শত বর্ষের শত গল্প

প্রথম খণ্ড

॥ ১৭৮৭-১৮৯৭ ॥

সাগরময় ঘোষ

সম্পাদিত

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১২

ভূমিকা

॥ ১ ॥

"কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে···লিখেছিলে মেঘদূত!" রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এর কোনো উত্তর পাননি। কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি, মেঘদূতের রস আস্বাদনে কোনো অসুবিধে ঘটেনি। অথচ, কোন্ সময়ে এই খণ্ডকাব্যটি রচিত হয়েছিল তা জানার কৌতূহল অনেকের আছে। কেউ-কেউ বলেন, কালিদাসের কাল গত হয়েছে দেড় হাজার বছর আগে। তা দেড়ই হোক বা আড়াই-ই হোক—সে বিষয়ে আমাদের কোনো কৌতূহল নেই; যতক্ষণ মেঘদূত হাতে আছে ততক্ষণই কালিদাস আমাদের সঙ্গে আছেন, ততক্ষণই তিনি আমাদের সমকালীন।

গল্প সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা অনুরূপ। আমাদের ধারণা গল্প হচ্ছে মানুষের সমকালীন। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে এসেছে এই জিনিসটি মানুষের ধারার সঙ্গে, প্রত্যেকটি ধাপে মানুষের সমকালীন থাকতে থাকতে আজ সেই গল্প আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে আমাদের সমকালীন চেহারা নিয়ে।

কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে গল্পের উৎপত্তি—ইতিহাসের পাতায় তা লেখা নেই। লেখা নেই বলেই বিস্মৃত। এবং বিস্মৃত বলেই লোকে বিস্মিত হয়ে ভাবতে বসে—কবে থেকে এল এই বস্তু এই পৃথিবীতে!

আমাদের মনে হয়, যবে থেকে মানুষ এল। মানুষ এল—অন্যান্য জীবের মত কেবল হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ নিয়ে না—একটা বাড়তি জিনিস নিয়ে। মন নিয়ে। মনের খোরাক দরকার, সেই খোরাকও এল সেই সঙ্গে; এল গল্প।

এখনো তো মানুষ আসে। নতুন মানুষ আসে। তাদের মুখে কথা ফুটলেই সে বলে, 'মা, গল্প বলো।' মুখ ফুটলেই এটা-ওটা-সেটা সে খেতে চায় বটে, সে-সব হচ্ছে তার শরীরের খিদে মেটাবার জন্যে; তার মনের খিদে মেটাবার জন্যে সে কিন্তু বলে অন্য কথা, বলে 'ঠাকমা, গল্প বলো। ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমির, রাজকন্যা—বা রাজপুত্তুরের, রাক্ষসের খোক্কসের।' গল্প তাহলে মানুষের দ্বিতীয় চাহিদা। প্রথমটা জীবনধারণের জন্যে দরকার, আর এই

দ্বিতীয়টা সম্ভবত দরকার প্রাণধারণের জন্যে। জীবনধারণের উপযোগী খাদ্যের অন্ত নেই। অনেকে বলে থাকেন, এবং সম্ভবত ঠিকই বলে থাকেন যে, পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যার খাদ্যের কোনো বাছ-বিচার নেই। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, মানুষ সব খায়। অন্য যে-কোনো প্রাণীর খাদ্যনির্বাচনে একটা নীতি আছে, একটা নিয়ম আছে : কিন্তু মানুষ এ-ব্যাপারে নীতি-নিয়ম মানে না। খাদ্যের উপকরণ নিয়ে মানুষের যেমন অবাধ উদারতা, গল্পের উপাদান নিয়েও তেমনি। পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই যা নিয়ে মানুষে গল্প না বানায়—পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ থেকে আরম্ভ ক'রে যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থই তার গল্পের উপাদান। এমনকি, যে বস্তুর সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি, যার অস্তিত্ব আছে কি না-আছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তা সত্ত্বেও সেই কাল্পনিক বস্তুকেও গল্পের উপাদান করা হয়ে থাকে। পরীরা তাই এসে গল্পের আসর জুড়ে বসে, তাই শিশুরা চোখে নিদারুণ কৌতূহল নিয়ে বলে 'গল্প বলো ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমির, গল্প বলো রাক্ষসের খোক্কসের।' এ-সবের অস্তিত্ব না থাক, তাতে কোনো অসুবিধে হয়নি, গল্পের মধ্যে দিয়েই তৈরী হয়েছে এদের চেহারা। চাক্ষুষ দেখতে না পেলেও এদের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন তা আমরা জানতে পেরেছি। যার কল্যাণে এই অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে তারই নাম দিয়েছি—গল্প।

অথচ এর বিপরীতটাও গল্প। আমাদের বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনী এক-এক সময় আমাদের মনে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগায়। আমরা তাকে গল্প বলে মনে করি। গল্প বলে মেনে নিই।

আসলে গল্পের কিন্তু কোনো সংজ্ঞা নেই। কাকে গল্প বলে, সহজে তা বলা বড় সহজ নয়। কিন্তু নিজেদের বুঝবার জন্যে একটা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। মানুষে যা শুনতে চায় সেইটেই গল্প। বৈঠকে বৈঠকে এইজন্যে বৈঠকী গল্পের আসর জমে ওঠে।

কিন্তু আমরা যে-গল্পের কথা বলতে বসেছি তা মুখ্য নয়—লেখ্য। মুখে-বলা গল্প হাওয়ায় হারিয়ে যায়, লিখে-বলা গল্প থাকে কেতাবে কবলিত।

হাওয়ায় হারিয়ে যদি না যেত তাহলে আদিম আদম তাঁর নবপরিণীতা বধূ ঈভকে যে গল্প বলেছেন তা আজ আমরা হয়তো খুঁজে পেতাম। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন নতুন চেতনা এসে প্রাণকে নাড়া দিল,

তখন প্রাণের মধ্যে নিশ্চয়ই জেগে উঠেছিল অজস্র কলরব। সেই কলরবই টুকরো-টুকরো কথায় পরিণত হয়েছে, সেই টুকরো-টুকরো কথা যুক্ত করে আদম ঈভকে এবং ঈভ আদমকে শুনিয়েছে গল্প। তা যদি না শোনাবে তো নির্বান্ধব এই বিপুল পৃথিবীতে সেই নবীন দম্পতি সময় কাটাতো কী ভাবে। গভীর দুখে দুখী না হোক—গভীর সুখে সুখীই না হয় হল, কেবল কি সেইভাবে তারা দুজনে মুখোমুখি নীরবে বসে ছিল? বিশ্বাস হয় না। বর্তমান কালের নবীন মানুষেরা মুখ ফোটার সঙ্গে-সঙ্গে যে চাহিদা জানায়, সেই চাহিদাটি সেই আদিম যুগের নবীন মানবদেরও ছিল। সেইকাল থেকে বয়ে আসছে শত মানুষের ধারা, আর সঙ্গে সঙ্গে বয়ে আসছে গল্পেরও ধারা। আমাদের তো এই ধারণা।

কিন্তু যার কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারা যাবে না, তা নিয়ে তর্ক করা সংগত হয় না। সুতরাং ও প্রসঙ্গ থাক। যে আকারেরই হোক বা যে আকৃতিরই হোক—গল্পের জন্ম অনেক আগে ঘটেছে। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তার চেহারার বা রীতি-পদ্ধতির বদল হয়েছে অবশ্য। বিশেষজ্ঞেরা বলেন গল্পের জন্ম সাহিত্যের সূচনারও আগে। রূপকথা উপকথা ইত্যাদি আরম্ভ হয়েছে কবে থেকে তা জানা যায় না। সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা রচনা করছেন তাঁরা সাহিত্যের সূত্রপাতের অন্তত একটা আনুমানিক কাল নির্দেশ করতে পারেন। কিন্তু গল্পের? তা বুঝি তাঁরা পারেন না।

মানুষের জীবনটাই আসলে একটি ছোটগল্প। এইজন্য জীবন থেকে একে পৃথক করা সম্ভব না, এবং এইজন্যেই গল্পকে মানুষ জীবনেরই একটা অঙ্গ—জীবনেরই একটা অংশ—করে নিয়েছে।

অনুপ্রাসটা অপ্রাসঙ্গিক হয়তো হবে না—তাহলে নিঃসংকোচে বলা যায় যে, রূপকথা উপকথার মত আষাঢ়ে গল্প থেকে আরম্ভ করে চাষাড়ে গল্প পর্যন্ত সবই গল্পের কোঠায় পড়ে।

অবশ্য একটা কথা এখানে বলে নিতে হবে। গল্প নিয়ে আমরা এখন গল্প করছি বটে, কিন্তু এই জিনিসটি খুব পুরনো হলেও এই শব্দটি খুব বেশি দিনের না। দু-এক শতাব্দী হল এই শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। আগে এই জিনিসেরই নাম ছিল অন্য। নাম ছিল—কথা। যেমন রূপকথা উপকথা। এবং কথা যদি একটু বিস্তৃত হত, তবে তাকে বলা হত—পরিকথা। এবং

যদি খুব ছোট হত, তবে তাকে বলা হত—কথানক, অর্থাৎ বর্তমান কালে আমরা যাকে ছোটগল্প বলি সেই জিনিসই আগে হয়তো ছিল এই কথানক।

কিন্তু গোলাপকে যে নামেই ডাকা যাক তার সৌন্দর্যের বা সৌরভের ইতরবিশেষ ঘটে না। এত নাম পরিবর্তনের দরুন, আশা করি, গল্পেরও রসের কোনো ইতরবিশেষ ঘটেনি। একটি নদী দূর পাল্লার পথ চলতে চলতে বাঁকে বাঁকে তার নামের বদল হয়তো করে, কিন্তু তবু সে থাকে নদী, থাকে স্রোতস্বিনী। আমাদের দেশের পুরাণ তো ছোট ছোট গল্পে ঠাসা, আমাদের মহাভারত তো গল্পের রাজা। এসব আমরা জেনেও হয়তো সব সময় সে বিষয়ে সচেতন থাকিনে। মহাভারতের কথাই বলি—কুরু-পাণ্ডবের সংগ্রামের মূল কাহিনীর দুইপাশে অজস্র নরনারী ভিড় করে দাঁড়িয়ে, তারা হচ্ছে ছোট ছোট গল্পের নায়ক ও নায়িকা। এদের সকলের খোঁজ আমরা সকলে করিনে ও করিনি, কিন্তু তাদের দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় তারা ছোটগল্পের কি রকম আশ্চর্য উপকরণ নিয়ে উপস্থিত। এই উপকরণ নিয়ে গত শতকে অনেক নাটক লেখা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথও দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন মহাভারতের উপাদান নিয়ে। এবং বর্তমান কালেও এই উপকরণ ব্যবহার করে দু-একজন উৎসাহী সাহিত্যিক গল্প এবং কাব্য রচনা করেছেন। মহাভারতের মত গ্রীক পুরাণও গল্পের উপাদানের আকর। রোমক লেখক ওভিদ ও আপুলিয়াস পদ্যে ও গদ্যে সেই উপকরণের সদ্‌ব্যবহার প্রথম আরম্ভ করেন।

আমাদের এই প্রাচ্য ভূখণ্ডই আসলে গল্পের দিক থেকে অগ্রগামী। অনেক কাল আগের কথা, এই দেশ থেকে গল্পের ধারা পশ্চিমের দিকে প্রবাহিত হয় মধ্যযুগে, এবং তারই পরিণামে দেখা পাই বোকাচ্চিয়োর, দেখা পাই চসারের—তাঁরা এইসব উপাদান লাভ ক'রে তার উপর নিজেদের দক্ষতার ও প্রতিভার ছাপ দিয়ে নূতন ভাবে তা পরিবেশন করেন।

অবশেষে, ঐতিহাসিকদের মতে, চতুর্দশ খৃষ্টীয় শতকে গল্প ভেঙে যায় কয়েকটি ভাগে। বাস্তব গল্প, প্রেমের গল্প, হাসির গল্প, রূপক গল্প। এসব অবশ্য পশ্চিম-দেশের কথা। আমাদের দেশে এ-ধরণের ভাঙচুর হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। তার প্রমাণ রূপকথা, তার প্রমাণ মহাভারত। মহাভারতের গল্পে হাসি আছে, কান্না আছে, দয়া আছে, মায়া আছে, শঠতা, কপটতা,

মহত্ত্ব, বীরত্ব সবই আছে। এককথায়, মানুষের চরিত্রের এমন কোনো দিক বা ঘটনা নেই যা মহাভারতের শাখা-কাহিনীতে বিবৃত না হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বলতে গেলে মহাভারত হচ্ছে একটি ছোটগল্পের সংকলন। আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই গল্প হচ্ছে লোকশিক্ষার একমাত্র বাহন। যুগ যুগ ধরে মানুষ ধর্ম দর্শন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেছে গল্পের মধ্য দিয়ে। গভীর তত্ত্ব আর জটিল জীবন-জিজ্ঞাসা সহজ সরল রূপ নিয়েছে ছোট-ছোট পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তীর মধ্যে।

সেই গল্পের দেশের মানুষ আমরা। আমাদের কল্পনাও তাই বিস্তৃত, কল্পনাও তাই ব্যাপক। দেবদেবীর কল্পনা যখন আমরা করি তখনও তাঁদের বিশ্রম্ভালাপকে নেহাত প্রণয়কূজন বলে ভাবতে পারিনে, গল্পের কথা পেলেই আমরাও পঞ্চমুখ হয়ে উঠি। মেঘনাদবধ কাব্যে মাইকেল মধুসূদন হরগৌরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন তাঁরা গল্পে রত। বলেছেন—

পঞ্চতন্ত্রকথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে।

এই পঞ্চতন্ত্রকথাও গল্প। এখানে আমরা ঈশপের গল্পের কথা মনে করতে পারি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, পঞ্চতন্ত্রের চেয়ে ঈশপের নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশি। কিন্তু ঈশপের অনেক আগেই আমাদের দেশে আছে এই পঞ্চতন্ত্র আর আছে কথাসরিৎসাগর। পঞ্চতন্ত্রের বয়স কত বলা কঠিন। কিন্তু এ যে অতি সুপ্রাচীন তার অন্যতম একটি প্রমাণ এই যে, দেবদেবীর মুখে এই কথা আরোপ করতে আমাদের কোনো দ্বিধা হয়নি। কিন্তু ঈশপের গল্প কোন দেবদেবীর মুখে আরোপ করতে আমাদের দ্বিধা হবে।

মোট কথা, আমরা গল্প নিয়ে যে এমন মশগুল হতে পারি—এইটেই আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য একদিনে আসেনি; এর একটা উৎস আছে। ধারাবাহিকতা আছে। এইটুকু বলার জন্যেই এই আলোচনা। আমরা আড্ডা দিতে যেমন পারি এমন বুঝি অন্য কোনো রাজ্যের বা দেশের লোক পারে না। গল্প না হলে আড্ডা জমে না। আড্ডার উপকরণই গল্প—সে খোসগল্পই হোক বা গালগল্পই হোক।

॥ ২ ॥

এদেশে ইংরেজি প্রভাব আরম্ভ হয়েছে গত শতকের গোড়ায়। ইংরেজরা এসেছেন অবশ্য তার অনেক আগে, এবং পলাশীর প্রান্তরে আমাদের জাতীয় ট্র্যাজিডিও ঘটে গেছে। কিন্তু ইংরেজি প্রভাব বলতে যা বোঝায় তার দ্বারা অভিভূত হতে সময় লাগে, এবং ঐ জাতীয় ট্র্যাজিডিরও প্রায় বছর পঞ্চাশ পরে আমরা ইংরেজির কবলে পড়ি। সেই সময় থেকে আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসের নতুন অধ্যায় শুরু। নতুন অধ্যায় শুরু—এই কথাটার উপরে জোর দিতে ইচ্ছে করি। কেননা, অনেকের হয়তো এই রকমের ধারণা আছে যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়েই আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের শুরু অর্থাৎ সূত্রপাত। ইংরেজরা এদেশে আসায় এবং আমাদের দেশের ও দশের উপরে তার প্রভাব পড়ায় আমাদের অকল্যাণ হয়েছে—এমন অকৃতজ্ঞ কথা বলার ইচ্ছে নেই। ইংরেজের দ্বারা আমরা উপকৃত হয়েছি—একথা অকপটে স্বীকার করতে হবে। তথাকথিত দেশাত্মবোধের প্রেরণায় যাঁরা এই উপকারকে অস্বীকার করেন তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া যেমন কঠিন, তেমনি, যাঁরা ইংরেজ-প্রভাবকেই আমাদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয় সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করেন তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়াও সহজ না। ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি সাহিত্যকে আমরা পৃথকভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি বলেই আমাদের মতের এই ভিন্নতা।

এই প্রভাবের কথা তোলা হল এই জন্যে যে এ'কে উপলক্ষ্য করেই গত শতকে আমাদের সাহিত্যের নূতন অধ্যায় রচিত হয়েছে। ইংরেজিয়ানায় মত্ত হয়ে একদল নব্যযুবক সনাতনীদের ব্যঙ্গ করতে আরম্ভ করলেন, এবং সনাতনপন্থীরা নবভাবে ভাবিত নব্যযুবকদের তিরস্কার করার জন্যে লেখনী ধারণ করলেন। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার আলোড়নে জেগে উঠল একটি আবর্ত—দেখা দিলেন রামমোহন রায়, দেখা দিল ব্রাহ্মসমাজ। সে আমলের বঙ্গবাসীর চোখে এসবের চেহারা কি রকমের ছিল, তা অনুমান করার চেষ্টা করতে চাইনে। এখন আমরা ঐসব আলোড়ন-আন্দোলনের থেকে প্রায় এক শতাব্দী দূরে সরে এসে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছি—জাতীয় চেতনা তখন মন্থন করা হয়েছে। অমৃত ও হলাহল—দুই-ই হয়তো উঠেছে তাতে। কিন্তু হলাহল নয়, আমরা অমৃত বিষয়ে আলোচনা করছি।

অমৃত লাভ করেছি আমরা। আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা পেয়েছি মধুসূদনের, দেখা পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্রের, দেখা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের। এ আমাদের পরমলাভ। এঁরা কেউ-ই কেবল আমাদের স্বদেশী সাহিত্যের দ্বারা পুষ্ট নন—বিদেশী সাহিত্যের রসেও সঞ্জীবিত। অথচ এঁরা খাঁটি স্বদেশী। এঁদের রচনা যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, এঁদের দেশাত্মবোধের উগ্রতা ছিল না, ছিল গভীরতা। এঁরা বিদেশীকে নকল করেননি, বিদেশের যা ভালো তা গ্রহণ করে পরিপাক করেছেন। পরিপাক-কার্যটি উত্তমরূপে সাধিত হয়েছে বলেই তাঁদের রচিত সাহিত্যের স্বাস্থ্য এমন উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। ইংরেজি-প্রভাবের সঙ্গে আরও এক প্রভাব গত শতকের মাঝামাঝি দেখা দেয়। সে হচ্ছে ফরাসি সাহিত্যের প্রভাব। এই দ্বিবিধ সাহিত্য এসে আমাদের দেশের তদানীন্তন নবযুবকদের আন্দোলিত করে তোলে। তাঁদের ধারণা হয় যে, ইংরেজের প্রভাবে আমরা যেমন পেয়েছি রোমান্টিসিজ্‌ম্, ফরাসির প্রভাবে তেমনি পেয়ে গেলাম রিয়ালিজ্‌ম্। এ-দুটি পেলাম—এতে আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি এই যে, এ-দুটি জিনিসই আমাদের দেশে আগে থেকেই ছিল, সেই সঙ্গে ছিল সে সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতা কথাটা রূঢ় শোনালে আমরা তার বদলে না হয় অন্য কথা বলতে পারি, বলতে পারি—উপেক্ষা।

কেবল এই কথা অকপটে স্বীকার করা যায় যে, গল্প-রচনায় আমরা সে-সময়ে তেমন মনোনিবেশ করতে পারিনি, ইংরেজ অথবা ফরাসিরা সাহিত্যের এই দিকটার উৎকর্ষ-সাধনে ব্রতী হয়েছেন আমাদের চেয়ে আগে। বিদেশের মাটি থেকে ওক্ গাছের চারা এনে আমাদের মাটিতে পোঁতা হল, এবং তারপরে আমরা পেলাম বট—এমন কথা আমরা যেন না ভাবি। গল্পও আমাদের ছিল, রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ও ছিল, রিয়ালিজ্‌ম্‌ও ছিল।

রোমান্টিসিজ্‌ম্? চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীর কথা স্মরণ করলে আমরা এর প্রমাণ পাব। কেবল দুজন প্রধানের নামোল্লেখ করা হল, আরো অজস্র পদকার পদাবলী রচনা করেছেন। তাঁরা নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেছেন ঐ পদে—নিজেই নিজ রচনার নায়ক সেজেছেন। রোমান্টিক রচনার এ হচ্ছে চরম দৃষ্টান্ত।

রিয়ালিস্টিক রচনাও আমাদের দেশে নতুন না। কবিকঙ্কণ তাঁর রচিত চণ্ডীকাব্যে যে-সব চরিত্র চিত্রিত করেছেন তার মত বাস্তব চরিত্র বুঝি হয়

না। ভাঁড়ু দত্ত যে একটি অতি প্রাচীন গ্রন্থের একটি চরিত্র মাত্র, এমন মনে হয় না। মনে হয়, জলজ্যান্ত মানুষটা যেন একেবারে চেনা।

সুতরাং, এইসব পশ্চাৎপট আমাদের ছিল। হাতে তুলিও ছিল, রংও ছিল ; তার সঙ্গে কিছুটা বিদেশী রং মিশিয়ে নিয়ে আমাদের দেশের শিল্পীরা অঙ্কন করতে আরম্ভ করলেন নতুন চিত্রাবলী। আমরা ক্রমশ পেতে আরম্ভ করলাম, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে, নিত্যনবীন চিত্রবহুল কাহিনী।

উপকথা বা রূপকথার পর্ব পার হয়ে গল্প রচনা আরম্ভ হল সমাজের মানুষকে নিয়ে। তখন গল্প হল সমাজেরই একটি ছবি—এক-একটি খণ্ডচিত্র। এর সূত্রপাত হয়েছে আগে—সমাজের ব্যঙ্গছবি আঁকা হয়েছে। এঁকেছেন ভবানীচরণ, এঁকেছেন প্যারীচাঁদ। তারপরে এলেন বঙ্কিম, তিনি—ব্যঙ্গ নয়, বলা যায়—বঙ্গচিত্র রচনা করলেন, বাংলাদেশের মানুষের সুখদুঃখের চিত্র। কিন্তু গল্প-রচনায় তেমন মনোযোগ না দিয়ে তিনি উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনাতেই তাঁর প্রতিভা নিয়োগ করলেন।

অবশেষে এলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর হাতে গল্পের চেহারা নতুন রূপ নিল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ অভিজাত বংশের সন্তান। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মেশার সুযোগ তাঁর তেমন ঘটেনি। বাংলাদেশের একটি নতুন সমাজ—যাকে আজকাল আমরা মধ্যবিত্ত সমাজ বলে অভিহিত করি, সেই সমাজ—গড়ে উঠতে আরম্ভ করে উনিশ শতকের গোড়ায়। তার আগে ছিল দুটি মাত্র সমাজ—জমিদার ও রায়ত। ওয়ারেন হেস্টিংসের দশসালা-বন্দোবস্তের দরুন জমিদার-সমাজে ভাঙন ধরল, ধীরে ধীরে দেখা দিল চাকুরিজীবী—অর্থাৎ ধীরে ধীরে গড়ে উঠল মধ্যবিত্ত সমাজ। এ-সমাজ বঙ্কিমের আমলে তেমনভাবে জমে ওঠেনি, রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালেও না। এই সমাজকে ভালভাবে পেলেন শরৎচন্দ্র —এবং তার চিত্রও তিনি আমাদের দিয়েছেন। কেবল ভালোভাবে পাওয়াই না, শরৎচন্দ্র নিজেই এই সমাজের মানুষ ছিলেন। সেইজন্যেই তিনি এ-সমাজকে দেখেছেন স্পষ্টভাবে।

রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে এমন স্পষ্টভাবে দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাতে বুঝি ক্ষতি হয়নি কিছু। দৃষ্টি প্রখর হলে দূর থেকে দেখাও অন্তরঙ্গভাবে দেখার সমান হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের সঙ্গে, বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে,

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পদ্মানদীর দুইকূল বরাবর। রাজশাহী পাবনা নদীয়া—বাংলাদেশের এই তিনটি জেলার অধিবাসীদের তিনি দেখেছেন স্পষ্টভাবে, প্রত্যক্ষভাবে। নৌকায় আরোহী হয়ে তিনি এই ত্রিজেলার কূলে কূলে ভেসে বেড়িয়েছেন, আকাশের অসীমেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না, তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল দুই তীরের শস্যশ্যামল প্রান্তরে, এবং প্রান্তরের প্রহরী হয়ে যারা ছিল, সেই নরনারীর জীবনযাত্রার প্রণালীর উপরে, তাদের সুখের তাদের দুঃখের তাদের অভাবের তাদের অভিযোগের তাদের জীবনের বিবিধ বিধানের উপর। সাধারণ ও সামান্য মানুষ বলে যাদের আমরা অভিহিত করি তাদের অন্তরঙ্গ-ভাবে দেখার সৌভাগ্যে ভাগ্যবন্ত হতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে। দুই পারে যেমন ঋতুতে ঋতুতে ফলে উঠেছে নতুন ফসল, রবীন্দ্রনাথের জীবনেও তেমনি দেখা দিয়েছে ফসলের সমারোহ—তিনি তাদের নিয়ে লিখেছেন গল্প। আমরাও সেই ফসল ঘরে তুলে ভাগ্যমন্ত হতে পেরেছি।

ভাগ্যমন্ত হতে পেরেছি আরও এই জন্যে যে, রবীন্দ্রনাথ গল্পরচনার ক্ষেত্রে বিষয়নির্বাচনে যে-ব্যাপকতার সন্ধান দিয়েছেন সেই পথ ধরে বাংলাদেশের গল্পকারেরা অগ্রসর হতে পেরেছেন। প্রথমে পথ থাকে না, পায়ে-চলা-পথ দেখা দেয় প্রথমে—সে পথেও একদিন প্রথম একজনের পা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তেমনি একজন পথিকৃৎ, প্রথম চলা আরম্ভ করে তিনি একটি পথের দাগ আঁকলেন, নিজে সেই পথে চলে চলে তার বিস্তার বাড়ালেন। এবং সে পথ ক্রমে হয়ে দাঁড়াল রাজপথ।

রাজপথ ধরে বর্তমানে চলেছেন অনেক পথিক। পথিকের সমাবেশে আজ এ-পথ পরিপূর্ণ বলা যায়। এই সংকলনে আমরা সেই রাজপথের শত পথিকের কণ্ঠস্বর ধরে এনেছি। একই গান যদি সকলে গায়, তবু গলায় গলায় তার সুর এক হলেও স্বর ভিন্ন হবে।

কেবল স্বর-বদল অবশ্য নয়, রীতির বদলও আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন আচার-আচরণ পোশাক-পরিচ্ছদ বদল হয়, তেমনি ভাষার পরিবর্তন ঘটে, ভঙ্গিরও বদল হয়। আমাদের পিতামহ যেভাবে কথা বলতেন, যেভাবে সাজপোশাক পরতেন, তাঁরই বংশধর হয়েও তাঁরই বংশের ধারা রক্ষা করেও আমরা অনেক পরিমাণে অন্যরকম হয়েছি। তাঁকে অস্বীকার করিনি, কিন্তু তাঁর সবকিছু স্বীকার করে নিতেও পারিনি। এইজন্যে শত বর্ষের গল্পের

ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করলে ভাবের ভাষার ভঙ্গির অনেক পার্থক্য দেখা যাবে। এতে গল্পের গল্পত্ব অটুট ত থাকেই, অধিকন্তু আমাদের পরিবর্তনশীল জীবনের একটি চলচ্চিত্র যেন দেখা যায়।

॥ ৩ ॥

এই সংকলনে ১৭৮৭ থেকে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে-সব লব্ধপ্রতিষ্ঠ গল্পকারের জন্ম, তাঁদের রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ১৮৯৭ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে তার পরবর্তিগণ আছেন। গ্রন্থশেষে দ্বিতীয় খণ্ডের লেখক-সূচী দেওয়া হল।

আমরা বলেছি, সামাজিক আচার-আচরণের প্রতি কটাক্ষ করে আমাদের নবীন গল্পের সূত্রপাত। আমরা সেই সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছি। সেকালে বাংলাদেশে একটি নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, 'বাবু' সম্প্রদায় নামে তার উল্লেখ করা হত। ভবানীচরণ প্যারীচাঁদ কালীপ্রসন্ন-প্রমুখ লেখকগণ তাঁদের রীতিনীতি নিয়ে বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে তাঁদের নায়ক হিসাবে গ্রহণ করে কাহিনী রচনা করেছেন। এইসব লেখায় গল্প যেমন আছে, তেমনি আছে সে-আমলের সমাজের চিত্র। যা গত হয়েছে, তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাহিত্যের কল্যাণে তা ধরা থাকে। সমাজব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষের আর-একটি দৃষ্টান্ত, এই গ্রন্থে সংকলিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী'। অন্যান্য গল্পও যদিও সমাজের প্রতি কটাক্ষ নয়, কিন্তু সেগুলিও সামাজিক চিত্র।

সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তনের দৃষ্টান্তও যেমন এসব গল্পে আছে, তেমনি গল্পের নিজস্ব রীতিনীতি পরিবর্তনের দৃষ্টান্তও এতে পাওয়া যাবে।

চতুর্দিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলে তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে না। আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে এখানে তা আহরণ করেছি, এই আহরণ-কাজে সহায় ছিলেন শ্রীমান সুবিমল লাহিড়ী। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবৃন্দের কাছে এ-সংকলন আদরণীয় হবে।

৪৫ এস আর দাশ রোড
কলিকাতা-২৬
৭ পৌষ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

সাগরময় ঘোষ

ফুলবাবু

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলবাবু অর্থাৎ বাবু ফুল হইলেন। খলিপা সঙ্গে কখন বাগানে কখন নিজভবনে নানাজাতি প্রমোদিনী বিবিধ বিলাসিনী বারাঙ্গনা আনয়নপূর্ব্বক আপন [মন] খুসি করিতেছেন। খুসির তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনে অক্ষম হইলাম, এক দিবসের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি ; খলিপা কহিলেন, কল্য বাগানে সকল রকম মজা দেখাইব ; কিন্তু পাঁচ শত টাকা অদ্য ব্যয় করিতে হইবেক। বাবু কহিলেন, খলিপা অদ্য আমার হস্তে একটি টাকাও নাই, সংপ্রতি টাকার কি হইবেক। খলিপা কহিল, বাবুজী আমি তোমার নিকটে যত দিবস থাকিব তত দিবস টাকার নিমিত্ত মজা ভঙ্গ হইবে না, কেবল তুমি আপন নাম সহি করিয়া দিবা। বাবু আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন, আর কহিলেন শীঘ্র টাকার সুযোগ অর্থাৎ ফিকির করহ ; খলিপা কাম্পেনি আফিসে খবর দিয়া তৎক্ষণাৎ দুই জন দালাল আনিয়া বাবুর নিকটে নিযুক্ত করিলেন, দালালেরা কহিলেক, বাবুজী কত টাকা চাহি আজ্ঞা করুন, বাবু কহিলেন পাঁচ শত টাকা ; দালালেরা একে হনুমান, তাহাতে যদি আজ্ঞা পান, তবে তৎক্ষণাৎ নক্ষত্রবেগে মহাজনের বাটীতে হয়েন ধাবমান। মহাজন ব্যাধের প্রায় ফাঁদ পাতিয়া আছেন, কে ফাঁদে পড়ে তাহাই সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন। দালালেরা কহিলেক, মহাশয় অভাগা অজা পাইয়াছি, পাঁচ শত টাকা চাহে। মহাজন কহিলেক, তাহার নাম কি এবং পিতার বা কি নাম, বাটী কোথা। দালালেরা কহিলেন এক্ষণে ওসকল কথায় প্রয়োজন নাই, আপনকার জ্ঞানেও এমন শিকার পান নাই। ইহার নাম জগদ্দুর্লভ বাবু, পিতার নাম রামগঙ্গা নাগ, হরেক রকম সওদাগরি আছে বেলেঘাটায় চুনের গোলা, জক্সনের ঘাটে থল্যার দোকান, খাতাবাটীতে মুটের সরদারি প্রায় লক্ষ দুই লক্ষ টাকার সম্ভাবনা হইবেক। মহাজন আপন লিষ্টি বাহির করিলেক, তাহার ঐ লিষ্টিতে লেখা আছে যে কোন লোক ধনী অবিরোধী অজাতুল্য এবং সন্তানকে অধিক স্নেহ করে, ঐ লিষ্টির মধ্যে রামগঙ্গা নামও লেখা আছে আর দেখিলেক এ লোক কখন আদালত দেখে নাই এবং উকীল কৌনসলী কি কর্ম্ম করে

তাহাও জ্ঞাত নহে, মহাজন আপন লিষ্টিতে এইসব অবগত হইয়া মহাতুষ্ট হইল। পরে দালালদিগকে কহিলেক, পাঁচ শত টাকা দিব দুই হাজার টাকার খত সহি করাইতে হইবেক, তোমরা দালালি সেই স্থানে লইবা; যাও বাবুর সহিত রফা কর। বাবু বৈঠকখানায় খলিপাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন অদ্য কি মজা হইবেক, আর এক একবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন টাকা পাওয়া যাইবেক কি না। খলিপা কহে টাকার কারণ উদ্বেগ করিবা না, যাহারা এক কথায় টাকা না দেয় এমত লোকের সহিত ব্যবহার ও আলাপ করি না, বাবুকে এত এত টাকা দেওয়াইয়াছি, এই যত হুমরা চুমরা দেখিতে পাও এক্ষণে কেহ ঝকমারি দলের রাজা, কেহ পাখির দলের সর্দ্দার, সকের যাত্রানির্ব্বাহক ইহারা সকলেই আমার কাছে তালিম হইয়াছে, কোন বেটাকে আমি টাকা না দেওয়াইয়াছি, ইহারা কএদ হইয়াছে ইহাদিগের পিতার কাছে গমনাগমন করিয়া খালাস করিয়াছি। তোমাকে একেবারেই কহিয়াছি আমি নিকটে থাকিতে কোন পেঁচ নাই, স্বচ্ছন্দে মজা কর, কেবল আমার কথাপ্রমাণে চলিবা। এমত [সময়] সমুদয় দালালেরা আসিয়া কহিলেক, বাবুজী টাকা স্থির করিয়াছি, কত স্থানে ভ্রমণ করিলাম তাহা কি কহিব কেহ দিতে চাহে না। তৎপরে এই সুর বাবুর নাম ডিউয়ের দিনে অর্থাৎ খতের মেয়াদ পূর্ণ হইলে টাকা না পাও আমরা দিব। বাবু কহিলেন, তোমারদিগের সহিত সে মহাজনের কি প্রকার আলাপ। দালালেরা কহিলেক, বাবুজী এ কর্ম্মে আমরা নূতন ব্রতী নহি। আপনি জ্ঞাত নহেন আমরা এই কর্ম্ম করিতে করিতে প্রাচীন হইলাম, আমাদিগের বাটী ছিল কোড়াগাছি, তাহা কে না জানে, এই সুরবাবু সকলি জানেন, ঞিহাকে কত টাকা দেওয়াইয়াছি এবং আমরাও ইহার স্থানে কত টাকা পাইয়াছি, যদি ইহার টাকা কিম্বা দুই চারিখান বাটী থাকিত তবে আজি আমারদিগের কি কি ভাবনা ছিল। সে যাহা হউক এক্ষণে আমারদিগের কি দালালি দিবেন। বাবু কহিলেন খলিপাজী যাহা দিতে কহিবেন তাহাই দিব। পরে খলিপা বাবুর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া কহিলেন, তোমারা দুই জনে ৫০ টাকা পাইবা। দালালেরা এ কথা শুনিয়া কহিলেক, মহাশয় এ কি কথা আপনি পাঁচ শত টাকা লইবেন আমাদিগকে পঞ্চাশটি টাকা দিবেন এমন কথা কখন শুনি নাই, যদি কোন লোক দুই শত টাকা লয় সেও পঞ্চাশ টাকা দেয়। এইরূপ অনেক কথোপকথনের পর এক শত

টাকায় রফা হইল। ইহাতে বাবু কিঞ্চিৎ বিরস হইলেন যে পাঁচ শত টাকার কমে এ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক না, ইহার মধ্যে এক শত টাকা দালালদিগকে দিতে হইবেক ইহাই ভাবিছেন। খলিপা কহিলেক, বাবুজী এক কথা আছে দালালি টাকা খতের উপর চড়াইয়া দাও। বাবু কহিলেক, এ কথা ভাল আমি ইহা স্বীকৃত আছি। ইহা শুনিয়া দালালেরা তৎক্ষণাৎ মহাজনের নিকট গমন করিয়া দুই হাজার এক শত টাকার এক নোট লেখাইয়া আনিল। বাবু সহি করিলেন টাকা খলিপা বুঝিয়া লইলেন। মহাজনের তরফ তিন লোক আসিয়া বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুজী এই নোটের বেবাক টাকা পাইয়াছেন। বাবু কহিলেন, হাঁ পাইয়াছি। পরে টাকা লইয়া খলিপা মজার নিমিত্তে দ্রব্যাদির আয়োজন করিছেন।

নববাবুবিলাস : ১৮২৩

বা বু য়া না

প্যারীচাঁদ মিত্র

সোনাগাজির দরগায় কুনী বুনী বাসা করিয়াছিল। চারি দিক্ শেওলা ও বোনাজে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে কাকের ও সালিকের বাসা—ধাড়ীতে আধার আনিয়া দিতেছে—পিলে চিঁচিঁ করিতেছে—কোনখানেই এক ফোঁটা চুণ পড়ে নাই—রাত্রি হইলে কেবল শেয়াল কুকুরের ডাক শোনা যাইত ও সকল স্থানে সন্ধ্যা দিত কি না তাহা সন্দেহ। নিকটে এক জন গুরুমহাশয় কতক-গুলি ফরগুল গলায় বাঁধা ছেলে লইয়া পড়াইতেন—ছেলেদিগের লেখাপড়া যত হউক বা না হউক, বেতের শব্দে ত্রাসে তাহাদিগের প্রাণ উড়িয়া যাইত—যদি কোন ছেলে এক বার ঘাড় তুলিত অথবা কোঁচড় থেকে এক গাল জলপান খাইত তবে তৎক্ষণাৎ তাহার পিঠে চট্ চট্ চাপড় পড়িত। মানবস্বভাব এই যে কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে সে কর্ত্তৃত্বটি নানারূপে প্রকাশ চাই তাহা না হইলে আপন গৌরবের লাঘব হয়—এই জন্য গুরুমহাশয় আপন প্রভুত্ব ব্যক্ত

করণার্থ রাস্তার লোক জড় করিতেন—লোক দেখিলে সেই দিকে দেখিয়া আপন পঞ্চম স্বরকে নিখাদ করিতেন ও লোক জড় হইলে তাঁহার সরদারি অশেষ বিশেষ রকমে বৃদ্ধি পাইত, এ কারণ বালকদিগের যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইত তাহার আশ্চর্য্য কি? গুরুমহাশয়ের পাঠশালাটি প্রায় যমালয়ের ন্যায়—সর্ব্বদাই চটাপট্, পটাপট্, গেলম রে, মলুম্ রে ও "গুরুমহাশয় গুরু-মহাশয় তোমার পড়ো হাজির" এই শব্দই হইত আর কাহার নাকখত—কাহার কাণমলা—কেহ ইটেখাড়া—কাহার হাতছড়ি—কাহাকেও কপিকলে লটকান —কাহার জলবিচাটি, একটা না একটা প্রকার দণ্ড অনবরতই হইত।

সোনাগাজির গুমর কেবল উক্ত গুরুমহাশয়ের দ্বারাই রাখা হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ প্রান্তভাগে দুই এক জন বাউল থাকিত—তাহারা সমস্ত দিন ভিক্ষা করিত। সন্ধ্যার পর পরিশ্রমে আক্লান্ত হইয়া শুয়ে শুয়ে মৃদুস্বরে গান করিত। সোনাগাজির এইরূপ অবস্থা ছিল। মতিলালের শুভাগমনাবধি সোনাগাজির কপাল ফিরিয়া গেল। একেবারে "ঘোড়ার চিঁহিঁ, তবলার চাটি, লুচি পুরির খচাখচ", উল্লাসের কড়াংধুম রাতদিন হইতে লাগিল আর মণ্ডা মিঠাই, গোলাপ ফুলের আতর ও চরস, গাঁজা মদের ছড়াছড়ি দেখিয়া অনেকেই গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার লোক চেনা ভার—অনেকেই বর্ণচোরা আঁব। তাহাদিগের প্রথমে এক রকম মূর্ত্তি দেখা যায় পরে আর এক রকম মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। ইহার মূল টাকা—টাকার খাতিরেই অনেক ফেরফার হয়। মনুষ্যের দুর্ব্বল স্বভাব হেতুই ধনকে অসাধারণরূপে পূজ্য করে। যদি লোকে শুনে যে অমুকের এত টাকা আছে তবে কি প্রকারে তাহার অনুগ্রহের পাত্র হইবে এই চেষ্টা কায়মনোবাক্যে করে ও তজ্জন্য যাহা বলিতে বা করিতে হয় তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। এই কারণে মতিলালের নিকট নানা রকম লোক আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ উলার ব্রাহ্মণের ন্যায় মুখফোঁড়া রকমে আপনার অভিপ্রায় একেবারে ব্যক্ত করে—কেহ বা কৃষ্ণনগরীয়দিগের ন্যায় ঝাড় বুটা কাটিয়া মুন্‌সিয়ানা খরচ করে—আসল কথা অনেক বিলম্বে অতি সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ হয়—কেহ বা পূর্ব্বদেশীয় বঙ্গভায়াদিগের মত বেনিয়ে বেনিয়ে চলেন—প্রথম প্রথম আপনাকে নিষ্প্রয়াস ও নির্লোভ দেখান—আসল মত্‌লব তৎকালে দ্বৈপায়নহ্রদে ডুবাইয়া রাখেন—দীর্ঘকালে সময়বিশেষে প্রকাশ হইলে বোধ হয় তাহার গমনাগমনের তাৎপর্য্য কেবল "যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য"।

মতিলালের নিকট যে ব্যক্তি আইসে সেই হাই তুলিলে তুড়ি দেয়—হাঁচিলে "জীব" বলে। ওরে বলিলেই "ওরে ওরে" করিয়া চীৎকার করে ও ভালমন্দ সকল কথারই উত্তরে—"আজ্ঞা আপনি যা বল্‌ছেন তাই বটে" এই প্রকার বলে। প্রাতঃকালাবধি রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত মতিলালের নিকট লোক গস্‌গস্‌ করিতে লাগিল—ক্ষণ নাই—মুহূর্ত্ত নাই—নিমেষ নাই—সর্ব্বদাই নানা প্রকার লোক আসিতেছে—বসিতেছে—যাইতেছে। তাহাদিগের জুতার ফটাং ফটাং শব্দে বৈঠকখানার সিঁড়ি কম্পমান—তামাক মুহুর্মুহু আসিতেছে—ধুঁয়া কলের জাহাজের ন্যায় নির্গত হইতেছে। চাকরেরা আর তামাক সাজিতে পারে না—পালাই পালাই ডাক ছাড়িতেছে। দিবারাত্রি নৃত্য গীত, বাদ্য, হাসিখুসি, বড়ফট্টাই, ভাঁড়ামো, নকল, ঠাট্টা, বট্‌কেরা, ভাবের গালাগালি, আমোদের ঠেলাঠেলি—চড়ুইভাতি, বনভোজন, নেশা একাদিক্রমে চলিয়াছে। যেন রাতারাতি মতিলাল হঠাৎবাবু হইয়া উঠিয়াছেন।

এই গোলে গুরুমহাশয়ের গুরুত্ব একেবারে লঘু হইয়া গেল—তিনি পূর্ব্বে বৃহৎ পক্ষী ছিলেন এক্ষণে দুর্গাটুনটুনি হইয়া পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে ছেলেদের ঘোষাইবার একটু একটু গোল হইত—তাহা শুনিয়া মতিলাল বলিলেন এ বেটা এখানে কেন মেও মেও করে—গুরুমহাশয়ের যন্ত্রণা হইতে আমি বালককালেই মুক্ত হইয়াছি আবার গুরুমহাশয় নিকটে কেন?—ওটাকে ত্বরায় বিসর্জ্জন দাও। এই কথা শুনিবামাত্র নববাবুরা দুই এক দিনের মধ্যেই ইট পাটখেলের দ্বারা গুরুমহাশয়কে অন্তর্দ্ধান করাইলেন সুতরাং পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেল। বালকেরা বাঁচলুম বলিয়া তাড়ি পাত তুলিয়া গুরুমহাশয়কে ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দেখাইতে দেখাইতে চোঁচা দৌড়ে ঘরে গেল।

এদিকে জান সাহেব হৌস খুলিলেন—নাম হৈল জান কোম্পানি। মতিলাল মুৎসুদ্দি, বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা কর্ম্মকর্ত্তা। সাহেব টাকার খাতিরে মুৎসুদ্দিকে তোয়াজ করেন, ও মুৎসুদ্দি আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া দুই প্রহর তিনটা চারিটার সময় পান চিবুতে চিবুতে রাঙ্গা চকে এক এক বার কুঠী যাইয়া দাঁতুড়ে বেড়াইয়া ঘরে আইসেন। সাহেবের এক পয়সার সঙ্গতি ছিল না—বটলর সাহেবের অন্নদাস হইয়া থাকিতেন এক্ষণে চৌরুঙ্গিতে এক বাটী ভাড়া করিয়া নানা প্রকার আসবাব ও তসবির খরিদ করিয়া বাটী সাজাইলেন ও ভাল ভাল গাড়ি, ঘোড়া ও কুকুর ধারে কিনিয়া আনিলেন এবং ঘোড়-

দৌড়ের ঘোড়া তৈয়ার করিয়া বাজির খেলা খেলিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে সাহেবের বিবাহ হইল, সোনার ওয়াচগার্ড পরিয়া ও হীরার আঙ্গুটি হাতে দিয়া সাহেব ভদ্র ভদ্র সমাজে ফিরিতে লাগিলেন। এই সকল ভড়ং দেখিয়া অনেকেরই সংস্কার হইল জান সাহেব ধনী হইয়াছেন এই জন্য তাঁহার সহিত লেন দেন করণে অনেকে কিছুমাত্র সন্দেহ করিল না কিন্তু দুই একজন বুদ্ধিমান্ লোক তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া আল্‌গা আল্‌গা রকমে থাকিত—কখনই মাথামাথি করিত না।

কলিকাতার অনেক সৌদাগর আড়তদারিতেই অর্থ উপার্জ্জন করে—হয় ত জাহাজের ভাড়া বিলি করে অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা জিনিসপত্র খরিদ বা বিক্রয় করে ও তাহার উপর ফি শতকরায় কতক টাকা আড়তদারি খর্চ্চা লয়। অন্যান্য অনেকে আপন আপন টাকায় এখানকার ও অন্য স্থানের বাজার বুঝিয়া সৌদাগিরি করে কিন্তু যাহারা ঐ কর্ম্ম করে তাহাদিগকে অগ্রে সৌদাগরি কর্ম্ম শিখিতে হয় তা না হইলে কর্ম্ম কাজ ভাল হইতে পারে না।

জান সাহেবের কিছুমাত্র বোধশোধ ছিল না, জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইলেই মুনফা হইবে এই তাঁহার সংস্কার ছিল ফলতঃ আসল মতলব এই পরের স্কন্ধে ভোগ করিয়া রাতারাতি বড়মানুষ হইব। তিনি এই ভাবিতেন যে সৌদাগরি সেস্ত করা—দশটা গুলি মারিতে মারিতে কোনটা না কোনটা গুলিতে অবশ্যই শিকার পাওয়া যাইবে। যেমন সাহেব ততোধিক তাহার মুৎসুদ্দি—তিনি গণ্ডমূর্খ—না তাঁহার লেখাপড়াই বোধশোধ আছে—না বিষয়কর্ম্মই বুঝিতে শুঝিতে পারেন সুতরাং তাহাকে দিয়া কোন কর্ম্ম করান কেবল গো বধ করা মাত্র। মহাজন, দালাল ও সরকারেরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট জিনিসপত্রের নমুনা লইয়া আসিত ও দর দামের ঘাট্‌তি বাড়্‌তি এবং বাজারের খবর বলিত। তিনি বিষয়কর্ম্মের কথার সময় ঘোর বিপদে পড়িয়া ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন—সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন না—কি জানি কথা কহিলে পাছে নিজের বিদ্যা প্রকাশ হয়, কেবল এই মাত্র বলিতেন যে বাঞ্ছারাম বাবু ও ঠকচাচার নিকটে যাও।

আফিসে দুই এক জন কেরানি ছিল, তাহারা ইংরাজীতে সকল হিসাব রাখিত। এক দিন মতিলালের ইচ্ছা হইল যে ইংরাজী ক্যাশবহি বোঝা

ভাল এজন্য কেরানির নিকট হইতে বহি চাহিয়া আনাইয়া এক বার এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া বহিখান্ এক পাশে রাখিয়া দিলেন। মতিলাল আফিসের নীচের ঘরে বসিতেন—ঘরটি কিছু সেঁতসেঁতে—ক্যাশবহি সেখানে মাসাবধি থাকাতে সরদিতে খারাপ হইয়া গেল ও নববাবুরা তাহা হইতে কাগজ চিরিয়া লইয়া সল্‌তের ন্যায় পাকাইয়া প্রতিদিন কাণ চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন—অল্প দিনের মধ্যেই বহির যাবতীয় কাগজ ফুরিয়া গেল কেবল মলাট্‌টি পড়িয়া রহিল। অনন্তর ক্যাশবহির অন্বেষণ হওয়াতে দৃষ্ট হইল যে তাহার ঠাটখানা আছে, অস্থি ও চর্ম্ম পরহিতার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। জান সাহেব হা ক্যাশবহি জো ক্যাশবহি বলিয়া বিলাপ করত মনের খেদ মনেই রাখিলেন।

জান সাহেব বেধড়ক ও তুচকোব্রত জিনিসপত্র খরিদ করিয়া বিলাত ও অন্যান্য দেশে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন—জিনিসের কি পড়তা হইল ও কাট্‌তি কিরূপ হইবে তাহার কিছুমাত্র খোঁজ খবর করিতেন না। এই সুযোগ পাইয়া বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা চিলের ন্যায় ছোবল মারিতে লাগিলেন তাহাতে ক্রমে তাহাদিগের পেট মোটা হইল—অল্পে তৃষ্ণা মেটে না—রাতদিন খাই খাই শব্দ ও আজ হাতিশালার হাতী খাব, কাল ঘোড়াশালার ঘোড়া খাব, দুই জনে নির্জ্জনে বসিয়া কেবল এই মতলব করিতেন। তাঁহারা ভাল জানিতেন যে তাঁহাদিগের এমন দিন আর হইবে না—লাভের বসন্ত অস্ত হইয়া অলাভের হেমন্ত শীঘ্রই উদয় হইবে অতএব নে থোর‌ই সময় এই।

দুই এক বৎসরের মধ্যেই জিনিসপত্রের বিক্রীর বড় মন্দ খবর আইল—সকল জিনিসেতেই লোকসান বই লাভ নাই। জান সাহেব দেখিলেন যে লোকসান প্রায় লক্ষ টাকা হইবে—এই সংবাদে বুকদাবা পাইয়া তাঁহার একেবারে চক্ষুঃস্থির হইয়া গেল আর তিনি নিজে মাসে মাসে প্রায় এক হাজার টাকা করিয়া খরচ করিয়াছেন, তদ্ব্যতিরিকে ব্যাঙ্কে ও মহাজনের নিকটও অনেক দেনা—আফিস কয়েক মাসাবধি তলগড় ও ঢালসুমরে চলিতেছিল এক্ষণে বাহিরে সম্ভ্রমের নৌকা একেবারে ধুপুস্ করিয়া ডুবে গেল, প্রচার হইল যে জান কোম্পানি ফেল হইল। সাহেব বিবি লইয়া চন্দননগরে প্রস্থান করিলেন। ঐ সহর ফরাসিদিগের অধীন—অদ্যাবধি দেনদার ও

ফৌজদারি মামলার আসামিরা কয়েদের ভয়ে ঐ স্থানে যাইয়া পলাইয়া থাকে।

এদিকে মহাজন ও অন্যান্য পাওনাওয়ালারা আসিয়া মতিলালকে ঘেরিয়া বসিল। মতিলাল চারি দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন—এক পয়সাও হাতে নাই—উট্‌নাওয়ালাদিগের নিকট হইতে উট্‌না লইয়া তাঁহার খাওয়া দাওয়া চলিতেছিল এক্ষণে কি বলিবেন ও কি করিবেন কিছুই ঠাওরাইয়া পান না, মধ্যে মধ্যে ঘাড় উঁচু করিয়া দেখেন বাঞ্ছারাম বাবু ও ঠকচাচা আইলেন কি না, কিন্তু দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি, ঐ দুই অবতার তুলতামালের অগ্রেই চম্পট দিয়াছেন। তাহাদিগের নাম উল্লেখ হইলে পাওনাওয়ালারা বলিল যে চিঠিপত্র মতিবাবুর নামে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের কোন এলেকা নাই, তাহারা কেবল করপরদাজ বই তো নয়।

এইরূপ গোলযোগ হওয়াতে মতিলাল দলবল সহিত ছদ্মবেশে রাত্রিযোগে বৈদ্যবাটীতে পলাইয়া গেলেন। সেখানকার যাবতীয় লোক তাঁহার বিষয়-কর্ম্মের সাত কাণ্ড শুনিয়া খুব হয়েছে হয়েছে বলিয়া হাততালি দিতে লাগিল ও বলিল—আজও রাতদিন হচ্ছে—যে ব্যক্তি এমত অসৎ—যে আপনার মাকে ভাইকে ভগিনীকে বঞ্চনা করিয়াছে—পাপকর্ম্মে কখনই বিরত হয় নাই, তাহার যদি এরূপ না হবে তবে আর ধর্ম্মাধর্ম্ম কি?

কর্ম্মক্রমে প্রেমনারায়ণ মজুমদার পরদিন বৈদ্যবাটীর ঘাটে স্নান করিতে-ছিল—তর্কসিদ্ধান্তকে দেখিয়া বলিল—মহাশয় শুনেছেন—বিট্‌লেরা সর্ব্বস্ব খুয়াইয়া ওয়ারিণের ভয়ে আবার এখানে পালিয়ে আসিয়াছে—কালামুখ দেখাইতে লজ্জা হয় না! বাবুরাম ভাল মুষলং কুলনাশনং রাখিয়া গিয়াছেন। তর্কসিদ্ধান্ত কহিলেন—ছোঁড়াদের না থাকাতে গ্রামটা জুড়িয়ে ছিল—আবার ফিরে এলো? আহা! মা গঙ্গা একটু কৃপা করিলে যে আমরা বেঁচে যাইতাম। অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন—নববাবুদিগের প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগের দাঁতে দাঁতে লেগে গেল, ভাবিতে লাগিলেন যে আমাদিগের স্নান আহ্নিক বুঝি অদ্যাবধি শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণ করিতে হইবে। দোকানি পসারিয়া ঘাটের দিকে দেখিয়া বলিল—কই গো! আমরা শুনিয়া-ছিলাম যে মতিবাবু সাত সুলুক ধন লইয়া দামামা বাজিয়ে উঠিবেন—এখন সুলুক দূরে যাউক একখানা জেলে ডিংগিও যে দেখিতে পাই না। প্রেমনারায়ণ

বলিল তোমরা ব্যস্ত হইও না—মতিবাবু কমলে কামিনীর মুস্‌কিলের দরুণ দক্ষিণ মশান প্রাপ্ত হইয়াছেন—বাবু অতি ধর্ম্মশীল—ভগবতীর বরপুত্র—ডিঙ্গে স্লুক ও জাহাজ ত্বরায় দেখা দিবে আর তোমরা মুড়ি কড়াই ভাজিতে ভাজিতেই দামামার শব্দ শুনিবে।

আলালের ঘরের দুলাল : ১৮৫৮

সফল স্বপ্ন

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া খরতর কিরণ-নিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জুমুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্ত্তী নির্ঝর-তীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আস্পদ হইয়া আছে। নিবিড় বনপত্রে সূর্য্যকিরণ প্রায় সর্ব্বতোভাবেই আচ্ছাদিত; কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখাপল্লব না থাকাতে বোধ হয় যেন, উহারা উপরিস্থ পর্ণচন্দ্রাতপ ধারণের স্তম্ভ হইয়া আছে। অদূরে বন-হস্তিগণ সুশীতল ছায়াতলে সুষুপ্তি-সুখানুভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতরুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্ব্বতা প্রমাণ করিতেছে। ফলতঃ বিধাতা নিভৃত নির্জ্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখরেই সৃষ্টির পরম রমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই মনুষ্য-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, নিঃশব্দ, শান্ত-রসাস্পদ স্থানে নানা অদ্ভুত বস্তুর সন্দর্শন হওয়াতে মন অবশ্যই ভক্তি শ্রদ্ধা ও

ঔদার্য্যগুণ অবলম্বন করিয়া সেই মহৈশ্বর্য্যশালী জগৎকর্ত্তার সন্নিধানে নীত হয়।

অনুমান হয়, পথিক তাদৃশ উদারভাবে নিমগ্ন-চিত্ত হইয়া ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় সম্মুখস্থ নির্ঝরের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে হঠাৎ সমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্রশাখী সমুদায় প্রবল বেগে সমালোড়িত, তাবৎ অরণ্য গভীর গর্জ্জনে শব্দায়মান এবং পথিকের অশ্ববর এক প্রকাণ্ড সিংহের পদাঘাতে ভূতলশায়ী হইল। পথিক নিমিষ মধ্যে সিংহের সমীপবর্ত্তী হইয়া নিষ্কোষিত করবাল দ্বারা এক এক আঘাতেই তাহার পশ্চাৎ পদদ্বয়ের শিরাচ্ছেদন করিলেন। মৃগরাজ ছিন্নপদ হওয়াতে চলৎশক্তিরহিত হইয়া অশ্বকে পরিত্যাগ করিল—কিন্তু অশ্ব তাহার দারুণ পদাঘাতে একান্ত আহত এবং নখর বিদারণে জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল—অতএব ক্ষণমাত্র পরেই প্রাণত্যাগ করিল। সিংহ অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে গর্জ্জন করিতেছিল—তাহার চক্ষুর্দ্বয় তেজে উদ্দীপ্ত এবং কেশর উত্থিত হইয়াছিল—কিন্তু সেই ক্রোধ কোন কার্য্যকরী হইল না। পশু সম্মুখের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, পথিক নির্ভয়ে গমনপূর্ব্বক তাহার মস্তকে খড়্গ প্রহার করিলেন; দ্বিতীয় আঘাতেই পশুরাজ আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

পথিক বাহনবিনাশে নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন—কিন্তু কি করেন, অপ্রতিবিধেয় দুঃখে দুঃখী হওয়া অকর্ত্তব্য, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন বহুক্ষণ অতীত হইয়াছে, দিবাভাগ থাকিতে থাকিতেই পদব্রজে অরণ্য উত্তীর্ণ হইতে হইবে, এই বিবেচনা করিয়া বাজিপৃষ্ঠে যাবৎ পাথেয় দ্রব্যসামগ্রী ছিল, সমুদায় স্বীয় স্কন্ধে আরোপণ করতঃ দ্রুতবেগে গমনোন্মুখ হইলেন। বহুক্ষণ কাননের কুটিল পথে গমন করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, এমত সময়ে সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইল। অগ্রসর হইয়া দেখেন, প্রান্তরমধ্যভাগে এক নবপ্রসূতা হরিণী স্বীয় শাবক সমভিব্যাহারে তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। পথিক সত্বরপদে আসিয়া অনতিবেগবান্ সদ্যোজাত সেই হরিণশিশুকে গ্রহণ করিলেন। ভয়বিহ্বলা হরিণী প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। মৃগয়া সফল হওয়াতে পথিক মনে মনে ভাবিলেন, এইক্ষণে উত্তম উপযোগ দ্রব্য পাইলাম, কাননে রাত্রি যাপন করিতে হইলেও হানি নাই। এই ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে

মৃগশাবকের পদে রজ্জু বন্ধন করিয়া লইলেন, এবং প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অটবী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণের যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া হরিণশিশুকে একটা বৈদ্যুতাগ্নিশুষ্ক বৃক্ষমূলে স্থাপন করত দুইখানি শুষ্ককাষ্ঠ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। অনন্তর অসিধারণপূর্ব্বক মৃগশাবকের প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছেন, দৈবাৎ অদূরে দণ্ডায়মানা মৃগমাতার প্রতি নেত্রপাত হইল। আহা! পশুজাতির মধ্যেও অপত্যস্নেহ কি প্রবল! হরিণী উন্নতমুখী হইয়া জলধারাকুল লোচনে পথিকের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছিল। পরে, ক্ষণে স্বীয় শাবকের প্রতি এবং ক্ষণে পথিকের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এক এক পা করিয়া শাবকের সমীপাগত হইলে, পথিক কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। হরিণী এক লম্ফে শাবকের সন্নিহিত হইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল এবং পার্শ্বে শয়ন করিয়া নানা প্রকারে স্পষ্টরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। পথিক পুনর্ব্বার নিকট গমনের উপক্রম করিলেন। হরিণী অমনি দীর্ঘলম্ফ প্রদান করিল। কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহ-বন্ধন প্রযুক্ত পলায়ন করিতে পারিল না—পূর্ব্ববৎ অপত্য-বিরহ-বিষাদ প্রদর্শন করিতে লাগিল। পশুযোনিতে ঈদৃক্ মানুষ-সদৃশ বাৎসল্য ভাব অবলোকনে কাহার মনে সত্ত্ব গুণের উদয় না হয়? পথিক কারুণ্যরসের প্রাদুর্ভাবে বিচলিতান্তঃকরণ হইয়া কুরঙ্গের কোমলাঙ্গ হইতে বন্ধন মোচন করত অপার পবিত্র আনন্দানুভব করিলেন। মৃগশাবক মুক্ত হইয়া অতি শীঘ্র মাতৃসন্নিহিত হইল এবং সিদ্ধমনোরথা হরিণী তৎক্ষণাৎ আনন্দধ্বনি করিয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু শাবক সমভিব্যাহারে অটবী মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, একবার সন্তানের জীবনরক্ষিতার প্রতি সজল দৃষ্টিদ্বারা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া গেল।

ধর্ম্মাত্মা পথিক এইরূপ সদাশয়তা প্রকাশ দ্বারা অতীব চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন। জীবন অপেক্ষা ইহলোকে অধিকতর প্রেমাস্পদ পদার্থ আর কি আছে? বিশেষতঃ নিকৃষ্ট জীবগণ অপরিণামদর্শী ও ইন্দ্রিয়-প্রীতিপরায়ণ। এই জন্য জিজীবিষাবৃত্তি পশ্বাদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকে। হায়! তাহারা কি নির্ঘৃণ, যাহারা অকারণে কোন প্রাণীর জগদীশ্বর-প্রদত্ত সর্ব্ব-সুখনিদান প্রাণাপহরণ করিয়া আপনাদিগের চিত্ত কলুষিত করে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! অনুমান হয়, পবিত্রচিত্ত ধর্ম্মাত্মার

অন্তঃকরণে জগদীশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠিত থাকেন, সুতরাং সৃষ্ট প্রাণিমাত্রের প্রতি তাঁহার হিংসা দ্বেষ ক্রোধাদি ভাব অপনীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস জন্মে। দেখ, পথিক কুরঙ্গশাবককে মোচন করিয়া অবধি সেই ভয়াবহ গহনবনকে প্রার্থনীয় পুণ্যতীর্থ বোধ করিয়া স্থানান্তরে রাত্রি যাপনের মানস পরিত্যাগ করিলেন এবং পাথেয় তণ্ডুলের কিয়দংশ হইতে যথাকথঞ্চিৎরূপে অন্ন প্রস্তুত করিয়া ক্ষুধাশান্তি করত অতীব তৃপ্তি-লাভ করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। সুধাংশুমণ্ডলনিঃসৃত জ্যোৎস্নারাশি মন্দ মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত মহীরুহগণ কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র খণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া নৃত্যকারী বনদেবতাগণের অলৌকিক অঙ্গপ্রভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এবং শুষ্কপত্র পতনের মর মর শব্দ, নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি ও রাত্রিচর পশুগণের গভীর নিনাদ সমুদায় মিলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন জগদ্‌যন্ত্র-বাদ্যের মধুর লয়সঙ্গতি হইতেছে এবং উহারই মোহিনীশক্তি প্রভাবে যাবতীয় জীব একেবারে সুপ্ত-শক্তি হইয়াছে।

পথিক বৃক্ষমূলে পর্ণশয্যায় শয়ন করিয়া পথ-পরিশ্রম বশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিন্তু দিবাভাগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তদ্দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তিনি নিদ্রাবস্থায় একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, মৃগাঙ্কমণ্ডল হইতে জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পরে ক্ষণকাল তাঁহার প্রতি সহাস্যাননে এবং সস্নিগ্ধ নয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন—"রে বৎস! তুমি অদ্য অতি সুকৃত করিয়াছ, অতএব যিনি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমস্ত জীবকে সমভাবে সুখদুঃখভাজন করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই পরাৎপর পরমাত্মা তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ তুমি অচিরে গজনন্ নগরের অধিপতি হইবে, কিন্তু দেখিও, যেন প্রভুত্বমদে মত্ত হইয়া নিজ নৈসর্গিক দয়া দাক্ষিণ্য বিবর্জিত হইও না, অদ্য পশুযোনির প্রতি যাদৃশ সদয়তা প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন নরলোকের প্রতিও তাদৃশ ব্যবহার করিও।"

এই বলিয়া দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন নিশা অবসান হয় নাই। গগনমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডল পরিবেষ্টিত অম্লানকিরণ দ্বিজরাজ বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তাদৃশ স্বপ্নদর্শনে পথিক এমত চঞ্চল-মনা হইয়াছিলেন যে, আর নিদ্রাবেশে নেত্র নিমীলিত করিতে

পারিলেন না। পর্ণশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া করতলে কপোলবিন্যাস পূর্ব্বক হিমাংশুর ব্যোমান্ত অবলম্বন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নভোমণ্ডল ঈষৎশুক্লাম্বর ধারণ করিল, চন্দ্রমামুখ ম্লান হইল, এবং দূরস্থ গিরিশৃঙ্গ সমুদায় হইতে কুজ্‌ঝটিকারাশি উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রচ্ছন্ন করিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইল—পরে সহস্রাংশুর তীক্ষ্ণ রশ্মি সমুদায় কুজ্‌ঝটিকাজাল বিদীর্ণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল—দূরস্থ মহীধরশৃঙ্গসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিরাশিপ্রায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—নীহারমণ্ডিত বৃক্ষগণের পত্র-বিটপাদি বালাতপ-সংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধরিল—এবং শিশির-সিক্ত শষ্পশয্যা যেন, রাত্রিবিহারী বনদেবীগণের পরিচ্যুত অঙ্গাভরণ বিভূষিত হইয়া তাদৃশ চাক্‌চিক্যশালী হইতে লাগিল—তথা প্রশস্ত পত্র মাত্রেই পবিত্র অম্বুভারে অবনত হইয়া সহৃদয় ব্যক্তির ন্যায় সদ্‌গুণাধার বশতঃ নিজ নিজ নম্রতা স্বীকার করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মন্দ মন্দ মারুতহিল্লোলে অথবা রবিরশ্মি-সংযোগে যে যাহার আপনাপন শোভা—কেহ বা পৃথিবীতে অভিষেক করিল, কেহ বা স্বর্গাভিমুখে প্রেরণ করিল—করিয়া, সকলে শান্তিপ্রদ হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়া রহিল।

পান্থ প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর শুষ্ক পত্রাদি সংযোগে অগ্নি জ্বালনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিবসের ন্যায় অন্ন পাক করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। পরে পাথেয় দ্রব্যসামগ্রী সমুদায় স্কন্ধে আরোপণ করিয়া ভূতলে জানু পাতনপূর্ব্বক আন্তরিক ভক্তি সহকারে সংযত-মনোবৃত্তি হইয়া স্বীয় ধর্ম্মের শাসনানুযায়ী পুণ্যধাম মক্কার প্রত্যভিমুখে ঈশ্বরারাধনা করিয়া পুনর্ব্বার গমনোদ্যত হইলেন।

অপরিজ্ঞাত কাননপথে একাকী যাইতে যাইতে পূর্ব্বরাত্রির অদ্ভুত স্বপ্নটি বারম্বার স্মৃতি-পথারূঢ় হইতে লাগিল। স্বপ্নটি তাঁহার চিত্তপটে এমনি স্পষ্টরূপে চিত্রিত হইয়াছিল যে, এক এক বার বোধ হইল উহা অবশ্যই সত্য হইবে; আবার ভাবিলেন, আমি এই দেশে নামধামবিহীন আগন্তুক ব্যক্তি, আমি এই দেশের একাধিপতি হইব ইহা স্বপ্নেরই বিষয় হইতে পারে, কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে; স্বপ্ন কেবল বাতিকের ক্রীড়া মাত্র; জাগ্রদবস্থায় যে সকল ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়, মনুষ্য তাহা বুদ্ধিবলে দমন করিয়া মনোবৃত্তি সকলকে আপন আপন উচিত কার্য্যে নিযুক্ত করেন; স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়, সুতরাং মনোমধ্যে বিবিধ অসঙ্গতভাবের আবির্ভাব হইবে আশ্চর্য্য কি?

অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনও স্বপ্নে বিশ্বাস করেন না—বিশেষতঃ এরূপ দুরাশা সঞ্চিত করায় মহৎ হানির সম্ভাবনা ; কারণ যদিও ইহা কস্মিন্‌কালে সফল হয়, তাহাতেই বা তাৎকালিক সুখের আধিক্য কি ? আর যদি সফল না হয়, তবে যতকাল বাঁচিব ততকাল লোভরূপ দাবাগ্নিদ্বারা অন্তর্দাহ হইতে থাকিবে ; অপরন্তু, সংকীর্ণ ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া ঈদৃশ দুশ্চিন্তা নিমগ্ন হইলে স্খলিতপদ হইয়া অধঃপতিত, অথবা অন্যমনস্কতা বশতঃ বিপথগামী হইতে হয়—অতএব হে জগৎপতে ! আমার এই প্রার্থনা, কখন যেন অন্তঃকরণে লোভের ভার এমত না হয় যে, তজ্জন্য অবিনশ্বর ধর্ম্ম পদার্থকে এই নশ্বর জীবন অপেক্ষা লঘু বোধ করি।

শুদ্ধাত্মা পথিক এই সকল চিন্তাদ্বারা উদ্রিক্ত দুরাকাঙ্ক্ষা নিরাকরণের চেষ্টা করিতে করিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পথিক এইরূপ চিন্তা-মগ্ন হইয়া কুটিলকানন-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ একটি স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি একত্র উপবেশন করিয়া কেহ বা তাম্রকূটধূম পানে কেহ বা অন্যান্য উপযোগে মনোযোগ করিয়া আছে। পর্য্যাটক মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহারা যদি শত্রুতা করে, তবে কখনই পলাইয়া রক্ষা পাইব না, আর শত্রুতাই করিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ?—মিত্রতা করিলেও করিতে পারে। অতএব ইহাদিগের সম্মুখে সাহস করিয়া গিয়া পথ জিজ্ঞাসা করি, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। এইরূপে সাহসে ভর করিয়া তিনি ঐ বনেচরদিগের সম্মুখীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “ওহে ভাই সকল ! আমি পথিকজন—এই স্থানের পথ জানি না, অনুগ্রহ করিয়া কহিয়া দেও।” এই কথা শ্রবণমাত্র একজন শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিকট হাস্য করত কহিল, “ওহে পথিক ! ভাল, বল দেখি, যদি এইখানেই তোমার গতি শেষ করা যায়, তাহাতে হানি কি ?” পর্য্যাটক উত্তর করিলেন, “তাহাতে অনেক ক্ষতি আছে, কিন্তু সে সকল কথা কহিবার অবকাশ নাই—এক্ষণে পথ বলিয়া দেও উত্তম—নচেৎ চলিলাম।” বনেচর কহিল, “তুই আর কোথা যাবি ?—জানিস না, আমরা এই কানন-রক্ষক, যে যে এখান দিয়া যায় সকলের স্থানেই আমরা শুল্ক আদায় করি—

আমাদিগের অনুমতি ভিন্ন কেহই এখান দিয়া যাইতে পারে না।" পথিক কহিলেন, "ভাই, আমি পণ্যজীবি বণিক্ নহি, কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য করি না।—আমার স্থানে কি শুল্ক পাইবে?" তস্কর তখন আপন প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিল, "ওরে মূর্খ! তুই নিঃসহায়, আমরা আটজন, তোর দুই হস্তের কি এত বল হইবে যে, আমাদিগের আট জনের সহিত একাকী যুদ্ধ করিবি?—যদি ভাল চাহিস্ তবে বাক্ছল পরিত্যাগ কর, সমভিব্যাহারে যে ধনসম্পত্তি বা ভক্ষ্যসামগ্রীসম্ভার আছে সমুদায় আমাদিগকে আনিয়া দে, দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যা, নিবারণ করিব না—আমাদিগের এই ব্যবসায়, কেহ কখন আমাদিগের কথার অন্যথা করিতে পারে না।" "তবে তোমরা চৌর্য্যবৃত্তি?" "আমরা চোর হই বা না হই সে কথায় তোর প্রয়োজন কি?" "এই প্রয়োজন যে, তোমার সাতজন মাত্র সহায়, কিন্তু যদি সাতশত হয় তথাপি জীবনসত্ত্বে আমি আজ্ঞাবহ হইব না।" তস্কর পথিকের সাহসের কথা শুনিয়া আপন সহযোগিগণকে কহিল, "এ বেটা বলে কি রে?—এ যে মরিতে বসেও কার্দ্দানি ছাড়ে না। ভাল, দেখা যাউক, দুই এক ঘা ওসারিয়া দিলেই ইহার বুদ্ধি স্বস্থান প্রাপ্ত হইবে" এই বলিয়া পথিকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল—"আইস তোমার পিঠ্বোচ্কাটি নামাইয়া দি, ছি ছি কুব্জের মত পিঠে থাকাতে কি কদাকার দেখাইতেছে, এবার সোজা হইয়া রূপখানি দেখাও।" পথিক তস্করের উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রে চোর! আমি প্রাণের ভয় করি না, বিশেষতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমত কোন সুখ পাই নাই এবং কখনও পাইব এমত আশাও করিতেছি না যে, জীবনভয়ে কাতর হইয়া তোর শরণ প্রার্থনা করিব—মৃত্যু আমার পক্ষে প্রার্থনীয়—অতএব সাবধান হইয়া আমার গতি রোধ কর্।" এই বলিয়া পথিক এক বৃহৎ বনতরুকে আশ্রয় করিয়া নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। চোরেরা ঈদৃশ সাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে চমৎকৃত হইল। পরে একজন দুরাত্মা দূর হইতে সন্ধান করিয়া পথিকের অপসব্য হস্তে শর নিক্ষেপ করিল। পথিক তৎক্ষণাৎ শরকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু শরধারে বাহুর শিরা ছিন্ন হইয়াছিল, অতএব যুদ্ধ করিবেন কি, ভুজোত্তোলন করিতেও সমর্থ হইলেন না। চোরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিরস্ত্র করিল, এবং তাহার পৃষ্ঠস্থিত থলিয়া মোচন করিয়া ফেলিল।

লুব্ধেরা পথিকের সমুদায় সম্ভার বাহির করিয়া দেখে তাহাতে এমন কিছুই নাই যে, গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু পথিক সেই সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্যই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া কেহ পরিহাস করিতে লাগিল, এবং কেহ অদ্ভুত ব্যাপার মানিয়া তুষ্ণীভূত হইয়া রহিল। অনন্তর তস্করপতি নিজ অনুচরদিগকে আদেশ করিয়া কহিলেন, "দেখ ইহার সঙ্গে এক কপর্দ্দকও নাই, কিন্তু ইহার শরীর বিলক্ষণ সবল এবং পরিশ্রমক্ষম, এমন দাস পাইলে অনেকে ক্রয় করিবে, অতএব চল উহাকে সঙ্গে করিয়া লই, যে কয়েক দিবস হাতের ঘা-টা আরাম না হয়, আমাদিগের সঙ্গেই থাকুক, পরে কোন গ্রামে লইয়া বিক্রয় করিলেই হইবে।" এইরূপ কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ হইলে চোরেরা পথিকের হস্তযুগল তাঁহার নিজ উষ্ণীষ বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করতঃ তাঁহাকে আপনাদিগের মধ্যবর্ত্তী করিয়া লইল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই পথিক তাহাদিগের কর্ত্তৃক কতিপয় কুটীর সম্মুখে নীত হইলেন। ঐ সকল কুটীর তস্করদিগের নির্ম্মিত এবং তাহাদিগের পরিজনের আবাস। চোরেরা সেই স্থানে পথিকের নিমিত্ত একটি নূতন কুটীর প্রস্তুত করিয়া দিল। পান্থ বনেচরদিগের সমভিব্যাহারে তিন দিবস যাপন করিলেন। তাঁহার বাহুর ক্ষত প্রায় শুষ্ক হইয়াছিল, আর দুই চারি দিবসে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার সম্ভাবনা, এমত সময়ে তস্করেরা একত্র হইয়া তাহাকে সম্মুখীন করিল, এবং তাহাদের অধিপতিদ্বারা কহিতে লাগিল, "শুন পথিক! আমরা তোমার দেহ-শক্তি এবং সাহস দর্শনে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি, আমরা চোর বটি, কিন্তু যথার্থগুণের পুরস্কারে পরাঙ্মুখ নহি, তোমার পাথেয় দেখিয়া নিতান্ত দুরবস্থা বুঝিয়াছি, অতএব আমরা তোমাকে সমভিব্যাহারী করিতে স্বীকার করিলাম; দেখ আমাদিগের কন্যা কলত্রাদি আছে এবং আমরা বনেচর বলিয়া নিতান্ত ক্লেশে কালযাপন করি না—ইচ্ছা হয় ত আমাদিগের সহিত মিলন কর, নচেৎ পূর্ব্বে যে অভিসন্ধি করিয়াছি অবশ্য তাহাই করিব।" পথিক ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, আমি কোনক্রমেই অসৎবৃত্তি অবলম্বন করিব না—বরং তোমাদিগকে অগ্রে সাবধান করিতেছি যে, আমাকে কোন রহস্যানুসন্ধান জ্ঞাত করিও না, করিলে, প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা জানিবে।" তস্করপতি কহিলেন—"আমরা সে ভয় করি না। সাহসী বীরগণ কখন বিশ্বাসহন্তা হইতে পারে না, বিশ্বাস-

ঘাতকতা নীচপ্রকৃতি ভীরুগণেরই ধর্ম্ম।" পথিক কহিলেন, "তোমরা সে আশা পরিত্যাগ কর, চোর ও দস্যু প্রভৃতি যে সকল দুরাত্মা মনুষ্যমাত্রেরই অপকারক, তাহাদিগকে ব্যাঘ্রভল্লুকাদির ন্যায় উচ্ছেদ করা সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম—না করিলে, ধার্ম্মিকগণের অনুপকার করা হয়।" চৌরপতি পথিকের ভৎর্সনা বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"আর তোর সাধুতা প্রকাশ করিতে হইবে না, আমি বুঝিলাম, তুই না ধার্ম্মিক জনের, না সাহসী পুরুষদিগের সংসর্গী হইবার যোগ্য—অতএব তুই যাদৃশ নীচপ্রকৃতি অচিরাৎ তদুপযুক্ত দাস্যবৃত্তি প্রাপ্ত হইবি।" পথিক উত্তর করিলেন, "নিরস্ত্র এবং আহত ব্যক্তিকে অধার্ম্মিক ভীরুজনেরাই অপমান করে—তাহাতে মনুষ্যত্ব নাই।" চৌরপতি ঈষৎ লজ্জাযুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান করত কহিলেন, "ভাল ভাল, এত বাকবিতণ্ডার প্রয়োজন নাই—তুমি আমার অনুচর হইতে অস্বীকার করিলে, অতএব চল তোমার শরীর বিক্রয় করিয়া আমাদিগের এতাবৎ পরিশ্রম সফল করি।" এই বলিয়া তস্করেরা পথিককে সমভিব্যাহারে করিয়া চলিল এবং বন উত্তীর্ণ হইয়া অনতিদূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হইল। সেই গ্রামের হট্টে একজন দাসক্রেতা পথিককে ক্রয় করিয়া লইল। চোরেরা মূল্য পাইয়া চলিয়া গেল। পথিক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার স্বপ্ন বিলক্ষণই সফল হইল। আমি কি নির্ব্বোধ যে, এমন দুরাশাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিয়াছিলাম! কোথায় রাজ্যেশ্বর হইব, না দাস হইলাম! বিধাতা কপালে আরও কি লিখিয়াছেন, বলা যায় না; কিন্তু যাহা হউক এমত কোন কর্ম্ম করা হইবে না, যাহাতে শেষে অনুতাপ বা অপযশের ভাজন হইতে হয়।

দাস-ক্রেতা পথিকের অঙ্গস্পর্শ করিয়া এবং বীরলক্ষণাক্রান্ত শরীর দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত পরিশ্রমসহিষ্ণু বুঝিয়াছিলেন। অতএব আপন আলয়ে আনিয়া বিশিষ্ট যত্নপূর্ব্বক ভেষজসেবন করাইয়া তাহার হস্তের ক্ষতদোষ সংশোধন করাইলেন। কিন্তু তিনি লোভপরবশ হইয়া ঐ দাসটির প্রতি যেরূপ অধিক মূল্য নিরূপিত করিলেন, তাহাতে কেহই ক্রয় করিতে চাহিল না। কিছুদিন এইরূপে গত হইলে দাস-বিক্রেতা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই দাসটির জন্য অনেক ব্যয়ব্যসন করিলাম, কিন্তু কেহই ইহাকে ক্রয় করিতে চাহে না—কি করি?—অথবা উহার যাদৃশ শ্রী দেখিতে পাই, তাহাতে উহাকে সদ্বংশজাত বলিয়া বোধ হয়, অতএব উহাকেই জিজ্ঞাসা করি যদি

আমাকে অর্থদ্বারা তুষ্ট করিতে পারে, তবে দাস্যবন্ধন হইতে মোচন করিয়া দিব। এই ভাবিতে ভাবিতে দাসের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে! তুই স্বাধীন হইতে চাহিস্ কি না?" "মহাশয়! এ কথা কি জিজ্ঞাস্য? পিপাসাতুর কি জল পান করিতে পরাঙ্মুখ হয়?" "ভাল, তবে তুই আমাকে তুষ্ট করিবি কি না?" "কি প্রকারে তুষ্ট করিব, অনুমতি করুন।" "অর্থদ্বারা।" দাস দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল, "স্বাধীনতা প্রাণিমাত্রের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, কেহ কাহাকে এই ধনে বঞ্চিত করিতে পারে না, আমিও সেই নিজস্ব অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে সম্মত নহি—তাদৃশ অধার্ম্মিক জনের প্রবঞ্চনাতেই দুষ্ট লোকে দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয় এবং দুর্ভাগ্য জনের স্বাধীনতা অপহরণ করে।" এই বলিতে বলিতে দাসের চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে লোহিতবর্ণ এবং শরীর কম্পমান হইতে লাগিল। দাস-বণিক্ ভয়ে সঙ্কুচিত-চিত্তে এবং ম্লানবদন হইয়া শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি তাহার চেষ্টা হইল, যাহাতে দাসকে অন্যহস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিষ্কৃতি পায়।

কিয়দ্দিনান্তর সৌভাগ্যক্রমে খোরাসান-প্রদেশাধিপতি অতি বদান্য এবং ক্ষমতাবান্ আলেপ্তাগীন্ ঐ দাসকে ক্রয় করিয়া আপন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দাস কিছুকাল মহীপালের আশ্রয়ে বাস করিতে করিতে প্রভুকে স্বীয় গুণে বদ্ধ করিল। রাজা তাহার ধর্ম্ম-পরায়ণতা, জিতেন্দ্রিয়তা, নিরালস্য এবং স্বামিবাৎসল্য দেখিয়া পরম তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা আপন সমীপে রাখিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহার পদোন্নতি করিয়া দিলেন। একদিন দুইজনে একত্র বসিয়া আছেন এমন সময়ে রাজা নিজ দাসের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত অবগত হইবার ইচ্ছা খ্যাপন করিলে দাস কহিতে লাগিল।—

"মহারাজ! আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত অতি সঙ্ক্ষেপ। আমি দাস হইয়াছি বটে, কিন্তু কখন এমত কোন কর্ম্ম করি নাই যাহাতে বংশের কলঙ্ক হয়। যখন মুসলমানেরা 'কালিফ্ ওথ্মানের' আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পারস্যরাজ্য আক্রমণ করে, তখন পারস্য-ভূপাল 'ইসদগর্দ' তাহাদিগের পরাক্রম-অসহিষ্ণু হইয়া তুর্কস্থানে পলায়ন করেন। আমি সেই রাজার বংশজাত। তাঁহার সন্তানেরা

তদ্দেশের আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিয়া তুর্কীয় জাতি হইয়া গেলেন। আমিও সেইরূপে তুর্কী হইয়াছি।—আমার পিতা নির্ধন ছিলেন, সুতরাং বালককালাবধি আমাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম এবং ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে আমার বপু সবল এবং মন উৎসাহশীল ও পরিশ্রমানুরক্ত হইল। অতএব আমি দরিদ্রাবস্থাকে ক্ষেমঙ্কর বলিয়া মানি।—পিতা নির্ধন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানযোগ ছিল। তিনি প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ অনেক জানিতেন, কিন্তু তত্তাবৎ পাঠ করাইবার অনবকাশ বশতঃ সমুদায় বিদ্যার সার পদার্থ যে ধর্ম্মতত্ত্ব তাহাই অহরহ শিক্ষা করাইতেন। অতএব তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ আমি বালককালাবধি ইন্দ্রিয়দমন করিতে এবং জগৎপিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে অভ্যাস করিয়াছিলাম। শৈশবাবধি আমার অন্তঃকরণে এই ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, আমার দ্বারা পরিবারের ক্লেশমোচন হইবে। সেই আশা অবলম্বন করিয়া ঊনবিংশতি বর্ষ বয়ঃকালে পিত্রালয় পরিত্যাগ করি। ইচ্ছা ছিল, কোন রাজসংসারে যোদ্ধকর্ম্ম স্বীকার করিব। পথিমধ্যে দস্যুকর্তৃক পরাভূত এবং দাস্যে নিযুক্ত হওয়াতে সেই বর্দ্ধমান আশালতা একেবারে ছিন্নমূলা হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অবধি তাহা পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত, সম্বর্দ্ধিত এবং ফলিত হইয়াছে।

আলেপ্তাগীন্ এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার দাসত্ব মোচন করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত-পদ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিত্বে এবং সর্ব্ব-সৈন্যাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিলেন। দাস তাদৃশ উচ্চপদারূঢ় হইয়া ব্যবহারের কিছুমাত্র অন্যথা করিলেন না। তাঁহার শান্তস্বভাব ও বিচক্ষণতায় সেনাপুঞ্জ বিলক্ষণ ভক্তিমান ও সুশিক্ষাসম্পন্ন হইল। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবে রাজার সকল শত্রু ক্ষীণবল হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল, এবং রাজ্যও নিরুপদ্রবে পালিত হওয়াতে প্রজাবৃন্দের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বেই এই অমাত্যের পিতা লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, অতএব আত্মজের ঈদৃশ বিভব দেখিতে পান নাই। কিন্তু জননী তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন, অতএব তিনি পুত্র সন্নিধানে আনীত হইয়া তাঁহার তাদৃশ গৌরব দর্শনে ও গুণকীর্ত্তন শ্রবণে চক্ষুকর্ণের চরিতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। কি চমৎকার! যে ব্যক্তি সহায়সম্পত্তিবিহীন হইয়া বনে বনে

ভ্রমণ করত সিংহভল্লুকের সহবাসী হইয়াছিল, যে নানা সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জীবন্মৃত্যুস্বরূপ দাসত্বদশাগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই এক্ষণে পৃথ্বীপতির সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইতে লাগিল, এবং সহস্র সহস্র নরগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া তাহাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে লাগিল। পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা! তিনি অতি উচ্চকে নীচ করিয়া এবং অতি অধমকেও প্রধান পদারূঢ় করিয়া মানবকুলকে সর্ব্বদাই সাংসারিক বিভবের অস্থায়িত্ব এবং ধর্ম্মপদার্থের অবিনশ্বরত্বের প্রমাণ দর্শাইতেছেন। ফলতঃ প্রধান মন্ত্রী এক্ষণে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং বাল্যাবস্থায় নানাপ্রকার দুঃখ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার চরম সুখ অধিকতর প্রীতিজনক বোধ হইতে লাগিল।

আলেপ্তাগীন্ রাজার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার যাদৃশ লাবণ্যমাধুরী তাহার গুণও তাদৃশ ছিল। অতএব দেশীয় এবং বৈদেশিক আঢ্য কুলীন সন্তানগণ তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষে আসিয়া নিরন্তর উপাসনা করিত। কিন্তু রাজকন্যা উপাসনার বশ ছিলেন না। তিনি ক্রমে ক্রমে সকল বিবাহার্থীকেই বিদায় করিয়া অনূঢ়াবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজার অন্য অপত্য ছিল না। কেবল সেই একমাত্র কন্যা। সুতরাং কন্যা বিবাহে সম্মতা হইয়া উপযুক্ত বরপাত্র গ্রহণ করেন, এমত একান্ত বাসনা থাকিলেও কন্যার অনভিমতে তাহার বিবাহ সম্পন্ন করণে ইচ্ছা করিতেন না।

প্রধানমন্ত্রীকে সর্ব্বদাই রাজবাটীর অভ্যন্তরে গমন করিতে হইত। সেই সকল সময়ে রাজকন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের উভয়েরই মানসে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং দিন দিন উভয়েই উভয়ের গুণ পরিচিত হইয়া পরস্পর অধিকতর নৈকট্য বাসনা করিতে লাগিলেন। আন্তরিক ভাবমাত্রই নয়ন দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশমান হয়। বিশেষতঃ প্রকৃত অনুরাগের অঙ্কুরোদয় হইলে প্রণয়িযুগলের প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্র এমত রমণীয়, সস্নেহ, সতৃষ্ণ দৃষ্টি ধারণ করে যে, দেখিবামাত্রই পরস্পরের মন বিকশিত হইয়া উঠে, এবং কথা না কহিলেও তাদৃশ নয়ন-দ্বারাই মনোগত সমুদায় ভাব ব্যক্ত হইয়া যায়। একদিন প্রধান মন্ত্রী রাজনন্দিনীর সহিত কথোপকথন কালে তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া আপন মানস ব্যক্ত করণের সাহস প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কি বলিলেন, এবং

গুণবতী জেহীরা কি উত্তর করিলেন তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। যথার্থ প্রণয়ের আবির্ভাবে শুদ্ধাত্মা মানবের চিত্ত যে কত প্রকার রমণীয় গুণধারণ করে তাহা কে বলিতে পারে? তখন শরীরের জড়তা অপগত হয়, অন্তঃকরণের অসাধুতা দূরীভূত হয়, জিহ্বাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করেন, এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হওয়াতে অন্তরিন্দ্রিয়গণ পরোক্ষ দৃষ্টির প্রথম সোপান অবলম্বন করে। আহা! জগদীশ্বর যে প্রীতি-পদার্থকে পরমসুখের প্রধান বর্ত্ম করিয়া দিয়াছেন, অজিতেন্দ্রিয় মানবগণ নিরঙ্কুশ রিপুগণ কর্তৃক সেই বর্ত্ম দ্বারাই কি বিষম বিপাকে পতিত হইতেছে। প্রধানমন্ত্রী আপন মনোগতভাব প্রকাশ করিলে পর সরলহৃদয়া রাজপুত্রীও সমুদায় ব্যক্ত করিলেন। পরে কিঞ্চিৎকালান্তরে কহিলেন, "আমি তোমার সহিত মিলিত-জীবন হইয়া যাবজ্জীবন তোমার সুখ-দুঃখ-ভাগিনী হইতে অসম্মতা নহি, কিন্তু অগ্রে পিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই প্রধান গুরু, কিন্তু যে কামিনী অনূঢ়াবস্থায় পিতার অসম্মান করে, সে যে গৃহিণী হইয়া স্বামীর বশীভূতা হইবে এমত সম্ভাবনা অতি বিরল।" প্রধানমন্ত্রী বলিলেন, "আমি এইক্ষণে রাজ-সন্নিধানে চলিলাম, তাঁহাকে আমাদিগের মানস ব্যক্ত করিয়া বলিব। তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন বটে, তথাপি আভিজাত্যাভিমান মানবগণের অন্তঃকরণে অতি প্রবল বলিয়া শঙ্কা হয়।"

সেই দিনই রাজা এবং রাজমন্ত্রী উভয়ের ঐ বিষয়ে কথোপকথন হইল। মন্ত্রী স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে ভূপাল কিছুমাত্র বিরূপ না হইয়া উত্তর করিলেন, "দেখ, জেহীরা আমার একমাত্র সন্তান—এই জীবন-বৃক্ষের একমাত্র পুষ্প, যাহার দ্বারা আমার সংসারকানন আমোদিত এবং অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া আছে। অতএব আমার একান্ত বাসনা যে, তাঁহাকে এমন পাত্রসাৎ করি, যাহাতে চিরকাল সুখভাগিনী হইয়া থাকে। অনেক রাজপুত্র এবং কুলীনসন্তান বিবাহার্থী হইয়া তাহার উপাসনা করিয়াছেন, সে কাহাকেও বরমাল্য প্রদানে সম্মতা হয় নাই—আমিও এই বিষয়ে তাহার অনভিমত করিতে চাহি না। অতএব তুমি অগ্রে তাহার মত কর তাহা হইলেই আমার সম্মতি পাইবে।" মন্ত্রিবর উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি আপনকার কন্যার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছি এবং তিনিও

আমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে সম্মতা আছেন ; কেবল আপনকার অনুমতির অপেক্ষা ; এক্ষণে আপনকার অনুকূলতার প্রতি আমার যাবজ্জীবনের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে।” রাজা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন, “যদি তুমি জেহীরার সম্মতিলাভ করিয়া থাক, তবে আর আমার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, আমি এই দণ্ডেই অনুমতি দিতেছি, যে পরম পুরুষ মনুজগণের মধ্যে উদ্বাহসংস্কার সংস্থাপন করিয়াছেন তিনি এই কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলাবহ করুন,—যাহা হউক, এই আমার পরম পরিতোষ যে, জেহীরা অনুপযুক্ত পাত্রে প্রীতি সমর্পণ করে নাই।

অনন্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই ভূপাল মহা সমারোহ পুরঃসর স্বীয় প্রিয়পাত্রের সহিত আত্মজার উদ্বাহসংস্কার সম্পন্ন করিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল জনের সহিত কন্যার পরিণয়-সম্বন্ধ করাতে দেশীয় কুলীনবর্গ মৎসর-ভাবাপন্ন হইলেন, কিন্তু মন্ত্রীর গুণগ্রামে বশীভূত প্রজাসাধারণ অত্যন্ত প্রফুল্লমনে আনন্দ-মহোৎসব করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিবস পরে আলেপ্তাগীন্ গজনন্ নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া পঞ্চদশ বর্ষকাল পরম সুখে রাজ্যভোগ করিলেন। তাঁহার পরলোক হইলে পুত্রপৌত্রাদি কেহ না থাকাতে ঐ জামাতাই রাজ্যাধিকারী হইয়া নিজ স্বপ্ন সফল বোধ করত সবক্তাগীন নামে বিখ্যাত হইলেন। ইঁহারই পুত্র গজ্নবী মহম্মুদ, যৎকর্ত্তৃক এই ভারতভূমি সর্ব্ব প্রথমে আক্রান্ত এবং মুসলমানাধিকার-সম্ভূত হয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস : ১৮৫৮

দামিনী

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বহুদিন হইল, একদিন সন্ধ্যার সময় সপ্তবৎসরবয়স্কা একটি বালিকা ভাগীরথী-তীরে দাঁড়াইয়া, অনিমেষ-লোচনে স্রোতস্তাড়িত দীপমালা দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী এক বৃদ্ধাকে বলিল, "আয়ি, আমার দীপ ভাসিয়া গেল।" আয়ী উত্তর করিলেন, "তা যাক, এখন তুমি ঘরে চল, অন্ধকার হইল।" "আর একটু দেখি" বলিয়া বালিকা দাঁড়াইয়া রহিল।

বালিকাটির নাম দামিনী। বৃদ্ধ মাতামহী ব্যতীত দামিনীর আর কেহই ছিল না; সেই মাতামহীর সঙ্গে আসিয়া দামিনী এই প্রথমে দীপ ভাসাইল; দীপ ভাসিয়া গেল। অন্য বালিকার ন্যায় দামিনী হাসিল না, অন্য বালিকার ন্যায় "ঐ আমার দীপ যাইতেছে" বলিয়া আহ্লাদে সঙ্গিনীকে দেখাইল না; কেবল গম্ভীরভাবে একদৃষ্টিতে সেই দীপের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সেই অকূল নদীতে দামিনীর দীপ একা ভাসিয়া চলিল। দামিনীর দীপ দামিনী আপনি ভাসাইয়াছে এক্ষণে আর উপায় নাই; অতএব কাতর অন্তরে দামিনী বলিতে লাগিল, "হে ঠাকুর! আমার দীপকে রক্ষা কর।"

অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল দেখিয়া, মাতামহী দামিনীকে গৃহে লইয়া চলিলেন। দামিনী গম্ভীরভাবে কেবল দীপের গতি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেল। প্রাঙ্গণপার্শ্বে একটি কলসে জল ছিল; দামিনী সেই জলে আপন ক্ষুদ্র পদদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিল। শয়নমাত্রেই নিদ্রা আসিল। নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—যেন মেঘ অন্ধকারে ভারী হইয়া নদীর উপর নামিয়া পড়িয়াছে। ঐ মেঘ দেখিয়া দামিনীর দীপ যেন ভয়ে অল্প অল্প জ্বলিতে জ্বলিতে পলাইতেছিল; এমত সময়ে পতনোন্মুখ ভয়ানক ভয়ানক তরঙ্গ আসিয়া তাহার চারি দিকে ঘেরিল। ঐ তরঙ্গের মধ্যে একটির চূড়ার উপর গম্ভীরভাবে একটি বিড়াল বসিয়া আছে। দামিনী চিনিল যে, সেইটি তাহাদের পাড়ার দুরন্ত বিড়াল; সেটি তাহাকে দেখিলেই নখাঘাত করিতে আসিত। দামিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কেবল চক্ষু মুদিয়া চীৎকার

করিত, কখনও পলাইতে পারিত না। এক্ষণে তরঙ্গচূড়ায় সেই বিড়ালকে দেখিয়া দামিনী ভয়ে মাতামহীর অঞ্চল ধরিয়া চক্ষু মুদিল। বৃদ্ধা যেন ক্রুদ্ধা হইয়া আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া দামিনীর ক্ষুদ্র দেহ সেই অগাধ জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। দামিনী চীৎকার করিয়া উঠিল। মাতামহী "ভয় কি" বলিয়া নিদ্রিতা দামিনীকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। দামিনী নিদ্রাভঙ্গে "আমার মা কোথায়" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনীর মা ছিল না। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার মাতা নিরুদ্দেশ হইয়াছিল।

পরদিবস প্রাতে দ্বাদশবর্ষীয় একটি বালক পাঠশালায় যাইতেছিল; দামিনীর গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া পক্ষীশাবকের নিমিত্ত পতঙ্গ সংগ্রহ হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। দামিনী একা বসিয়াছিল, বালকের প্রশ্নে কেবল মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল। বালক অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর হইয়াছে কি?" দামিনী আবার মাথা নাড়িল। বালক বলিল, "আয়ীর উপর রাগ করিয়াছ?" দামিনী কোন উত্তর দিল না। বালক বস্ত্রাগ্র হইতে কতকগুলি পতঙ্গ দামিনীর নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল।

বালকটির নাম রমেশ। দামিনীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না; প্রতিবাসী বলিয়া দামিনী তাহাকে রমেশদাদা বলিয়া ডাকিত। দামিনী রমেশের বড় অনুগত ছিল। যে বিড়ালটিকে দামিনী বড় ভয় করিত, রমেশ তাহাকে দেখিলেই মারিত। স্নানের সময় রমেশ স্রোতে সন্তরণ করিয়া দামিনীর নিমিত্ত পুষ্প ধরিয়া আনিত; দামিনী তাহা লইয়া হাসিতে হাসিতে কেশে পরিত; পরা হইলে মাথা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "রমেশদাদা, দেখ, হয়েছে?" রমেশ প্রায় ভাল বলিত, আবার মধ্যে মধ্যে মনোনীত না হইলে আপনি পরাইয়া দিত। রমেশ জানিত যে, গ্রামের সকল বালিকার অপেক্ষা দামিনী শান্ত আর দুঃখিনী। আর দামিনী ভাবিত যে, গ্রামের সকল বালক অপেক্ষা রমেশদাদা তাহার "আপনার জন।" আর কেহ ত তাহার জন্য ফুল কুড়ায় না, পতঙ্গ ধরে না, বিড়াল মারে না। এই জন্য রমেশদাদাকে দেখিলেই দামিনী দৌড়িয়া নিকটে যাইয়া দাঁড়াইত; হাসিমুখে সকল কথার উত্তর দিত। কিন্তু এই দিন রমেশকে দেখিয়া আর পূর্ব্বানুরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। দামিনী শৈশবগম্ভীর হইয়াছে।

দামিনী শৈশবে এত গম্ভীরপ্রকৃতি কেন? যে সুখী, সেই চঞ্চল, যে

দুঃখী, সেই শান্ত, সেই ধীর, সেই গম্ভীর। এক দারুণ দুঃখে দামিনী এই শৈশবে কাতর। দামিনীর মা কোথা? তাহার মা কি মরিয়াছেন? তা হইলে লোকে বলে না কেন? পাড়ায় সকল ছেলে, মার কোলে শোয়, মার হাতে খায়, মার কথা শোনে, মার মুখপানে চায়, মার সঙ্গে গল্প করে, মার সঙ্গে কোন্দল করে, মার কাছে দৌরাত্ম্য করে, দামিনীরই কপালে এই সকল হলো না কেন? আয়ী আছে—আয়ী বেশ—মার মত ভালবাসে—তবু মা! মার আদর কেমন! তিন বৎসর বয়সে দামিনী মা হারাইয়াছিল, দামিনীর মাকে একটু একটু মনে পড়িত।—একটু একটু—কেবল ছায়াটী—কেবল একখানি শরীর আর একখানি মুখ—তাতে আহ্লাদ আর হাসি—যেমন, যে বাল্যকালে দুর্গোৎসব দেখিয়াছে—আর কখন দেখে নাই—তাহার যেমন প্রৌঢ়াবস্থায় সেই দুর্গাপ্রতিমা মনে পড়ে, দামিনীর তেমনি মাকে মনে পড়িত। দামিনী কত সময়ে মনে মনে মাকে গড়িত—বসনে, অলঙ্কারে, মনে মনে সাজাইত,—তাহার উপর হাসিতে, আদরে প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া সাজাইত—সাজাইয়া মনে মনে মা! মা! মা! বলিয়া ডাকিত!

আজি মার কথা ভাবিতে ভাবিতে, মার কথা, দীপের কথা, স্বপ্নের কথা, রমেশের কথা, সব কেমন মিশাইয়া মনের ভিতর গোলমাল হইল। দামিনী ভাবিল, মরি ত বেশ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দশ বৎসর পরে আর একদিবস অপরাহ্নে একটী ক্ষুদ্র শয়নগৃহে দামিনী একা শয্যারচনা করিতেছিলেন। পশ্চিমদিকের ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া সূর্য্যকিরণ শয্যায় পড়িয়া দামিনীর মুখকমলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। তাঁহার নাসাগ্রে এবং কপোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষুদ্র মুক্তারাজীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। দামিনী একখানি সিক্ত গাত্রমার্জ্জনী লইয়া গাত্রমার্জ্জনা আরম্ভ করিলেন।

দামিনী আর ক্ষুদ্র বালিকা নাই; এক্ষণে সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এক্ষণে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। শরীরের গুরুত্বানুরূপ আবার অঙ্গচালনার গাম্ভীর্য্য জন্মিয়াছে। দামিনী স্বভাবতঃ গৌরাঙ্গী, এক্ষণে সেই বর্ণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হইয়াছে।

গাত্রমার্জ্জনা সমাধা করিয়া দামিনী একখানি দর্পণ তুলিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রাঙ্গণ হইতে একটী স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দামিনী অমনি চঞ্চল হইয়া দর্পণ ফেলিয়া দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। বালিকাবয়সে যাঁহারে দামিনী রমেশদাদা বলিতেন, তিনি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আপনার বিমাতার সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার প্রতি সস্নেহলোচনে দামিনী চাহিয়া রহিলেন।

রমেশ দামিনীর স্বামী ; দামিনীর সর্ব্বস্ব।

কথা সমাধা হইলে রমেশ আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শয্যায় দুই একটী পুষ্প পড়িয়া আছে দেখিয়া, দামিনীকে বলিলেন, "কোন্ চোরে আমার নামাবলী থেকে ফুল চুরি করেছে রে ?"

দামিনী বলিল, "খুব করেছে, উনি ফুল এনে নামাবলীতে বেঁধে রাখতে পারেন, আর লোকে চুরি করতে পারে না ? খুব করেছে—চুরি করেছে।"

রমেশ বলিলেন, "খুব করেছে বই কি ? চোরকে একবার ধরিতে পারিলে বুঝিতে পারি।"

চোর আসিয়া ধরা দিল।

রমেশ দুই হস্তে দামিনীর দুই গাল ধরিলেন ; দুই করে দামিনীর দুই কর্ণ আবরণ করিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দামিনী রমেশের দুই বাহু ধরিয়া ঊর্দ্ধমুখে রমেশকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব।" দামিনীর চক্ষু অমনি জলে পূরিয়া আসিল। দামিনী কাঁদিয়া উঠিলেন।

রমেশ দামিনীকে ছাড়িয়া দিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "তুমি কি নিত্য কাঁদিবে ?" দামিনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "তুমি নিত্য আদর কর কেন ?"

এই সময় দ্বারের পার্শ্বে ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ হইয়া উঠিল। যেন আর এক জন কেহ কাঁদিল। দামিনী ও রমেশ উভয়ে ব্যস্ত হইয়া সেই দিকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, একজন অপরিচিতা অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেছে। দামিনী তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন ; বহির্দ্বার পর্য্যন্ত দামিনী গেলে স্ত্রীলোকটী ফিরিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হইল। দেখিয়া, দামিনীর যেন কি মনে

পড়িল—কিন্তু কি মনে পড়িল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। উন্মাদিনী হঠাৎ দামিনীর গলা ধরিয়া তাহার বক্ষে মাথা দিয়া মা! মা! বলিয়া কাঁদিতে লাগিল—কত কি বলিল—কত আশীর্ব্বাদ করিল—দামিনী কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না,—কিন্তু তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন।—কান্না দেখিলে কান্না পায় বলিয়া, কি কেন—তাহা জানি না।

দামিনী ধীরে ধীরে উন্মাদিনীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে বিমুক্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা তুমি কে গা?"

উন্মাদিনী কিছু বলিল না, "মা মা!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দামিনী বলিলেন, "কাঁদিতেছ কেন?"

উন্মাদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা আছে?"

দামিনী কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিলেন, "বিধাতা জানেন", বলিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

পাগলী বলিল, "দেখ, তোমার মার নামেই তুমি কাঁদিতেছ—আমি আজ আমার মা পাইয়াছি—আমি কাঁদিব না?"

একটী কথা সহসা বিদ্যুতের মত দামিনীর মনের ভিতর চমকিল—"এই আমার মা নয় ত?"

হাঁ, সেই ত মা। দামিনীর মা যে স্বামীর শোকে পাগল হইয়া পলাইয়াছিল। কোথায় গিয়াছিল, কোথায় ছিল, তাহা কে জানে? দিনকত ভৈরবী হইয়া ত্রিশূল ধরিয়া বেড়াইয়াছিল। আবার বহুকাল পরে সংসার মনে পড়িল—দামিনীকে দেখিতে আসিল—লুকাইয়া দামিনীকে দেখিতেছিল। দামিনীর মনে হঠাৎ উদয় হইল—"এই আমার মা নয় ত?"

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রমেশের বিমাতা ডাকিলেন। দামিনী চমকিয়া ফিরিলেন। যেখানে পাগলী দাঁড়াইয়াছিল, সে দিকে আবার দেখিলেন; পাগলী চলিয়া গিয়াছে। একবার ভাবিলেন, তাহার অনুসরণ করি; দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন। আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্ত্রীলোকটী কে?" দামিনী অন্যমনে মৃদুভাবে ভাবিতে ভাবিতে উত্তর করিলেন, "পাগল।"

রমেশ আর কোন কথা না বলিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। দামিনী শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিলেন; দুই একবার

অস্ফুটস্বরে মা বলিয়া ডাকিলেন। শৈশবে মা হারাইয়াছেন, সেই অবধি মা বলিয়া ডাকেন নাই। এক্ষণে পাগলের কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে বড় সাধ হইল। দামিনী বালিশে মুখ লুকাইয়া কত কাঁদিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে গ্রামে রমেশ বাস করিতেন, তাহার দক্ষিণপ্রান্তে ভাগীরথীতীরে একটী ভগ্ন অট্টালিকা ছিল। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বকালে এক রাজা আপন মাতার গঙ্গাবাসের নিমিত্ত ঐ অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন দৈব ঘটনায় ঐ অট্টালিকায় একটী স্ত্রী-হত্যা হওয়ায় রাজার মাতা উহা পরিত্যাগ করেন। সেই পর্য্যন্ত কেহ তথায় বাস করে নাই। অট্টালিকার ক্রমে ভৌতিক অপবাদ জন্মিল। শেষে দিবাভাগেও কেহ এ অট্টালিকার নিকট গিয়া গতিবিধি করিতে সাহস করিত না।

পাগলী দেখিল যে, এই ভয়ানক ভগ্ন অট্টালিকা তাহার বাসোপযোগী। অতএব গোপনে তথায় বাস করিতে লাগিল। দামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাগলের অনেক মতিস্থির হইয়াছিল; তথাপি মধ্যে মধ্যে দামিনীকে চুরি করিয়া এই গোপনীয় স্থানে আনিয়া একা দেখিবে, এই মনে মনে স্থির করিত। আবার পরক্ষণেই ইহার অকর্ত্তব্যতা বুঝিতে পারিত। পাছে চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত আত্মপরিচয় দিয়া জামাতার কলঙ্ক রটায়, এই ভয়ে আর দামিনীর বাটীতে যাইত না। একা ভগ্ন অট্টালিকায় বসিয়া আপনা আপনি উদ্দেশে দামিনীকে আদর করিত, দামিনীকে কিরূপে রমেশ আদর করিতেছিল, আবার তাহাই ভাবিত।

একদিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় পাগলী স্নিগ্ধ গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া ভগ্ন অট্টালিকার ছাদের উপর বসিয়া অন্ধকারে কেশ শুকাইতেছিল। কেশরাশি নানাদিকে নানাভঙ্গীতে তুলিতেছিল, ফেলিতেছিল। এমন সময় পূর্ব্বদিকের অশ্বত্থবৃক্ষমূলে হঠাৎ এক অশ্বের চীৎকার শুনিতে পাইল। দক্ষিণকরে কেশগুচ্ছ ধরিয়া অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বৃক্ষমূল প্রতি চাহিয়া রহিল। দেখিল, ক্রমে দুই একটী মশাল জ্বালিত হইল, এবং তদালোকে কতকগুলি অস্ত্রধারী সৈনিক আর এক অশ্বারোহী পুরুষ দৃষ্ট হইল। পাগলী প্রথমে ভাবিল, ইহারা ডাকাইত; পাছে ইহারা আমার দামিনীর ঘরে ডাকাতী করে, এই

আশঙ্কায় দ্রুতবেগে ছাদের উপর হইতে অবতরণ করিয়া ডাকাতদিগের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিল। ফিরিয়া ঝটিতি গৃহে আসিয়া ভৈরবীবেশ ধারণ করিয়া, করাল ত্রিশূল হস্তে লইয়া সদর্পে চলিল। কথঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া একখানি পাল্কী দেখিয়া ভাবিল, ইহারা ডাকাত নহে, ডাকাতের সঙ্গে পাল্কী থাকে না। ইহারা বরযাত্রী হইবে। পাগলী তাহাদের সঙ্গে চলিল। দামিনীর বিবাহ সে দেখিতে পায় নাই, অতএব বিবাহ দেখিব মনে করিয়া পরম আহ্লাদ-পূর্ব্বক পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্ধকারে তাহাকে কেহই প্রথমে দেখিতে পায় নাই, শেষ কতদূর গেলে একজন শিবিকাবাহক তাহাকে দেখিয়া রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে, তুই এমত সময় আমাদের সঙ্গে যাইতেছিস্ ?" পাগ্‌লী উত্তর করিল, "আমি তোমাদের সঙ্গে বিবাহ দেখিতে যাইতেছি, তোমাদের সঙ্গে বাদ্যকর নাই কেন ?"

বাহক উত্তর করিল, "এ বড় ভয়ানক বিবাহ, এ বিবাহে বাদ্য থাকে না।" পাগলী এ কথায় মনোনিবেশ না করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার বাড়ীর বর, কাহার বাড়ীর কনে ?" বাহক কহিল, "হিন্দুর কনে, মুসলমানের বর।" পাগলী উত্তর করিল, "মিছে কথা।" বাহক দেখিল যে, স্ত্রীলোকটী পাগল, অতএব তাহার সঙ্গে রঙ্গ করিতে লাগিল। "কে বর ?" এই কথা উন্মাদিনী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় বাহক অশ্বারোহীকে দেখাইয়া দিল। উন্মাদিনী দেখিল, অসম্ভব নহে, বয়স অল্প, জরির কাপড় পরিধান। আর কোন শব্দ না করিয়া সঙ্গে চলিল।

সঙ্গীদিগের পরিচয় দিতে বাহকের প্রতি বিশেষ নিষেধ ছিল, কিন্তু সে নিষেধ তাহার পক্ষে ক্রমে ভার হইয়া উঠিতেছিল। পাগলীকে পাইয়া বাহক মনে করিয়াছিল যে, সে ভার নামাইবে; কিন্তু পাগলী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করায় তাহার আশা পরিতৃপ্ত করিবার ব্যাঘাত জন্মিল। শেষ বাহক পাগলীকে বলিল, "তুমি স্ত্রীলোক, আমাদের সঙ্গে যাওয়া ভাল নহে, এখনই কাটাকাটি হইবে, অতএব তুমি পালাও।" পাগলী বলিল, "বিবাহ শুভ কর্ম্ম, ইহাতে কাটাকাটি হইবে কেন ?" বাহক উত্তর করিল, "এ ব্যাপার বিবাহের নহে। যিনি তাজ পরিয়া তরবারি লইয়া ঘোড়ার উপর যাইতেছেন উনি আমাদের ফৌজদারের পুত্র। এই গ্রামে একটি অদ্ভুত সুন্দরী আছে শুনিয়া তাহাকে কাড়িয়া লইতে যাইতেছেন; তাই বলিতেছিলাম, কাটাকাটি হইবে।"

পাগলী শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার কন্যা লইয়া যাইবে?" বাহক বলিল, "আমি সবিশেষ জানি না, শুনিয়াছি কোন ভট্টাচার্য্যের পুত্রবধূ; যুবতীর স্বামী নাকি অদ্য কয়েক দিন হইল শিষ্যালয়ে গিয়াছে। সুন্দরীর নাম বুঝি দামিনী।"

এই কথা শুনিবামাত্র পাগলী ফণিনীর ন্যায় বাহকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথরোধ করিল; দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল তুলিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া বাহক ভয়ে বলিল, "আমি দরিদ্র বাহক, পেটের জ্বালায় সকল করি; আমাকে মারিলে কি হইবে? আমি হিন্দু, অতএব হিন্দুর অত্যাচার আমার ইচ্ছা নয়। এক্ষণে গোলযোগ করিলে এই যবনেরা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে, অতএব আমার পরামর্শ শুন। তুমি অন্য পথ দিয়া দ্রুত যাইয়া গ্রামবাসিদিগকে জাগ্রত কর; সকলে একত্র প্রতিবন্ধক হইলে সফল হইতে পারিবে, নতুবা আর উপায় নাই।"

পাগলী শুনিবামাত্র ছুটিল; গ্রামের মধ্যে যাইয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "হিন্দুর হিন্দুত্ব যায়, সকলে উঠ; সতীর সতীত্ব যায়, একবার সকলে উঠ। ফৌজদারের পুত্র আসিয়া তাহার পুত্রবধূকে হরণ করে, একবার সকলে উঠ।"

কেহই উঠিল না। কেহ বলিল, "যাউক শত্রু পরে পরে।" কেহ বলিল, "পরের নিমিত্ত মাথা দিবার আমার কি প্রয়োজন পড়িয়াছে?" কেহ বলিল, "অদিতির সর্ব্বনাশ হয় যদি, তাহাতে আমার কি ক্ষতি?"

ক্ষতি আছে। আমরা ভিন্ন তাহা অপরদেশীয় সকলে বুঝে। বিপদ অদ্য আমার, কল্য তোমার; অত্যাচার এক ঘরে প্রবেশ করিতে পাইলে সকল ঘরে পথ পায়। অগ্নি এক ঘরে লাগিলে সকল ঘর আক্রমণ করে। পরের ঘরের অগ্নি যে নিবায়, কেবল সেই আপনার ঘর রক্ষা করে। এ বোধ বাঙ্গলা হইতে অনেক কাল অন্তর্হিত হইয়াছে; অতএব পাগলীর চীৎকারে কেহই উঠিল না।

দুর্ব্বৃত্ত যবনের অত্যাচার কেহ নিবারণ করিল না; রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ একা, তাহে বৃদ্ধ; দামিনীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। যবনেরা দ্বার ভাঙ্গিয়া মূর্চ্ছিতা দামিনীকে লইয়া গেল।

পাগলী দেখিল, কেহই উঠিল না, কেহই সহায়তা করিল না। রমেশের

গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিল, সকল ফুরাইয়াছে; দামিনীকে লইয়া গিয়াছে। তখন পাগলীর কপোলমধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পাগলী পূর্ব্বতন উন্মত্তা হইয়া সিংহীর ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইল। শেষ ত্রিশূল তুলিয়া ছুটিল।

যবনেরা এক প্রান্তরের মধ্য দিয়া দামিনীকে লইয়া যাইতেছিল। পাল্কীর চারিদিকে অস্ত্রধারী পদাতিক। সর্ব্ব পশ্চাতে ফৌজদারপুত্র অশ্বারোহণে যাইতেছিল। পাগলী বায়ুবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া ত্রিশূল নিক্ষেপ করিল। ত্রিশূল ফৌজদারপুত্রের পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে ঈষৎ দেখা দিল। ফৌজদারপুত্রের শরীর প্রথমে দুলিল, শেষে অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। পাগলী বিকট হাসি হাসিল; অশ্ব চমকিয়া উঠিল; পদাতিকেরা ফিরিয়া দেখিল।

পাগলী আবার বিকট হাসি হাসিতে হাসিতে ছুটিল। দামিনীকে আর তাহার স্মরণ হইল না। সেই অবধি পাগলীকেও আর কেহ দেখিতে পাইল না। পদাতিকেরা দেখিল যে, ফৌজদারপুত্র সাজ্যাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে তুলিল। পাল্কী হইতে দামিনীকে ফেলিয়া দিয়া গেল। দামিনী একা প্রান্তরে পড়িয়া রহিলেন। নবপল্লবিত পুষ্পিত লতাবৃক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া পথে ফেলিয়া গেলে যেমন বাতাসে তাহা উলটি পালটি করিতে থাকে, প্রান্তরে পড়িয়া দামিনীর সেইরূপ দশা ঘটিল। বাতাসে তাঁহার অঞ্চল উলটি পালটি করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইল। রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ নামাবলী স্কন্ধে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। প্রাতঃসন্ধ্যা হয় নাই; দামিনী নাই, সন্ধ্যার আয়োজন আর কে করিয়া দিবে? বিশারদ অতি বিমর্ষভাবে একা বসিয়া রহিলেন; ক্রমে প্রতিবাসিগণ, গ্রামবাসিগণ, আত্মীয়-কুটুম্বগণ আত্মীয়তা করিতে আসিতে লাগিলেন। কেহ আসিয়া বলিলেন, "কি বিপদ, কি বিপদ!" কেহ বলিলেন, "কখন্ কাহার কি ঘটে, কে বলিতে পারে?" কেহ বলিলেন, "অদৃষ্টই মূল।" অদিতি বিশারদ ইহার কোন কথাতেই উত্তর করিলেন না দেখিয়া গণেশচন্দ্র নামে জনৈক মধ্যবয়স্ক স্থূলশরীর প্রতিবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ব্বে ইহার কোন স্থচনা ছিল না? অর্থাৎ পূর্ব্বে কি মহাশয় কিছুই জানিতে পারেন

নাই ?" অদিতি বিশারদ ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিব, তবে এমন ঘটিবেই বা কেন ? রমেশকেই বা বিদেশে যেতে দিব কেন ? এই রাত্রে রমেশ থাকিলে শৃগালের সাধ্য কি যে সিংহের গৃহে প্রবেশ করে ?"

গণেশচন্দ্র বলিলেন, "রমেশের প্রয়োজন কি ? আমরাই যে আপনার পুত্রবধূকে রক্ষা করিতে পারিতাম। তবে কি জানেন, সকল সময় সাহস হয় না ; যবনেরা প্রায় বিশজন, আমরা একা ; বিশেষতঃ তখন যদি সদরবাড়ীতে থাকিতাম, তবে যা হয় একখানা করিয়া বসিতাম। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য বশতঃ অথবা রমেশের দুরদৃষ্ট বশতঃ আমি তখন অন্দরে শয়ন করিয়াছিলাম। শয়ন করিলে সহজে উঠা যায় না ; তথাপি ব্রাহ্মণীর কথায় উঠিলাম, ভাল করে কাপড় পরিলাম, সেই অন্ধকারে অনুসন্ধান করিয়া নস্য শম্বুক বাহির করিলাম ; এক টীপ বিলক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলাম ; এ সকল কার্য্যে নস্য আবশ্যক। তাহার পর দেখি, আমি ঘর্ম্মাক্তকলেবর। এ সকল কার্য্যে ঘর্ম্ম ভাল নহে ; কি জানি, পাছে যবনেরা পিছলে পলায়, এই মনে করিয়া গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা বিলক্ষণ করিয়া ঘর্ম্ম পরিষ্কার করিলাম ; সকল বিষয় এককালে স্মরণ হয় না ; গাত্রমার্জ্জনী রাখিলে অস্ত্রের কথা মনে পড়িল। আমি বলিলাম, 'পুতির তক্তা আন।' ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'তাহার কর্ম্ম নহে।' শেষে একটি শিশু, আমার সপ্তম সন্তান, একটী ইট আনিয়া দিল। আমি সেই ইট হাতে করিয়া ছাদে আসিয়া দেখি, দুর্বৃত্তেরা তখন ফিরিয়া যাইতেছে ; আমি অমনি সেই ইট ছুঁড়িলাম।"

প্রতিবাসী এইরূপ আত্মবীরত্বের পরিচয় দিতেছেন, এমত সময় একজন কৃষক আসিয়া বলিল যে, ফৌজদারপুত্র পথে মারা পড়িয়াছে। কে তাহারে মারিয়াছে, তাহার স্থির নাই।

গণেশচন্দ্র আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "তবে সে আমারই ইটে মরিয়াছে ; নিশ্চয় বলিতেছি, আমিই যবন মারিয়াছি। আমার অব্যর্থ সন্ধান।"

আর একজন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ওরূপ কথা মুখে আনা ভাল নহে। যিনি মরিয়াছেন, তিনি ফৌজদারের একমাত্র পুত্র ; সে পুত্রকে যে মারিয়াছে, তাহার অদৃষ্টে নিশ্চয় শূল আছে।"

গণেশ অমনি ভয়ে জড়বৎ হইলেন। কম্পান্বিত-স্বরে বলিতে লাগিলেন,

"আমি উপহাস করিতেছিলাম; আমি তা বলি নাই; আমি কি বলিতেছি, কিছুই নহে। আমার দ্বারা হাকিমের অনিষ্ট হইবে, কখন সম্ভব নহে। আমি বরং বলিতেছি যে, এত ডাকাডাকি করেছে, তথাপি আমি কথা কই নাই। রমেশ বড় না হাকিম বড়?" এই বলিতে বলিতে তিনি পলাইলেন।

যে ব্যক্তি ফৌজদারপুত্রের মৃত্যুসংবাদ আনিয়াছিল, সে অদিতি বিশারদকে বলিল যে, মহাশয়ের পুত্রবধূ বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন। এই কথা শুনিবামাত্র বিশারদ সকলের মুখ প্রতি চাহিলেন। কেহ কিছু বলিলেন না। শেষে অদিতি বিশারদ আপনিই সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? আমার পুত্রবধূ যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না?" সকলে উত্তর করিল যে, মহাশয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা আপনিই মীমাংসা করুন। অদিতি বিশারদ কিঞ্চিৎ ভাবিলেন, শেষে অন্দরে যাইয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "সেই বউকে আবার ঘরে? তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি স্বতন্ত্র গৃহে লইয়া সংসার কর।"

কর্ত্তা বলিলেন, "কেন, তাহার ত কোন দোষ নাই।"

গৃ। "দোষ তবে সকল আমার?"

ক। "না, তোমার দোষ দিই নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি, পুত্রবধূকে গ্রহণ করিলে কি দোষ হইতে পারে?"

গৃ। "দোষ অনেক। প্রথমে লোকে গালে কালি-চূণ দিবে, দ্বিতীয়তঃ শিষ্যেরা ত্যাগ করিবে, তখন আমার এই শিশু সন্তানের কি উপায় হইবে?"

ক। "কেন লোকেরা দোষ দিবে? আমাদের পুত্রবধূ কুলত্যাগী নহে, ইচ্ছা পূর্ব্বক যায় নাই, যবন-গৃহেও যায় নাই, পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

গৃ। "কুলত্যাগী নহে? ইচ্ছাপূর্ব্বক যায় নাই, এ কথা তোমায় কে বলিল? তুমি সকল সংবাদই প্রায় জান। কয় দিবস পর্য্যন্ত এক মাগী পাগলের বেশ ধরিয়া যাতায়াত করিতেছিল; সে দিবস সন্ধ্যার সময় বধূকে লইয়া পলাইতেছিল, আমি যাইয়া ফিরাইয়া আনিলাম। ফিরে এসে বালিশ মুখে দিয়া যে আবার মেয়ের কান্না! আমি কি সকল কথা তোমায় বলি।

তোমার পুত্রবধূ যখন দেখিল যে, আমি থাকিতে আর পলাতে পারিবে না, তখন এই পরামর্শ করিয়া লোকজন আনাইয়া চলিয়া গেল।”

গৃহিণীর বাক্য শুনিয়া কর্ত্তা বিস্মিত হইলেন, দুই একবার বলিলেন, “শাস্ত্র মিথ্যা হয় না, স্ত্রীচরিত্র কে বুঝিতে পারে?” শেষে বলিলেন, “তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমার বিশ্বাস হইল। আমি কদাচ তাহাকে আর গ্রহণ করিব না।”

অদিতি বিশারদ বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সকলকে বলিলেন, “আমার ভ্রম হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম আমার পুত্রবধূ নির্দ্দোষী, এক্ষণে জানিলাম, তাহা নহে। তোমরা আমার আত্মীয়, তোমাদিগের নিকট বলিতে লজ্জা কি? আমার পুত্রবধূ কুলটা। অনেকদিন পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু গৃহিণীর সতর্কতা হেতু সফল হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি আমার এই ঘর দ্বার ভগ্ন হওয়া সে কেবল আমার কুলবধূর পরামর্শ ও কৌশলে হইয়াছে। সে যাহা হউক, যদি তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া আমরা স্বীকার করি, তথাপি তিনি যে যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন, সে বিষয় ত আর সন্দেহ নাই। অতএব শাস্ত্রানুসারে তাহারে আর কেমন করিয়া গ্রহণ করি? শাস্ত্রে সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে, এ পাপেরও অবশ্য আছে, কিন্তু বধূকে গ্রহণ করিলে আর একটী বিপদ আছে। ফৌজদার মনে করিবেন যে, আমরাই তাঁহার পুত্রকে হত্যা করিয়া বধূকে ঘরে আনিয়াছি। আমি কি, যে কেহ বধূকে আশ্রয় দিবে, তাহারই প্রতি সেই সন্দেহ হইবে। অতএব আত্মরক্ষা মানুষের প্রধান ধর্ম্ম; শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এক্ষণে স্থির করিয়াছি, পুত্রবধূ গৃহে আসিতে চাহিলে আর আমি তাঁহাকে স্থান দিব না। তোমরা এ পরামর্শে কি বল?”

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, “এ ভাল যুক্তি করিয়াছেন, আমরাও এ পরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিব। আমরাও কেহ আপনার পুত্রবধূকে স্থান দিব না; অন্য কেহ স্থান দিতে চাহিলে নিবারণ করিব। কেন একটা পাপিষ্ঠার নিমিত্ত গ্রামস্থ সকলে বিপদ্‌গ্রস্ত হই? বিশেষতঃ কুলটাকে গ্রামে স্থান দেওয়া উচিত নহে; এখানে স্থান না পাইলে সে আপনিই অন্যত্র যাইবে।”

সকলে এই পরামর্শ করিয়া আপন গৃহ সাবধান করিতে উঠিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সকলে স্ব স্ব গৃহে গেলে পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে গৃহিণী কর্ত্তাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার দেশউজ্জ্বল মুখ-উজ্জ্বল কুলবধূ আসিতেছেন, এখন কি বলিতে হয় যাইয়া বল।" ইহা শুনিয়া অদিতি বিশারদ খিড়কীদ্বারের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। দামিনী মুখ ঢাকিয়া অধোমুখে ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন, দ্বারে শ্বশুরকে দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া উঠিলেন, বড় যন্ত্রণা পাইয়াছেন। অন্যদিন হইলে সে ক্রন্দন দেখিয়া অদিতি বিশারদ আপনিও কাঁদিতেন, কিন্তু এ সময় তিনি কাঁদিলেন না; চক্ষে জল আসিয়াছিল, স্ত্রীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া তাহা সংবরণ করিলেন। পরে নস্য-শম্বুক বাহির করিয়া দুই একবার তাহাতে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া শেষ দীর্ঘ টানে এক টিপ টানিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিলেন, "বৎসে! আমি সকল দিক ভাবিয়া দেখিলাম, তোমায় আর গ্রহণ করিতে পারি না; তুমি যবনস্পৃষ্টা হইয়াছ; ব্রাহ্মণগৃহে আর তুমি স্থান পাইতে পার না; অতএব স্থানান্তরে যাও।" এই বলিয়া অদিতি বিশারদ দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন; দামিনী প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; ক্রমে শ্বশুরের প্রত্যেক বাক্য স্মরণ করিয়া অর্থ বুঝিলেন, কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিলেন না; ভাবিলেন, ইহা স্বপ্ন হইবে। স্বপ্ন কি না স্থির করিবার নিমিত্ত চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। নিকটে তিন্তিড়ী-বৃক্ষ, তাহার শুষ্ক ডালে একটী চিল বসিয়া আছে; খিড়কী-পুষ্করিণীর কাল জলে ডাহুক সাঁতার দিতেছে, ঘাটের নিকট জলে উচ্ছিষ্ট পাত্র রহিয়াছে; যে দাসী তাহা জলে রাখিয়া গিয়াছে, তাহার জলসিক্ত পদচিহ্ন সোপানে স্পষ্ট রহিয়াছে। শ্বশুর যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহা রুদ্ধ রহিয়াছে। দামিনী একবার সেই দ্বারে হাত দিয়া দেখিলেন পরে আপনার গাত্রে, চক্ষে হাত দিয়া দেখিলেন, স্বপ্ন নহে—সকলই সত্য! গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ সত্য—দামিনী 'ব্রাহ্মণের অগ্রাহ্য' এই কথা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাও স্বপ্ন নহে। দামিনীর চক্ষে সূর্য্য নিবিয়া গেল, সকলই অন্ধকার হইল, দামিনী পড়িয়া গেলেন।

ক্ষণকাল বিলম্বে পাড়ার অনেকগুলিন বৃদ্ধা, মধ্যবয়স্কা, যুবতী, বালিকা সকলে আসিয়া দামিনীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দামিনী তখনও মতিস্থির করিতে

পারেন নাই। যেখানে পড়িয়া গিয়াছিলেন সেইখানে নতমুখে বসিয়া একটী দুর্ব্বাদল, নখদ্বারা অন্যমনস্কে ছিঁড়িতেছিলেন। অন্যমনস্কে হউক, আর সমনস্কে হউক, তাঁহার নয়ন হইতে বারিধারা বহিতেছিল।

প্রতিবাসীদিগের মধ্যে একটী বৃদ্ধা বলিলেন, "এমনও কপাল করে ভারতে এসেছিলে। আহা! কি অদৃষ্ট! কি দুর্ভাগ্য!" দামিনী ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বৃদ্ধার মুখপ্রতি ব্যথিত হরিণীর ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন, "এ মুখ প্রতি পোড়া শ্বশুর একবার ফিরে চাহিল না। ধর্ম্ম বড় হল না, জাত বড় হল, আ রে পোড়া বিধাতা! কপালে মন্দ লিখিতে আর কি লোক পেলে না? এই বয়সে এই কষ্ট! আহা! মরি মরি মরি! মেয়ে ত নয়, যেন স্বর্ণলতা!"

আর একজন মধ্যবয়স্কা বলিলেন, "আহা! দামিনী আমাদের চির-দুঃখিনী; বুড়া মাতামহী দামিনীর বিবাহ দিয়া বলিয়াছিল যে, 'এতদিনে আমার দামিনীর উপায় হইল, এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।' আহা! যদি বুড়ি বেঁচে থাকিত, তবে দামিনী দাঁড়াইবার একটা স্থান পাইত। এখন আর দামিনীর দাঁড়াইবার স্থান নাই।"

দামিনীর অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল; শেষে দামিনী মাতামহীর জন্য কাঁদিয়া উঠিলেন। উদ্দেশ্যে মাতামহীকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "আয়ি! আমায় কার কাছে ফেলে আপনি চলে গেলে?" এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তাঁহার শ্বাশুড়ী রাগভরে সশব্দে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইলেন ও তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। "বলি বউ! তোমার কেমন আক্কেল আচরণ! এই দুই প্রহর বেলা গৃহস্থের দ্বারে বসিয়া মরা কান্না আরম্ভ করিলে? জান না কি যে, এতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়?" প্রতি-বাসিনীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর তোমাদেরই বা কি আচরণ! আপনার আপনার ঝি-বউ ঘরে রেখে পরের বউ নাচাতে এলে। এখন সকলে সময় পাইয়াছ, ভাল, পরমেশ্বর আমাকেও একদিন দিবেন, আমিও একদিন পাব।"

কেহ কোন উত্তর করিল না; সকলেই একে একে চলিয়া গেল। দামিনীও চক্ষের জল মুছিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। প্রতিবাসিনীরা আপন আপন গৃহকার্য্যে গেল। তাঁহাদের একজন সমবয়স্কা একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

রমেশের বিমাতা পূর্ব্বমত দ্বার রুদ্ধ করিলে দামিনীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "একবার উঠ ত।" দামিনী বলিলেন, "আমি আর কোথায়ও যাব না; কোথায়ও যাইবার আর আমার স্থান নাই; কেহ আর আমায় স্থান দিবে না।" সমবয়স্কা বলিল, "তবে কি এইখানে মরিবি?" দামিনী উত্তর করিলেন, "এইখানেই মরিব। আমার স্থান কোথা? তিনি আমায় এইখানে রাখিয়া গেছেন, আমি এইখানেই থাকিব; যতদিন তিনি না আসেন, ততদিন যেমন করে পারি বাঁচিব। আমি তাঁরে না দেখে মরিতে পারিব না।"

এই বলিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। সমবয়স্কা বলিলেন, "অন্যত্র না যাও, এই বৃক্ষমূলে আসিয়া বস; রৌদ্র অসহ্য হইয়াছে, আমরা আর দাঁড়াইতে পারিব না।" দামিনী এই কথায় ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার গৃহে যাও, তোমার গৃহ আছে, গৃহে তোমায় না দেখিলে তোমার মা ব্যস্ত হবেন, আবার বুড়া মানুষ, এই রৌদ্রে তোমায় খুঁজিতে আসিবেন।"

প্রতিবাসিনী গৃহে গেলেন, কিন্তু বিস্তর ক্ষণ থাকিতে পারিলেন না; অপরাহ্ণ না হইতে হইতেই অদিতি ভট্টাচার্য্যের বাটীর পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দামিনী পূর্ব্বমত একা বৃক্ষমূলে অন্যমনস্কে বসিয়া একটী পক্ষী দেখিতেছেন। আর চক্ষে জল নাই।

প্রতিবাসিনী আসিয়া দামিনীর নিকটে বসিলেন। পরস্পর কেহই ক্ষণকাল পর্য্যন্ত কথা কহিলেন না। পরে দামিনী বলিলেন, "যদি এই রাত্রে তিনি আসেন।"

প্র। "কে? তোমার স্বামী? তা আসেন ত ভালই হয়। যাহা হউক, ভালমন্দ একটা স্থির হইয়া যায়।"

দা। "তিনি যদি আসিয়া পথ হইতে ফিরে যান?"

প্র। "সে কি! তা কি হইতে পারে?"

দা। "পারে। পথে যদি তাঁরে কেহ কোন কথা শুনায়। তিনিও কি আমায় ত্যাগ করিবেন?"

প্র। "কি জানি ভাই। পুরুষের মন কখন কেমন থাকে, তা কে বলিতে পারে?"

দা। "তিনি আমায় কত ভালবাসেন। আমায় দেখিতে দেখিতে কাঁদেন। আমায় দেখিবার তাঁর কত সাধ। দেখিবার নিমিত্ত কত ছল করে আমার কাছে আসিয়া বসেন, কতবার কতদিকে বসে দেখেন। আবার কপালে হাত দিয়া দেখেন ; দাড়িতে হাত দিয়া দেখেন ; ওষ্ঠে হাত দিয়া দেখেন ; দেখিয়া আর তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না। রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া আমার মুখের উপর চাহিয়া থাকেন, আমি পোড়া চক্ষু বুজিয়া ঘুমাইয়া থাকি।"

এই বলিতে বলিতে দামিনীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। দামিনী কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিনী বলিলেন, "সন্ধ্যা হইল, রাত্রি যাপন কিরূপে হইবে ? কোথা থাকিবে ?" দামিনী প্রথমে বলিলেন, "কি জানি", পরক্ষণেই বলিলেন, "এইখানেই থাকিব। কে আমায় স্থান দিবে ?"

প্রতিবাসিনী শিহরিয়া বলিলেন, "তা কি স্ত্রীলোকের সাধ্য ? এই অন্ধকার বনমধ্যে একা পুরুষে থাকিতে পারে না, তুমি কেমন করিয়া থাকিবে ? রাত্রের নিমিত্ত ঘরে না হউক, বাটীর অন্য কোন চালায় শ্বশুর শ্বাশুড়ী কি স্থান দিবেন না ? অবশ্যই দিবেন।"

দামিনীও সেই আশা করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় মনে করিয়াছিলেন যে, রাত্রে কেহ না কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইবে ; কিন্তু রাত্রি হইল, প্রতিবাসিনী চলিয়া গেল। কেহ তাঁহার তত্ত্ব করিল না। খিড়কীদ্বার এতক্ষণ মুক্ত ছিল, শেষে তাহাও রুদ্ধ হইল।

দামিনী একা অন্ধকারে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। দূরে যে দুই একটী দীপালোক দেখা যাইতেছিল, তাহা একে একে নিবিয়া গেল। গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হইয়া সকলে নিদ্রা গেলেন, দামিনীর ভাবনা কেহ ভাবিল না। দামিনী আপনার ভাবনা আপনি ভাবিতে লাগিল। ক্রমে দুই একবার ভয় পাইতে লাগিল, অন্ধকারে নানাদিকে নানা মূর্তি দেখিতে লাগিল। একা থাকা বিষম হইয়া উঠিল। একে সমস্ত দিন অনাহার, তাহে আবার সমস্ত দিন কাঁদিয়াছেন, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, দামিনী ধূলায় শয়ন করিলেন, শীঘ্র নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে ডাকিল, "মা !" স্বপ্নে যেন উত্তর দিলেন "মা !" স্বপ্নে যেন বোধ হইল, তাঁহার মা বলিতেছেন, "উঠ মা ! এ ঘরে আর কাজ কি ?"

পরদিন, প্রাতে উঠিয়া কেহ আর দামিনীকে দেখিতে পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দশ বারো দিবস পরে রমেশ বাটী আসিয়া সকল শুনিলেন। পিতাকে কিছু বলিলেন না, বিমাতার প্রতি দোষারোপ করিলেন না, কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। গ্রামে গ্রামে পথে পথে পাঁচ সাত দিবস ভ্রমণ করিলেন, কোথাও দামিনীর সন্ধান পাইলেন না। শেষে এক দিবস রাত্রিশেষে বিষণ্ণভাবে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, নদীতীরে ভগ্ন অট্টালিকা দেখিয়া দাঁড়াইলেন। ভগ্ন অট্টালিকার অবস্থাসহিত আপনার সাদৃশ্য দেখিলেন। অট্টালিকার আলিসা ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ আপন আপন মূল বিদ্ধ করিয়া সাহঙ্কারে দুলিতেছে। দুর্ব্বল অট্টালিকা একা নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহা সহ্য করিতেছে।

রমেশ অগ্রসর হইলেন, দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার মুক্ত ছিল, গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সমাগমশব্দে অসংখ্য চামচিকা, বাদুড় অন্ধকারে উড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে ক্রমে ক্রমে তাহাদের শব্দ থামিল। ঘর ভয়ানক গম্ভীর হইল। রমেশ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই কক্ষান্তরে মনুষ্য-কণ্ঠ-নিঃসৃত একটী মৃদু শব্দ শুনিলেন। রমেশের শরীর কণ্টকিত হইল। রমেশ সাবধানে নিঃশব্দে সেই দিকে গেলেন, অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিলেন, মৃত্যুশয্যায় একটী রুগ্ন মনুষ্যদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

রমেশ কি ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নরদেহ একেবারে সংজ্ঞাহীন হয় নাই, তাহার কণ্ঠস্বর আবার অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইতে লাগিল, "আয়ি! এলে? বসো, আর বিলম্ব করিব না, কেবল একবার রমেশকে দেখে আসি।"

রমেশ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "দামিনী, দামিনী! আমি এসেছি, আর কখন তোমা ছাড়া হব না।"

দামিনী কোন উত্তর দিল না। রমেশ আছড়াইয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "আবার কথা কও; অনেক দিন কথা শুনি নাই; আবার কথা কও।" আর কোন উত্তর নাই; সকল নিঃশব্দ। রমেশ কতক বুঝিলেন, রুদ্ধশ্বাসে গ্রামমধ্যে গেলেন। তথা হইতে দীপ জ্বালিবার দ্রব্যাদি লইয়া আসিলেন। দীপ জ্বালিলেন। দেখিলেন, সেখানে আর একটী বৃদ্ধা

স্ত্রীলোক বসিয়া দামিনীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। দামিনী এ জন্মের মত চক্ষু মুদিয়াছেন।

রমেশকে দেখিয়া বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিল, সে ভীষণ হাসি দেখিয়া রমেশের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বৃদ্ধা উঠিল, দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ চিনিলেন যে, এই পূর্ব্বপরিচিতা পাগলী।

পাগলী একবার অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চুপ, আমার দামিনী ঘুমাইতেছে; ঘুমাইতেছে।" পরক্ষণেই আবার বিকট হাসি হাসিয়া রমেশের উপর পড়িয়া রমেশের গলদেশ বজ্রবৎ টিপিয়া বলিল, "আমি চিনিয়াছি, তুই রমেশ; তোর জন্যই আমার দামিনী মরিয়াছে।"

রমেশের শ্বাস রুদ্ধ হইল; চক্ষুর শিরাসকল উঠিল। রমেশ বাক্যরহিত, শক্তিরহিত, শেষে দামিনীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। পাগলী আবার রমেশের গলদেশ পূর্ব্বমত ধরিল। এবার সকল ফুরাইল।

'সঞ্জীবনীসুধা' : ১৮৯৩

রা ধা রা ণী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল—বড়মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে এক জন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়; সর্ব্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি; ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা, অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, প্রিবি

কৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্ব্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এ জন্য কাজে কাজেই তাহার উপবাস; রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথা? কি দিবে?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষুঃ বারি বর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমত সময় অন্ধকারে, অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, "কে গা তুমি কাঁদ?"

পুরুষ মানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল।

রাধারাণীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণীর ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, "আমি দুঃখিলোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছে।"

সে পুরুষ বলিল, "তুমি কোথা গিয়াছিলে?"

রাধা। "আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।"

পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ী কোথায়?"

রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন্ পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দিও—আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড় বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমার বয়স কত?"

রাধা। "দশ এগার বছর—"

"তোমার নাম কি?"

রাধা। "রাধারাণী।"

"হাঁ রাধারাণি! তুমি ছেলেমানুষ, একেলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন?"

তখন সে কথায় কথায়, মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণেও বালিকার হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, "আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।"

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি প্রকারে? তা নহিলে, আমার মা খেতে পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।" সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা? এ যে বড় বড় ঠেকছে।"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না দুইটা বই দিই নাই।"

রাধা। "তা এ যে অন্ধকারেও চক্‌চক্ করচে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত?"

"না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্‌চক্ করচে।"

রাধা। "তা, আচ্ছা, ঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে যদি দেখি যে, পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।"

কিছু পরে তাহারা রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া, রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি, টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়—তার পর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালি।"

"আচ্ছা।"

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া চকমকি ঠুকিয়া, আগুন জ্বালিতে হইল। আগুন জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল যে, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষন্নবদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল—সকাতরে বলিল—"মা! এখন কি হবে?"

মা বলিল, "কি হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে? সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় সোর গোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল—মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন? পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌সে!

রাধারাণীর মার কুটীর বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটীরের নিকটেই পদ্মলোচন শাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,—পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌সে—একযোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল। বলিল, "রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ও মা! আমার কিসের কাপড়!"

পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ারমুখো কি না, তাহা আমরা সবিশেষ জানি না—রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল; বলিল, "কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়া এস।"

রাধারাণী তখন বলিল, "ওমা সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁ গা পদ্মলোচন?"—

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইঁহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেক বারই ইঁহাদিগের নিকট যখন সুদিন ছিল, তখন চারি টাকার কাপড়ে শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বারো আনা, আর দুই আনা মুনাফা লইতেন।

"হাঁ পদ্মলোচন—বলি সে বাবুটিকে চেন?"

পদ্মলোচন বলিল, "তোমরা চেন না?"

রাধা। "না।"

পদ্ম। "আমি বলি তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।"

যাহা হৌক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনাফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া, প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এ দিকে রাধারাণী প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মার পথ্যের উদ্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া, মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—"এ কি মা !"

মা দেখিয়া বলিলেন—"একখানা নোট !"

রাধারাণী বলিল, "তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।"

মা বলিলেন, "হাঁ ! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, তোমার নাম লেখা আছে।"

রাধারাণী বড়ঘরের মেয়ে, একটু অক্ষর-পরিচয় ছিল। সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে। লেখা আছে।

রাধারাণী বলিল, "হাঁ মা, এমন লোক কে মা !"

মা বলিলেন, "তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।"

পরদিন মাতায় কন্যায়, রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া, তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনী ছিলেন। এখন অতি দুঃখিনী হইয়াছিলেন, এই শারীরিক এবং মানসিক দ্বিবিধ কষ্ট তাঁহার সহ্য হইল না। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার শেষ কাল উপস্থিত হইল।

এমত সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রিবি কৌন্সিলের আপীল তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি পাইয়াছে ; তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওয়াশিলাতের টাকা ফেরত পাইবেন এবং তিনি আদালতের খরচা পাইবেন। কামাখ্যানাথ বাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সংবাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সুসংবাদ শুনিয়া, রুগ্নার অবিরল নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল।

তিনি নয়নাশ্রু সংবরণ করিয়া কামাখ্যা বাবুকে বলিলেন, "যে প্রদীপ নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে? আপনার এ সুসংবাদেও আমার আর প্রাণরক্ষা হইবে না। আমার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তবে আমার এই সুখ যে, রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। তাই বা কে জানে? সে বালিকা, তাহার এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনিই ভরসা। আপনি আমার এই অন্তিমকালে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন—নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব।"

কামাখ্যা বাবু অতি ভদ্র লোক এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন। রাধারাণীর মাতা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন যে. যতদিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অন্ততঃ ততদিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব। রাধারাণীর মাতা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামাখ্যা বাবু কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। "আমার এখনও কিছু হাতে আছে—আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইব।" এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। রুক্মিণীকুমারের দান গ্রহণ তাঁহাদিগের প্রথম ও শেষ দান গ্রহণ।

কামাখ্যা বাবু এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দশা দেখিয়া কামাখ্যা বাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন। আবার রাধারাণীর মাতা যুক্তকরে তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন, দেখিয়া আরও কাতর হইলেন; বলিলেন, "আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? আপনার যাহা প্রয়োজনীয়, আমি তাহাই করিব।"

রাধারাণীর মাতা বলিলেন, "আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার শ্বশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব রাধারাণী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিবেন, এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।"

কামাখ্যা বাবু বলিলেন, "আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপন কন্যার অধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ কথা কহিলাম; আপনি বিশ্বাস করুন।"

যিনি মুমূর্ষু, তিনি কামাখ্যা বাবুর চক্ষের জল দেখিয়া, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আহ্লাদের হাসি দেখা দিল। হাসি দেখিয়া কামাখ্যা বাবু বুঝিলেন, ইনি আর বাঁচিবেন না।

কামাখ্যা বাবু তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, এক্ষণে আমার গৃহে চলুন। পরে ভদ্রাসন দখল হইলে আসিবেন। রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিদ্র্যজনিত—এজন্য দারিদ্র্যাবস্থায় তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দারিদ্র্য নাই, সুতরাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যা বাবু, রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সযত্নে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যা বাবু রাধারাণীকে তাহার সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজ বাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন।

কালেক্টর সাহেব রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্য যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যা বাবু বিবেচনা করিলেন, আমি রাধারাণীর জন্য যতদূর করিব, সরকারি কর্ম্মচারিগণ ততদূর করিবে না। কামাখ্যা বাবুর কৌশলে কালেক্টর সাহেব নিরস্ত হইলেন। কামাখ্যা বাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যা বাবু নব্যতন্ত্রের লোক—বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক।

এই ভাবিয়া কামাখ্যা বাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর গেল—রাধারাণী পরম সুন্দরী যোড়শবর্ষীয়া কুমারী। কিন্তু সে অন্তঃপুরমধ্যে বাস করে, তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যা বাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন। তত্ত্ব জানিবার জন্য আপনার কন্যা বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে রাধারাণীর সখীত্ব। উভয়ে সমবয়স্কা। এবং উভয়ে অত্যন্ত প্রণয়। কামাখ্যা বাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

বসন্ত সলজ্জভাবে, অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "রুক্মিণী-কুমার রায় কেহ আছে ?"

কামাখ্যা বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না। তা ত জানি না। কেন ?"

বসন্ত কহিল, "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

কামাখ্যা। "সে কি ? রাধারাণীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কি প্রকারে হইল ?"

বসন্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল। সে রথের রাত্রির বিবরণ সবিস্তারে রাধারাণীর কাছে শুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল। শুনিয়া কামাখ্যা বাবু রুক্মিণীকুমারের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "রাধারাণীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারাণী একটি মহাভ্রমে পড়িয়াছে। বিবাহ কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নহে। রুক্মিণীকুমারের নিকট রাধারাণীর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; যদি সময় ঘটে, তবে অবশ্য প্রত্যুপকার করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহে রুক্মিণীকুমারের কোন দাবি দাওয়া নাই। তাতে আবার সে কি জাতি, কত বয়স, তাহা কেহ জানে না। তাহার পরিবার সন্তানাদি থাকিবার সম্ভাবনা। রুক্মিণী-কুমারের বিবাহ করিবারই বা সম্ভাবনা কি ?"

বসন্ত বলিল, "সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। কিন্তু সেই রাত্রি অবধি, রুক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে, রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া, প্রত্যহ মনে মনে পূজা করে। এই পাঁচ বৎসর

রাধারাণী আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বৎসরে এমন দিন প্রায় যায় নাই, যে দিন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই। আর কেহ রাধারাণীকে বিবাহ করিলে, তাহার স্বামী সুখী হইবে না।"

কামাখ্যা বাবু মনে মনে বলিলেন "বাতিক। ইহার একটু চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু প্রথম চিকিৎসা বোধ হয়, রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করা।"

কামাখ্যা বাবু রুক্মিণীকুমারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং কলিকাতায় তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। দেশে দেশে আপনার মোয়াক্কেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ—

"বাবু রুক্মিণীকুমার রায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন—বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে রুক্মিণী বাবুর সন্তোষের ব্যতীত অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইবে না।

শ্রী ইত্যাদি—"

কিন্তু কিছুতেই রুক্মিণীকুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, তথাপি কৈ, রুক্মিণীকুমার ত আসিল না।

ইহার পর রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইল—কামাখ্যা বাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী ইহাতে অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন, দ্বিতীয় বার পিতৃহীনা হইলেন মনে করিলেন। কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধাদির পর রাধারাণী আপন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিতে লাগিলেন। কামাখ্যা বাবুর বিচক্ষণতা হেতু রাধারাণীর সম্পত্তি বিস্তর বাড়িয়াছিল।

বিষয় হস্তে লইয়াই রাধারাণী প্রথমেই দুই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন যে, এই অর্থে তাঁহার নিজ গ্রামে একটি অনাথনিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হউক—"রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ।"

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কে কথা কহিবে? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইল। রাধারাণীর মাতা দরিদ্রাবস্থায় নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া-

ছিলেন ; কেন না, যে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দরিদ্র হইলে, সে গ্রামে তাহার বাস করা কষ্টকর হয়। তাঁহাদিগের নিজ গ্রাম শ্রীরামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর—আমরা সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধারাণী রাজপুরেই বাস করিতেন। অনাথনিবাসও রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল। নানা দেশ হইতে দীন দুঃখী অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুই এক বৎসর পরে, একজন ভদ্রলোক সেই অনাথনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। অবস্থা দেখিয়া, অতি ধীর, গম্ভীর এবং অর্থশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই "রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদের" দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী ?"

তাহারা বলিল, "এ কাহারও বাড়ী নহে, এখানে দুঃখী অনাথ লোক থাকে। ইহাকে 'রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ' বলে।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি ইহার ভিতরে গিয়া দেখিতে পারি ?"

রক্ষকগণ বলিল, "দীন দুঃখী লোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে— আপনাকে নিষেধ কি ?"

দর্শক ভিতরে গিয়া সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলিলেন, "বন্দোবস্ত দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে। কে এই অন্নসত্র দিয়াছে ? রুক্মিণীকুমার কি তাঁহার নাম ?"

রক্ষকেরা বলিল, "এক জন স্ত্রীলোক এই অন্নসত্র দিয়াছেন।"

দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ইহাকে রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ বলে কেন ?"

রক্ষকেরা বলিল, "তাহা আমরা কেহ জানি না।"

"রুক্মিণীকুমার কার নাম ?"

"কাহারও নয়।"

"যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার নিবাস কোথায় ?"

রক্ষকেরা সম্মুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তোমরা যাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলে,

তিনি পুরুষ মানুষের সাক্ষাতে বাহির হইয়া থাকেন? রাগ করিও না, এখন অনেক বড় মানুষের মেয়ে মেম লোকের মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে, এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

রক্ষকেরা উত্তর করিল—“ইনি সেরূপ চরিত্রের নন। পুরুষের সমক্ষে বাহির হন না।”

প্রশ্নকর্ত্তা ধীরে ধীরে রাধারাণীর অট্টালিকার অভিমুখে গিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত; বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাট্যের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না, কিন্তু তাহার অঙ্গুলিতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় ছিল; তাহা দেখিয়া, রাধারাণীর কর্ম্মকারগণ অবাক্ হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল, এত বড় হীরা তাহারা কখন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কেহ লোক ছিল না, এজন্য তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, কে ইনি? মনে করিল, বাবু স্বয়ং পরিচয় দিবেন। কিন্তু বাবু কোন পরিচয় দিলেন না। তিনি রাধারাণীর দেওয়ানজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। বলিলেন, “এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।”

দেওয়ানজি বলিলেন, “আমার মুনিব স্ত্রীলোক, আবার অল্পবয়স্কা। এজন্য তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, কোনো অপরিচিত লোকে পত্র আনিলে আমরা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।”

আগন্তুক বলিল, “আপনি পড়ুন।”

দেওয়ানজী পত্র পড়িলেন—

“প্রিয় ভগিনি!

এ ব্যক্তি পুরুষ হইলেও ইঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিও—ভয় করিও না। যেমত যেমত ঘটে, আমাকে লিখিও।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী।”

কামাখ্যা বাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া, কেহ আর কিছু বলিল না। পত্র অন্তঃপুরে গেল।

অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্রবাহক বাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পাইল না—হুকুম নাই।

পরিচারিকা, বাবুকে লইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইল। রাধারাণীর অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষ মানুষ প্রবেশ করিল। দেখিয়া এক জন পরিচারিকা রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর এক জন অন্তরালে থাকিয়া আগন্তককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল যে, তাঁহার বর্ণটুকু গৌর, স্ফুটিত মল্লিকা-রাশির মত গৌর; তাঁহার শরীর দীর্ঘ, ঈষৎ স্থূল; দীর্ঘ, অতি সূক্ষ্ম পরিষ্কার ঘনকৃষ্ণ সুরঞ্জিত কেশজালে মণ্ডিত; চক্ষু বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, ভ্রূযুগ সূক্ষ্ম, ঘন, দূরায়ত এবং নিবিড় কৃষ্ণ; নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত; ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র এবং কোমল; গ্রীবা দীর্ঘ, অথচ মাংসল; অন্যান্য অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কেবল অঙ্গুলিগুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি শুভ্র, সুগঠিত, এবং একটি বৃহদাকার হীরকে রঞ্জিত।

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকাকে বিদায় করিয়া দিলেন। রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে, সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল—রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আগন্তকের উচিত, প্রথম কথা কহা—কেন না, তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ—কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছেন কেন? আমি স্ত্রীলোক, কেবল বসন্তের অনুরোধেই আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি।"

আগন্তুক বলিল, "আমি আপনার সহিত এরূপ সাক্ষাতের অভিলাষী হইয়াছি, ঠিক তা নহে।"

রাধারাণী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তা নয়, বটে। তবে বসন্ত কি জন্য এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। বোধ হয়, আপনি জানেন।"

আগন্তুক একখানি অতি পুরাতন সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধারাণীকে দেখাইলেন। রাধারাণী পড়িলেন; কামাখ্যা বাবুর স্বাক্ষরিত রুক্মিণীকুমার সম্বন্ধে সেই বিজ্ঞাপন। রাধারাণী দাঁড়াইয়াছিলেন—দাঁড়াইয়া

দাঁড়াইয়া নারিকেলপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। আগন্তুকের দেবতুল্য গঠন দেখিয়া, মনে ভাবিলেন, ইনিই আমার সেই রুক্মিণীকুমার। আর থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আপনার নাম কি রুক্মিণীকুমার বাবু?"

আগন্তুক বলিলেন, "না।" "না" শব্দ শুনিয়াই রাধারাণী ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—তাঁহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গেল। আগন্তুক বলিলেন, "না। আমি যদি রুক্মিণীকুমার হইতাম, তাহা হইলে, কামাখ্যা বাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না। কেন না, তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তখনি আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

রাধারাণী বলিলেন, "যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন?"

উত্তরকারী বলিলেন, "একটি কৌতুকের জন্য। আজি আট দশ বৎসর হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম—কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে আপনার নামটা গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক নাম রুক্মিণীকুমার। আপনি অত বিমনা হইতেছেন কেন?"

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন—আগন্তুক বলিতে লাগিলেন—"যথার্থ রুক্মিণীকুমার নাম ধরে, এমন কাহাকেও চিনি না। যদি কেহ আমারই তল্লাস করিয়া থাকে—তাহা সম্ভব নহে—তথাপি কি জানি—সাত পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম—কিন্তু কামাখ্যা বাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না।"

"পরে?"

"পরে কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমি কার্য্যগতিকে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি সেই ত্রুটির ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য তাঁহার পুত্রদিগের নিকট আসিলাম। কৌতুকবশতঃ বিজ্ঞাপন সঙ্গে আনিয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে উহার কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যা বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল? কামাখ্যা বাবুর পুত্র বলিলেন যে, রাধারাণীর অনুরোধে। আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম—এক বালিকা—আমি এক দিন দেখিয়া তাহাকে আর ভুলিতে

পারিলাম না। সে মাতার পথ্যের জন্য, আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া—সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে—" বক্তা আর কথা কহিতে পারিলেন না—তাঁহার চক্ষু জলে পুরিয়া গেল। রাধারাণীরও চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। চক্ষু মুছিয়া রাধারাণী বলিলেন, "ইতর লোকের কথায় এখন প্রয়োজন কি? আপনার কথা বলুন।"

আগন্তুক উত্তর করিলেন, "রাধারাণী ইতর লোক নহে। যদি সংসারে কেহ দেবকন্যা থাকে, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহাকে পবিত্র, সরলচিত্ত, এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেই রাধারাণী—যদি কাহারও কথায় অমৃত থাকে, তবে সেই রাধারাণী—যথার্থ অমৃত। বর্ণে বর্ণে অপ্সরার বীণা বাজে, যেন কথা কহিতে কহিতে বাধ বাধ করে অথচ সকল কথা পরিষ্কার, সুমধুর,—অতি সরল! আমি এমন কণ্ঠ কখন শুনি নাই, এমন কথা কখনও শুনি নাই।"

রুক্মিণীকুমার—এক্ষণে ইঁহাকে রুক্মিণীকুমারই বলা যাউক—ঐ সঙ্গে মনে মনে বলিলেন, "আবার আজ বুঝি তেমনি কথা শুনিতেছি।"

রুক্মিণীকুমার মনে মনে ভাবিতেছিলেন আজি এত দিন হইল, সেই বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, ঠিক্ আজিও সে কণ্ঠ আমার মনের ভিতর জাগিতেছে! যেন কাল শুনিয়াছি। অথচ আজি এই সুন্দরীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সেই রাধারাণীকেই বা মনে পড়ে কেন? এই কি সেই? আমি মূর্খ! কোথায় সেই দীনদুঃখিনী, কুটীরবাসিনী ভিখারিণী—আর কোথায় এই উচ্চপ্রাসাদবিহারিণী ইন্দ্রাণী! আমি সে রাধারাণীকে অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, সুতরাং জানি না যে, সে সুন্দরী, কি কুৎসিতা, কিন্তু এই শচীনিন্দিতা রূপসীর শতাংশের একাংশ রূপও যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে সেও লোকমনোমোহিনী বটে!

এ দিকে রাধারাণী, অতৃপ্তশ্রবণে রুক্মিণীকুমারের মধুর বচনগুলি শুনিতে-ছিলেন—মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি যাহা পাপিষ্ঠা রাধারাণীকে বলিতেছ, কেবল তোমাকেই সেই কথাগুলি বলা যায়! তুমি আজ আট বৎসরের পর রাধারাণীকে ছলিবার জন্য কোন্ নন্দনকানন ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিলে? এতদিনে কি আমার হৃদয়ের পূজায় প্রীত হইয়াছ? তুমি কি অন্তর্যামী? নহিলে আমি লুকাইয়া লুকাইয়া, হৃদয়ের ভিতরে লুকাইয়া তোমাকে যে পূজা করি, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?

এই প্রথম, দুই জনে স্পষ্ট দিবসালোকে, পরস্পরের প্রতি করিলেন। দুই জনে, দুই জনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি? এই সসাগরা, নদনদীচিত্রিতা, জীবসঙ্কুলা পৃথিবীতলে এমন তেজোময়, এমন মধুর, এমন সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্য অথচ গম্ভীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ব্রীড়াময়, এমন আর আছে কি? চির-পরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অভিনব মধুরিমাময়, আত্মীয় অথচ অত্যন্ত পর, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব—কখন দেখি নাই, আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি?

রাধারাণী বলিলেন,—বড় কষ্টে বলিতে হইল, কেন না, চক্ষের জল থামে না, আবার সেই চক্ষের জলের উপর কোথা হইতে পোড়া হাসি আসিয়া পড়ে—রাধারাণী বলিলেন, "তা, আপনি এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন, আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন, তা ত এখনও বলেন নাই।"

হাঁ গা, এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, প্রাণেশ্বর! দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব! চিরবাঞ্ছিত! বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে; আবার যাকে সেই সঙ্গে "হাঁ গা, সেই রাধারাণী পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা" বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে—তার সঙ্গে আপনি, মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই সকল কথা নিয়ে কি কথা কহা যায় গা? তোমরা পাঁচজন রসিকা, প্রেমিকা, বাক্‌চতুরা, বয়োধিকা ইত্যাদি ইত্যাদি আছ, তোমরা পাঁচজনে বল দেখি, ছেলেমানুষ রাধারাণী কেমন করে এমন করে কথা কয় গা?

রাধারাণী মনে মনে একটু পরিতাপ করিলেন; কেন না, কথাটা একটু ভৎর্সনার মত হইল। রুক্মিণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"তাই বলিতেছিলাম। আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম—রাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু—এতটুকু—অন্ধকার রাত্রে জোনাকির ন্যায়—একটু আশা হইল যে, যদি এই রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয়!"

"তোমার রাধারাণী।" রাধারাণী ছল ধরিয়া চুপি চুপি এই কথাটি বলিয়া, মুখ নত করিয়া ঈষৎ ঈষৎ হাসিলেন। হাঁ গা, না হেসে কি থাকা যায় গা? তোমরা আমার রাধারাণীর নিন্দা করিও না।

রুক্মিণীকুমারও মনে মনে ছল ধরিলেন—এ তুমি বলে কেন? কে এ?

প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমারই রাধারাণী। আমি একরাত্রি মাত্র তাহাকে দেখিয়া—দেখিয়াছিই বা কেমন করিয়া বলি—এই আট বৎসরেও তাহাকে ভুলি নাই। আমারই রাধারাণী।"

রাধারাণী বলিলেন, "হোক আপনারই রাধারাণী।"

রুক্মিণী বলিতে লাগিলেন, "সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যা বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কে? কামাখ্যা বাবুর পুত্র সবিস্তারে পরিচয় দিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক ছিলেন; কেবল বলিলেন, 'আমাদিগের কোন আত্মীয়ার কন্যা।' যেখানে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম; সেখানে আর অধিক পীড়াপীড়ি করিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কেন রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই কি? যদি প্রয়োজন হয় ত বোধ করি, আমি কিছু সন্ধান দিতে পারি। আমি এই কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, 'কেন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না; আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন; বোধ করি, আমার ভগিনীও জানিতে পারেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে।' এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পত্র দিয়া বলিলেন, আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন যে, এই পত্র লইয়া তাঁহাকে স্বয়ং রাজপুরে যাইতে বলুন। রাজপুরে যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন। আমি সেই পত্র লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। কোন অপরাধ করিয়াছি কি?"

রাধারাণী বলিলেন, "জানি না। বোধ হয় যে, আপনি মহাভ্রমে পতিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন। আপনার রাধারাণী কে, তাহা আমি চিনি কি না, বলিতে পারিতেছি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিলে বলিতে পারি, আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না।"

রুক্মিণী সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন, কেবল নিজদত্ত অর্থ বস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না। রাধারাণী বলিলেন—"স্পষ্ট কথা মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে রাধারাণীর কোন কথা বলিতে সাহস হয় না; কেন না, আপনাকে

দয়ালু লোক বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরূপ দয়ার্দ্রচিত্ত হইতেন, তাহা হইলে আপনি যে ভিখারী বালিকার কথা বলিলেন, তাহাকে অমন দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া অবশ্য তার কিছু আনুকূল্য করিতেন। কই, আনুকূল্য করার কথা ত কিছু আপনি বলিলেন না?"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আনুকূল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমি সে দিন নৌকাপথে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম—পাছে কেহ জানিতে পারে, এই জন্য ছদ্মবেশে রুক্মিণীকুমার রায় পরিচয়ে লুকাইয়া আসিয়াছিলাম—অপরাহ্লে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। সঙ্গে যাহা অল্প ছিল, তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম; কিন্তু সে অতি সামান্য। পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদিগের বিশেষ সংবাদ লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই আমাকে কাশী যাইতে হইল। পিতা অনেক দিন রুগ্ন হইয়া রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিতে আমার বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। বৎসর পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটীরের সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।"

রা। "একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বোধ হয়, সে রথের দিন নিরাশ্রয়ে, বৃষ্টি বাদলে, আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন?"

রু। "অধিকক্ষণ নহে। আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম, তাহা দেখিবার জন্য রাধারাণী আলো জ্বালিতে গেল—আমি সেই অবসরে তাহার বস্ত্র কিনিতে চলিয়া আসিলাম।"

রা। "আর কি দিয়া আসিলেন?"

রু। "আর কি দিব? একখানি ক্ষুদ্র নোট ছিল, তাহা কুটীরে রাখিয়া আসিলাম।"

রা। "নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই। তাহারা মনে করিতে পারে, আপনি নোটখানি হারাইয়া গিয়াছে।"

রু। "না, আমি পেন্‌সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, 'রাধারাণীর জন্য'। তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম 'রুক্মিণীকুমার রায়'। যদি সেই রুক্মিণীকুমারকে সেই রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকে, এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

রা। “তাই বলিতেছিলাম, আপনাকে দয়ার্দ্রচিত্ত বলিয়া বোধ হয় না। যে রাধারাণী আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য—” একটুকু বলিতেই—আ ছি ছি রাধারাণী! ফুলের কুঁড়ির ভিতর যেমন বৃষ্টির জল ভরা থাকে, ফুলটি নীচু করিলেই ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া যায়, রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই, তাহার চোখের জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। অমনই যে দিকে রুক্মিণীকুমার ছিলেন, সেই দিকের মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া সে ঘর হইতে রাধারাণী বাহির হইয়া গেলেন। রুক্মিণীকুমার বোধ হয়, চক্ষের জলটুকু দেখিতে পান নাই, কি পাইয়াই থাকিবেন, বলা যায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া, মুখে চক্ষে জল দিয়া অশ্রুচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া, রাধারাণী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, “ইনিই ত রুক্মিণীকুমার। আমিও সেই রাধারাণী। দুই জনে দুই জনের জন্য মন তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন উপায়? আমি যে রাধারাণী, তা উঁহাকে বিশ্বাস করাইতে পারি—তার পর? উনি কি জাতি, তা কে জানে। জাতিটা এখনই জানিতে পারা যায়। কিন্তু উনি যদি আমার জাতি না হন! তবে ধর্ম্মবন্ধন ঘটিবে না, চিরন্তনের যে বন্ধন, তাহা ঘটিবে না, প্রাণের বন্ধন ঘটিবে না। তবে আর উঁহার সঙ্গে কথায় কাজ কি? না হয় এ জন্মটা রুক্মিণীকুমার নাম জপ করিয়া কাটাইব। এত দিন সেই জপ করিয়া কাটাইয়াছি. জোয়ারের প্রথম বেগটা কাটিয়া গিয়াছে—বাকি কাল কাটিবে না কি?”

এই ভাবিতে ভাবিতে রাধারাণীর আবার নাকের পাটা ফাঁপিয়া উঠিল, ঠোঁট দুখানা ফুলিয়া উঠিল—আবার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আবার তিনি জল দিয়া মুখ চোখ ধুইয়া টোয়ালিয়া দিয়া মুছিয়া ঠিক হইয়া আসিলেন। রাধারাণী আবার ভাবিতে লাগিলেন,—“আচ্ছা! যদি আমার জাতিই হন, তা হলেই বা ভরসা কি? উনি ত দেখিতেছি বয়ঃপ্রাপ্ত—কুমার, এমন সম্ভাবনা কি? তা হলেনই বা বিবাহিত? না! না! তা হইবে না। নাম জপ করিয়া মরি, সে অনেক ভাল—সতীন সহিতে পারিব না।

“তবে এখন কর্ত্তব্য কি? জাতির কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই কি হইবে? তবে রাধারাণীর পরিচয়টা দিই। আর উনি কে, তাহা জানিয়া লই; কেন না,

রুক্মিণীকুমার ত ওঁর নাম নয়—তা ত শুনিলাম। যে নাম জপ করিয়া মরিতে হইবে, তা শুনিয়া লই। তার পর বিদায় দিয়া কাঁদিতে বসি। আ পোড়ারমুখী বসন্ত! না বুঝিয়া, না জানিয়া এ সামগ্রী কেন পাঠাইলি? জানিস্ না কি, এ জীবনসমুদ্র অমন করিয়া মন্থন করিতে গেলে, কাহারও কপালে অমৃত, কাহারও কপালে গরল উঠে!

"আচ্ছা! পরিচয়টা ত দিই।" এই ভাবিয়া রাধারাণী, যাহা প্রাণের অধিক যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বাহির করিয়া আনিলেন। সে সেই নোটখানি। বলিয়াছি, রাধারাণী তাহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। রাধারাণী তাহা আঁচলে বাঁধিলেন। বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতে লাগিলেন—

"আচ্ছা, যদি মনের বাসনা পূরিবার মতনই হয়? তবে শেষ কথাটা কে বলিবে?" এই ভাবিয়া রাধারাণী আপনা আপনি হাসিয়া কুটপাট হইলেন। "আঃ, ছি-ছি-ছি! তা ত আমি পারিব না। বসন্তকে যদি আনাইতাম! ভাল, উঁহাকে এখন ছদিন বসাইয়া রাখিয়া বসন্তকে আনাইতে পারিব না? উনি না হয় সে দুই দিন আমার লাইব্রেরি হইতে বহি লইয়া পড়ুন না। পড়াশুনা করেন না কি? ওঁরই জন্য ত লাইব্রেরি করিয়া রাখিয়াছি। তা যদি দুই দিন থাকিতে রাজি না হন? উঁহার যদি কাজ থাকে? তবে কি হবে? ওঁতে আমাতেই সে কথাটা কি হবে? ক্ষতি কি, ইংরেজের মেয়ের কি হয়? আমাদের দেশে তাতে নিন্দা আছে, তা আমি দেশের লোকের নিন্দার ভয়ে কোন্ কাজটাই করি? এই যে উনিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি বিয়ে করলেম না, এতে কে না কি বলে? আমি ত বুড়া বয়স পর্য্যন্ত কুমারী;—তা এ কাজটাও না হয় ইংরেজের মেয়ের মত হইল।"

তার পর রাধারাণী বিষণ্ণ মনে ভাবিলেন, "তা যেন হলো; তাতেও বড় গোল! মমবাতিতে গড়া মেয়েদের মাঝখানে প্রথাটা এই যে, পুরুষ মানুষেই কথাটা পাড়িবে। ইনি যদি কথাটা না পাড়েন? না পাড়েন, তবে—তবে হে ভগবান্! বলিয়া দাও, কি করিব! লজ্জাও তুমি গড়িয়াছ—যে আগুনে আমি পুড়িতেছি, তাহাও তুমি গড়িয়াছ! এ আগুনে সে লজ্জা কি পুড়িবে না? তুমি এই সহায়হীনা, অনাথাকে দয়া করিয়া পবিত্রতার আবরণে আমাকে আবৃত করিয়া লজ্জার আবরণ কাড়িয়া লও। তোমার কৃপায় যেন আমি এক দণ্ডের জন্য মুখরা হই।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভগবান্ বুঝি, সে কথাও শুনিলেন। বিশুদ্ধচিত্তে যাহা বলিবে, তাহাই বুঝি তিনি শুনেন। রাধারাণী মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে, গজেন্দ্রগমনে রুক্মিণী-কুমারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রুক্মিণীকুমার তখন বলিলেন, "আপনি আমাকে বিদায় দিয়াও যান নাই, আমি যে কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি, তাহাও জানিতে পারি নাই। তাই এখনও যাই নাই।"

রা। "আপনি রাধারাণীর জন্য আসিয়াছেন, তাহা আমারও মনে আছে। এ বাড়ীতে একজন রাধারাণী আছে, সত্য বটে। সে আপনার নিকট পরিচিত হইবে কি না, সেই কথাটা ঠিক করিতে গিয়াছিলাম।

রু। "তার পর ?"

রাধারাণী তখন অল্প একটু হাসিয়া, একবার আপনার পার দিকে চাহিয়া, আপনার হাতের অলঙ্কার খুঁটিয়া, সেই ঘরে বসান একটা প্রস্তরনির্ম্মিত Niobe প্রতিকৃতি পানে চাহিয়া রুক্মিণীকুমারের পানে না চাহিয়া, বলিলেন— "আপনি বলিয়াছেন, রুক্মিণীকুমার আপনার যথার্থ নাম নহে। রাধারাণীর যে আরাধ্য দেবতা, তাহার নাম পর্য্যন্ত এখনও সে শুনিতে পায় নাই।"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আরাধ্য দেবতা ! কে বলিল ?"

রাধারাণী কথাটা অনবধানে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখন সামলাইতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "নাম ঐরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।"

কি বোকা মেয়ে।

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।"

রাধারাণী গুপ্তভাবে দুই হাত যুক্ত করিয়া মনে মনে ডাকিলেন, "জয় জগদীশ্বর ! তোমার কৃপা অনন্ত।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের নাম শুনিয়াছি।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "অমন সকলেই রাজা কব্‌লায়। আমাকে যে কুমার বলে, সে যথেষ্ট সম্মান করে।"

রা। "এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল। জানিলাম যে, আপনি আমার

স্বজাতি। এখন স্পর্দ্ধা হইতেছে, আজি আপনাকে আমার আতিথ্য স্বীকার করাই।"

দে। "সে কথা পরে হবে। রাধারাণী কৈ?"

রা। "ভোজনের পর সে কথা বলিব।"

দে। "মনে দুঃখ থাকিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না।"

রা। "রাধারাণীর জন্য এত দুঃখ? কেন?"

দে। "তা জানি না, বড় দুঃখ—আট বৎসরের দুঃখ তা জানি!"

রা। "হঠাৎ রাধারাণীর পরিচয় দিতে আমার কিছু সঙ্কোচ হইতেছে। আপনি রাধারাণীকে পাইলে কি করিবেন?"

দে। "কি আর করিব? একবার দেখিব।"

রা। "একবার দেখিবার জন্য এই আট বৎসর এত কাতর?"

দে। "রকম রকমের মানুষ থাকে।"

রা। "আচ্ছা, আমি ভোজনের পর আপনাকে আপনার রাধারাণী দেখাইব। ঐ বড় আয়না দেখিতেছেন; উহার ভিতর দেখাইব। চাক্ষুষ দেখিতে পাইবেন না।"

দে। "চাক্ষুষ সাক্ষাতেই বা কি আপত্তি? আমি যে আট বৎসর কাতর।"

ভিতরে ভিতরে দুই জনে দুই জনকে বুঝিতেছেন কি না জানি না, কিন্তু কথাবার্ত্তা এইরূপ হইতে লাগিল। রাধারাণী বলিতে লাগিলেন, "সে কথাটায় তত বিশ্বাস হয় না। আপনি আট বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাহার বয়স কত?"

দে। "এগার হইবে।"

রা। "এগার বৎসরের বালিকার উপর এত অনুরাগ?"

দে। "হয় না কি?"

রা। "কখনও শুনি নাই।"

দে। "তবে মনে করুন কৌতূহল!"

রা। "সে আবার কি?"

দে। "শুধুই দেখিবার ইচ্ছা।"

রা। "তা, দেখাইব, ঐ বড় আয়নার ভিতর। আপনি বাহিরে থাকিবেন।"

দে। "কেন সম্মুখ সাক্ষাতে আপত্তি কি ?"

রা। "সে কুলের কুলবতী।"

দে। "আপনিও ত তাই।"

রা। "আমার কিছু বিষয় আছে। নিজে তাহার তত্ত্বাবধান করি। স্থতরাং সকলের সমুখেই আমাকে বাহির হইতে হয়। আমি কাহারও অধীন নই। সে তাহার স্বামীর অধীন, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত—"

দে। "স্বামী !"

রা। "হাঁ। আশ্চর্য্য হইলেন কেন ?"

দে। "বিবাহিতা !"

রা। "হিন্দুর মেয়ে—উনিশ বৎসর বয়স—বিবাহিতা নহে ?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া রহিলেন। রাধারাণী বলিলেন, "কেন, আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ?"

দে। "মানুষ কি না ইচ্ছা করে ?"

রা। "এরূপ ইচ্ছা রাণীজি জানিতে পারিয়াছেন কি ?"

দে। "রাণীজি কেহ ইহার ভিতরে নাই। রাধারাণী-সাক্ষাতের অনেক পূর্ব্বেই আমার পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে।"

রাধারাণী আবার যুক্তকরে ডাকিলেন, "জয় জগদীশ্বর! আর ক্ষণকাল যেন আমার এমনই সাহস থাকে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তা শুনিলেন ত, রাধারাণী পরস্ত্রী। এখনও কি তাহার দর্শন অভিলাষ করেন ?"

দে। "করি বৈ কি।"

রা। "সে কথাটা কি আপনার যোগ্য ?"

দে। "রাধারাণী আমার সন্ধান করিয়াছিল কেন, তাহা এখনও আমার জানা হয় নাই।"

রা। "আপনি রাধারাণীকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করিবে বলিয়া। আপনি শোধ লইবেন কি ?"

দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "যা দিয়াছি, তাহা পাইলে লইতে পারি।"

রা। "কি কি দিয়াছেন ?"

দে। "একখানা নোট।"

রা। "এই নিন।"

বলিয়া রাধারাণী আঁচল হইতে সেই নোটখানি খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের হাতে দিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন, তাঁহার হাতে লেখা রাধারাণীর নাম সে নোটে আছে। দেখিয়া বলিলেন, "এ নোট কি রাধারাণীর স্বামী কখনও দেখিয়াছেন?"

রা। "রাধারাণী কুমারী। স্বামীর কথাটা আপনাকে মিথ্যা বলিয়াছিলাম।"

দে। "তা, সব ত শোধ হইল না।"

রা। "আর কি বাকি?"

দে। "দুইটা টাকা আর কাপড়।"

রা। "সব ঋণ যদি এখন পরিশোধ হয়, তবে আপনি আহার না করিয়া চলিয়া যাইবেন। পাওনা বুঝিয়া পাইলে কোন মহাজন্ বসে? ঋণের সে অংশ ভোজনের পর রাধারাণী পরিশোধ করিবে।"

দে। "আমার যে এখনও অনেক পাওনা বাকি।"

রা। "আবার কি?"

দে। "রাধারাণীকে মনঃপ্রাণ দিয়াছি—তা ত পাই নাই।"

রা। "অনেক দিন পাইয়াছেন। রাধারাণীর মনঃপ্রাণ আপনি অনেক দিন লইয়াছেন—তা সে দেনাটা শোধ-বোধ গিয়াছে।"

দে। "সুদ কিছু পাই না?"

রা। "পাইবেন বৈ কি।"

দে। "কি পাইব?"

রা। "শুভ লগ্নে সুতহিবুক যোগে এই অধম নারীদেহ আপনাকে দিয়া, রাধারাণী ঋণ হইতে মুক্ত হইবেন।"

এই বলিয়া রাধারাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ানজি আসিয়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে বহির্ব্বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। যথাবিহিত সময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধারাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে রাধারাণী বলিলেন, "আপনার নগদ দুইটা টাকা ও কাপড় এখনও ধারি। কাপড় পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি;

টাকা খরচ করিয়াছি। তাহা আর ফেরত দিবার যো নাই। তাহার বদলে যাহা আপনার জন্য রাখিয়াছি, তাহা গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া রাধারাণী বহুমূল হীরকহার বাহির করিয়া দেবেন্দ্রের গলায় পরাইয়া দিতে গেলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যদি ঐরূপে দেনা পরিশোধ করিবে, তবে তোমার গলায় যে ছড়া আছে, তাহাই লইব।"

রাধারাণী হাসিতে হাসিতে আপনার গলার হার খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইলেন। তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সব শোধ হইল—কিন্তু আমি একটু ঋণী রহিলাম।"

রা। "কিসে ?"

দে। "সেই দুই পয়সার ফুলের মালার মূল্য ত ফেরত পাইলাম। তবে এখন মালা ফেরত দিতে আমি বাধ্য।"

রাধারাণী হাসিলেন।

দেবেন্দ্রনারায়ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মুক্তাহার পরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা রাধারাণীর কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই ফেরত দিলাম।"

এমন সময়ে পোঁ করিয়া শাঁক বাজিল।

রাধারাণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাঁক বাজাইল কে ?"

তাহার একজন দাসী, চিত্রা উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমি।"

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাজাইলি ?"

চিত্রা বলিল, "কিছু পাইব বলিয়া।"

বলা বাহুল্য যে, চিত্রা পুরস্কৃত হইল। কিন্তু তাহার কথাটা মিথ্যা। রাধারাণী তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া দ্বারের নিকট বসাইয়া আসিয়াছিলেন।

তার পরে দুই জনে বিরলে বসিয়া মনের কথা কহিলেন। রাধারাণী দেবেন্দ্রনারায়ণের বিস্ময় দূর করিবার জন্য, সেই রথের দিনের সাক্ষাতের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার পিতামহের বিষয়সম্পত্তির কথা, পিতামহের উইল লইয়া মোকদ্দমার কথা, তজ্জন্য রাধারাণীর মার দৈন্যের কথা, মার মৃত্যুর কথা, কামাখ্যা বাবুর আশ্রয়ের কথা, প্রিবি কৌন্সিলের ডিক্রীর কথা, কামাখ্যা বাবুর মৃত্যুর কথা সব বলিলেন। বসন্তের কথা বলিলেন, আপনার বিজ্ঞাপনের কথা বলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে, হাসিতে হাসিতে, বৃষ্টি বিদ্যুতে, চাতকী চিরসঞ্চিত প্রণয়সম্ভাষণপিপাসা পরিতৃপ্ত করিলেন। নিদাঘসন্তপ্ত পর্ব্বত

যেমন বর্ষার বারিধারা পাইয়া শীতল হয়, দেবেন্দ্রনারায়ণও তেমনি শীতল হইলেন।

তিনি রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ত কেহ নাই। কিন্তু এ বাড়ী বড় জনাকীর্ণ দেখিতেছি।"

রাধারাণী বলিলেন, "দুঃখের দিনে আমার কেহ ছিল না। এখন আমার অনেক আত্মীয় কুটুম্ব জুটিয়াছে। আমি এ অল্প বয়সে একা থাকিতে পারি না, এ জন্য যত্ন করিয়া তাহাদিগকে স্থান দিয়া রাখিয়াছি।"

দে। "তাঁহাদের মধ্যে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট কেহ আছে যে, তোমাকে এই দীনদরিদ্রকে দান করিতে পারে?"

রা। "তাও আছে।"

দে। "তবে তিনি কেন সেই শুভলগ্নযুক্ত সুতহিবুক যোগটা খুঁজুন না?"

রা। "বোধ করি, এতক্ষণ সে কাজটা হইয়া গেল। তোমার সঙ্গে রাধারাণীর এরূপ সাক্ষাৎ অন্য কোন কারণে হইতে পারে না, এ পুরীতে সকলেই জানে। সংবাদ লইব কি?"

দে। "বিলম্বে কাজ কি?"

রাধারাণী ডাকিলেন, "চিত্রে!" চিত্রা আসিল। রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিন টিন কিছু হইল কি?"

চিত্রা বলিল, "হাঁ দেওয়ানজি মহাশয় পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইয়াছিলেন। পুরোহিত পর দিন বিবাহের উত্তম দিন বলিয়া গিয়াছেন। দেওয়ানজি মহাশয় সমস্ত উদ্যোগ করিতেছেন।"

তখন বসন্ত আসিল, কামাখ্যা বাবুর পুত্রেরা এবং পরিবারবর্গ সকলেই আসিল, আর যত বসন্তের কোকিল, সময়ের বন্ধু, যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিল। দেবেন্দ্রনারায়ণের বন্ধু ও অনুচর-বর্গ সকলেই আসিল।

বসন্ত আসিলে রাধারাণী বলিলেন, "তোমার কি আক্কেল ভাই বসন্ত?"

বসন্ত বলিল, "কি আক্কেল ভাই রাধারাণী?"

রা। "যাকে তাকে তুমি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দাও কেন?"

বসন্ত। "কেন, লোকটা কি করেছে বল দেখি?"

রাধারাণী তখন সকল বলিলেন। বসন্ত বলিল, "রাগের কথা ত বটে। শুদ্ধ

শুদ্ধ দেনা পাওনা বুঝিয়া নেয়, এমন মহাজনকে যে বাড়ী চিনাইয়া দেয়, তার উপর রাগের কথাটা বটে।"

রাধারাণী বলিলেন, "তাই আজ আমি তোর গলায় দড়ি দিব।"

এই বলিয়া রাধারাণী যে হীরকহার রুক্মিণীকুমারকে পরাইতে গিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন।

তার পর শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ হইয়া গেল।

'বঙ্গদর্শন' : ১২৮২

হঠাৎ অবতার

কালীপ্রসন্ন সিংহ

বাবু পদ্মলোচন ওর্‌ফে হঠাৎ অবতার ১১১২ সালে তাঁর মাতামহ নাউপাড়া-মুষুলীর মিত্তিরদের বাড়ি জন্মগ্রহণ করেন। নাউপাড়ামুষুলী গ্রামখানি মন্দ নয় অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস আছে; গাঁয়ের জমিদার মজফ্‌ফর খাঁ, মোছলমান হয়েও গরু জবাই প্রভৃতি দুষ্কর্মে বিরত ছিলেন, মোল্লা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখতেন—মানীর মান রাখতেন ও লোকের খাতির ও সেলামাম্বীর গুণা কত্তেন না, ফারসীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাঙ্গলা ও উর্দ্দুতেও তাঁর দখল ছিল; মজফ্‌ফর খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন বটে কিন্তু ধোপা নাপিত বন্ধ করা, হুঁকা মারা, ঢ্যালা ফ্যালা ও বিয়ে ভাটির হুকুম হাকাম ও নিষ্পত্তি করার ভার মিত্তির বাবুদের ওপরই দেওয়া হয়। পূর্ব্বে মিত্তির বাবুদের বড় জলজলাট ছিল, মধ্যে পরিবারের অনেকে মরে যাওয়ায় ভাগা ভাগা ও বহু গুষ্টি নিবন্ধন কিঞ্চিৎ দৈন্যদশায় পড়তে হয়েছিল কিন্তু নিঃস্বত্ব হয়েও গ্রামস্থ লোকেদের কাছে মনের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি।

পদ্মলোচনের জন্মদিনটি সামান্য লোকের জন্মদিনের মত অমনি যায় নি, সে দিন—হঠাৎ মেঘাড়ম্বর করে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়—একটি সাপ আঁতুড়ঘরের দরজায় সমস্ত রাত্তির বসে ফোঁস ফোঁস করে, আর বাড়ির একটি

পোষা টিয়েপাখি হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে, পদ্মলোচনের পিতামহী এ সকল লক্ষণ শুভ নিমিত্ত বিবেচনা করে বড়ই খুসি হয়ে আপনার পরবার একখানি লালপেড়ে সাড়ি দাইকে বকসিস দ্যান, অভ্যাগত ঢুলী ও বাজন্দরেরাও একটি সিকি আর এক হাঁড়ি নারকেলনাড়ু পেয়েছিল। ক্রমে মহা আনন্দে আটকৌড়ে সারা হলো, গাঁয়ের ছেলেরা "আটকৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে আছে ভাল; ছেলেরা বাবার দাড়িতে বসে হাগ" বলে কুলো বাজিয়ে ফুটকড়াই, বাতাসা ও এক এক চক্‌চকে পয়সা নিয়ে আনন্দে বিদেয় হলো। গোভাগাড় থেকে একটা মরা গরুর মাথা কুড়িয়ে এনে আঁতুড়ঘরের দরজায় রেখে "দোরষষ্ঠী" বলে হলুদ ও দূর্ব্বো দিয়ে পূজো করা হলো। ক্রমে ১৫ দিন ২০ দিন এক মাস সম্পূর্ণ হলে গাঁয়ের পঞ্চানন্দতলায় ষষ্ঠীর পূজো দিয়ে আঁতুড় ওঠানো হয়।

ক্রমে পদ্মলোচন তিথিগত চাঁদের মতন বাড়তে লাগলেন। গুলিডাণ্ডা, কপাটি কপাটি, চোর চোর, তেলী হাত পিছলে গেলি প্রভৃতি খেলায় পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়লেন। পাঁচ বছরে হাতে খড়ি হলো, গুরুমশায়ের ভয়ে পদ্মলোচন পুকুরপাড়ে, নলবনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন, পেট কামড়ানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি অন্তঃশিলে রোগেরও অভাব রইলো না; ক্রমে কিছুদিন এই রকমে যায়, এক দিন পদ্মলোচনের বাপ মলেন, তাঁর মা আগুন খেয়ে গেলেন, ক্রমে মাতামহ, মামা ও মামাতো ভেয়েরাও একে একে অকালে ও সময়ে সল্লেন সুতরাং মাতামহ মিত্তিরদের ভিটে পুরুষশূন্য প্রায় হলো; জমিজমাগুলি জয়কৃষ্ণের মত জমিদারে কতক গিলে ফেল্লে, কতক খাজনা না দেওয়ায় বিকিয়ে গেল, সুতরাং পদ্মলোচনকে অতি অল্প বয়সে পেটের জন্যে অদৃষ্ট ও হাতযশের ওপর নির্ভর কত্তে হলো। পদ্মলোচন কল্‌কেতায় এসে এক বাঁসাড়েদের বাসায় পেটভাতে ফাই ফরমাস্‌, কাপড় কোঁচানো ও লুচি ভাজা প্রভৃতি কর্ম্মে ভর্ত্তি হলেন,—অবকাশ মত হাতটাও পাকান হবে—বিশেষতঃ কুঠেলরা লেখাপড়া শেখাবেন প্রতিশ্রুত হলেন।

পদ্মলোচন কিছুকাল ঐ নিয়মে বাঁসাড়েদের মনোরঞ্জন কত্তে লাগলেন; ক্রমে দু' এক বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মাথালো মাথালো জায়গায় উমেদারি আরম্ভ কল্লেন। সহরের যে বড়মানুষের বৈঠকখানায় যাবেন প্রায় সর্ব্বত্রই লোকারণ্য দেখতে পাবেন, যদি ভিতরকার খবর নেন তা হলে

পাওনাদার, মহাজন, উঠ্‌নোওয়ালা, দোকানদার, উমেদার, আইবুড়ো ও বেকার কুলীনের ছেলেই বিস্তর দেখ্‌তে পাবেন—পদ্মলোচনও সেই ভিড়ের মধ্যে একটি বাড়লেন; ক্রমে অষ্ট প্রহর ঘণ্টার গরুড়ের মত উমেদারিতে অনবরত এক বৎসর হাঁটাহাঁটি ও হাজ্‌রের পর দু' চারখানা সই সুপারিস্‌ও হস্তগত হলো; শেষে এক সদয়হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হউসে একটি ওজোন সরকারী কর্ম্ম দিলেন।

পদ্মলোচন কষ্টভোগের একশেষ করেছিলেন, ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও কাপড় কোঁচান, লুচি ভাজা, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি অপকৃষ্ট কাজ স্বীকার কত্তে হয়েছিল, ক্রমশ লুচি ভাজতে ভাজতে ক্রমে লুচিভাজায় তিনি এমনি তৈরি হয়ে উঠলেন যে, তাঁর মত লুচি অনেক ঘটক ও মেঠাইওয়ালা বামুনেও ভাজতে পাত্তো না। বাঁসাড়েরা খুসি হয়ে তাঁরে "মেকর" খেতাব দেয়, সুতরাং সেই দিন থেকে তিনি মেকর পদ্মলোচন দত্ত নামে বিখ্যাত হলেন।

ভাষাকথায় বলে "যখন যার কপাল ধরে মুত্তে বসে……" যখন পড়্‌তা পড়তে আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধল্লে সোনামুটো হয়ে যায়। ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফল্‌তে আরম্ভ হলো—মুচ্ছুদ্দী অনুগ্রহ করে সিপ-সরকারী কর্ম্ম দিলেন। সায়েবরাও দত্তজার চালাকি ও কাজের হুঁসিয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগলেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবদের সন্তুষ্ট করবার অবসর খুঁজতে লাগলেন—একমনে সেবা কল্লে ভয়ঙ্কর সাপও সদয় হয়, পুরাণে পাওয়া যায় যে তপস্যা করে অনেকে হিন্দুদের ভূতের মত ভয়ানক দেবতাগুলোকেও প্রসন্ন করেচে। ক্রমে সায়েবরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাল করবার চেষ্টায় রইলেন; একদিন হউসের সদরমেট কর্ম্মে জবাব দিলে—সায়েবরা মুচ্ছুদ্দীকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্ম্মে ভর্ত্তি কল্লেন।

পদ্মলোচন সিপসরকার হয়েও বাঁসাড়েদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নি, কিন্তু সদরমেট হয়ে সেখানে থাকা আর ভাল দেখায় না বলেই অন্যত্র একটু জায়গা ভাড়া করে নিয়ে একটি খোলার ঘর প্রস্তুত করে রইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরে অধিক দিন থাকৃতে হলো না। তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচির ফোস্‌কার মত ফুলে উঠ্‌লো—বের জল পেলে কনেরা যেমন ফেঁপে ওঠে, তিনিও তেমনি ফাঁপতে লাগলেন। ক্রমে মুচ্ছুদ্দীর সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না

হওয়ায় মুচ্ছুদ্দী কর্ম্ম ছেড়ে দিলেন, সুতরাং সায়েবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন বিনা টাকায় মুচ্ছুদ্দী হলেন।

টাকায় সকলই করে! পদ্মলোচন মুচ্ছুদ্দী হবামাত্র অবস্থার পরিবর্ত্তন বুজতে পাল্লেন, তার পরদিন সকালে সেই খোলার ঘর বালাখানাকে ভ্যাংচাতে লাগলো—উমেদার, দালাল, প্যায়দা, গদিওয়ালা ও পাইকেরে ভরে গ্যালো, কেউ পদ্মলোচন বাবুকে নমস্কার করে হাঁটু গেড়ে জোড়হাত করে কথা কয়, কেউ "আপনার সোনায় দোত কলম হোক" "লক্ষপতি হোন" "সম্বৎসরের মধ্যে পুত্তুর সন্তান হোক" "অনুগতের হুজুর ভিন্ন গতি নাই" প্রভৃতি কথায় পদ্মলোচনকে তুঁহুলে পাঁউরুটি হতেও ফোলাতে লাগলেন—ক্রমে দুরবস্থা ভুকুরে লোচ্চার মত মুখে কাপড় দিয়ে সুকুলেন—অভিমান ও অহঙ্কারে ভূষিত হয়ে সৌভাগ্যযুবতী বারাঙ্গনা সেজে তাঁরে আলিঙ্গন কল্লেন; হুজুকদারেরা আজকাল "পদ্মলোচনকে পায় কে" বলে ঢ্যাড্‌রা পিটে দিলেন, প্রতিধ্বনি—রেও রামুন, অগ্রদানী ও গাইয়ে বাজিয়ে সেজে এই কথাটি সর্ব্বত্র ঘোষণা করে বেড়াতে লাগলেন—সহরে ঢিঢি হয়ে গেল—পদ্মলোচন এক জন মস্ত লোক।

কলকাত সহরে কতকগুলি বেকার "জয়কেতু" আছেন, যখন যার নতুন বোলবালাও হয় তখন তাঁরা সেইখানে মেশেন, তাঁকেই জাতের শ্রেষ্ঠ দেখেন ও অনন্যমনে তাঁরই উপাসনা করেন; আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উঁচু হয়ে পড়েন তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উঁচুর দলে জমেন; আমরা ছেলেবেলা বুড়ো ঠাকুরমার কাছে "ছাঁদন দড়ি ও গোদা বাড়ির" গল্প শুনেছিলাম, এই মহা-পুরুষরা ঠিক সেই ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি। গল্পে আছে, "রাজপুত্তুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি! এখন তুমি কার?"—"না আমি যখন যার তখন তার!" তেমনি হুতোম প্যাঁচা বলেন সহুরে জয়কেতুরাও "যখন যার তখন তার"!!!

জয়কেতুরা ভদ্রলোকের ছেলে, অনেকে লেখাপড়াও জানেন, তবে কেউ কেউ মূর্ত্তিমতী মা! এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বামুন, কায়স্থ কুলীন বেকার পেনস্থনে ও ব্রোকদই বিস্তর। বহু কালের পর পদ্মলোচন বাবু কলকেতা সহরে বাবু বলে বিখ্যাত হন, প্রায় বিশ বৎসর হলো সহরের "হঠাৎ বাবুর" উপসংহার হয়ে যায় তন্নিবন্ধন "জয়কেতু" "মোসাহেব" "ওস্তাদজী" "ভড়জা" "ঘোষজা" "বোসজা" প্রভৃতি বরাখুরেরা জোয়ারের বিষ্ঠার মত

ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন, সুতরাং এখন পদ্মলোচনের "তর্পণের কোষায়" জুড়োবার জায়গা পেলেন!

জয়কেতুরা ক্রমে পদ্মলোচনকে ফাঁপিয়ে তুল্লেন, পড়্‌তাও ভালো চল্লো—পদ্মলোচন অ্যাম্বিশনের দাস হলেন, হিতাহিত বিবেচনা দেনদার বাবুদের মত গাঢাকা হলেন। পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে সংসার রঙ্গ-ভূমিতে নাবলেন—ব্রাহ্মণের পাদ্‌ধুলো খান—পা চাটেন—দলাদলির ও হিন্দু ধর্ম্মের ঘোঁট করেন—ঠাকুরুণ বিষয় ও সখীসম্বাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্লটিং পেপার; পদ্মলোচনের জোরদণ্ডপ্রতাপ! বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না, মিউটিনির সময় গবর্মেণ্ট যেমন দোচোকোব্রত ভলন্‌টিয়ার জুটিয়ে-ছিলেন, পদ্মলোচন বাবু হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংগ্রহ কত্তে বাকি রাখলেন না, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মের মত বিবিধ আশ্চর্য্য জীব একত্র কল্লেন—বেশীর ভাগ জ্যান্ত!!!

বাঙ্গালি বদমায়েস ও দুর্ব্বুদ্ধির হাতে টাকা না থাকলে সংসারের কিছু মাত্র ক্ষতি কত্তে পারে না, বদমায়িসী ও টাকা একত্র হলে হাতা পর্য্যন্ত মারা পড়ে, সেটি বড় সোজা কথা নয়, শিবকেষ্টো বাঁড়ুজ্যে পর্য্যন্ত যাতে মারা যান! পদ্মলোচনও পাঁচজন কুলোকের পরামর্শে বদমায়িসী আরম্ভ কল্লেন—পৃথিবীর লোকের নিন্দা করা, খোঁটা দেওয়া ও টিট্‌কারি করা তাঁর কাজ হলো, ক্রমে তাতেই তিনি এমনি চোড়ে উঠলেন যে, শেষে আপনাকে আপনি অবতার বলে বিবেচনা কত্তে লাগলেন; পরিষদেরা অবতার বলে তাঁরে স্তব কত্তে লাগলো, বাজে লোকে "হঠাৎ অবতার" খেতাব দিলে—দর্শক ভদ্দর লোকেরা এই সকল দেখে শুনে অবাক্ হয়ে ক্ল্যাপ দিতে লাগলেন!

পদ্মলোচন যথার্থই মনে মনে ঠাউরেছিলেন যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নন, হয় হরি নয় পীর কিম্বা ইহুদীদের ভাবী মেসায়া—তারই সফল ও সার্থকতার জন্য পদ্মলোচন বুজরুকি পর্য্যন্ত দেখাতে ত্রুটি করেন নাই।

বিলাতী জুজেস্ ক্রাইষ্ট—এক টুক্‌রো রুটিতে এক শ লোক খাইয়েছিলেন—কাণা ও খোঁড়া ফুঁয়ে ভাল কত্তেন। হিন্দুমতের কেষ্টও পূতনা বধ, শকট ভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করেছিলেন। পদ্মলোচন আপনারে অবতার বলে মানাবার জন্য সহরে হুজুক তুলে দিলেন যে, "তিনি এক দিন বারো জনের খাবার জিনিসে এক শ লোক খাইয়ে দিলেন"; কাণা খোঁড়ারা

সর্ব্বদাই হাতা বেড়ির ধ্বজবজ্রাঙ্কুশযুক্ত পদ্মহস্ত পাবার প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন, বুড়ী বুড়ী মাগীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে নিয়ে "হাতবুলানো" পাইয়ে আনে—প্রভৃতি নানাবিধ বুজরুকি প্রকাশ কত্তে লাগলেন। এই সকল শুনে চতুষ্পাঠীওয়ালা মহাপুরুষরা মড়কের মত নাচতে লাগলেন—টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কেঁপে ওঠেন,—অন্যের কি কথা। ময়রার দোকানে যত রকমারি মাছি, বসন্তি বোল্‌তা আর ভোঁভূঁয়ে ভোমরা দেখা যায়, বইয়ের দোকানে তার কটা থাকে—সেথায় পদার্থহীন উই পোকারা—আন্‌সাড়ে আরসুলোর দল, আর দু' একটা গোড়িমওয়ালা ফচ্‌কে নেংটি ইঁদুর মাত্র!

হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও তত হয় না; "হঠাৎ অবতার" হয়েও পদ্মলোচনের আশা নিবৃত্তি হয় নাই—বাদসাই পেলেই যে সে আশা নিবৃত্তি হবে তারও সম্ভাবনা কি! কিছুদিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা সহরের এক জন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুল্লে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচ্‌লে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে! ওরে! ওরে! হুজুর ও "যো হুকুমের" হল্লা পড়ে গেল, ক্রমে সহরের বড় দলে খপর হলো যে কলকাতার ন্যাচ্‌র্যাল হিষ্ট্রীর দলে একটি নম্বরে বাড়লো!

ক্রমে পদ্মলোচন নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কত্তে লাগলেন, অবস্থার উপযুক্ত একটি নতুন বাড়ি কিন্‌লেন, সহরের বড়মানুষ হলে যে সকল জিনিসপত্র ও উপাদানের আবশ্যক, সভাস্থ আত্মীয় ও মোসাহেবেরা ক্রমশঃ সেই সকল জিনিস সংগ্রহ করে ভাণ্ডার ও উদর পূরে ফেল্লেন, বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে স্থবর্ণ বর্ষে) একটি রাঁড়ও রাখলেন।

বেশ্যাবাজিটি আজকাল এ সহরে বাহাদুরির কাজ ও বড়মানুষের এলবাত পোশাকের মধ্যে গণ্য, অনেক বড়মানুষ বহু কাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনিমেণ্টের মত তাঁদের স্মরণার্থে রয়েচে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয় নি, যা দেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে। কলকেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা রাজ্‌ড়ারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দেখেন না, বাড়ির প্রধান আম্‌লা দাওয়ান মুচ্ছুদ্দীরা যেমন হুজুরদের হয়ে বিষয় কর্ম্ম দেখেন—

স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইনমত অর্শায়, সুতরাং তাঁরা ছাড়বেন কেন! এই ভয়ে কোন বুদ্ধিমান্ স্ত্রীকে বাড়ির ভিতরের ঘরে পুরে চাবি বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারারাত্রি রাঁড় নিয়ে আমোদ করেন, তোপ পড়ে গেলে ফর্‌সা হবার পূর্ব্বে গাড়ি বা পালকি করে বিবি সাহেব বিদায় হন—বাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে শয়ন করেন—স্ত্রীও চাবি হতে পরিত্রাণ পান। ছোক্‌রা গোছের কোন কোন বাবুরা বাপ মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে একজন চাকর বা বেয়ারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান, চাকর দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাকে, স্ত্রী তুলসীপাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন, মধ্যরাত্তির কেটে গেলে বাবু আমোদ লুটে ফেরেন ও বাড়িতে এলে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় ঘা মারেন, চাকর উঠে দরজা খুলে দিয়ে বাইরে যায়, বাবু শয়ন করেন—বাড়ির কেউই টের পায় না যে বাবু রাত্তিরে ঘরে থাকেন না। পাঠকগণ! যারা ছেলেবেলা থেকে "ধর্ম্ম যে কার নাম তা শোনেনি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সুদূর সম্পর্ক, কতকগুল্লি হতভাগা মোসাহেবই যাদের হাল্" তারা যে এই রকম পশুবৎ কদাচারে রত থাক্‌বে, এ বড় আশ্চর্য্য নয়! কলকেতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাসহর হয়ে পড়েচে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশ ঘর বেশ্যা নাই; হেথায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্চে বই কম্‌চে না। এমন কি একজন বড়মানুষের বাড়ির পাশে একটি গৃহস্থের সুন্দরী বৌ কি মেয়ে নিয়ে বাস করবার যো নাই; তা হলে দশ দিনেই সেই সুন্দরী টাকা ও সুখের লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেবে—যত দিন সুন্দরী বাবুর মনস্কামনা পূর্ণ না কর্ব্বে তত দিন দেখ্‌তে পাবেন বাবু অষ্টপ্রহর বাড়ির ছাদের উপর কি বারাণ্ডাতেই আছেন, কখন হাসচেন, কখন টাকার তোড়া নিয়ে ইসারা করে দেখাচ্চেন, এ ভিন্ন মোসাহেবদেরও নিস্তার নাই, তাঁরা যত দিন তাঁরে বাবুর কাছে না আনতে পার্ব্বেন, ততদিন মহাদায়গ্রস্ত হয়ে থাক্‌তে হবে, হয় ত সে কালের নবাবদের মত "জান বাচ্চা এক গাড়" হবার হুকুম হয়েচে! ক্রমে কলে কৌশলে সেই সাধ্বী স্ত্রী বা কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তখন বাজারে কসব করাই তার অনন্যগতি হয়ে পড়ে! শুধু এই নয়; সহরের বড়মানুষরা অনেকে এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিত মেয়েমানুষ ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কামক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—শেষে

ভগ্নি ভাগ্নি—বউ ও বাড়ির যুবতী মাত্রেই তাঁর ভোগে লাগে—এতে কত সতী আত্মহত্যা করে বিষ খেয়ে এই মহাপাপীদের হাত এড়িয়েছে। আমরা বেশ জানি, অনেক বড়মানুষের বাড়ি মাসে একটি করে ভ্রূণহত্যা হয় ও রক্তকম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালের নূন তেলের মত উঠ্‌নো বরাদ্দ আছে! যেখানে হিন্দুধর্ম্মের অধিক ভড়ং, যেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট, ও ভদ্রলোকের অধিক কুৎসা, প্রায় সেখানেই ভেতরবাগে উদোম এলো কিন্তু বাইরে পাদে গেরো!

হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে? আজ এক শ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এ দেশে এসেচেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয়েচে? সেই নবাবী আমলের বড়মানুষী কেতা, সেই পাকানো কাছা, সেই কোঁচান চাদর, লপেটা জুত্তো ও বাবরি চুল আজও দেখা যাচ্চে, বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, কিন্তু আমাদের হুজুরেরা যেমন তেমনিই রয়েচেন! আমাদের ভরসা ছিল, কেউ হঠাৎ বড়মানুষ হলে রিফাইণ্ড গোছের বড়মানুষীর নজির হবে কিন্তু পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদের সে আশা সমূলে নির্মূল হয়ে গেল—পদ্মলোচন আবার কফিন চোরের বেটা ম্যাক্‌মারা হয়ে পড়লেন; কফিন চোর, মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি কত্তো মাত্র কিন্তু তার উত্তরাধিকারী মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি করে শেষে—র‍াঁড় রেখে অবধি পদ্মলোচন স্ত্রীর সহবাস পরিত্যাগ কল্লেন, স্ত্রী চরে খেতে লাগলেন, পূর্ব্ব সহবাস বা তাঁর হাতযশে পদ্মলোচনের গুটি চার ছেলে হয়েছিল; ক্রমে জ্যেষ্ঠটি বড় হয়ে উঠ্‌লো সুতরাং তাঁর বিবাহে বিলক্ষণ ধুমধাম হবার পরামর্শ হতে লাগলো!

ক্রমে বড়বাবুর বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগলো, ঘটক ও ঘটকীরা বাড়ি বাড়ি মেয়ে দেখে বেড়াতে লাগলেন—"কুলীনের মেয়ে, দেখতে পরমা সুন্দরী হবে, দশ টাকা যোত্তোর থাক্‌বে" এমনটি শীগ্‌গির ফুটে ওঠা সোজা কথা নয়; শেষে অনেক বাছা গোছা ও দেখা শোনার পর সহরের আগ্‌ড়োম ভোম সিঙ্গির লেনের আত্মারাম মিত্তিরের পৌত্তুরীরই ফুল ফুটলো! আত্মারাম বাবু

খাস হিঁদু, কাপ্তেনির কর্ম্মে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করেছিলেন, আত্মারাম বাবুর সংসারও রাবণের সংসার বল্লে হয়—সাত সাতটি রোজগেরে বেটা, পরীর মত পাঁচ মেয়ে আর গড়ে গুটি চল্লিশে পৌত্তুর পৌত্তুরী, এ সওয়ায় ভাগ্নে জামাই কুটুম্ব-সাক্ষাৎ বাড়িতে গিজগিজ করে—সুতরাং সর্ব্বগুণাক্রান্ত আত্মারাম পদ্মলোচনের বেয়াই হবার উপযুক্ত স্থির হলেন ; শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে বিবাহের স্থির হলো, দলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণরা মর্য্যাদা মত পত্রের বিদেয় পেলেন, রাজভাট ও ঘটকেরা ধন্যবাদ দিতে দিতে চল্লো ; বিয়ের ভারী ধুম। সহরে হুজুক উঠ্‌লো পদ্মলোচন বাবুর ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে, কিন্তু এত নয়।

দিন আস্‌চে ; দেখতে দেখতেই এসে পড়ে, ক্রমে বিবাহের দিন ঘুনিয়ে এলো—ক্রিয়েবাড়িতে নহবত বসে গেল। অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য ও দলস্থদের ঘোঁট বাদান সুরু হলো—ত্রিশ হাজার জোড়া শাল, সোনার লোহা, ও ঢাকাই সাড়িওয়ালা দু লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত দলে বিতরণ হলো, বড়মানুষদের বাড়িতেও শাল ও সোনাওয়ালা লোহা, ঢাকাই কাপড়, গ্যাঁদ্‌ড়া কদ্দক্, গোলাব ও আতর, ও এক এক জোড়া শাল সওগাত পাঠান হলো ; কেউ কেউ আদর করে গ্রহণ কল্লেন, কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে আমরা ঢুলী বা বাজান্দরে নই যে শাল নেবো! কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অবতার হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন সুতরাং সে কথা গ্রাহ্য কল্লেন না! পারিষদ, মোসাহেব ও বিবাহের অধ্যক্ষেরা বলে উঠ্‌লেন—ব্যাটার অদৃষ্টে নেই!

এদিকে বিয়ের বাইনাচ আরম্ভ হলো, কোথাও রূপোর বালা, লাল কাপড়ের তকমা ও উর্দ্দীপরা চাকরেরা ঘুরে বেড়াচ্চে, কোথাও অধ্যক্ষরা গড়ের বাজনা আন্‌বার পরামর্শ কচ্চেন—কোথাও বরের সজ্জা তৈরির জন্য দর্জীরা একমনে কাজ কচ্চে—চার দিকেই হৈ হৈ ও রৈ রৈ শব্দ—বাবুর দেওয়া শালে সহরের রাস্তার অর্দ্ধেক লোকই লালে লাল হয়ে গেল, ঢুলী ও বাজন্দরেরা তো অনেকের বিয়েতেই পুরনো শাল পেয়ে থাকে কিন্তু পদ্ম-লোচনের ছেলের বিয়েয় ভদ্দর লোকেও শাল পেয়ে লাল হয়ে গেলেন।

১২ই পৌষ শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিল, আজ ১২ই পৌষ ;

আজ বিবাহ। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে সহরে টি টি হয়ে গিয়েছিল যে "পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ" সুতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে রাস্তায় ভয়ানক লোকারণ্য হতে লাগলো, পাহারাওয়ালারা অতি কষ্টে গাড়ি ঘোড়া চলবার পথ করে দিতে লাগ্‌লো। ক্রমে সন্ধ্যার সময় বর বেরুলো—প্রথমে কাগজের ও অব্বরের হাত ঝাড়, পাঙ্খা ও সিঁড়ি ঝাড়, রাস্তার দু' পাশে চল্লো, ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চল্‌তি নবৎ ছিল, তার পেছনে গেট—দালান ও কাগজের পাহাড়—পাহাড়ের ওপর হর পার্ব্বতী, নন্দী, ষাঁড়, ভৃঙ্গী, সাপ ও নানা রকম গাছ—তার পেছনে ঘোড়াপঙ্খী, হাতীপঙ্খী, উটপঙ্খী ও ময়ূরপঙ্খী; পঙ্খীগুলির ওপরে বারো জন করে দাঁড়ি, মেয়ে ও পুরুষ সওদাগর সাজা, ও দুটি করে ঢোল। তার আশে পাশে তক্তানামার ওপর "মগের নাচ" "ফিরিঙ্গীর নাচ" প্রভৃতি নানা প্রকার সাজা সং। তার পশ্চাৎ এক শ ঢোল, চল্লিশটি জগঝম্প ও গুটি ষাইটেক্ ঢাক, মায় রোশন-চৌকি—শানাই, ভোড়ং ও ভেঁপু—তার কিছু অন্তরে এক দল নিমখাসা রকমের চুনোগলির ইংরিজি বাজনা। মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পারিষদ, আত্মীয় ও কুটুম্বরা। সকলেরই একরকম শাল, মাথায় রুমাল জড়ান, হাতে এক এক গাছি ইষ্টিক; হঠাৎ বোধ হলো যেন এক কোম্পানি ডিজার্মড্ সেপাই। এই দলের দুই ধারে লাল বনাতের খাসগেলাপ, ও রুপোর ডাণ্ডিতে রেশমের নিশেন ধরা তক্‌মাপরা মুটে ও ক্ষুদে ক্ষুদে ছোঁড়ারা, মধ্যে খোদ বরকর্ত্তা, গুরু, পুরোহিত, বাছালো বাছালো ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভট্‌চায্যি ও আত্মীয় অন্তরঙ্গরা; এর পেছনে রাঙ্গামুখো ইংরিজি বাজনা, সাজা সায়েব তুরুকসওয়ার, বরের ইয়ারবক্স, খাস দরওয়ানরা, হেড খান্‌সামা ও রুপোর সুখাসনে বর; সুখাসনখানির চার দিকে মায় বাতি বেললণ্ঠান টাঙ্গান, সামনে রুপোর দশ-ডেলে বসা ঝাড়, দুই পাশে চামরধরা দুটো ছোঁড়া; শেষে বরের তোরঙ্গ, প্যাটরা, বাড়ির পরামাণিক, সোনার দানা গলায় বুড়ি বুড়ি গুটি কত দাসী ও বাজে লোক, তার পেছনে বরযাত্রীর গাড়ির সার—প্রায় সকলগুলির উপরে এক এক চাকর, ডবল বাতি দেওয়া হাতলণ্ঠান ধরে বসে যাচ্চে।

ব্যাণ্ড, ঢাক, ঢোল ও নাগরার শব্দে, লোকের রল্লা ও অধ্যক্ষদের মিছিলের চীৎকারে কল্‌কেতা কাঁপতে লাগ্‌লো, অপর পাড়ার লোকেরা

তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে কল্লে ওদিকে ভয়ানক আগুন লেগে থাক্‌বে, রাস্তার দুধারি বাড়ির জানালা ও বারাণ্ডা লোকে পূরে গেল, বেশ্যারা "আহা দিব্যি ছেলেটি যেন চাঁদ!" বলে প্রশংসা কত্তে লাগলো, হুতোম প্যাঁচা অন্তরীক্ষ থেকে নক্‌শা নিতে লাগ্‌লেন—ক্রমে বর কনেবাড়ি পৌছিল। কন্যাকর্ত্তারা আদর ও সম্ভাষণ করে বরযাত্তোরদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাড়ার মৌতাতী বুড়ো ও বওয়াটে ছোঁড়ারা গ্রামভাটির জন্য বরকত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—বর সভায় গিয়ে বস্‌লেন, ভাটেরা ছড়া পড়তে লাগ্‌লো, মেয়েরা বারাণ্ডা থেকে উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো, ঘটকরা মিত্তির বাবু ও দত্ত বাবুর কুলজী আউড়ে দিলে; মিত্তির বাবু কুলীন সুতরাং বল্লালী রেজেষ্টরীতে তাঁর বংশাবলি রেজেষ্টরী হয়ে আছে, কেবল দত্ত বাবুর বংশাবলিটি বানিয়ে নিতে হয়!

ক্রমে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা সাপ্টা জলপান করে বিদেয় হলেন, বর স্ত্রী আচারের জন্য বাড়ির ভিতরে গেলেন। ছাঁদনাতলায় চারটি কলাগাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পিঁড়ে রাখা হয়েছিল, বর চোরের মত হয়ে সেইখানে দাঁড়ালেন, মেয়েরা দাড়া গুয়া পান, বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও পিদ্দিম দিয়ে বরণ কল্লেন, শাঁক বাজানো ও উলু উলুর চোটে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠ্‌লো, ক্রমে মায় শাশুড়ী এয়োরা সাত বার বরকে প্রদক্ষিণ কল্লেন—শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন, "হাতে দিলেম মাকু এক বার ভ্যা কর ত বাপু"! বর কলেজ বয়, আড়-চকে এয়োদের পানে তাকাচ্ছিলেন ও মনে মনে লঙ্কা ভাগ কচ্ছিলেন; সুতরাং "মনে মনে কল্লেম" বল্লেন—অমনি শালাজরা কাণ মলে দিলে, শালীরা গালে ঠোনা মাল্লে; শেষে গুড় চাল, তুক্ তাক্ ও ওষুদ বিশুদ ফুরুলে, উচ্ছুগ্‌গু করবার জন্য কনেকে দালানে নিয়ে যাওয়া হলো, শাস্ত্রমত মন্ত্র পড়ে কনে উচ্ছুগ্‌গু হলেন, পুরুত ও ভট্টাচার্য্যরা সন্দেশের সরা নিয়ে সল্লেন, বরকে বাসরে নে যাওয়া হলো। বাসরটিতে আমোদের চূড়ান্ত হয়। আমরা তো এত বুড়ো হয়েচি, তবু এখনও বাসরের আমোদটি মনে পড়লে মুখ দে লাল পড়ে ও আবার বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয়!

ক্রমে বাসরের আমোদের সঙ্গেই কুমুদনাথ অস্ত গেলেন, কমলিনীর হৃদয়-রঞ্জন প্রকৃত তেজীয়ান হয়েও যেন তাঁর মানভঞ্জনের জন্যই কোমল ভাব ধারণ করে উদয় হলেন, কমলিনী কামাতুর নাথের তাদৃশ দুর্দ্দশা দেখেই যেন

সরোবরের মধ্যে হাসতে লাগ্‌লেন, পাখিরা "ছি ছি কামোন্মত্তদের কিছু মাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে না।" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, বায়ু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসতে লাগ্‌লেন—দেখে ক্রোধে সূর্য্যদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন; তাই দেখে পাখিরা ভয়ে দূরদূরান্তরে পালিয়ে গেল—বিয়েবাড়ি বাসি বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো। হলুদ ও তেল মাখিয়ে বরকে কলতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ান হলো, বরণডালায় বরণ ও কতক কতক তুক্‌তাকের পর, বর কনের গাটছড়া কিছু ক্ষণের পর খুলে দেওয়া হয়।

এদিকে ক্রমে বরযাত্র ও বরের আত্মীয় কুটুম্বরা জুট্‌তে লাগ্‌লেন, বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর কনেকে বাড়ি নে যাওয়া হলো, বরের মা বর কনেকে বরণ করে ঘরে তুল্লেন. এক কড়া দুধ দরজার কাছে আগুনের ওপর বসান ছিল, কনেকে সেই দুধের কড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, "মা! কি দেখ্‌চো? বল যে আমার সংসার উত্‌লে পড়্‌চে দেখচি"। কনেও মনে মনে তাই বল্লেন। এ সওয়ায় পাঁচ গিন্নিতে নানা রকম তুক্‌তাক্ কল্লে পর বর কনে জিরুতে পেলেন, বিয়ে বাড়ির কথঞ্চিৎ গোল চুক্‌লো—ঢুলীরা ধেনো মদ খেয়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লো, অধ্যক্ষরা প্রলয় হিন্দু সুতরাং একটা একটা আগাতোলা দুর্গোমণ্ডা ও এক ঘটি গঙ্গাজল খেয়ে বিছানায় আড় হলেন, বর কনে আলাদা আলাদা শুলেন—আজ একত্রে শুতে নেই, বে বাড়ির বড়গিন্নির মতে আজকের রাত—কালরাত্তির।

শীতকালের রাত্তির শিগ্‌গির যায় না। এক ঘুম, দু' ঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ এক ঘুম হয়; ক্রমে গুড়ুম করে তোপ পড়ে গেল—প্রাতঃস্নানে মেয়েগুলো বক্‌তে বক্‌তে রাস্তা মাথায় করে যাচ্চে,—বুড়ো বুড়ো ভট্‌চায্যিরা স্নান করে "মহিম্নঃ পারন্তেঃ" মহিম্নস্তব আওড়াতে আওড়াতে চলেচেন। এদিকে পদ্মলোচন রাঁড়ের বাড়ি হতে বাড়ি এলেন, আজ তাঁর নানা কাজ! পদ্মলোচন প্রত্যহ সাত আটটার সময় বেশ্যালয় থেকে উঠে আসেন, কিন্তু আজ কিছু সকালে আসতে হয়েছিল—সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো দলপতির এক একটি রাঁড় আছে এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেচি, এদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, একেবারে সকালবেলা প্রাতঃস্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা কেটে, গীতগোবিন্দ ও তসর পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি ফেরেন—হঠাৎ লোকে মনে কত্তে পারে

শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতেই প্রিয়তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিদেয় দিয়ে স্নান করে পুজো কত্তে বসেন—যেন রাত্তিত্তের তিনি নন—পদ্মলোচনও সেই চাল ধরেছিলেন।

ক্রমে আত্মীয় কুটুম্বেরাও এসে জমলেন—মোসাহেবরা "হুজুর! কল্‌কেত্তায় অ্যামন বিয়ে হয়নি হবে না।" বলে বাবুর ল্যাজ ফোলাতে লাগলেন। ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এলো, পদ্মলোচন মহাসমাদরে কনের বাড়ির চাকর চাকরাণীদের অভ্যর্থনা কল্লেন, প্রত্যেককে একটি করে টাকা ও একখানি করে কাপড় বিদেয় দিলেন। দলস্থ ও আত্মীয়রা কিছু কিছু করে অংশ পেলেন, ঢাকী ঢুলী ও রেশালার লোকেরা বক্‌সিস পেয়ে বিদেয় হলো; মহাসমারোহে পাঁচ লক্ষ টাকার বিবাহ শেষ হয়ে গেল; কোন কোন বাড়ির গিন্নিরা সামিগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পুরে পুরে শিকেয় টাঙ্গিয়ে রাখলেন, অধিক অংশ পচে গেল, কতক বেরালে ও ইঁদুরে খেয়ে গেল, তবু পেট ভরে খাওয়া কি কারেও বুক বেঁধে দিতে পাল্লেন না—বড়মানুষদের বাড়ির গিন্নিরা প্রায়ই এই রকম হয়ে থাকেন, ঘরে জিনিস পচে গেলেও লোককে হাত তুলে দিতে মায়া হয়। শেষে পচে গেলে মহারাণীর খানায় ফেলে দেওয়া হবে সেও ভাল। কোন কোন বাবুরও এ স্বভাবটি আছে—সহরের এক বড়মান্‌ষের বাড়িতে পূজার সময় নবমীর দিন গুটি বাইটেক্‌ পাঁঠা বলিদান হয়ে থাকে; পূর্ব্বপরম্পরায় সেগুলি সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়দের বাড়ি বিতরিত হয়ে আসচে, কিন্তু আজকাল সেই পাঁঠাগুলি নবমীর দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয়; পূজোর গোল চুকে গেলে পূর্ণিমার পর সেইগুলি বাড়ি বাড়ি বিতরণ হয়ে থাকে; সুতরাং ছয় সাত দিনের মরা পচা পাঁঠা কেমন উপাদেয়, তা পাঠক! আপনিই বিবেচনা করুন। শেষে গ্রহীতাদের সেই পাঁঠা বিদেয় কত্তে ঘর হতে পয়সা বার কত্তে হয়। আমরা যে পূর্ব্বে আপনাদের কাচে সহরের সর্দ্দার মূর্খের গল্প করেচি, ইনিই তিনি।

এদিকে ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গেল, পদ্মলোচন বিষয় কর্ম্ম কত্তে লাগলেন। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক দোল, দুর্গোৎসব, প্রভৃতি বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ ফাঁক দিতেন না; ঘেঁটুপুজোতেও চিনির নৈবিদ্দি ও সন্দেশের মাত্রা বরাদ্দ ছিল ও আপনার বাড়িতে যে রকম ধুম করে পুজো আচ্ছা কত্তেন, রক্ষিত মেয়েমানুষ ও অনুগত দশ বারো জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদেরো তেমনি ধুমে

পূজো করাতেন। নিজের ছেলের বিবাহের সময় তিনি আগে চল্লিশ জন আইবুড়ো বংশজের বিবাহ দিয়ে দেন। ইংরিজি লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে, রামমোহন রায়ের জন্মগ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দুধর্ম্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তিনি কায়মনে পুনরায় তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি, কি তাঁর ছেলেরা দেশের ভালোর জন্য এক দিনও উদ্যত হন নি—শুভ কর্ম্মে দান দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তর পশ্চিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষেও কিছু মাত্র সাহায্য করেন নি, বরং দেশের ভালো করবার জন্য কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে তারে কৃশ্চান ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিতেন—এক শ বেলেল্লা বামুন ও দুই শ মোসাহেব তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হতো—তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান্ পবিত্র বলে সহরে বিখ্যাত ছিল। লেখাপড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়া পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, সুদ্ধ নামটা সই কত্তে পাল্লেই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশপরম্পরার স্থির সংস্কার ছিল। সরস্বতী ও সাহিত্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে ঐ বংশের সম্পর্ক রাখতেন না! উনবিংশতি শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের জন্য সহরে কোন বড়মানুষ তাঁর মত পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। যে রকম কাল পড়েছে, তাতে আর কেউ যে তাদৃক্ যত্নবান্ হন, তারো সম্ভাবনা নাই। তিনি যেমন হিন্দুধর্ম্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্ম্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল ; বিধবাবিবাহের নাম শুন্‌লে তিনি কাণে হাত দিতেন—ইংরিজি পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরিজি পড়ান নি—অথচ বিদ্দেসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে ওঠে নাই—বিশেষত শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই এটিও তাঁর জানা ছিল, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও "বাপ্‌কা বেটা—সেপাইকা ঘোড়া"র দলেই পড়ে।

কিছু দিন এই রকম অদৃষ্টচর লীলা প্রকাশ করে আশী বৎসর বয়সে পদ্মলোচন দেহ পরিত্যাগ কল্লেন—মৃত্যুর দশ দিন পূর্ব্বে এক দিন হঠাৎ অবতারের সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করে। সেই বেদনাই ক্রমে বলবতী হয়ে তাঁরে শয্যাগত কল্লে—তিনি প্রকৃত হিন্দু, সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসায় ভারি দ্বেষ কত্তেন, বিশেষতঃ তাঁর ছেলেবেলা পর্য্যন্ত সংস্কার ছিল ডাক্তারি ওষুধ মাত্রেই মদ মেশান, সুতরাং বিখ্যাত বিখ্যাত কবিরাজ মশাইদের দ্বারা নানা প্রকার

চিকিৎসা করান হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে আত্মীয়রা কবিরাজ মশাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীশ্রী৺ভাগীরথীতটস্থ কল্লেন; সেখানে তিনি রাত্তির বাস করে মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্তের পর সজ্ঞানে রাম ও হরিনাম জপ কত্তে কত্তে প্রাণত্যাগ করেন।

পাঠকগণ! আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে বহুদূর এসেছেন। যে পদ্মলোচন আপনাদের সম্মুখে জন্মালেন আবার মলেন, তাঁর শুদ্ধ নিজের চরিত্র আপনারা অবগত হলেন এমন নয়, সহরের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সরেস! যে দেশের বড়-লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতির প্রার্থনা করা, নিরর্থক! যাঁদের হাতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের সর্ব্বদাই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা ইচ্ছা করে আপনা আপনি বিষময় পথের পথিক হন; তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম্ম করেন, তার যথারূপ শাস্তি নরকেও দুষ্প্রাপ্য।

জন্মভূমি-হিতচিকীর্ষুরা আগে এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্র সংশোধন করবার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থায় দৃষ্টি করবেন, নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতি প্রার্থনায় যত্ন নেবেন, সকলই নিরর্থক হবে।

আলালের ঘরের দুলাল লেখক—বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন "সহরের মাতাল বহুরূপী" কিন্তু আমরা বলি, সহরের বড়মানুষরা নানারূপী—এক এক বাবু এক এক তরো, আমরা চড়কের নক্শায় সেগুলির প্রায়ই গড়ে বর্ণন করেচি, এখন ক্রমশ তারই সবিস্তার বর্ণন করা যাবে—তারি প্রথম উঁচু দল খাস হিন্দু; এই হঠাৎ অবতারের নক্শাতেই আপনারা সেই উঁচু-কেতার খাস হিন্দু দলের চরিত্র জানতে পার্ব্বেন—এই মহাপুরুষেরাই রিফর্ম্মেশনের প্রবল প্রতিবাদী—বঙ্গসুখসৌভাগ্যের প্রলয় কণ্টক ও সমাজের কীট!

হঠাৎ অবতারের প্রস্তাবে পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্ম-পরিচয় দিয়ে নিয়েছি; আমরা ক্রমে আরো যত ঘনিষ্ঠ হবো, ততই রং ও নক্শার মাজে মাজে সং সেজে আস্‌বো—আপনারা যত পারেন হাততালি দেবেন ও হাসবেন!

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' : ১৮৬২

প থি ক

হরিশচন্দ্র মিত্র

শীতের প্রভাত, অন্ধকার কুয়াসার মাঝে মাঝে উষার আভাষ ফুটিয়া উঠিতেছে, উত্তরের হিম বাতাস বহিতেছে, কিন্তু আমাদের বাড়ি আজ ব্রাহ্মণভোজন—সকালেই ঘরের বাহির না হইলে নয়—আমি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রত্যুষে উঠিয়া কলসীকক্ষে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলাম, নদীর ধারে আসিয়া দেখিলাম একটি গাছের তলায় একজন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া মেয়েটি উঠিয়া বসিল, আমাদের এ ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে আমরা মেয়েরা সকলকে সকলে চিনি, দেখিলাম মেয়েটি এ গাঁয়ের নয়, একটু অবাক হইলাম, অমন রূপবতী যুবতী মেয়েটি একাকী এখানে কে ও? তাহার শীতে বিবর্ণ, অবসন্ন, শ্রান্ত-ভাবাপন্ন মুখখানি দেখিয়া প্রাণ কেমন কাঁদিয়া উঠিল, কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাগা, তুমি কে গা, কোথা হইতে আসিয়াছ?" মেয়েটি বিষণ্ণ নেত্র তুলিয়া আস্তে আস্তে উত্তর করিল—"আমি একজন যাত্রী গো, আর চলিতে পারিলাম না, এইখানেই তাই পড়িয়া আছি—"

"তুমি যুবতী একা যাত্রী। বাড়ির লোকেরা তোমাকে এরূপে একা ছাড়িয়া দিয়াছে!"

যুবতী চক্ষু নত করিয়া বলিল,—"বাড়ির লোক আমার কেহ নাই—" তাহার বিষণ্ণ স্বর আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল—বলিলাম—"কেহ নাই তোমার! তবে কোথায় যাইবে তুমি?"

যুবতী বলিল—"যদি স্থান পাই, এইখানেই থাকিব, আমাকে কেহ এখানে দাসী রাখিবেন?"

আমার চোখে জল আসিল—আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও মুখ ফুটিল না—বুঝিলাম অভাগিনী বিধবা ভদ্রকন্যা, সংসারের মোহাবর্তে পড়িয়া আশ্রয় হারাইয়াছে, বলিলাম—"আজ হইতে আমি তোর দিদি হইলাম—আমার সঙ্গে চল।"

গঙ্গাস্নান করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি লইয়া আসিলাম।

২

অল্পদিনের মধ্যেই যমুনা আমাদের নিতান্ত আপনার হইয়া পড়িল, এমন কোন কথা নাই যাহা তাহাকে না বলিয়া আমাদের দুই যায়ের মনের তৃপ্তি হয়, এমন কোন আমোদপ্রমোদ কাজকর্ম নাই যাহা তাহাকে ছাড়িয়া করিতে মন উঠে। ক্রিয়া কর্মে, অসুখে বিসুখে, হর্ষ উল্লাসে যমুনা আমাদের সঙ্গিনী, সুখে দুঃখে সে আমাদের আপনার। কিন্তু আমরা তাহাকে যত আপনার ভাবি—সে কি আমাদের তত ভাবে?

আমাদের স্নেহে তাহার তো কই সে স্থির বিষণ্ণ ভাব ঘুচে না, আমাদের কাছে সে তো কখনো তাহার হৃদয়ের কথা খুলে না। এতদিন আসিয়াছে আমরা তাহার জীবন-ইতিহাস কিছুই জানিলাম না, এই মাত্র জানি—জাতিতে সে আমাদের এক জাতি, সে কায়স্থ কন্যা। বাপের বাড়ি তাহার মেদিনীপুর জেলায়। বাপ মা এখন কেহই নাই, তাহার দাঁড়াইবারও স্থান নাই।

"কেন শ্বশুরালয়?"

সে কথায় সে উত্তর করিতে চাহে না, এ সম্বন্ধে বেশি পীড়াপীড়ি করিলেই তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসে—সে সেখান হইতে চলিয়া যায়।

আমাদের সহিত যমুনার এরূপ লুকাচুরি ভাব কেন? একি আমাদের প্রতি তাহার ভালোবাসার অভাব?

এখনো বৎসর পূর্ণ হয় নাই, যমুনা শীতকালে আসিয়াছিল—এখন বর্ষা আসিয়াছে। আজ সকাল হইতে মেঘ করিয়া আছে—চারিদিক একটা আঁধার বিষণ্ণ ভাবে আচ্ছন্ন—আমরা দুইজনে বিকালে গঙ্গায় গা ধুইতে আসিয়াছি। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে—আকাশের মেঘ গাঢ়তর হইয়া গঙ্গার জল যেন আরো কালো করিয়া তুলিল—দেখিতে দেখিতে জলে নামিলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল—আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"যমুনা, শীঘ্র ওঠ—আর না"—যমুনা আমার দিকে মুখ ফিরাইল—চমকিয়া উঠিলাম—কি ঘোর বিষণ্ণতা! বাহিরের আঁধার যেন তাহার হৃদয়ের অর্ধ বিকাশ মাত্র। আমার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"দিদি, তুমি ঘরে যাও—আমি আর একটু থাকি"—আমি আর থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম, "যমুনা, আমরা কি তোর এতই পর?" সে আমার কথা বুঝিল, জলপূর্ণ নেত্রে কহিল, "দিদি, আর তো আমার আপনার অন্য কেহ নাই।"

"তবে যমুনা, তোর এই বিশ্বাসের অভাব কেন? আমাদের কাছে মনের ব্যথা লুকাস কেন?"

যমুনা ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া কহিল, "ভগবান জানেন কেন লুকাই। কিন্তু আজ আর লুকাইব না, যদি এই অভাগিনীর জীবন শুনিতে এতই সাধ, তবে শোনো দিদি।"

আমরা সিঁড়িতে উঠিয়া বসিলাম; চৌদিকে অন্ধকার, পদতলে নদী, মাথার উপর অবিশ্রাম বৃষ্টি, দুইজনে চারিদিক ভুলিয়া দুইজনের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম, যমুনা গল্প করিতে লাগিল, আমি নীরবে শুনিতে লাগিলাম।

৩

"সেদিনও ঠিক এই রকম একটি দিন, সকাল হইতে মেঘ করিয়া সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। আমি আমাদের কুটিরে আমার রুগ্ন মাতার কাছে বসিয়া আছি। আমার বয়স ১২ বৎসর, কিন্তু এখনো বিবাহ হয় নাই। আমার বয়স যখন ৫ বৎসর তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়। পিতা ধনবান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দুএকজন দুষ্ট লোকে তাঁহার ঋণের দাবি দিয়া আমাদের বিষয়সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লয়। সংসারে আমাদের আপনার লোক কেহ নাই, উদ্যোগ করিয়া, যত্ন করিয়া আমার বিবাহ দিবার কেহ নাই, মা একা স্ত্রীলোক! দরিদ্র কায়স্থ কন্যার বিবাহ সহজে হয় না। তাই এতদিন আমার বিবাহ হয় নাই। মা সেজন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, মনের অসুখে শরীর অসুখ দিন দিন তাঁহার বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনি যাহাকে পান কেবল ঐ কথা বলেন, একটি সুপাত্র স্থির করিতে অনুরোধ করেন, ঐ এক কথাই তাঁহার মনে জাগিতেছে; তাহা ছাড়া যেন তাঁহার মনে আর কোনো কথা নাই। সেদিন সন্ধ্যাবেলাও ঐ কথা হইতেছিল, মা গেলে আমার কি দশা হইবে আমাকে বুকে ধরিয়া মা তাহাই বলিতেছিলেন, বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, ঘরের মধ্যে আমাদের দুজনের অশ্রুধারা বহিতেছিল। এমন সময় আমাদের কুটিরের দ্বারে ঘা পড়িল। মা বলিলেন, 'হারার মা এল বুঝি দরজাটা খুলে দে।' হারার মা আমাদের একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশিনী, আমাদের ঘর-সংসারের কাজকর্ম করিয়া দেয়। আমি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। হারার মা নহে, একজন আর্দ্র-কলেবর অপরিচিত পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম, তিনি বলিলেন, 'আমাকে

আজিকার মতো এখানে একটু আশ্রয় দিবেন কি? এই বৃষ্টিতে আর বাড়ি যাইতে পারিতেছি না।' মা তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'আহা, তা ভিজবে কেন বাছা, রাতটা এইখানেই থাকো।'

পথিক সে রাত্রের জন্য আমাদের অতিথি হইলেন।

আমাদের চারখানি ঘর। একটি রান্নাঘর, একটি গোয়াল, আর দুইখানি ভালো ঘর; তাহারি একখানি পথিকের শয়নের জন্য প্রস্তুত হইল, আমাদের যথাসাধ্য অতিথিসৎকার করিলাম। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম পথিক পীড়িত। সেদিনও আর তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া হইল না। ক্রমে এক রাত্রির পরিবর্তে এক সপ্তাহ, এক সপ্তাহের পর প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল, পীড়িত পথিক আমাদের গৃহে অতিথি হইয়া রহিলেন।"

বলিতে বলিতে সহসা যমুনার বিষণ্ণ মুখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি প্রকাশ পাইল, বুঝি বা তাহার অন্ধকার জীবনে সুখ-স্মৃতির দীপ্তি। যমুনা একটুখানি থামিয়া সজল নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি, সেদিনের পর বাঁচিয়া রহিলাম কেন? প্রতিদিন অন্য কাজকর্মের মধ্যে ছুটিয়া যখন পথিককে দেখিতে আসিতাম, প্রতিদিন তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার মুখে আরোগ্যের লাবণ্য-সঞ্চার দেখিয়া হৃদয়ে যে আনন্দ উথলিয়া উঠিত, সেই আনন্দ না হারাইতে হারাইতে মরিয়া গেলাম না কেন?

যমুনা আবার আরম্ভ করিল—"পথিক আরোগ্য হইলেন, তাঁহার যাওয়ার আর কোনো বাধা নাই, প্রতিদিন শুনিতেছি দুই চারিদিনের মধ্যে যাইবেন কিন্তু সে দুই চারিদিন আর ফুরাইতেছে না। একদিন আমি অন্য ঘরে কাজ করিতেছি, পাশের ঘরে মা পথিকের সহিত গল্প করিতেছেন—হঠাৎ এই কথাগুলি কানে গেল—শুনিলাম পথিক বলিতেছেন, 'আমার কথাটা একটু বিবেচনা করিবেন, আপনাদের ন্যায় আমিও সদ্‌বংশজাত কায়স্থ, আমার অর্থ আছে, আপনার কন্যাকেও আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি—'

এই সময় আমার সই কুসুম আসিয়া আমাকে ডাকিল, আর কিছু শোনা হইল না। কি জানি কুসুম যদি ঘরের মধ্যে আসিয়া সব শুনিয়া ফেলে—তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া কুসুমের কাছে আসিলাম।

সেইদিন কুসুমের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম পথিকের সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের বিবাহ

হইয়া গেল। মা যেন আমাদের বিবাহিত দেখিবার জন্যই জীবনধারণ করিয়াছিলেন, বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল, স্বামীর প্রেম পাইয়া স্নেহময়ী মাতার অসীম স্নেহ হারাইলাম।"

* * *

"আমি শ্বশুরবাড়ি যাইব। স্বামী প্রথমে একবার একাকী বাড়ি যাইতে চাহেন, কিন্তু আমি তাহাতে নিতান্ত আপত্তি করাতে আমাকে একেবারেই সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

শীতকালের বিকাল, দেখিতে দেখিতে সূর্যের আলো সন্ধ্যার আঁধার এক হইয়া আসে, অল্পক্ষণের মধ্যেই চারিদিক একটা মলিন আলোকে ডুবিয়া পড়িতে লাগিল, একটা নির্জন পথে স্বামীর অনুসরণ করিয়া সন্ধ্যার কিছু আগে একটা গাছপালাময় ক্ষুদ্র জঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িলাম, সহসা একটা অন্ধকার যেন বাহিরের আলোক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, হঠাৎ যেন হৃদয় কেমন কাঁপিয়া উঠিল, স্বামী বলিলেন, 'ঐ দেখ আমাদের বাড়ি।'

কম্পিত হৃদয়ে মুখ তুলিয়া চাহিলাম; একটি ইষ্টকনির্মিত বাড়ি নজরে পড়িল, সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলাম, প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র স্বামী বলিলেন—'তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।' তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন, অপরিচিত অন্ধকার স্থানে, একটা অজানিত অন্ধকার হৃদয়ে ধরিয়া একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটু পরে প্রদীপহস্তে একজন রমণী আমার দিকে আগুয়ান হইলেন, ভাবিলাম, এইবার শাশুড়ি ঠাকরুণ আমাকে লইতে আসিয়াছেন, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল, ভালো করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিলাম। রমণী নিকটে আসিয়া বলিলেন—'এই বুঝি নূতন দাসী, তা দাসীর আবার এত ঘোমটা কেন?'

কি শুনিলাম কিছু বুঝিলাম না—কেবল একটা বজ্রের ধ্বনি মাথার মধ্যে কনকন করিয়া উঠিয়া মর্মভেদ করিয়া চলিয়া গেল—বাড়িঘর চৌদিকে প্রবলবেগে ঘুরিয়া উঠিল, আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

৪

একদিন দুপুরবেলায় বাড়ির সকলে যখন বিশ্রামলাভ করিতেছে—আমি একাকী গৃহের বাহির হইয়া গেলাম। জঙ্গল পার হইয়া মুক্তমাঠে আসিয়া

পড়িয়া একটি আমগাছের তলায় বসিলাম ; আর চলিতে তখনও বল নাই।

অদূরে কাহাকে দেখিতে পাইলাম! সেই রাতের পর এই প্রথম দেখা, সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। এই কি সেই? করুণাময় স্বামী ভাবিয়া যাহার পদতলে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছি? এই কি সেই? দেবতা ভাবিয়া যাহাকে দিবানিশি পূজা করিয়াছি? সেই দেবতা আমার আজ প্রতারক? সেই করুণাময় স্বামী আজ আমার প্রাণহন্তারক!

স্বামী আমার নিকটে অগ্রসর হইলেন, বলিলেন, 'যমুনা, আমাকে মাপ করো, আমি তোমাকে অন্যত্র লইয়া যাইব। তোমাকে এখানে আনিয়া অন্যায় করিয়াছি, সেই দিন হইতে তোমার সহিত দেখারও একবার সুবিধা হয় নাই।'

সর্বাঙ্গে হু হু করিয়া আগুন জলিয়া উঠিল, এইখানে আনিয়া অন্যায় করিয়াছেন—আর কিছু অন্যায় নহে! স্বামী আমার স্কন্ধে হাত দিতে যাইতেছিলেন, বিদ্যুতের মতো সরিয়া দাঁড়াইয়া গর্বিত তীব্র স্বরে বলিলাম, আমাকে স্পর্শ করিও না, তুমি আমার স্বামী, কিন্তু আমি জানি আমি তোমার পত্নী নহি—আমাকে স্পর্শ করিও না—স্বামী থমকিয়া দাঁড়াইলেন—আমি রুদ্ধশ্বাসে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম, কিছু পরে ফিরিয়া দেখিলাম স্বামী আমার অনুসরণ করেন নাই। তাহার পর এইখানে আসিয়া পড়িয়াছি।"

*   *   *

যমুনার কথা শেষ হইয়াছে, বৃষ্টিও থামিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মতো আকাশ এখনো মেঘান্ধ, মেঘান্ধ হৃদয়ে সেই মেঘান্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া আমরা দুজনে নিস্তব্ধে বসিয়া আছি, এই সময় ও-পাড়ার কালিন্দী কলসী কক্ষে ঘাটে জল লইতে আসিল—আমাদের দেখিয়া বলিল—"কি লো, তোরা দুজনে চুপচাপ করে ভাবছিস কি?" আমি তখন উঠিলাম, যমুনাকে বলিলাম, "ঘরে আয়।"

দুজনে নদীতীর হইতে দুই-এক পা আসিয়াছি—আমাদের ঝি আসিয়া বলিল, "মাঠাকরুণ, যমুনাদির দেশের একজন লোক এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।" যমুনার দেশের লোক! যমুনা আশ্চর্য হইয়া গেল। আমরা গৃহাভিমুখী হইলাম, বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দাসী অদূরের একটি বৃক্ষতলে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল—যমুনার মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল, সে বদ্ধ-পদ হইয়া দাঁড়াইল।—বৃক্ষতল হইতে একজন পুরুষ আমাদের দিকে

অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমরা সরিয়া গেলাম—পুরুষ যমুনার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—ছিন্নশাখার ন্যায় সহসা যমুনা তাহার পদতলে পড়িয়া গেল।

সে পুরুষ আর কেহ নহে, যমুনার স্বামী। যমুনার সন্ধান পাইয়া তিনি তাহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। যমুনার রূপের ঘোর এখনো বুঝি তাঁহার হৃদয়ে কিছু লাগিয়া ছিল। যমুনা প্রথমে তাঁহার সহিত যাইতে কোনোমতে সম্মত হইল না—কিন্তু তাহার স্বামী মহা জেদ করিয়া বলিলেন যে, যমুনা তাহার সঙ্গে না গেলে তিনি এখান হইতে কখনই যাইবেন না। দুই-চার দিন চলিয়া গেল—সত্যই তিনি চলিয়া গেলেন না—তখন সে যাইতে সম্মত হইল। কিন্তু যাইবার আগে স্বামীকে এই অঙ্গীকার করাইয়া লইল যে, তিনি তাহাকে স্বতন্ত্র গৃহে রাখিয়া দিবেন—এবং তাহাকে পরস্ত্রীভাবে দেখিবেন।

যমুনা অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। আমার ছোট ছেলেটির কয়দিন হইতে অসুখ করিয়াছে, নিকটে বসিয়া তাহাকে পাখা করিতে করিতে ক্রমাগত এখন যমুনার কথাই মনে পড়িতেছে, সে গোপালকে বড় ভালোবাসিত, তাহার কোলেকোলেই গোপাল মানুষ হইয়াছে—যমুনা এখন এখানে থাকিলে কত যত্নই ইহাকে করিত। হঠাৎ এ চিন্তায় বাধা পড়িল। খোকার দাসী বলিল—

"মা, খোকার অসুখ তো এখনো সারছে না—তা শুনছি শ্মশানে একজন সন্ন্যাসিনী এসেছে, অনেকরকম মন্ত্রতন্ত্র জানে—তার কাছে একবার গেলে হয় না?"

কথাটা মনে লাগিল, আমি সেই বিকালেই দাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর নিকট গমন করিলাম।

নদীতীরে শ্মশানে শবকুটির, সে কুটিরে শ্মশান হইতে বিষণ্ণ গম্ভীর এলোকেশী সন্ন্যাসিনী মূর্তি, হৃদয় স্তম্ভিত হইল—ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণত হইতে গেলাম। কিন্তু ভূমিষ্ঠ না হইতে হইতে সন্ন্যাসিনী হাত ধরিয়া উঠাইলেন—অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিলাম—সেই রুক্ষজটাযুক্ত কেশপাশ-প্রচ্ছন্ন মলিন গম্ভীর অপরিচিত মুখশ্রীর মধ্যে পরিচিত কি যেন লুকানো মনে হইতে লাগিল, কাহাকে যেন চিনি চিনি, কাহাকে যেন এইরূপ দেখিয়াছি অথচ তাহাকে মনে করিতে পারিতেছি না—আমার সে আকুলতা দেখিয়া সন্ন্যাসিনীর অধরপ্রান্তে হাসির রেখা পড়িল—আমি বলিয়া উঠিলাম, "যমুনা!" যমুনার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল; আমি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলাম।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। আবার তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছিল—বলিলাম, "যমুনা, তোর এ কি বেশ!" যমুনার নেত্র অশ্রু-হীন, সে কোনো উত্তর করিল না—একটু কেবল হাসিল। অত দুঃখে লোকে হাসিতে পারে! আশ্চর্য হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম—"যমুনা, আবার ফিরিয়া আসিলি কেন?" যমুনা বলিল, "দিদি, ভাঙা জিনিস কি জোড়া লাগে? শুনিলাম অন্যের নিকট স্বামী আমাকে···বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন—তাই চলিয়া আসিয়াছি।" কথাগুলি সে হাসিয়া বলিতে চেষ্টা করিল—সে হাসিতে মর্ম বিদ্ধ হইল, বুঝিলাম সে কি কষ্টের হাসি, বুঝিলাম—অশ্রুতে সে কষ্টের সান্ত্বনা নাই, তাই এ হাসির উপেক্ষা। যমুনা বুঝি আমার কষ্ট বুঝিল, বলিল—"দিদি, মানুষের জন্য মানুষের কি কষ্ট হয়?—মিথ্যা কথা—সব কষ্ট আপনার জন্য"—আর কথা কহিলাম না—স্তব্ধ হইয়া গেলাম, বুঝিলাম যমুনা সে যমুনা নহে।

কিছু পরে আমি বলিলাম, "যমুনা, আমাদের বাড়ি চলো না"—যমুনা উত্তর করিল, "দিদি, শ্মশানই আমার আপনার ঘর, এ ঘর আর ছাড়িব না।" অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই তাহাকে বাড়ি আনিতে পারিলাম না, তাহার দগ্ধ হৃদয় লইয়া জীবন্তে সে শ্মশানবাসী হইল। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাকে একবার করিয়া দেখিতে যাইতাম, একদিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কুটিরদ্বারে আসিতেই কতকগুলা শৃগাল-কুকুর আমার মুখপানে চাহিয়া একবার চীৎকার করিয়া উঠিয়া কিছুদূরে সরিয়া গেল; আমার হঠাৎ কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল, বদ্ধদ্বার ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম—অভাগিনীর মৃতদেহ ভূমিতে লুটাইতেছে; শিহরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম

ল লি ত - সৌ দা মি নী

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ষোড়শী কুলীনকুমারী সৌদামিনী এক দিবস অপরাহ্ণে বিরলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। প্রফুল্ল শতদল সদৃশ মুখখানি প্রতিভাশূন্য দেখাইতেছে—চক্ষুর পক্ষ্মাগ্রভাগে গুটি দুই অশ্রুবিন্দু মুক্তাফলের ন্যায় ঝুলিতেছে—নিবিড় কৃষ্ণ

কুঞ্চিত কুন্তলজাল নিতম্ব ঝাঁপিয়া পড়িয়া মেঘমালার ন্যায় শোভা সম্পাদন করিতেছে—তপ্তকাঞ্চননিভ উজ্জল গৌরকান্তি বিদ্যুৎপ্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। সৌদামিনী অবনতমস্তকে রোদন করিতেছেন। এমন সময় অনতিদূরস্থ পদধ্বনি সৌদামিনীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সৌদামিনী চমকিয়া কক্ষ-দ্বারাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন তাঁহার মাতা সাবিত্রীসুন্দরী আসিতেছেন। সৌদামিনী ত্রস্ত হইয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন এবং একটি সূচিকা গ্রহণ করিয়া শেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রী গৃহে প্রবেশ করিয়া চতুর্দিক অবলোকন পূর্বক সৌদামিনীর নিকট গিয়া বসিলেন। সৌদামিনী মুখ তুলিয়া দেখিলেন না। শেলাই করিতেই লাগিলেন —যেন তিনি এতক্ষণ অনবরতই সূচীকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সুদাম! চুপ ক'রে বসে আছিস্ কেন?"

সৌদামিনী মুখ তুলিয়া একটু হাসিলেন, ভাবিলেন একটু হাসিলে সাবিত্রী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল। সাবিত্রী তাঁহার মুখে স্পষ্ট বিষণ্ণতার চিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া সাদরে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "আজ তোর কি হয়েছে? অমন কচ্ছিস্ কেন?"

সৌদামিনী মুখ তুলিয়া পুনরায় হাসিতে গেলেন। কিন্তু আশানুরূপ কৃত-কার্য হইলেন না। হাসির সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষু দিয়া দুটি ধারা বহিল। রৌদ্রবৃষ্টি এককালে হইল। ভাবুক যদি দেখিত, তাহাব ভাবসিন্ধু উছলিয়া উঠিত।

সাবিত্রী সৌদামিনীর চিবুকে নিজহস্ত সংলগ্ন করিয়া কহিলেন, "ভেবে কি করবে বাছা, অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই। প্রজাপতির নির্বন্ধ কি কেউ খণ্ডাতে পারে?"

মাতার সকরুণ কথায় সৌদামিনী পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল বেগে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সৌদামিনী কুলীনকন্যা। জন্মাবধিই মাতামহালয়ে বাস। তাঁহার পিতার ৪টি বিবাহ। তন্মধ্যে এক স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হইয়াছিল। অপর তিনটির—দুইটির সন্তানাদি হয় নাই। সৌদামিনী তাঁহার মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতার নাম বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বামনদাস, যে স্ত্রীটির গর্ভে একটি পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাকে লইয়াই ঘরসংসার করিতেন। অপর তিনটির তত্ত্ব তল্লাস লইতেন না।

ক্রমে সৌদামিনী বিবাহযোগ্যা হইলে তাঁহার মাতুল বামনদাসের নিকট পাত্রানুসন্ধান করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। বামনদাস সে পত্রে মনোযোগ করিলেন না। ভাবিলেন, সৌদামিনীকে সৎপাত্রে সমর্পণ করা তাঁহার মাতুলের অবশ্য কর্তব্য। বস্তুতঃ সৌদামিনীর মাতুল পত্র লিখিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনিও নিজে পাত্রানুস্কান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলেন—বামনদাসের স্বঘরের পাত্র পাইলেন না।

এমন সময় এক দিবস সাবিত্রী হঠাৎ একটি বালককে দেখিতে পাইলেন। বালকটির বয়স আনুমানিক দ্বাবিংশতি বৎসর, নাম ললিতমোহন। সৌদামিনীর মাতুলের বাটির নিকট এক বাটিতে ললিতের ভগিনীপতি দুশ্চিকিৎস্য চক্ষু-রোগাক্রান্ত হইয়া কালেজের ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করিবার মানসে আসিয়া বাসা করিয়াছিলেন। ললিত হিন্দুকালেজে পড়িতেন এবং সর্বদাই আসিয়া ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে দেখিয়া যাইতেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকেই জামাতা করিবেন মনে মনে স্থির করিলেন।

সাবিত্রী ললিতের কথা নিজ ভ্রাতার নিকট বলিলেন। তাঁহার ভ্রাতার নাম দিগম্বর। দিগম্বর অনন্তর ললিতের কুলশীলের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। প৷রচয়ে জানিতে পারিলেন ললিত বংশজ। দিগম্বরের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। পাত্রটি দেখিতে শুনিতে ও বিদ্যা বুদ্ধি সর্বাংশেই উৎকৃষ্ট। কিন্তু বংশজকে কি প্রকারে নৈকোষ্য কুলীনের কন্যা দান করেন?

সাবিত্রী ললিতকে প্রথমতঃ যে প্রকারে দেখেন, সৌদামিনীও সেইরূপে এক দিবস ললিতকে দেখিতে পাইলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের বাটির জানালায় বসিয়া আছেন, এমন সময় ললিত তাঁহার ভগ্নীপতিকে দেখিতে আইলেন, ললিতকে দেখিবামাত্রই সৌদামিনীর মন প্রাণ ললিতের প্রতি আকৃষ্ট হইল। প্রণয় চিরকালই এরূপে আরম্ভ হয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া,—স্বভাব বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া কাহার কোন্ কালে প্রণয় হইয়া থাকে? বারুদ অগ্নিস্পর্শ মাত্রেই যেরূপ প্রজ্বলিত হয়, কাষ্ঠাদির ন্যায় রহিয়া রহিয়া জলে না, সেইরূপ প্রণয় দর্শন মাত্রেই হয়, অল্পে অল্পে কখনও প্রণয়ের উৎপত্তি হয় না।

রোগী বিশ্রাম লাভার্থে যতই শয্যায় এ পাশ ও পাশ ফিরিতে থাকে ততই তাহার নিদ্রা দূর হয়, সেইরূপ যে ভালো বাসিয়াছে সে যতই নিজ মনের ভাব গোপন করিতে চায় ততই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। অল্প-

দিনের মধ্যেই সাবিত্রী সৌদামিনীর মনের ভাব অবগত হইতে পারিলেন। কিন্তু ললিত বংশজকুলোদ্ভব, সৌদামিনীর সহিত তাঁহার পরিণয় অসম্ভব, জানিতে পারিয়া সাবিত্রী নিজ তনয়াকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া ললিতের চিন্তা দূর করিতে কহিলেন। সৌদামিনীকে আর জানালায় বসিতে দেন না। তাঁহাকে নিষ্কর্মা দেখিলে অমনি কোনো না কোনো কার্যে নিয়োজিত করেন। কিন্তু প্লাবনের জল কার সাধ্য হঠাৎ শুখায়, সৌদামিনী একাকিনী হইলেই বসিয়া বসিয়া অনবরত ললিতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, এবং কেহ কোথায় না থাকিলে অমনি গিয়া জানালায় বসিতেন।

ললিতের ভগিনীপতিকে এক্ষণে ললিত প্রত্যহই দেখিতে আইসেন। পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে। কিন্তু ললিতের আসার ক্ষান্ত না হইয়া বৃদ্ধি হইতেছে। এক দিবস ললিত ভগিনীপতিকে দেখিয়া পুনরায় নিজ বাসে গমন করিয়াছেন। যতক্ষণ ললিত ছিলেন সৌদামিনী তাঁহাকে অনিমিষ লোচনে নিরীক্ষণ করিলেন। ললিত চলিয়া গেলে ঘরের মেঝের উপর বসিয়া ললিতের চিন্তা করিতে লাগিলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে দুই এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইতেছিল। এইরূপ সময়ে সাবিত্রী অনেকক্ষণ তনয়াকে না দেখিতে পাইয়া যে ঘরে সৌদামিনী বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভোক্ত সান্ত্বনা বাক্যগুলি তনয়াকে প্রয়োগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষ একবার মস্তিষ্কে উঠিলে আর তাহার চিকিৎসা করা বৃথা। তখন সে অসাধ্য হইয়া পড়ে। সৌদামিনীকে উপদেশ বাক্য, এক্ষণে সেই অবাধ্য রোগে ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় হইয়াছিল। সৌদামিনী মাতার কথা মনোযোগ পূর্বক শুনেন ও তদনুরূপ কার্যানুষ্ঠান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন কিন্তু সকলি বৃথা হইয়া পড়ে। তাঁহার মন আর আত্মবশে নাই। বহন্তা নদীকে পথান্তর খনন করিয়া অনায়াসে সেই নূতন পথে লইয়া যাওয়া যায়; কিন্তু তাহার প্রবাহ কেহ একেবারে বন্ধ করিতে পারে না। সৌদামিনীকে বোধ হয় পাত্রান্তরে বিমুগ্ধমনা করা যাইতে পারিত কিন্তু তাঁহার মাতা সে চেষ্টা করেন নাই। তিনি একেবারে তাঁহাকে চিন্তাশূন্য করিবার যত্ন করিয়াছিলেন।

প্রয়াহকে একেবারে শুষ্ক করিবেন মানস করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে নিষ্ফল প্রয়াস হইবেন তাহার আর বিচিত্র কি ?

সাবিত্রী যখন দেখিলেন যে তাঁহার সমুদায় যত্ন বিফল হইল, তখন তিনি তদীয় ভ্রাতাকে পুনরায় ললিতের কথা কহিলেন। ললিত সর্বাংশে সুপাত্র ; কিন্তু তাঁহার সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিলে বামনদাসের কুল থাকিবে না। তাহাতে সাবিত্রীর কি ক্ষতি ? সাবিত্রীর পুত্র সন্তান নাই যে তাহার কুল নষ্ট হইবে। সপত্নিপুত্রের কুল থাকিলেও সাবিত্রীর কোনো লাভ নাই, গেলেও কোনো দুঃখ নাই।

দিগম্বর শুনিয়া ভগিনীকে বিস্তর বুঝাইলেন। কহিলেন, "কুলীনের কুল নষ্ট করা মহাপাপ, তাহাতে যত্নবান্ হওয়াও উচিত নয়।" সাবিত্রী উত্তর করিলেন, "তোমরা যদি সত্বর সৌদামিনীর বিবাহ না দাও, তবে আমি ললিতের সহিত তাহার বিবাহ দিব। আমি কাহারো কথা শুনিব না।"

দিগম্বর উত্তর করিলেন, "দিদি! আর দশ দিন কাল বিলম্ব কর। যদি এত দিন গিয়াছে তবে আর দশ দিনে কি হবে ? আমি একখানা পত্র লিখি, দেখি কি জবাব পাই।"

সাবিত্রী কহিলেন, "তবে পত্র লেখ। কিন্তু আমি এগারো দিনের দিন বিবাহ দেব, তার আর ভুল নাই। আমি আর কাহাকে জানাবও না, দিন ক্ষণও দেখিব না।"

দিগম্বর উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, দশ দিনই যাউক তার পর তোমার যা খুশি তাই করো। আমি আজই পত্র লিখিব। দশ দিনের মধ্যে অবশ্যই পত্রের উত্তর পাইব।"

ললিতকে দেখিয়া সৌদামিনীর যেরূপ মন হইয়াছিল, সৌদামিনী দর্শনেও ললিতের সেইরূপ হইয়াছিল। দুই এক দিবস ভাবিলেন সৌদামিনী লালসা আমার পক্ষে বামনের প্রাংশুলভ্য ফল লালসার ন্যায়। কিন্তু যখন সাবিত্রী নিজেই সেই কথা উত্থাপন করিলেন, তখন আর ললিতের পক্ষে সে আশা দুরাশা বলিয়া বোধ হইল না। যে আগুন ললিত ইচ্ছা পূর্বক অনায়াসেই নির্বাপিত করিতে পারিতেন, সাবিত্রী বায়ু স্বরূপ হইয়া সেই অগ্নিকে দিন দিন প্রবল করিয়া তুলিলেন। ললিত পূর্বে পূর্বে দুই তিন দিনে একবার আসিতেন, কিন্তু এক্ষণে প্রত্যহই আসিতে আরম্ভ করিলেন। ললিতের ভগ্নী নিষেধ

করিবেন ভাবিলেন, কিন্তু লজ্জায় ভ্রাতার নিকট ও বিষয়ে কথা কহিতে পারিলেন না। ললিতের ভগিনীপতি সমস্ত দিবস একাকী থাকিতেন। চক্ষু রোগ নিবন্ধন পড়াশুনা করিয়া কালক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিকটে কেহ বসিয়া কথোপকথন করিলে তিনি যার পর নাই শান্তি প্রাপ্ত হন। সুতরাং তিনি, যাহাতে ললিত পূর্বাপেক্ষাও ঘন ঘন আইসে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংক্ষেপতঃ ললিতকে কেহ কোনো উপদেশ দিল না, কেহ তাঁহাকে স্বরূপ দেখিতে সাহায্য করিল না। ললিতের পড়াশুনা বন্ধ হইয়া গেল। বাসায় থাকিলে কতক্ষণে ভগ্নীপতিকে দেখিতে আসিবেন ভাবেন। ভগ্নীপতিকে দেখিতে আসিলে আবার, পুনরায় বাসায় প্রত্যাগমন করিতে হইবেক এই ভাবনায় সন্তাপিত হন। সাবিত্রী ক্রমাগত ললিতের উৎসাহই বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন, এক দিনের জন্যও এমন কথা বলেন নাই যে, বিবাহ না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সৌদামিনীকে কখনই উৎসাহের কথা কহেন নাই। তাহাকে অনবরতই এ বিবাহ যে সম্ভবপর নহে তাহাই বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন।

সকলে এই ভাবে অবস্থিত আছেন এমত সময়ে দিগম্বর নিজ ভগিনীপতিকে পত্র লিখিলেন। দশ দিবসের মধ্যেই পত্রের উত্তর আইল। বামনদাস সানুনয়ে অন্তত আর এক মাস অপেক্ষা করিতে লিখিয়াছেন। বলিয়াছেন এক মাসের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া একেবারে কলিকাতায় পৌছিয়া শুভ কর্ম সম্পন্ন করিবেন। দিগম্বর ভগিনীকে পত্রের মর্ম অবগত করাইয়া সেইরূপ অনুরোধ করিলেন। তখন সাবিত্রী মহা গোলযোগে পড়িলেন। ললিতকে বলিয়া রাখিয়াছেন দশ দিবসের পরেই বিবাহ দিবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনো রূপেই পত্রের জবাব আসিবে না। কিন্তু ভাবিয়া আর কি করিবেন? লজ্জাবনত-মুখী হইয়া ললিতের ভগিনীকে পত্রের মর্ম অবগত করাইয়া কহিলেন, "ললিতকে বলো কর্মের সুবিধা হইবেক না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ললিত প্রত্যহ যে সময় ভগিনীপতিকে দেখিতে আসিতেন, অদ্য সে সময় অতিক্রম করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় ভগিনীপতির বাসায় সমাগত হইলেন। সৌদামিনীর পিতার নিকট পত্র অদ্য দশ দিবস গিয়াছে। অদ্য উত্তর না

আসিলে সৌদামিনী তাঁহার হইবেন। ললিত এই ভাবিয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া আসিলেন যে, ভগিনীপতির বাটীতে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকিবেন কিংবা তাহার পরেও দুই চারি দণ্ড অপেক্ষা করিয়া যাইবেন। একেবারে দশম দিবসের শেষ খবর লইয়া যাইবেন। ললিত রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া কম্পিত হৃদয়ে তদীয় ভগিনীপতির দ্বারে আঘাত করিলেন। ললিতের ভগিনী গিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন। ললিতের ভগিনীর মুখ অদ্য কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ। কিন্তু ললিতের হৃদয় সৌদামিনীময়। তাহাতে তৎকালে অন্য কাহারো স্থান হওয়া অসম্ভব। ললিতের চক্ষে তাঁহাব ভগিনীর মুখে কোনো বৈলক্ষণ্য বোধ হইল না। অন্যান্য দিবসের ন্যায় ললিত গিয়া তদীয় ভগিনীপতির নিকট উপবেশন করিলেন। অন্যান্য দিবস হয় সাবিত্রী নতুবা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোনো না কোনো লোক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। তিনি আসিলেই তাহাদিগের মুখে দিবসের খবর পাইতেন, কিন্তু অদ্য কেহই তাঁহার নিকট আসিয়া সংবাদ জানাইল না। ললিত অত্যন্ত চঞ্চল-চিত্ত হইলেন। তাঁহার ভগিনীপতি কথা কহেন কিন্তু তাহা ললিতের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হয় না। হয় তো ললিতের ভগিনীপতি এক কথা কহিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন—ললিত কিছুই জানিতেছেন না; অথবা উত্তর দিতেছেন কিন্তু "হাঁ" স্থানে "না" বা "না" স্থানে "হাঁ" বলিতেছেন। ললিতের ভগিনীপতি ললিতের চিত্তচাঞ্চল্য অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইলেন, তিনি তাহার কারণ সম্যক অবগত ছিলেন। কিন্তু কি প্রকারে তিনি ললিতকে কুসংবাদ দিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, এবং যে বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল তাহা ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ললিতও চুপ করিয়া থাকিলেন। সন্ধ্যা হইল, প্রদীপ জ্বালা হইল, যে ঘরে ললিত ও তদীয় ভগিনীপতি বসিয়াছিলেন সেই ঘরে দাসী প্রদীপ দিয়া গেল। হঠাৎ আলোক অবলোকন করিয়া ললিত ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আর কি উপলক্ষে বসিয়া থাকিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ভগিনীপতিকে কহিলেন, "তবে আজ আমি যাই।"

ললিতের ভগিনীপতি উত্তর করিলেন, "হাঁ, আর আজ থাকিয়া কি করিবে?"

ললিত এই কথা শুনিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তখন ললিতের ভগিনী-পতির যেন হঠাৎ মনে হইল, ললিতকে কোনো কথা কহিতে হইবেক; এজন্য

তিনি ললিতকে কহিলেন, "ভালো কথা, ললিত তোমার একটা সংবাদ আছে শুনে যাও।"

ভগিনীপতির কথা শুনিয়া ললিতের হৃৎপিণ্ড এরূপ জোরে বক্ষঃস্থলে প্রতিঘাত হইতে লাগিল যে ললিতের বোধ হইল তাঁহার ভগিনীপতি সে আঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলেন। ললিত যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই-খানেই বসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি সংবাদ ?"

ললিতের ভগিনীপতি কহিলেন, "সৌদামিনীর সহিত তোমার যে বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল তাহার প্রতিবন্ধক পড়িয়াছে। সে বিবাহ হইবেক না।"

ললিত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "কে কহিল ?"

ললিতের ভগিনীপতি উত্তর করিলেন, "সৌদামিনীর মাতা দাসী দ্বারায় সংবাদ পাঠাইয়াছেন। দাসী কহিয়া গেল, 'মা লজ্জায় নিজে আসিতে পারিলেন না ; আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন'।"

ললিত ক্ষণ-কাল মৌনভাবে থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বিবাহ হ'বে ?"

ললিতের ভগিনীপতি উত্তর করিলেন, "দাসী কহিল সৌদামিনীর পিতা উপযুক্ত পাত্র লইয়া সত্বর কলিকাতায় পৌছিয়া নিজ কন্যার বিবাহ দিবেন। তিনি ত্বরায় পৌছিবেন।"

ললিতের আর উঠিয়া যাইবার শক্তি রহিল না, কিন্তু তথাপি কহিলেন, "তা আমি জানি। আমি কখন প্রত্যাশা করি নাই যে আমার সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইবেক। কুলীনের কন্যা আমাকে দিবে কেন ? তবে তাঁরাও বলিতেন, আমিও সায় দিতাম।"

ললিতের ভগিনীপতি ললিতের কথায় কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ললিতও কিয়ৎক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া তথা হইতে উঠিয়া নিজবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। সে রাত্রি ললিত কি রূপে অতিবাহিত করিলেন সহজেই অনুভূত হইতে পারে। পর দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া ললিত পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিবেন স্থির করিলেন। পুস্তকাদি খুলিয়া দেখিলেন সমুদায় আবার প্রথম পত্র হইতে আরম্ভ করিতে হইবেক। এদিকে গণনা করিয়া দেখিলেন পরীক্ষার আর অধিক দেরি নাই। সাত পাঁচ ভাবিয়া স্থির

করিলেন এ বৎসর পরীক্ষা দিবেন না। তবে কলিকাতায় থাকিবারই বা আবশ্যকতা কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া ললিত সেই দিবসই পুস্তকাদি লইয়া বাটী গমন করিলেন। ট্রেন যখন চলিতে আরম্ভ হইল তখন ললিত কত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন তাহা বলা দুঃসাধ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত কলিকাতা অদৃশ্য না হইল ততক্ষণ পশ্চাৎ ভাগ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কলিকাতা অদৃশ্য হইল। ললিত নিজ বস্ত্রে মুখাবরণ পূর্বক অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্রয় বৃক্ষ ভগ্ন হইলে আশ্রিত লতার যেরূপ দুরবস্থা হয়, ললিত বিরহে সৌদামিনীর চিত্ত সেইরূপ হইল। ললিতের সহিত তিনি কখন কথা কন নাই, একত্র উঠা বসা করেন নাই, তথাপি ললিত চলিয়া গেলে তাঁহার হৃদয় শূন্য, গৃহ শূন্য, সমুদায় সংসার শূন্য বোধ হইতে লাগিল। সাবিত্রী এক দিনের জন্যও সৌদামিনীকে ললিতের সহিত বিবাহ হইবে বলিয়া উৎসাহ দেন নাই, কিন্তু তথাচ সৌদামিনীর চিত্তে এক প্রকার বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার ললিতের সহিত পরিণয় হইবেক। এক্ষণে সেই বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। সৌদামিনী নিজ মনের ভাব গোপন করিবার জন্য যত্ন করিলেন। কিন্তু কোনো রূপে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। পূর্বে যে স্থানে বসিলে ললিতকে দেখিতে পাইতেন সেই স্থানে সর্বদা থাকিতে ভালোবাসিতেন কিন্তু এক্ষণে ভ্রমেও আর সে গৃহে গমন করেন না। সৌদামিনীর মুখের হাসি যেন কোথায় গেল, ভাবিয়া ভাবিয়া বর্ণ মলিন ও শরীর শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার পিতা লিখিয়াছিলেন এক মাসের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সমভিব্যাহারে কলিকাতায় পৌঁছিবেন। সে এক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। পাত্র সমভিব্যাহারে আসা দূরে থাকুক তিনি একখানি পত্রও লিখিলেন না। সাবিত্রীও যার পর নাই চিন্তিতা হইলেন। তনয়ার সুখে তাঁহার সুখ, তনয়ার দুঃখে দুঃখ; ভাবনায় সেই তনয়াকে কৃশাঙ্গী দেখিয়া সাবিত্রী সাতিশয় ভাবনা-যুক্ত হইলেন। ললিতকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন সেজন্য এক্ষণে হৃদয় আত্মগ্লানিতে সন্তাপিত হইতে লাগিল। কতবার ললিতকে পত্র লিখিতে উদ্যত হইলেন, কতবার আবার নিরস্ত হইলেন। কি লজ্জায়, যাহাকে

একবার বিদায় দিয়াছেন তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করিবেন ? এই রূপে যখন তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন আর সাবিত্রী থাকিতে পারিলেন না। ললিতকে পত্র লিখিলেন। লিখিলেন যে এবার আর বিবাহ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহার আগমন মাত্র প্রতীক্ষা। সৌদামিনীর পিতা যদি রতিপতির ন্যায় রূপবান, বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বান, কুলে কুলীনের অগ্রগণ্য পাত্রও লইয়া আইসেন, তথাপি সাবিত্রী সৌদামিনীকে ললিতের করে সমর্পণ করিবেন।

সাবিত্রী এই ভাবিয়া ললিতকে এরূপ পত্র লিখিলেন যে যদি তাঁহার সৌদামিনীকে সুখী করিতে না পারি তবে তাঁহার জীবনে ফল কি? কৌলীন্যের অনুরোধে তিনি নিজ স্বামী বর্তমানেও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তাঁহার তনয়াকে কখনই যে যন্ত্রণা ভোগ করিতে দিবেন না এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া তিনি সৌদামিনীকে কহিলেন, "বাছা আর কেঁদ না, এই ললিতকে পত্র লিখিলাম। ললিত আসিলেই তোমার বিবাহ দিব। আর কাহারও অনুরোধ শুনিব না।"

যে দিবস প্রাতঃকালে সাবিত্রী ললিতকে উল্লিখিতরূপ পত্র লিখিলেন, সেই দিবস সায়ংকালে বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হৃষ্টচিত্তে পাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া দিগম্বরের বাটীতে উপনীত হইলেন। পাত্রটির নাম রামকানাই চট্টোপাধ্যায়। রামকানাই কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, কৃশ। বয়ঃক্রম আনুমানিক চত্বারিংশৎ বৎসব, মস্তকের কেশ দুটি একটি পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং সম্মুখের দুইটি দন্ত পড়িয়া গিয়াছে। এই পাত্র। ইহাই অনুসন্ধান করিতে বামনদাসের তিন মাস অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি দিগম্বরের দ্বিতীয় পত্র পাইবামাত্রেই বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। নানা স্থান অনুসন্ধান করিলেন, কোনোখানেই সুপাত্র, অর্থাৎ তাঁহার সমান ঘরের পাত্র পাইলেন না। পরিশেষে রামকানাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিবাহ করা রামকানাইয়ের ব্যবসায়। তিনি ইতিপূর্বে এগারোটি কুলীন কামিনীর আইবড় নাম ঘুচাইয়াছেন। সৌদামিনীকে উদ্ধার করিতে পারিলে দ্বাদশটি হয়। বামনদাস রামকানাইকে পাইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং অন্যান্য কথোপকথনের পর সৌদামিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। রামকানাই কহিলেন উপযুক্ত পণ পাইলে বিবাহ করিতে তাঁহার কোনো আপত্তি নাই, তবে এক

কথা এই তিনি স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে যদি বামনদাস সম্মত হন তবে দিন স্থির করিয়া বলিয়া গেলেই রামকানাই নির্ধারিত দিবসে কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইবেন।

বামনদাস ভাবী জামাতাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাপু তুমি চির-জীবী হও, তোমার ন্যায় সুবুদ্ধি লোক আজকাল মেলা ভার। তুমি যথার্থই কুলীনের মর্যাদা বুঝো, তুমিই যথার্থ কুলীন। তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে আমি তৎসমুদায়ে সম্মত আছি। কন্যার ভরণপোষণের ভার তোমার লইতে হইবেক না। আমি তাহা ইষ্টম্বরে লিখিয়া দিতে পারি। সে জন্মাবধি মাতামহালয়ে আছে, বিবাহের পরেও সেইখানে থাকিবেক। এখন পণের কথাটা সাব্যস্ত হইলেই হয়।"

রামকানাই উত্তর করিলেন, "পণের কথা পাত্রীর বয়সের উপর নির্ভর করে। কন্যা যতই বয়স্থা হইবেক পণ ততই বেশি লাগিবেক। এ কথা আপনি না জানেন তাহা ত নহে? আপনিও ত কুলীন?"

বামনদাস কহিলেন, "যাহা বলিলে, সত্য। কিন্তু আমার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে পণের কথাটা বলো, আমার কন্যার বয়সও অধিক নহে। যদি বড়ো বেশি হয় তবে চৌদ্দ বৎসর।"

রামকানাই একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "বৎসর পিছু দু'টাকা দিবেন, আপনার নিকট আর অধিক প্রার্থনা করিব না।"

বামনদাস বিস্তর বলিয়া কহিয়া ১৫৲ টাকায় রাজী করিয়া রামকানাইকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছেন। সমস্ত পথ ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া-ছিলেন শ্বশুর-বাটী গেলে তাঁহার আদরের সীমা থাকিবেক না, কিন্তু সে আশা যে কতদূর ফলবতী হইল তাহা পরে জানা যাইবেক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ললিতের ভগিনীর নাম গিরিবালা। তাঁহার ভগিনীপতির নাম কেশবচন্দ্র। কেশবের চক্ষে ছানি পড়িয়াছিল; সেই ছানি কাটাইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ছানি কাটিবার উপযুক্ত না হওয়ায় তাঁহাকে অনেক দিবস কলিকাতায় থাকিতে হইল। পরে ছানি কাটিবার যোগ্য হইলে ডাক্তার সাহেব এক চক্ষের ছানি কাটিয়া দিলেন। কহিলেন একটা

আরোগ্য হইলে অন্তটা কাটিবেন। ললিত যখন বাটী যান তখন একটি চক্ষু বিলক্ষণ আরোগ্য হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার সাহেব তথাপি পড়াশুনা বা যে কোনো কার্যে অধিকক্ষণ চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি প্রয়োজন হয় তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ললিত কলিকাতায় থাকিতে তিনি প্রত্যহই কেশবকে দেখিতে আসিতেন এবং প্রায় সমস্ত দিবস তাঁহার নিকট থাকিয়া কথোপ-কথন বা তাশ ক্রীড়া করিতেন। কিন্তু ললিত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেলে কেশবের পক্ষে একাকী থাকা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিল। তাঁহার স্ত্রী পাক শাক ও অন্যান্য গৃহকার্যে সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। কেশবের নিকট বসিয়া কথোপকথন করেন এরূপ অবকাশ পাইতেন না। ললিতের গমনের পর প্রথম দিবস কেশব কোনো রূপে কাটাইয়া দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিবস আর নিষ্কর্মা থাকিতে পারিলেন না। একখানি পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মনে করিয়াছিলেন দুই এক পৃষ্ঠা পড়িয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ পুস্তকখানি এতই ভালো লাগিয়াছিল যে তাহা শেষ না করিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে ৮টা ৯টার সময় আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর রাত্রি ১০টার সময় শেষ হইল। গিরিবালা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র তাঁহার কথা শুনিলেন না, কহিলেন, "কোনো কষ্ট বোধ হইতেছে না তবে কেন না পড়িব? আর কত কালই বা চক্ষু থাকিতে অন্ধের ন্যায় বসিয়া থাকিব?" সঙ্ক্ষেপতঃ কেশব স্ত্রীর নিষেধ শুনিলেন না। পুস্তকখানি এক দিবসেই শেষ করিলেন।

পুস্তক সমাপ্ত করিয়া কেশব হৃষ্টচিত্তে শয়ন করিলেন। কোনোই অসুখ নাই। কিন্তু শেষ রাত্রে চক্ষের বেদনায় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। জাগিয়া দেখিলেন আর চক্ষু মেলিতে পারেন না। কোনো রূপে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস পুনরায় ডাক্তারকে চক্ষু দেখাইলেন। ডাক্তার দেখিয়া কহিলেন, "চক্ষুটি আর পূর্ববৎ হইবেক না। কিন্তু অপর চক্ষুটি অস্ত্র করিলে আরোগ্য হইতে পারে।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া কেশব রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিবালাও তদ্দর্শনে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর ডাক্তার সাহেব দুই চারিটি সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কেশব রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "এত দিনের পর অন্ধ হইলাম।

আর কিছুই দেখিতে পাইব না। কেনই বা তোমার কথা অবহেলা করিলাম ?"

গিরিবালা গাঢ়স্বরে উত্তর করিলেন, "সে কথা ভাবিয়া রোদন করিলে আর কি হইবে ? অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা ঘটিয়াছে।"

কেশব উত্তর করিলেন, "না গিরিবালা। তোমার কথা না শুনিয়া আমি যখন যে কার্য করিয়াছি তাহাতেই কোনো না কোনো অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তুমি মিথ্যা অদৃষ্টকে দোষিতেছ। এ আমার নিজের দোষ।"

গিরিবালা কেশবের শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অঞ্চল দ্বারা তাঁহার চক্ষু মুছিয়া দিয়া কহিলেন, "অদৃষ্টে লেখা আছে বলেই তুমি আমার কথা শুন নাই। অদৃষ্টের লিপি কি কাহারও বারণে বন্ধ হয় ?"

গিরিবালার কথা শুনিয়া কেশব ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "গিরিবালা, আমি আর কিছুই দেখিতে পাইব না !"

গিরিবালা রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "যদি একজনের চোখ আর একজনকে দেওয়া যাইত তাহা হইলে মাথার উপর ঈশ্বরই জানেন আমার চোখ এখনই তোমাকে দিতাম। কিন্তু তা যেখানে হবার যো নাই সেখানে যাতে একজনের চোখ দুজনের হয় তাই করিব। তুমি যেমন আমারে সব বিষয় বুঝাইয়া দাও আমি তেমনি তোমাকে যা যখন দেখিতে পাই বলিয়া দিব।"

কেশব কহিলেন, "আমার আর এক ভয় হচ্ছে, গিরিবালা, আমি অন্ধ হইলাম, তুমি আর এখন আমাকে ভালোবাসিবে না। কাণা বলিয়া ঘৃণা করিবে।"

গিরিবালা দুই হস্তে কেশবের পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, "এমন কথা মুখেও এনো না। পূর্বে আমি কখনো কখনো রাগ করিতাম, কখনো কখনো অভিমান করিতাম, কিন্তু এখন আর আমার তাহা কখনই ইচ্ছা হইবে না। আমি দেবতার স্থানে এই ভিক্ষা চাই যেন জন্ম জন্ম তোমার মতন স্বামী পাই।"

কেশব কহিলেন, "সে তুমি ভালোবাসিয়া যা বল। আমার মনের কথা এই, গিরিবালা যে, তোমার ন্যায় পত্নী বুঝি আর পৃথিবীতে নাই।"

গিরিবালা আর কথা কহিতে পারিলেন না। স্বামীর নিকট বসিয়া উচ্ছ্বাসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বামনদাস কর্তৃক আনীত পাত্র দর্শন করিয়া সাবিত্রী যার পর নাই বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন বামনদাস ললিতের মতন আর একটি পাত্র আনিবেন। রামকানাইয়ের ন্যায় পাত্র আসিবে তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। ললিতের সহিত দেখা হইবার অগ্রে যদি সাবিত্রী রামকানাইকে দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার প্রতি এত গাঢ় ঘৃণা জন্মিত না। ঘরে বয়স্থা কন্যা, পাত্রও বৃদ্ধ নহে; তাহাদিগের বিবাহ হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু একবার ললিতকে দেখিয়া রামকানাইয়ের ন্যায় পাত্রে কন্যা সমর্পণ করা সাবিত্রীর নিকট কন্যা জলে নিক্ষেপ করার ন্যায় বোধ হইল। ভালো পাইবার সম্ভব থাকিলে মন্দ কে চায়? সাবিত্রী একমাত্র কন্যাকে কেন রামকানাইয়ের করে সমর্পণ করিবেন?

বামনদাস স্বভাবতঃ যে রামকানাইকে কন্যা দান করিতে উৎসুক হইবেন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু রামকানাই এতাবৎ টাকার জন্যই বিবাহে সম্মত ছিলেন। তিনি কন্যাকে দেখেন নাই। কন্যা স্বরূপা তাহা অনুসন্ধান করিবার তাঁহার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। টাকা মেকি না হইলেই হইল। টাকার জন্যই তাঁহার বিবাহ, কন্যার জন্য নহে। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সৌদামিনীকে দর্শন করিয়া রামকানাইয়ের চিত্ত পরিবর্তিত হইল; তাঁহার আর অর্থ স্পৃহা রহিল না। তখন যদি সৌদামিনী লাভার্থ তাঁহার কিঞ্চিৎ ব্যয় হয় তাহাও তিনি প্রস্তুত। কিন্তু বিবাহের ভয়ানক প্রতিবন্ধক সমুত্থিত হইল। সাবিত্রী কহিলেন তিনি ওরূপ পাত্রে সৌদামিনীকে দান করিতে দিবেন না। বামনদাস বুঝাইলেন, তোষামোদ করিলেন, রাগ করিলেন, সাবিত্রী তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।

ভাব ভঙ্গী দেখিয়া রামকানাই বামনদাসকে কহিলেন, "মহাশয়! মনের ভাব ভেঙে বলাই ভালো, আমি বাড়ি হইতে সকলকে বিবাহ করিব বলিয়া আসিয়াছি। এমন স্থলে বিবাহ না করিয়া ফিরিয়া গেলে লোকে ঠাট্টা করিবে। বিশেষ, মুখে যা বলি কিন্তু আমার সংসারে স্ত্রীলোক নাই, বিবাহ করা আমার আবশ্যক হইতেছে, এমন অবস্থায় আমি পূর্বে যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম তাহার অতিরিক্ত আরও স্বীকার করিতেছি যে, বিবাহ হইলে আমি কন্যা

নিজ বাটী লইয়া যাইব।" রামকানাই ভাবিলেন যে পূর্বে তাঁহার কন্যা লইয়া ঘর করিবার কথা ছিল না। এক্ষণে তাহা স্বীকার করিলেন সুতরাং সাবিত্রীর আর অধিক আপত্তি থাকিবেক না ও বামনদাসও বিবাহ পক্ষে অধিকতর প্রয়াস পাইবেন।

বামনদাস কহিলেন, "যদি তোমাকে কন্যা দেয় তবে তো বাটী নিয়ে যা'বে। যে গতিক দেখিতেছি তাহাতে অপ্রতিভ হইয়া যাইতে হইবে সেই সম্ভবই অধিক।"

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া রামকানাই পুনরায় কহিলেন, "আমার সংসারে একটি স্ত্রীলোক নহিলে চলে না। কি করি যদি পনেরো টাকা হইতে কিছু বাদ দিলে সম্মত হ'ন আমার তাহাও কর্তব্য।" রামকানাই যেরূপ টাকার মর্ম বুঝিতেন অমন অতি অল্প লোকেই বুঝে। টাকা তাঁহার শরীরের শোণিত সদৃশ। সুতরাং কম টাকা লইলে যে সাবিত্রী তাঁহাকে কন্যা দান করিতে পারেন এরূপ ভাবনা তাঁহার পক্ষে বড়ো আশ্চর্যের ব্যাপার নহে।

বামনদাস স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, রামকানাই কি জন্য কম টাকা লইয়াও বিবাহ করিতে সম্মত। সুতরাং তিনি রামকানাইকে যে নিরাশ হইয়া যাইতে হইবেক ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "ইহারা বড়োমানুষ ; ৫।৭ টাকার প্রলোভনে ইহারা যে ভুলিবে তাহা বোধ হয় না।" বামনদাসের মনোগত ইচ্ছা যে বিনা পণে রামকানাই সম্মত হইলেই ভালো হয়। বস্তুত তাহাই ঘটিল। আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রামকানাই কহিলেন, "আমার নিতান্ত প্রয়োজন, বিশেষ বিবাহ করিতে আসিয়াছি, না করিয়া গমন করিলে লোকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে, অতএব আমি বিনা পণেই এ কর্ম করিতে সম্মত আছি।"

বামনদাসের ইচ্ছানুরূপ কথা হইল। ভাবিলেন সাবিত্রীর যদি পায় ধরিতে হয়, তিনি তাহাও ধরিবেন। যদি বিবাহের জন্য অনাহারে ধন্না দিতে হয়, তাহাও দিবেন। তিনি দেখিলেন এরূপ সুবিধা আর হইবে না। এমন ঘর, এত কম ব্যয়ে আর পাওয়া যাইবে না। তাঁহার কুলও এ কর্ম না হইলে আর টিকিবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় সাবিত্রীকে বুঝাইবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

সাবিত্রী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন—রামকানাইয়ের সহিত সৌদামিনীর

বিবাহ দিবেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা কেহ কখন ভঙ্গ করাইতে পারে নাই। বামনদাসও পারিলেন না। বামনদাস বুঝাইলেন, রামকানাইয়ের সহিত বিবাহ দিলে টাকা লাগিবে না, কুল বজায় থাকিবে, পাত্র নিতান্ত মন্দ নহে। সাবিত্রী সক্রোধে উত্তর করিলেন, "১৫ টাকা, আমি টাকা, আমি সাশ্রয় দেখাইতেছ, ও টাকা আমিই তোমাকে দিচ্ছি, তুমি এখন যেখানে ছিলে সেই খানে যাও।"

বামনদাস কাতরস্বরে কহিলেন, "টাকা যেন দিলে, কুলবজায়ের কি করলে?" সাবিত্রী পূর্ব্ববৎ সরোষে কহিলেন, "আমার কুলের দরকার কি? কুল না থাকিলেই আমার পক্ষে ভালো। বাবা কুলক্রিয়া করিয়াছিলেন বলিয়া আমার যাবজ্জীবনটা দুঃখে গেল। আবার আমি কুলক্রিয়া করিয়া সুদামকে চিরকালের জন্যে দুঃখভোগী করিয়া যাইব, তাহা আমি পারিব না।"

বামনদাস ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "তোমার কিসের দুঃখ হলো? তোমার কিসের অভাব?"

সাবিত্রীর আর বরদাস্ত হইল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কিসের দুঃখ? কিসের অভাব? অভাব আর দুঃখ এই যে, তুমি মর না।" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

বামনদাস তাঁহার অঞ্চলাকর্ষণ করিয়া কহিলেন, "আর একটা কথা শুনে যাও।"

সাবিত্রী উত্তর করিলেন, "যে শুন্‌তে চায় তাকে গিয়ে বল।" এই বলিয়া বলপূর্ব্বক নিজের অঞ্চল মুক্ত করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বামনদাসের আর একটি মাত্র উপায় রহিল—অনাহারে ধন্না দেওয়া। এক্ষণে সেই উপায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়া বহির্বাটী আগমন করিলেন। পাঠকবর্গকে বলা বাহুল্য বামনদাস অধুনাতন ইংরাজি-পরিমার্জ্জিত যুবক নহেন। স্ত্রীকে প্রহার করা অবিধেয়, তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না। তাঁহার এই দুঃখ হইতে লাগিল যে সাবিত্রী তাঁহার আলয়ে নহে। মনে মনে বলিলেন, "আমার বাটীতে থাকিলে বেতের আগে সোজা করিতাম।" কিন্তু

এ স্থানে আর তাহা ভাবিয়া কি করিবেন। মৌনভাবে আসিয়া রামকানাইয়ের নিকট উপবেশন করিলেন।

রামকানাই তাঁহাকে বিরসবদন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?" তিনি এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন যে একেবারে পণ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া কার্য ভালো হয় নাই, হয়ত কিঞ্চিৎ কম গ্রহণ করিবেন বলিলেই হইতে পারিত! হায়! ঘরে লক্ষ্মী আসিতেছিল, তিনি নিজেই তাহাকে বন্ধ করিলেন। কিন্তু বামনদাসকে বিরসবদন দেখিয়া চিন্তাদগ্ধচিত্ত অপেক্ষাকৃত শীতল হইল। ভাবিলেন যদি বিনাপণেও কর্ম করিতে স্বীকার না হইয়া থাকে তবে আর তিনি পণগ্রহণ করিবেন না বলায় ক্ষতি হয় নাই।

বামনদাস রামকানাইয়ের কথায় উত্তর না করিয়া যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানে শুইয়া পড়িলেন। রামকানাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"

বামনদাস কাতরস্বরে কহিলেন, "আর কি খবর? কোনো মতেই স্বীকার করে না। তার প্রতিজ্ঞা সে আমার কুল নষ্ট করিবে। আমারও প্রতিজ্ঞা যে যতক্ষণ সে আমার কথায় স্বীকার না হয় ততক্ষণ আমি অনাহারে এইখানে পড়িয়া থাকিব।"

রামকানাই কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকেও কি অনাহারে থাকতে হবে?"

বামনদাস কহিলেন "না, তুমি কেন থাকবে?"

অনন্তর স্নানের সময় দিগম্বর বামনদাসকে স্নান করিতে কহিলেন। বামনদাস উত্তর করিলেন, "আমি নাবও না, খাবও না। আমি এইখানে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।" দিগম্বর নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিলেন, বামনদাস কিছুতেই স্নান করিলেন না। তখন নিজ ভগিনীর নিকট গিয়া কহিলেন, "দিদি, যাতে ব্রাহ্মণের কুল বজায় থাকে, তার চেষ্টা কর।" সাবিত্রী সরোষে কহিলেন, "কুল গেলে ত বয়ে গেল, আমি প্রাণ থাকতে অমন বরে কন্যা দিতে পারব না।"

দিগম্বর নিরুপায় হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা তাই হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার মতের অন্যথা করব না। তুমি এখন একবার বল যে রামকানাইকে কন্যা দেবে, তাহ'লে আমি বাঁচি, আর আমার দ্বারে ব্রহ্মহত্যা হয় না।"

সাবিত্রী কহিলেন, "আমি যা বলব, তা করবে ?"

দিগম্বর উত্তর করিলেন, "করিব।"

সাবিত্রী। "তবে যা বল্‌লে স্নান আহার করেন, তাই গিয়ে বল।"

সাবিত্রী কি সংকল্প করিয়া দিগম্বরকে প্রতিশ্রুত করাইলেন তাহা পরে প্রকাশ হইবে। আপাততঃ বামনদাস আশ্বস্ত হইয়া স্নানাহার করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের অদৃষ্টের কথা মনুষ্য দূরে থাকুক, দেবতারাও বলিতে পারেন না। ললিতের ভগিনী ও ভগিনীপতি এতকাল সদ্‌ভাবে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে কেশবের চক্ষু গিয়াছে, গিরিবালার উচিত পূর্বাপেক্ষা তাঁহার অধিক যত্ন করা, কিন্তু কি আশ্চর্য এত কালের পর তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইবার সম্ভব হইল। বিবাদ আবার একটি দাসীর কথায়। দাসীটি বাল্যকালাবধি কেশবের বাটীতে আছে। কলিকাতায় আসিবার সময় কেশব সেই দাসীটি লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই দাসীটির দ্বারাই সংসারের কাজ কর্ম নির্বাহ হইত। কিন্তু কেশবের চক্ষু যাওয়া অবধি একটি চাকরের প্রয়োজন হইল। সর্বদা তাঁহাকে ডাক্তারখানায় যাইতে হয় কিন্তু এক্ষণে চক্ষু না থাকায় নিজে গিয়া গাড়ি ভাড়া করিয়া যাইতে পারেন না। ললিতও কলিকাতায় নাই যে তাঁহার দ্বারা এক্ষণে কোনো সাহায্য হইবে। দাসীটি পল্লীগ্রামের, সুতরাং সে সহরের ভাব ভঙ্গী কিছুই জানে না। এ সমস্ত কারণে একটি চাকর রাখা হইল, কিন্তু দাসী চাকরে এরূপ বিবাদ আরম্ভ হইল যে দাসীটি বহুকালের হইলেও গিরিবালা তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে কেশবের নিকট গমন করিয়া নিজের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিল কিন্তু যখন দেখিল যে কেশবও তাহাকে রাখিতে সম্মত নহেন তখন বলিয়া গেল, "এতকাল আমি ছিলাম কোনো কথাটি জন্মায় নি, এখন সখের চাকর আসিয়াছে আর আমায় দরকার নাই। আমি যদি আপনার মতন কানা হতে পাত্তেম, তবে আমি থাকলে কোনো আপত্তি থাকতো না।" কেশব দাসীর কথা শুনিয়া দূর দূর করিয়া তাহাকে তথা হইতে তৎক্ষণাৎ যাইতে আদেশ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে কেশবের রাগের সমতা হইলে কেশব ভাবিতে লাগিলেন, এত কালের পর দাসী আজ হঠাৎ এরূপ কথা বলিয়া গেল কেন? সে যদি কানা হইত তাহা হইলেই তাহার থাকার কোনো আপত্তি জন্মিত না। ইহার অর্থ আর কি হইতে পারে? কি ভয়ানক কথা কহিল? হায়, কেন তাহার নিকট সবিশেষ না শুনিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলাম? সন্দেহ একবার উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় ভিন্ন কমে না। তুচ্ছ কথা, যাহাতে পূর্বে কর্ণপাতও করিতেন না, এক্ষণে সেগুলি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। চাকরকে তামাক দিতে কহিলে যদি একটু দেরি হয় তাঁহার অমনি মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। এইরূপে দিন কতক কাটিয়া গেল। কেশব কাহাকে কিছু স্পষ্ট করিয়া বলেন না। কিন্তু গিরিবালা ও চাকরের প্রতি কথা, প্রতি পদধ্বনি, মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করেন, ও তদ্বিষয়ে তর্ক করেন। কেশব কখন কখন বোধ করেন যে সে সব কিছুই নহে, দাসীর রাগ প্রকাশ মাত্র; আবার সময়ে সময়ে যেন সমুদায় স্পষ্ট দেখিতে পান। কেশবের মন এই ভাবে আছে এমন সময় এক দিবস বহির্দ্বারে শব্দ হইল। চাকর ইহার পূর্বে বাজারে গিয়াছে সুতরাং গিরিবালা গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। একটি যুবা পুরুষ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গিরিবালাকে দেখিয়া একটু হাসিল। গিরিবালাও তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন। পরক্ষণেই যুবক গিরিবালাকে দরজার আড়ালে ডাকিয়া অস্পষ্ট স্বরে কি কহিল। অনন্তর গিরিবালা নিঃশব্দে দরজা পুনরায় বন্ধ করিয়া, যুবকটিকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ লইয়া, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিরিবালা স্বাভাবিক পদধ্বনি করিয়া যাইতে লাগিলেন। যুবক নিঃশব্দে গমন করিল। উভয়ে অন্তঃপুরে যাইতেছেন এমন সময় কেশব গিরিবালাকে ডাকিলেন। গিরিবালা নিকটে গেলে কেশব জিজ্ঞাসিলেন, "কে দুয়ারে না ডাকিতেছিল?" গিরিবালা অম্লানবদনে উত্তর করিলেন, "কেহ না।" কেশব জিজ্ঞাসিলেন, "ফিস্ ফিস্ করে কার সঙ্গে কথা কহিতেছিলে?" গিরিবালা কইলেন, "কৈ? কার সঙ্গে কথা কহিলাম?" কেশব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। গিরিবালা কেশবের মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া একটু মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

গিরিবালা! এই কি তোমার উচিত হইল? যে স্বামীকে তুমি দেবতা-

তুল্য জ্ঞান করিতে আজ তাঁহার চক্ষু গিয়াছে বলিয়া তাহাকে এত হেয়জ্ঞান করিলে ?

গিরিবালা স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। আগন্তুক যুবকও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। সে গৃহ হইতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিবার সময় যুবকের চর্ম-পাদুকা চৌকাঠে লাগিয়া শব্দ হইল। সেই শব্দ কেশবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কেশবের মনে হইল যেন তাঁহার হৃদয় পাদুকা দ্বারা আহত হইল। তিনি আবার গিরিবালাকে ডাকিয়া কিসের শব্দ হইল জিজ্ঞাসিলেন। গিরিবালা উত্তর করিলেন, "কৈ শব্দ হলো ?"

কেশব আবার মৌনাবলম্বন করিয়া বসিলেন, গিরিবালা যুবকের নিকট গমন করিলেন এবং তাহার সহিত নানাবিধ গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন।

কেশব ভাবিলেন চাকর প্রকাশ্যরূপে বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় প্রবেশ করিল ; আবার অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিবে।

গিরিবালা যুবককে লইয়া অনেকক্ষণ পরে পুনরায় বাহিরে আসিলেন। যুবককে কহিলেন, "এই বেলা যাও। নৈলে প্রকাশ হয়ে পড়বে।" এই বলিয়া যুবককে লইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দ্বারদেশে গমন করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু পুনরায় দ্বাররুদ্ধ করিবার সময় শব্দ হইল। কেশব জিজ্ঞাসিলেন, "কে—ও ?" গিরিবালা দেখিলেন আর গোপন করা যাইবে না, এজন্য কহিলেন, "চাকর ফিরিয়া আসিল কি না দেখিতে গিয়াছিলাম।" এই কথা বলিতে না বলিতে পুনরায় দ্বারদেশে শব্দ হইল। গিরিবালা গিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। এবার চাকর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া কথা কহিতে কহিতে আসিল। কেশব মনে করিলেন, "এই প্রকাশ্য প্রবেশ করিল।"

নবম পরিচ্ছেদ

সূর্য অস্তমিত হইল। পৃথিবী গাঢ়তিমিরাবৃত হইল। তদপেক্ষা গাঢ়তর তিমির কেশবের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল। পৃথিবীর সহিত মানব হৃদয়ের এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একতা আছে। অরুণোদয়ে কেবল পৃথিবী হাসেন এরূপ নহে। জীবলোক সমুদায় সূর্যালোকে প্রফুল্ল হয়। হাজার ভাবনা চিন্তা থাকিলেও রজনী

অপেক্ষা দিবাভাগে মন নিরুদ্বেগ থাকে। যামিনী নিজে মলিন, সুতরাং সকলকেই মলিন করিতে পারিলেই যেন ভালো থাকে।

রজনী আগমনে কেশবের হৃদয় যার পর নাই সন্তাপিত হইতে লাগিল। গিরিবালা রন্ধনাদি করিয়া কেশবকে আহার করিতে ডাকিলেন। কেশব ক্ষুধা নাই বলিয়া আহার করিলেন না। অন্যান্য সকলে আহারাদি করিল। চাকর গিয়া নিজস্থানে শয়ন করিল। গিরিবালা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার গায়ে তালবৃন্ত-ব্যজন করিতে লাগিলেন। কেশব মনে করিলেন গিরিবালা তাঁহাকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এজন্য তিনি কহিলেন, "আজ আর বাতাস করিতে হইবে না। আমার জ্বরভাব হইয়াছে। গা শীত শীত করিতেছে। তুমি শোও।"

গিরিবালা স্বামীর কপাল স্পর্শ করিলেন। হাত কেশবের কপালে জ্বলন্তবৎ বোধ হইল। অনন্তর গিরিবালা শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

কেশব ক্ষণকাল শয়ন করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। এরূপ স্ত্রীর সহিত কিরূপে সহবাস করিবেন? গিরিবালাকে তিনি বিষধর সর্প জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া প্রকাশে বলিতে লাগিলেন, "গিরিবালা! এই কি তোমার উচিত? তুমি এমন হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমি এক্ষণে অন্ধ হইয়াছি, কোথায় তুমি আমাকে অধিকতর যত্ন করিবে, তাহা না করিয়া তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে?" এতদূর বলিয়া আর কেশব ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহার উচ্ছ্বাসে গিরিবালার নিদ্রাভঙ্গ হইল, কিন্তু তিনি তাহার কোনো চিহ্ন না দেখাইয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। কেশব কহিতে লাগিলেন, "গিরিবালা, ক্ষমা কর, তোমার বৃথা দোষ দিয়াছি। এ দোষ তোমার নহে, এ আমার অদৃষ্টলিপি। তুমি তো আমাকে সে দিবস পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলে, আমি তোমার কথা না শুনিয়া পড়িলাম। পড়িয়া চক্ষুরত্ন হারাইলাম। আমার অদৃষ্ট যদি ভালো হইত তাহা হইলে চিরকাল তোমার কথা শুনিয়া আসিয়া সে দিবস তোমার পরামর্শের বিপরীত আচরণ করিতাম না। আমার অদৃষ্ট ভালো হইলে তুমিই বা কেন আমাকে ত্যাগ করিবে? কিন্তু গিরিবালা, যদি তোমার চক্ষু এরূপ হইত তাহা হইলে আমি কখন তোমাকে অনাদর করিতাম না। কখন তোমাকে ত্যাগ করিয়া অপর

কাহাকে বিবাহ করিতাম না। গিরিবালা তোমার চক্ষু আছে বটে কিন্তু তুমি আমার অন্তঃকরণ দেখিতে পাইতেছ না। আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি তোমা বিনে যে আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না তাহা তুমি টের পাইতেছ না। তুমি বলিবে 'কানার ভালোবাসায় আবার কাজ কি?' সত্য, কিন্তু গিরিবালা তোমার অন্তঃকরণ যে মৃণাল অপেক্ষাও কোমল তাহা তো আমি জানি। আমার ভালোবাসার জন্য না হউক আমার অন্তঃকরণের কষ্ট একবার দেখিতে পাইলে তুমি আমাকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারিতে না। নিতান্ত পর হইলেও তুমি তাহার কষ্ট সহ্য করিতে পার না। গিরিবালা এখনও ফের। তুমি যাহা করিয়াছ তা করিয়াছ, আর আমাকে ত্যাগ করিও না। সহস্র দোষে দোষী হইলেও গিরিবালা তুমি আমারি। একবার তুমি আমাকে এইরূপ আদর করিয়া আমাকে 'আমারি' বলিয়া ডাক। তাহা হইলে আমার সকল দুঃখ দূর হইবে।"

এতদূর প্রকাশে বলিয়া কেশব চুপ করিলেন। গিরিবালার চক্ষে বারি বহিতে লাগিল। কিন্তু তিনি প্রকাশ করিয়া কিছুই বলিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ

সৌদামিনীর বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে। বামনদাস আনন্দ সলিলে ভাসিতেছেন। রামকানাই দুঃখার্ণবে হাবুডুবু খাইতেছেন। বামনদাসের উপর তাঁহার যার পর নাই রাগ হইয়াছে। মনে মনে ভাবিতেছেন, "বামনদাসকে সেই ধন্না দিতে হইল, তবে কিঞ্চিৎ আগে দিলেই হইত, তাহা হইলে আর আমার ক্ষতি হইত না।"

দিগম্বর সমস্ত দিবস বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত আছেন ; ভগিনীপতির সহিত বসিয়া গল্প করিবার অবকাশ নাই। ক্রমে সমস্ত উদ্যোগ হইল, কল্য রাত্রে বিবাহ। রামকানাইয়ের পূর্বরাত্রি নিদ্রা হইল না। সৌদামিনী-লাভ হইবে ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত আনন্দে উছলিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছু পণ পাইবেন না ভাবিয়া আবার যার পর নাই দুঃখিত হইতে লাগিলেন। বামনদাসের উপরেই তাঁহার রাগ,—তিনি কেন কিঞ্চিৎ অগ্রে ধন্না দিলেন না, এই তাঁহার দোষ।

বিবাহের দিন রামকানাই ও বামনদাস উভয়েই উপবাস করিলেন। সন্ধ্যা

সমাগত হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা দু'একটি করিয়া আসিতে লাগিলেন। বিবাহের লগ্ন অনেক রাত্রে; সুতরাং সকলে বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প ও রঙ্গকে লইয়া নানাবিধ হাস্য কৌতুক করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে রামকানাই কহিলেন, "দিগম্বর বাবু কোথায়?" বামনদাস কহিলেন, "কেন?" রামকানাই উত্তর করিলেন, "তাঁহার সহিত আমার কোনো বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার ডাকিয়া পাঠান।"

দিগম্বর বাটীর মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন, আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। রামকানাই বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমি ডাকছি, তাতে দেরি!"

নিকটে একজন বসিয়া ছিল, সে রামকানাইয়ের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "দিগম্বর বাবু শীঘ্র আসুন, শিশুপাল রাগ করছেন।"

রামকানাই রাগতস্বরে কহিলেন, "আপনি কি বল্‌লেন?"

সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "কিছু না।"

রামকানাই রাগত হইয়া কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দিগম্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকানাই তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "এমন স্থানে আমি বিবাহ করিতে চাই না। দু'দণ্ড আমাকে সুস্থির থাকিতে দেয় না।"

দিগম্বর কহিলেন, "তোমরা সকলে চুপ কর।" পরে রামকানাইকে কহিলেন, "মহাশয়! বিবাহের রাত্রে এমন ক'রে থাকে, আপনি ওসব কথায় কান দেন কেন?"

রামকানাই কহিলেন, "আর এক কথা আছে, আমি ২০৲ টাকা পণ না পাইলে বিবাহ করিব না।"

দিগম্বর কহিলেন, "সে কি মহাশয়? আপনি তো আগে এমন কথা বলেন নাই।"

রাম। "কখন বলি নাই? আমাকে কে জিজ্ঞাসা করিল?"

ইতিপূর্বে বামনদাসের সহিত রামকানাইয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছে, যদি রামকানাই বিবাহের সময়ে কোনো ছলে কিছু লইতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোনো আপত্তি নাই।

দিগম্বর কহিলেন, "বামনদাস বাবু বলেছেন আপনি পণ লইবেন না। কেমন বামনদাস বাবু, আপনি এ কথা বলেন নাই?"

বামনদাস নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হাঁ—না। তাই বটে—তাও তো নয়। কুলীনের ছেলে বিবাহের সময় কিছু পেয়ে থাকে।"

দিগম্বর কহিলেন, "এ আপনার বড়ো অন্যায়।"

বামনদাস কহিলেন, "যাক্ যাক্ সে সব কথা এখন যাক্—পরে হবে। এখন তুমি এঁর কুটুম্ব হ'লে, দশ পাঁচ টাকা চাইলে কি তুমি দেবে না?"

দিগম্বর কহিলেন, "সে স্বতন্ত্র কথা। রামকানাইকে যদি মেয়েই দি, তবে কি আর দু'চার টাকা চাইলে পাবেন না?"

দিগম্বরের কথার ভাবে বোধ হইল যে এখনও কন্যাদান পক্ষেই বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তখন বামনদাস ও রামকানাই কহিলেন, "সে কেমন কথা?"

দিগম্বর কহিলেন, "২০৲ টাকা না পেলে তো উনি আর বিবাহ করবেন না, তাই বল্‌ছিলাম।"

দিগম্বরের কথা শুনিয়া রামকানাইয়ের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলেন টাকা চাহিয়া ভালো কর্ম করি নাই।

এমন সময় বাটির অভ্যন্তরে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি হইল। বামনদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "লগ্নের সময় হলো কি?"

স্বরভঙ্গীর সহিত দিগম্বর উত্তর করিলেন, "হাঁ, বিবাহ হইল।"

বামনদাস ও রামকানাই উভয়েই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার মানে কি?"

দিগম্বর কহিলেন, "তার মানে আবার কি? বিবাহ হইল, এ কথার আবার কি অর্থ হইয়া থাকে।" এই বলিয়া সভাস্থ সকলকে বলিলেন, "আপনারা গাত্রোত্থান করুন, আহারের উদ্যোগ হইয়াছে।"

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ প্রতিবেশবাসী, তাঁহারা সকলেই এ ব্যাপার পূর্বাবধি অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা কেহ এ কথায় চমৎকৃত হইলেন না। প্রত্যেকেই উঠিয়া যাইবার সময়ে রামকানাইয়ের কান মলিয়া দিয়া যাইতে লাগিলেন। রামকানাই উচ্চৈঃস্বরে "দোহাই মেজেষ্টর সাহেব, দোহাই কোম্পানি সাহেবের" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

বামনদাস কহিলেন, "রামকানাই একটু স্থির হও, ব্যাপারটা কি শুনি।" বামনদাস যতই এইরূপ বলিতে লাগিলেন, ততই রামকানাই "দোহাই মেজেষ্টর

সাহেবের, দোহাই জজ সাহেবের, আমার জাত মারলে, আমার কান ছিঁড়লে" বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দিগম্বর বামনদাসের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "ব্যাপারটা শুন্‌তে চাও কি দেখ্‌তে চাও?"

বামনদাস কহিলেন, "শুন্‌তেও চাই, দেখ্‌তেও চাই।"

"তবে আমার সঙ্গে এস", এই বলিয়া দিগম্বর বামনদাসকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে গেলেন। সেই সঙ্গে রামকানাইও গমন করিলেন। যে স্থানে বর কন্যা ছিল, দিগম্বর বামনদাসকে তথায় লইয়া গিয়া বরকে কহিলেন, "ললিত, ইনি তোমার শ্বশুর, এঁকে প্রণাম কর।"

ললিত প্রণাম করিলেন। বামনদাস সরোষে কহিলেন, "আশীর্বাদ আর কি করিব, শীঘ্রই উচ্ছিন্ন যাও, এই আমার প্রার্থনা।"

রামকানাই উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরুক।"

দিগম্বর তাঁহাদিগের মুখে এতাদৃশ কথা শুনিয়া রাগতস্বরে কহিলেন, "বেরো তোরা আমার বাড়ি থেকে। যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা। আজি আনন্দের দিনে অমঙ্গলের কথা?" এই বলিয়া বামনদাসের বুকে হাত দিয়া ধাক্কা মারিলেন। বামনদাস সমস্ত দিবস অনাহারে; ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া রামকানাইয়ের গায়ের উপর পড়িলেন। রামকানাই অমনি মাটির উপর পড়িয়া গেলেন। বামনদাস তাঁহার উপর পড়িলেন। পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমাকে মেরে ফেল্‌লে, কে কোথায় আছ ঠ্যাকাও।" রামকানাই কহিলেন, "আমার সর্বস্ব লুটে নিলে। আমার টাকা কড়ি সব নিলে। কে কোথায় আছ রক্ষা কর। দোহাই মেজেষ্টর সাহেবের, দোহাই কোম্পানি সাহেবের।"

এই চীৎকার শুনিয়া যে যেখানে ছিল, সকলেই সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল। বামনদাস কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তোমরা সব দেখ আমার হাত ভেঙে গিয়েছে। আমি এখনই থানায় যাব।"

রামকানাই কহিলেন, "তোমরা সব দেখ, আমার নগদ দুশো টাকা ছিল, আর পাঁচ খান মোহর ছিল, সব লুটে নিল। আমি এর জন্য লাটসাহেবের কাছে যেতে হয় তাও যাব।"

দিগম্বর কহিলেন, "যা তোরা কোথায় যাবি যা। এখানে গোলমাল

করলে মেরে হাড় ভেঙে দেব।" এই বলিয়া উভয়ের হাত ধরিয়া বাটীর বাহিরে লইয়া চলিলেন। পশ্চাৎ হইতে অমনি দুই চারি জন রামকানাইয়ের কাপড় ধরিয়া কহিল, "কোথায় যান মহাশয়! গ্রামভাটী ও বারোয়ারী দিয়ে যান, নইলে যেতে দেব না।" উপস্থিত সকলে তদ্দর্শনে হাসিতে লাগিল। রামকানাই ও বামনদাস চীৎকার করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। দিগম্বর বিরক্ত হইয়া একজন পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া দিলেন। পাহারাওয়ালা উভয়কে তথা হইতে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সৌদামিনীর বিবাহে গিরিবালার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বিবাহ সমাধা হইবামাত্র তিনি নিজ বাটীতে আগমন পূর্বক কেশবের নিকট গমন করিলেন। কেশব নিজের শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। গিরিবালা কহিলেন, "তোমাকে যদি একটি সুসমাচার দিতে পারি, তবে আমাকে কি দাও?"

কেশব কহিলেন, "কে—ও গিরিবালা! কি সুসমাচার?"

গিরিবালা কহিলেন, "আগে আমাকে কি দেবে বল?"

"এ অন্ধের আর অদেয় কি আছে?"

"আমি তা শুন্‌তে চাইনে। তুমি একটু হাসবে কি না? আর আমার সমস্ত দোষ মার্জনা করবে কি না?"

কেশব গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "অন্ধের রাগে তোমার কি হবে?"

"তবে তুমি কিছু দেবে না,—আমি অমনই বলি। সৌদামিনীর সহিত ললিতের বিবাহ হইয়াছে।"

"সে কি! রামকানাইয়ের কি হ'ল?"

"তার শিশুপালের বিবাহ হয়েছে।"

কেশব চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বিষয়টা কি ভেঙেই বল না।"

গিরিবালা কহিলেন, "রামকানাইকে দেখে অবধি সুদামের মা প্রতিজ্ঞা করলেন তার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেবেন না। তাই শুনে বামনদাস আর নায়ও না, খায়ও না, বল্‌লে অনাহারে প্রাণত্যাগ করবে। সৌদামিনীর মা কি করেন? তাঁহাকে বল্‌লেন রামকানাইকে কন্যা দিবেন। এদিকে গোপনে ললিতকে এখানে আস্‌তে পত্র লিখ্‌লেন। ললিত পত্র পেয়ে এল, এসে আমাকে মাথার দিব্য দিয়ে বারণ করলে, যেন তুমি একথা শুন্‌তে

না পাও। আমি কত বল্‌লাম, তোমাকে বলায় কোনো ক্ষতি নাই, তবু সে শুন্‌লো না। এমনি দুই এক দিন আস্‌তে দাসী তাকে দেখ্‌তে পেলে, কিন্তু সন্ধ্যার পর বলে চিন্‌তে পারলে না। সে মনে করলে চাকরই বুঝি গোপনে বাহির হয়ে যাচ্ছে। এই মনে করে তার মনে সন্দেহ হ'ল। আমাকে মন্দ কথা বল্‌লে। সেই জন্য তাকে বিদায় ক'রে দিলাম। যাবার সময় বুঝি তোমাকে কিছু বলে গিয়ে থাক্‌বে, তাই তোমার মনে সন্দেহ হয়েছে। সে দিন রাত্রে তোমার কথা শুনে আমি জান্‌তে পারলাম। আমি তখনই তোমাকে সব কথা কহিতাম, কিন্তু ললিত দিব্য দিয়েছিল বলেই বলি নাই। আমি কি তোমাকে ত্যাগ করতে পারি? তোমার মতন—"

কেশব এত দূর শুনিয়া গিরিবালার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আর কাজ নাই, আমি সব বুঝেছি। গিরিবালা আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর।"

গিরিবালা কহিলেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করিব? তুমি আমাকে এই ক্ষমা কর যে ললিতের কথা শুনে আমি এত দিন তোমার নিকট এ বিষয় গোপন করে রেখেছি। আমার বড়ো কঠিন প্রাণ যে তোমার এই কয়েক-দিনকার কষ্ট দেখেও আমি গুপ্ত কথা প্রকাশ করি নাই। তোমার স্ত্রী হওয়া দূরে থাকুক, আমি তোমার দাসী হওয়ারও যোগ্য নই।"

পূর্ববৎ গিরিবালার হস্তাকর্ষণ করিয়া কেশব কহিলেন, "তোমার দোষ কি? তোমাকে দিব্য দিয়া বলিয়াছিল, তাই তুমি এ কথা বল নাই। দোষ দু'জনেরই। আমি যে দাসীর কথা শুনে তোমাকে কলঙ্কিনী মনে করেছি, এই আমার ঘোরতর অপরাধ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" এই বলিয়া কেশব কাঁদিতে লাগিলেন। গিরিবালাও তদ্দর্শনে কাঁদিতে লাগিলেন।

"জ্ঞানাঙ্কুর" : ১২৮২

বীরবালা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

দেবীসিংহের যখন এগারো বৎসর বয়স, তখন পাঁচ বৎসরের একটি বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার শ্বশুরবাড়ি অনেক দূর। বিবাহের পর আর তিনি শ্বশুরবাড়ি যান নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীকে তাঁহার মনে পড়ে না। শুভদৃষ্টির পর স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। আজ দেবীসিংহের শ্বশুর সপরিবারে অযোধ্যায় তীর্থ করিতে আসিতেছেন। আজ সরযূর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিবেন। তাই পিতামহী বলিলেন,—"দেবী! সকাল সকাল আহার করিয়া ঘাটে গিয়া বসিয়া থাক। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে আমাদের বাটী লইয়া আইস। আজ আমার বড়ো আনন্দের দিন। দেবী! আজ আমি পুত্র-বধূর মুখ দেখিয়া জন্ম সার্থক করিব।"

সরযূর ঘাটে গিয়া দেবী বসিয়া রহিলেন। অশ্বত্থ বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া দেবী ভাবিতে লাগিলেন। "তাঁহার শ্বশুর কিরূপ? তাঁহার নাম কি? তাঁহার স্ত্রী এখন কত বড়ো হইয়াছে? দেখিতে কিরূপ? নাম কি?" এইরূপ শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে নানা কথা দেবী ভাবিতে লাগিলেন। দিন অতীত হইল, সন্ধ্যা হইল, তবুও তাঁহারা আসিলেন না। দেবী মনে করিলেন,—"আজ বুঝি তাঁহারা আর আসিলেন না। যাই হউক, রাত্রি নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখি, তাহার পর বাটী ফিরিয়া যাইব।"

অশ্বত্থমূলে ঠেশ দিয়া দেবীসিংহ বসিলেন,—বসিয়া পুনরায় শ্বশুরবাড়ির কথা ভাবিতে লাগিলেন। সরযূকূল এখন জনমানবশূন্য; নীরব। রাখালগণ গরু-মহিষের পাল লইয়া ঘরে গিয়াছে। পলাশ কেশর-রঞ্জিত পীত-বসনা অঙ্গনাগণ এখন আর সরযূর ঘাটে নাই। পাণ্ডাদিগের কোলাহল-ধ্বনি একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সরযূর জল কুল কুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। নক্ষত্ররাশি সরযূর ঈষৎ তরঙ্গ-হিল্লোলে নাচিতেছে। দেবী তাই দেখিতেছেন, তাই শুনিতেছেন, আর শ্বশুর-বাড়ির কথা মনে মনে ভাবিতেছেন। এমন সময় কি হইল?—না,—ভয়ানক "উপ" করিয়া এক প্রকাণ্ড হনুমান অশ্বত্থ গাছ হইতে লাফ দিয়া দেবীসিংহের সম্মুখে পড়িল। পাছে কামড়াইয়া দেয়, সেই ভয়ে দেবীসিংহ পলাইবার উদ্যোগ

করিলেন। পলাইতে না পলাইতে বীর হনুমান তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার গাছতলা তুমি অপবিত্র করিলে কেন? তোমার কি কুস্তানি মতলব?"

দেবীসিংহ উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা, না মহাশয়! কুস্তানি মতলব কেন হইবে? এই দেখুন, আমার মাথায় শিখা রহিয়াছে!"

বীর হনুমান বলিলেন,—"কৈ দেখি?"

দেবীসিংহ, বীর হনুমানের দিকে মস্তক অবনত করিলেন। টিকির মর্যাদা-রক্ষক বীর হনুমান বাম হাত দিয়া টিকিটি ধরিলেন; ধরিয়া, একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া টান মারিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"বেশ টিকিটি! বাঃ দিব্য টিকিটি!"

কিন্তু টিকিটি ভালো হইলে কি হইবে, দেবীসিংহের এদিকে প্রাণ বাহির হইতে লাগিল, মুণ্ডটি ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল, দেবীসিংহের চক্ষে জল আসিল। টিকির টানে একবার তাঁহার ঘাড়টি খুট্ করিয়া উঠিল। ঘাড়টি যেই খুট্ করিল, আর দেবীসিংহ জ্ঞান হারাইলেন। তাহার পর কি হইল, তিনি কিছুই জানেন না।

যখন পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন দেবীসিংহ দেখিলেন যে, মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছেন। একটি স্ত্রীলোকের কোলে তাঁহার মাথা রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটি কাঁদিতেছেন, সেই চক্ষু জলের দুই এক ফোঁটা তাঁহার গায়ে পড়িতেছে। আশে-পাশে অনেকগুলি পুরুষ-মানুষ মেয়ে-মানুষ, বালক-বালিকা—সব দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই অপরিচিত। দেবীসিংহ যেই চক্ষু চাহিলেন, আর চারিদিকে আনন্দধ্বনি হইল। সকলে বলিল—"আর কোনোও ভয় নাই। ধর্মদত্ত এইবার প্রাণ পাইল। ধর্মের মা! আর কাঁদিও না, আর কোনোও ভয় নাই। বাছাকে লইয়া এখন ঘরে যাও।"

যে স্ত্রীলোকটির কোলে তাঁহার মাথা ছিল, তিনি অতি স্নেহের সহিত দেবীসিংহের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন,—"ধর্মদত্ত! বাবা আমার! এখন একটু কি ভালো হইয়াছ?"

দেবীসিংহ উত্তর করিলেন,—"তুমি কে? আমি তো তোমাকে চিনি না। আমার নাম তো ধর্মদত্ত নয়! আমার নাম যে দেবীসিংহ!"

স্ত্রীলোকটি কাতরস্বরে বলিলেন,—"কৈ গা! আমার ধর্মের তো এখনও জ্ঞান হয় নাই! আমার ধর্মদত্ত তো কৈ এখনও ভালো হয় নাই। সে কি

বাবা ধর্ম! দশমাস দশ দিন তোমাকে গর্ভে ধরিলাম, আজ এগারো বৎসর ধরিয়া প্রতিপালন করিলাম, আমাকে তুমি চিনিতে পার না?"

সকলে বলিলেন,—ধর্মের মা! ভাবিও না, জলে ডুবিয়া যাইলে ওরূপ হয়। এখনি জ্ঞান হইবে, সকল কথা মনে পড়িবে। ধর্মদত্ত! ঐ দেখ, তোমার পিতা ভারতসিংহ বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন। ঐ দেখ, রামসেবক, যিনি তোমাকে নদীর জল হইতে তুলিয়াছেন! এই দেখ, তোমার খেলাইবার সঙ্গী, প্রতাপ ও মহাবীর। আর এই দেখ, বীরবালা, যে খেলা করিতে করিতে নদীর জলে পড়িয়া গিয়াছিল। যাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত তুমি জলে ঝাঁপ দিয়াছিলে। কিনারার দিকে যাহাকে ঠেলিয়া দিয়া, তুমি নিজে গভীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলে। ভাগ্যক্রমে মহাবীর, প্রতাপ প্রভৃতি বালকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে রামসেবক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। তাই তো বাছার প্রাণরক্ষা হইল! তা না হইলে ভারতসিংহের আজ কি সর্বনাশই হইত! ধর্মদত্ত! এই দেখ, বীরবালা! বীরবালাকে চিনিতে পার?"

দেবীসিংহ বীরবালার পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—বীরবালা একটি পাঁচ বৎসরের স্বরূপা বালিকা। নিজের শরীর পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—বসন আর্দ্র, হাত-পা-গুলি ছোটো ছোটো,—দশ এগারো বৎসরের বালকের যেরূপ হয়, সেইরূপ। পিতা ভারতসিংহকে দেখিলেন, সজল-নয়না মাতাকে দেখিলেন। সমবয়স্ক মহাবীর, প্রতাপ প্রভৃতিকে দেখিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে তাঁহার মনে বিশ্বাস হইল যে, তিনি দেবীসিংহ নন্, তিনি ধর্মদত্ত। তিনি বিংশতি বৎসরের যুবক নন্, তিনি একাদশ-বর্ষীয় বালক। স্বপ্নে আপনাকে দেবীসিংহ মনে করিয়াছিলেন, স্বপ্নে তিনি বীর হনুমানকে দেখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অমাবস্যা বাবাজী

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ধর্মদত্তকে লইয়া সকলে বাড়ি যাইলেন। তাঁহার পিতা ভারতসিংহ বলিলেন,—"ধর্মদত্ত! সৌভাগ্যক্রমে আজ তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। বাবাজীকে গিয়া প্রণিপাত কর।"

বাবাজী সন্ন্যাসী। নাম অমাবস্যা বাবাজী। বাবাজী দীর্ঘদন্ত, লোহিত-লোচন, ঘোর কৃষ্ণকায়। ঘোর কৃষ্ণকায় বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহার নাম অমাবস্যা বাবাজী হইয়া থাকিবে। ইনি অতি সাধু পুরুষ। কেবল দুগ্ধ খাইয়া প্রাণ ধারণ করেন। তাই ভারতসিংহ ইঁহাকে অতি ভক্তি করেন। চিমটা হাতে দেশে দেশে তীর্থ পর্যটন করিতে দেন না। নিজ ঘরে রাখিয়া ভারতসিংহ ইঁহাকে যথাবিধি পূজা করেন। সতত ইঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকেন। ভারতসিংহের ঘরে অমাবস্যা বাবাজী সর্বেসর্বা, যা করেন তাই হয়।

ধর্মদত্ত গিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিলেন, পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। কোনও কথা না বলিয়া বাবাজী ধর্মদত্তকে চিমটা দ্বারা সবলে প্রহার করিলেন। আর বলিলেন,—ধর্মদত্ত! দিন দিন তুই অতি মূর্খ ও অতি নির্বোধ হইতেছিস্! শাস্ত্রে আছে,—'চাচা, আপনা বাঁচা!' তাই প্রতি-বাসীর গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে আপনার আপনার ঘরে দোহারা তেহারা খিল ও হুড়কো দিয়া বসিয়া থাকিত, কেহ বাহির হইত না। আজকালের ছেলেরা সব হইল কি? পরের জন্য প্রাণসমর্পণ! পাঁচ বৎসরের একটা মেয়ে বাঁচাইতে জলে ঝাঁপ! এ সকলি কলির মাহাত্ম্য!"

চিমটার প্রহারে ধর্মদত্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সজলনয়নে পিতার মুখপানে চাহিলেন। ভারতসিংহ কিছুই বলিলেন না। মাতা আসিয়া ধর্মদত্তকে বাটীর ভিতর লইয়া যাইলেন। মাতা বলিলেন,—"বাছা, ধর্ম! চুপ কর, আর কাঁদিও না। কালা-মুখ সন্ন্যাসী এখান হইতে যায়ও না, মরেও না। কি গুণে যে কর্তাকে এত বশীভূত করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। উহার কু-পরামর্শে কর্তাটি দিন দিন যেন জন্তু হইতেছেন। কালা-মুখ আমার সোনার সংসার ছারখার করিল।"

কিছু দিন পরে, বীরবালার পিতা, জবরদস্তসিংহ আসিয়া ভারতসিংহের নিকট প্রস্তাব করিলেন,—"মহাশয়! ধর্মদত্ত আমার কন্যার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। যদি অনুমতি হয় ত বীরবালাকে ধর্মদত্তের হস্তে সমর্পণ করি। বীরবালা,—ধীর, লজ্জাশীলা ও পরমাসুন্দরী।"

এ কথায় সকলে সম্মত হইলেন। ধর্মদত্তের সহিত বীরবালার বিবাহ হইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গত হইতে

লাগিল। এদিকে ভারতসিংহের ঘরে ধর্মদত্ত বাড়িতে লাগিলেন। ওদিকে জবরদস্তসিংহের গৃহে বীরবালা বাড়িতে লাগিলেন। ধর্মদত্ত ও ধর্মদত্তের মাতা কিন্তু বড়োই অসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ভারতসিংহের গৃহে অমাবস্যা বাবাজীর এখন একাধিপত্য। ধর্মদত্তকে তিনি দুটি চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারেন না। বিনা দোষে সর্বদাই তাঁহাকে প্রহার করেন। টাকা-কড়ি বিষয়-বিভব, সমুদায় এখন অমাবস্যা বাবাজীর হাতে। ধর্মদত্তের মাতাকে তিনি আহার-পরিচ্ছদের ক্লেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে ভারতসিংহ নির্জীব জড় পদার্থপ্রায় জবু-থবু হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে সাত আট বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন অমাবস্যা বাবাজী ধর্মদত্তকে চিমটার দ্বারা অতিশয় প্রহার করিলেন। ধর্মদত্তের শরীরে শতধারা হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সেইদিন বিনয় করিয়া ধর্মদত্ত বাবাজীকে বলিলেন,—"মহাশয়! দেখুন, আমি আর এখন বালক নই, এক্ষণে বড়ো হইয়াছি। আমাকে বিনা দোষে প্রহার করা আর ভালো দেখায় না। আমাকে আর মারিবেন না। স্মরণ রাখিবেন যে, খরতর ক্ষত্রিয়-শোণিত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে।"

বাবাজী পরিহাস করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে পুনরায় তিনি ধর্মদত্তকে প্রহার করিলেন। ধর্মদত্ত সে দিন আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। বাবাজীর গলা টিপিয়া ধরিলেন। সবল ক্ষত্রিয় যুবার সহিত শীর্ণকায় বাবাজী পারিবেন কেন? শ্বাসরোধ হইয়া বাবাজী মৃতপ্রায় হইলেন। কেবল প্রাণটি থাকিতে থাকিতে ধর্মদত্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। রাগ-দ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া বাবাজী বলিলেন,—"ভালো! দেখিয়া লইব! অমাবস্যা বাবাজীর গায়ে হাত তুলিয়া কে বাঁচিতে পারে, এ কথা আমি দেখিয়া লইব।"

অল্পদিন পরে ভারতসিংহের একটি কন্যা হইল। সূতিকা-ঘরে সমাগতা প্রতিবাসিনীগণ নবপ্রসূতা কন্যাটির অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখিয়া আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন। কন্যার রূপে সূতিকা-ঘর প্রভাময় হইল। সকলে একবাক্য হইয়া বলিলেন,—'ধর্মের মা! তোমার কন্যাটির কি অদ্ভুত-রূপ হইয়াছে! দিদি, আঁতুড়-ঘরে এরূপ রূপ তো কখনও দেখি নাই! কন্যাটির নাম কমলা রাখ।' সকলে মিলিয়া কন্যাটির নাম কমলা রাখিলেন।

ভারতসিংহের কন্যা হইয়াছে শুনিয়া অমাবস্যা বাবাজীর রাগ হইল।

ভারতসিংহকে তিনি বলিলেন—"মহাশয়! আপনার বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলে কন্যা কখনও জীবিত থাকে নাই। আপনার পূর্বপুরুষদিগকে শ্বশুর বলিয়া কেহ সম্বোধন করেন নাই। ইংরাজের দৌরাত্ম্যে আজ ক্ষত্রিয়কুল কলঙ্কিত হইতেছে সত্য, কিন্তু আমি আপনার গৃহে থাকিতে আপনার কুল কলঙ্কিত হইতে দিব না। এক্ষণে যেরূপ অনুমতি হয়।"

ভারতসিংহ এক্ষণে জড়পদার্থ। জ্ঞানগোচর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন,—"যা ভালো বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।"

অমাবস্যা বাবাজী সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নীচ জাতি ধাত্রীকে অর্থ দ্বারা বশ করিলেন। একদিন ঘোর নিশীথে, ধর্মের মাতাকে নিদ্রিত পাইয়া ধাত্রীর যোগে বাবাজী কমলাকে চুরি করিলেন। পূর্বপ্রচলিত প্রথা অনুসারে কন্যাটিকে মৃত্তিকাপাত্রে রাখিলেন। সেই হাঁড়িতে একটু গুড় ও একটুখানি তুলা রাখিয়া সরা চাপা দিলেন। গ্রামের বাহিরে জনশূন্য মাঠের মাঝে লইয়া হাঁড়িটিকে পুঁতিয়া ফেলিলেন। গর্ত খুঁড়িবার সময় ও হাঁড়ি পুঁতিবার সময় বাবাজী বার বার এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে লাগিলেন,—

কমলা তুমি হও দূর।
যাও শীঘ্র যমপুর॥
খাও গুড় কাটো সুত।
তোমায় চাই না—চাই পুত॥

রাজপুতদিগের মনে বিশ্বাস এই যে, নবপ্রসূতা কন্যাকে সংহার করিলে, সেই কন্যাই বারবার আসিয়া গৃহে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এইরূপ প্রণালীতে মন্ত্রপাঠ করিয়া জীবিত কন্যাকে মৃত্তিকাসাৎ করিলে পুনরায় আর সে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে না।

মাতা জাগরিত হইয়া শিশুটিকে দেখিতে পাইলেন না। সূতিকাঘরে হাহাকার পড়িয়া গেল। কত কাঁদিলেন, কত কাটিলেন। মনে করিলেন,—তাঁহার অসাবধানতা বশতঃ কন্যাকে শৃগালে লইয়া গিয়াছে।

অমাবস্যা বাবাজী গোপনভাবে পুলিসের নিকট পত্র পাঠাইলেন। তাহাতে ধর্মদত্তের প্রতি ভগিনীবধের দোষারোপ করিলেন। পুলিসের দ্বারা তদন্তের সময় অমাবস্যা বাবাজী প্রকাশ্যভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। ধর্মদত্ত রাত্রিকালে হাঁড়ির ভিতর করিয়া শিশুটিকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহা

তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এইরূপ ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। ধাত্রীও সেইভাবে সাক্ষ্য দিল। প্রতিবাসী রামসেবক বলিলেন যে, রাজপুতেরা কিরূপে আপনাদিগের কন্যা বধ করিত, এ কথা ধর্মদত্ত তাঁহাকে কিছুদিন পূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রামসেবক মিথ্যা বলেন নাই, কুতূহলবশতঃ ধর্মদত্ত সত্য সত্যই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য ভারতসিংহ কিছুমাত্র যত্ন করিলেন না; একটি পয়সাও খরচ করিলেন না। ধরাশায়িনী শোকাকুলা পত্নীর অবিরত অশ্রুধারায় তাঁহার মন ঈষৎমাত্রও ভিজিল না। অমাবস্যা বাবাজী যে তাঁহার ঘোর সর্বনাশ করিতেছে, সে জ্ঞান তাঁহার হইল না। বীরবালার পিতা অনেক অর্থব্যয় করিলেন; সুচতুর উকিল নিযুক্ত করিয়া জামাতার রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সামান্য বালিকা হইয়াও কুলের কুল-বধূ হইয়াও, এই বিপদের সময় স্বামিরক্ষার নিমিত্ত, বীরবালা উকিলের বাড়ি, সাক্ষীদিগের বাড়ি, কত লোকের বাড়ি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ধর্মদত্তের উকিল আসিয়া ভারতসিংহকে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, —"ধর্মদত্ত যে ভগিনীকে বধ করে নাই, তাহা নিশ্চয়। অমাবস্যা বাবাজীর কুটিলতা ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। প্রকৃত ঘটনা কি মহাশয়ের বোধ হয় অবিদিত নাই। অতএব সকল কথা প্রকাশ করিয়া, পুত্রের প্রাণরক্ষা করুন।" ভারতসিংহ, না রাম না গঙ্গা,—কোনও উত্তর করিলেন না। জড়ের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

জবরদস্তসিংহের সমুদয় চেষ্টা বিফল হইল। ধর্মদত্তের মাতা, পুত্রের হিত-কামনায় দেবতাদিগকে রাত্রি-দিন ডাকিতেছেন। দেবতারা তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন না। বীরবালার কান্নায় দয়ার্দ্র-চিত্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার স্বামী অব্যাহতি পাইলেন না। যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ধর্মদত্ত দ্বীপান্তরিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ঘোমটাবতী

জামাতা-শোকে জবরদস্তসিংহ অতিশয় কাতর হইলেন। ক্রোধে সর্বশরীর তাঁহার কাঁপিতে লাগিল। অমাবস্যা বাবাজীর যথোচিত দণ্ড করিয়া অবশেষে

তাহার প্রাণবধ করিবেন, মনে মনে এই সংকল্প করিলেন। বিষণ্ণ-বদনে, অশ্রুনয়না মলিন-বসনা বালিকা কন্যাকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি হইয়াছে, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। মাটিতে পড়িয়া বীরবালা অবিরত কাঁদিতেছেন। বেড়াইতে বেড়াইতে ঘোমটাবতী বলিয়া একটি উপদেবতা সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরবালাকে শিশুকাল হইতে তিনি দেখিয়া আসিতেছেন। বীরবালাকে আজ দুঃখ-সাগরে নিমগ্না দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। ঘোর রজনীতে বীরবালা মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, ঘোমটাবতী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বীরবালাকে হাত-ছানি দিয়া ডাকিলেন। এরূপ সময়ে বীরবালার আর ভয় কি? তিনি উঠিলেন। ঘোমটাবতী যে দিকে যাইতে লাগিলেন, সেই দিকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গ্রাম পার হইয়া, দুই জনে মাঠের মাঝে উপস্থিত হইলেন। হাত বাড়াইয়া ঘোমটাবতী একটি স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন।

তাহার পর ঘোমটাবতী অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকা কোমল, যেন অল্প দিবস পূর্বে সে স্থান কেহ খনন করিয়াছিল। হাত দিয়া বীরবালা সেই স্থানের মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটি হাঁড়ি বাহির হইল। হাঁড়িটি তুলিয়া মুখের সরাখানি খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার ভিতর একটু গুড় একটুখানি কার্পাস ও একখানি কাগজ রহিয়াছে। সেইগুলি বাটী লইয়া আসিলেন ও আপনার পিতাকে দেখাইলেন। জবরদস্তসিংহ দেখিলেন যে, সেই কাগজখানিতে এইরূপ লেখা রহিয়াছে,—"আমার নাম শাহ সুলতান, নিবাস বোগদাদ। ভারতবর্ষ হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছি। লোকজন লইয়া তাঁবু খাটাইয়া এই মাঠে আমি রাত্রিযাপন করিতেছিলাম। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে নিকটে ঐ ঝোপের ভিতর বসিয়াছিলাম। সেই সময় কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তি একটি হাঁড়ি লইয়া মাঠে আসিল। হাঁড়ির ভিতর হইতে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সেই ব্যক্তি হাঁড়িটি পুঁতিল। সেই মন্ত্র শুনিয়া বুঝিলাম যে, শিশুটি রাজপুত কন্যা, নাম কমলা। কৃষ্ণকায় ব্যক্তি চলিয়া যাইলে, আমি তৎক্ষণাৎ মাটি খুঁড়িয়া হাঁড়িটি তুলিলাম। শিশুটি জীবিত রহিয়াছে দেখিলাম। আমি নিঃসন্তান। কমলাকে আমি আপনার দেশে লইয়া চলিলাম।" বীরবালার পিতা ও বীরবালা সেই কাগজখানি ও

হাঁড়িটি উকিল ও বিচারকর্তাকে দেখাইলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। সকলে বলিল,—"তুমি যে নিজে এই কাগজখানি প্রস্তুত কর নাই, তাহার প্রমাণ কি?"

বীরবালা ও তাঁহার পিতা পুনরায় বিষণ্ণ-চিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। সেই রাত্রিতে বীরবালা গোপনে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। পাগড়ীর ভিতর আপনার দীর্ঘ কেশ লুকাইলেন। সেই রাত্রিতেই অতি গোপনভাবে বাটী পরিত্যাগ করিলেন। পিতার প্রবোধের নিমিত্ত একখানি কাগজে এই লিখিয়া যাইলেন,—"পিতা! আমি কমলার অন্বেষণে চলিলাম। বোগদাদ নগরে চলিলাম। কমলাকে আনিয়া নিশ্চয় স্বামীর উদ্ধার করিব। স্বামিপদ ধ্যান্ করিয়া আমি যাইতেছি। নিশ্চয় কৃতকার্য হইব। আপনি চিন্তিত হইবেন না।"

বীরবালা চলিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা বৈ তো নয়? পথ-ঘাটের কথা তিনি কি জানেন? লোকের মুখে শুনিলেন যে, বোগদাদ অনেক দূর, পশ্চিমদিকে। বীরবালা সেই পশ্চিমদিকে চলিলেন। এক দিনে অধিক পথ যাইবেন এরূপ ক্ষমতা কোথায়? অল্প অল্প করিয়া প্রতিদিন পথ হাঁটিতে লাগিলেন। নানা ক্লেশ পাইয়া, নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে ভারতের পশ্চিম-প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এক দিন এক স্থানে একটি মেলা হইতেছে, বীরবালা তাহা দেখিতে পাইলেন। বীরবালা সেই মেলার ভিতর প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে নানা দেশ হইতে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। ভারতের নানা স্থান হইতে শত শত সাধুগণও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, একজন সাধু, সিদ্ধি বাটিয়া সকলকে বিতরণ করিতেছেন। যে চাহিতেছে, তাহাকেই তিনি সিদ্ধি ও মিষ্টান্ন দিতেছেন। সহসা সকলের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। সকলের সন্দেহ হইল যে, সাধু হিন্দু নন্, মুসলমান। এইরূপ মনে করিয়া লোকে তাঁহার উপর ঢিল ও পাথর বর্ষণ করিতে লাগিল। সাধুর একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি নিকটে শুইয়া ছিল। ক্রোধে অপর কাহাকে কিছু না বলিয়া, সাধু দুই হাতে কুকুরটির পা ধরিয়া তুলিলেন, নিকটস্থ একখানি পাথরের উপর আছাড় মারিলেন। কুকুরের মাথাটি ফাটিয়া গেল, চারিদিকে মস্তিষ্ক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, কুকুরটি তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। কুকুরের

মৃতদেহ ফেলিয়া দিয়া সাধু সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া শিষ দিতে লাগিলেন। সেই শিষ শুনিয়া মৃত কুকুরটি তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়া উঠিল, দৌড়িয়া সাধুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন, সকলেই তখন সাধুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মেলাস্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে সাধু অরণ্যময় নির্জন পর্বতের দিকে চলিলেন। বীরবালাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বার বার হাত নাড়িয়া সাধু তাঁহাকে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। বীরবালা তাহা শুনিলেন না, বীরবালা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। অবশেষে সাধু ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছ কেন? আমাকে এরূপ বিরক্ত করিতেছ কেন?" বীরবালা তাঁহাকে আপনার দুঃখের কথা সমুদয় বলিলেন। সাধুর দয়া হইল। বৃক্ষপত্রে একখানি কবজ লিখিয়া বীরবালাকে দিলেন, ও বলিলেন,—"এই কবজখানি বাম হাতে ধরিয়া যেখানে ইচ্ছা করিবে, সেই দণ্ডে সেই খানে উড়িয়া যাইতে পারিবে। ইহার সহায়তায় তুমি বোগদাদ গমন কর। সে স্থান হইতে কমলাকে আনিয়া পতির উদ্ধার সাধন কর। আর আমার সঙ্গে আসিও না। কিন্তু দেখিও, কবজখানি যেন ছিঁড়িয়া না যায়। তাহা হইলে ফল হইবে না।"

চতুর্থ অধ্যায়

সবুজ ভূত

কবজ পাইয়া বীরবালার মনে আনন্দ হইল। অনায়াসে এখন বোগদাদ যাইতে পারিবেন, শাহ্ সুলতানের অনুসন্ধান হইবে। কমলাকে পাইবেন, পতির উদ্ধার হইবে, তাঁহার মনে এখন ভরসা হইল। বীরবালা মনে করিলেন,—"আচ্ছা দেখি, সত্য সত্যই কবজের এইরূপ গুণ আছে কি না? প্রথমে বোগদাদ না গিয়া অন্য কোনও স্থানে যাইবার বাসনা করি। কবজের পরীক্ষা করি। দেখি সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হই কি না।"

এইরূপ ভাবিয়া তিনি কবজখানি বাম হাতের ভিতর করিলেন, আর মনন করিলেন,—"আমি পৃথিবীর মুড়োতে যাইব।" মনে করিতে না করিতে বীরবালা শূন্যপথে দ্রুত বেগে উড়িয়া চলিলেন। নিমিষের মধ্যে পৃথিবীর

প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আমাদের এই পৃথিবীটি চারিদিকে বেষ্টিত। আকাশ ভেদ করিয়া সেই প্রাচীর রহিয়াছে। বীরবালা ভাবিলেন যে, তবে এই প্রাচীর হইল পৃথিবীর শেষ, ইহার ও-দিকে আর পৃথিবী নাই। প্রাচীরের ও-ধারে কি আছে? সেটি দেখিতে হইবে। প্রাচীরের গায়ে গোল গোল ছোটো ছোটো ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্র দিয়া বীরবালা উঁকি মারিলেন। সর্বনাশ! প্রাচীরের ও-ধারে পৃথিবীর ও-পারে কোটি কোটি খর্বকায় ভূত। প্রাচীর ধরিয়া ক্রমাগত তাহারা ঠেলিতেছে; ইচ্ছা,—প্রাচীর ভাঙিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে। পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবী একেবারে রসাতলে দিবে, এই তাহাদের বাসনা। কোটি কোটি খর্বকায় ভূতগণ একবার যদি প্রাচীর পার হইতে পারে, তাহা হইলে পৃথিবীর আর রক্ষা নাই। মনুষ্যকুল ধ্বংস করিয়া পৃথিবী তাহারা অধিকার করিবে। তাহাদের ভয়াবহ মূর্তি দেখিয়া বীরবালার প্রাণে ভয় হইল।

ছিদ্র দিয়া তাহারাও সেই সময়ে বীরবালাকে দেখিতে পাইল। ছিদ্র দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহারা বীরবালার হাত ধরিল। কবজখানি কাড়িয়া লইবে এই তাহাদের বাসনা। অতি কষ্টে বীরবালা হাত ছাড়াইয়া লইলেন। কিন্তু ঘোর বিপদের কথা! টানাটানিতে কবজখানি ছিঁড়িয়া গেল!

বোগদাদে না গিয়া পৃথিবীর প্রান্তভাগে মিছামিছি আসিয়া কবজখানি হারাইলেন। সে নিমিত্ত বীরবালা আপনাকে কত তিরস্কার করিলেন। কিন্তু কি করিবেন! আর উপায় নাই। পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। পৃথিবীর আগা কি এখানে? পথ আর ফুরায় না। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বীরবালা এইরূপ পথ চলিলেন। তথাপি লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। একদিন এক পাহাড়ের নিকট বীরবালা একটি সবুজ বর্ণের বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধা গাছতলায় বসিয়া রৌদ্র পোহাইতেছিল ও চরকা কাটিতেছিল। বীরবালাকে দেখিয়া সে অমনি তাড়াতাড়ি চরকা ফেলিয়া উঠিল, আর আকাশপানে পা করিয়া বীরবালার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। বীরবালা যে দিকে যান, আর আকাশ পানে পা করিয়া বুড়িও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, অবশেষে বীরবালাকে বুড়ি যেই একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ

করাইল, আর সব দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। বীরবালার বড়ো ভয় হইল। দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন, কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। সবুজ বুড়ি আপনার আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল। সবুজ বুড়ির বাটীতে কোলাহল পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া বীরবালা তাহাদের সকল কথা শুনিতে পাইলেন। এই পৌষপার্বণে তাহারা বীরবালাকে কাটিয়া কুটিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইবে, সবুজ ভূতেরা এই পরামর্শ করিতে লাগিল। চারিদিকে চাউল কুটিবার ধূম পড়িয়া গেল। ডাল বাটা হইতে লাগিল। অবশেষে বীরবালাকে কুটিবার সময় উপস্থিত হইল। অন্য ভূতদিগের মতো সবুজ ভূতেরা আচার-বিহীন নয়। ইহারা বৃথা মাংস ভক্ষণ করে না; ঠাকুরদের নিবেদন করিয়া বীরবালার বলিদান হইবে। তাহার পর বীরবালার দেহকে কাটিয়া কুটিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। দুই চারি জন সবুজ ভূতে বীরবালাকে ধরিয়া স্নান করাইল। পাহাড়ের মাথায় দেবতার মন্দিরে গিয়া পূজা দিল। যথাবিধি বীরবালাকে উৎসর্গ করিল। বলিদান দিবার নিমিত্ত বীরবালাকে পাহাড়ের ধারে লইয়া গেল। এক দিকে পাহাড়, অপর দিকে অতল গিরিগহ্বর। কোপ মারিবার নিমিত্ত কামার-ভূত খাঁড়া তুলিল। বীরবালা ভাবিলেন,—"মরিলাম তো। মরিতে তো আর বাকি নাই। কিন্তু আমার মাংস লইয়া সবুজ ভূতেরা যে পিঠে করিয়া খাইবে, তাহা দিব না।" এই মনে করিয়া তিনি পর্বতের শিখর দেশ হইতে ঝাঁপ দিলেন। শূন্যপথে বীরবালা পাহাড়ের তলদেশে পড়িতে লাগিলেন।

পাহাড়ের গায়ে একখানি পাথরের উপর সবুজ ভূতদিগের একটি ছেলে বসিয়াছিল। ভালো কাপড়-চোপড় পরিয়া সবুজ বুড়ির বাড়িতে সে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল। সবুজ বুড়ির বাড়িতে আজ মানুষের পিঠে হইবে, পৌষপার্বণের দিনে পেট ভরিয়া মানুষের পিঠে খাইবে। তাই, মনের আনন্দে ভূতের ছেলেটি পায়ের উপর পা দিয়া পাথরের উপর বসিয়া আছে।

পড়বি তো পড়, বীরবালা গিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িলেন। অকস্মাৎ কি আসিয়া আকাশ হইতে ঘাড়ে পড়িল, সে জন্য ভূতবালক চমকিয়া উঠিল। তাহার বড়ো ভয় হইল। নিমন্ত্রণ খাওয়া ঘুরিয়া গেল। পলাইবার নিমিত্ত সে আকাশে উড়িল। দৃঢ়রূপে বীরবালা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। আকাশে উড়িতে উড়িতে ভূতবালক ক্রমাগত গা-ঝাড়া দিতে লাগিল, কিন্তু

বীরবালা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না, বীরবালাকে সে কিছুতেই ফেলিয়া দিতে পারিল না। উড়িতে উড়িতে ভূতবালক গিয়া মহাসমুদ্রের উপর উপস্থিত হইল, উড়িয়া উড়িয়া তাহার শ্রান্তি বোধ হইল। সমুদ্রের উপর একখানি জাহাজ যাইতেছে, সে দেখিতে পাইল। সেই জাহাজের মাস্তলের উপর ভূতবালক গিয়া বসিল। এই সময় বীরবালা তাহার গলা ছাড়িয়া দিলেন, আর হাত দিয়া মাস্তলের দড়ি ধরিলেন। ছাড়ান পাইয়া ভূতবালক তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলাইল।

মাস্তল হইতে বীরবালা নামিয়া জাহাজের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। জাহাজের লোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলে আশ্চর্য হইল যে, এই অকূল সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজের উপর মানুষ কোথা হইতে আসিল। আকাশ হইতে পড়িল না কি? যাহা হউক, বীরবালা সেই জাহাজে রহিলেন। অল্প দিন পরে প্রবল ঝড় উঠিল, পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ দ্বারা মহাসমুদ্র আলোড়িত হইতে লাগিল; জাহাজ ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। জাহাজের লোকে মনে করিল, বীরবালার আগমনেই তাহাদের এই বিপদ ঘটিতেছে। এ মনুষ্য নয়। ভূত কি ডাইন হইবে। আকাশ হইতে মানুষ আবার কবে কোথায়, জাহাজের উপর পড়ে? এই মনে করিয়া রাত্রিকালে তাহারা বীরবালাকে সমুদ্র-জলে ফেলিয়া দিল। তরঙ্গ দ্বারা তাড়িত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে বীরবালা চলিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। যখন জ্ঞান হইল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সমুদ্র-কূলে বালির উপর পড়িয়া আছেন। আস্তে আস্তে উঠিলেন, উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। চারিদিকে বালুকাপ্রান্তর, ধূ ধূ করিতেছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। যাইতে যাইতে একটি মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উটে করিয়া মনুষ্যটি আসিতেছিল। বীরবালাকে ধরিয়া সে আপনার নিকট উটের পৃষ্ঠে বসাইল, উট চালাইয়া দিল। সাত দিন সাত রাত্রি বীরবালা সেই মনুষ্যের সহিত উটের পৃষ্ঠে যাইলেন। অবশেষে তাঁহারা একটি নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মনুষ্য বীরবালাকে লইয়া এক জন অর্থবান ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিল। ক্রেতার নাম ইব্রাহিম। বীরবালা এক্ষণে জানিতে পারিলেন যে, তিনি আরব দেশে মক্কা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

মক্কা নগরে ইব্রাহিমের ঘরে বীরবালা বাস করিতে লাগিলেন। সুন্দর

শান্তপ্রকৃতি বালক দেখিয়া ইব্রাহিম বীরবালাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। ইব্রাহিমের স্ত্রীও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন থাকিতে থাকিতে বীরবালা এক দিন ইব্রাহিমের বিবিকে আপনার সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন ইব্রাহিমের স্ত্রী বুঝিতে পারিলেন যে, বীরবালা বালক নন্—বালিকা। স্বামীকে তিনি সকল কথা বলিলেন। স্ত্রী-পুরুষে বীরবালার দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। দয়া করিয়া তাঁহারা বীরবালাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন ও অর্থ দিয়া বণিকদের সহিত বোগদাদে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সাহেব ভূত

বীরবালা বোগদাদে উপস্থিত হইয়া শাহ্ সুলতানের বাটী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শাহ্ সুলতান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, অনায়াসেই তাঁহার তত্ত্ব পাইলেন। বীরবালা শুনিলেন যে, আজ এক বৎসর শাহ্ সুলতান মরিয়া গিয়াছেন। তিনি বিপুল ধন রাখিয়া গিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের একটি শিশু কন্যাকে সেই বিষয়ের অধিকারিণী করিয়া যান। কিন্তু তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফয়াগৎ হোসেন, কন্যাটিকে তাড়াইয়া দিয়া সমুদয় বিষয় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাহার পর নানারূপ দুষ্ক্রিয়া দ্বারা অল্পদিনে সমুদয় বিষয় তিনি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। পথের ভিখারী হইয়া অবশেষে একটি সাহেবের বাড়িতে চাকরি করিতেছেন। এই সকল কথা শুনিয়া বীরবালার নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, শিশুটি আর কেহ নয় কমলা—এক্ষণে তিনি সেই শিশুটির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক সন্ধান করিয়া অনেক ক্লেশে, শেষে জানিতে পারিলেন যে, শাহ্ সুলতানের বাটী হইতে বিদূরিত হইয়া শিশুটি কয়েক দিনের নিমিত্ত পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। একদিন গাছতলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, এমন সময় সেই পথ দিয়া একটি ইংরেজ বণিক ও তাঁহার স্ত্রী যাইতেছিলেন। নিরাশ্রয় শিশুটিকে দেখিয়া তাঁহাদের দয়া হইল। আদর করিয়া তাহাকে বাটী লইয়া যাইলেন। সেই অবধি ইংরেজ বণিকের ঘরে শিশুটি বাস করিতেছিল। ইংরেজ বণিকের সহসা সৌভাগ্যের উদয় হইল। সহসা তিনি বিপুল অর্থলাভ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। শিশুটি তাঁহাদের সঙ্গেই রহিল।

এই কথা শুনিয়া বীরবালা হতাশ হইয়া পড়িলেন। বোগদাদে আসিয়াও কমলাকে পাইলেন না। কিন্তু কি করিবেন? এক্ষণে বিলাত যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদিন পরে ভূমধ্যসাগর-কূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কি করিয়া বিলাত যাইবেন, বিষণ্ণ-বদনে সেইখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। নিজের দুরদৃষ্ট ভাবিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নিঃশ্বাসটি যেই ফেলিয়াছেন, আর কাতর-স্বরে চীৎকার করিয়া নিকটে কে কাঁদিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া বীরবালা চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটি সাহেব-ভূত! সাহেব-ভূত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ওগো তুমি আমার সহিত এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কেন করিলে? জোরে নিঃশ্বাস ফেলিলে কেন? এই দেখ আমার শরীরের জোড় সব খুলিয়া গেল।"

বীরবালা দেখিলেন, সত্য সত্যই সাহেব-ভূতের শরীরের জোড় সব খুলিয়া যাইতেছে। হাত, পা, নাক, কান খসিয়া পড়িতেছে।

সভয়ে বীরবালা বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি যে এখানে বসিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না। আপনার শরীরের জোড় যে এত ভঙ্গুর, তাহাও জানিতাম না। তাহা যদি জানিতাম, তাহা হইলে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিতাম।"

সাহেব-ভূত পুনরায় বলিলেন,—"আমার আঙুল খসিয়া গেল, এখন আঙ্‌টি পরিব কোথায়? পা খসিয়া গেল, মল পরিব কোথায়? নাক খসিয়া গেল, নোলক পরিব কোথায়? কান খসিয়া গেল, মাকড়ি পরিব কোথায়?"

সাহেব-ভূতের দুঃখে বীরবালা দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! ইহার কি কোনও উপায় নাই?" ভূত বলিলেন,—"যদি তুমি কাদা দিয়া আমার হাত পা ভালো করিয়া জুড়িয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি ভালো হই।" বীরবালা তাহাই করিলেন। সুস্থ হইয়া সাহেব-ভূত বীরবালার সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সকল কথা পরিচয় দিয়া বীরবালা সাহেব-ভূতকে বিলাত যাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহেব-ভূত বলিলেন,—"তার ভাবনা কি? আমি এইক্ষণেই তোমাকে টেলিগ্রাফে বিলাত পাঠাইয়া দিতেছি। জন-সাহেব কমলাকে বিলাত লইয়া গিয়াছেন, রঙ্গিণী মেমের

নিকট তোমাকে আমি পাঠাইব। আমি জীবিত থাকিতে রঙ্গিণী আমার স্ত্রী ছিলেন। জন-সাহেবের মেয়ের সহিত রঙ্গিণীর ভাব আছে।” এই বলিয়া সাহেব-ভূত সমুদ্রের বালি দিয়া বড়ো একটি টেলিগ্রাফের তার প্রস্তুত করিলেন। বীরবালাকে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন।

বীরবালা তাহার ভিতর প্রবেশ করিলে সাহেব-ভূত তারের বাঁটটি টক্ টক্ টক্ টক্ করিয়া নাড়িলেন, আর সেই মুহূর্তেই বীরবালা বিলাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে রঙ্গিণীর ঘরের ভিতর গিয়া পৌঁছিলেন। আরসির নিকট দাঁড়াইয়া রঙ্গিণী তখন বেশ-ভূষা করিতেছিলেন, মুখে পাউডার মাখিতেছিলেন। সহসা বীরবালাকে ঘরের ভিতর আসিতে দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন।

রঙ্গিণীর নিকট বীরবালা সকল পরিচয় দিলেন। বীরবালা তাঁহার নিকট দুই এক দিন বাস করিলেন। তাহার পর রঙ্গিণী তাঁহাকে জন-সাহেবের নিকট লইয়া যাইলেন। জন-সাহেব বলিলেন যে, বোগদাদ হইতে কমলাকে তিনি বিলাতে আনিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এখানে আনিয়া কন্যাটিকে বিজয়ার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। বিজয়া অতি সম্ভ্রান্ত মহিলা, অতি দয়াময়ী, অতি পবিত্রপ্রাণা। শিশুটিকে তিনি নিজের কন্যার ন্যায় অতি যত্নে প্রতিপালন করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া বীরবালা বিজয়ার নিকট গমন করিলেন। কমলাকে দেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। অতি মধুর ভাবে বিজয়া বলিলেন,—“কমলা আমার প্রাণস্বরূপ। কমলাকে আমি কিছুতেই দিতে পারিব না।” ভূমে জানু পাতিয়া, জোড় হস্তে বীরবালা স্তুতি-বিনতি করিতে লাগিলেন। বীরবালা বলিলেন—“মহোদয়া! দয়াময়ি! দয়াময়ী বলিয়া সকলে আপনাকে জানে। আপনার প্রভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাস, দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে। আপনি পবিত্রতাময়ী। আপনার পবিত্রতা আদর্শ স্থল হইয়া ঘরে ঘরে আজ পবিত্রতার আবির্ভাব করিয়াছে। আমার পতিধর্মের প্রতি আপনি কৃপা করুন। আমার শ্বশুর ভারতসিংহের প্রতি আপনি কৃপা করুন। ভারতসিংহ বৃদ্ধ বুদ্ধিহীন হইয়াছেন। তাঁহার সংসার আজ শ্মশানভূমি হইয়াছে। কমলাকে প্রদান করুন। ধর্মকে আমি পুনরায় দেশে আনয়ন করি! ভারতসিংহের অন্ধকার সংসার পুনরায় আলোকিত হউক।”

এইরূপ স্তুতি-বিনতি শুনিয়া বিজয়ার মনে দয়া হইল, ভারতসিংহের দুর্দশা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। বীরবালার হস্তে কমলাকে সমর্পণ করিলেন। বীরবালা তাঁহার কে হন, তাহা শুনিয়া কমলার আর আহ্লাদের অবধি রহিল না। মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু সকলের মুখ দেখিবেন, সে জন্য কমলার মনে অপার আনন্দের উদয় হইল। বীরবালার গলা ধরিয়া কমলা কত কাঁদিলেন, কত হাসিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পোষড়ার পিঠে

কমলাকে লইয়া বীরবালা দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। নিকটস্থ নগরে থাকিয়া পিতাকে সংবাদ দিলেন। জবরদস্তসিংহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কন্যাকে পাইয়া, কমলাকে দেখিয়া জবরদস্তসিংহের আর সুখের পরিসীমা রহিল না। কমলাকে দেখাইয়া, যথাবিধি উপায় করিয়া, ধর্মদত্তকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিলেন। অবশেষে ধর্মদত্ত, বীরবালা ও কমলাকে সঙ্গে লইয়া তিনি ভারতসিংহের ভবনে উপস্থিত হইলেন। জবরদস্তসিংহ, বীরবালার পুনরাগমন, কমলা-লাভ, ধর্মের মুক্তি, এতদিন সকল কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। আজ সকলকে লইয়া সহসা ভারতসিংহের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূ দেখিয়া ধর্মের মাতা স্বর্গ যেন হাত বাড়াইয়া পাইলেন। অমাবস্যা বাবাজীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি ভারতসিংহকে বলিলেন,—"আপনার এ পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূকে কিছুতেই ঘরে লওয়া হইবে না।" এই কথা শুনিয়া জবরদস্তসিংহ আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। বাবাজীর চিমটাটি সেই স্থানে পড়িয়া ছিল; চিমটার অগ্রভাগ অগ্নির ভিতর ছিল। অগ্নির উত্তাপে চিমটার অর্ধাংশ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়াছিল। জবরদস্তসিংহ সেই চিমটাটি তুলিয়া লইয়া, তাহার অগ্রভাগ দ্বারা অমাবস্যা বাবাজীর নাক ধরিলেন। বাবাজীর নাসিকা পড় পড় শব্দে পুড়িতে লাগিল। তাহা হইতে দারুণ দুর্গন্ধময় ধূম নির্গত হইতে লাগিল। যন্ত্রণায় বাবাজী চীৎকার করিতে লাগিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, বাবাজী আপনার পৃষ্ঠে পক্ষীর মতো পাখা বাহির করিলেন। অবশেষে জানালা দিয়া উড়িয়া পলাইলেন।

সকলে আশ্চর্য হইলেন। সকলে তখন বুঝিলেন যে, অমাবস্যা বাবাজী মনুষ্য নন। অমাবস্যা বাবাজী যেই উড়িয়া যাইলেন, আর ভারতসিংহ যেন চমকিত হইয়া ঘোর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। নির্বাণ প্রায় তাঁহার চক্ষু দুইটিতে পুনরায় আলোকের সঞ্চার হইল, তাঁহার মুখ প্রভাময় হইল। সহসা ভারতসিংহের যেন পুনরায় নবযৌবন উদয় হইল। ধর্মদত্ত বীরবালা ও কমলাকে তিনি সাদরে কোলে করিলেন। মোহবশতঃ অন্ধ হইয়া স্ত্রী-পুত্রকে নানারূপ ক্লেশ দিয়াছিলেন, দেবদুর্লভ ধর্ম যেন পুত্র ও কমলা হেন কন্যারত্নকে তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন, সে জন্য ভারতসিংহ এক্ষণে মনোদুঃখে অতিশয় কাতর হইলেন, আকুল হইয়া মনের বেদনায় তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে বীরবালা ভাবিলেন,—"যদি ঘোমটাবতীকে দেখিতে পাই, ত তাঁহার চরণে একবার প্রণাম করি। তিনি আমার বড়ো উপকার করিয়াছেন।" এইরূপ ভাবিয়া বীরবালা একাকিনী মাঠের দিকে চলিলেন। কমলা যে স্থানে মাটিতে প্রোথিত হইয়াছিলেন, বীরবালা সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষতলে ঘোমটাবতী বসিয়া রহিয়াছেন, বীরবালা দেখিতে পাইলেন। করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাতঃ। আপনি কে বলুন! আপনি যে ভূতিনী নন, তাহা আমি নিশ্চয় জানি। আপনি কে বলুন।" কোনওরূপ উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া ঘোমটাবতী ঘোমটা খুলিলেন। বিদ্যুৎপ্রায় তাঁহার রূপের ছটায় জগৎ আলোকিত করিল। বিশ্বসংসার শান্তিসুধায় সিক্ত হইল। আকাশের দ্বার উন্মুক্ত হইল। অপ্সরাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। অপ্সরা বালকগণ মধুরতানে বীরবালার সাহস, বিক্রম ও পতিভক্তির গুণগান করিতে লাগিল।

বীরবালাকে মাঠের দিকে যাইতে ধর্মদাস দেখিয়াছিলেন। বীরবালার প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতেছেন দেখিয়া তাঁহার ভাবনা হইল। বীরবালার অনুসন্ধানে তিনিও মাঠের দিকে চলিলেন। মাঠের মাঝখানে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া ধর্মদত্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বীরবালা বসিয়া আছেন। অপ্সরা-বালক-বালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। কেহ তাঁহার চুল বাঁধিয়া দিতেছে, কেহ তাঁহার সুকোমল শরীর সুগন্ধ দ্বারা সিক্ত করিতেছে। আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। ভালো করিয়া দেখিবার নিমিত্ত ধর্মদত্ত আকাশের দিকে মস্তক আরও উন্নত

করিলেন। সবলে মাথাটি যেই তিনি তুলিলেন, আর তাঁহার ঘাড়টি খুট্ করিয়া উঠিল।

ঘাড়টি যেই খুট্ করিয়া উঠিল, আর সেই অপূর্ব দৃশ্য তাঁহার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইল, দেখিলেন যে, তিনি সরযূকূলে অশ্বথমূলে ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন। আপনার শরীর পানে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন যে, সে শরীর ধর্মদত্তের শরীর নয়, আর কা'র শরীর। "আমি কে?" এই কথা লইয়া তাঁহার মনে ঘোরতর সংশয় উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল। তিনি অযোধ্যানিবাসী দেবীসিংহ। স্বপ্নে তিনি আপনাকে ধর্মদত্ত মনে করিয়াছিলেন, আর এই সমস্ত অদ্ভুত রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাকে স্বপ্নই বা কি করিয়া বলি। ক্ষণকালের নিমিত্তও তিনি তো নিদ্রা যান নাই। কেবল একবার মাত্র তাঁহার ঢুল আসিয়াছিল। সম্মুখ দিকে তাহার মাথাটি একবার ঢুলিয়া পড়িয়াছিল, আর সেই সময় তাঁহার ঘাড়টি একটু খুট্ করিয়াছিল। সেই মুহূর্তেই তিনি মাথাটি সোজা করিয়া লইলেন, আর ঘাড়টি আর একবার খুট্ করিল। এ কতটুকু সময়? কিন্তু এই ক্ষণ-কালের মধ্যেই তিনি এত কাণ্ড দেখিলেন, এত কাণ্ড শুনিলেন, এত কাণ্ড কবিলেন। কি আশ্চর্য ব্যাপার! স্বপ্ন হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু বীববালা যে স্বপ্ন, প্রকৃত দেবীরূপিণী নারী নন, সে কথা ভাবিয়া দেবীসিংহের মন বড়োই কাতর হইল। "যদি বীরবালাকে আর দেখিতে পাইব না, তবে এ জাগরণে প্রয়োজন কি? চিরনিদ্রায় কেন আমি অভিভূত হইয়া থাকিলাম না?"

দেবীসিংহ অতি কাতর হইয়া বৃক্ষের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন যে, বৃক্ষডালে একটি হনুমান বসিয়া রহিয়াছে। সেইক্ষণেই চতুর্দশ বর্ষীয়া একটি পরমাসুন্দরী বালিকা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়! অযোধ্যা কি এই পথ দিয়া যাইতে হয়?" সে কণ্ঠস্বর, সে রূপ, দেবীসিংহের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, কথনও আর ভুলিবার নহে। চকিত হইয়া দেবীসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে ও বীরবালা?"

বালিকাটি উত্তর করিল,—"আজ্ঞা, হাঁ। আমার নাম বীরবালা বটে! আপনি আমার নাম কি করিয়া জানিলেন?"

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকাটির পিতা এবং তদীয় পরিবারবর্গ সেই

বয়সের বিস্তর মহিলা এই মজলিশে উপস্থিত। কেহ গা আদুড় করিয়া, কেহ পা ছড়াইয়া, কেহ আধ-ঘোমটা টানিয়া—নানাভাবে নানা মহিলা বসিয়া আছেন। আর, কেহ বা দুয়ারের শিকল ধরিয়া, কেহ বা এক পায়ে ভর করিয়া দেয়ালে ঠেসান দিয়া, কেহ বা আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবির রিং আঙুলে ঘুরাইয়া অন্যমনস্ক হইয়া—কত জন কত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ বাসরের গান ভাবিতেছেন, কেহ নূতন অপেরার নূতন টপ্পাটা বার বার মনে মনে আওড়াইতেছেন, কেহ অপরের নূতন ধরণের বেশবিন্যাসটা সপ্রণালী মৌনসমালোচনা করিতেছেন; কেহ বা গোরাচাঁদের বনিতাকে সাহস দিতেছেন, কেহ বা কল্পিত বহুদর্শিতার সুপারিশে তাঁহার আশঙ্কা বাড়াইতেছেন। ফল কথা, নানারকমে নানাজনে কথা কহিতেছেন। হাসির উপদ্রবে, নিষেধের তাড়নায়, পরামর্শের গভীরতায়, রোদনের শান্ত অভিনয়ে, নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়, এমনতর একটা গোলযোগ সেখানে হইতেছে। মজলিশের উপস্থিত বিষয়—গোরাচাঁদের বনিতা আসন্নপ্রসবা।

যশোহর জেলার পূর্বপ্রান্তে অপ্রসিদ্ধ-নামে এক পল্লীগ্রামে গোরাচাঁদের বনিতার বাপের বাড়ি; নাম বসুমতী। নামটা উনবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত নয় মনে করিয়া, গোরাচাঁদ স্বীয় উত্তমার্ধকে বিকল্প বসন, বসনী বা বসী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, প্রাণান্তেও বসুমতী বলিতেন না। আমি কিন্তু এ নিয়মের অধীনতা স্বীকার করিব না, যেখানে যেমন সুবিধা, সেখানে সেই নাম করিয়া গোরাচাঁদ-গৃহিণীর পরিচয় দিব।

বসুমতীর বয়স উনিশ বৎসর মাত্র, বর্ণ গৌর, এমন কি চুলগুলি পর্যন্ত খুব কালো নয়; গড়ন দীর্ঘাকার, একহারা, তবে সম্প্রতি তেহারা বলিয়াই মনে হয়; কপাল ছোটো; চক্ষু দুটি ডাগর, কিন্তু কোলে বসা; নাক সুদীর্ঘ, টিকলো, সরু; গাল দুখানি মরা মরা, উপর ঠোঁট খুব পাতলা, নীচের খানি পুরু, থুতনী খুব অল্প। বসুমতীর সুর চড়া, কিন্তু মিহি, অল্পেই নাকিতে উঠে। এহেন বসুমতী আসন্নপ্রসবা সেই মজলিশে বসিয়া আছেন, কদাচ দুই-একটি কথা কহিতেছেন। কিন্তু এত গোলে তাঁহার কথা ধরা যাইতেছে না। যাঁহারা দেখিতে, দেখা করিতে বা দেখা দিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা নিজে নিজে কথা কহিয়াই পরিতুষ্ট; সুতরাং বসুমতীর কথা বুঝিলেও তাঁহাদের কোনও ক্ষতি হইতেছে না।

গোরাচাঁদ বাড়িতে ছিলেন না। "স্ত্রী-উত্তোলনী" সভার অভ্য বিশেষ

অধিবেশন। সুতরাং সভাপতি গোরাচাঁদ বেলা একটার সময় সেইখানেই গিয়াছিলেন। স্ত্রীর অবস্থা মনে ছিল না, বাড়িতে এ মজলিশ বসিবে তাহারও সংবাদ পান নাই, কাজে কাজেই সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরে ফিরিয়া আসিলেন না। পাড়ার মেয়েরা গোরাচাঁদকে বড়ো ভয় করিত, আজি বাহিরে গোরাচাঁদের বিলম্ব হইবে টের পাইয়া মেয়েরা তাঁহার বাটীতে আসিয়া জুটিয়াছিল। এমত অবস্থায়, সন্ধ্যার পর গোরাচাঁদ যখন বাড়ি আসিলেন, তখন মজলিশের কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

গোরাচাঁদের পরিচয় দিবার এই সুযোগ হইয়াছে, অতএব পাঠক-পাঠিকাগণের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেওয়া যাউক।

বর্ণচোরা আমের দোষ বা গুণ এই যে, ভিতরে পাকিয়া পচিবার উপক্রম হইলেও, খোসা যে সবুজ সেই সবুজই রহিয়া যায়। বয়সের হিসাবে গোরাচাঁদও বর্ণচোরা আম; পঁচিশের উপর পঞ্চান্ন পর্যন্ত সকল বয়সই গোরাচাঁদের হইতে পারিত। কেবল এক বুড়ি মা বাড়িতে থাকাতেই গোরাচাঁদের বয়স চল্লিশের নীচে রাখিতে পাড়া-প্রতিবাসী বাধ্য হইয়াছিল। নবদূর্বাদলশ্যাম,—(ইহার ভাবার্থ যাহাই হউক)—বিলক্ষণ খর্বাকৃতি, প্রশস্ত চতুষ্কোণ ললাট, স্থূলনাস, প্রবল হনুমস্ত, বর্তুলাক্ষ, গুম্ফবিভূষিত, নিষ্পিষ্ট ওষ্ঠাধর, বিরল অথচ দীর্ঘ শ্মশ্রু-শোভিত চিবুক, মস্তকে ধূসর কাশ্মীরার ক্যাপ, গলায় দু'হাত লম্বা কম্ফটর, আধ-চীনে-আধ-বিলাতী কালো আলপাকার কোট এবং সাদা জিন কাপড়ের পেন্টলুন পরা, হাতে পিচের মোটা ছড়ি, পায়ে গরাণহাটার ডবলস্প্রিং জুতা—পুষ্ট না হইলেও হৃষ্ট গোরাচাঁদ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়াকাশের চাঁদ (বসন) কাতর মুখে, কাতর ভাবে বসিয়া একাগ্রচিত্তে স্বীয় দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ দেখিতেছেন। ভীত, চিন্তিত, বা বিস্মিত না হইয়া গৃহিণীকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া গোরাচাঁদ নিকটবর্তী হইয়া বসুমতীর হাত ধরিলেন এবং শুদ্ধ হস্তবলের অনুরোধে তাঁহাকে শয়নগৃহে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। বসুমতী মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোরাচাঁদের মা রান্না-ঘরে ছিলেন, জুতার শব্দে পুত্রের আগমন-বার্তা জানিতে পারিয়া ত্রস্ত ব্যস্তভাবে উপস্থিত হইয়া পুত্র-পুত্রবধূকে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন।

জননীকে দেখিয়া গোরাচাঁদ বিরক্ত হইলেন। বসুমতীর হাত ছাড়িয়া দিয়া, স্বীয় বাম কটিতটে বামহস্তের মণিবন্ধ স্থাপন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ তুলিয়া, সোজা অথচ একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া গোরাচাঁদ বলিলেন,—"যাও, তোমার রান্না-ঘরে যাও—কর্তব্য পালন আগে, বিশ্রাম কি আমোদ, তার পর। রুটি হয়েছে?—হয় নাই; ডাল হয়েছে?—হয় নাই; চচ্চড়ি হয়েছে?—হয় নাই; মাছ ভাজা হয়েছে?—হয় নাই! আমি জানি, নিশ্চয় জানি, এ সব কিছুই হয় নাই। তবু তুমি কাজ ফেলে, আমার কাছে আমোদ করতে এলে! ছি! ছি!" মাকে সম্বোধন করিয়া এই পর্যন্ত। আপনা-আপনি খুব স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—"মা মনে কর যে, মা হ'লেই বুঝি সাত খুন মাফ! এই এলুম একটা কাজ ক'রে, কোথায় দুটো মিষ্টি মুখের কথা শুনে মন তুষ্ট করব, পরিশ্রমের অবসাদ বিনাশ করব, না বুড়ি এসে সুমুখে দাঁড়ালেন। এদের কি বিবেচনার লেশ মাত্র নাই?"

মা থতমত, ভীত, সংকুচিত। বলিলেন—"না বাবা, এই বৌমার অসুখ করেছে, তাই বলতে এলুম, যদি কারুকে ডাক্তে টাক্তে হয় তা হ'লে—"

"তা হ'লে তোমার সাত গুষ্টির পিণ্ডি, আর আমার বাবার মাথা! তা হ'লে আবার কি?—যাও, যাও, বিরক্ত করো না।"

"আহা পরের জন্য বাছার আমার আহার-নিদ্রে নেই! খেটে খুটে এয়েছে"—বিড় বিড় করিয়া এইরূপ বলিতে বলিতে গোরাচাঁদের মা, কর্তব্য পালনের স্থান রন্ধনশালায় পলায়ন করিলেন।

তখন গোরাচাঁদ আবার পূর্বভাব অবলম্বন করিয়া, প্রেয়সীর হাতে ধরিয়া একটু উৎকণ্ঠা, একটু আগ্রহের স্বরে বলিলেন—"অসুখ হয়েছে? কি অসুখ, বসন? তোমার অসুখ করেছে? তোমার?"

বসন উত্তর দিতে বিলম্ব করিল। গোরাচাঁদ বসনের হাতে ধরিয়া বসনকে টানিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন, খাটের উপর বসনকে সবলে উপবেশন করাইলেন।

বসুমতীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল, নয়ন-নদের পঙ্কিল জলে কপোল-ভূমি ভাসিয়া গেল। "তোমার বসীর কি হয়েছে, তা কি তুমি জান না?" স্বল্পভাষিণী বসুমতী প্রত্যেক শব্দের পর এক এক দীর্ঘশ্বাস, অথবা কণ্ঠরোধ-সূচক অব্যক্ত ধ্বনি সহকারে কয়েকটি শব্দ প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হইল।

গোরাচাঁদ মাথার টুপি খুলিতেছিলেন, খোলা হইল না, টুপির সঙ্গে হাতের যোড় লাগিয়া গেল।

"আমি ত জানি না যে, তোমার কোনো অসুখ করেছে। তোমার অসুখ জান্‌লে কি আমি এমনি স্থির হ'য়ে থাকবার লোক? তোমার জন্য আমি নদীর জল, গাছের পাতা, আকাশের নক্ষত্র তন্ন তন্ন করে তোলপাড় করতে পারি, স্বর্গ মর্ত্য আন্দোলিত করতে পারি—আর, আমার সেই বসনের, আমার হৃদয়ের বসীর, আমার সেই তোমার অসুখ জেনেও আমি হিমাচলের মতো শীতল, অচলভাবে বসে থাকব, এও তোমার বিশ্বাস হয়?"

বসুমতী দেখিলেন বেগতিক! এখন এই যে প্রণয়-সরোবরের লহরীলীলা দেখিয়া তিনি সুখানুভব করিবেন, এমন অবস্থা তাঁহার নয়। কাজে কাজেই আর বাক্যাড়ম্বরের দিকে না গিয়া সাদা কথায় বলিয়া উঠিলেন—"আজ বুঝি আমার ছেলে হবে। একটু একটু ব্যথা উঠেছে।"

গোরাচাঁদ।—"এই বুঝি অসুখ?"

বসুমতী।—"দত্তদের বাড়ির মেয়েদের কথা শুনে অবধি আমার ভয় আরও ভয় হচ্চে ওমা! তা হ'লে আমি কি করব?"

বসুমতী আবার কাঁদিয়া ফেলিল। দত্তদের বাড়ির মেয়েরা ভয় দেখাইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত কি না, বসুমতীর ব্যথা উঠিয়াছে, ডাক্তারকে প্রথমেই ডাকিয়া আনা উচিত কিনা; যে জন্য যে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য-সংস্থাপন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ব্রত সার্থক করিবার এই সুযোগে কাজ হাসিল করিবার চেষ্টা করা উচিত কিনা—এই মানসিক বিতণ্ডায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোরাচাঁদ একটু মৌনী হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে, শেষ চিন্তাই শ্রেষ্ঠ চিন্তা, এই সার করিয়া প্রফুল্লভাবে, হাসি হাসি মুখে বলিলেন,—

"বেশ হয়েছে! তোমার এই যে অসুখের কথা বল্‌ছ, এ চমৎকার হয়েছে। তোমার কষ্ট পাবার দরকার নাই, আমি স্বয়ং সন্তান প্রসব করব, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমোও গে। আমি রইলুম, ছেলে প্রসবের ভারও আমার রইল।"

বসুমতী অবাক।

"সে কি? তুমি প্রসব করবে কি? তা যদি হ'ত, তবে আর ভাবনা

কি বলো ?”—অনেক কষ্টের উপরেও একটু হাসিয়া, বসুমতী এই কথা কয়টি বলিল।

“তা যদি হ'ত ?—কেন ? যদি কেন ? তা হ'তেই হ'বে। তুমি যেটা অসম্ভব মনে করছ, সেটা আমার মতে একটুকুও অসম্ভব নয়।—হাঁ আমি স্বীকার করি যে, এ পর্যন্ত পুরুষে কুত্রাপি প্রসব করে নাই। কিন্তু এর কারণ কি ? কারণ, শুদ্ধ পুরুষের অত্যাচার, স্ত্রীজাতির বিড়ম্বনা, আর তোমাদের অর্থাৎ স্ত্রীলোকের কুঅভ্যাস। আগে রেলের গাড়ি ছিল না, তাই বলে কি রেলের গাড়ি হ'ল না ? আগে কেবল পুরুষেই বই পড়ত, স্ত্রীলোকে রাঁধাবাড়া করত—এখন কি তা উল্‌টে যায় নি ? কু-অভ্যাস, সমস্তই কু-অভ্যাস, আর কু-সংস্কার, আর অত্যাচার। আমাকে যদি মা বাপ ছাড়তে হয়, বাগ্‌বাজার ছাড়তে হয়,—সেও স্বীকার, তবু এবার তোমাকে আমি প্রসব হ'তে দিচ্ছি না। আমি ফরাসডাঙ্গায় গিয়ে বাড়ি করব, সেখানে নিজে প্রসব করব—তবু তোমাকে আর কষ্ট সহ্য করিতে, একমাত্র স্ত্রীজাতিকে বিড়ম্বিত হ'তে দিব না।”

বক্তৃতা করিতে করিতে, গোরাচাঁদ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রের ভাব দর্শনে গোরাচাঁদের মা কাতর ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাতের এক গোছা রুটি উননে পড়িয়া পুড়িতে লাগিল, পাড়ার লোক একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল। মহা এক হুলস্থুল ব্যাপার। কিন্তু গোরাচাঁদের বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই। বাস্তবিক সদ্‌বক্তার, সুকবির, প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেরই গুণ এই ; ইঁহারা তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। নহিলে প্রতিভা কি ? অসাধারণতা কোথায় ?

অনেকক্ষণ পরে গোরাচাঁদের চট্‌কা ভাঙিল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে পারিলেন যে, আপনি বক্তৃতা করিতেছেন, আর কথাটা না কি নিজ গৌরবের কথা,—তাই মনে মনে একটু ইতস্তত করিয়া গোরাচাঁদ বুঝিতে পারিলেন যে, শুদ্ধ বক্তৃতার ইন্দ্রজালে জড়িত এবং বিমোহিত হইয়াই এত লোক সমবেত হইয়াছে। গোরাচাঁদ সিদ্ধ-বক্তা ;—জনতাই তাঁহার ঘর বাড়ি, জনতাই তাঁহার অস্থি-মাংস। মৎস্যের যেমন জল, নক্ষত্রের যেমন আকাশ, অগ্নির যেমন ইন্ধন, জনতাও গোরাচাঁদের তদ্রূপ, সুতরাং গোরাচাঁদ বিস্মিত হইলেন না, সস্মিত-বদনে হতবুদ্ধি

জননীকে বলিলেন—"মা, এক গেলাস জল নে এস দেখি"—বলিয়া সেই স্ত্রীবহুল লোকসমুদ্রে নয়ন সঞ্চালনপূর্বক দেখিলেন, সংবাদপত্রের লেখক তাহাতে ভাসিতেছে কি না। দেখিলেন, কিন্তু বৃথা! যেহেতু, সংবাদপত্রের সম্পর্কীয় নরনারী কেহ তথায় ছিল না। সংসারের দোষই এই, শিয়রে সময়-মতো ইতিবেত্তা থাকে না বলিয়া আমাদের কত কত সোনার স্বপ্ন স্বপ্নেই বিলীন হইয়া যায়।

জননী জল আনিবার অভিপ্রায়ে ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলেন যে, বৌমা বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন, এবং কাতরভাবে—"মাগো মরচি গো, আর বাঁচলাম না গো" ইত্যাদি শব্দ করিতেছেন। সুতরাং জলের কথা ভুলিয়া বৌমার শুশ্রূষা করিতে বসিয়া গেলেন। অভ্যাস দোষেই হউক, কুল-ধর্মের গুণেই হউক, বসুমতী যে তখন বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতেছিল, তাহার আর কথাটি নাই। এবং গোরাচাঁদের মা যে সে কষ্ট বুঝিতেছিলেন, তাহারও সংশয় নাই। সুতরাং প্রিয় পুত্রের পিপাসার কথা ভুলিয়া যাওয়াতে তিনি যে একটা খুব গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

জল আসিল না দেখিয়া গোরাচাঁদ অতিশয় ত্যক্ত হইলেন। বক্তৃতা ব্যাপারের দুইটি প্রধান অঙ্গ—সংবাদপত্রের লিপিকর এবং জলের গেলাস—অনুপস্থিত দেখিয়া উপস্থিত মহিলামণ্ডলীর উপর গোরাচাঁদ কটূক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তুই মাগীরেই তো যত দোষের গুরু। আপনি ভালো হবি না, পরকেও হ'তে দিবি না।—তোরা আপনার নাক কাটিস্, কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস্। সৎকার্যে যোগদান,—আপনাদের উপকারের কথাতে উৎসাহ—দূরে থাক, বাপ পিতামহের ব্যাভারের উল্লেখ ক'রে, আবার আমাদেরই টিটকারি করাটুকু আছে। এখানে তামাশা দেখ্‌তে এয়েছেন,—আমার—চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ দেখ্‌তে এয়েছেন। বেরো আমার বাড়ি থেকে! বেরো, বললুম বেরো! এক্ষনি বেরো। নইলে এক এক কিলে তোদের নাক থেঁতো ক'রে দেবো, জানিস্ নে?"

স্ত্রীলোকেরা গোরাচাঁদকে ভয় করিত, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। কেন তাহারা ভয় করিত, তাহাও এখন জানা গেল। তিরস্কারের তাড়নায় রমণীগণ দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিল।

সেই রাগের ভরেই গোরাচাঁদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, জননীর উপস্থিতির প্রতি দৃকপাত না করিয়া, ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"বসন! এই তোমাকে শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমাকে প্রসব করতে দিবে কি না?"

"বসন" নিরুত্তর। পূর্ববৎ এ পাশ, ও পাশ, হা হুতাশ করিতে লাগিলেন।

"বাবা গোরাচাঁদ"—বলিয়া জননী মুখ ব্যাদান করিতে না করিতে, একবার তীব্র দৃষ্টির পর এক লম্ফ প্রদানে গোরাচাঁদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; এবং সেই রাত্রি নয়টার সময়ে স্ত্রীর দুরভিসন্ধির প্রতিবিধান কল্পে কিংকর্তব্য স্থির করিবার জন্য সভাগৃহে উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মনে মনে সংকল্প করিয়া চলিলেন যে, স্ত্রী-পুরুষের সাম্য বিধান জন্য আবশ্যক মতো বল প্রয়োগ করাও বিহিত, সভায় এইরূপ অবধারণ করিয়া সভার কার্য-বিবরণে ইহা লিপিবদ্ধ করাইয়া লইবেন। নচেৎ এ সমস্যা পূরণের উপায়ান্তর নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[পাঠক-পাঠিকার মরণ বাঁচন গ্রন্থকর্তারই হাতে।]

তখন দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়াছে। এমন যে কলিকাতা সহর, তাহাও এক প্রকার নিস্তব্ধ হইয়াছে; এত যে জনস্রোত, তাহাও যেন শুকাইয়া, শীর্ণ হইয়া, সংকুচিত হইয়া, বালুকারাশির মধ্যে অন্তর্ধান হইয়াছে। (পাঠক মহাশয় সমীপেষু,—জনস্রোতের অনুরোধ আমি অবশ্য মানি; কিন্তু এস্থলে বালুকারাশি যে কোন্ পদার্থের উপমান, তাহা আমি অবগত নহি)। কেবল কদাচ কোথাও একখান ভাড়াটে গাড়ি ভয় দেখাইবার জন্য বিকট শব্দসহকারে মৃতপ্রায় অশ্বযুগলের অনুধাবন করিতেছে; অশ্বদ্বয়ও প্রাণের দায়ে একমনে এক ভাবে চলিয়াছে। অনেকে ভূত মানে না, কিন্তু ভূতকে বড়ো ভয় করে; রাত্রিকালে সন্দিগ্ধ স্থল দিয়া যাইতে হইলে ভয়ে দৌড়িতে পারে না; থামিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেও সাহস করে না। ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়ার অবস্থাও সেইরূপ। কোনও কোনও স্থানে বেড়ার গায়ে, দেওয়ালের গায়ে, রেলিঙের গায়ে, ঠেস্ দিয়া চক্ষু মুদিয়া আন্ধারিয়া লাণ্ঠান হাতে এক এক জন পাহারাওয়ালা দুইটি পরমতত্ত্বের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে; এক—সার্জন সাহেব এ পথে না আইসে; অপর—একটা চোর কিংবা মাতাল গায়ে পড়িয়া ধরা দেয়। যাহারা পাখা টানে আর যাহারা পাহারা দেয়,

তাহারা ইহকাল পরকাল একসঙ্গে রক্ষা করে—ধ্যান ছাড়ে না, অথচ কাজ ভোলে না। ইহা ছাড়া, পথের ধারে কিংবা দোতলায় উপরে কোথায়ও বাঁয়া তবলা, মানুষের গলা প্রভৃতি হইতে ওয়াক্ ওয়াক্ মিশ্রিত অনির্বচনীয় শব্দে নেশায় তর্‌র্ কলিকাতার বিরক্তি সম্পাদন করিতেছে। ঘুমাইয়াও কলিকাতা ঘুমাইতে পাইতেছে না।

ফলে আমি প্রকৃতি বর্ণন করিতে বসি নাই, পটও আঁকিব না। গোরাচাঁদ না কি সভাস্থল হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছেন, তাই ঐতিহাসিক নবাখ্যানের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্যই এত বাক্য ব্যয় করিতেছি। আপনারা সেটা ভুলিবেন না।

তত রাত্রিতে সভায় গিয়া গোরাচাঁদ দেখিলেন, সভাগৃহের দ্বার রুদ্ধ, সুতরাং প্রবেশ করিবার উপায় নাই। যে সে লোক হইলে হতশ্বাস হইয়া এইখানেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিত। কিন্তু গোরাচাঁদের অধ্যবসায় অপ্রতিহন্য ; সংকল্প অটল, সাহস দুর্জয়। অসাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু গোরাচাঁদের অভীষ্ট বিচলিত হইতে পারে না। অনেক উত্তম উত্তম উপমা দিয়া এ বাক্য সমুজ্জ্বল করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। যে অসম্ভবকে বাস্তব করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে উপমা প্রয়োগ করা ধৃষ্টতা ত বটেই, পূর্ণ বাতুলতা।

স্ত্রী-উত্তোলনীর সম্পাদকের বাড়ি গোরাচাঁদ স্বয়ং গেলেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সভ্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়া আবশ্যক সংখ্যা পূরণ করিয়া সকলে মিলিয়া সভাতলে উপনীত হইলেন।

অসাধারণ সভার এই অসাধারণ অধিবেশন খুব জমিয়া গেল, ইহা বলাই বাহুল্য। ক্রমে প্রস্তাব বক্তৃতা, বাদ, অনুবাদ, প্রতিবাদ, বিতর্ক বিতণ্ডা—কত বলিব? আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্র মানব, কেমন করিয়া সে বাক্যসাগর মসীরেখায় অঙ্কিত করিব? সাহারার মরুভূমি যদি কাগজ হইত, মিশরের শিখা-মন্দির[১] যদি লেখনী হইত, ভূমধ্যসাগর যদি দোয়াত হইত, তাহা হইলেও এই সভার, এই রজনীর কার্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করিতাম কি না, বলা যায় না। আমার বর্তমান অবস্থায়, উপস্থিত উপকরণ লইয়া ত কোনো-

অগ্নিশিখাকার স্তূপ Egyptian Pyramid

মত্তেই নয়। আপনারা এইস্থলে একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন, উপরে যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ভারত ছাড়া। পাণ্ডিত্য থাকিলে, আর পাণ্ডিত্য দেখাইতে হইলে এরূপ নহিলে হয় না ; ফল কথা, আমি সে কার্য-বিবরণ এখানে তুলিতে সাহসী হইলাম না ; সগু সগু তাহা না পড়িলে যাঁহার সংসার অচল হইবে, তিনি সভাসম্পাদকের খাতায় পড়িয়া আসিতে পারেন ; আর, অপেক্ষা করা যদি চলে, তবে আগামী কল্য মন্তব্য সমেত সংবাদপত্রে পাঠ করিতে পারিবেন।

স্ত্রী-পুরুষের সম্যক্ সাম্য বিধান জন্য গোরাচাঁদ যথাবিধি প্রস্তাব করিলেন। যথাবিধি গোরাচাঁদের সে প্রস্তাব গৃহীত, অনুমোদিত, অবলম্বিত এবং সভার পুস্তকে লিখিত আকারে পরিণত হইল। একটু বলা আবশ্যক। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, জয়ের পূর্বে যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী, নহিলে জয় কিসে? অতএব গোরাচাঁদের প্রস্তাবে বাধা উপস্থিত করিয়া, তাহার বিরোধ চেষ্টা করিয়া কেহ যে নিজ দুর্বলতা, অসমসাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছিল, ইহা না বলিলেও চলে।

সেই জয়ে উল্লসিত হইয়া, সভাভঙ্গের পর দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত করিয়া গোরাচাঁদ কর্ণবালিস[১] রথ্যা অবলম্বনে বাটি যাইতেছিলেন। তাহাতে সুকিয়ার গলির মোড়ের সম্মুখে গ্রন্থকারের সহিত দেখা। সেই কথাটা জানাইবার জন্য আমার এ প্রয়াস। অনেক কথা বলিতে ভুলিয়াছি ; তন্মধ্যে এক কথা এই যে, মির্জাপুর রথ্যার কোনও এক স্থানে স্ত্রী-উত্তোলনীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল ; সেই ধড়া-চূড়া-বাঁধা গোরাচাঁদ সেই স্থান হইতে বাড়ি যাইতেছিলেন। আর এক কথা এই যে, গাড়ি ভাড়ার পয়সা সঙ্গে ছিল না বলিয়া গোরাচাঁদ একাকী পদব্রজে যাইতেছিলেন। এই অর্থাভাবে এই ইতিহাসের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, গোরাচাঁদ গাড়ি হাঁকাইয়া যাইতে পারিলে আমরা সঙ্গে যাইতে পারিতাম না। অতএব ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার এবং গোরাচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন।

যাহাদের মানসক্ষেত্রের পরিসর অল্প, এরূপ ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্যগণ উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু গোরাচাঁদ বিরাট পুরুষ, উন্মত্ত হইলেন না ; তাই বলিয়া

১ Cornwallis Street

অন্তরের তরঙ্গ-বিক্ষোভে তিনি যে একটুকুও বিচলিত হন নাই, এমন বলিতে পারি না। প্রাকৃতিক বলের সংঘর্ষ একেবারে পরিহার্য নহে, ভূকম্পে ভূধরও টলিয়া যায়। সুতরাং গোরাচাঁদ চলিতে চলিতে এক একবার দণ্ডায়মান হইবেন, থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গভঙ্গীসমেত সবলে দক্ষিণ হস্তের সঞ্চালন, বাম করতলে দক্ষিণ করমুষ্টি সশব্দে প্রহার করিবেন, ইহা আশ্চর্য নহে। এক পার্শ্ববর্তী পাদপন্থা হইতে অপর দিকের পাদপন্থায়, আবার এধার হইতে ওধার—বার বার গোরাচাঁদ এ প্রকার করিয়া চলিতেছিলেন, তাহাও আমি অস্বীকার করি না, অস্থিরমতিতে পদ-বিক্ষেপ অস্থির হইয়াছিল, তাহাও আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ইহার কারণ ছিল।

সভাতে গোরাচাঁদ কৃতকার্য, সিদ্ধকাম হইয়াছেন, সভার নির্ধারিত প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া বসুমতী আর আপত্তি করিতে পারিবে না, সহজেই পুরুষত্ব লাভে সম্মত হইবে, সমগ্র নারীকুল বাধ্য হইয়া দায়ে পড়িয়া সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে, ইহা চাপিয়া রাখিবার আনন্দ নহে। এখন, এই গৌরবের কথা, এই আনন্দের কথা, দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হইবে বটে, কিন্তু অদ্য রাত্রিতেই "বঙ্গমশালে" এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ লেখাইতে যাওয়া কর্তব্য কিনা, গোরাচাঁদ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কাজে কাজেই তাঁহাকে সর্পগতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, কাজে কাজেই মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইতেছিল। গোরাচাঁদ একবার ভাবেন "বঙ্গমশালের" বাড়ি যাই, অমনি রাস্তার ডান ধারে উপস্থিত; আবার মনে করেন, "বঙ্গমশাল" হয়ত এতক্ষণ ঘুমাইয়াছে, অমনি দাঁড়াইয়া মাথা কাঁপাইয়া চিন্তা; তখনি স্থির করেন—আত্মগৌরব পরমুখে ব্যক্ত হইলেই ভালো, সঙ্গে সঙ্গে বেগে রাস্তার বাঁ ধারে আসিয়া পড়েন; ক্ষণে আবার যুগপৎ সমস্ত ভাবের সমাবেশ হয়, তখন এক পা তুলিতে এক পা পড়িয়া যায়, দু পা আগে হাঁটিতে এক পা পাছে সরিয়া যায়, যেখানকার সেইখানে পা থাকিতে দেহপ্রতিমা দুই বার বামে, দুই বার দক্ষিণে হেলিয়া যায়। ফলতঃ গোরাচাঁদের সেই আপাত-দৃশ্যমান অস্থিরতার কারণ ছিল, ইহা আমি দেখাইলাম। সে কারণ "বঙ্গমশাল"। "বঙ্গমশাল" যে বঙ্গদেশীয় বঙ্গভাষাবিরচিত, বঙ্গোন্নতির কেন্দ্রীভূত জগদ্বিখ্যাত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, এ কথা যে না জানে,—মহারাজা, রাজা এবং রায় বাহাদুরের তালিকা হইতে তাহার নাম খারিজ

করিয়া দেওয়াই উচিত। আবশ্যক হইলে "বঙ্গমশাল" সম্বন্ধে অন্য কথা পশ্চাৎ।

উপরে বলা হইয়াছে—বৃথা কথা আমি বলি না—রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে পাহারাওয়ালা ছিল। একজন পাহারাওয়ালা একটা আলোকস্তম্ভে নির্ভর করিয়া মুদিত-নয়নে ভাবনা করিতেছিল যে, ব্রজবাসিনী গোপীগণের ভাণ্ড ভাঙিয়া নবনী চুরি করিয়া কিষণজী বড়ো উত্ত্যক্ত করিতেছেন, যশোদামাইর খাতিরে কেহ কিছু বলিত না, আর তেমন হুঁসিয়ার পাহারাওয়ালাও সে আমলে ছিল না। এখন এই "কোম্পানির" মুলুকে আমার সামনে পড়িলে কিষণজী যেই ননীর ভাঁড় হইতে হাতটি তুলিতেন, অমনি খপ্ করিয়া—ভগবৎধ্যানমগ্ন পাহারাওয়ালা সত্য সত্যই দক্ষিণ হস্তখানি বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে দৈবের বিচিত্র সমাবেশ, গোরাচাঁদের দেহখানি সেই হাতখানির প্রান্তদেশে উপস্থিত। সুতরাং সংস্পর্শ; ফল, উভয়েরই ধ্যানভঙ্গ। একভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্তির কারণ নির্দেশ করিতে বড়ো বড়ো দার্শনিকগণ সমর্থ হন নাই; সুতরাং 'কিষণজী' ভাবিতে ভাবিতে পাহারাওয়ালা কেন যে 'শ্বশুরা' বলিয়া উঠিল, আমি কেমন করিয়া জানিব? কিন্তু বলিল 'শ্বশুরা'। গোরাচাঁদও "বঙ্গমশাল" ভাবিতেছিলেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন—"ক্যা হায়"। চিত্ত-বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতেই নাটকের উৎপত্তি; শব্দের উপর শব্দ পড়িলেই গোল-যোগের উৎপত্তি; এ নাকি নৈসর্গিক নিয়ম, তাই এ স্থলেও ইহার কার্য হইল। পাহারাওয়ালা পূর্বে কেবল 'শ্বশুরা' বলিয়াছিল, এখন বলিল "শ্বশুরা, বাউরা, মাতোয়ারা"। অগত্যা গোরাচাঁদের মুখে "যও" অর্থাৎ সরিয়া যাও ধ্বনিত হইল। পাহারাওয়ালা পুনরপি বলিল "চলো থানা পর" এবং সর্বাঙ্গ চঞ্চল করিল। গোরাচাঁদও ইংরেজি ভাষায় উত্তর দিয়া সর্বাঙ্গ অধিকতর সঞ্চালন করিলেন। ফল হইল উভয়ের বেগে গমন, অগ্রে গোরাচাঁদ, পশ্চাৎ পাহারাওয়ালা; ক্রমে রীতিমতো নরদৌড়, সঙ্গে সঙ্গে শব্দ—"পাকড়ো চোর—মাতোয়ারা" ইত্যাদি।

দৌড়! দৌড়! দৌড়! নিরপরাধ পরহিতপরায়ণ গোরাচাঁদ জানেন না যে কেন দৌড়িতেছেন, তথাপি দৌড়। সাহস নাই এমন নয়,—এত রাত্রিতে সভ্য সংগ্রহ, সভা হইতে একাকী প্রত্যাগমন ভীরু লোকে পারে না। শরীরে বল নাই এমত নয়,—জ্বরের উচ্ছিষ্ট প্লীহাগর্ভ বঙ্গবাসী সহজে এত

বেগবান্ হইতে পারে না, তবু দৌড়। ভ্রম বশত দৌড়। পাহারাওয়ালা দৌড়িতেছে, সেও ভ্রম বশত দৌড়। সংসারে কয়জন ফিরিয়া দেখে? সংসারের গতিকই এই।

ইঁহারা দৌড়ুন, কিন্তু পাঠক-পাঠিকা এখন নিতান্তই গ্রন্থকারের হাতে। এখন আমি মারিলে মারিতে পারি, রাখিলে রাখিতে পারি; এখন একমাত্র আমার দয়ার উপর নির্ভর। এই জন্যই গ্রন্থকারের এত সম্মান, লোকে গ্রন্থকারদের এত ভয় করে। নিত্য নিত্য দেখিতে পাও না, দক্ষিণা দিয়া হাসি হাসি মুখে গ্রন্থকারের কর-কবলিত হইয়া কত সুশীল সুবোধ পাঠক শেষে কাঁদিয়াও নিস্তার পান না? অতি কোমল শয্যায় সবলে শোয়াইয়া দিলেও যাহার অস্থিভঙ্গের সম্ভাবনা, এমন কোমলপ্রাণা, পাঠকের ভালোবাসার ধন, নায়িকাকেও উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে তুলিয়া 'এই ফেলি, এই ফেলি' করিয়া গ্রন্থকার ছাড়িয়া দেন, বহু অশ্রুপাত, বহুতর বিচ্ছেদ, বহুতর দুঃখ ভুঞ্জাইয়া আশার সুখপ্রান্ত সংস্পর্শ করাইয়া ধীর শান্ত নায়ককেও গ্রন্থকার ভদ্রাসনের খিড়কির বাঁধা ঘাটের নিম্নে অতল সাগরতলে নিমজ্জমান রাখিয়া ভদ্রলোকের মতো সরিয়া দাঁড়ান। গ্রন্থকারের এই রীতি। এক্তেয়ার আছে বলিয়াই এই কার্দানি। আমিও ত গ্রন্থকার।

গোরাচাঁদ অনন্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া অনন্তকাল পর্যন্ত পাহারাওয়ালা-তাড়িত হইয়া দৌড়িতে পারেন; মুহূর্ত মধ্যে পাহারাওয়ালার করাল কবলে কবলিত হইতে পারেন; অথবা বিপদ্-প্রশান্তমহাসাগরে সন্তরণ লীলা দেখাইয়া পাঠকের অলক্ষিতে, পাঠিকার অতর্কিতে বেলা-ভূমিতে পদার্পণ করিয়া হাস্যরাশি বিকীর্ণ করিতে পারেন; পারেন বটে, কিন্তু আমি রাজি হইলে ত? সেই জন্যই বলিয়াছি, পাঠক-পাঠিকার মরণ-বাঁচন গ্রন্থকর্তারই হাতে।

এখন আপনাদের ধৈর্য পরীক্ষা করিবার জন্য আমি একবার বিশ্রাম লভিব; আপনারা ভাবিতে থাকুন।

মাতৃভক্তি

অমৃতলাল বসু

মেমারি ষ্টেশনে নেমে বেলা ১০টা থেকে ৫॥টা পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাতে হেঁটে গেলে বাঁশখালি গ্রামে পৌঁছানো যায়। ঐ গ্রামের সুদাম মণ্ডল জাতিতে মাহিষ্য এবং পল্লীগ্রামের পক্ষে যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন। প্রায় এক বিঘা জমির উপর বাস্ত; খড়ের বাড়ি কিন্তু সদরে একখানি প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, তার দু'ধারে ও অন্দরে বড়ো বড়ো চালা, বাড়ির নিকটেই মস্ত বাগান, বড়ো বড়ো পুকুর, আম কাঁটাল জাম লিচু পেয়ারা পেঁপে ডালিম চালতা আমড়া নোড় প্রভৃতির গাছ, তাল গাছ, খেজুর গাছ-ও প্রচুর, ফলন্ত নারিকেল গাছ-ও ১০।১২টা আছে। বাড়িতে নারায়ণ-শিলা প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং নিত্য-সেবার জন্য বক করবী কুরচী স্থল-পদ্ম শেফালী চাঁপা কৃষ্ণকলি বেল যুঁই মল্লিকা এবং নানাবিধ দিশী ফুলের গাছ আছে। ভিটের আধরশিটাক্ তফাতে ৩।৪টি বড়ো বড়ো গোলা, তা'তে দু' তিন রকম ধান ডাল কলাই সরষে তিল প্রভৃতি সর্বদা বহু পরিমাণে মজুত থাকে। জমাজমি বিস্তর, তরিতরকারি শাকপাতা মাছ কিছু-ই কিনে খেতে হয় না, ক্ষেতের দোক্তায় ও ক্ষেতের আকের গুড়ের সাহায্যেই ঐ শ্রান্তি-হর আলস্য-রঞ্জন বস্তু প্রস্তুত হয়। হেলে গরু ও দুধোলো গাই থাকবার জন্যে যে গোয়াল-বাড়িটা আছে, সেটি-ও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়।

সুদামরা চার ভাই, সকলে-ই বিবাহিত, ছেলেপুলে-ও সবার হয়েছে। এ ছাড়া বিধবা খুড়ি জ্যেঠাই মাসী পিসী দিদি বোন ভাগ্নে ভাগ্নী এবং বাঙালী গৃহস্থের অবশ্য-পোষ্য এবং পোষ্যা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের অবস্থানে ভিটাখানিতে মা-লক্ষ্মী আপনার অপূর্ব শ্রী দিয়ে ফুল ফুটিয়ে রেখেছেন!

সুদামের ছোটো ভাই মুকুন্দ ছেলেবেলায় গ্রামের পাঠশালায় অর্জুন সরকারের কাছে কাগজে লেখা পর্যন্ত শেষ করে 'সরকার' উপাধি পায়, সেই জন্য সে নাম লিখিবার সময় 'মণ্ডল' না লিখে মুকুন্দ সরকার ব'লে দস্তখত ক'রত। চিঠা দাখিলা দলিল দস্তাবেজ এক রকম পড়তে পারৃত, জমিদারী কাছারিতে কি সরকারী আদালতে মামলা টামলা তদ্‌বীরের ভার

মুকুন্দের উপর-ই ছিল। মুকুন্দ ভিন্ন পরিবারস্থ অন্য সকল পুরুষই নিরক্ষর; তবে মুখে-মুখে হিসেব-নিকেশ করায় নিরক্ষর অগ্রজেরা কেহ-ই মুকুন্দ অপেক্ষা অল্প পটু ছিলেন না।

এই সাহিত্য-পরিবারের মধ্যে আর একটি প্রাণী মুদ্রিত অক্ষরের সহিত পরিচিত ছিলেন; সেই প্রাণীটি সুদাম মণ্ডলের অষ্টাদশ বর্ষীয়া রূপসী কন্যা। মণ্ডলদের বড়ো গিন্নী স্বামীকে দু'টি পুত্র সন্তান দান ক'রে প্রায় আট বৎসর সৃষ্টি-রক্ষার সাহায্যে বিরত থাকার পর এই কন্যা-রত্নের দেহ-জ্যোতিঃতে সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল করিয়া দিবার উপলক্ষ হয়েন।

অন্নপ্রাশনের পূর্বেই যে এ কন্যার নাম রত্নময়ী হ'বে সেটা অতি সহজ; আর অন্নপ্রাশনের সময় এই কন্যার লাবণ্যবিম্বে যে রজত-কাঞ্চন-ভূষণ প্রতিবিম্বিত হবে, তা' মণ্ডলদের পারিবারিক ইতিহাসে নূতন ঘটনা হ'লেও গ্রামবাসীদের মনে কোনও-রূপ বিস্ময়োৎপাদন করে নি।

যদি-ও মণ্ডল-পরিবারের সধবারা একেবারে নিরাভরণা ছিলেন না, তথাপি চাষে-কারবারে শিক্ষিত সুদাম মণ্ডল খাটাবার টাকা আটক ক'রে সোনা-রূপোকে আগুনে পোড়ানোটা গৃহস্থ লোকেদের পক্ষে বড়ো একটা সুলক্ষণ ব'লে মনে করতেন না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত অতিথির প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন-ছলে পিতা এ-ক্ষেত্রে হাঁসুলি পদক তাগা ও বালায় প্রায় পাঁচ ভরির উপর কিছু সোনা ও কোমরের নিমফল পায়ের মল ও বেঁকীতে প্রায় বারো ভরি রূপো বাজে খরচ করেছিলেন।

রত্নময়ী যখন সাত বছরে পড়ে তখন মহা সম্রান্ত প্রতিবেশী রাজবল্লভ কবিরাজ মহাশয়ের দৌহিত্রী বিজয়ার সঙ্গে রত্নর মা তাঁর কন্যার 'গঙ্গাজল' পাতিয়ে দেন। জাতি খ্যাতি সম্পত্তি প্রতিপত্তি শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতির অভিমান কবিরাজ মহাশয়ের ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নাতে প্রবলভাবে প্রবাহিত থাকিলে-ও, সুদাম মণ্ডলের শুদ্ধি বুদ্ধি ধর্মনিষ্ঠা ও নিরভিমান সারল্যের তিনি সতত প্রশংসা করতেন, সুতরাং এই সখীত্ব-সম্বন্ধ-বন্ধনে তিনি কোনো আপত্তি করেন নি; বরং রত্ন যখন বিজয়ার সঙ্গে তাঁদের বাড়ি বেড়াতে আসত, তখন তাকে এক এক দিন কাছে ডেকে আদর-ও করতেন এবং আর একটু বড়ো হ'লে দু' এক পুরিয়া স্বর্ণ-সিন্দুর খাইয়ে তার সৌন্দর্যের বৃদ্ধি করে দেবেন, এমন আশা-ও দিতেন।

এখন বিজয়ার ছোটো মামা বর্ধমানে থেকে ইংরেজি লেখাপড়া করে, সুতরাং সে বিজয়ার-ও একটু বাড়িতে পড়াশুনার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। আখ্যান-মঞ্জরী পাঠ-রতা বড়ো 'গঙ্গাজলে'র মাষ্টারিতে ছোটো 'গঙ্গাজল' মাস কয়েকের মধ্যেই "পাখি সব করে রব" আগাগোড়া মুখস্থ ক'রে আপনার বাপ্‌কে শোনাতে পারত। যে বাড়িতে আড়া পশারী ছালা পালা রেক্ কেঁড়ে ঢেঁকি কুলো ধুচুনি চরকা প্রভৃতি বৈষয়িক বা রান্নাবান্না ঝোল ঝাল আদি গার্হস্থ্য কথা ছাড়া অন্য কথা প্রায়ই উচ্চারিত হ'ত না,—পূজারী ব্রাহ্মণের মুখোচ্চারিত অশুদ্ধ অবোধ্য অনুস্বার-সংযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণে যে বাড়িতে সারস্বত-শ্রাদ্ধ সম্পাদিত হ'ত, সে ভিটেয় ফুট্‌ফুটে ছোটো মেয়ের কণ্ঠালাপে মধুর কবিতা ঝ'রে বাপের প্রাণ পরিতৃপ্ত ক'রত।

চাষী গৃহস্থের ঘরের ছেলের বই প'ড়ে সময় নষ্ট করাটা ভালো কাজ না মনে করলেও, সম্পত্তি-সঞ্চয়ের সঙ্গে-সঙ্গে সুদামের মনের কোনো একটা লুকানো কোণে "ভদ্র" হবার আকাঙ্ক্ষা মাঝে-মাঝে উঁকি মারত; অবশ্য সুদাম আপনাদের কখন-ই অভদ্র মনে ক'রত না এবং তাদের সংসারের সকলের-ই আচারব্যবহারে এমন একটা শিষ্টতা ছিল, যাতে গ্রামবাসী অতিশয় জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ-ও তাদের 'ভদ্র' সম্বোধন না ক'রে থাকতে পারতেন না।

কিন্তু মণ্ডল তার কোনো কোনো খবরের কাগজ-পড়া প্রতিবেশীর মুখে শুনেছিল যে, এখনকার কালে জামা না গায়ে দিলে, ঘাড় মুড়িয়ে চুল না ছাঁটলে, আর বইয়ের কথা আওড়াতে না পারলে সহর অঞ্চলে কেউ ভদ্র ব'লে পরিচয় দিতে পারে না, সুতরাং রত্ন ন' বছরে পা দিতে-ই সে তার জন্যে বেড়ালকে 'মার্জ্জার' আর গাছকে 'বৃক্ষো' বল্‌তে পারে এমন একটি বরের সন্ধান করছিল। পল্লীগ্রামে ব'সে সহজে ওরূপ বর পাওয়া যায় না—কাজে-ই এগারো বছর বয়সের আগে আর রত্নর বিবাহ হ'ল না।

বরটি নিতান্ত ভদ্র। জন্ম ভাদ্রমাসে, নিবাস ভদ্রেশ্বরের নিকট, নাম ভদ্রনাথ। পাছে স্বাধীন শ্রমজীবির অসভ্য আদর্শের ছায়াপাতে পুত্রের মনে ভদ্রভাব ভালোরূপে উন্মেষিত না হয় এই ভয়ে ভদ্রনাথের জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে-ই তার পিতা নিজের চাষবাস করা ছেড়ে দিয়ে যা-কিছু সামান্য জোতজমি ছিল, তা' জ্ঞাতিভ্রাতা হলধরকে ভাগে জমাবিলি ক'রে দেয় ও নিজে সুপারিশাদির জোরে জমিদারের কাছারি থেকে নিজগ্রামে তহশীলের

ভার প্রাপ্ত হয়। সেই অবধি ভদ্রজনসুলভ 'অনাটন' পাঁজাদের সংসারে বাঁশগাড়ী ক'রে বসে। স্কুলে পড়া ছেলের চিকণ ধুতি, ধোপদস্ত জামা, চকচকে জুতা তার সঙ্গে বইয়ের উপর বই—বাংলা সাহিত্য, পদ্য সংগ্রহ, অঙ্কপুস্তক ১ম ভাগ, ২য় ভাগ ইত্যাদি, অঙ্কপুস্তকের অর্থপুস্তক, জ্যামিতি, জ্যামিতি শিখিবার সহজ উপায়, পদ্যগাথার গদ্য-ব্যাখ্যা, বিজ্ঞান-রিডার, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় উঠিবার সোপান প্রভৃতি পুস্তক আর খাতার উপর খাতা। এর উপর স্কুলের মাইনে, কোচিংয়ের মাইনে, পাখার ফি, খেলার ফি, মাষ্টারের অভিনন্দন, শোক-সভার চাঁদা, ভেকের মরণে পুত্রের স্বরচিত শোকোচ্ছ্বাস মুদ্রণের ব্যয়, মারবেল, ব্যাটবল, ইত্যাদি খরচের ফর্দে বাবা-পাঁজাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্লে। এর সঙ্গে যোগ ক'রে নাও যে তিনি ভদ্রপুত্রের পিতা ও গ্রামের তহশীলদার; কাজে-ই তাঁর-ও আর আটহাতী খেঁটীতে চলে না। সুতরাং কোঁচা-ও একটু ঝুলেচে, গায়ে একটা মেরজাই চ'ড়েচে, পায়ে-ও একজোড়া কে-এম দাস—বগলে-ও একটি রেলীর বাড়ির ছাতা। যার মাথায় এত জ্বালা, অনটনের চিন্তায় যে সদা এত অন্যমনস্ক, জমা আদায়ের হিসাব-কিতেব নিয়ে তার প্রজা আর জমিদারের সঙ্গে যে হিসেবের গোলমাল হ'বে সেটা কিছু বিচিত্র নয়। আর হলধর-ও বাগ বুঝে ফসলের ভাগ নিয়ে গোলমাল করে।

বাল্যাবধি খাটুনির জোরে মজবুত শরীর ভদ্রনাথের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেবার পূর্ব বৎসর পর্যন্ত টি'কে ছিল,—কিন্তু আর রইল না। পেয়ারা গাছ, আতা গাছ তাতে আওতায় শুকিয়ে শুকিয়ে ম'রে যায়, কিন্তু তালগাছ যখন ঝড়ে নড়ে তখন একেবারে ঘাড়মুড় ভেঙে পড়ে। জরগ্রস্ত পিতার শয্যাশিয়রে ব'সে পুত্র দশদিন 'স্বাস্থ্য শিক্ষা' মুখস্থ করবার পর ভদ্রনাথ তাঁর অস্থি ভদ্রেশ্বরের জাহ্নবীজলে বিসর্জন ক'রে এল। বিধবা মাতা বল্লেন, "বাবা ভদ্দর, এখন তুমিই ভরসা। পর বৎসর ভদ্রনাথ দিবারাত্রি পরিশ্রম ক'রে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে মাসিক বৃত্তি লাভ করলে। এক্ষণে ভদ্রনাথের বয়স ১৫ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। নিবারণ চক্রবর্তীর ঘটকালিতে সুদাম মণ্ডল পাশ-করা জামাই পেয়ে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করলে।

সুদামের একান্ত ইচ্ছে যে জামাইটিকে নিজের কাছে রেখে চাষবাসের কার্য শেখায় এবং কন্যার যৌতুক স্বরূপ কিছু জমিজমা দিয়ে ভদ্রনাথকে

স্থিতু করে। ভদ্রনাথের মনে-মনে ঘরজামাই থাকতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু টেক্‌স্‌ট-বুক লিখিত আলুর চাষ মুখস্থ ক'রে পরীক্ষা পাশ করা এক কথা, আর হাতে-হাতে লাঙল ধ'রে মাঠের পাট করা আর এক কথা, এটি ভদ্রনাথ বেশ বুঝ্‌ত।

শৈশব হতেই সে শিক্ষা পেয়েছিল যে সরস্বতীর আবাস কেবলমাত্র রসনায়, হস্তপদাদির ব্যবহারে শুধু মূর্খের-ই অধিকার; বিবাহের পর সে বুঝ্‌লে যে চক্ষুদুটির-ও একটু কার্য আছে, তা' এলোকেশী প্রেয়সীর কৌমার অধরের সলাজ হাসির সৌন্দর্য দর্শন, আর—হৃদয় ব'লে একটা নিরাকার প্রত্যঙ্গে প্রণয়চিন্তার পরিপোষণ। সে বড়ো বড়ো আঙ্ক আস্ক আঙ্গ আব্ধ আব্দ্য প্রভৃতি শব্দ সংযোগে শ্বশুরকে বুঝিয়ে দিলে যে বিদ্যা অমূল্য ধন, সমস্ত নরনারী বিদ্যাশিক্ষা করে নি ব'লে-ই আজ-ও স্বাধীনতা পায় নি, একমাত্র কৃষিকার্যে রত হয়েই ভারতবর্ষ আজ-ও পরাধীন।

শ্বশুর আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভারতবর্ষ', সে কোন্ দেশ, কোথায় বাবা?" নবীন জামাতা গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে, ম্যাপে।" শ্বশুর মহাশয় কিছুই বুঝ্‌লেন না, তবে জামাতার আব্ধ আব্দ উচ্চারণ স্তব্ধ হ'য়ে শুন্‌লেন এবং তার ভদ্রতার আবাদে অভদ্র নামাবার ভয়ে কেবল যে কোনো আপত্তি করলেন না তা' নয়, বরং তার হুগ্‌লীতে থেকে নর্মাল স্কুলে পড়বার জন্যে বাসা খরচাদি ব্যয়ের কিছু কিছু সাহায্য করতে-ও প্রতিশ্রুত হলেন।

উলুবেড়ে সাবডিভিসনের অধীন ঝাউহাটী গ্রামস্থ মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে আজ ভদ্রনাথ পাঁজা বিরাজমান। প্রবেশ করেছিলেন ১৮৲ টাকা মাসিক বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে চার বৎসর পূর্বে। কিন্তু এক বৎসর কাজ করার পরেই তখনকার দ্বিতীয় পণ্ডিত হোমিওপ্যাথিতে এম্ ডি পাশ করবার জন্যে কলকেতায় চলে যান। সেক্রেটারির বাসায় থেকে খাবেন, আর তাঁর ছেলেদের পড়াবেন এই সর্তে ভদ্রনাথ ঐ পদে বাইশ টাকা বেতনে উন্নীত হন। এ সওয়ায় ড্রিল-শিক্ষা দেবার জন্যে দু'টাকা করে মাসে অতিরিক্ত বেতন। স্কুলের ছুটির পর উমো গোয়ালিনীর নাতিকে তার পড়া মুখস্থ করিয়ে দিতেন ব'লে উমো প্রত্যহ মাষ্টার মশায়কে এক পো করে দুধ খেতে দিত। কথাটা অসম্ভব হ'লেও আপনারা বিশ্বাস করবেন যে শুধু

গোপধর্ম রক্ষা করবার জন্তে উমো এ দুধটুকুতে এক ছটাকের বেশি জল কখনই দিত না। অপ্রত্যাশিত আশা পূর্ণ হ'লে লোকের পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এক বছরের মধ্যে যে হঠাৎ এমন প্রোমোশন ২২৲+২৲=২৪৲ এবং দু' বেলা ভাত, এতে ভদ্রনাথ বৃহস্পতির দৃষ্টিপাত প্রত্যক্ষ করলে। তখন আশা ফিস্ ফিস্ ক'রে দ্বিতীয় পণ্ডিতের কাণে কাণে বল্‌লে, "প্রথম শিক্ষক মহাশয়ের কিছু ভালো-মন্দ হ'লে বেশ সুবিধা হয় না!" দিবসে অবসর পেলেই ভদ্রনাথ ঝাউহাটী গ্রামের ষষ্ঠীতলায় মনসাতলায় শীতলাতলায় বাবা-ঠাকুরতলায় হেড্‌পণ্ডিত মশায়ের কোনোরূপে তাঁদের কৃপায় ত্বরায় সজ্ঞানে স্বর্গ-লাভের ব্যবস্থা যাতে হয়, তার মানত করেন আর রাত্রে সেক্রেটারির পাতকো-তলার পাশের কুঠুরীতে ব'সে ব'সে 'নিত্যকর্ম পদ্ধতি' দেখে ব্রজবন্ধু পণ্ডিতের উদ্দেশে সকল রকম তর্পণের মন্ত্র পাঠ করেন। ভদ্রনাথের শোনা ছিল যে জীবিত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করলে সে শীঘ্র শীঘ্র মরে যায়।

কিন্তু ব্রজবন্ধু রায় উগ্রক্ষেত্রীর বাচ্ছা। তার বাপ মরেছিল কাশরোগে বটে, পিতামহ দিনকতক বাতে ভুগে তুলসীতলা পান। তার আগে তাদের বংশের কোনো পুরুষ লাঠির ঘায়ে ভিন্ন পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হয় নি, আর তা-ও ১০।১৫টা মাথা নামানোর আগে নয়। তিনি নর্ম্যালই পাশ করুন, আর পাটীগণিতের সরল ব্যাখ্যাই লিখুন, তাঁদের বংশটা শীতলা-মনসা-পঞ্চানন সকলেরই বিশেষ পরিচিত। লাঠি দিয়ে যারা মাটি রাখ্‌তে পার্‌ত, তাদের ভিটেয় যমকে পৌছে দিতে দেবতারা-ও একটু ইতস্তত: করতেন।

কলিতে দেবতা নিদ্রিত বুঝতে পেরে ভদ্রনাথ তখন পিতৃতুল্য প্রাচীন হেডপণ্ডিত মহাশয়কে নানাবিধ সৎপরামর্শ দিতে সুরু করলে। "উঃ, কি দুঃখের বিষয়! আপনার মতো বিজ্ঞ লোক—তার ওপর এই পরিশ্রম—মায় পঁয়ত্রিশটি টাকা মাসে,—কি আর বল্‌ব মশায়, আপনি যদি কলকাতায় যান তা' হ'লে অনায়াসে সংস্কৃত কলেজে হেড্‌পণ্ডিত হ'তে পারেন, এমন কি মুন্সীপাল-স্কুল-ও আপনাকে পেলে বত্তে যাবে।"

হেড্‌পণ্ডিত মশায় বল্‌লেন, "আর ভাই, কোথায় যাই! এইখানে-ই আছি, কাটিয়ে দিই এইখানে-ই বাকি কটা দিন—" আবার ভদ্রনাথ বল্‌লেন, "তা-ও বলি, চাকরি-ই বা আপনার করবার প্রয়োজন কি? কেবল যদি ঘরে ব'সে ব'সে বই-ই লেখেন, তাতে-ই আপনার টাকা খায় কে? এই ধরুন,

অর্থপুস্তক ত অনেকে-ই লিখচে কিন্তু অর্থপুস্তকের যে 'সরল প্রবেশিকা' লেখা যায় এ কথাটা ত আজও কারও মাথায় আসে নি। আমার বিশ্বাস আপনিই এ বিষয়ে একটা নতুন আবিষ্কার ক'রে যেতে পারেন। তারপর আপনার "ছাত্র-প্রবোধে" এক বৃদ্ধা এবং তাহার কুক্কুটের ডিম্ব ব'লে যে গল্পটি লিখেছেন, তাতে বোধ হয় আপনি উপন্যাস লিখ্‌লে 'সাহিত্য-ভারতেশ্বর' হ'তে পারেন!" কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়া সম্ভব, ব্রজবন্ধু রায় যে গঙ্গালাভের পূর্বে ঝাউহাটী বঙ্গ-বিদ্যালয়ের লোহার পতোর মারা পুরানো পচা কেদারাখানি পরিত্যাগ করবেন এর কোন-ও লক্ষণ-ই তিনি ইঙ্গিতে-ও প্রকাশ করলেন না। আসল কথা, এই স্কুলটি তিনি হাতে ক'রে তৈরি করেছেন, অনেক পিতা-ছাত্রের পুত্র-ছাত্রেরা এখন-ও তাঁর কাছে পড়ছে। সত্য-ই অন্যত্র গেলে তাঁর আর্থিক উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা, প্রলোভন-ও যে চোখের সামনে হাত নেড়ে যায় নি তা-ও নয়, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর হাতে-গড়া পুতুলটির মায়া পরিত্যাগ করতে পারেন নি।

ভাদ্রমাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন প্রথম ঘণ্টাতেই ভদ্রনাথ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে সাহিত্য পড়াচ্ছেন। সহরের বড়ো বড়ো স্কুলের অনুকরণে ছাত্রদের আবৃত্তি শোনা, বানান ও অর্থ-ব্যাকরণাদির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার চেয়ে তাদের খাতায় রচনাদি লিখতে দিয়ে বা একেবারে এগারোটা অঙ্ক কসতে দিয়ে নিজের বৈষয়িক, বাসা খরচিক্, প্রাইভেট্ টিউশনিক্ প্রভৃতির চিন্তা করাই ছাত্রদের বিদ্যোন্নতির সহজ উপায় ব'লে ভদ্রনাথ স্থির ক'রে নিয়েছেন। ভদ্রনাথ আজ ছেলেদের 'মাতৃভক্তি' সম্বন্ধে রচনা লিখতে দিয়েছেন; ব'লে দিয়েছেন, 'এক-সার্সাইজ' বইয়ের চার পাতার অধিক না হয়, আর প্রতি দশ লাইনের ভিতর ৩২টি করিয়া যুক্তাক্ষর থাকিবে। ছেলেরা অবশ্য মাকে ভালোবাসে, ভয় করে, মার কাছে আব্‌দার করে, কখন-ও কখন-ও বকাবকি-ও করে, তার নাম যদি 'মাতৃভক্তি' হয় তাতে-ও তাদের আপত্তি নেই; কিন্তু যুক্তাক্ষর-বহুল রচনার মাতৃভক্তি কখনই সত্যকার মাতৃভক্তি নয়, সুতরাং কোন বইয়ে কে একটু আধটু মাতৃভক্তির বিষয় প'ড়েছে—তাই পরস্পরে কানাকানি ক'রে জিজ্ঞেস করছে। কেউ বা আরম্ভ করেছে—"মাকে জননী বলে, জননী বিশেষ্য পদ, জনন শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় করিলে জননী হয়। মাতা ভিন্ন

জননী শব্দের আরও অনেক অর্থ আছে, যথা :—দয়া, জানীনামগন্ধদ্রব্য, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, চর্ম্মটীকা, চামচিকা ইত্যাদি—।”

পণ্ডিত মহাশয় অলস চিন্তা ত্যাগ ক’রে পাঠে নিযুক্ত। গত রাত্রের ডাকে বাঁশখালী গ্রাম থেকে তাঁর স্ত্রীর একখানি পত্র পেয়েছেন। রত্নময়ী এক্ষণে অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী। বিবাহের পর স্বামী-ও যেমন প্রায় বারো মাস বিদেশে থাকে, সে-ও তেমনি বাপের বাড়িতেই থাকে। তবে মাঝে মাঝে ত্ু’ চার দিনের জন্য শাশুড়ীকে গিয়ে দেখা দিয়ে আসে। মণ্ডল পরিবারের সকল মেয়েরাই অশিক্ষিতা, সুতরাং কেবল মাত্র দাসীজনোচিত ধান-ভানা, ডালকলাই-ভাঙা, চাল-ঝাড়া, ঘুঁটে দেওয়া, বাট্না বাটা, কুট্নো-কোটা, ভাতব্যান্ন্ন রাঁধা, মুড়ি ভাজা, মুড়ি, নারকোল নাড়ু পাক করা, ক্ষীরের ছাঁচ ও চন্দ্রপুলি গড়া, বালিসের ওয়াড়, কাঁথা সেলাই করা, প্রভৃতি ইতর কার্যেই দক্ষা ; বাড়িতে রত্নময়ী একমাত্র শিক্ষিতা মহিলা। সুতরাং বিদ্যার সম্মান রক্ষার্থ কেউ তাকে কোনো কাজ করতে বলে না। সে সকালে নেয়ে উঠে পিঠের উপরে চুল ফেলে চিকণ শাড়ি পরে হেসে খেলে ঘুরে বেড়ায়, সম্পর্ক বুঝে কারুর সঙ্গে একটু আধটু ঠাট্টা-তামাশা করে। কখন-ও কখন-ও ঘরে ব’সে একটু আধটু দীর্ঘ-নিঃশ্বাস, আর মাঝে মাঝে শুয়ে প’ড়ে নূতন নূতন উপন্যাসের মধ্যে সতীত্বের সহিত রতিত্বের যে অপূর্ব মিলন কাহিনী রচিত আছে, তাই পাঠ ক’রে পতি-বিরহ-বিধুর হৃদয়কে শান্ত করে। ২রা ভাদ্র তারিখে রত্নময়ী স্বামীকে যে পত্রখানি লিখেছেন তিনি সেখানি কাল পেয়ে বার দশেক পড়েছেন ; এখনও চক্ষু ত্ুটি সেই পত্রে নিবিষ্ট।

রত্নময়ীর বিদ্যাভ্যাস যদিও হাল্কা উপন্যাস পাঠেই শেষ, তবু তাঁ’রে বিদুষী বলা উচিত ; তার ওপর তিনি কিঞ্চিৎ সুরসিকা ; এই রসালাপের শিক্ষয়িত্রী-ও সেই ‘গঙ্গাজল’। বিজয়ার বিবাহ হয়েছে হালীসহরে ; ঈশ্বর গুপ্তের জন্মভূমি যার শ্বশুর বাড়ি—তার প্রাণে যে একটু রঙ্গ-রসের বুদ্বুদ উঠ্বে, তা আর আশ্চর্য কি ?

লেখক ভদ্রনাথ পণ্ডিতের ঠাকুরদাদা স্থানীয়, কাজে-ই নাত্বৌয়ের গোপন চিঠিখানি যদি লুকিয়ে প’ড়ে নকল ক’রে নেয়, তা হ’লে নেহাৎ সম্পর্ক-বিরুদ্ধ কাজ হবে না।

রত্নময়ীর পত্র

পরম পুজোনিয় শ্রীজুত পতিরাম নাথ মহাষয়

শ্রীচরণসরোয পানের বরোজেষু

প্রাণেশ্যর,—

(প্রথম প্রথম রত্নময়ী স্বামীকে 'প্রণমা শতকোটী নিবেদন' লিখ্‌ত, কিন্তু ভদ্রনাথ তাকে প্রাণেশ্বর, হৃদয়বল্লভ, প্রিয়তম প্রভৃতি লিখতে উপদেশ দিয়েছিল)।

সেই গর্‌মীর ছুটির সময় এখানে দু'মাস কাটিয়ে তুমি যে চোলে গেছো তারপর থেকে তোমার বদনচন্দ্র না দেখে আমার দুঃখিনী মনে কি যে অচেনা অজানা বেদনবাঁশী দিবানিশি বাজ্‌ছে তা আর কেমন ক'রে তোমায় জানাবো? আমার নিতুই নতুন ভাবনা সাগরে যে সপনের পদ্মফুল ফোটে তা দেখ্‌লে তোমার বুক ফেটে যাবে। এক একটা কাজলা রাতে এমন এক একটা পুরানো কথার রাগীনি কী ঝড়ের বেগে চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে আমার হৃদয়-মোন্দিরে একটা দম্‌কা বিদ্দুতের স্থষ্টি করে, তা যদি তুমি দেখতে পাও, তাই থেকে অনাআসে একখানি উপন্নাস লিখতে পারো। পূজোর সময় তুমি এখানে আসবে, তাই আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, ভোরের পর ভোর, দুপুরের পর দুপুর, সোন্দের পর সোন্দে, আজকের পর কাল, কালকের পর পরশু, পরশুর পর তরশু গুণ্‌ছি। তোমার মা ভালো আছে, সদুর মা গিয়ে খবোর এনেচে; ক'টা চাল্‌তা আর এক ঝুড়ি তাল এনেছিলো—আহা, আর কোথায় কি পাবে। তুমি মাকে পুজোর কাপড় দিও, মাথা খাও, মাথা খাও—আর পিস্‌ শাউড়িকেও দিয়ো, খুরশসুর, তোমার হলাকাকা—তাকেও দিলে ভালো হয়; আর তোমার বোনের খুকীকে একটা রাঙা যামা আর ছোটো যুতো না দিলে ভালো দেখায় না; মার কাপড় একটু বেসি দামের কিনো, জেন এক টাকা চার আনার কম হয় না। আর যাকে জেমন পার্ব্বে তেমোন দেবে, তাতে ৬।৭ টাকা পড়ে যাবে তা কি কোরবে। মা পরোম গুরু, ঠাকুর মশাইর চেয়ে বড়ো,—স্ত্রীরীর চেয়েও বড়। মাকে লিখো যে আমাদের বাড়ী পুজোয় বরাবর ঘটা হয়, সব কুটুম আস্‌বে—তুমিও আস্‌বে। তাই বাড়ী জেতে পার্ব্বে না, ঐ চিঠীর গায়েই বিজয়ার নেমোস্‌কার লিখে দিও, বাবা তোমার জোন্নে খুব ভাল কাপড় চাদর কিনবেন, ছোটকাকা

বর্দ্দোমান থেকে দু' পাটি জুতো এনে দেবে। আমার জোন্যে জেন কিছু কিনোনা, কিনলে ভারি রাগ কোর্ব্বো—এঁ্যা! ঐ তো মাইনে পাও, খেতে কষ্টো—তার ওপরে কোত্থেকে খরচ করবে! একটা বেলাইস্ না কি বলে দেখবার ইচ্ছে ছিলো, তা যখন তুমি হেডপণ্ডিত হবে তখন না হয় কিনে দিও। বাবা আমায় ৫।৬ খানা কাপড় দেবে, তবে বোমবাঈ সাড়িটাড়ি বাবা বোঝে না। আর এ পাড়াগেয়ে দেখবেই বা কে? তোমার শহোরে জানাশুনো আছে, তুমিই দেখেচো। এক সের নারকোল তেল শস্তায় পাও তো এনো। আমি এখানে মাতাঘসা ভিজিয়ে গন্দ ক'রে নেবো। সিসির গন্দ তেল শুনেছি অনেক দাম, তুমি এনোনা! গংগাজল বলছে তুমি বাড়ি এলে সে তার সিসি থেকে আমাকে একটু অতিকলোম আর লেগেণ্ডার দেবে; ভাল কথা আমি একদিন গংগাজলের কৌটো থেকে একটু পাউটার মেখেছিনু, সবাঈ বলেছিলো বেশ দেখাচ্চে। না, না ছি তুমি কিনো না, আমি মাখ্বো না। আল্তাগোলা না কি আজকাল সিসি ক'রে বিক্কিরী হয়— ওমা সে কি! বুরুষ মাথায় দিলে চুল নাকি নরোম হয়, তা বাবু আমি অত ফেসান ভালো বাসিনী। কিছু কিনোনা, কিছু এনোনা, খালি সুদ্ধু তুমি এসো। তবে পারো যদি এক ঠোঁট্ আদরের চুম্ এনো।

তোমার প্রিয়োতমা

রত্ন।

পুং। "বোলতে ভুলে গেচি—গংগাজলের বাড়ী একজন এক যোড়া কাসির পাঁজোর বাঁধা রেখেছিলো, ওৎরাতে পারে নি, সেটা আমি তোমায় না বোলেই কিনেচি, কুড়ি টাকার ওপর পেরায় বানি বেঁচে গেলো। রূপোর দরে চলিশ টাকা লেগেছে। তা বাবা আমায় মাসে মাসে যে একটাকা জলপানি দেয়, তাই জোমিয়ে জোমিয়ে আট টাকা কোরেচি আরো জমিয়ে ২ শোদ কোরবো, তুমি তার জোন্নে ভেবোনা, ভেবোনা, মাথা খাও।"

একদিকে বেঞ্চিতে ব'সে ছাত্রবৃন্দ 'মাতৃভক্তি' প্রকাশের জন্য যুক্তাক্ষর নির্বাচনে নিযুক্ত, অন্যদিকে পত্নী রত্নময়ীর যত্নগ্রথিত প্রেমপত্রের প্রতিছত্রের শিহরণসঞ্চারে কেদারাধিকারী শিক্ষক মহাশয়ের গাত্র রোমাঞ্চিত। যে বর্ণাশুদ্ধি বা ব্যাকরণ-বুদ্ধি শিষ্যেরা প্রকাশ করলে পণ্ডিত মহাশয় চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করতেন সেই সাহিত্য-হত্যা-কাণ্ড প্রেয়সীর লেখনী-অগ্রে সম্পাদিত

হ’য়ে প্রাণেশ্বরকে মুগ্ধ ক’রে দিলে। ভদ্রনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক’রলে, সে আর কখনও “কি” লিখতে ক’য়ে হ্রস্ব “ই” দেবে না, কারণ যখন প্রিয়তমার হাত দিয়ে দীর্ঘ “ঈ” বেরিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই এ দৈব্য-প্রেরণা। ভদ্রনাথ চক্ষু বুজে ভাবতে লাগল ;—“আহা! সরলা বালিকে! বোধ হয় প্রিয়তমা এখন আলুলায়িতকেশে পুকুর ঘাটের পৈটেয় ব’সে—।”

এখনও অনেকের একটা কুসংস্কার আছে যে আজকালকার ধরণের লেখাপড়া শিখলে লোকের জাত যায়। এটা একেবারে ডাহা মিথ্যে কল্পনা, কেন না জাত কখন যায় না—যেতে পারে না ; যে ছেলেবেলা নবাবকে “লবাব”, নবান্নকে “লবান্ন” ব’লে এসেছে সে সংস্কৃতে এম্, এ পাশ করলেও, “লবাব” আর “লবান্ন” বলবেই। ভদ্রনাথ নর্মাল ইস্কুলের দ্বিতীয়-বার্ষিক-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষক। সীতার বনবাস, মেঘনাদ বধ, ভূদেববাবুর সামাজিক প্রবন্ধ এ সব ত পড়েই চে তার উপর বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, নবীন সেন, হেমবাবু প্রভৃতি-ও বাদ যায় নি ; তবু,—বর্ধমেনে ন্যাসন্যালেটি কিছুতেই ছাড়তে পারে নি ; সে “বালিকে”-ও বল্‌বে, “পুকুর”-ও বল্‌বে।

“যাক্, এখন উপায় কি ? এই যে রত্নময়ীর স্বার্থত্যাগ,—শাশুড়ী, পিস্-শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী, খুড়শ্বশুর প্রভৃতির জন্য কাপড় আনতে এত অনুরোধ, অথচ মাথার দিব্বি দিয়ে নিজের জন্যে কিছু আনতে মানা,—নারী-হৃদয়ের এই মহত্ত্ব এ কেউ দেখলে না, শুনলে না। লোকে রাণী ভবানী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, অহল্যাবাঈ—এদের-ই নাম করে ; এই যে

“লোক লোচনের দূরে ঘন-বন-মাঝে,
সুন্দর সুরভি ভরা কত ফুল রাজে,
বিজনে ফুটিয়ে উঠে গোপনে শুখায়,
সাজে না দেবতা পায় রমণী খোঁপায়॥”

এর সংবাদ কি কেউ নিয়ে থাকে ? কিন্তু—কিন্তু—আমি কি তা’ ব’লে তার এই অনুরোধ রক্ষা করবো ? মানব-ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য রমণীর এই আত্মত্যাগে সহায়তা করবো ? মা! মা! আমার চিরারাধ্যা—কিন্তু তুমি-ও হয়ত মনে মনে করচো, ভদ্র আমার জন্যে পূজোর সময় একখানা কাপড় আনবেই আনবে, আর এই কিশোরী স্বল্পদিনের পরিচিতা লাবণ্যময়ী তরুণী করুণায় বরুণার স্রোত প্রবাহিত ক’রে মানা করচে—‘কিছু এনোনা ; নাথ,

কিছু এনোনা।' এইখানেই ভক্তি আর প্রেমের তফাৎ। ভক্তি পূজা চায়—প্রেম আপনাকে বিলিয়ে দেয়। এই দেখ আমার ভাব আসচে—আসচে, এই রকম খানিক চালালেই একখানা উপন্যাস লিখে ফেলতে পারি। প্রেম—প্রেম—তুমি কাব্যবিদ্যালয়ের হেড্‌পণ্ডিত।"

"ব্লাউজ, বোম্বাইশাড়ি, বিলেতি এসেন্স, সুগন্ধি নারিকেল তেল, পাউডার, তরল আল্‌তা এ সব আমায় কিনে নিয়ে যেতে-ই হবে। প্রেয়সী লিখেছেন আমায় 'তুমি কোথায় পাবে, তোমার কষ্ট হবে'—এটা কবিতা। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মন-ত সে দিকে ধাবিতা নয়। তিনি যে একেবারে পুরো-পূরি বাস্তব। ঢেঁকি-পদাঘাত-পটিয়সী-প্রেয়সী-প্রসবিনী ত' নিশ্চয় ভেবে বসবেন যে 'জামাইটে হা-ঘরে, পূজোর সময় মেয়েটাকে একখানা দশী দিতে পাবলে না।' এই স্বাধীনতার দিনে আত্মমর্যাদার উপর এ রকম অসম্মান আমি কখনই সহ্য করতে পারব না। কিন্তু হা রে প্রণয়, তোর জন্য খোরাক-পোষাক ক্রয় করতে হয় কেন? আর ক্রয় করতেই যখন হয়, তখন তার ব্যয় সংকুলান অদৃষ্ট কেন করে না? প্রিয়া আবার পাঁজর কিনেছেন, নিজেই তার ঋণ পরিশোধ করবেন বলেছেন, আর আমি 'কী' এমন-ই হীন যে সেই পাঁজবের ঝুমুর ঝুমুব সংগীত নিঝুম হয়ে শুয়ে শুয়ে শুন্‌বো? টাকা গুণে দেবার ঠন্‌ ঠন্‌ ধ্বনিতে একটা একতানের সৃষ্টি করবো না?"

"আহা-হা—পদ্যের স্রোতস্বিনীর মধ্যে টাকার চিন্তা গদ্যের একটা বালির চড়া! সেপ্টেম্বরের মাইনে ২৪ চব্বিশ—অক্টোবরেরটা দিলেও দিতে পারে, না হয় সেক্রেটারি মশায়কে ধ'রে ক'রে নেব,—হ'ল আটচল্লিশ। গেল মাসে মা'র খরচ পাঠাতে পারি নি সে দশটাকা এখনও মজুত আছে; এই ত আটান্ন;—উমো গয়লানী মানুষ ভালো, লোক মন্দ নয়, মা'র অনন্তব্রত উদ্‌যাপন বল্‌লে গোটা কুড়িক টাকা সে ধার দিতে পারে—হ'ল আটাত্তর। উলুবেড়ের পার্বণ—সরকার তেল এসেন্স আলতা-ফালতা এই রকম দু-পাঁচটা জিনিস নিশ্চয়ই আমাকে ধারে দেবে। ভগবতী দাদা এখন কল্‌কেতায় ক্যাম্বেলে পড়ছে; সিল্কের শাড়ি জামা-কামাগুলোর জন্য এখন তাকে-ই চিঠি লিখি। আহা! এস মা, এস মা আনন্দময়ী! এই মাটির মেদিনী-মধ্যে আনন্দধাম সেই শ্বশুর-ভবনে গিয়ে আমার আনন্দময়ী প্রেয়সীকে যেন লেগেগুার গন্ধে—" ঢং ঢং ঢং সাড়ে এগারোটার ঘণ্টা পড়লো, ছাত্রেরা রচনার

খাতা বন্ধ ক'রে অঙ্ক পুস্তক খুল্‌লে, পণ্ডিত ভদ্রনাথ-ও বিজ্ঞান পড়াবার জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে চলে গেল।

হেড্‌পণ্ডিত মশায় ছিলেন অমায়িক লোক, আর সেক্রেটারি বাবু-ও ভাব্‌লেন, "ছুটির আগে এ-কটা দিন ছেলেগুলো ত ভালো ক'রে পড়বেই না, তবে ব'সে ব'সে পাঁজার পো মিছি মিছি ক'বেলা ভাত মারে কেন?" এই দুই শুভগ্রহের সংযোগে "চিঠি পেয়েছি, মা জ্বরে পড়েছেন, দেখ্‌বার কেউ লোক নেই"—এই অছিলায় দ্বিতীয়ার দিন থেকেই ভদ্রনাথের ছুটি মঞ্জুর হ'ল। মাতৃভক্তি রচনা লিখতে দেবার পর থেকেই ভদ্রনাথ কলকাতায় গিয়ে শীঘ্র শীঘ্র বাজার-টাজার ক'রে শ্বশুর বাড়ি যাবে তারই ঠিক করছিল। কাজেই মাতৃভক্তি প্রদর্শনের সুযোগটা সহজেই তার মনে জেগে উঠ্‌ল, তা'তেই মা'র অসুখের সৃষ্টি—আর তাঁর সেবার নামে শ্বশুর বাড়ির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি।

আজ পঞ্চমী—বেলা চলে পড়েছে, নাচ-দোরের দু-ধারে তুলসীমঞ্চের পাশে কৃষ্ণকলির গাছে ফুল ফুটে উঠেছে, এমন সময় কাপড়-চোপড় শিশি-বোতল প্রভৃতি সরঞ্জাম সহ ভদ্রনাথ বাঁশখালি গ্রামে পৌঁছিল।

বাড়িতে ঢুকেই দেখে লোকের ভিড়, মহা-গোলমাল। মণ্ডপে সুসজ্জিতা প্রতিমা, প্রতিমার দুই দিকে দুটি বড়ো বড়ো পিতলের দীপ-গাছা; উঠানে সামিয়ানার নীচে বেল লণ্ঠন খাটানো; চারদিকে চালের ছাঁচে আম পাতার সার গাঁথা; বড়ো বড়ো থালা, বারকোষ, লটকান, ছেপয়া, ঘটি, ঘড়া প্রভৃতি দলুজে স্তূপাকারে সাজানো। "নিয়ায় রে", "কোথা গেলি রে", "ময়দার ছালাগুলো কি তোলা কর্‌লি", "ঘি-টা ওজন হ'ল?" "ঘোষের ঘরে জানান্ দিতে কা'রে পেঠিয়ে দিলি?" "ভস্‌চায্যি ঠাকুর বুঝি এই ওকৃতে সরে পড়া ক'রলে"—ইত্যাদি হাঁক্‌ডাক্ কলরবে মুখরিত নয়—একেবারে চীৎকৃত। তার ওপর আবার ছেলেমেয়েদের কল্‌কলানি;—"দেখেছিস্ আমার কাপড়ে কেমন নীল কোর", "আমার কেমন নতুন ঘুন্‌সি হ'য়েছে, তোর ত নেই", "দেখিস্ দেখিস্ আমার রঙিন চুড়ি ভেঙে যাবে", "হ্যাঁ, জুতো হবে না বুঝি, মামা কাল বদ্ধমান থে' আনা করবে", "ক্যাঙ্‌লা, তুই যে বড়ো আমায় মারলি, আমি তোর দাদা হুই না রে শালা",—আর-ও এই নমুনার কত কি? জামাইবাবু কাপড় টাপড়গুলো

একটা দাওয়ার উপর রেখে, শ্বশুরদের গড় হয়ে প্রণাম করলে; "ভাল আছ্লে ত বাবা", "রেলে কেলেশ পাও নি", "বাবুর মতো থাকা অভ্যেস, হেঁটে মাঠ পার হ'য়ে বড্ডই হয়রান হয়েছ, ব'স, হাত মুখ ধোয়া কর—" ইত্যাদি সম্ভাষণে ভদ্র জামাইকে পরিতৃপ্ত করা হ'ল। ছেলেপুলেগুলো জামাই দেখে যেন আরও কলরব বাড়িয়ে তুল্লে; কর্মগত অভ্যাসে ভুলে একবার ডান হাতের আঙুল খাড়া ক'রে ভদ্রনাথ বলে ফেল্লে, "স্থীর"। জামাই তামাসা করছে মনে ক'রে, ছেলেগুলো বলে উঠ্ল, "জামাই ক্ষীর খাবেক্ গো ক্ষীর খাবেক্।"

জামাইবাবু কিন্তু সারা পথটাই ক্ষীর খেতে খেতে এসেছেন, এখন-ও খাচ্ছেন। তাঁ'র হৃদয়কটাহে মুগ্ধকরী আশার দুগ্ধধারা আবেগের উত্তাপে ঘনীভূত হ'য়ে, মিলনের শর্করা-সংযোগে যে দেবদুর্লভ প্রেমের ক্ষীরে পরিণত হয়েছে—তাঁর বিরহী মন তৃষিত মুখ জুব্ড়ে শুধু যে সেই ক্ষীর পান করছে তা নয়, একেবারে লেলিহান জিহ্বা বিস্তারিত ক'রে স্বকনী পরিলেলিয়েৎ। (এই চমৎকার অলংকারটি যেন কোনো পাঠক মনে না করেন লেখকের স্বকৃত রচনা।) উদ্ধৃত ক'রে স্বীকার করলে, শিষ্টাচার-ও হয় কপিরাইট্ আইন-ও রক্ষা পায়। নর্মাল দ্বিতীয় বার্ষিকী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হ'লে এমন নৈষধ-সূদন অলংকার কার-ও কল্পনা-রাজ্যে প্রস্ফুটিত হয় না।

সন্ধ্যার জলখাবারটা যখন বাইরে এসেছিল, তখন মনে ততটা খোঁচ লাগে নি; কিন্তু রাত্রে ভাত খাবার ডাক পড়লে তার পাত-ও পাঁচজনের সঙ্গে পশ্চিমের দলুজে হয়েছে দেখে, ভদ্রনাথের প্রাণটা ছাঁৎ ক'রে উঠ্ল। এক পিস্শ্বশুর মশায় দাঁড়িয়েছিলেন, বল্লেন, "বাবাজী, অন্দরে পা বাড়াবার ঠাঁই নেই, কুটুমের মেয়েতে একেবারে বাড়ি ভ'রে গেছে, কে যে কোথায় শোয়, কে যে কোথায় খায়, তার ঠিকানা করতে মুশকিলে পড়ে গেছি, ব'সে যাও বাবা খাওয়া যাক্; আবার ভাতটা জুড়িয়ে যাবেক্, দশ দশটা আকায় হাঁড়ি চড়েছে; এ সকাল সন্ধ্যে আর বিরেম নেই।"

প্রেমে বা বিরহে ক্ষুধামান্দ্য ও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এটা একটা চলিত কুসংস্কার; বরং বর্ধমানের রান্না কলায়ের ডাল আর রুই মাছের মুড়োযোগে তেঁতুলের টক-গোছ সুখাদ্য অনুপান সহযোগে উদরে অন্ন একটু চাপাচাপি ব'সে গেলে শকুন্তলা-বিরহ-বিধুর দুষ্মন্তের-ও গাঢ় নিদ্রা আসে তা' মাহিন্দ্র-

নন্দিনী-হৃদয়ানন্দ পাঁজা-বাবাজীর কত ত দূরে থাক্। বত্রিশটি নাসিকার ঘর্ঘর ভৈরব রবে জামাইবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে যাবার দরকার হওয়ায়, উঠানে এসে দেখে যে আকাশে তারা দলের ভেতর অনেকের-ই পাহারা বদল হয়েছে, সাতভাই চম্পা প্রায় মাথার কাছাকাছি এসে পড়েছে; মিঠাইকরেরা রসের গাম্লায় গজাগুলো ঢেলে দিয়ে আর কাল ষষ্ঠীর উপলক্ষে যে শতাধিক ব্রাহ্মণ খাবে তাদের মতন লুচি ভেজে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে; নাসিকাধ্বনি শুনে শঙ্কিত ঝিল্লিরা-ও নীরব। কেবল উচ্ছিষ্টভোজীদের কলহ-কলরব সতত জাগ্রত; এক্ষণে এই আড়াই প্রহর রাত্রে সেই কলরব কুক্কুর-কণ্ঠোচ্চারিত শানিত স্বরে নিশীথিনীকে যাতনা দিচ্ছে। আমপাড়া কল্‌কেয় দা-কাটা তামাক টিপে দিয়ে উনুন থেকে আগুন এনে ভদ্রনাথ একবার বেশ ক'রে তামাকটা খেয়ে নিলে, তারপর আবার শয়ন, এবার কিন্তু নয়ন মুদলে-ও অঙ্গ অসাড় হয় না। নাসিকার ঘর্ঘর, মশকের স-ভন্‌ভন্ দংশন, আর বিরহের হুতাশন—ত্র্যহস্পর্শের নিষেধ নিয়ে ভদ্রনাথের নিদ্রাযাত্রার পথে দাঁড়ালো। চৌকিদারদের মতোন রবি ঠাকুর-ও প্রাতে মাত্র প্রেয়সীর সঙ্গে একটু প্রেমালাপের অবসর পান, দুপুর বেলা বেচারীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারেন, আবার বৈকালে যেন একটু লজ্জায় লাল হ'য়ে লুকিয়ে পশ্চিমে হাওয়া খেতে চলে যান। এ ক্ষেত্রে বিরহ-বিধুর সূর্যদেব ভোর না হতে-ই পূর্বদিকে আমবাগানের আড়ালে, আর ডিটো ডিটো ভদ্রনাথ উত্তর দিকের বড়ো পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে, একজন রাঙা মুখ আর একজন রাঙা চোখ খুলে প্রকাশ হ'লেন।

খুড়শ্বশুর মুকুন্দ মণ্ডল পৈটেয় ব'সে দাঁতন করছিল। জামাইকে দেখে বল্‌লে, "ইরির মধ্যেই গা তুলে উঠে পড়্‌ছ? নিদ্রে কি ভালোরূপ হয় নি?" ভদ্রনাথ বল্‌লে, "আজ্ঞে, হইছিল—তবে—মশা—একটু—এই যা"—

মুকুন্দ। "আরে করি কি কও ত, এ বাগে কাটোয়া মুকসুদাবাদ আর উ-দিক ধর ত' শান্তিপুব লগদ্বীপ নাগাদ যে পর্যন্ত কুটুম আনা করানো গেছে; মোশারি-ও ত' মজুত ছিল না কম্‌তি—তা বাড়ির ভিতর ওনারা-ই সবগুলো দখল ক'রে নিলেক্,—কওয়া ত' যায় না কিছু, তা বাবা, জামাই-ও যে, ঘরের বেটা-ও সে। এ-কটা দিন বাইরে একটু কষ্ট সইতে হবেক্।" ভদ্রনাথের বুকে যেন একটা ঢেঁকি ধপাৎ ক'রে পড়লো, মনে মনে বল্‌লে, "কটা দিন!"

মুকুন্দ ব'লে যেতে লাগ্‌লো, "তা', কি জানো জামাই, আনন্দময়ী মা ভিটেয় পায়ের ধূলো দিচ্ছে, পাঁচকুটুমের মুখ দেখে এ সময়টা আনন্দ করা-ই চাই ; তুমি ত' পাশ করা পণ্ডিত তোমায় আর বোঝাব কি।"

মুখটুকু ধুয়ে স্নানটান করার পর, ভদ্রনাথ একটা চাল চেলে দেখ্‌লে ; "স্বপ্নবিলাস শাড়ি", "বুক জুড়ানো বডিস্", "যৌবন-জমক্ জ্যাকেট্", "হায়াহারা শায়া", "বিধুমুখী সিঁদুর", "পতিপাগল তৈল", "চিকুর-চিকণ-চিরুণী", "উষার-তুষার-পাউডার", "হৃদয়রক্ত অলক্ত", "কুন্দনন্দিনী মঞ্জন", চুম্‌কি বসানো একখানা খোঁপার জাল, একখানা স্নানরতা সতীর চিত্র, দুইখানি নূতন চকচকে বাঁধানো উপন্যাস,—একখানির নাম "বারাঙ্গনা না বরাঙ্গনা", আর একখানি "পতিতার অপূর্ব সতীত্ব", একশিশি ম্যালেরিয়া-মিক্‌শ্চার আর শাউড়ীর জন্য আনা একখানি কস্তাপেড়ে শাড়ি, সব গুছিয়ে টুছিয়ে বেঁধে বড়ো শালার ছেলে হাতোল্‌কে ডেকে তার হাতে দিয়ে ব'লে দিলে যে "এই গুনি নিয়ে আস্তে আস্তে তোমার পিসীকে দাও গে ; বুঝেছ ত' তোমার পিসী—পিসীমা।" হাতোল বল্‌লে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝছি গো, তুমি তো আমার পিসা, তবেই হোল পিসি। তোমার বউ, তা সব বুঝি পিসীর জন্যেই আনা করলে, আমার জন্যে কি নিয়ে আসছ ?" ভদ্রনাথ বল্‌লে, "এগুনি বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে আস দিকি তারপর তোমায় এক জিনিস দেবো'খন্, একখানা ফুটবলের ক্যাটালাক্—অনেক ছবি আছে।" ঘুড়িকাটা লক্ পাবে মনে ভেবে বোঁচকাটি বুকে ক'রে হাতোল্ বাড়ির মধ্যের দিকে দৌড় দিলে।

সমস্ত দিনের ভেতর হাতোলের আর টিকিটির দেখা নেই, সে রত্নীপিসীর ঘরে বোঁচকাটা পৌঁছে দিতে না দিতেই ঠাকুরমার হুকুমে বদ্দিদের বাড়ি 'ছিরি' (শ্রী) আন্‌তে কখন লোক যা'বে তাই জিগ্‌গুস্‌তে গেল, সেখানে গিয়ে মনে প'ড়লো—তার স্যাঙাৎ দুলেদের ষাঁড়াকে সন্ধ্যেপূজোর পর পোড়াবার জন্যে যে তুবড়ী তৈরি করতে দিয়েছে, তার কতদূর হ'ল একবার তাগিদ্ দিতে হবে। সেখান থেকে ফিরে তেল মেখে পুকুরে স্নান—একপাল ছেলের সঙ্গে সাঁতার খেলা—তার পর অন্ন-মেরু ভক্ষণ, সুতরাং পিসা-মোসার দৌত্য-কার্যের কথা তার মন থেকে একেবারে ধুয়ে পুঁছে লোপ পেয়েছিল ; বিকেলবেলায় করবীতলায় দেখা হ'তে পিসা শুধুলে, "কিরে, সে সব জিনিস পত্তর নিয়ে

গেলি, তারা কি বল্‌লে আমায় বল্‌লি নি?" হাতোল বল্‌লে, "তারা বুঝি—? আমি তেমন কৈবতের ব্যেটা লই।" ভদ্রনাথ বল্‌লে, "ছিঃ ও কথা বল্‌তে আছে? আমরা মাহিষ্য।"

হাতোল্। "মাহিষ্যি-ই হই, আর হবিষ্যি-ই হই, আমি রা' কাড়্‌তি না কাড়্‌তি আঁতের কথা বুজেকলি, আমার পিসী তোমার তো পিসী না, বউ; তুমি তা'কে যা' দিলেক তা কি হাটের মধ্যে গোল করি? আমি চুপিসাড়ে রত্নী পিসীর ঘর্‌কে ঢুকে চৌকির উপর থুয়ে আস্‌ছি।"

ভদ্র। "তা-তা—সে কি বল্‌লে?"

এইবার হাতোল্ মুশ্‌কিলে প'ড়ল, পিসী-ও কিছু বলে নি, সে-ও কিছু শোনে নি, অথচ কথাটার উত্তর দিতে না পারলে, সহুরে পিসে তাকে যে পাড়াগেঁয়ে বোকা ঠাওরাবে এটা-ও তার সহ্য হবে না, কি উত্তর দিবে ভাব্‌তে ভাব্‌তে তা'র মনে পড়্‌ল হাজার ভালো হ'লেও মেয়েরা একটা না একটা খুঁত ধরবেই ধরবে, তাই বলে উঠ্‌ল, "পুট্‌লিটা খুব ভালো কইল বটেক, তবে মু'খানা একটু বাঁকা ক'রে কইলেক্ যে একটা ছাতা বুঝি আর আন্‌তে পারেক নি।" প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে-ই ব্যতিব্যস্ত হাতোল্ Right about—ভোঁ দৌড়। ছাতার ভেতর কি প্রেমের আশ্লেষ লুকানো আছে, তার সমস্যার নিষ্ফল ভাবনায় মাথা ঘামাতে ভদ্রনাথের আধঘণ্টার উপর কেটে গেল।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় আনন্দ যখন প্রদীপ শিখায়, ধূপের গন্ধে, ঢোলের ছন্দে, বাঁশীর রন্ধ্রে, আলাপের প্রবন্ধে অভিব্যক্ত; যখন সারা ভূমণ্ডলের হাসি মণ্ডলদেব চণ্ডীমণ্ডপস্থ প্রতিমার অধর হ'তে বলির অপেক্ষায় জীবিত ছাগশিশুর চক্ষে-ও প্রস্ফুটিত, তখন একমাত্র ভদ্রনাথ-ই নিরানন্দ। কেবল নিরানন্দ নয়, শাস্তির উপর কঠিন শাস্তি প্রাণের সমস্ত ছন্দ কণ্ঠনালীপথে বন্ধ ক'রে ঠোঁটে একটা বিকারগ্রস্ত হাস্যরেখার আঁচড় কাটতে হচ্ছে। জল সইতে যাবার বাজ্‌না বেজে উঠ্‌ল। অবগুণ্ঠনবতী অন্তঃপুরিকারা মঙ্গলকলস-কক্ষে বাটীর অনতি-দূরস্থ ষষ্ঠীতলায় পুষ্করিণী-অভিমুখে ধীরপদে শুভযাত্রা করলেন; তখন ভদ্রনাথ নিজ আর্দ্র চক্ষে প্রেমের বীক্ষণ-শক্তি প্রয়োগ ক'রেও স্থির করতে পারলেন না যে সেই চত্বারিংশ সুধাংশু মালার মধ্যে নববস্ত্র-মণ্ডিত কোন্ কবরী কুণ্ডলীটি তাঁর হৃদ্-পিণ্ড-স্পন্দন-সক্ষম-সূত্র-গুচ্ছে রচিত।

ছাত্রদের সেই "মাতৃভক্তি"-রচনা লিখ্‌তে দেবার পর থেকে ভদ্রনাথ আর নিজের মার নাম মুখে আনে নি, গর্ভধারিণী মার-ও নয়, জগৎপ্রসবিনী মার-ও নয়। জামা কেন্‌বার সময়, "রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে" গেছে যদি মা কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে থাকে, তবে সেটা জ্ঞানকৃত অপরাধ নয়। শ্বশুর বাড়ি এসে বার-বাড়িতে রাত কাটানোর ব্যবস্থা হওয়ার সুরু থেকে-ই চণ্ডীমণ্ডপস্থ মৃন্ময়ী মার নিষ্ঠুর আচরণ দেখে হিন্দুধর্মের উপর ভদ্রনাথের আস্থা একেবারে মন্দীভূত হয়ে গেল। অ্যাঁ, এই মা! এর নাম দয়াময়ী! সঞ্চিত যা' কিছু ছিল সব গেল, পর মাসের বেতন-ও বস্ত্র-নিকেতনে গমন করেছে, উমো-ধুম্‌সীর কাছে ধার—এত আশা, এত স্বপ্ন, এত কল্পনা সব ব্যর্থ হ'ল! কুটুম্ব! কুটুম্ব! জামাতার চেয়ে আবার বড়ো কুটুম্ব কে আছে! সেই জামাই বাইরে প'ড়ে 'হা হুতাশ' করছে, আর মাসীর ননদের সতীনের বকুলফুলের নাতবোয়েরা এসে ঘর জোড়া ক'রে আছেন। ধিক্‌ এই বাঙালীর সামাজিক আচারে! একটু যদি ভালো ক'রে ইংরাজি পড়তাম, তা হ'লে কালই সাহেব হ'য়ে যেতাম। কি সুন্দর সুখের সংসার সাহেবদের, বলিহারী যাই, বলিহারী যাই; শুধু ওয়াক্‌ আর আই-থাই-ইটসেল্‌ফ-আই! আর কোন-ও বালাই নেই। একবার দেখতে বা একটা কথা কইতে পেলুম না। চিরুণী কিনে এনেছিলাম রেতে আমার সামনে বসে চুল বাঁধ্‌বে দেখব, আপনার হাতে ক'রে মুখে পাউটার মাখিয়ে দোব, কলকাতায় যেতে হয়েছিল থিয়েটার পর্যন্ত দেখে এসেছি, তার গল্প করতাম, এ সব আশায় ছাই পড়ল।

মার জন্যে একগাছা সুতো পর্যন্ত কিনে পাঠাই নি, বিটি শাপ দিলে না কি! না, তা' বিটি গালমন্দ কখন-ই দেয় নি। আর সেই ত' বিয়ে দিয়েছে, মা কালীঘাটের কালী, এই দুগ্যোপুজোটা যদি উঠিয়ে দাও মা, তা হ'লে আমি তোমায় পাঁচসিকে পূজো পাঠিয়ে দিই! ওঃ, বিটি আমার আনন্দময়ী! আনন্দময়ী! সারা রাত বাইশ বেটার নাকের ডাকে আর মশার কামড়ে আনন্দ আর ত' ধর্‌ছে না। সেই পঞ্চমী থেকে সুরু আর এই নউমীর রাত পোয়ায় পোয়ায়, প্রাণের ভেতর আনন্দনাড় পাকিয়ে তুলছে!

তারা এই কি তোমার বিচার বটে।
(দুর্গা এই কি তোমার বিচার বটে)
এতে-ই তো মা ভক্তি টক্তি যায় গো চটে ॥
কিনে এসেন্স বডি জ্যাকেট শাড়ী,
এলেম কত আশায় শ্বশুর বাড়ি,
এখন বাইরে প'ড়ে ছাডছে নাড়ী যেন ঘাটের মড়া নদীর তটে ;—
কি গুণে আনন্দময়ী নাম্‌টি তোমার ধরায় রটে ॥

কৌতুক যৌতুক •

পাঁচ ছেলের গল্প

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আমি আজ একটি গল্প বলিব। সেই—সেই পুরান গল্প। ঠান্‌দিদিদের কাছে শোনা গল্প ; তাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের ঠানদিদিদের কাছে। তাঁরা তাঁদের ঠানদিদিদের কাছে, তারা তাঁদের ;—এই রকম করে গল্প ঠানদিদিতে ঠানদিদিতে চলিয়া আসিতেছিল। এখন ইংরাজীর চোটে ঠানদিদিদের গল্প আর ভাল লাগে না, শোনাও যায় না। এই ঠানদিদিদের গল্প যখন বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে জাতক ! যখন মহাযানীরা বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে অবদান। যখন ব্যাসদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে সংবাদ। আবার বিষ্ণুশর্ম্মার মুখে হইয়াছে পঞ্চতন্ত্র। এখনকার পাড়াগাঁয়ের স্ত্রীলোকদের কাছে হইয়াছে ব্রতকথা। এ সব গল্পে প্রেমের ছড়াছড়ি নাই, প্রেমের বীজ গজায় না ও ক্রমে ফলফুল ঝাঁকড়িয়া পড়ে না। এ লেখায় কৌশল নাই, বাঁধুনী নাই, রকমারী নাই। নিভাননী, নগেন্দ্রবালা, বিদ্যুৎবরণী, তড়িৎসৌদামিনী, অমিয়ানিভা চপলাপ্রভা প্রভৃতি একেলে বাহারে নাম নাই। চন্দ্রিমার বর্ণনা নাই, বসন্তের হাহুতাশ নাই আছে শুদ্ধ একটি গল্প। সেকালে মিষ্ট লাগিত। লোক পড়িত, শুনিত। একালে যাঁদের ভাল না লাগে, পড়িবেন না, শুনিবেন না। গল্পটি এই—

এক আছেন রাজপুত্র, তাঁর আছেন চার বন্ধু—গুরুপুত্র, পাত্রের পুত্র, পুরুতপুত্র আর কোটালের পুত্র। তাঁদের বয়স এক, বাড়ী একখানে, এক পাঠশালায় পড়া, একত্রে খেলা করা, যেন পাঁচটিতে এক। রাজা ছেলে-গুলিকে ভালবাসেন, গুরুঠাকুর তাদের ভালবাসেন, পাত্র ভালবাসেন, পুরুত ভালবাসেন, কোটালও ভালবাসেন। সকলেই পাঁচটি ছেলেকে আপনার ছেলের মত দেখেন। চাকররা ভালবাসে, কাছারীর লোকজন ভালবাসে, প্রজারা ভালবাসে এবং যে-দেখে, সেই ভালবাসে। কিন্তু পাঁচজনের প্রকৃতি পাঁচ রকমের। তাঁরা পাঁচ রকম জিনিস ভালো করিয়া শিখিলেন, আপনার মনোমত জিনিস শিখিলেন। রাজপুত্র শিখিলেন পুণ্যকর্ম, দান, ধ্যান, অতিথি-সংকার, সরলতা, অমায়িকতা, সত্যকথা বলা ইত্যাদি। গুরুপুত্র শিখিলেন বিচার করা, সূক্ষ্ম হইতে আরও সূক্ষ্মে যাওয়া; শিখিলেন শাস্ত্র, শিখিলেন বুদ্ধি কেমন করিয়া মাজিয়া লইতে হয়; শিখিলেন শাস্ত্র কেমন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। পুরুতের পুত্র শিখিলেন শিল্প, ৬৪ কলা, নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি। পাত্রের পুত্র দেখিতে সুন্দর ছিলেন। তিনি শিখিলেন চেহারাটা কেমন করিয়া খোলে তাই করিতে, রূপের কেমন করিয়া বাহার দিতে হয়। কোটালের পুত্র শিখিলেন কুস্তী, কসরৎ, লাঠিখেলা ইত্যাদি এবং শিখিলেন কেমন করিয়া দেহে জোর করিতে হয়, আর কেমন করিয়া সে জোর কাজে লাগান যায়।

বৌদ্ধ বইএ বলে, ইহাদের বাড়ি কাশী। ইহাদের প্রকৃতি অনুসারে নাম হইয়াছে, পুণ্যবন্ত, প্রজ্ঞাবন্ত, রূপবন্ত, শিল্পবন্ত আর বীর্যবন্ত। রাজার প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড দেউড়ী, তারই ভিতরে অন্তঃপুর, হাতীশালা, ঘোড়াশালা, গোশালা, কাছারী, দেওয়ানখানা ইত্যাদি রাজার সমস্ত মহল। দেশের মধ্যে বড়ো রাস্তার উপর রাজার বাড়ি। এক দিকে রাজার বাড়ি—আর এক দিকে সব দেবমন্দির, মাঝখানে প্রকাণ্ড রাস্তা। রাস্তা প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথ একেবারে দুই তিনখানা টানা যায়। মন্দিরগুলিতে বিষ্ণু আছেন, শিব আছেন, কালী আছেন, কার্তিক আছেন, গণেশ আছেন, ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি আছেন। প্রত্যেক মন্দিরে ছোটো-বড়ো নাটমন্দির, সেইখানে দেশের লোক ব'সে গল্প করে। দেবতার সামনে বসিয়া মিছা কথা বলিতে পারে না। উহারই মধ্যে একটায় পাঠশালা। রাজপুত্র প্রভৃতিরা পড়েন, লেখেন, খেলা ও

গল্প করেন। গল্প করিতে করিতে এক দিন কথা উঠিল, পুণ্য বড়ো না প্রজ্ঞা বড়ো, না শিল্প বড়ো, না রূপ বড়ো, না বীর্য বড়ো। আপন আপন কোট কেহই ছাড়িলেন না। রাজপুত্র বলিলেন, পুণ্য বড়ো; গুরুপুত্র বলিল, প্রজ্ঞা বড়ো; পাত্রের পুত্র বলিল, রূপ বড়ো; পুরুতপুত্র বলিল, শিল্প বড়ো; কোটালের পুত্র বলিল, বীর্য বড়ো। বিচার ত হয় না, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, এখানে এর বিচার হবে না, এখানে সকলে আমাদের চেনে; পক্ষপাত করিবে। চল আর এক ভিন্ন রাজার দেশে যাই। ঘর থেকে কেউ কিছু লইয়া যাইতে পারিবে না। যে যা উপার্জন করিবে, ভাগ করিয়া খরচ চালাইব।

যাইতে যাইতে তাঁহারা কাম্পিল্য নগরে উপস্থিত হইলেন, তথায় একটি বাড়ি ভাড়া করিলেন, এবং পাঁচজনই আপনার গুণের পরিচয় দিয়া রোজগারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলের মনের ইচ্ছা, তাঁহার গুণের পুরস্কার দেখিয়া অন্য বন্ধুরা তাক হইয়া যাইবেন। দুপুরবেলা কোমরে গামছা জড়াইয়া পাঁচজন মহাপ্রভু স্নান করিতে গেলেন; গঙ্গায় পড়িয়া স্নান করিতেছেন। সাঁতার দিতেছেন, দেখা গেল, একখানা বাহাদুরী কাঠ ভাসিয়া আসিতেছে। বর্ষায় গঙ্গার বেগ খরতর, মাঝে মাঝে ঘূর্ণিও আছে, কেহই সে কাঠ ধরিতে যাইতে সাহস করিতেছে না। কোটালের পুত্র বলিল, "আমি যাইব", বলিয়া সাঁতার দিয়া কাঠের উপর উঠিল। তাহার পর যেমন দাঁড় বহে, হাতে-পায়ে সেইরূপ জল কাটাইয়া তাহাকে কৌশলে ডাঙার কাছে আনিল এবং গায়ে অসীম জোর ছিল, উহাকে পাড়ে তুলিয়া ফেলিল। পাঁচ বন্ধুতে তখন বাহাদুরী কাঠখানাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেশ সুগন্ধ বাহির হইতেছে। কিসের গন্ধ? কিসের গন্ধ? চন্দনের গন্ধ। তবে এটা চন্দনের কাঠ। প্রকাণ্ড চন্দনের কাঠ নদীর পাড়ে তোলা হইয়াছে শুনিয়া কাম্পিল্যের লোক ভাঙিয়া পড়িল। গন্ধবেণেরা এমন দাঁও ছাড়া যায় না বলিয়া বীর্যবন্তের কাছ থেকে অল্প দামে কাঠখানি কিনিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিয়া, ও "উহাকে ঠকান সহজ নয়" বুঝিয়া এক লক্ষ "পুরাণ" নামে টাকা দিয়া কিনিয়া লইল। সে-ও বাসায় আসিয়া আপনার বন্ধুবর্গকে ভাগ করিয়া দিল এবং একটি গাথা পড়িল—

"বীর্যের প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপর।
মানুষের বাহুবল সবার উপর ॥
বীর্যের প্রভাবে দেখ কোটালের সুত।
আনিল প্রচুর ধন সহস্র অযুত ॥"

সকলে বীর্যবন্তের প্রশংসা করিতে লাগিল।

তাহার পর শিল্পবন্তের পালা। তিনি বীণা লইয়া বন্ধুদের কাছ হইতে সরিয়া পড়িয়া একটি মন্দিরের নিকটে দাঁড়াইয়া বীণা বাজাইতে লাগিলেন। নগর ভাঙিয়া পড়িল। যত লোক কাম্পিল্য নগরে বীণা বাজাইতে পটু ছিল, সকলেই আসিয়া জুটিল। কত অমাত্য-পুত্র আসিলেন, কত শ্রেষ্ঠি-পুত্র আসিলেন। সকলেই শিল্পবন্তকে হারাইবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ওস্তাদ ছিলেন, সকলকে ছাড়াইয়া উঠিলেন। এমন সময় তাঁহার সাততারা বীণার একটা তার ছিঁড়িয়া গেল। ছয় তার হইতেই সাত তারার সমস্ত আওয়াজ ও সুর বাহির হইতে লাগিল। লোক চমৎকৃত হইয়া গেল। ক্রমে আরও এক তার ছিঁড়িল, তবুও সেই সুর, যেন তার ছিঁড়েই নাই। ক্রমে সব তার ছিঁড়িয়া যখন একটিমাত্র তারে ঠেকিল, তখনও সেই সাততারার সব সুর বাহির হইতে লাগিল। সকলে আশ্চর্য হইয়া উহাকে 'পুরাণ' নামে টাকা ও বস্ত্র, অলংকার পেলা দিতে লাগিল। সে সব পেলা কুড়াইয়া বাড়ি আসিল ও পাঁচজনে ভাগ করিয়া লইল। সকলে খুব খুসী হইল ও গাথা গাহিল—

"শিল্পের প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপর।
শিল্পকলা মানুষের সবার উপর ॥
শিল্পের প্রভাবে দেখ পুরুত-নন্দন।
আনিলেন কত ধন করি উপার্জন ॥"

সকলে শিল্পবন্তের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এবার রূপবন্তের পালা। তিনিও অন্যান্য বন্ধুদের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়া, অনুপম বেশ-বিন্যাস করিয়া, চকের রাস্তার মাঝখান দিয়া চলিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল, এমন রূপ ত কখন দেখি নাই। এ কোথা হইতে আসিল? এ কি "অমিয় ছানিয়া বিধি রূপ নিরমিল। তাহাতে গড়িল বরবপু?" স্ত্রীলোকেরা দেখিয়াই মনে মনে স্বামি-নিন্দা করিতে আরম্ভ

করিল। ভাবিল, আমার এইরূপ একটি স্বামী হইলে কত ভালো হইত। তা নয়, বাবা একটা পোড়া কাঠের সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছে!

যাহাই হউক, চকের বাজার দিয়া যাইতে যাইতে পাত্রের পুত্র নগরের প্রধান গণিকার চোখে পড়িয়া গেলেন। সে দোতলায় জানালায় বসিয়া ছিল, উঁহাকে দেখিয়াই চাকরাণীকে বলিল, "তুমি যাও, ঐ লোকটিকে আমার নাম করিয়া ডাকিয়া লইয়া আইস।" তিনি দাসীর সঙ্গে গণিকার সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। গণিকা অমনই স্বহস্তে তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিয়া মাথার চুল দিয়া পা মুছাইয়া দিল এবং বলিল, "আর্যপুত্র, আপনি দাসীর এই খাটের উপর বসুন। আমার যা' কিছু আছে, আপনি সকলেরই মালিক। আজ হইতে আমি আপনার দাসী। আপনি আমার সহিত ক্রীড়া করুন, কৌতুক করুন, আর যাই করুন, সব আপনার স্বেচ্ছাধীন। স্নানের ঘরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া গণিকা তাঁহাকে স্বহস্তে গন্ধ-তৈল মাখাইয়া দিল; নানারকম স্নান-চূর্ণ দিয়া জল সুবাসিত করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইল। তাহার সুগন্ধ অনুলেপন দিয়া তাঁহার গা লেপিয়া দিল; মিহি কাপড় ও চাদর পরাইয়া তাহার মধ্যে নানারূপ ধূপের ধোঁয়া লাগাইয়া দিল। তাহার পর সে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চারি প্রকারের উৎকৃষ্ট আহার প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল। তখন তিনি বলিলেন, "আমার ঘরে আমার চারিজন বন্ধু আছেন, তাঁহাদের এই সময়ে আনান আবশ্যক এবং তাঁহাদের টাকাকড়ি দেওয়া আবশ্যক।" তাহাদের ডাকা হইল। তাহারা আসিয়া সব দেখিল। তখন সে গাথা গাহিল—

"রূপের প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপর।
মানুষের রূপ হয় সবার উপর॥
দেখ রূপবন্ত গণিকার কোলে বসি।
আহরণ করিয়াছে কত ধনরাশি॥"

তোমরা এখন এই লক্ষ টাকা লও ও খরচ কর। তাহারা টাকা লইয়া বাসায় গেল।

এইবার প্রজ্ঞাবন্তের পালা। তিনি রাস্তায় যাইতে যাইতে শুনিলেন, এ দেশে এক মজার মামলা উপস্থিত হইয়াছে। রাজসভায় কেহই তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দিতে পারিতেছেন না। ব্যাপারটি এই,—এক জন শ্রেষ্ঠী

নগরের প্রধানা গণিকাকে এক রাত্রি তাঁহার সঙ্গে কাটাইবার জন্য আহ্বান করেন, এবং তাহাকে লক্ষ টাকা দিবেন স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যে দিন তাহাকে চান, সে দিন সে আসিয়া বলিয়া যায়, সে অন্যত্র ভাড়া লইয়াছে, সে-দিন আসিতে পারিবে না। তাহার পরদিন সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, কবে আসিতে হইবে? শ্রেষ্ঠী বলে, "তোমার আর আসিতে হইবে না, আমি কা'ল রাত্রে তোমায় স্বপ্নে দেখিয়াছি।" তখন সে বলিল "আচ্ছা, যদি আমারই সঙ্গে সারারাত কাটাইয়াছ, তবে আমার ভাড়া লক্ষ-টাকা দাও।" সে বলিল, "তা কেন দিব? তুমি ত অন্যত্র ছিলে, আমি তোমায় দক্ষিণা কেন দিব?" জবাব হইল, "তুমি ত আমাকেই পাইয়াছিলে, আমার প্রাপ্য আমায় দিবে না কেন?" তখন দু পক্ষই রাজার কাছে গিয়া নালিশবন্দী হইল। রাজা ও রাজার সভাসদ্‌গণ কেহই ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেছেন না এবং যে পারিবে, তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দুই পক্ষই রোজ দরবারে যাতায়াত কবিতেছে, কিন্তু কিছুই হইতেছে না।

শুনিয়া প্রজ্ঞাবন্ত রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, একজন তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণকে সভায় আসিতে দেখিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার সৎকার করিয়া বসিবার জন্য তাঁহাকে আসন দিলেন। তিনি বসিয়া আলাপচারি করিতেছেন, এমন সময় রাজা এই কঠিন মোকর্দমার কথা তাঁহাকে বলিলেন এবং তিনি যদি ইহার কিনারা করিয়া দিতে পারেন, পুরস্কার দিবেন, তাহাও বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "বাদী প্রতিবাদী উপস্থিত আছে?" রাজা বলিলেন "আছে।" তিনি তাহাদের সামনা-সামনি দাঁড করাইয়া তাহাদের ব্যবহার শুনিলেন। উভয় পক্ষই যখন স্বীকার করিতেছে, তখন সাক্ষী-সাবুদের দরকার নাই। তিনি গম্ভীরভাবে অনেকক্ষণ ভাবিয়া শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, "তুমি এক লক্ষ টাকা এইখানে রাখ।" আর মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ, একখানা বড়ো আরসী আনাইয়া এইখানে রাখিবার আজ্ঞা হউক।"

বলিবামাত্রই দুই জিনিস আসিয়া পৌছিল। তিনি গণিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, শ্রেষ্ঠী স্বপ্নে তোমার আবছায়া উপভোগ করিয়াছেন। তুমি যে তাহার ভাড়া বা দক্ষিণাস্বরূপ সত্যকার টাকা চাহিতেছ, তাহা হইতেই পারে না। তুমি এই আরসীর মধ্যে ঐ লক্ষ টাকার যে আবছায়া

আছে, তাই তোমার দক্ষিণা বলিয়া গ্রহণ কর।" এই নিষ্পত্তিতে রাজসভায় একটা মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল, "ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও এমন বিচার করিতে পারিতেন না।" কেহ বলিল, "বোধ হয়, রাজার বিপদে স্বয়ং বৃহস্পতি স্বর্গ ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছেন।" রাজা মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে যে পুরস্কার দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা ত দিলেনই, আর তাহার উপরও কিছু দিলেন; কারণ, তিনি বুঝিতে পারেন নাই, এত সহজে এমন মামলার বিচার হইবে। উদ্ধার পাইয়া শ্রেষ্ঠী বলিল, "আপনি আমার মান বাঁচাইয়াছেন, এ লক্ষ টাকা আপনারই, আমি আর উহা বাড়ি লইয়া যাইব না।"

সমস্ত ধন-রত্ন লইয়া প্রজ্ঞাবন্ত তাঁহার বন্ধুদিগকে বাঁটিয়া দিলেন এবং গাথা গাহিলেন—

"প্রজ্ঞার প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপর।
প্রজ্ঞা মানুষের হয় সবার উপর॥
এই দেখ প্রজ্ঞাবন্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া।
রাশীকৃত ধন-রত্ন দিলেক আনিয়া॥"

এ বার রাজপুত্রের পালা। তিনিও বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়া রাজবাড়ির নিকট এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রাজার এক অমাত্যপুত্র সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্রকে দেখিয়াই অমাত্যপুত্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া আখড়ায় গেলেন, নানারূপ কুস্তী-খেলার পর তাঁহাকে লইয়া স্নানাগারে গেলেন, সেখানে স্নান করাইয়া অনুলেপন মাখাইয়া শরীর ধূপ দিয়া সুগন্ধ করাইয়া রাজপুত্রকে আহারে বসাইলেন। সে আহার ত রাজভোগ। আহারাদির পর অমাত্যপুত্র তাঁহাকে লইয়া রাজার যানশালায় একটি সুসজ্জিত গৃহে শয়ন করাইয়া দিলেন। তিনি ক্লান্ত ছিলেন, খুব ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াছিলেন, তিনিও একখানি যান লইয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজপুত্র উঠিলেই "তাঁহার সহিত কথা কহিয়া যাইব।" ভাবিয়া "এই উঠেন, এই উঠেন" করিয়া সারারাত কাটাইয়া দিলেন। যখন তিনি যানশালা হইতে যানে চড়িয়া ঘরে যায়েন, তখন অমাত্যেরা ভাবিলেন, "এ কি? রাজকন্যা রাত্রিতে যানশালায় ছিলেন কেন?" খুঁজিতে খুঁজিতে এক ঘরে রাজপুত্র শুইয়া আছেন দেখা গেল। দেখিয়াই অমাত্যগণ তাঁহাকে

রাজার কাছে লইয়া গেল, এবং কন্যান্তঃপুরদূষক বলিয়া অভিযোগ করিল। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বল?" তিনি বলিলেন, "মহারাজ, অমাত্যপুত্র আমায় যানশালায় শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, আমি তথায় আর কাহাকেও দেখি নাই।" রাজকন্যাও সেইরূপ সাক্ষ্য দিলেন। অমাত্যপুত্রও সব কথা খুলিয়া বলিল। রাজার বোধ হইল, আসামী নির্দোষ। তিনি উঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, উনি বলিলেন, "আমি বারাণসীর রাজা অঞ্জনের পুত্র, দেশভ্রমণে এখানে আসিয়াছি।" রাজা অপুত্রক ছিলেন, ঐ কন্যাটিই তাঁহার একমাত্র সন্তান। তিনি বলিলেন, "তোমায় দেখিয়া আমার পুত্রস্নেহ উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমার পুত্র হও ও আমার এই বিস্তীর্ণ রাজত্ব তোমার হউক।" পুণ্যবন্ত রাজা হইয়া আপন বন্ধুদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন—

"পুণ্যের প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপর।
নরলোকে নাহি কিছু পুণ্যের উপর ॥
এই দেখ পুণ্যবলে আমি পুণ্যবন্ত।
পাইলাম রাজ্য যার নাই সীমা-অন্ত ॥"

এইরূপে পাঁচ বন্ধুই আপন আপন শিক্ষার পুরস্কারে অন্য অন্য বন্ধুগণকে ভাগ করিয়া দিলেন। সকলেই বলিলেন, পুণ্য, প্রজ্ঞা, রূপ, শিল্প ও বীর্য ইহার কাহাকেও অবজ্ঞা করা যায় না। সকলই মানুষের কাজে আইসে এবং সকলেরই সময়ে সময়ে প্রচুর পুরস্কার হয়।

বৌদ্ধ গল্পে বলিল, ঐ যে রাজপুত্র পুণ্যের জোরে কাম্পিল্য রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, উনিই অনেক জন্মের পর হইয়াছিলেন ভগবান্ বুদ্ধদেব, শুদ্ধোদনের পুত্র ও কপিলাবস্তুবাসী। যিনি সে জন্মে বীর্যবন্ত ছিলেন, বুদ্ধের সময় তিনি শোণক হইয়াছিলেন, যিনি শিল্পবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন রাষ্ট্রপাল; যিনি রূপবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন সুন্দরনন্দ। আর যিনি প্রজ্ঞাবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন শারিপুত্র। যাঁহারা বৌদ্ধ সাহিত্যে দক্ষ, তাঁহারাই এই সকল জাতকের মর্ম বুঝিতে পারিবেন, তাহার জন্য আমার আর বাক্যব্যয় করা বৃথা।

মডেল ভগিনী

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

জ্যৈষ্ঠ মাস। দিবা দ্বিপ্রহর। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, বাতাস সাঁ সাঁ করিতেছে, মন খাঁ খাঁ করিতেছে। স্থলে, বাবুর বাগানে, দাড়িম্ব-পত্র যেন ঝলসিয়া গিয়াছে; কদম্বকাণ্ড যেন নীরস, নির্গুণ, নিশ্চলভাবে, পরমব্রহ্মের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। জলে, কমল-সরোবরে, তপন-সোহাগে তৃপ্ত হইয়া, কমলিনীকুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এদিকে নভোমণ্ডলে পাখি, প্রাণবঁধু জীবনধন জলকে "ফটী-ঈক জল" বলিয়া ডাকিতেছে। ওদিকে, তারকেশ্বরের মহান্তের হাতিটা অতি গরমে ক্ষেপিয়া উঠিয়া জলে পড়িয়া কমল-দলের অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। স্বভাবের এই বিপরীত ব্যবহারে, বঙ্গভূমি চমকিত।

আরও কথা আছে। অতি-গরমে আম পাকিল, জাম পাকিল, লিচু পাকিল, কলা পাকিল,—চুল পাকিবে না কেন? হাতি ক্ষেপিল, কমলিনী ফুটিল, দাড়িম ঝলসিল,—বারি-পতন হইবে না কেন? ঘর গরম হইল, ভাই-ভগিনীর দেহ গরম হইল, ঘাম বাহিরিল,—কাপড় ভিজিবে না কেন?

কলিকাতার দালানগুলা যেন দাবানল জ্বলিতেছে। খোলার ঘর ত আগুনের খাপ্‌রা টিনের ছাদ তাতিয়া তাঁহা তাঁহা করিতেছে। নূতন চূণকাম-করা সাদা দেওয়ালে মধ্যাহ্নতপনের তাপ লাগিয়া, গরিব পথিকের চক্ষু কেবল ঝলসিতেছে। যে বাড়িগুলার হল্‌দে রঙ, সে গুলাতে বরং একটু রক্ষা আছে! তক্তা-চাপা-অসূর্য্যম্পশ্য-নবদূর্বাদল-শ্যাম-রঙের অনুকরণে যে সকল বাড়িতে আজকাল একটু হরিতালী গোছ রঙ মাখান হয়, সেইখানেই কতকটা উত্তপ্ত পথিকের মন-প্রাণ-শরীর ঠাণ্ডা হইতে পারে।

বড়ো সুখের বিষয়, কলিকাতার বাড়ি যতই জরাজীর্ণ হইতেছে, ততই ঐ হরিতাল-রঙে একটু "নিকেন পোঁছান" করিয়া, তাহার ভাড়া বাড়ান হইতেছে। বাড়ি পড় পড়; বনিয়াদে ঘুণ ধরিয়াছে, ছাদ ফাটিয়াছে, কড়ি ঝুলিয়াছে। ভাবিলাম, মিউনিসিপালিটা হইতে দুচার দিনের মধ্যে উহাকে ভাঙিয়া দিবার আজ্ঞা আসিবে। ওমা! পনের দিন পরে দেখি, কতকগুলা রাজমিস্ত্রী, সেই

হরিতালী রঙ, হাঁড়া হাঁড়া গুলিয়া হুহু শব্দে তাহার অষ্টপৃষ্ঠললাটে মাখাইতেছে। দেখিতে দেখিতে, দিব্য ফুট্‌ফুটেটি হইল। তখন বাড়ির কর্তা, প্রচার করিতে লাগিলেন, "আমার ইচ্ছা, (ত্রিশ টাকা ভাড়া ছিল) দশ টাকা বাড়াইয়া চল্লিশ টাকা করি। গিন্নী বলেন, তা হবে না; পঞ্চাশ টাকার কম এবার ও-বাড়ি ছাড়া হবে না।" পঁয়তাল্লিশ-বর্ষ-বয়স্কা বারাঙ্গনা, গোলাপী-রঙে ছোপান পুরান কাপড়ের কাঁচুলি-কসনে, ডবলবিজিটের দাবী করে।

কলিকাতার কোনো এক ফিরিঙ্গীপাড়ায় ঐরূপ একটা হল্‌দে বাড়িতে, এ গরমের দিনে, কয়েকজন নরনারী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বাড়িটা প্রকাণ্ড; দ্বিতল; সুমুখে বড়ো বড়ো থাম; যেন নবাবের খাস-বৈঠকখানা। ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ও হরি!—নীচের ঘরগুলো অন্ধকার!—সপ্ সপ্ জল উঠছে!—একটা দুর্গন্ধ! বসবার, কি দাঁড়াবার একটু যদি স্থান থাকে, তা আমায় দিব্য আছে! তবে নরনারীগণের, নীচে-তলার সঙ্গে বড়ো একটা অধিক কারবার নাই। সংসারধর্মে থাকিতে হইলে, অনেক কষ্টই সহিতে হয়। সময়ে সময়ে মানবধর্মের আবশ্যকীয় কোনো কাজ পড়িলে, সেই অন্ধকারময় ঘরেই লোকজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ-আদি করিতে হয়। অভ্যাস বশত গৃহস্থের অন্ধকারে তত অসুবিধা হয় না। কিন্তু আগন্তুকের প্রাণ-বিয়োগ।

সাধারণ নিয়ম এইরূপ হইলেও বিশেষ সুবিধা আছে। বিচালীওয়ালা, টিকেওয়ালা, জুতাবুরুশওয়ালা, দরজী, রাজমিস্ত্রী যত বাজে-লোক আসে, তাহাদের সঙ্গেই কেবল নিম্নতলে কথাবার্তা কার-কারবার চলে। কোনো ভদ্রলোক আসিলে, তাঁহাকে নীচে বসিতে, দাঁড়াইতে, বা কথা কহিতে কিছুই হয় না; একেবারে গট্ গট্ উপরে চলিয়া যাও, নিষেধ নাই, অবারিত দ্বার। আরও বিশেষ সুবিধা এই যে, পরিচিত বিশেষ-বন্ধুবান্ধব আসিলে, গৃহস্থ শীঘ্র স্বয়ং আসিয়া, সসম্ভ্রমে তাঁহাকে নীচে হইতে উপরে লইয়া যান। এক কথায়, নীচে-তলাকে বর্জিতদেশ বা নরককুণ্ড বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নিম্নদেশ নরক হউক, ন্যক্কারজনক হউক, উপরিভাগ কিন্তু নন্দনকানন। একবার ঠেলে-ঠুলে, চোখ-বুজে, নাকে কাপড় দিয়ে, উপরে উঠিতে পারিলে প্রথমে মনে হয়, আঃ বাঁচিলাম।—এ যে, দ্বিতীয় স্বর্গ। দ্বিতলের দ্বারে দ্বারবান সদা দণ্ডায়মান। পাগড়ী, চাপকান্, পায়জামা, দিল্লীর নাগরা, সকলই

তাঁহাতে আছে। পরিচিত, অপরিচিত, সুপরিচিত, যাঁহাকে তিনি দেখিতেছেন তাঁহাকেই অমনি তিনি ঘাড় নোয়াইয়া সেলাম করিতেছেন। যেন কাঠের পুতুল, কলে কাজ করিতেছে। হাসি নাই, স্ফূর্তি নাই, কথা নাই, অঙ্গচাঞ্চল্য নাই,—ঠায়, ঠিক্ সোজা গাছের গুঁড়ির মতো সে ব্যক্তি দণ্ডায়মান।

দ্বারবানরূপ জিনিসকে দেখিয়াই, এক প্রকাণ্ড হলে প্রবেশ করিতে হয় সে হল প্রথম দর্শনমাত্র, আমাদের মতো বাংলা-লেখকের মনে প্রথমে ভয় হয়,—জুতা খুলে ঢুকি, কি, জুতা পায়ে দিয়ে ঢুকি! জুতা পায়ে দিয়া ঢুকাই যদি নিয়ম হয়, তবে, জুতা খুলিয়া ঢুকিলে আমাকে অসভ্য বলিবে। আর নিয়ম যদি বিপরীত হয়, অথচ আমি জুতা পরিয়া ঢুকিলাম, তাহা হইলেও আমি উনবিংশ শতাব্দীর কুলাঙ্গার বলিয়া পরিচিত হইব। প্রথম দর্শনেই এই বিপদ। জুতা রাখি, কি, জুতা ফেলি,—এই সংশয়দোলায় চিত্ত ঘুরিতে থাকে।

প্রথমত মেজে মাদুরিত; তার উপর সতরঞ্চ; তস্য উপর, কারপেট বিছানা। অর্থাৎ যেন প্রথমত ঘনদুধ, তার উপর দু আঙুল পুরু সর, তার উপর বৌবাজারের ভীমবাবুর কাঁচাগোল্লা,—এই দেবোপম তিন মহাপ্রাণীর উপর কেমন করিয়া আমার সেই ছেঁড়া জুতা বসাই বল দেখি? জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালবিশিষ্ট, চারিদিকে চারুতালি-সুশোভিত, নানাবিধ-পার্থিব-পদার্থপূর্ণ, সেই দিনে-রেতে-ঘরে-বাহিরে একমেবাদ্বিতীয়ং নাস্তিং জিনিসং, আমার সেই ছেঁড়াজুতাং—(আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোকে বলুন দেখি)—কেমন করিয়া সেই মাদুর-সতরঞ্চ-কারপেটরূপ ট্রিনিটী বক্ষে বিচরণ করিবে!

বুঝিলাম, সে ঘর ছেঁড়াজুতার উপযুক্ত ত' নহেই। তালতলার নূতন চটী তাহার সম্মান রাখিতে সক্ষম কিনা, তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের চটী, বিদ্যাসাগরের চটী, ডাক্তার সরকারের চটী, এই ত্রিচটী ত তাহার কাছে ঘেঁসিতেই পারে না। মিঃ লালমোহন ঘোষের বিলাতী বুট, রাম-শ্যাম-নবীন-জ্ঞানী বাবুগণের ডসনের বার্ণিস বিনামা, সেই বিরাট, বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্রে বাহার দিবারই একমাত্র উপযুক্ত।

জুতা-বিভ্রাটের পরই, আসন-বিভ্রাট উপস্থিত। বসি কোথা? মেজেতে কার্পেটের উপরে এমন একটু জায়গা নাই যে, খানিক পা ছড়ায়ে বসা যায়। "ন স্থানং তিলধারণং" কেবল রাশিকৃত চৌকিতে, ঘরটা বোঝাই

করা। তাই কি ছাই, সব সোজা রকমের কেদারা? স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু, গুরু,—ঢ্যাঙা, গেঁড়া, চেপটা, চৌকা—নানা ঢঙের, নানা রঙের যেন নানা সঙ উপস্থিত। কোনো কেদারাখানি এত মিহি যে, প্রাণ খুলে ভর দিয়ে বসিতে ভয় হয়,—বুঝিবা এ দেহ-ভার অনুভব করিলে তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে অন্তর্ধান হইবে। আবার কোনো কোনো কেদারা গোদা-গোদা মোটা-সোটা যেন "বজ্জর বাঁটুল",—লোহার মুগুর মার, তবু ভাঙিবে না,—স্বয়ং হিমালয় কবে দেখা করিতে আসিবেন বলিয়াই যেন সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। কোনো কেদারায় বসিলেই, তিনি দুলিতে থাকেন;—নাগরদোলায় নায়ককে রস-পাকে দুলাইবার আয়োজন করিতেছেন! কোনো চৌকি ল্যাজ-বিশিষ্ট, —চারিহাত লম্বা, বুক চিতাইয়া পড়িয়া আছেন, তার উপর তুমি চোদ্দপোয়া হইয়া শোও; পা দুটা আকাশে উঠিবে, কোমরটা পাতালে পড়িবে, ঘাড়টা ত্রিশূন্যে বাঁকিয়া রহিবে, মাথাটা আঠেকাঠে বদ্ধ হইয়া সোনার গোখুরা সাপের ফুটন্ত চক্র গোছ সদাই ফণা ধরিয়া থাকিবে। কোনো চৌকি বিলাতীকলের গদী আঁটা,—বসিলেই অতলস্পর্শ! চোরাবালিতে প্রাণ হারাবো নাকি? কোনোখানির নির্মাণ-কৌশল এইরূপ যে, দুজনে কেবল ঠিক্‌সোজা নড়ন-চড়ন-বিহীন হইয়া, মুখোমুখি বসিয়া থাক,—ঈষৎ অঙ্গচালনা করিলেই উভয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উভয়ের গায়ে ঠেকে। তখন ত্রাহি মধুসূদন। ফল কথা, স্বচ্ছন্দে বসিবার একটুকুও স্থান নাই।

দাঁড়াইয়া থাকিই বা কেমন করিয়া? দেওয়ালের পানে চাহিলে চোখ ঝলসিয়া যায়। লাল, নীল, সবুজ, সাদা রঙের দেওয়াল-গিরি ঝল্ ঝল্ করিতেছে। মাঝে মাঝে গ্লাসে ঢাকা ছবি। একখানি ছবি কাপড়ের ঘেরাটোপে ঢাকা। এইরূপ জনশ্রুতি, ঐ কাপড়ের আড়ালে আদম এবং ইভ, আদিম এবং অকৃত্রিম অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন।

"অদ্বিতীয় স্বর্গে" আসিয়া যদি এরূপ ধাঁধা ঠেকে, এমন বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, তবে তেমন স্বর্গে আমার কাজ কি? গা খুলে, পা মেলে, কাঁকাল চুলকাইতে চুলকাইতে গুড়ুকতামাক না খেতে পেলে কি আমাদের পোষায়? ওরূপ আটাকাটীতে বদ্ধ থাকা কি ভদ্রলোকের কাজ? স্বর্গে দণ্ডবৎ! নরকেও দণ্ডবৎ! ভালো মানুষের ছেলের সোজাসুজি কার-কারবারই ভালো। অতএব বিদায়।

বলি, ও হচ্চে কি? এই রকম করে কি নভেল লেখে? সেই হলদে ঘরের বর্ণনাটা, চলেছে ত চলেইছে! ছি!

উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ, মেয়েমানুষ কৈ? সেই গুণবতী, জ্ঞানবতী, রসবতী, যুবতী প্রসন্নমতি নায়িকা কৈ? সেই হেসে হেসে ঢলে পড়া কৈ? সেই কেঁদে কেঁদে বুকভাসান কৈ? সেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চম্‌কে-উঠা কৈ? সেই জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা কৈ? আচ্ছা, না হয় নায়িকাই এখন নাই।

সেই জ্ঞানের সাগর, গুণের সাগর, রসের আকর নায়ক-প্রবরই কৈ? বসন্তকাল, আমের মুকুল, কোকিল, ভ্রমর, চাঁদ, পদ্ম, জ্যোৎস্নারাত্রি, গোধূলি, প্রভাত-তপন, দীর্ঘ-নিশ্বাস, হা হুতাশ, বুকের ভিতর কুলকাঠের অগ্নি, চোখের ভিতর মন্দাকিনী, মুখের ভিতর বক্তৃতা-রাগিণী, কণ্ঠের ভিতর বীণাপাণি, কত আর লিখিবে লেখনী,—উপন্যাসের এ সমস্ত প্রত্যঙ্গ কৈ? এ কালিয়-দমনের যাত্রার রাধাও নাই, কৃষ্ণও নাই; শুধু আখড়াই গাওনায় কতক্ষণ আর আসর থাকিবে বল?

রাগ করিবেন না। হাতে সবই আছে। কিন্তু ধীরে, ধীরে, ধীরে। যখন যেখানে যে ভাবে যেটি চাহিবেন, তখনি সেইখানে তাহাই পাইবেন। শিক্ষিতা, স্বাধীনতাপ্রাপ্তা, সাম্যভাবাক্রান্তা, অবিবাহিতা, যৌবন-বিকার-গ্রস্তা-বিরহিণী চান কি? দিব। পরিপূর্ণ-ভাণ্ডার। জগৎশেঠের কুঠী। কি রকম নায়ক দরকার? খাসা, শুকো, নিম-খাস, চলন, রাশি—এই পাঁচ প্রকার নায়কই উপস্থিত। উপনায়ক, উপনায়িকা, প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বরী, সখা, সখী আছে। আর ঐ পদ্মফুল, আমের মুকুল, কোকিল, ওসব ত' ধরিই না। আমের মুকুল ত বাগানভরা, পদ্মফুল ঠাকুরদাদার খাস-দিঘিতে দিন-রাতই ফুটে আছে,—কোকিল ত' গাছের পাখি, যাবে কোথা?

আছে সব। এখন এনে দিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করিতে পারিলেই হয়।

প্রথমে শাকান্ন; শেষে পায়সপিষ্টক। তাই প্রথমেই বসন্তবর্ণন এবং নায়িকার বিবাহবর্ণন না করিয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম রোদের কথা পড়িয়াছিলাম।

গ্রন্থারম্ভ। সেই জ্যৈষ্ঠমাসের রোদে তাতিয়া পুড়িয়া, অনর্গল ঘাম ঝরাইতে ঝরাইতে এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ কলিকাতার রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছে। বামুনের বয়স অনুমান ৩৭।৩৮ বৎসর; শ্যামবর্ণ; মাথায় টিকি; পায়ে চটিজুতা;

নাকে তিলক; স্কন্ধে মুড়ি-সেলাই চাদর, পরিধান থান ধুতি;—গায়ে পিরিহান নাই, মাথায় টেড়ি নাই, চড়নে গাড়ি নাই; ট্যাঁকে ঘড়ি নাই, হাতে ছড়ি নাই;—ব্রাহ্মণ তথাচ বেশ সতেজে রাজপথে চলিতেছে। সঙ্গে একটি মুটে,—মাথায় একটি সামান্য মোট করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে।

মুটে। "হাম আউর কেতনা দূর যায়গা,—বহুবাজার বোল্‌কে তোম্ হাম্‌কো লালবাজারমে লে যাতা হ্যায়।"

ব্রাহ্মণ। "নারে বাপু! রাগ করোনা,—একটু এগিয়ে বাঁহাতি গলিতে ঢুকলেই বাড়ি।"

মুটে। "সিয়ালদা ষ্টেসনসে হুয়াকা কেরেয়া আট পয়সা দস্তর হ্যায়—হাম পয়সা নেহি ছোড়েগা।"

ব্রাহ্মণ। "বাপু! ছ পয়সা চুক্তি ক'রে, দু পয়সা বেশী বল কেন? তা পাবে না।"

মুটে। "তোমারা মোট লেও, পয়সা দেও, হাম্ আউর নেহি যাঙ্গে।"

রক্ষা করুন! ক্ষান্ত হউন। আপনার আর উপন্যাস লিখে কাজ নাই। এ কি এ? কেবল ধাষ্টমো!—একটা বুড়ো ডোক্‌রা বামুন, আর একটা নগদা মুটে। এ নিয়েই কারবার! চলে যান আপনি।—সভ্য সমাজের আর অপমান করিবেন না।

মাপ করিবেন। প্রথমে শাকান্ন, শেষে পায়সপিষ্টক,—ইহাই আমি জানি। আগে যে আপনারা দই-ক্ষীর-সন্দেশ খাবেন, তা আমি বুঝি নাই। মজুত সবই আছে; ভালো,—তাহাই হইবে। তবে দুঃখ এই যে, এ পরিচ্ছেদ অঙ্কুরেই এইখানেই শেষ করিতে হইল। আর, ভাবনা এই, কেহ পাছে মনে করেন যে, আমি নভেল লিখিতে অক্ষম। আমি বিলক্ষণ জানি, পরিচ্ছেদ যতই লম্বা হইবে, ততই লেখকের কৃতিত্ব অধিক। পদ্ধতি, প্রকরণ, ধারা, ধরণ সবই অবগত আছি। ইংরেজি, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক ক্যোটেসান দিতেও পারি, ভগবদ্গীতা, সাংখ্যদর্শন, ঋগ্বেদ-মন্ত্র উপযুক্ত স্থানে যোজনা করিতে শিখিয়াছি। অভাব কি? সন্ন্যাসী চক্রবর্তী গাইয়ে, দাশরথি রায় ছড়া-কাটিয়ে; ব্যালেন্টাইন বারিষ্টার, পিকক বিচারক; সৈন্যাধ্যক্ষ নেপোলিয়ান, সুশিক্ষিত ফরাসী সৈন্য;—সুতরাং দিগ্বিজয়ের অভাব কি?

তবে এইবার হাত দেখাই।

এখনও কথা ফুরায় নাই। বুড়োমানুষ কিছু বেশি বকে।

সপ্তমে স্বর চড়াইয়া বাঁধিলাম। দীপক রাগে তান ধরিলাম। হয় লেখক, না হয় পাঠক, উভয়ের মধ্যে একজন ভস্মীভূত হইবেই হইবে। তবে সুবিধা এই, দীপকে পুড়িয়া মরিলে তান্‌সেনের মতো মহাক্ষেত্রে সমাধি হইবে, তদুপরি রসজ্ঞ ব্যক্তিগণের বার্ষিক উৎসব হইবে, এবং সংগীত-আচার্যগণ সেই গোরের মাটি লইয়া মাথায় দিবে। অতএব সুবিধা।

সেই প্রকাণ্ড হরিতাল রঙের হলে কি দেখিলাম? দেখিলাম, এক পীনোন্নত-পয়োধরা, আলুলায়িতকেশা, বিবিধবর্ণের বেশ-ভূষিতা বরবর্ণিনী রমণী একাকিনী সেই ল্যাজবিশিষ্ট চেয়ারে অধিষ্ঠিতা। তিনি শায়িতা, কি উপবিষ্টা, কি দণ্ডায়মানা, হঠাৎ কিছুই বুঝিবার যো নাই। উত্তমাঙ্গ ও পদদ্বয় ঈষৎ উর্ধ্বে উত্থিত এবং নিতম্বপ্রদেশ নিম্নভাগে কথঞ্চিৎ অবনমিত। ফল কথা, শোয়া, বসা এবং দাঁড়ানো,—এ তিনের সংমিশ্রণে যে ভাব দাঁড়ায়, ইহা তাহাই।

কমলিনীর কোমল অঙ্গ কুটিল আঙরাখায় পরিবৃত। স-টান সতেজ অঙ্গ-রক্ষণী দেহযষ্টিকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া, ছাঁদিয়া রাখিয়াছে। মরি, মরি! বিধাতার কি এই কঠোর লীলা! এমন কুসুম-সুকুমার, মাখমে-গড়া, গৌরাঙ্গখানি, কার অভিশাপে, কি দোষে, ঐ কালো-জামারূপ-কারাবাসে এ গরমের দিনে পচিতেছে? কমলিনী ইন্দুমুখের ঘামবিন্দু, রেশমী রুমাল সাহায্যে মুছিয়া ফেলিতেছেন;—না-জানি, তাহাতে হাতের কত কষ্টই হইতেছে।

ও হরি! এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই;—পায়ে এণ্টাকিন্‌!! মাগী কে গো? এমন গুমট গ্রীষ্মে দিন-দুপুরে যে মেয়ে-মানুষ, এণ্টাকিন্‌ এঁটে ব'সে থাকতে পারে, তার কি অসাধ্য কিছু আছে?

বোধ করি, ওর কোনো একটা বিলাতী ব্যারাম থাকিবে। এখনকার মা-লক্ষ্মীদের শরীরে একটা না একটা, রোগ লেগেই আছে। আহা! বড়ো ঘরের মেয়ে; লেখাপড়া শিখেছেন; কেতাবের সঙ্গে চোখের এক তিল বিচ্ছেদ নেই; কাজেই ওঁদের একটুকুতেই অসুখ করে। মা লক্ষ্মীর দোষ কি? দোষ যত, তা আমার পোড়া কপালের।

হুহু শব্দে কপি-কলের সাহায্যে টানাপাখা চলিতেছে। দ্বারে, জানালায়

জলময়ী খস্‌খসের পরদা! তবু কেন তিনি পায়ে এষ্টাকিন্‌ এবং গায়ে জামা দিয়া ঘাম বাড়াইতেছেন?

বুঝি অতি লজ্জাশীলা হবেন! তাই কি? তবে ধনুকের ছিলার মতো সুতীক্ষ্ণটান-বিশিষ্ট জামার রঙ্গভঙ্গ কেন? মাথায় কাপড়ও ত নাই। কেশ-কলাপ কেদারা ডিঙাইয়া কার্পেট চুম্বন করিতে উদ্যত। সর্বাঙ্গে ঘেরাটোপ; মাথাটি খোলা; এই বা কেমন লজ্জা? আর, এ নির্জনে লজ্জাই বা কাকে? বিধাতার বিচিত্রলীলা বুঝিতে পারিলাম না!

কমলিনী ক্ষীণ-মৃদু-পঞ্চমে বসন্তবাহার রাগিণীতে ডাকিলেন,—"বেয়ারা, বরফ-পাণি লে আও না!" বেহারা আসিয়া মা-লক্ষ্মীর সম্মুখস্থ টেবিলে এক গ্লাস বরফজল রাখিয়া গেল।

রমণী কথা কহিলেন না, নড়িলেন না—কেবল মিটিমিটি চাহিয়া রহিলেন।

অবাক্! ডেপুটি বাবুর বাড়িতে ঝি নাই নাকি? পরপুরুষ অমন হন্ হন্ করে এসে সুমুখে দাঁড়ালো; তবু একটু মাথায় কাপড় দিলে না গা? সেই ত্রিভঙ্গভাবেই খাড়া শুয়ে রইল? মাগীকে ভূতে পায় নাই ত? জানিনা, কোন্ গন্ধর্বকন্যা, কোন্ নাগকন্যা, অথবা কোন্ কিন্নরকন্যা, কলিকালে কলিকাতায় সমুদ্ভূতা হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা ২টা বাজিল। গ্রীষ্মটা যেন পাকিয়া উঠিল। কমলিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বারান্দার দিকে আসিয়া পা-চালি করিতে লাগিলেন। তাহাতে যেন মন স্থির হইল না। টেবিলের কাছে গিয়া এক চুমুক বরফজল খাইলেন; তাহাও যেন ভালো লাগিল না। টেবিলে শেলির কবিতাবলী ছিল; তাহা লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই, মাঝখানটা খুলিয়া, মনে মনে পড়িতে লাগিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই শেলির উপর বিরক্ত হইয়া, কেতাব রাখিয়া দিলেন। তার পর, আপন পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, বেলা আড়াইটা বাজিয়াছে। মুখ বাঁকান এবং নাক শিট্‌কান দেখিয়া বোধ হয়, তিনি ঘড়ির উপরও বিষম চটিয়াছেন। তখন একটা কেদারায় বসিলেন। বসিয়া, কাগজ, কলম লইয়া কি লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে কমলিনীর মা, পাশের কুঠারি হইতে আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। জননী প্রবীণা ব্রাহ্মণী; গৌরাঙ্গী; হাতে কঙ্কণ; কপালে সিন্দুর, মাথায় কাপড়। মা বলিলেন, "বাছা! দুপুরবেলা ঘরে এসে শুয়ে একটু

ঘুমাও না ? ডাক্তার বলে গেছেন, আহারের পর বিশ্রাম দরকার। সারাদিন লেখাপড়া করিলে, ব্যারাম যে বাড়বে।"

কমলিনী। "দিনের বেলা ঘুম হয় না তো, আমি কি করিব ? ঘুমের উপর তো জোর নাই ?"

মা। "আমি তোমার ভালোর জন্যই বলি। দুপুর বেলা সহজ-প্রাণ আইঢাই করে,—তোমার ত অসুখ শরীর। এস, আমার সঙ্গে এস—খানিক শোও সে।"

কমলিনী। "এখন আর শোব কখন ? চারিটার সময় মাষ্টার পড়াতে আসবে যে ; শোবার কি আর সময় আছে ?"

মা। "এই তো দুটো বেজেছে বৈ ত না ; চারটার এখন ঢের দেরি। মাষ্টারবাবু পড়াতে এলে, ঘুম থেকে আমি তোমাকে উঠিয়ে দেব।"

কমলিনী। "না, তিনি রাগ করবেন। আমার পড়া তৈয়ারি না হ'লে, তিনি যে রাগ করেন !"

মা। "বাছা, রোগ হলে আমাকেই ভুগতে হয়। শরীরটা আগে, না পড়া আগে ? শিরঃপীড়াটা একটু কমে যাক্, তারপর দিন-রাত পড়।"

কমলিনী। "মা, তুমি আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না। এইরূপ দৌরাত্ম্যেই ত আমার মাথাধরা রোগ জন্মিয়াছে। হৃদয়কমল-উত্থিত নিগূঢ় ভাব-নিচয়ের গতি প্রতিরোধ করিলে, ডাক্তারি মতে, সেই বদ্ধভাবরূপ বিষে শরীর দূষিত হয়। তখন মস্তিষ্কে বিকার উপস্থিত হয়। আর্যরমণীর ধমনীতে তখন শোণিতনিচয় ইতস্ততঃ প্রবল পরাক্রমে প্রধাবিত হয়। শিরঃপীড়ার ইহাই আদি এবং মূল কারণ। আপনি যদি আমাকে আর দুইবার "শোও শোও" বলিয়া জেদ করেন, তাহা হইলে আমার এখনি মাথা ধরিবে।"

মা। "তা বাছা, তুমি যাতে ভালো থাক, তাই তুমি কর।"

এই বলিয়া জননী প্রস্থান করিলেন। কন্যা আবার ঘড়ি দেখিলেন,—তিনটা বাজিতে এখনও দশমিনিট বিলম্ব। কাঁটা সরাইয়া দিয়া তিনটা বাজাইলে প্রকৃতই তিনটা বেলা হয় কি না,—গুম্ হইয়া একমনে তাহাই বোধ হয় তিনি ভাবিতে লাগিলেন। সূর্যের বশে ঘড়ি হইল কেন ? ঘড়ির বশে সূর্য চলিল না কেন ? বিধাতার এমন কুনিয়ম কেন ? ঘড়ির অধীনতা, দাসত্ব, পরমুখপ্রেক্ষিতা, সাম্যনীতির মূলে কি কুঠারাঘাত করিতেছে না ? সূর্য

কি ব্রাহ্মণ, ঘড়ি কি শূদ্র ?—তাই আজও এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতে ঘড়ি, সূর্যের পদানত থাকিবে ? এ দাস-প্রথা, পাপব্যবসা এদেশে আর কত দিন চলিবে ? এখানে কি কোনো উইলবারফোর্স আজও জন্মগ্রহণ করেন নাই ? কমলিনী ভাবনা-সাগরে ডুব দিলেন।

ডুব দিয়া, পাতাল পানে তলাইয়া যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার করপদ্মে এক প্রকাণ্ড চৌকো লেফাফা আসিয়া পৌঁছিল। খামের এক পার্শ্বে ইংরেজিতে কেবল এইটুকু লিখিত আছে ;—

KAMALINI

55 Lane, Calcutta.

ভিতরে বাংলা।—

"সুহৃদ্‌বরাসু !

পরমপিতা পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, হৃদয় পবিত্র করুন, দেহ সুস্থ রাখুন ! চারিটার সময় তোমায় শিক্ষা দিবার জন্য যাইতে সক্ষম হইলাম না। চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই,—অভাবনীয় বিবিধ যত্ন সত্ত্বেও, নির্দিষ্ট সময়ে তথায় উপনীত হইতে পারিলাম না। অপরাধ ক্ষমা করিও। সন্ধ্যার একটু পরেই পৌঁছিব। তোমার পাঠে ব্যাঘাত দিলাম বলিয়া আমি দুঃখিত, কাতর এবং মর্মাহত। আমার দোষ লইও না। এই পত্রের উত্তর দিয়া আমার মনপ্রাণ শান্ত করিলে বড়োই অনুগ্রহ করা হয়।

তোমারই নগেন।—"

রমণী এই পত্র পাইয়া অবশ্যই নিতান্ত ব্যথিতা হইলেন। অবশ্যই প্রথমত উষ্ণদীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু দুঃখ এই, সে শ্বাসবায়ুর শব্দ কেহ শুনিল না।

কমলিনী ভাবিতে লাগিলেন, পত্রের উত্তর দি, কি না দি ! খুব ক্রোধের বশীভূত হইয়া বলিলেন, আমি আর পত্র লিখিব না। কিন্তু তাঁহার সে রাগের সান্ত্বনা করিবার কেহই নাই দেখিয়া, তিনি আবার মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা, এবার এই শেষপত্র লিখিলাম, আর কখনো লিখিব না।

"সুহৃদ্‌বর !

আমি আপনাকে গুরুর মতো দেখি। এ নারী-জন্মের আপনিই আমার শিক্ষক। গুরুদেব ! অধীনীর প্রতি আপনার কৃপা কম হইল কেন ? নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া আপনি আমায় অমৃতময় বাক্যে উপদেশ দিবেন, সেই আশায়

আমি বসিয়া আছি। আশায় নিরাশ হইলে বুক ভাঙিয়া যায়। আপনার বিশেষ কাজ থাকিলে আসিয়া কাজ নাই। কারণ, আপনার কোনোরূপ ক্ষতি হইলে আমার কষ্ট হয়। আমি আপনার রূপ কল্পনা করিয়া, আপনার মূর্তি গড়িয়া, হৃদয়-রাজ্যে বসাইব। সেই মূর্তিকেই গুরুদেব বলিয়া প্রণাম করিয়া, আমি শেলি পাঠ আরম্ভ করিব।

চিরদুঃখিনী কমলিনী।"

এই পত্র ভৃত্য লইয়া গেল। কমলিনী আবার সেই ল্যাজবিশিষ্ট চেয়ারে গিয়া শুইলেন। বাঁ হাতে কেতাব, ডান হাতে পেন্‌সিল, চক্ষু মুদ্রিত।

এমন সময় আর একখানি পত্র আসিয়া পৌছিল। পত্র দিয়া দ্বারবান জিজ্ঞাসিল, "ডাক্তার বাবুকা আদ্‌মী খাড়া হ্যায়, আপ বোলী ত জবাবকে ওয়াস্তে খাড়া রহে।" কমলিনী পত্র খুলিতে খুলিতে উত্তর দিলেন, "আবি রহেনে বোলো।"

দ্বারবান সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। সেই পত্রের অভ্যন্তর প্রদেশে এইরূপ লেখা ছিল।—

"প্রিয় ভগিনি!

অদ্য তোমার মাথাধরা ব্যারামটা কেমন আছে, জানিবার জন্য বড়ো উৎসুক হইয়াছি। অদ্য তোমাদের বাড়ি আমার যাওয়া দরকার হইবে কি? যাইব কি? অতি অল্প পরিমাণ মাথা ধরিলে, তৎক্ষণাৎ লিখিয়া পাঠাইও; আমি সকল কাজ ছাড়িয়া যাইব। তোমার দাদা কবে আসিবেন?

তোমারই মহেন্দ্র।"

কমলিনী ঝটিতি এই পত্রের উত্তর লিখিয়া দিলেন;—

"প্রিয় ভ্রাতঃ!

আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। আমার উপর আপনার যেরূপ কৃপাদৃষ্টি, যেরূপ যত্ন, যেরূপ স্নেহ, তাহাতে আমার মাথাধরা ব্যারাম অচিরে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। আপনিই এ জগতে আমার একমাত্র পরমবন্ধু; প্রকৃত শান্তি, সুখ, স্বচ্ছন্দ আপনিই আমাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু এরূপ অনুগ্রহদৃষ্টি চিরদিন থাকিবে কি? ভগবন্! আমায় অভয় দিন।

ভগবানের ইচ্ছায় এখন একটু ভালো আছি। যদি বিশেষ মাথা ধরে, তবে ৭টার পর ডাকিতে পাঠাইব।

তোমার দুঃখিনী।"

বার বার তিন বার। তখন আর একখানি পত্র আসিয়া পৌঁছিল। পত্রাকৃতি বড়ই জমকালো—চারিদিকে সোনার হল্‌করা—এবং শিরোদেশে উড়নশীলা, বিবসনা পরীর ছবি। পত্রের অভ্যন্তর এবং বাহ্যপ্রদেশ হইতে, আতর-গোলাপের সুগন্ধ বাহির হইতেছে। পত্রখানি পদ্যে;

"কেন ভালোবাসি, কি দিব উত্তর ?
নীল নয়নের তারা, ফেটে পড়ে বারিধারা,
ভাসে মুখ, ভাসে বুক, ভাসয়ে কোমর।
কেন হায়! ভালোবাসি কি দিব উত্তর!

হাসে চাঁদ গগনের কোলে,
হাসে ফুল এ মহীমণ্ডলে,
ক্ষরে মধু কমলের ফুলে,
বহে বায়ু বাসন্তী-হিল্লোলে,
গায় পিক সুধামাখা বোলে,
নাচে শিখী ঘন-ঘটা রোলে,—
দাবানলে দহে শুধু অভাগা অন্তর
কেন ভালোবাসি হায় কি দিব উত্তর!

ক্ষুদ্রমতি ক্ষুদ্রগতি বামন বন্ধুর অতি,
দেহ মোর অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
দূরে অই গুরুগিরি, ধাপে ধাপে ধীরি ধীরি,
কেমনে উঠিয়া পাব ত্রাণ॥
কাঁদি তাই দিবানিশি ভাবিয়া ঈশ্বর।
কেন ভালোবাসি তোমা, কি দিব উত্তর!

পঙ্কজ প্রফুল্ল কেন অরুণ উদয়ে,
কুমুদিনী ফুটে কেন চাঁদ-মধু-পিয়ে,

বসন্তে কোকিল কেন কুহু কুহু করে,
মলয় অনিল কেন ঝুরঝুর ঝরে,
কমলিনী পানে কেন ধাইছে ভ্রমর,
কেন ভালোবাসি প্রিয়ে! কি দিব উত্তর!

কি দিব উত্তর?—চাই আকাশের পানে,
কি দিব উত্তর?—চাই পাতালের পানে;
কি দিব উত্তর?—হেরি সুনীল সাগর;
কি দিব উত্তর?—হেরি হিমগিরিবর;
চারিদিক অন্ধকার—ঘোর, ঘোরতর,
কেন ভালোবাসি প্রিয়ে! কি দিব উত্তর!

ব্রহ্মাণ্ড কাগজ যদি, মৈনাক লেখনী,
কালী তোয়নিধি কিম্বা নয়নের পাণি,
সময় অনন্ত যদি, শ্রম নিশিদিশি,
তবে ত উত্তর দিব, কেন ভালোবাসি।
কিম্বা যদি হ'তো দেখা,—বিরল বাসরে,
সুধাংশুবদনি! শুধু অর্ধদণ্ড তরে!
নখে করি, বুক চিরি, খুলিয়া অন্তর,
কেন ভালোবাসি, তার দিতাম উত্তর।

দেখাতাম হাড়ে হাড়ে তব নাম লেখা,
দেখাতাম ত্বকে ত্বকে তব ছবি আঁকা,
দেখাতাম প্রেমতরী শোণিত-সাগরে,—
জীবাত্মা নাবিক তার আছে হাল ধরে;
দেখাতাম হৃদিমূল—শরতের শশী,
তবে তো উত্তর হ'তো—কেন ভালোবাসি।

এই শেষ-লিপি, তবে,—বিদায়! বিদায়!
সাজিব সন্ন্যাসী, মাখি, ভস্মরাশি গায়।

গেরুয়া বসন পরি, করে, কমণ্ডলু ধরি,
ভ্রমিব ভারতমাঝে নগরে কাননে,—
নদীবক্ষে গিরিশৃঙ্গে, সাগরতরঙ্গভঙ্গে,
গাইব তোমার গান আনন্দ-আননে।
যাগ যজ্ঞ হোম জপ তপ যন্ত্র তন্ত্র,—
সেই নাম, সেই নাম, সেই নাম মন্ত্র,—
সে নাম সঙ্গের সাথী—সে নাম ঈশ্বর,
কেন ভালোবাসি প্রিয়ে! কি দিব উত্তর!

শ্রীনবঘনশ্যাম।

এই পদ্যটি কেবল আপনার পাঠের জন্যই লিখিলাম। আপনি যদি ছাপাইতে অনুমতি দেন, তবে ছাপাইব। আর যদি লোকসমাজে প্রচার করা, ইহা আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে ছিঁড়িয়া কুচি কুচি করিয়া ফেলিবেন। আজ দুই বৎসর পূর্বে সেই অপূর্ব গোলাপ ফুলটি আমার হাত হইতে ঈষৎ হাসিয়া, কাড়িয়া লইয়া আপনি কোমল নখ দ্বারা যেরূপ ধীরে ধীরে ছিঁড়িয়াছিলেন, এই পত্র সেই ভাবেই ছিঁড়িবেন। পনেরো দিন কলিকাতায় রহিলাম, তথাচ একদিনও দেখা হইল না—সে সকল আমারই দুরদৃষ্ট! এখন দূর দেশে চলিলাম, কবে ফিরিব জানি না।

শ্রীনবঘনশ্যাম।”

কমলিনী, পত্র পাঠান্তে, প্রায় দশমিনিট কাল, আপন মনে গভীর চিন্তা করিলেন। শেষে উত্তর দিলেন,—

“ইহার উত্তর আজ নহে। আপনার কর্মস্থানে, ডাকযোগে উত্তর পাঠাইব। এখন এইমাত্র বলিতে পারি, আমি নিরপরাধিনী অবলা।

সংসারসুখ-বিরহিতা কমলিনী।”

তৃতীয় পত্রের উত্তর দিয়া, কমলিনী নীরবে সোফায় গিয়া শুইয়া রহিলেন। ভৃত্যকে বলিলেন “জোরসে পাঙ্খা চালাও।” তৎপরে তিনি নয়ন দুখানি বুজিলেন।

কি কর্মভোগ! দেখিতে দেখিতে, আর একখানি পত্র আসিল। পত্রখানি, বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসের লিখিত। যথা:—

"মহিলা-কুল-গৌরবে!

রমণীতে বিজ্ঞান বুঝিবে, ইহা আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া, আমার সে ভ্রমান্ধকার দূর হইল। আজ একমাস মধ্যে শরীর-বিজ্ঞানে তুমি যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছ, তাহা অত্যদ্ভুত। আর রসায়নেও তোমার দৃষ্টি প্রখরা। আজ আমার শিক্ষা দেওয়া সার্থক হইল। কিন্তু একটা বড়ো অসুবিধা ঘটিয়াছে। সপ্তাহে কেবল একদিন বিজ্ঞান পড়িবার দিন নির্দিষ্ট আছে; তাহাতে পড়া অতি অল্পই হয়। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্য-পাঠ সপ্তাহে ছয় দিন হইয়া থাকে। একদিন সাহিত্য-পাঠ কমাইয়া, সপ্তাহে বিজ্ঞান পাঠ দুইদিন ধার্য করিলে ভালো হইত না কি? বিশেষ, সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান কিছু গভীরতর বিষয়। চন্দ্রমুখি! এ বিষয়ে তুমি যাহা অনুমতি করিবে, তাহাই হইবে।

অনুগত শ্রীনিত্যানন্দ দাস।"

নিত্যানন্দ বাবু বহুকাল বিজ্ঞানচর্চায়, দুচারগাছি চুল পাকাইয়া, ক্রমশঃ প্রবীণত্বে পা দিয়াছেন। কমলিনী এ পত্রের এই উত্তর দিলেন;—

"অদ্য আমার শরীর অসুস্থ। সুতরাং গভীর বিষয় আলোচনা করিবার অদ্য উপযুক্ত সময় নহে। কিন্তু আপনার কথা দিবানিশি আমার মনে জাগিয়া থাকিবে। শয়নে, স্বপনে, শ্রবণে, ভবনে—কেবল ঐ কথাই ভাবি। কারণ আপনার দ্বারা আমি যেরূপ উপকৃত হইতেছি, অন্যের দ্বারা সেরূপ নহে;— আপনি ভিন্ন বিজ্ঞানের কঠোর অর্থ আর কে বুঝাইতে পারে?

বিজ্ঞান-ভিখারিণী কমলিনী।"

এমন সময়, উকিলবাবুর "ভেট" কমলিনীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। রজতথালে সন্দেশ এবং গোলাপফুলের তোড়া। পত্রখানি গালামোহর করা। উপরে লেখা আছে 'অন্যের পাঠ নিষেধ।' কমলিনী সেই পত্রখানি মনে মনে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পত্রবাহক একটাকা বক্শীশ পাইয়া বিদায় হইল।

উপরি উপরি চারিখানি পত্র লিখিয়া কমলিনী নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কোমল করপল্লব আড়ষ্ট হইল। আঃ, উঃ, গেলাম, বাঁচিনা, ইত্যাদি মিহি মিহি শব্দ তাঁহার মুখ-বিবর হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। তথাপি চারিটা বাজিল না। এমত স্থলে ঘড়ির কল খারাপ হইয়াছে, এরূপ

অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং কমলিনী, দ্বারবান্‌কে গির্জায় ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন।

পাঠাইয়া, নিজ পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঘরটি ক্ষুদ্র। মধ্যভাগে একটি ছোটো টেবিল; তার দুধারে দুখানি কেদারা; পাশে একখানি বেঞ্চ। ঈষৎ দূরে খাট, গদী আঁটা; ধপধপে চাদর বিছানো; তদুপরি সরু, মোটা, পাতলা,—নানারকমের ৫।৬টি বালিস। বইভরা দুইটি ছোটো আলমারি। কাগজ, কলম, দোয়াত। ছবি, দেয়ালগিরি, ক্লকঘড়ি। কুঁজোয় কলের জল, বোতলে লাল ঔষধ, আলনায় বিলাতি তোয়ালে। ডিবেয় পান, খাতায় গান, বাক্সে হারমোনিয়াম।

কমলিনী সেই নির্জন কক্ষে বসিয়া আপন মনে মহাকবিতা রচনা করিবার উপক্রম করিলেন।

প্রথম সেক্ষপীয়র খুলিয়া, তাহা হইতে সুচিকণ কাগজে ইংরেজি কবিতা করিলেন।—

To be, or not to be, that is the question
Whether I'is nobler in the mind, to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them ?—To die,—to sleep.—
No more, and, by a sleep to say we end
The heart-ache, and the thousand natural shocks
The flesh is heir to,—'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die,—to sleep ;—
To sleep ! perchance to dream ; ay, there's the rub ;

এই পর্যন্ত লিখিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হইল,—

হয়, কি না হয়,—মরি কিম্বা বাঁচি,—প্রশ্ন
ইহাই এখন। হতভাগ্য কপালের
বিষমাখা-বাণ গায়ে ফোটে সদা ;—
দুঃখের সমুদ্রঘোর, তরঙ্গ-সঙ্কুল !

উচ্চহ্রদে রোধিব কি গতি তার? কিম্বা
অনন্ত-আলয়ে দিব—যত যত ক্লেশ!
মৃত্যু—নিদ্রা—আর কিছু নয়, ঘুমাইলে,—
হ্রাস হয়, হৃদয়বেদনা—মাংসপিণ্ড
শরীরের শতেক যাতনা;—এই ফলে
পূর্ণ হয় মনের কামনা। মৃত্যু—নিদ্রা!—
নিদ্রা বুঝি অসার স্বপন। এইখানে,
হায়! হায়! কাঁচাবাঁশে ধরিলরে ঘুণ!

লেখা শেষ হইলে, কমলিনী কবিতাটির প্রথম-আধখানা খুলিয়া, দ্বিতীয় আধখানা ঢাকিয়া টেবিলের উপর, অতি যত্নে রাখিয়া দিলেন। অথচ সাহিত্য-শিক্ষক আসিয়া উপনীত হইলেন না। কমলিনী তখন জানালার নিকট গিয়া ঊর্দ্ধমুখী হইয়া নীল আকাশপানে তাকাইলেন; আকাশ ভালো লাগিল না। দক্ষিণ দিকের গবাক্ষ দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন;—জনতা বিষবৎ বোধ হইল। অবশেষে, সেই নিজস্ব নির্জন ঘরে "সহজ-কেদারায়" শুইয়া, শেলির গ্রন্থ বুকে রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

মডেল ভগিনী

ল জ্জা ব তী

স্বর্ণকুমারী দেবী

১

শুনিতে পাই তাহার আসল নাম লজ্জাবতী নহে। সে ছোট বেলায় নাকি বড় অভিমানী ছিল, কোন দোষ করিলে পিতা মাতা যদি তাহাকে তিরস্কার করিতেন অমনি সে লজ্জাবতী-লতাটির মত সঙ্কুচিত জড় সড় হইয়া পড়িত। তাহার ছোট্ট, গৌরবর্ণ মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত, তাহার ডাগর ডাগর হাসি হাসি চোখ দুটি জলে ভরিয়া যাইত, হৃদয়ের ভাব লুকাইবার ইচ্ছায়

হাসিতে চেষ্টা করিয়া অশ্রুজলে ও ম্লান হাসিতে সে এক অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিত তাই তাহার বাপ-মা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন—লজ্জাবতী।

লজ্জাবতীর পিতা মাতা এই মধুর কোমল অভিমানের মধ্যে তাহার হৃদয় মাধুর্য্য প্রকাশিত দেখিতেন, তাই তাঁহারা সাদরে ইহার সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। কিন্তু শ্বশুর গৃহে লজ্জাবতীর এই অকৃত্রিম বিনয়-নম্রতা প্রসূত শিশুসুলভ সরল লজ্জামাধুরী কখনও আদৃত হয় নাই। কি করিয়া হইবে? সংসারে নীরবতার গীতি-মাহাত্ম্য সকলের প্রাণে পৌছে কি?

সে ত' প্রশংসার কাজ করিয়া ঢ্যাড্‌রা পিটাইতে জানে না, দোষের কাজ করিলেও পাঁচ রকম কথার ছলে ঢাকিয়া লইতে পারে না, বিনা দোষে তাহাকে দোষী করিলেও তাহাতে কোন কথা না কহিয়া অশ্রু বর্ষণ করে। কিন্তু কঠোর সংসারে কোমল অশ্রুর সাক্ষ্য কয়জন সত্য বলিয়া গ্রহণ করে? ইহাতে বরং তাহার সপ্রমাণিত হয়; সুতরাং যে স্বভাবের গুণে লজ্জাবতী পিতামাতার আদরের ছিল, সেই স্বভাবের গুণেই শ্বশুর-গৃহে প্রতিপদে তাড়না সহ্য করে।

শীতের প্রভাত, কিন্তু আজ কুয়াসা নাই, নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যের অগ্নি-গোলক জলন্ত মহিমায় বিরাজিত হইয়া দিক্ বিদিক্ বিভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে লজ্জাবতী দেখিল, তাহার ঘরের দেওয়ালে সূর্য্যকিরণ ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে; ভাবিল কতই না জানি বেলা হইয়া গিয়াছে! তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া, একবার মাত্র আকাশের দিয়া চাইয়া সসম্ভ্রমে সূর্য্য প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি স্নান সমাপন করিয়া দ্রুতপদে রন্ধন-গৃহে আসিয়া দেখিল, তাহার 'যা' তখনও রান্নাঘরে আসেন নাই; দাসী উনুন ধরাইয়া বাঁটনা বাটিতেছে; সে তখন নিশ্বাস ফেলিয়া সুস্থির ভাবে কুটনার আয়োজন করিয়া লইয়া কুটনা কুটিতে বসিল। সেদিন তাহার রাঁধিবার পালা নহে, বড় বৌ রাঁধিবেন সে যোগাড় দিবে মাত্র। তাহার কুটনা কুটা প্রায় শেষ হইয়াছে, এই সময় শাশুড়ী আসিয়া সহাস্য মুখে কোমল স্বরে বলিলেন—"বৌমা, শুনেছ—?"

দ্বাদশ বৎসর লজ্জাবতী শ্বশুর গৃহে আসিয়াছে—এমন সাদরে শাশুড়ী তাহার সহিত কথা কহিয়াছেন বলিয়া তাহার মনে নাই, সে তাঁহার দিকে চাইতে গিয়া থতমত খাইয়া আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল।—শাশুড়ী বলিলেন—"শুনেছ

ফুলকুমারী আসছে—?" লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি কাটা হাত কাপড়ে লুকাইয়া আশ্চর্য্যব্যঞ্জকস্বরে বলিল—"ঠাকুরঝি!"

আশ্চর্য্য হইবারই কথা, লজ্জাবতী শ্বশুর গৃহে আসিয়া অবধি কখনও এ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখে নাই, চতুর্দ্দশ বৎসর হইল ফুলকুমারীর বিবাহ হইয়াছে—বিবাহের পর একবারও সে বাপের বাড়ী আসে নাই, শ্বশুর ধনী লোক, পুত্র-বধূকে এই গৃহস্থ ঘরে পাঠাইতে অপমান জ্ঞান করিতেন, শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাই এতদিনে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিতেছে। শাশুড়ী আবার বলিলেন, "আজ কার রাঁধার পালা? বড় বৌয়ের বুঝি? তা দেখো বৌমা, বড় মানুষের বৌ—এতদিন পরে আসছে, যত্নের যেন কিছু কমি না হয়।"

শাশুড়ী চলিয়া গেলেন, কাটা আঙ্গুল জলে চুবাইয়া ধরিয়া লজ্জাবতী ভাবিতে লাগিল "আজ যে এই সুপ্রভাত আনিয়াছে সে না জানি কিরূপ কল্যাণরূপী উষাময়ী প্রতিমা! তাহার আগমনে এই কঠোর অন্ধকার প্রান্তর এতদিনে বুঝি প্রেমালোকে আলোকিত হইয়া উঠিবে!

এক অপূর্ব্ব আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

২

একে কন্যা, তাহে ধনীর ঘরণী, গৃহে আসিয়াছে আবার অনেক দিনের পর;—চৌধুরী বাড়ীর অন্তঃপুরে আজ পর্ব্বোৎসবের ধূম, কাহারো মুহূর্ত্ত দাঁড়াইবার অবকাশ নাই। বধূগণ রাঁধিতে ব্যস্ত, দাসীগণ যোগাড় দিতে ব্যস্ত, গৃহিণী আনাগোনা ও ফরমাস করিতে ব্যস্ত, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা "পিসিমা আসিতেছেন" বলিয়া আনন্দ-কোলাহল করিয়া ছুটাছুটি করিতে ব্যস্ত। এই ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে চাকর আসিয়া খবর দিল "দিদিমণি আসছেন গো।"

চাকর দাসী ছেলে মেয়ে গৃহিণী সকলেই উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—লজ্জাবতীও তাড়াতাড়ি হাতা বেড়ী ফেলিয়া মাতৃদেবীর তিরস্কার না মানিয়া দ্বার দেশে আসিয়া উঁকি মারিল। রন্ধন গৃহের সম্মুখেই অন্তঃপুরের উঠান। একখানি বস্ত্রাবৃত পালকী,—অগ্রপশ্চাতে দুইজন সুসজ্জিত দ্বারবান্ এবং উভয় পার্শ্বে পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণহার-বিভূষিতা দুই দাসী, উঠানে আসিয়া দেখা দিল। এই রাজসজ্জা দেখিয়া লজ্জাবতীর স্ফীত হৃদয় সহসা দমিয়া গেল,—ধনীর নিকট

দরিদ্র অনুগ্রহের পাত্র, তাহাদের মধ্যে কি সখ্যতা সম্পর্ক—হৃদয়ের সম্বন্ধ জন্মিতে পারে ?

কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই আড়ম্বরের মধ্যে যখন সামান্য সাজে, সামান্য বেশে এক হাস্যময়ী প্রফুল্লমুখী অসামান্যা রমণী আবির্ভূত হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন নিমেষে তাহার বিরস ভাব দূর হইল, হৃদয় এক উত্তাল আনন্দ তরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মা ফুলকুমারীর হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন, লজ্জাবতী তাহার আনন্দ উচ্ছ্বাস লইয়া আবার রান্নাঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই খানিকটা হলুদ লইয়া বড় বৌয়ের পৃষ্ঠ-বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া দিল, বড় বৌ রাগিয়া বলিলেন, "ও আবার কি সোহাগীপণা!" সে হাসিয়া অস্থির হইল। বড় বৌয়ের রাগ তাহাতে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্র-স্বরে বলিলেন, "কাজের সময় ওসব ন্যাকরামি ভাল লাগে না, কি হাসিই পেয়েছ!" ছোট বৌ বুঝিল, কাজটা ভাল করিতেছে না। তবুও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। বড় বৌ আবার বলিলেন, "ভ্যালা আদুরেপণা শিখেছিলি! আদুরেগিরি ফলাতে হয় বাপের বাঁড়ী গিয়ে ফলাস্; আমাদের ও-সব ভাল লাগে না"—এই কথায় তাহার অন্তর বিদ্ধ হইল, নয়ন সজল হইয়া উঠিল, তবুও সে হাসিতে লাগিল। অনেক দিনের পর তাহার স্বাভাবিক শিশু-সুলভ চপলতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

*　　　*　　　*

আর লুকাইয়া এক তরফা দেখা নহে—এবার চোখে চোখে মিলন। বধূরা অন্ন ব্যঞ্জন, ক্ষীর নবনী, দধি দুগ্ধ, ফল মিষ্টান্ন সজ্জিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মা কন্যাকে ভোজন স্থানে লইয়া আসিলেন। আহারের সরঞ্জাম দেখিয়া ফুলকুমারী বড় বৌকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এ কি করেছিস্ লো, এত কেন! আমি কি গুরুঠাকরুণ হয়ে এসেছি নাকি ?"

বড় বৌ অর্দ্ধ ঘোমটার মধ্য হইতে আস্তে আস্তে বলিল, "তা নইলে এতদিন পরে বাপের বাড়ী আসিস্? এখন বোস্, রান্নার যেন নিন্দে না হয়, পাতে পড়ে থাকলেই বুঝ্‌ব রুচলো না।"

"মরে যাই আমি কি রাক্ষস নাকি ? ও কে, বড় বৌ ?"

মা তাহার উত্তর-স্বরূপ বলিলেন—"তা জানিস্ নে ফুলি! ও ছোট বৌ! কি করেই বা জান্‌বি, শ্বশুর পোড়ারমুখো হেমের বিয়েতেও ত একবার

পাঠালে না, এত করে বল্লুম—তা একবেলাও না, এমন জান্‌লে কি অমন ঘরে মেয়ে দিই!"

ফুলকুমারী ইত্যবসরে ছোট বৌয়ের নিকটে আসিয়া বলিল, "এই আমাদের ছোট বৌ! দেখি লো দেখি, মুখ খোল," বলিতে বলিতে সে তাহার ঘোমটা উঠাইল, ছোট বৌ একটু হাসিয়া আবার ঘোমটা টানিয়া দিল। ফুল বলিল, "ওমা বেশ বৌ হয়েছে, দাদা দেখছি ছবির মত বৌ করেছে!" ছোট বৌয়ের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে ফুল এই কথা বলিল, ছোট বৌ হাসিয়া মুখ হেঁট করিয়া ঘিয়ের বাটী ভাতের থালার কাছে আর একটু সরাইয়া রাখিল।

৩

কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বিকালে লজ্জাবতী উপরে উঠিতেছে, ফুলকুমারীকে আর একবার দেখিবার জন্য সে তৃষিত, ফুলের সেই প্রফুল্ল ভাব, সহাস্য দৃষ্টি, সাদর মধুর কথা, সমস্তক্ষণ তাহার মনে তরঙ্গ তুলিয়াছে,—লজ্জাবতী নববধূর ন্যায় সলজ্জ আগ্রহে অধরের মৃদু হাসি চাপিয়া অধীর চরণ ধীরে ধীরে বিক্ষেপ করিয়া দোতালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় পুঁটুরাণী আসিয়া বলিল—"মা, আমার ফুল কাঁটা ফিতে দে, পিসিমা চুল বেঁধে দেবে।" লজ্জাবতী সহসা স্বপ্নরাজ্য হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"সে কি, তোর ফুল কাঁটা ত আমি রাখি নি!" মেয়ে বলিল—"রাখিসনি কি! সেই যখন তুই কুটনো কুটছিলি আমি তোর কাছে রেখে এলুম!"

"কই আমি ত তা জানিনে; আমাকে ত ব'লে আসিস নি?" মেয়ে বলিয়া আসে নাই সেটা ঠিক! কিন্তু মা যে তুলিয়া রাখেন নাই সেটা ত আর তাহার দোষ নহে। সে মুখ ঝামটা দিয়া বলিল—"কাছে রেখে এলুম—তা তার বলে আসব কি! শীঘ্র আমার দড়ি কাঁটা দে।" লজ্জাবতী নিজের দোষটাই মনে মনে মানিয়া লইয়া, তাহাকে আর কিছু না বলিয়া গহনা খুঁজিতে আবার নীচে নামিলেন,—আর ফুলকুমারীকে দেখিতে যাওয়া হইল না।

এদিকে দাসী আসিয়া গৃহিণীকে বলিল, "দিদিমণির বিছানা ত করে এনু—তা গায়ের লেপ কি দেব—একটা দাও।" ফুলকুমারী তখন বড় বৌয়ের ঘরে তাহার সহিত গল্প করিতেছিল গৃহিণী একাকী ছিলেন; দাসীর কথায় তিনি

তাহার তলপী তলপা খুঁজিয়া একটিও ভাল লেপ পাইলেন না,—সবই ছেঁড়া ছেঁড়া, পাতা চলে, কিন্তু বড় মানুষের বৌকে গায়ে দিতে দেওয়া যায় না। গৃহিণী ভাবিত হইয়া পড়িলেন,—তবে বিপদে পড়িলে যাঁহার বুদ্ধি না যোগায় তিনি স্ত্রীলোকই নহেন; মুহূর্ত্তের মধ্যেই উপায় আবিষ্কৃত হইল, দাসীকে বলিলেন, "ছাখ, আজ ত হেম পশ্চিমে যাবে, ছোট বৌয়ের গায়ের নেপটা ফুলির বিছানায় দিগে, আর এর একটা আমি বেছে রাখি—এসে তখন ছোট বৌয়ের জন্যে নিয়ে যাস্।"

দাসী চলিয়া গেল, খানিক পরে আসিয়া বলিল,—"এমন আগোছাল বৌও দেখিনি। পুঁটুরাণী গহনা রাখতে দিয়েছিল—তা হারিয়ে খুঁজতে নেগেছে, তাই তাকে আর বলতে পেনু না; আপনিই নেপটা নিয়ে দিদিমণির বিছানা করে এনু।"

"গহনা হারিয়েছে! কি গহনা?"

"মাথার ফুল গো ফুল! দেখ' মা আমাদের শেষে দয়ে মজিও না। তোমরা সব হারাবে—আর আমরা গরীব মানুষ যেন মারা না যাই"—

গৃহিণী এই খবরে রাগিয়া আগুন হইলেন, আজ আনন্দের দিন, মেয়ে ঘরে আসিয়াছে—আর কিনা পোড়ারমুখী বৌ গহনা হারাইয়া অলক্ষণ করিয়া বসিল! তিনি প্রথমে বড় বৌয়ের ঘরে আসিয়া খবর দিলেন—"শুনেছিস্? ছোট বৌ গহনা হারিয়েছে! এই সেদিন চেলির কাপড় খানা হারালে আবার আজ এই কীর্ত্তি! এমন উড়নচণ্ডী বৌ"—

ফুল বলিল—"মা, তা বৌ ত আর ইচ্ছে করে হারায় নি।"

ফুলকে তাহার পক্ষ লইতে দেখিয়া মায়ের রাগ আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "তুমি ত বাছা বৌয়ের গুণ জান না তাই ওকথা বলছ, দিন কতক থাক তখন বুঝবে! দেখতে মুখখানি অমন—পেটে পেটে দুষ্টমি, ইচ্ছে করেই হারিয়েছে! আর গহনা ত ওর যাবে না, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন! তুই আজ বাড়ী এসেছিস তাই ইচ্ছে করেই অলক্ষণ করছে।"

বড় বৌ কোন কথা কহিল না; ফুলকুমারী বলিল,—"আচ্ছা দেখে আসি ব্যাপারটা কি হয়েছে?" তিন জনে মিলিয়া তখন ছোট বৌয়ের সন্ধানে চলিলেন। বেশী দূর যাইতে হইল না, ছোট বৌ নীচের সব ঘর খুঁজিয়া উপরে উঠিতেছিল, বারান্দায় দাঁড়াইতেই শ্বাশুড়ীর তীব্রস্বর তাহার কাণে

পৌঁছিল—"কি গহনা আবার হারিয়েছিস্! (যেন চিরকাল ধরিয়া সে গহনাই হারাইয়া আসিতেছে!) বাড়ীতে আর লক্ষ্মী রইলো না! পরের বাড়ী মেয়ে পাঠানই বা যাবে কি করে? শ্বশুররা যখন বলবে আমাদের গহনা কি হোল তখন লজ্জায় না মুখ কালী হয়ে যাবে!"

লজ্জাবতী মৃদুস্বরে বলিল, "ওর শ্বশুর-বাড়ীর গহনা নয়; আমার বাবা আমাকে যে ফুল দিয়েছিলেন তাই পরিয়ে দিয়েছিলুম।"

"বটে! তোমার বাবা তোমায় যা দিয়েছেন তাই হারিয়েছে? তা আমরা কথা কয়েছি ঘাট হয়েছে! দোষ করলেই কথা কইতে হয়—তা কথা কইলেই অমনি বাপের বাড়ীর তুলনা! দেখলি বাছা ফুলি, দেখ— একবার তোর মায়ের অপমানটা দেখ"—

বড় বৌ বলিল, "হ'লেই বা বাপের বাড়ীর গহনা, জিনিসটা ত হারাল!"

শাশুড়ী বলিলেন—"হারাক্—হারাক্ সব যাক, আমাদের কথা কয়ে কাজ কি? বলব কি, হরিমোহন ঘোষের মেয়ে আমি—তাই,—অমন বৌ নিয়ে ঘর করছি! নইলে আর কেউ হ'লে বাপ বাপ ডাক ছাড়ত! আয় বাছা, তোরা কেউ কথা ক'স্‌নে।"

শাশুড়ী চলিয়া গেলেন, ঘরে গিয়া সেই কথা লইয়াই গুলজার করিতে লাগিলেন। ছোট বাবু সেদিন কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া মায়ের নিকট বিদায় লইতে গিয়া সেই সকল কথা তাঁহার কাণে উঠিল, মা নানা কথার পর বলিলেন—"বাছা তোদের ত এখন ঘর সংসার হয়েছে, আমাকে ত আর দরকার নেই,—আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, এখানে থেকে এসব অপমান আমার আর সয় না।" ছোট বাবু ছোট বৌয়ের ব্যবহার শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, গোলযোগের আর ছাই কি দিন ছিল না, আজ বিদেশে যাইবার দিনে যত হেঙ্গাম! তিনি ত গৃহে গিয়াই ছোট বৌকে বকিতে লাগিলেন। কেবল বকিলেই রক্ষা ছিল,— বলিলেন, "আমি আর এরূপ গোলযোগ সহিতে পারি না, এই চলিলাম আর ফিরিব না।"

স্বামীকে যদি লজ্জাবতী সব খুলিয়া বলে ত এতটা কিছুই হয় না; কিন্তু স্বামীর কঠোর বাক্যে তাহার হৃদয় এত কাতর হইয়া উঠিল যে মুখ দিয়া কথা ফুটিল না! বিদায়ের দিনে এইরূপ স্নেহসম্ভাষণ জানাইয়া স্বামী যখন

চলিয়া গেলেন সে বিছানায় পড়িয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। তাহা ছাড়া তাহার উপায় কি! যেরূপ স্বভাব লইয়া সে জন্মিয়াছে!

৪

চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিয়াছে, তাই আপনার বাড়ী হইয়াও এ বাড়ীর সবই যেন তাহার চোখে নূতন। মায়ের সে শ্রী নাই, তিনি এখন বৃদ্ধা, বালিকা বড় বৌ এখন গৃহিণী, দাদারা সব বড় হইয়াছেন, ঘরে ঘরে বালক বালিকার নবমুখ—সকলই তাহার কাছে নূতন, সর্ব্বাপেক্ষা নূতন লজ্জাবতী, এবং তাহার প্রতি বাড়ীর ব্যবহার! সে যেন ছাই ফেলিতে ভাঙাকুলা, তাহাকে যা বকেন, মা বকেন, স্বামী বকেন, মেয়ে পর্য্যন্ত—এমন কি দাসীরা পর্য্যন্ত বকে! তাহার কি দোষ, কোন দোষ আছে কিনা ইহা বিচার করিয়া দেখাটাও কেহ আবশ্যক বিবেচনা করে না,—লজ্জাবতীও কখনও নিজের দোষের প্রতিবাদ করে না।

ফুলকুমারী অবাক হইয়া গেল—তাহার হৃদয় মমতার্দ্র হইয়া পড়িল। সে ছোট বৌয়ের পক্ষ হইয়া মাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা কবিল; কিন্তু দেখিল বৃথা চেষ্টা, মা তাহাতে আরও বেশী রাগিয়া যান। এদিকে নিষ্ফল হইয়া সে সন্ধ্যার পর লজ্জাবতীর কক্ষে গমন করিল, যদি কোনরূপে তাহাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারে। গৃহ-দ্বারে আসিবা মাত্র দাদার রুষ্টস্বর তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, ফুলকুমারী ভিতরে না গিয়া সেইখানেই দাঁড়াইল। তখনই প্রায় দাদাকে গৃহের বাহিরে আসিতে দেখিয়া বলিল, "দাদা, বৌকে বকছ, আমি ত বৌয়ের কোন দোষ দেখছিনে"—দাদা সহসা দাঁড়াইয়া বলিলেন—"তবে দোষ কার?"

"দোষ যদি ধরতে হয় ত পুঁটুরাণীর, নইলে কারো নেই। সে যদি বৌকে গহনার কথা বলে, তাহলে ত আর চুরি যায় না।"

"কিন্তু মায়ের মুখের উপর অমন চোপা করার কি দরকার ছিল?"

ফুলকুমারী একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "দাদা, সেটা ঠিক চোপা নয়, মা যদি বুঝে দেখতেন, তাহলে তাতে রাগ করতে পারতেন না, তবে এখন বুড়ো হয়েছেন এক বুঝতে আর বুঝে বসেন। কিন্তু তাই বলে তুমিও দাদা ভুল বুঝ না। কি হয়েছে বলি শোন।" কি কথার পর লজ্জাবতী মাকে

কি বলিয়াছিল, ফুলকুমারী তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি ওর দোষ পেলে ?"

"না।"

"তবে ভেবে দেখ দেখি, বিনা দোষে তুমি পর্য্যন্ত ওরূপ করে বকলে ওর কিরূপ কষ্ট হয়! বিশেষ আজ বিদেশে যাবার দিন ওকে বকে যাচ্ছ, তোমার একটু মায়া করে না দাদা ?"

দাদা আর কিছু না বলিয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন; শয্যায় আসিয়া দেখিলেন লজ্জাবতী কাঁদিতেছে, নিকটে বসিয়া কহিলেন, "লজ্জাবতি, তুই কি চিরকাল লজ্জাবতী থাকবি ? এতক্ষণ সব খুলে বললেই ত আমি বুঝতুম তোর দোষ নেই। যা হয়েছে তা হয়েছে, ভুলে যা লক্ষ্মীটি, আর কখনও তোকে বকব না; আমায় মাপ কর।" লজ্জাবতী গভীর সুখে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া স্বামীর বুকে মাথা রাখিল।

৫

স্বামী চলিয়া গিয়াছেন—রাত্রি গভীর,—চারিদিক নিস্তব্ধ, কিন্তু লজ্জাবতীর নিদ্রা আসিতেছে না। গভীর কষ্টের পর স্বামীর প্রেমাদর পাইয়া কৃপণের ন্যায় সে তাহা এখনও আস্তে আস্তে উপভোগ করিতেছে। এক একবার তাহার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে, স্বামী সব কথা কি করিয়া জানিলেন ?—কে বলিল ? সহসা সে চমকিয়া উঠিল, ফুলকুমারী তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিল, "বৌ, এখনো বিছানায় যাস্‌নি।" স্বামীকে বহির্বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া আসিয়া সেই যে সে নীচে সতরঞ্চের উপর শুইয়া পড়িয়াছে—আর ওঠে নাই। ফুলকুমারীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"ঠাকুরঝি, তুমি এখনও শোওনি ?"

ঠাকুরঝি বলিলেন—"আমি শুয়েছিলুম, বিছানা থেকে উঠে তোকে দেখতে এলুম, দাঁড়া প্রদীপটা কাছে আনি, ভাল করে মুখ দেখা যাচ্ছে না।" ফুলকুমারী দীপটা নিকটে আনিয়া ভাল করিয়া জ্বালাইয়া দিয়া নিকটে বসিল, বসিয়া বৌয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল, "তোর না ভাই বারো বছর বিয়ে হয়েছে ? আচ্ছা তখন কি তুই এর চেয়েও ছোট ছিলি ? তোকে এখনও এমন ছোট দেখতে! মনে হয় যেন কনে-বৌটি!" বৌ একটু

হাসিল—ননদ তাহার হাতটি হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিল, "তুই ভাই অমন কেন ?"

"কেমন ?"

"যেখানে তোর দোষ নেই সেখানেও কথা ক'স্‌নে ?"

"কথা কইতে গিয়ে দেখেছি উল্টো হয়, কে জানে আমি কি রকম করে বলি—সবাই ভুল বোঝে ?"

"দাদাও ? কেন আমি দাদাকে বুঝিয়ে বলতে ত তিনি সব বুঝলেন ?"

তবে ফুলকুমারীই তাহার পক্ষ লইয়া স্বামীকে সব কথা বলিয়াছে ! তাহার জন্যই সে স্বামীর আদর পাইয়াছে ! কৃতজ্ঞতায় লজ্জাবতীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তিনি কিছু বললে আমার বড কান্না পায়।"

"তাইতে কোন কথা মুখ ফুটে বলা হয় না ? বুঝেছি।"

"না তা ঠিক না, তিনি বিরক্ত হ'য়ে তারপর আর জিজ্ঞাসা করেন না।"

"হায়রে আমাব অভিমানিনি ! কে জানে ভাই তোকে সবাই বকে কি করে ! কি করে তোর উপর রাগ করে !"

"দিন কতক পরে তুমিও বকবে ! দেখবে আমার উপর রাগ না করে লোকে থাকতে পারে না।"

"কক্ষনো না।"

"যদি দোষ কবি ?"

"তা হলেও না। তোকে যে সকলেই বকে—আমি আবার কোন প্রাণে বকব !" লজ্জাবতী তাহার হাত দুটি ধরিয়া টিপিয়া বলিল—"তাও নাকি কখনও হয় !"

আনন্দ-সজল নেত্রে খানিক পরে ফুলকুমারী চলিযা গেলেন, বৌ বিছানায় গেল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম হইল না। সে রাত্রির সমস্ত ঘটনা, স্বামীর আদর, ফুলকুমারীর সস্নেহ বাক্য, অকৃত্রিম সখীত্বভাব তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে লাগিল, সুখের চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়া কাটাইল।

ভোর বেলা উঠিতে গিয়া দেখিল মাথা বড ঘুরিতেছে—আবার সে শুইয়া পড়িল। ফুলকুমারী সকালে গৃহে আসিয়া বৌকে তখনও শয্যায় দেখিয়া মশারীর দরজাটা একটু খুলিয়া যখন উঁকি মারিল, লজ্জাবতী তখন তাড়াতাড়ি

উঠিয়া বসিল। লজ্জাবতীকে নিতান্ত বিবর্ণ, ক্লান্ত দেখিয়া ফুলকুমারী বলিল, "বৌ, তোর কি অসুখ করেছে নাকি? অমন দেখাচ্ছে কেন?"

লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি বলিল, 'না'।

ফুলকুমারী বলিল—"কিন্তু তুই যে কাঁপছিস্ শীত করছে? গায়ে কাপড় দে না।"

লজ্জাবতী বিছানার এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, "আমার নেপটা কই দেখছিনে ত"—গোলমালে শ্বাশুড়ীর দত্ত লেপটি দাসী তাহার জন্য আনিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

"ওমা, সারারাত নেপ না গায়ে দিয়ে অমনি কাটিয়েছিস্! কেন তোর নেপ কোথায় গেল?"

"জানিনে, ঝি বুঝি শুক'তে দিয়েছিল, তুলে দিতে ভুলে গেছে"—বলিতে বলিতে লজ্জাবতী বিছানার বাহির হইল। ফুলকুমারী তাহার মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, "সত্যি বৌ, তুই এখন উঠিস্‌নে, শুয়ে থাক, তোর কপালটা যেন গরম গরম মনে হচ্চে।"

বৌ হাসিয়া বলিল, "এখন শুয়ে থাকলে কি চলে? ও কিছু না, একটু মাথা ধরেছে, স্নান করলেই সেরে যাবে এখন।"

"কেন—চলবে না কেন? আজ বুঝি তোর রাঁধার পালা? তা অসুখ করলেও পালা রাখতে হবে নাকি? আমি রাঁধব এখন।"

লজ্জাবতী জিব কাটিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি—ক্ষেপেছ নাকি? সত্যি আমার কিছু হয় নি।" এমন আজগুবি অসম্ভব প্রস্তাব সে যেন জীবনে কখনো শুনে নাই। বলিতে বলিতে সে খাটে বসিয়া পড়িল। ফুল বলিল, "আমার মাথা খাস্ তুই শো,—"

এমন সময়ে দাসী একটা লেপ আনিয়া বিছানায় ফেলিয়া বলিল, "এই তোমার লেপ রইলো গো,—কাল আনতে ভুলে গেছনু—তা উনুন যে বয়ে যাচ্ছে আজ কি আর রান্না বান্না করতে হবে না?"

লজ্জাবতী বলিল, "চল যাচ্চি।"

দাসী গেল, ফুল বলিল— "আমার কথা রাখবিনে, তবু রাঁধতে যাবি!"

বৌ কাতর হইয়া বলিল—"ঠাকুরঝি, তুমি রাঁধবে সে কি করে হবে?"

"কেন তাতে কি হয়! তবে আমি তোর এত পর,—বেশ!" এই কথা

বলিয়া ফুল রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, লজ্জা বলিল, "শোন ঠাকুরঝি—না, তা নয়! কিন্তু মা তাহলে রাগ করবেন, তিনি ভাববেন—"

"তাঁর সঙ্গে বোঝা পড়া সে আমার!"

লজ্জাবতী একটু ভাবিল—ভাবিয়া সেই প্রস্তাবের অসম্ভাব্যতাটা মনে মনে কল্পনা করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "ছি ছি তাও কি হয়! না ঠাকুরঝি, সে কোন মতে হবে না!"

"কোন মতে হবে না! বেশ তুই রাঁধলে আমি কিন্তু সে রান্না খাব না।" ফুল রুষ্ট স্বরে এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল,—লজ্জাবতী ডাকিল—"ঠাকুরঝি!" কিন্তু ফুল আর ফিরিল না। লজ্জাবতী আর পারিল না—সে তাহার ঘূর্ণ্যমান উত্তেজিত উষ্ণ মস্তক লইয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল। এখনও একদিন যায় নাই ইহার মধ্যে ঠাকুরঝিও তাহার উপর রাগ করিল। সে বুঝিল এ রাগ ঠাকুরঝির স্নেহপ্রসূত,—কিন্তু তবুও তাহাতে তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইল, দুঃখে অভিমানে অশ্রু উথলিয়া উঠিল, কাঁদিয়া মনে মনে সে কহিল, ঠাকুরঝিও আমার উপর রাগ করিল! আমার মরণই ভাল!

৬

লজ্জাবতী খানিক পরে নীচে রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিল, ফুল উনুনে হাঁড়ি চড়াইয়া বড় বৌকে রান্না সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতেছে—বড় বৌ কুটনা কুটিতে কুটিতে হাসিয়া উত্তর করিতেছেন। ফুলের বাঁহাতী উনুনে ডালের হাঁড়ি—ডানদিকে কড়ায় তেল ফুটিতেছে—সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বৌ লো! তেল চড়বড় করে এলো এখন তরকারী গুলো দিই?" বউ হাসিয়া বলিতেছে, "বলি তোমার অমন কাজ না করলেই কি নয়! চড়বড়ানি আগে থামুক্ তখন দেবে—" ফুল বলিল, "ঐ লো বউ ডাল উথলে উঠলো! কি করি আয় আয়—"

লজ্জাবতী বলিল, "এই যে আমি আসছি ঠাকুরঝি।" সে আসিতে আসিতে ডাল উথলিয়া খানিকটা ফুলের পায়ে পড়িয়া গেল। পা পুড়িল ফুলের, তাহার জ্বালা ভোগ করিল যেন লজ্জাবতী, এই ঘটনায় এমনি সে ব্যথিত হইয়া পড়িল! সে শুষ্ক মুখে তাড়াতাড়ি তাহার শুশ্রূষা করিতে বসিয়াছে, এমন সময় শ্বাশুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আসিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা তাই ত! সত্যিই ফুলকুমারী রান্‌ছে—আমার বিশ্বাস

হয়নি! আবার পা পুড়িয়ে ফেলেছে! বলি সব রাজার ঝিরা! ননদ দুদিন মাত্র থাকতে এসেছে তাকে না পুড়িয়ে মনস্কামনা সিদ্ধি হল না!"

বড় বৌ বলিল, "আমি ত সেই অবধি বারণ করছি, তা ঠাকুরঝি ত শোনে না কি করব? ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে, না পারে—আমি রাঁধছি, তোর কেন বাবু আসা!"

শ্বাশুড়ী। "ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে তাই উনি রাঁধতে এয়েছেন! দেখ ফুলি, আমি আজ মাথামুড় খুঁড়ে মরব! এদিকে আয় বলছি, মাইরি—এমন বৌও তো আমি কখনও দেখিনি।"

বড় বৌয়ের প্রতি ফুল ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মাকে বলিল, "না মা আমি সখ্ করে রান্‌তে এসেছি, আমি এই ডাল আর তরকারীটা রেঁধে যাচ্ছি—তুমি যাও।"

মা বলিলেন, "তুমি রাঁধবে, আর বৌরা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকবে? আয় বলছি, নইলে আমি রক্ষে রাখব না"—বলিয়া হেঁসেলে উঠিয়া ফুলের হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, এবং সমস্ত বেলা ধরিয়া তাহাকে এমন চোখে চোখে রাখিয়া দিলেন যে ফুলের আর লুকাইয়াও এ মুখো হইবার যো রহিল না।

৭

লজ্জাবতী তাহার অসুখ শরীর লইয়া নিস্তব্ধে রাঁধিল, কিন্তু রান্নার পর গৃহে আসিয়া সেই যে শুইয়া পড়িল, আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না।

বড় বৌ ফুলের ভাত বাড়িয়া উপরে লইয়া আসিল। পুঁটুরাণী পিসিমাকে ডাকিল, "পিসিমা ভাত এসেছে খাওসে গো।" মা মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আহার স্থানে আসিয়া ছোট বৌকে না দেখিয়া বলিলেন, "রাজার ঝির বুঝি আর এদিকে আসতে নেই!" পুঁটুরাণী বলিল, "মায়ের বড় অসুখ করেছে সে শুয়ে পড়েছে।"

শ্বাশুড়ী বলিলেন, "সব ভাণ, কাজের নামে অমনি অসুখ।"

তাহার অসুখের কথা শুনিয়া ফুলের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল—বুঝিল বিশেষ অসুখ না হইলে সে এখানে আসিত। সে বলিল, "না, মা, সকাল থেকে তার অসুখ করেছে—রেঁধে ভাল করেনি, একটা বাড়াবাড়ি না হয়।"

মা বলিলেন—"অমনি বাড়াবাড়ি হোল ! একটু বুঝি মাথা ধরেছে আর পড়ে আছে। গেরস্থের বাড়ী অত বড়মানুষী কল্লে চলে না।"

ফুল আর কিছু না বলিয়া আহারের পর তাহার গৃহে গমন করিল, মাও তাহার সঙ্গ লইলেন। লজ্জাবতীকে দেখিয়া শাশুড়ীর জ্ঞান জন্মিল যে, সে সত্যই পীড়িত। ফুল তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল, "উঃ! আগুন যে! বৌ শীতে কাঁপছে, নেপটা আবার গেল কোথা? কাল ত বৌয়ের বিছানায় মোটেই নেপ ছিল না—সারা রাত শীতে সারা হয়ে আসলে এ অসুখটা হয়েছে।"

শাশুড়ী বলিলেন, "বড় মানষের ঝি! একটা নেপ দিয়েছিলুম তা ফেরস্ত দেওয়া হয়েছে। গেরস্থঘর এক দিন কি নিজের ভাল নেপটা নইলে চলে না! না হয় ননদকেই গায়ে দিতে দিয়েছিলুম—তার জন্যে একেবারে অসুখ বাধান!"

লজ্জাবতী জানিতই না যে শাশুড়ী তাহার লেপের পরিবর্ত্তে অন্য লেপ তাহাকে দিয়াছেন। সুতরাং সকালে রন্ধন-গৃহে যাইবার সময় বিছানা তুলিতে গিয়া ছেঁড়া লেপখানা দেখিয়া ভাবিল, দাসী লেপটা বদল করিয়া আনিয়াছে—তাই পুঁটুরাণীকে দিয়া লেপটা ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিল। ফুল বলিল, "সে যা হোক, এখন একটা নেপ পাঠিয়ে দেও দেখি!" শাশুড়ী চলিয়া গেলেন। ফুল লজ্জাবতীর সেই করুণ কাতর মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কেন আমি জোর করে রাঁধলুম না, তাহলে ত তোর অসুখ হোত না!"

লজ্জাবতীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,—সে বলিল, "না আমার রেঁধে অসুখ করেনি। বল দিদি, তোমার আর রাগ নেই—তুমিও ভাই আমার উপর রাগ করলে!"

ফুলকুমারী কাঁদিয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল, "আর আমি কখনো রাগ করব না—বল ভাই, তুই কিছু মনে করবি নে!"

লজ্জাবতী কোন কথা কহিল না, তাহার মাথা ফুলের বুকে রাখিয়া গভীর প্রশান্তসুখে সে কাঁদিতে লাগিল। প্রাণে প্রাণে এক হইয়া, দুজনে অশ্রুজলে অশ্রুজল মিলাইল!

বুঝিবা লজ্জাবতীর কাঁদিবার সাধ মিটিল! ইহার পর আর সে কাঁদিল না,—স্বামী যে কথা দিয়াছিল, ফুল যে কথা দিয়াছিল তাহা ঠিক রহিল—

আর লজ্জাবতীকে তাঁহাদের বকিতে হইল না!—কয়েক দিনের মধ্যেই লজ্জাবতী রোগ-শয্যা হইতে একেবারে চিতা-শয্যায় শয়ন করিল।

শাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আহা গেলো গো—নিজের দোষে প্রাণটা খোয়ালে! রাগ করে নেপটা গায়ে দিলে না গো। রাগ করে বল্লে না যে অসুখ করেছিল।"

দাসী, চাকর, যা, সকলেই এই এক ধূয়া ধরিয়া কাঁদিলেন,—কেবল একটি গভীর শোকক্লিষ্ট, অনুতপ্ত হৃদয় তাহাদের সঙ্গে যোগ না দিয়া নির্জ্জনে মর্ম্মান্তিক দুঃখের অশ্রু বর্ষণ করিয়া মনে মনে কহিল,—"হায় হায়, কি করিলাম! কেন তাহার উপর রাগ করিয়াছিলাম। বুঝিবা সে ঐ অভিমানেই গেল—বুঝি আমিই তাকে মারিলাম! একবার মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া এস দিদি—একবার প্রাণ ভরিয়া আদর করিয়া লই,—আদরের ভিখারিণি, তোমাকে কেহ আদর করে নাই, আমিও করিলাম না; জীবনে এ দুঃখ শেলের মত মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়া থাকিবে।"

নবকাহিনী ও অন্যান্য গল্প

দুই বন্ধু

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

তবে আরম্ভ করি?—আমার সেই দুঃখময়ী আখ্যায়িকা—দুই বন্ধুর কথা আরম্ভ করি?—তোমরা সকলে মন দিয়া শুন।

প্রভাতের বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছে, কিন্তু এখনও সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব আছে। প্রকৃতি যেন এখনও সুষুপ্ত, কিন্তু পক্ষীগণের মধুর কলরব ধীরে ধীরে সেই সুষুপ্ত প্রকৃতির ঘুম ভাঙ্গাইতেছে। দিবসের এই প্রথমাংশ বড়ই মধুর। প্রভাত সমীরণের সুখস্পর্শে সকলেরই হৃদয় স্নিগ্ধ হয়—সকলেরই মন নবোৎসাহে মাতিয়া উঠে। কিন্তু প্রভাতের সেই স্নিগ্ধতা ও উৎসাহ মধ্যাহ্নে থাকে না, সুতরাং হৃদয় ও মনের সুখের অবস্থা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। সংসারের গতিই এই!

দেখিতে দেখিতে বাঘাণ্ডা গ্রামের রাস্তা দিয়া দুই একজন লোক চলিতে আরম্ভ করিল, এখন যেন গ্রামখানি সজীব হইতে লাগিল। তখন ধীরে ধীরে সেই পক্ষীগণের মধুর কলরবের সহিত কর্কশ মনুষ্যকণ্ঠরব মিশিতে লাগিল। মধুর ও কর্কশের মিলনে এক অপূর্ব্ব স্বর জমিয়া গেল। তখনও প্রকৃতি অনেকটা নীরব, প্রকৃতির অল্প অল্প চেতনা হইতেছে মাত্র। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ জীবন্তভাব দেখা যায় নাই। এমন সময় একটি সপ্তম বৎসরের বালক ঐ গ্রামের এক গৃহস্থের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"সমর—সমর—এখনও ঘুম!"

তৎক্ষণাৎ এক অষ্টম বৎসরের বালক গৃহমধ্য হইতে বাহির হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"কে ও অমর, তুমি ভাই আজ এত সকাল সকাল উঠিয়াছ যে?"

দুই জনে তখন হাত ধরাধরি করিয়া গৃহের বাহিরে আসিল। সমর অমরকে পাইয়া আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে চলিল—এবং অনেক প্রাণের কথা বলিতে লাগিল। কিন্তু অমর আজ যেন কিছু বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক, পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণ খুলিয়া মন খুলিয়া অমরের সহিত কথা কহিতেছিল না। সমর তাহা বুঝিল। একবার অমরের মুখের দিকে চাহিল, তাহার আজিকার সেই বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া সমরের হৃদয় ব্যথিত হইল। সমর ব্যথিত হৃদয়ে বলিল—"অমর, তোমার মুখ আজ শুষ্ক কেন ভাই?"

কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে সমরের চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রুজল দেখা গেল। ধীরে ধীরে অমর সেই চক্ষের জল মুছাইয়া দিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিল। তাহার পর, অমর বলিল—"তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—চল আমরা বাগানে যাই।"

কথা কয়েকটি বলিয়া অমর সমরের হাত ধরিয়া টানিল। সমর আর কোন কথা বলিল না। তখন উভয়েই নীরবে সম্মুখস্থ উদ্যানে প্রবেশ করিল। উদ্যানের মধ্যে এক অতি দীর্ঘ পুষ্করিণী ছিল, তাহার সোপানে উভয়ে গিয়া বসিল। তখনও প্রভাতের বায়ু সেই পুকুরের জল সঞ্চালিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা তুলিতেছিল; আর পুষ্পে পুষ্পে সৌগন্ধ চুরি করিয়া চারিদিকে ছড়াইতেছিল।

সমর বলিল, "অনেক কথা—কি অমর?"

অমর বিষণ্ণমনে বলিল—"আমাকে লইয়া যাইতে মামার বাড়ি হইতে লোক আসিয়াছে।"

সমর। "এই তোমার অনেক কথা!"

অমর। "আমি যাইব না।"

সমর। "কেন?"

অমর। "আমার মন কেমন করিবে যে।"

সমর। "কাহার জন্য অমর?"

অমর। "তোমার জন্য, সমর।"

সমর তখন আর কোন প্রশ্ন করিল না; কিন্তু অনেক ক্ষণ অমরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"না অমর, তোমার গিয়া কাজ নাই।"

অমর। "আমি না যাইলে কিন্তু বাবা রাগ করিবেন।"

সমর। "তবে তুমি যাও।"

অমর। "তুমি আমার সঙ্গে যাইবে বল।"

সমর আবার নীরব হইল, কিছুক্ষণ পরে বলিল—"আমি তবে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি?"

অমর বলিল, "যাও।"

সমর তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া গৃহে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বিষণ্ণ মনে অমরের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। অমর সমরের মুখের প্রতি চাহিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"মার মত হইয়াছে?"

সমর অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "না।"

অমর আর কথা কহিল না। কিন্তু সমর অমরের দিকে চাহিয়া দেখিল যে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। এবার সমর ধীরে ধীরে অমরের চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "অমর, তুমি আমায় এত ভালোবাসো!"

অমর। "না, আমি তোমায় ভালোবাসি নে, ভালোবাসিলে যে ভালো কাপড়, জুতা খেলনা এই সব কিনে দিতে হয়। আমি তোমায় কি দিতে পারি ভাই? তবে তোমায় না দেখিলে আমার মন বড়ই কেমন করে; ইচ্ছা হয়, তুমি যেখানে সেখানে এক দৌড়ে ছুটিয়া যাই।"

সমর। "আমারও তোমার জন্য বড়ই মন কেমন করে। আমি ভাই,

মনে করি, আমরা কখনও ছাড়াছাড়ি হইব না। আচ্ছা, আমারও মামার বাড়ি আছে, যাইব না, তুমি তোমার মামার বাড়ি কেন যাবে, ভাই ?"

অমর। "আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না।"

সমর। "তোমার বাপ যদি মারে ?"

অমর। "মার খাব।"

এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"অমর !"

উভয়ে চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল যে অমরের পিতা উমানাথ। পিতাকে দেখিয়া অমরের প্রাণে ভয় হইল, সে তাড়াতাড়ি সমরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমরও কাঁদিতে লাগিল। উমানাথ গোপনে দাঁড়াইয়া ইহাদিগের অনেক কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন, দুইটি বালকের এইরূপ অকৃত্রিম প্রণয়ের দৃশ্য দেখিয়া তিনিও মোহিত হইয়াছিলেন, এখন উভয়কে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"না অমর, তোমার মামার বাড়ি আর যাইতে হইবে না।"

উমানাথ চলিয়া গেলেন। বালকদ্বয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তখন উভয়ে মনের আনন্দে বাগানে গিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর দুই জনে মিলিয়া নানাজাতীয় ফুল তুলিয়া দু-ছড়া মালা গাঁথিল। তখন সেই মালা উভয়ে উভয়ের গলায় পরাইয়া দিয়া উভয়েই বিপুল আনন্দ উপভোগ করিল।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর প্রায় দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসরের মধ্যে জগতের যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু আমাদের সেই সমরেন্দ্র আর অমরেন্দ্র এই দুই বন্ধুর প্রণয়ের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাঘাণ্ডা গ্রামে আরও অনেক বালক ছিল, কিন্তু অমরেন্দ্র আর সমরেন্দ্র আর কাহার সহিত খেলা করিত না এবং আর কাহার সহিত কোন সংস্রব রাখিত না। গ্রামের বালকেরা সুর করিয়া সকলেই বলিত,—'যেখানে সমর, সেইখানে অমর, আর যেখানে অমর, সেইখানেই সমর।' অমরের মাতা বর্ত্তমান নাই কিন্তু সমরের মাতা জীবিতা ছিলেন, পিতা বর্ত্তমান ছিলেন না। অমর সমরের জননীর নিকট মাতৃস্নেহ পাইত, সমর অমরের পিতার নিকট পিতৃ-আদর পাইত। উভয়ের

কিছুরই অভাব ছিল না, অভাব কাহাকে বলে, উভয়ে কেহই জানিত না। একত্রে শয়ন, একত্রে অধ্যয়ন এইরূপে দশ বৎসর কাটিয়া গেল, এক দিনের জন্য কেহ কাহারও মনে কোনরূপ কষ্ট দেয় নাই।

একদিন বৈকালে দুই জনে সেই বাগানে বেড়াইতেছে, দুই চারিটি অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর সমর বলিল—"ভাই অমর, আজ তোমায় একটা শুভ সংবাদ দিব।"

অমর আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ ভাই ?"

সমর। "আমার বিবাহ।"

অমর। "মিথ্যা কথা!"

সমর। "না অমর, সত্য ; এই ত্রিশে আষাঢ় দিন ধার্য্য হইয়া গিয়াছে।"

এইবার অমর প্রাণের ভিতর এক অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল—মুখও বিবর্ণ হইল। সমর চাহিয়া দেখিল যে অমরের চক্ষে আর সে জ্যোতিঃ নাই।

ব্যথিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে অমর বলিল, "তোমার এ বিবাহ কেন সমর ?"

সমর। "বিবাহ সকলেই করে তোমাকেও করিতে হইবে।"

অমর। "না—আমি বিবাহ করিব না।"

সমর। "কেন ?"

অমর। "বিবাহ করিলে আমাদের এরূপ প্রণয় আর থাকিবে না।"

সমর হাসিয়া বলিল, "ছি অমর, এ কথা তোমার ভুল।"

অমর এইবার করুণস্বরে বলিল—"কিসে ভুল সমর? আমি তোমায় ভালোবাসিয়াছি, এ পৃথিবীতে আর কাহাকেও ভালোবাসিতে পারিব না—তবে বিবাহ করিব কেন ?"

সমর। "বিবাহ করিলে কি কখন বন্ধু যায় ? সকলই তো বিবাহ করে, তাহাদের কাহার কি বন্ধু নাই ?"

অমর। "তাহাদের কিরূপ বন্ধু আছে, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাহাদের প্রকৃত বন্ধু নাই।"

সমর পুনরায় হাসিয়া বলিল—"তোমার সকলই ভুল। হৃদয়ের যতটুকু অংশ স্ত্রীর প্রাপ্য, সেই অংশ স্ত্রীকে দিব—বেশী দিব না। আর যে অংশ বন্ধুর প্রাপ্য সে অংশ বন্ধুকে দিব, তাহা আর কাহাকে দিব কেন ?"

অমর। "হৃদয়ের মধ্যেও ভাগাভাগি! আমার বিশ্বাস হৃদয় এরূপে ভাগ করা যায় না।"

সমর। "এও তোমার ভুল।"

অমর আর কথা কহিল না। অনেকক্ষণ সমরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পূর্ব্বে অমর সে মুখ দেখিয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিত, এখনও সেইরূপ করিল। সুতরাং অমর হৃদয়ে প্রথম আজ যে ব্যথা পাইল, সমরের মুখ দেখিয়া তাহা ভুলিল।

বাস্তবিকই ৩০শে আষাঢ় সমরের বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছিল। সমরের বিধবা জননী পুত্রবধূমুখ দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া তাঁহারই পিত্রালয়ের সন্নিকটে নিজেই একটি পাত্রী স্থির করেন। জননীর অনুরোধেই হউক, কিম্বা নিজের বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকা প্রযুক্তই হউক, সমর এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি করে নাই।

আজ ২৮শে আষাঢ় সমরের গাত্রহরিদ্রা। সমরের জননী আত্মীয়স্বজন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সমরের গৃহ আনন্দ ও উৎসবে পরিপূর্ণ। সকলেই আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন; আজও সমর ও অমর উভয়ে সর্ব্বদা একত্রে রহিয়াছে, এক মুহূর্ত্তের জন্য কেহ কাহার কাছছাড়া নহে। উভয়েরই মুখ প্রফুল্ল—সমরের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া অমরেরও মুখ প্রফুল্ল হইয়াছে।

আজ ৩০শে আষাঢ় সমরের বিবাহ। প্রাতঃকাল হইতেই আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী সকলে সমরের গৃহে আসিয়া জমিতে লাগিল। আহারান্তে বেলা দুইটার সময় মহা ধুমধামের সহিত বর ও বরযাত্র সকলে চলিলেন। সমর ও অমর একত্রে একসঙ্গে চলিল। চারি ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলে কন্যাকর্ত্তার বাড়ি আসিয়া পৌছিল। যথাসময়ে শুভক্ষণে গোধূলি লগ্নে পরিণয় হইয়া গেল। সে রাত্রেও অমর যতক্ষণ না বাহিরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমর তাহাকে ছাড়িয়া বাসর ঘরে আসিতে পারে নাই। পরদিন প্রভাতে সকলে মহা আনন্দে ও উৎসবে বরকন্যা লইয়া বাঘাণ্ডা গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

আজ ২রা শ্রাবণ সমরের ফুলশয্যা। এতকাল সমর ও অমর একত্রে

এক শয্যায় শয়ন করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজ আর তাহা হইল না। সন্ধ্যার পর হইতে অমরের মুখের সে প্রফুল্লতা আজ কি জানি কেন আর দেখা গেল না। সমরেরও মন আজ সেরূপ আনন্দিত ও উৎসাহিত নহে। অতি প্রত্যুষে সমর অমরের শয়নগৃহে গিয়া ডাকিল—"অমর।"

অমর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। অমরের মলিন মুখ ও রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া সমর বিস্মিত হইল। সে রাত্রে অমর এক মুহূর্তের জন্যও নিদ্রা যায় নাই। সে দৃশ্য দেখিয়া সমরের প্রাণ আকুল হইল—সমর ধীরে ধীরে অমরের শয্যায় গিয়া উপবেশন করিল। হঠাৎ বালিশে হাত পড়িল। সমর শিহরিয়া উঠিল—দেখিল অমরের বালিশ ভিজা।

"শৈল, তুমি কি আমায় ভালোবাস না?"

একবিংশতি বৎসরের যুবক অতৃপ্তলোচনে এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া উৎসুক হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"শৈল, তুমি কি আমায় ভালোবাস না।"

বালিকা লজ্জায় জড়সড় হইয়া আকুঞ্চিত দেহে মস্তক নত করিয়া রহিল। যুবকের সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। যুবক বড়ই অস্থির—যেন সেই প্রশ্নের উত্তরের উপর তাহার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

পুনরায় প্রশ্ন হইল—"শৈল, আমার মাথার দিব্য, আমায় ভালোবাস কি না বল।"

বালিকা এইবার অতি ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল—"বাসি।"

কিন্তু এই ক্ষুদ্র "বাসি" কথায় যুবকের তৃপ্তিলাভ হইল না। যুবক বলিল—"আমার সহিত এরূপ ব্যবহার কর কেন শৈল? মাথা তুলিয়া কথা কহ না। আমি তোমার মুখখানি দেখিতে পাই না যে। তোমার মুখ দেখিলে এ পৃথিবীর আর কোন সুন্দর বস্তু দেখিতে আমার ইচ্ছা করে না। তোমার কথা শুনিলে স্বর্গীয় অপ্সরাদিগের গীতও আমার শুনিবার ইচ্ছা থাকে না। একবার মাথা তোল।"

এই কথা বলিতে বলিতে যুবক স্বহস্তে বালিকার নতশির সোজা করিয়া দিল। যুবক তখন প্রাণ ভরিয়া বালিকার সেই সুন্দর মুখখানি দেখিতে লাগিল। কিন্তু সেই মুখখানি দেখিয়াও যুবক সম্পূর্ণ সুস্থির হইতে পারিল না,

কারণ বালিকার চক্ষু মুদ্রিত ছিল। যুবক আগ্রহের সহিত বলিল, "শৈল, একবার চাও, আমার দিকে চাও।"

বালিকা চক্ষু চাহিবার চেষ্টা করিল—চক্ষুর পাতা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; কিন্তু বালিকা চাই চাই করিয়া আর চাহিতে পারিল না। চাহিতে পারিল না বটে, কিন্তু সেই সময় বালিকার সেই ক্ষুদ্র মুখখানিতে যে সৌন্দর্য্যের ক্ষণপ্রভা খেলা করিয়া গেল—তাহা বর্ণনাতীত। অঙ্কুরিত প্রণয়ের অস্পষ্ট সৌন্দর্য্যকণায় আমাদের মন যেরূপ মোহিত হইয়া যায়, বর্দ্ধিত প্রণয়ের সৌন্দর্য্যরাশিও আমাদের মনকে সেরূপ মোহিত করিতে পারে না। এই প্রস্ফুটিতোন্মুখ প্রণয়ের মধ্যে যেরূপ নির্ম্মল পবিত্র স্বর্গীয় ভাব আমরা দেখিতে পাই, এরূপ আর কোথাও আছে কি? যুবক মুহূর্ত্তের জন্য সেই অস্পষ্ট সৌন্দর্য্যকণা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল! হৃদয়ের বেগ স্থির করিতে পারিল না। বারম্বার বালিকার মুখ চুম্বন করিল।

পরে অনেক সাধ্যসাধনার পর বালিকা ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল। আবার যুবকের অনুরোধে চাহিল, আবার মুদিল। এইরূপ অনেকক্ষণ অভ্যাসের পর বালিকা সলাজে আড়ে আড়ে যুবার প্রতি চাহিতে আরম্ভ করিল। আ মরি! মরি! কি সুন্দর চাহনি রে! স্বর্গীয় কোন পদার্থ যদি এ কলঙ্কিত পৃথিবীতে থাকে, তবে ঐ চাহনিতেই তাহা আছে। যুবক মোহিত হইয়া তখন মনে মনে এই কথাই ভাবিতেছিল। ক্রমে ক্রমে যুবকের সকল সাধ মিটিতেছিল। হঠাৎ কি মনে পড়িল, যুবক ধীরে ধীরে বালিকার চিবুক ধরিয়া বলিল—"শৈল, এইবার একবার তুমি হাসো, একবার মাত্র তোমার ঐ হাসিমুখ দেখিবার জন্য আমি হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারি।"

বালিকা তৎক্ষণাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু তখনি হঠাৎ কি জানি কেন পুনরায় সেই ক্ষুদ্র দেহখানি অধিকতর আকুঞ্চিত হইয়া গেল, ঠিক যেন লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিবার পরিবর্ত্তে আঘাত করা হইল। বালিকা পুনরায় মস্তক নত করিয়া জড়সড় হইল। যুবক এইবার সাহস করিয়া বলিল, —"ছি শৈল! তুমি আমায় ভালোবাস না?"

কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে যুবক শৈলকে আপনার কোলের দিকে টানিল। বালিকা তাড়াতাড়ি যুবকের বক্ষে মুখ লুকাইল। কিন্তু একি! অকস্মাৎ যুবক বিস্মিত নেত্রে দেখিল, বালিকার চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃস্থল

ভাসিয়া যাইতেছে। যুবকের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। এ কি শৈলের চক্ষে জল? যুবকের সে দৃশ্য অসহ্য হইল। যুবক ব্যথিতহৃদয়ে বলিল, "শৈল, তুমি কি কাঁদিতেছ?"

বালিকার উত্তর নাই!

পুনরায় প্রশ্ন হইল—"শৈল, কেন কাঁদ, বল না।"

এবারও বালিকা নিরুত্তর!

যুবক পুনরায় আগ্রহের সহিত বলিল—"আমার কথার উত্তর দিবে না? কেন কাঁদ? বল—বল—বল।"

বালিকা এবারও নিরুত্তর, কিন্তু এখন তাহার কান্না আর ছিল না, বালিকা তখন দুই হস্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল। যুবক বুঝিল যে তাহার দুইটি কথা বালিকার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে। যুবক এইবার শৈলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"না শৈল, তুমি আমায় যথার্থই ভালোবাস। কিন্তু আমার সহিত ভালো করিয়া কথা কহ না কেন?"

শৈল এইবার ধীরে ধীরে বলিল, "আমার লজ্জা করে যে।"

যুবক সে কথা শুনিয়া মোহিত হইয়া পুনরায় বালিকার মুখচুম্বন করিল।

এই সময় কে বাহির হইতে ডাকিল, "সমর"।

যুবক চমকিয়া উঠিল, হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেরূপ হয়, যুবকের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইল। পুনরায় বাহির হইতে কে ডাকিল—"সমর, একবার, বাহিরে এস ভাই—সমর।"

সমর এইবার আর স্থির থাকিতে পারিল না, বলিল—"একবার বাহিরে যাই?"

শৈল। "না।"

সমর। "এখনি আসিব—একবার যাই?"

শৈল। "না—এখন যাওয়া হইবে না।"

পুনরায় বাহির হইতে আগ্রহসূচক স্বরে শোনা গেল—"সমর, একবার এস-না ভাই।"

সমর এইবার একটু চঞ্চল হইয়া বলিল—"অমর ডাকিতেছে, এক মুহূর্তের জন্য ছাড়িয়া দাও।"

বালিকা সেই সলজ্জ অর্দ্ধবিস্ফারিত চক্ষু সমরের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল—"ডাকুক অমর, এখন ছাড়িয়া দিব না।"

পুনরায় বাহির হইতে অমর ডাকিয়া বলিল—"ভাই সমর, একবার আসিলে না?" এই "একবার আসিলে না" কথা কয়েকটি অমরের হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে বাহির হইতেছিল, তাহার কথা অস্পষ্ট, স্বর করুণরসোদ্দীপক। পূর্ব্বে অমরের মুখে এরূপ স্বরে এরূপ কথা শুনিলে সমর পাগলের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়াইত। কিন্তু আজ সমর স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, একবিন্দুও অশ্রু তাহার চক্ষে দেখা গেল না। অমর আর একবার সমরকে ডাকিয়া কি কথা কহিয়াছিল, কিন্তু রুদ্ধকণ্ঠের সে কথা কেহ শুনিতে পাইল না, তাহা বাতাসে মিশাইয়া গেল!

পরদিন বৈকালে সেই পূর্ব্ববর্ণিত উদ্যানে সমরের সহিত অমরের সাক্ষাৎ হইল। অমরের মুখ বড়ই বিষণ্ণ, কারণ পূর্ব্বদিনে অমর তাহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইয়াছিল। দূর হইতে অমরকে দেখিয়া সমর আপনার নিকটে ডাকিল। অমর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে সমরের নিকট আসিল। সমরও নীরবে অমরের হাত ধরিয়া লইয়া সেই পুষ্করিণীর সোপানোপরি গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীবব; কাহারও মুখে একটিও কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না। উভয়েই বিষণ্নমনে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার পর অমর প্রথমে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—"ভাই সমর, আজ তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ না কেন?"

সমর। "কি কথা কহিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তুমি কথা কহ না, ভাই।"

অমর। "সমর, পূর্ব্বে আমাদের কথা কহিয়া শেষ হইত না, আর আজ ভাই, তুমি কথা খুঁজিয়া পাইতেছ না!"

এই কথা কয়েকটি বলিতে অমরের হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। আর তাহার সেই সকরুণ স্বর সমরের হৃদয়েও কতক আঘাত করিয়াছিল। সমর তখন সে কথা চাপা দিয়া বলিল—"আজ সমস্ত দিন তোমায় দেখি নাই কেন, অমর?"

অমর। "আমায় না দেখিলে কি এখন তোমার মনে কষ্ট হয়, সমর?"

সময় অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর যেন পূর্ব্বাপেক্ষা বিষণ্ণভাবে বলিল—"অমর, কালিকার ঘটনায় তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়াছি।"

অমর। "কালিকার কথা থাক্‌, আজ তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার যথার্থ উত্তর দিবে কি ?"

সমর। "কি কথা অমর ?"

অমর। "পূর্ব্বের কথা একবার স্মরণ করিয়া বল দেখি ভাই সমর, তুমি আমায় এখন পূর্ব্বের ন্যায় ভালোবাস কি না ?"

পুনরায় অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া সমর বলিল—"না।"

অমর বিস্মিত নেত্রে সমরের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল! এই "না" কথাটা যেন অমরের হৃদয়ে সজোরে আঘাত করিল! তাহার পর এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সমর, একদিন এই উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে কি বলিয়াছিলে একবার মনে করিয়া দেখ দেখি। ইহারই মধ্যে আমাদের সেই অকৃত্রিম বন্ধুত্বের কি পরিণাম হইল, এখন বুঝিতে পারিয়াছ কি ? এখন বল দেখি সমর, ভুল কাহার ?"

সমর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"ভুল আমারই। আমি তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিতে পারিব না। আমি পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর তোমায় ভালোবাসি না, অনেক চেষ্টাও করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোনক্রমেও তাহা পারি না। শৈল এখন আমার সমস্ত হৃদয়ই অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। হৃদয়ের যে অংশ তোমায় বিক্রয় করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি শৈল তাহা চুরি করিয়া লইয়াছে। আমার হৃদয়ের যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা স্বপ্নেও আমি কখন ভাবি নাই।"

সমর আবার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এইসময় হঠাৎ একবার অমরের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া সমর শিহরিয়া উঠিল, সমরের মুখে আর কথা বাহির হইল না। সমর দেখিল, হঠাৎ অমরের মুখ এরূপ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে যে অমরকে আর চেনা যায় না। সমর আগ্রহের সহিত বলিল—"অমর, তোমার মুখ হঠাৎ এমন হল কেন ?"

অমর আর কথা কহিল না, কেবল সতৃষ্ণনয়নে একবার সমরের মুখের

প্রতি চাহিল। কিন্তু সমর সে চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিল না। অমরের এখন ইহাই অধিকতর কষ্টের কারণ।

সমর বলিল—"অমর, চুপ করিয়া রহিলে যে!"

অমর। "ভাই, তোমায় আর কি উত্তর দিব? তুমি কি এখন আর আমার কথা বুঝিতে পারিবে?"

সমর তখন নীরব হইয়া রহিল। অমর কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এখন আমি চলিলাম, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও।"

অমর। "আবার কবে দেখা হইবে?"

এতক্ষণ পরে এইবার অমরের চক্ষে অশ্রুজল দেখা গেল। ধীরে ধীরে সে অশ্রুজল মুছিয়া অমর বলিল—"যখন তুমি আমায় না দেখিলে কষ্ট বোধ করিবে।"

অমর আর দাঁড়াইল না, দ্রুতবেগে সেখান হইতে চলিয়া গেল। সমর অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

অমর উদ্যান হইতে বাহির হইয়া গৃহের দিকে চলিল, কিন্তু গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়াই আর গৃহে যাইতে তাহার পা উঠিল না। অমর অন্য দিকে ফিরিল। অমর হৃদয়ের মধ্যে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, তাহা বর্ণনা করা আমাদের সাধ্য নহে। অমর যে কোথায় চলিয়াছে, অমরও তাহা জানে না, কি জানি কেন লোকালয়ে থাকিতে অমরের এখন আর ইচ্ছা নাই। দেখিতে দেখিতে অমর গ্রাম পার হইয়া এক বিস্তৃত মাঠে আসিয়া পৌছিল। তখন অমরের একবার চৈতন্য হইল, অমর সে স্থান নির্জ্জন দেখিয়া সেইখানেই বসিল। বসিয়া একমনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু অধিকক্ষণ অমর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না।

অমর আজ আর স্থির নহে। তাহার স্বভাব এক ঘণ্টার মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। অমর সেই মাঠের মধ্যে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু চলিয়াও তাহার হৃদয়ের যন্ত্রণা হ্রাস হয় না। অমর দৌড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দৌড়িয়াও সে যন্ত্রণা কমে না। তখন অমর পুনরায় একস্থানে স্থির হইয়া বসিল। এইবার বসিলেই অমরের চক্ষে জল দেখা গেল, অমর অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। সে কান্নাও আর থামে না,

অমরেরও কাঁদিয়া আশা মেটে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অমরের হৃদয় অনেকটা স্থির হইল—যেন হৃদয়ের উপরের একটা ভারি বোঝা এখন কতকটা নামিয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া অমর ধীরে ধীরে বিষণ্ণমনে গৃহে ফিরিল।

গৃহে আসিয়া অমরের যন্ত্রণা আবার বৃদ্ধি হইল। অমর যে দিকে চাহিয়া দেখে যেন সেই দিকেই সমরকে দেখিতে পায়। গৃহের মধ্যে বাল্যকালের দুই একটা খেলনা দেখিয়া অমরের বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ঐ সমরের ফটোগ্রাফ সম্মুখে ঝুলিতেছে, এখন তাহা দেখিয়া অমরের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। ঐ পুস্তকখানি সমর তাহাকে উপহার দিয়াছে, ঐ সমরের হস্তাক্ষরে অমরের নাম লেখা রহিয়াছে—অমর গৃহের যে দিকে চায়, যেন মূর্ত্তিমান সমরকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পায়, কিন্তু সে সমরকে দেখিয়া আজ তাহার হৃদয়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষাদেব তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। অমর তাড়াতাড়ি গৃহের আলো নিবাইয়া দিয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। কিন্তু আজ তাহার শয্যা কেন কণ্টকময়, অমর অনেকক্ষণ সেই শয্যায় পড়িয়া ছটফট্ করিল, তাহাব পর কি মনে করিয়া অমর শয্যা ত্যাগ করিয়া পুনরায় আলো জ্বালিল। আলো জ্বালিয়া অমর সেই বাল্যকালের খেলনা চূর্ণ করিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। সমরের ফটো এবং উপহার পুস্তকাদি সমস্তই অগ্নিতে ভস্মীভূত করিল, সমরের কোনরূপ চিহ্নমাত্রও সে গৃহে রাখিল না।

অমর পুনরায় শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল, কিন্তু তাহাতেও তাহার সে যন্ত্রণার হ্রাস হইল না। অমর কি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিল, তাহার পর অনেকক্ষণ সেই গৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া অমব কাঁদিল। রাত্রি প্রভাত হইবাব পূর্ব্বেই কাঁদিতে কাঁদিতে অমর সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। গত বৎসব অমরের পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, সুতরাং এক সমর ভিন্ন অমরের বিশেষ অনুসন্ধান আর কেহ লইল না; কিন্তু সমরও অমরের কোন সন্ধান করিতে পারিল না।

চারি দিকে অলঙ্ঘনীয় হিমালয় পর্ব্বতের শাখাপ্রশাখাবেষ্টিত একটি সুন্দব উপত্যকাভূমি। সে পর্ব্বতশ্রেণী বিস্তৃতে যেন অনন্ত, যেন তাহার আদি নাই, সীমা নাই, অন্ত নাই। আকার দীর্ঘ। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত তাহার উপব

পর্ব্বত, এইরূপে অনন্ত পর্ব্বত সেই অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া গম্ভীর মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে দৃশ্য দেখিলে গাম্ভীর্য্যে হৃদয় পুরিয়া যায়। এবং কোথা হইতে এক মহান ভাব হৃদয়ের মধ্যে উত্থিত হইয়া সঙ্কীর্ণ মনকে উন্নত করিয়া দেয়। এই দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখিলে সে মহান ভাব কল্পনায় টানিয়া আনা যায় না। পর্ব্বতের শিখরগুলি নিষ্কলঙ্ক শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত, দূর হইতে দেখিলেই বোধ হয় যেন শুভ্র মেঘপুঞ্জ আকাশপটে স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। পর্ব্বতের নিম্নদেশে নানাজাতীয় বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদি শোভা পাইতেছে। কোথাও বড় বড় বৃক্ষ সকল নানা বর্ণের নানা আকৃতির ফলে সুশোভিত। কোন স্থানে ঝুরঝুর স্বরে ঝরণা আসিয়া উপত্যকায় পড়িতেছে, কোন স্থানে পক্ষীগণের সুমধুর কণ্ঠরব চারিদিকে যেন সুধা বর্ষণ করিতেছে। প্রকৃতির এই মনোমোহিনী ছবি যিনি না দেখিয়াছেন, তাঁহার জন্মই বৃথা। নন্দনকানন-সদৃশ এই উপত্যকার এক স্থানে জটাজূটধারী এক যোগী ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, নিকটেই একজন যুবা বসিয়া বসিয়া তাঁহার সেই ধ্যানস্তিমিত চক্ষু এবং প্রশান্ত মুখকান্তির প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইল, যোগী যুবকের প্রতি এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন। যুবক শিহরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। তাহার পর যোগী গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"বৎস, আজ ছয় মাস তোমার পরীক্ষা কবিয়া দেখিলাম যে আজও তোমার চিত্ত স্থির হয় নাই, তুমি এ দুঃসাধ্য যোগব্রতে ব্রতী হইতে পারিবে না। তোমার মন অন্য বিষয়াসক্ত। তুমি কি অন্য কোন রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছ ?"

যুবক। "না গুরুদেব, আমি কোন রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ নই।"

যোগী। "তবে তোমার চিত্ত এখনও স্থির হইল না কেন ? কোন্ আত্মীয়ের জন্য তোমার মন এতদূর চঞ্চল হইয়াছে, বৎস ?"

যুবক অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিল, তাহার পর এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"গুরুদেব, জীবনের একমাত্র অবলম্বন আমার এক শৈশবের বন্ধুর কথা শত চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারিতেছি না ; তাহাকে ভুলিবার জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়াছি, স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছি, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়াছি, সমাজ ত্যাগ করিয়াছি, তাহার পর কত দেশ, কত নদনদী অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের এই রমণীয় উপত্যকায় আপনার ন্যায় গুরুর

শরণাগত হইয়াছি, তথাপি—তথাপি গুরো! আমার সেই বাল্যসুহৃদকে বিস্মৃত হইতে পারিলাম না। তাহার সেই পূর্ব্বস্মৃতি—যে স্মৃতি পূর্ব্বে আমার আনন্দের কারণ ছিল—এখন আমায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এ জন্মে তাহাকে ভুলিতেও পারিব না, পরজন্মের কথা জানি না কিন্তু পরজন্মেও যে তাহাকে ভুলিতে পারিব, এ বিশ্বাসও আমার মনে স্থান পাইতেছে না।"

ধীরে ধীরে যুবক আপনার জীবনের সমস্ত ঘটনা যোগীর চরণে নিবেদন করিয়া নীরব হইল। তখন ক্রমে ক্রমে তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। যুবক অন্য কেহ নহে, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অমর।

অমর যতক্ষণ এইসকল কথা বলিতেছিল, যোগী ততক্ষণ আশ্চর্য্য নেত্রে অমরের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সেই গম্ভীর প্রকৃতি মুহূর্ত্তমধ্যে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। যোগী প্রফুল্ল অন্তঃকরণে বলিলেন—"বৎস, আমি জানিতাম, রমণী ভিন্ন সংসারী পুরুষের মন আর কিছুতেই এতদূর প্রণয়াবদ্ধ হইতে পারে না; কিন্তু আজ তোমার নিকট যে অদ্ভুত কাহিনী শুনিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি। মনুষ্যহৃদয়ের এই গূঢ়তত্ত্ব আমি এতদিন জানিতাম না। যাও বৎস, তুমি পুনরায় সংসারে ফিরিয়া যাও; প্রণয়ের এরূপ নূতন চিত্র সংসারের কথা দূরে থাকুক স্বর্গেতেও দুর্ল্লভ। তোমার এইরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সংসারের মানুষ অনেক শিক্ষা করিতে পারিবে।"

অমর যোগীর চরণ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"গুরুদেব, অনুমতি করুন, আমি এখনি স্বদেশে চলিয়া যাই। আর আমি সেই বন্ধুর বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না। একবার তাহাকে ভালো করিয়া দেখিয়া আমার এই চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিব। তাহার পর পুনরায় আপনার চরণে শরণাগত হইব।"

হঠাৎ যোগী যেন অন্যমনস্ক হইলেন, তাঁহার সেই প্রফুল্লমূর্ত্তি পুনরায় গম্ভীর হইল। যোগী কি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ অমরকে বিদায় দিলেন।

যোগীর নিকট হইতে বিদায় হইয়াই অমরের যেন মন একটু প্রফুল্ল বোধ হইল। অমর দ্রুতবেগে সমরের উদ্দেশে চলিল। কিন্তু সমর কোথায়?—সমর বহুযোজন দূরে। যদি অমর তখন স্বল্পায়াসে সমরকে পাইত, তবে কি হইত জানি না। এখন কিন্তু সমরকে না পাইয়া অমরের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক বড়ই শোচনীয় হইল। অমর ক্রমে ক্রমে উন্মাদ হইল!

আজ অমর ও শৈলবালা বিষণ্ণমনে এক কক্ষ মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের এরূপ ভাবে বসিয়া থাকাটা শুভ লক্ষণ নহে। অনেকক্ষণের পর শৈলবালা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তা আমি কি জানি, সেই সামান্য ঘটনা হইতেই এতদূর হইবে, তা আমি কেমন করিয়া জানিব ?"

সমর শৈলবালাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"তোমার দোষ কি ? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।"

শৈল। "এখন তুমি যাও, একবার তাঁহাকে দেখিয়া আইস। শুনিলাম, জ্ঞানশূন্য বটে, কিন্তু এখনও তোমার নাম শুনিলে উদাসভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখেন।"

সমর। "অমর এতদিন পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, এ কথা শুনিয়াও তাহাকে দেখিতে যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। এখন কোন্ মুখে আমি অমরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব ? কে অমরকে পাগল করিয়াছে ? কাহার জন্য অমর জীবনের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল ? কাহার জন্য তাহার জীবনের এইরূপ শোকাবহ পরিণাম হইল ? শৈল, এই সকল কথা যখন আমার মনে হয় তখন আত্মঘাতী হইতে আমার ইচ্ছা হয় ! আমি কোন্ মুখে অমরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব ?"

সমরের কথা শুনিয়া শৈলবালার চক্ষু ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল। মুখখানি যেন প্রখর সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত কমলিনীর ন্যায় ম্লান হইল। সমর তাহা দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিল—"শৈল, তোমার কি দোষ ?"

শৈল বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুজল মুছিয়া বলিল—"আমারই সব দোষ।"

সমর বলিল, "না।"

শৈল বলিল, "হাঁ।"

তাহার পর উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। শেষে পুনরায় শৈলবালা বলিল—"যাও, আমার মাথার দিব্য, তুমি এখনি যাও। যদি না বুঝিয়া কোন দোষ করিয়া থাক, তবে কি তাহার প্রতিকার করিবে না ?"

শৈলবালার এই কথা শুনিয়া সমর কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল, তাহার পর তাহার সেই সরু সরু ঠোঁট দুইখানি আপনার ওষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিল—"তোমার এত গুণ না থাকিলে আমি অমরকে ভুলিয়া তোমায় এতদূর ভালোবাসিব কেন ?"

তাহার পর বিষণ্ণমনে ধীরে ধীরে সমর অমরকে দেখিতে গেল।

* * *

আর আমরা পারি না। এই আখ্যায়িকার শেষ অঙ্ক আর দেখাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু যখন আরম্ভ করিয়াছি তখন শেষ করিতেই হইবে। তাহা না করিলে পাঠকপাঠিকাগণ ছাড়িয়া দিবেন কেন? সুতরাং বাধ্য হইয়া আমরা এই আখ্যায়িকার শেষ অঙ্ক লিখিতে বসিলাম।

সমর যখন অমরকে দেখিতে আসিল তখন অমর আপন মনে কি বকিতেছিল, নিকটে তাহাব অনেক আত্মীয় বসিয়াছিল। তাহার সকল কথা শুনা যাইতেছিল না। সমর নীরবে অমরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রাণ আজ আকুল হইল; চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। অনেক কষ্টে সমর শুনিল, অমর বলিতেছে, "ভুল—ভুল—ভুল—সকলি ভুল।"

তাহার পর অমর একটা বিকট হাস্য করিয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ সে হাসি আবার থামিয়া গেল, অমর গান ধরিল—"মনে করি, ভুলে থাকি, ভোলা নাই যায় সখি।"

আবার সে গান থামিয়া গেল, অমর কাঁদিল, সে কান্নাও থামিয়া গেল। অমর পুনরায় গান ধরিল—"তাই তোমায় দেখা দিতে আসি নে।"

এই গানের এইটুকু শেষ করিয়াই অমর পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। এই সময় অমরের খুল্লতাত বলিলেন—"অমর, তোমার সমর আসিয়াছে।"

অমব বিকট হাস্য করিয়া বলিল—"সমর! সমর! সমর আমার কে?"

সমর দাঁড়াইয়াছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল।

খুল্লতাত বলিলেন—"তোমার বন্ধু সমর তোমায় দেখতে এসেছেন।"

অমর এইবার যেন রাগিল, তাহার সেই শীর্ণ দেহ রাগে যেন ফুলিয়া উঠিল। অমর বলিল—

"সমরে আর নাহি ডরি আমি,
যে ডবে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক তারে।"

সমর আর থাকিতে পারিল না, রুদ্ধকণ্ঠে সমর বলিল—"ভাই অমর, আমায় চিনিতে পারিলে না?"

সমরের কণ্ঠস্বর অমরের কর্ণে প্রবেশ করিল। অমর বসিয়াছিল উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ একটা তড়িতপ্রবাহ যেন ভীষণবেগে তাহার দেহের মধ্যে

প্রবেশ করিল। অমর চারি দিক একবার স্থির নেত্রে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর "সমর! সমর! সমর!" এই কথা বলিতে বলিতে সমরের কোলে লুটাইয়া পড়িল। তখন সমর ও অন্যান্য সকলেও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সমর অমরকে আপনক্রোড়ে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সকলের সে কান্না কিছুক্ষণ পরে থামিল। তখন সকলে বিস্মিত নেত্রে দেখিল—অমরের দেহ শক্ত হইয়া গিয়াছে; তাহাতে আর প্রাণ নাই!!

কিন্তু আমরা জানি—অমর মরে নাই, অমর স্বর্গে চলিয়া গিয়াছিল, আর সমর এ পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিল।

দুই বন্ধু

গৃ হি ণী রো গ

জলধর সেন

আফিস থেকে ফিরতে প্রত্যহই ছ'টা বাজে। আবার যে দিন কাজ চেপে পড়ে, সে দিন আটটা সাড়ে আটটাও হয়। যাঁ'রা নিম্ন কর্মচারী, তাঁ'রা বলেন, আফিসের বড়োবাবু, মাস গেলে চার শ' খানি টাকা পান—খাটবেন না? আমাদের যেমন দান, তেমনই দক্ষিণা; দশটা পাঁচটা কাঁসি বাজাই—চল্লিশ পঞ্চাশ যা' পাই, বহুৎ আচ্ছা!

এই ত গেল আফিসের কথা। বাড়ির অবস্থা আরও সঙ্গীন। সে কেমন শুনবেন?

এক দিন একটু সকাল সকাল অর্থাৎ অপরাহ্ণ সাড়ে ছ'টার সময় বাড়ি এসে দেখি, উপরে আমার শয়ন-ঘরে আমার গৃহিণী শুয়ে আছেন, মাথার উপরে হু হু ক'রে পাখা চল্‌ছে! বুড়ো ঝি শ্যামার মা গৃহিণীর পায়ের কাছে বসে আছে।

আমাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই শ্যামার মা অতি কর্কশ স্বরে ব'লে উঠল—"যা হ'ক, বাবুর ঘরে আসবার সময় হয়েছে, সে-ও ভালো।"

আমি এমন সুমিষ্ট সম্ভাষণের কোনো কারণ না বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে ? উনি শুয়ে রয়েছেন যে ? অসুখ—"

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই শ্যামার মা ঝংকার দিয়ে উঠল—"শুয়ে থাকবে না, কি নেচে বেড়াবে ? এই যে এত দিন থেকে বাছার আমার অসুখ, তা'র কি খোঁজ নেওয়া আছে ?"

শ্যামার মা অনেক দিনের ঝি। সে আমার স্ত্রীকে "মানুষ" করেছিল। তাহার পর তিনি যখন আমার গৃহিণী হয়ে এলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই ঝি-টিকেও ফাউ পাওয়া গিয়েছিল ; শ্যামার মা বল্‌তে গেলে, সেই থেকেই এ বাড়ির অভিভাবিকা,—তা'র উপরে কথা বলে, এমন সাহস কারু হয় না। আর হবেই বা কা'র ? বাড়িতে আমি, আর আমার স্ত্রী। একটি মেয়ে, তাকেও বছর দুই হ'ল তালতলার ঘোষেদের বাড়ি বিয়ে দিয়েছি ; সে সেখানে বেশ সুখে আছে। সুতরাং শ্যামার মা'র ক্ষমতা অব্যাহতই আছে।

শ্যামার মা যে গুরু চার্জ আমার উপর করল, তা' অস্বীকার ক'রে আরও গোলমাল না বাধিয়ে, আমি নিতান্ত ভালোমানুষের মতো বল্‌লাম, "এমন অসুখ, তা' আমাকে আফিসে খবর পাঠালেই আমি তখনই ছুটে আসতাম, এত দেরি হ'ত না।"

শ্যামার মা উত্তর দিল, "অসুখ কি আজই হয়েছে ? এই মাসখানেক ধ'রেই অসুখ। সেই যে বেলা ১১টার সময় দুটো ভাত মুখে দিয়ে—আহা, বাছার আমার কি সে খাওয়া আছে ? ঐ নামমাত্তর পাতের কাছে ব'সেই উঠে এসে সেই যে বিছানায় পড়ে, আর ৫টার আগে উঠতে পারে না। সেই ৫টার সময় কষ্ট ক'রে উঠে, তাই কি সাধ ক'রে ? শুয়ে থাকৃতে বল্‌লে বলে, 'না, না, বাবুর আসার সময় হ'ল। তাঁ'কে আমি না দেখলে কে দেখবে ?' বাবুর ত সে দিকে দিষ্টি কত ! বাছার আমার শরীরে কি পদাথ আছে !"

অসুখ যে কি এবং তাহা যে কেমন গুরু, শ্যামার মা'র এই সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার ত কোনো হদিশই পেলাম না। এত দিনের মধ্যে কোনো দিন কোনো কথা শুনতেও পাইনি, দেখতেও পাইনি। কিন্তু আজ যে প্রকার গুরু ব্যাপার, তা'তে সে কথা ত বলা যায় না। সুতরাং নিতান্ত বিনীতভাবে অপরাধ স্বীকার ক'রে যতখানি সহানুভূতি সংগ্রহ করা যেতে

পারে, তাই করে বল্‌লাম—"তাই ত, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। সেই গাধার খাটুনি খেটে সন্ধ্যার পর এসে আর কোনো দিকে চাইবার শক্তি থাকে না। তা'রই জন্য ওঁর অসুখ এমন বেড়ে উঠেছে। আমারই অমনোযোগে এমন হয়েছে। যাক্‌, সে কথা ব'লে দুঃখ ক'রে এখন আর কি হবে। আমি এখনই যাই, ললিত ডাক্তারকে ডেকে আনি।"

গৃহিণী এতক্ষণ নীরবই ছিলেন, ললিত ডাক্তারের নাম করতে যেন তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠলেন, মুখখানি যথাতিরিক্ত বিকৃত করে বল্‌লেন, "ললিত ডাক্তার কেন, শ্রীচরণ কম্পাউণ্ডারকে ডেকে আনলেই হবে। আমার যেমন পোড়া কপাল!"

এই নেও! চার শ' টাকা মাইনের আফিসের বড়ো বাবুর একমাত্র সহধর্মিণীর এমন দারুণ অসুখ, আর আমি কিনা ডাকতে চাইলাম পাড়ার ললিত ডাক্তারকে! যা'র মোটর দূরে থাক, গাড়ি-ঘোড়াও নেই, যে এক টাকার বেশি ভিজিট নেয় না, হয় ত পায়ও না, আমি কি না আমার মহামহিমময়ী গৃহিণীর চিকিৎসার জন্য তা'কে ডাকবার প্রস্তাব করলাম। কি ধৃষ্টতা আমার!

আমি তখন আমার নির্বুদ্ধিতার কৈফিয়ৎস্বরূপ বল্‌লাম, "আরে, ললিতকে কি আর চিকিৎসার জন্য ডাকতে চাইছি। তোমার যে রকম ভয়ানক অসুখ, তাতে বাড়িতে এক জন ডাক্তার সর্বদার জন্য রাখা দরকার। তাই তাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি এক জন বড়ো ডাক্তার আনতে চাচ্ছি। তোমার চিকিৎসা ললিতকে দিয়ে করাব—আমি কি পাগল হয়েছি?" মনে মনে কিন্তু যা' বল্‌লাম, তা' আর লিখে কাজ নেই।

কি আর করি? সেই সন্ধ্যাবেলাতেই আফিসের কাপড় না ছেড়েই এক জন ভালো ডাক্তারের খোঁজে বা'র হলাম, কিন্তু যাই কা'র কাছে? ডাক্তার নীলরতন সরকার কি বিধান রায়ের কাছে গিয়ে আমার গৃহিণীর এবংবিধ দারুণ অসুখের কথা বল্‌লে তাঁ'রা তখনই হয় আমাকে পাগল ব'লে তাড়িয়ে দেবেন, আর না হয়, দয়া-পরবশ হয়ে আমাকে পাগ্‌লা গারদে পাঠাবার জন্য পুলিসের জিম্মা করিয়ে দেবেন।

শেষে মনে পড়ল, ডাক্তার বোসের কথা। শুনেছি, তিনি না কি এই রকম রোগীর চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ত আমার তেমন আলাপ-

পরিচয় নেই। ছুই তিন বার বন্ধুদের বাড়িতে দেখা হয়েছিল মাত্র। তিনিও আমার নাম জানেন, আমিও তাঁর নাম জানি। পথে-ঘাটে দেখা হ'লে আজকালকার ভদ্রতাসংগত "নমস্কার মশাই" "ভালো ত" এই রকম মামুলী সম্ভাষণের অধিক কোনো কথা কোনো দিন হয় নি—ঘনিষ্ঠতা ত দূরের কথা। তবে অনেকের কাছে তাঁর প্রশংসা শুনেছি। ডাক্তারও বেশ নাম-ওয়ালা। স্থতরাং তাঁর কাছে যাওয়াই স্থির করলাম।

ডাক্তার বোসের বাড়ি আমার জানা ছিল। তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুন্‌লাম, তিনি বাড়িতেই আছেন। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করবার পরই ডাক্তারবাবু উপর থেকে নেমে এলেন এবং আমাকে দেখে সহাস্ত মুখে বল্‌লেন, "এই যে বিজয় বাবু! আস্থন, আমার বসবার ঘরে।"

তাঁর রোগী দেখবার ঘরের মধ্যে গিয়ে আমাকে বসিয়ে বললেন, "তা'র পর এ অসময়ে একেবারে আফিসের ড্রেসে এসে উপস্থিত, ব্যাপার কি ?"

আমি বল্‌লাম, "ব্যাপার কিছু সঙ্গীন না হ'লে কি এ সময় আপনাকে বিরক্ত করতে আসি? আপনার সময় হবে ত? সব কথা বলতে হয় ত দশ মিনিট লাগবে।"

ডাক্তার বল্‌লেন, "আমি এখন আর কোথাও বেরুব না, যথেষ্ট সময় আছে। কেউ 'ডিসটার্ব' না করে, ছুয়ারটা বন্ধ ক'রে দিই।" এই ব'লে তিনি ঘরের প্রবেশ-দ্বার বন্ধ ক'রে বিজলী বাতি ও পাখা খুলে দিলেন। তা'র পর বল্‌লেন, "এখন বলুন, আপনার ব্যাপারটা কি ?"

আমি বল্‌লাম—"আমার স্ত্রীর না কি ভয়ানক অস্থখ।"

ডাক্তার হেসে বল্‌লেন—" 'না কি' কথাটা ত বুঝতে পারলাম না বিজয় বাবু।"

আমি বল্‌লাম—"কি যে অস্থখ, তা আমি জানিনে। প্রত্যহ সাড়ে ৯টায় আফিসে যাই, সাড়ে ৬টা ৭টায় বাড়ি ফিরি। আমার স্ত্রীকে কোনো দিনই অস্থস্থ দেখিনে। আজ আঠারো বছর যেমন দেখে আসছি, তাই-ই দেখি। শরীরেও কোনো বৈলক্ষণ্য দেখিনে। বাড়িতে ছেলেপিলেও নেই যে, হাঙ্গামা পোয়াতে হয়। একটিমাত্র মেয়ে, তা'রও ছুবছর হ'ল বিয়ে দিয়েছি। সে কখনও এক আধ বেলার জন্য আসে, আবার চ'লে যায়। বাড়িতে চাকর, ঝি, বামুন, সইস-কোচোয়ান সবই আছে। গিন্নীকে শ্রম-

সাধ্য কোনো কাজই করবার দরকার হয় না। এই ত অবস্থা। আজ এই একটু আগে বাড়ি এসে দেখি, তিনি শুয়ে আছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করতেই তাঁর বাপের বাড়ি থেকে আমদানী বুড়ো ঝি শ্যামার মা একেবারে রেগে অস্থির। তাঁর বাছার না কি 'গুরুতর' অসুখ; আর আমি না কি কোনো দিন সে দিকে 'দিষ্টি' দিইনে। আমি ত মশাই, মহা সংকটে পড়লাম। শেষে, অনেক বক্তৃতা ও অনেক ভৎর্সনার পর শ্যামার মা রোগের যে বিবরণ দিলেন, তা' থেকে আমি এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। আপনি শুনেছি মনস্তত্ত্ববিৎ চিকিৎসক, আপনি যদি কিছু বুঝতে পারেন। শ্যামার মা বল্‌লে যে, তাঁর বাছা অর্থাৎ আমার স্ত্রী বেলা ১১টার সময় প্রত্যহই পাতের কাছে বসেন মাত্র, তার পর উঠেই যে শয্যাগ্রহণ করেন, বিকেলে ৫টার পূর্বে আর সে শয্যা ত্যাগ করতে পারেন না, এমনই তিনি কাতর। আমি ৬টার পর বাড়ি আসি, তখন আর কিছু দেখতেও পাইনে, জান্‌তেও পাই নে; গৃহিণীও কিছু বলেন না। আজ ৫টার পরেও তিনি শয্যা ত্যাগ করতে পারেন নি। এই পর্যন্তই আপনাকে বল্‌তে পারি, ডাক্তার বাবু! কাজেই আমাকে ডাক্তার ডাকৃতে ছুটে আসতে হ'ল।"

ডাক্তার বোস আমার কথা শুনে হেসে বল্‌লেন—"আপনাকে আর বলতে হ'বে না, আমি আপনার গৃহিণীর ও আপনার অসুখের কথা বুঝতে পেরেছি।"

আমি সবিস্ময়ে বল্‌লাম—"আমার অসুখ! আপনি কি এতক্ষণ সব কথা শোনেন নি? অসুখ আমার স্ত্রীর, আমার নয়। আমি বেশ সুস্থ আছি।"

ডাক্তার বল্‌লেন—"সে পরে বিবেচনা করা যাবে। এখন আমাকে কি করতে বলেন? এখনই কি আপনার রোগীকে দেখতে যেতে হবে?"

আমি বল্‌লাম—"সর্বনাশ! আপনি এখনই যাবেন কি! তা হ'লে কি গৃহিণী আপনাকে আমল দেবেন, না আপনার ব্যবস্থামতো ঔষধ ব্যবহার করবেন? তিনি অমনিই ব'লে বস্‌বেন, বড়ো ডাক্তার না ছাই; ওর মোটেই পসার নেই; বড়ো ডাক্তারদের কি ডাকবামাত্রই পাওয়া যায়? আপনি পণ্ডিত হয়ে কথাটা বুঝতে পারেন নি! আপনি আসছে কাল একটা সময় ব'লে দিন; সেই সময় যাবেন। আমি বাড়ি গিয়ে আপনার এখন সময় হ'ল না, আর আপনার ভয়ানক পসারের কথা সত্য-মিথ্যা বানিয়ে তাঁকে ব'লে

আপনার উপর তাঁর শ্রদ্ধা বাড়িয়ে রাখব। তবে ত এ রোগের চিকিৎসা ঠিক হবে। কি বলেন, ডাক্তার বাবু, আমার কথা সঙ্গত কি না ?"

ডাক্তার বাবু বল্‌লেন—"সত্যিই আমি অতটা ভেবে দেখিনি, বিজয় বাবু। আপনি দেখছি মনস্তত্ত্ববিষয়ে আমার অপেক্ষাও সূক্ষ্মদর্শী। যাক্, তা হ'লে আমি কাল সাড়ে ৯টায় আপনার বাড়িতে যাব ; ঠিকানাটা লিখে রাখছি।"

আমি বল্‌লাম—"আর একটু আগে কি সময় হ'তে পারে না, ডাক্তার বাবু? সাড়ে ৯টায় গেলে, হয় কাল আমাকে আফিস কামাই করতে হয়, আর না হয় 'লেট' হয়। তা'তে কাজের ভারি অসুবিধা হবে।"

ডাক্তার বাবু একটু চিন্তা ক'রে তাঁর ডায়েরি বইখানি নেড়ে চেড়ে বল্‌লেন —"বেশ, এক ঘণ্টা আগে, সাড়ে আটটায় যাব। কেমন, তা হ'লে ত আপনার অসুবিধা হবে না ?"

আমি বল্‌লাম—"না কোনো অসুবিধা হবে না। ঠিক সাড়ে ৮টাতেই যাবেন। ১০ মিনিট আগে গিয়ে যেন না ওঠেন, বরঞ্চ ২ মিনিট দেরি হ'লেও কোনো ক্ষতি হবে না। আগে গেলে কি হবে বুঝেছেন ত ? গৃহিণী অমনই মনে করবেন, এ ডাক্তারের হাতে তেমন রোগী নেই।"

ডাক্তার বল্‌লেন—"আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না, আমি বেশ বিবেচনা ক'রে কাজ করব ; আমি সব বুঝতে পেরেছি।"

আমি বল্‌লাম—"ডাক্তার বোস, কিছু যদি মনে না করেন, তা হ'লে আর একটা কথা বলতে চাই।"

তিনি বল্‌লেন—"সে কি কথা ; আপনি বলুন না।"

আমি বল্‌লাম—"দেখুন, আমি অনেক দিন দেখেছি, আপনি সকালে বা বিকেলে যখন রোগী দেখতে আপনার মোটরে চ'ড়ে যান, তখন আপনার পরনে খদ্দরের ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, আর কাঁধের উপর খদ্দরের চাদর দেখতে পাই। পায়ে কি দেন, দেখতে পাই নে, হয়ত চটিই হবে। ও যে শ্বশুরবাড়ি নেমন্তন্নে যাবার পোষাক। ও প'রে আমার বাড়ির রোগিণীকে দেখতে গেলে তিনি আপনাকে আমলই দেবেন না। আপনাকে একেবারে ফিট্‌ফাট্ 'সাহেব' সেজে যেতে হবে, তিনটা বাংলা কথার সঙ্গে দশটা ইংরাজি কথা বলতে হবে। তবে ত রোগীর মনে হবে, হাঁ ডাক্তার বটে। কি যে বিপদে পড়েছি, ডাক্তার বোস, তা আমার এই সব ভদ্রতা-বিরুদ্ধ

কথা থেকেই আপনি বুঝতে পারছেন। আমি ফিরে গিয়ে আপনার সম্বন্ধে যে সব কথা তাঁকে ব'লে তাঁর শ্রদ্ধা বাড়িয়ে রাখব, কাল তা'র কিছু গলতি হ'লে কি আর আমার বাঁচোয়া থাক্‌বে! এই এত কথা বলতে হ'ল; আমার অবস্থা বিবেচনা ক'রে ক্ষমা করবেন।"

ডাক্তার বাবু বল্‌লেন—"ও সব কিছু মনে করবেন না; আমাদের অনেক রকম রোগী নিয়ে কারবার করতে হয়, বিশেষ মাথা-পাগলা রোগী নিয়ে আমাকে অনেক সময় থাকতে হয়। তা'দের কথার কাছে, আপনার কথাগুলো তেমন বেশি অসংলগ্ন নয়। বিশেষতঃ, আপনাকে যে রোগী নিয়ে ঘর করতে হচ্ছে, তাতে আপনাকে যে বিশেষ সতর্ক হ'তে হয়, এ ত জানা কথা। তা হ'লে আপনি আসুন। আমি, কাল ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ৮টায় যাব, আর যা যা করতে হয়, করব। কোনো রকম ভুলের জন্য আপনাকে বিব্রত হতে হ'বে না।"

আমি বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, তখন আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। আমি বিনীত ভাবে বললাম—"আর একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। বড়োই বিরক্ত করছি, ডাক্তার বোস, ক্ষমা করবেন।"

ডাক্তার হেসে বল্‌লেন—"আবার কি ভুল হ'ল বলুন।"

আমি বল্‌লাম—"রোগী দেখে আপনি যখন উঠবেন, আমি তখন আপনাকে ষোলোটি টাকা ফি দেব; আপনি অমনি ব'লে বসবেন, আপনার ফি ষোলো নয়, বত্রিশ টাকা। বুঝলেন? এটাও দরকার, ভুলবেন না।"

ডাক্তার উচ্চ হাস্য ক'রে বল্‌লেন—"বিজয় বাবু, আপনি দেখছি, এ সব রোগের আমার অপেক্ষাও পাকা চিকিৎসক। বেশ, বেশ, তাই হবে; আমি বত্রিশ টাকাই চাইব।"

ডাক্তার বোসের নিকট বিদায় নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। এসে দেখি, গৃহিণী শয্যাত্যাগ ক'রে ঘরের মেঝেতে বসেছেন; বামুন-ঠাকুর এক বাটি দুধ হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, আর শ্যামার মা দুধটুকু খাবার জন্য গৃহিণীকে জেদ করছেন। আমাকে দেখেই শ্যামার মা বল্‌ল—"ডাক্তার আস্‌ছে না কি?"

আমি বল্‌লাম—"জান তো কলকাতা সহরে বলবামাত্রই বড়ো ডাক্তার মেলে না।"

আমার গৃহিণী বল্‌লেন—"সে ত ঠিক কথা ; বড়ো ডাক্তারদের কত রোগী। তিন দিন ঘুরে তবে এক জনকে পাওয়া যায়।"

মিথ্যা কথা বলতে কোনোদিনই আমার বাধে না। তা' যদি হ'ত, তা' হ'লে আর ত্রিশ টাকার কেরাণী থেকে চার শ' টাকার বড়ো বাবু হতে পারতাম না। সুতরাং গৃহিণীর অনুকূল মন্তব্য শুনে আমার মিথ্যার ভাণ্ডার একেবারে খুলে গেল। আমি আফিসের কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বল্‌লাম—"বুঝলে, এই কলকাতা সহরে বড়ো ডাক্তার হঠাৎ পাওয়া যে কি মুশকিল, তা' আজ আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। এই ধর না, এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে ত ঠিকই করতে পারি নে, কা'র কাছে যাই। শেষে ভাবলাম, টাকা আগে, না প্রাণ আগে? এই কথা মনে হতেই একেবারে ছুটে গেলাম নীলরতন সরকারের বাড়ি। সেখানে গিয়ে শুনি, তিন দিন থেকে তিনি অসুস্থ ; নীচেও নামেন না, রোগীও দেখেন না। তখন আর কি করি, দৌড়লাম বিধান রায়ের বাড়ি। গিয়ে দেখি, তিনি ব্যাগ সাজাচ্ছেন। কি ব্যাপার! না, এখনই তাঁ'কে কোন্ নরসিংগড়, না প্রতাপগড়ে যেতে হবে ; মোটর প্রস্তুত। এক ঘণ্টা পরেই হাবড়ায় ট্রেণ। কি করি, সেই গোলমালের মধ্যেই তাঁকে রোগীর অবস্থা বল্‌লাম। তিনি বল্‌লেন—'এক কাজ করুন। যে রোগের কথা বল্‌লেন, তা'র চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার বোস খুব উপযুক্ত ; তাঁকেই নিয়ে যান। আমি যদি থাকতাম, তা হ'লেও তাঁ'কে নিয়ে যেতেই আপনাকে পরামর্শ দিতাম।' সেখান থেকে ছুটলাম ডাক্তার বোসের বাড়ি—বিলম্ব ত করা যায় না। তাঁর বাড়ি ঠিক সময়ে পৌঁছেছিলাম। তিনি রোগী দেখতে বেরুচ্ছেন ; মোটরে এক পা দিয়েছেন ; সেই সময় গিয়ে আমি উপস্থিত। তিনি আর ঘরে ফিরলেন না ; তাঁর খুব তাড়াতাড়ি কোথায় যেতে হবে। আমি আমার বিপদের কথা বলতে তিনি বল্‌লেন—'তাই ত বিজয় বাবু, এখন ত যেতেই পারব না। এত রোগী আমার হাতে যে, বাড়ি ফিরতে সেই রাত ১১টা। তখন ত আর যাওয়া যায় না। আচ্ছা দেখছি।' এই ব'লে তাঁর নোটবুক খুলে দেখে বল্‌লেন, 'কাল বেলা ১টার পূর্বে আর আমার যাওয়ার সুবিধে হবে না।' তখন কি করি, অনেক সাধ্য-সাধনা করলাম, যা চাইবেন, তাই দিতে স্বীকার করলাম। তবুও আজ রাত্তিরে তিনি সময় করতে পারবেন না, বল্‌লেন।

অনেক অনুরোধের পর তিনি কাল ঠিক সাড়ে আটটার সময় আসতে স্বীকার ক'রে সেই কথা নোটবুকে লিখে নিলেন। একবার মনে হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করি, ফি কত দিতে হবে। তখনই ভাবলাম, টাকা আগে, না প্রাণ আগে? যা চাইবে, তাই দেব। কি বল?"

এইবার গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটল। তিনি বল্‌লেন, "আহা, বড়ো কষ্ট ত হয়েছে। ও রাধি, ও ঠাকুর, বাবুর হাত-মুখ ধোয়ার ঠিক ক'রে দেও। যাও ঠাকুর, এত রাত্তিরে আর জলখাবার দিয়ে কাজ নেই, শীগ্‌গির একেবারে খাবার ঠিক ক'রে দেও।"

যাক্, মিষ্ট কথায় পেট না জুড়োক, শরীর ত জুড়িয়ে গেল। আমি তখন সাহস পেয়ে বল্‌লাম—"হাঁ, ডাক্তার বটে বোস। দেখ দেখি কি পসার, রাত ১১টা পর্যন্ত রোগী দেখতে হয়। কাল ১টার আগে আসতে পারবে না বলে বস্‌ল। শেষে অনেক ক'রে ব'লে তবে সাড়ে ৮টা করলাম। এ ত আর আমাদের ললিত ডাক্তার নয়, এ একেবারে সাহেব, বাংলা কথা বড়ো একটা বলেই না। আর কি প্রকাণ্ড মোটর।"

গৃহিণী বল্‌লেন—"তা আর হবে না! অত বড়ো ডাক্তার যে পাওয়া গিয়েছে, এই আমার সৌভাগ্য।"

যাক্, এতগুলো মিথ্যা কথা একেবারে বৃথায় যায় নি, কাজ হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

পরদিন ৮টা বাজতেই গৃহিণী মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—"ওগো, তুমি নীচের বৈঠকখানায় গিয়ে থাক। কি জানি, বলা ত যায় না। ডাক্তার সাহেব যদি সাড়ে ৮টার আগেই এসে পড়েন।"

আমি বল্‌লাম—"তুমি বল কি! এ কি যে-সে ডাক্তার যে, আধঘণ্টা আগে এসে ব'সে ব'সে গল্প করবে? ডাক্তার ঠিক সাড়ে ৮টায় আসবে, দু' মিনিট আগে আসবারও তার সময় হ'বে না।"

গৃহিণী উল্লসিত হয়ে বল্‌লেন—"তা কি আর আমি জানি নে, তবুও তুমি নীচে গিয়ে অপেক্ষাই কর না।"

আমি ত সবই ঠিক ক'রে এসেছি। তবুও গৃহিণীর আদেশে নীচে যেতে হ'ল।

পূর্বের ব্যবস্থা মতো ডাক্তার সাড়ে ৮টার সময় এলেন—একেবারে আঠারো

আনা "সাহেব"। এসেই তাড়াতাড়ি রোগী দেখতে চল্‌লেন। মুখে একটাও বাংলা কথা নেই—খাঁটি বিলাতী বুলি। গৃহিণী প্রস্তুতই ছিলেন। ডাক্তার তখন বুক-পিঠ পরীক্ষা করলেন ; কতক কথা বাংলাতেই রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কতক বা আমাকে ইংরাজিতে বল্‌লেন। আমি আবার সেই সব কথা তর্জমা ক'রে উত্তর শুনিয়ে দিলাম। ডাক্তারের সে সব জেরার কথা আনুপূর্বিক ব'লে আর কাজ নেই। অবশেষে তিনি বল্‌লেন, "রোগ কঠিনই বটে। তবে আমি ঠিক এই রকম একটা রোগীকে মাসখানেক আগে ৩ দিনে আরাম করেছি—ছয় ডোজ ওষুধ দিয়ে। এঁকেও বোধ হয়, ৩ দিনেই সারাতে পারব। সেই রোগীর জন্য ব্যবস্থা লিখে দিলাম ; তারা কোনো দোকানে সে ওষুধ পেলে না। শেষে কি করি, আমাকেই বেরুতে হ'ল। একটা 'সাহেবের' দোকানে এক শিশিমাত্র ওষুধ ছিল। দশ টাকা দিয়ে তাই নিয়ে এলাম। ছয় ডোজে ছয় ড্রপমাত্র খরচ হ'ল ; বাকীটা আমার কাছেই আছে। আপনাকে বেলা সাড়ে ১০টায় একবার আমার বাড়ি যেতে হচ্ছে। আমি এখন বাড়ি ফিরতে পারছি নে। আপনার ওষুধ দেওয়ার জন্যই সাড়ে ১০টায় আমি পাঁচ মিনিটের তরে বাড়ি ফিরব। ছয় দাগ ওষুধ দেব। রোজ সকালে-বিকালে এক দাগ খাওয়াতে হবে। আজ এ-বেলা ওষুধ এনেই এক দাগ খাইয়ে দেবেন। তার পর পথ্যের কথা। এ রোগে পথ্যই হচ্ছে প্রধান। তা'র একটু গোল হ'লেই সব মাটি হ'বে, রোগীকে বাঁচান দায় হবে। সুতরাং পথ্য দেওয়ার ভার আপনাকে নিতে হবে ; চাকর-দাসী বা আর কারও উপর সে ভার দিলে আমি চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে পারব না। এ ৩ দিন আপনাকে আফিস কামাই করতে হবে শুধু রোগীর পথ্যের ব্যবস্থার জন্য। পথ্য হচ্ছে, বেলা ১২টার সময় ছয় আউন্স ডাবের জল, বেলা ৩টার সময় চার আউন্স ঘোল, আর রাত সাড়ে ৭টার সময় ছয় আউন্স ছানার জল। মেজার গ্লাসে মেপে খাওয়াতে হবে, একটু কম-বেশি হলেই বিপদ ; কাজেই এ ভার আপনাকে নিতে হবে, আর কারও উপর নির্ভর করবেন না। এই ঔষধ আর এই পথ্য আজ, কাল দু' দিন চল্‌বে। পরশু আমি এসে পুনরায় পরীক্ষা ক'রে যদি অন্য কোনো ব্যবস্থার দরকার হয়, তা' করব। আপনি পরশু সকালে খবর দিতে পারেন ভালো, না হয় আমিই আসব। আমি আর বসতে পারছি নে, অনেক জায়গায় যেতে হবে।" এই বলে ডাক্তার যেই উঠবেন, আমি অমনিই তাঁকে

১৬টি টাকা দিলাম। তিনি টাকার দিকে চেয়েই বল্‌লেন— "আমার এ সব 'কেসে' ফি ৩২৲ টাকা।"

আমি তখনই আর ১৬৲ টাকা দিয়ে বল্‌লাম—"আপনি ৩২৲ কেন, তার ডবল চাইলেও দিতাম।"

ডাক্তার বল্‌লেন—"কোনো ভয় নেই, ৩ দিনেই রোগ সেরে যাবে।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

কি করি—আফিস কামাই করা ছাড়া অন্ত কোনো উপায় নেই। ১০টার সময় পাশের বাড়ি থেকে আফিসে বড়ো 'সাহেবের' কাছে টেলিফোন ক'রে আমার বিপদের কথা জানালাম এবং আমার সহকারী বিধু বাবুকে একবার আমার বাড়িতে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করলাম। 'সাহেব' সব কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং ৩ দিনের ছুটি মঞ্জুর করলেন।

সাড়ে ১০টার সময় গিয়ে ডাক্তারের কাছে থেকে ছয় দাগ ঔষধ নিয়ে এলাম। দাম দিতে চাইলাম, তিনি নিলেন না। যেমন যেমন ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই ভাবে ঔষধ ও পথ্য দেওয়া গেল। কোনো রকমে দিনমান কেটে গেল, কিন্তু রাত আর কাটে না। ছয় আউন্স ডাবের জল, চার আউন্স ঘোল, আর ছয় আউন্স ছানার জল খেয়ে কি মানুষ দিন রাত কাটাতে পারে? গৃহিণী সন্ধ্যার পর থেকেই ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট্ করতে লাগলেন। কিন্তু উপায় নেই, ডাক্তারের নিষেধ!

কোনো রকমে রাত কেটে গেল। ভোরে উঠেই আমাকে পাঠালেন ডাক্তারের কাছে। ব'লে দিলেন যে, কাল দু' দাগ ওষুধ খেয়েই অসুখ সেরে গেছে, ভয়ানক ক্ষুধা হয়েছে; পথ্যের অন্য ব্যবস্থা করতেই হবে।

ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে সব কথা বলতে তিনি গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন— "ওষুধে যে ফল হয়েছে, তা' বেশ বুঝা যাচ্ছে। যিনি আহারের সময় পাতের কাছে বসেই অমনই উঠে পড়তেন, তাঁর যে যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, এ খুব শুভ লক্ষণ। কিন্তু তাই ব'লে আজই ঔষধ বা পথ্যের কোনো পরিবর্তন করতে পারছি নে। আজ ঐ ব্যবস্থাই চলবে; কাল গিয়ে, পরীক্ষা করে দেখে, যা' ভালো হয় করা যাবে।"

আমি বল্‌লাম—"আপনি ত ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, এ দিকে বাড়িতে যে আমার তিষ্ঠান ভার হবে, তার উপায় কি?"

ডাক্তার হেসে বল্‌লেন—"এ পাপের শাস্তি আপনাকে ভুগতেই হবে।" কি করব, বাড়ি ফিরে এসে গৃহিণীকে সমস্ত কথা বল্‌লাম। তিনি ত রেগেই অস্থির! শুধু ডাবের জল আর ছানার জল খেয়ে কি মানুষ থাকতে পারে?

উপায় কি? চিকিৎসক যা' বলেছেন, তা প্রতিপালন করতেই হ'বে! সে দিন যে কি কষ্ট গেল, তা আর কহতব্য নয়।

পরদিন ঠিক সাড়ে ৮টার সময় ডাক্তার এলেন; পূর্বের মতো পরীক্ষা করলেন; তাহার পর আমাকে বল্‌লেন—"বৈঠকখানায় চলুন; বিশেষ বিবেচনা ক'রে ব্যবস্থা করতে হবে।"

বৈঠকখানায় এসে ডাক্তার বাবু বল্‌লেন—"বিজয় বাবু, আপনার গৃহিণীর আর অসুখ হবে না। এই ছু' দিনেই তাঁর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। তাঁকে আর ওষুধ খেতে হবে না; তিনিও আর পাতের কাছে বসেই উঠবেন না। কিন্তু, একটা গোল রইল। আপনার রোগ ত সারল না? আপনার গৃহিণী যদি মাসের মধ্যে ছু' বার করে এই ভাবে অসুস্থ হতেন, আর আপনাকে আফিস কামাই করতে হ'ত, খরচের কথা না হয় না-ই ধরলাম, তা হ'লে এই ভাবে মাস ছয়ের মধ্যে আফিস কামাই করলে মনিবরা বিরক্ত হয়ে আপনাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিতেন, তাহ'লে হয় ত—আপনার রোগ সারত। কিন্তু, এই ছুই দিনে আপনার গৃহিণী যে শিক্ষা পেয়েছেন, তা'তে তাঁর আর কোনো দিন এ'রকম অসুখ হবে না, আপনাকেও আফিস কামাই করে চাকরি হারাতে হবে না; সুতরাং আপনার গুরু রোগ থেকেই গেল।"

আমি বল্‌লাম—"আপনি কি বলছেন? আমার ত কোনো রোগই নেই।"

ডাক্তার বাবু হেসে বল্‌লেন—"আপনি রোগের কথা জানবেন কি ক'রে? আমরা ডাক্তার, আমরা মানুষ দেখলেই, তার কি রোগ হয়েছে, তা বলতে পারি। আপনার রোগের ইংরাজি নাম তেমন নেই; তবে আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একটি রোগের কথা আছে, তার সমস্ত লক্ষণই আপনাতে বিদ্যমান। সে রোগের নাম গৃহিণী রোগ! আপনার সেই রোগ হয়েছে; কিন্তু তার চিকিৎসা পদ্ধতি আমি জানিনে, বুঝেছেন? ও কি, আজ বত্রিশও নয়—ষোলোও নয়—আজ আমি ফি নেব না। নমস্কার!"

বার্ষিক বসুমতী : ১৩৩৩

স্বয়ম্বর

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

পাঁচ বৎসরের মাতৃহীনা কন্যা সুহাসিনীকে লইয়া শশাঙ্কশেখর যখন কাশীবাসী হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে হয় নাই, ইহজন্মে আবার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। গৃহলক্ষ্মীকে চিরবিদায় দিয়া শ্মশানবৈরাগ্যপ্রভাব ক্ষীণবল হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি বাটীর বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তার পর ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল। তাহাকে সৎপাত্রস্থ করা এখন তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। আত্মীয়-বন্ধুরা ইতিপূর্ব্বে উপযাচক হইয়া চিঠিপত্রে তাঁর ক্ষুদ্র বিষয়সম্পত্তিটুকুর ভার গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, কিন্তু জামাতা নির্ব্বাচন করিবার গুরুতর দায়িত্ব লইতে কেহ অগ্রসর হইলেন না। কাজেই দেশে প্রত্যাগমন ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না।

কাশীধামের বাঙালীটোলায় যাঁহারা বসবাস করেন, বঙ্গদেশীয় এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তীদের সংখ্যা তন্মধ্যে প্রায় সমান। দেশে যেমন ভাষার প্রাদেশিকতা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বতোমুখ মিলনের অন্তরায়স্বরূপ, এখানেও কতকটা সেইরূপ। কিন্তু তাঁহাদের বালক-বালিকাগণের ভিতর এই ভাষাগত ভেদ আদৌ দেখা যায় না। তাহারা সকলেই কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী ভদ্রসমাজে চলিত "দক্ষিণদেশী" ভাষায় কথা কয় এবং "বাঙাল" বা "রেঢ়ো" কথাবার্ত্তা শুনিলে সমভাবে আনন্দানুভব করে।

শশাঙ্কশেখর রায় পাবনা-জেলার লোক। ছয় বৎসর-কাল কাশীবাস করিয়াও কথাবার্ত্তার ভাষায় জন্মভূমির টানটুকু ভুলিতে পারেন নাই। কিন্তু কন্যা সুহাসিনী (চলিত নাম সুহাসি) দক্ষিণদেশী বাংলায় ও বেণারস-অঞ্চলের হিন্দীতে সমান অভ্যস্ত। বাপের বাঙালে বাক্যভঙ্গী ও উচ্চারণ তার হাস্যরস উদ্রিক্ত করিয়া থাকে। তার উপর সুহাসি একটু রঙ্গপ্রিয়, স্নানের ঘাটে সাঁতার-কাটা ও বাঙাল স্ত্রীপুরুষদের কথাবার্ত্তার হুবহু নকল-ব্যাপারে শিশুমহলে সে অদ্বিতীয়। মা-মরা মেয়ে, সহজেই বাপের বড় আদরের, কেহ তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। তার উপর অনন্যবালিকাসুলভ কতকগুলি গুণের

জন্ম সে সকলেরই প্রিয়পাত্রী। পাড়ায় কাহারও পীড়ার খবর পাইলে সুহাসি আত্মপরনির্ব্বিশেষে রোগীর শুশ্রূষা করিতে ছুটিয়া যায়। যত কাঁদুনে ও দুষ্ট ছেলেকে ঔষধ খাওয়াইবার কল-কৌশল তার মত আর কেহ জানে না। একাদশীর দিন মধ্যাহ্নে পাড়ার বিধবাদের রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়া শুনান তার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য এবং যে বৃদ্ধারা একাকিনী বাস করেন, পরদিন প্রাতে পারণের পূর্ব্বে এই বালিকা তাঁহাদের একবার খোঁজখবর না লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। তা ছাড়া ইহার ভিতর সুহাসি যেরূপ রাঁধিতে এবং সেলাই করিতে শিখিয়াছে, সচরাচর যুবতীদের পক্ষে তাহা শ্লাঘার কথা। তবে একলাটি ঘুটিং খেলিতে বসিলে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা অথবা স্থানকালজ্ঞান বড় থাকে না। কোন ব্রাহ্মণগৃহে ভোজের উদ্যোগ হইলে পল্লীর ঠাকুরাণীরা অতর্কিতে সুহাসির সন্ধানে বাহির হন এবং তাহার দেখা পাইলে ঘুটিং কাড়িয়া লইয়া উৎসবগৃহে ধরিয়া আনেন। তার পর কাপড় ছাড়াইয়া তার কোমরে অঞ্চল জড়াইয়া দিতে পারিলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত,—সমস্তদিন সুহাসি রন্ধনে বা পরিবেষণে তন্ময় থাকিবে। হাতের কাজ ফেলিয়া পলাইবে, সে তেমন মেয়ে নহে।

২

শশাঙ্কশেখর গৃহে ফিরিবার সকল বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এমন-সময় খবর পাইলেন, তাঁর শ্বশুরকুলের দূর-জ্ঞাতি ভবানীচরণবাবু সপরিবারে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছেন। ভবানীচরণের একটি বিবাহযোগ্য ছেলে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়ে এবং সে-ও সঙ্গে আসিতেছে জানিয়া, রায়মহাশয় একটু আশ্বস্ত হইলেন। নিতান্ত কর্ত্তব্যানুরোধেই তিনি দেশে ফিরিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু আসল কথা, শূন্য গৃহমন্দিরে পুনঃপ্রবেশের চিন্তাও তাঁহার অসহনীয়। যাহা হউক, ফাল্গুনমাসে গৃহযাত্রার যে দিন স্থির হইয়াছিল, তাহা বদলাইয়া গেল।

ভবানীচরণবাবু দ্বিতীয়পক্ষের সংসার করিয়া দুইটি পুত্র লাভ করিয়াছেন। বড় ছেলেটির বিবাহে অলঙ্কার ও নগদ টাকায় বেশ দুপয়সা তাঁর লাভ হইলেও, পুত্রবধূটি তেমন মনের মত হয় নাই। সেজন্য যখন-তখন তাঁহাকে গৃহিণীর গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে বহুকাল পূর্ব্বে দুই-

একবার তাঁহার দেখা হইয়াছিল, দেশে থাকিতে সুহাসির সৌন্দর্য্যখ্যাতির কথা শুনিয়াছিলেন। কাশীধামে পৌঁছিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া করণীয় ঘরে ছেলের বিবাহ দিতে তাঁর খুব ইচ্ছা হইল। কিন্তু মেয়েটির সরলহাস্যপ্রদীপ্ত সুলক্ষণা শ্রীতে একটু খুঁৎ ছিল—রং মেমের মত অমন ধবল নহে। সেইজন্য স্বয়ং গৃহিণী কন্যাদর্শন করিয়া মতামত না দিলে সহসা তিনি রায়মহাশয়কে বাক্যদান করিতে সাহস করিলেন না।

এদিকে শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ওরফে শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী দুইদিনের ভিতর বাঙালীটোলার মহিলাবৃন্দকে আপনার রূপ ও গহনার ছটায় এবং শ্বশুর বিশেষত পিতৃকুলের ধনগৌরব-প্রসঙ্গে একেবারে চমকিত করিয়া তুলিলেন। ইহাতে চৌধুরাণী বলিয়া তাঁহার যে নামডাক রটিয়া গেল, বালক-বালিকা-মহলেও তাহা অজ্ঞাত রহিল না। সুহাসিকে দুইতিনবার দেখিয়া তিনি তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পিতার নিষেধবশত বালিকা তাঁহার সম্মুখে বড় আসিত না, দূরে থাকিয়া এবং অন্য সূত্রে শুনিয়া শুনিয়া সে তাঁর ভাবভঙ্গী ও গল্পগুজবের আখ্যানবস্তু যথাসাধ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। ইহার ফলে বালক-বালিকা-মহলে দিনকতক চৌধুরাণীকে লক্ষ্য করিয়া নূতন রকমের খেলা ও আনন্দের সৃষ্টি হইল এবং বলা বাহুল্য, দুষ্ট মেয়ে সুহাসি তাঁহাকে যেমন নকল করিতে পারিত, আর কেহ তেমন নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে চৌধুরীমহাশয়দের আগমনের ১০।১২ দিন পরে দশাশ্বমেধ-ঘাটে সমবেত স্নানযাত্রী ছেলেমেয়েদের ভিতর সুহাসি যখন চৌধুরাণীর অভিনয় পূর্ণমাত্রায় করিয়া সকলকে হাসাইয়া হাসাইয়া পাগল করিতেছিল, স্বয়ং ইচ্ছাময়ী স্নানার্থ সদলবলে সেখানে উপস্থিত হইয়া স্বকর্ণে তাহার কতক-কতক শুনিলেন। স্বামীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি যাহাকে পুত্রবধূ করিবেন ভাবিতেছিলেন, তাহার মুখে নিজের এইরূপ ব্যাখ্যান শুনিয়া তিনি রোষে-অভিমানে জ্বলিয়া গেলেন। তার পর নানা ওছিলায় প্রতি-বেশিনীদের সঙ্গে প্রকাশ্য কলহ করিয়া স্বামীর দীর্ঘকাল কাশীবাসের সঙ্কল্প উড়াইয়া দিলেন। কাজেই পক্ষমধ্যে পত্নীবৎসল ভবানীচরণকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। ছেলে ষোড়শীচরণের সঙ্গে সুহাসির বিবাহের কথা তিনি আর গৃহিণীর কাছে পাড়িতে পারিলেন না।

৩

এই সম্বন্ধটির উপর রায়মহাশয় পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন জবাব না দিয়া চৌধুরীমহাশয় অকস্মাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় তিনি বুঝিলেন, বিবাহ ঘটিবার নহে। ভিতরের কথা কিছু জানিতে না পারায় তিনি বড় ম্রিয়মাণ হইলেন।

চৌধুরীমহাশয়দের কাশীত্যাগের সপ্তাহখানেক পরে ডাকযোগে নূতন একটি সম্বন্ধ আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। পাত্রের পিতা অনেকদিন পাবনা জেলায় ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টারি করিয়া পেন্‌শন্ লাভ করিয়াছেন এবং তাঁর পুত্রটি রসায়ন-বিজ্ঞানে এম্-এ. পাস্ করিয়া কোনরূপ স্বাধীন জীবিকা-অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। পিতা লিখিয়াছেন,—"বলা বাহুল্য, আমার পুত্র রসায়নশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত নহে, অন্যান্য বিজ্ঞানেও তাহার দৃষ্টি আছে। সেকালের ইংরেজীনবিশ আমরা, সকলই যুক্তির চক্ষে দেখিতাম ; কিন্তু আমার পুত্র গিরিজা সম্ভব-অসম্ভব সকল বিষয়েই যেরূপ গবেষণার সহিত অনুবদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে বিজ্ঞানই বলুন, কি ভক্তিতত্ত্বই বলুন,—কবিবর সেক্সপীয়রের সেই চরণ-দুটি মনে করিয়া বলিতে হয়, 'যে নামেই ডাক, অন্য নামে গোলাপের সুবাস সমান!' এই সকল মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সে স্বাধীন জীবিকার পথ খুলিতে চাহে। কিন্তু তাহাতে মূলধনের দরকার। আমাব তত সঞ্চয় নাই। শুনিলাম, মহাশয়ের কন্যাটিমাত্র সম্বল এবং বিষয়সম্পত্তি জামাতারই প্রাপ্য। সেইজন্য ছেলেটি মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমিও কাশীবাসী হইব, মনে করিয়াছি।"

"পুনশ্চ।—মেয়েটির জন্মপত্রিকার নকল ও দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ফেরৎ ডাকে পাঠাইতে পারিবেন কি? আমার পুত্রটি একটু-একটু ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা করিতেছে—আশ্চর্য্য তাহার মেধা। মহাশয় একটু সত্বর হইবেন। নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে।"

শশাঙ্কশেখর এরূপ গুণবান পাত্রকে হাতছাড়া করা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। ফেরৎ ডাকে রেজেষ্টারি চিঠিতে তিনি কন্যার জন্মপত্রিকা প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন, ভাবী-বৈবাহিক-মহাশয় যদি সপুত্র তাঁর মেয়েটিকে দেখিতে চান, কাশীধামে তাঁহাদের যাতায়াতের ব্যয়ভার

তিনি বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। যথাসময়ে উত্তর আসিল যে, বড় গরম পড়িয়া গিয়াছে, এ সময়ে তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া যাইতে সাহস করেন না। অথচ মেয়েটিকে দেখারও একবার দরকার। পাত্রের মাতা সেজন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। রায়মহাশয়ের পক্ষে বৈশাখের শেষে কি জ্যৈষ্ঠের প্রথমে স্বদেশে আসা কি তেমন কষ্টকর হইবে? প্রত্যুত্তরে শশাঙ্কশেখর লিখিলেন, জ্যৈষ্ঠ-মাসে তিনি, যেমন করিয়াই হউক, দেশে ফিরিবেন।

৪

রায়মহাশয় যথাসময়ে জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া শুনিলেন, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর বিধুভূষণবাবু কলিকাতায় কোন ধনিগৃহে পুত্রের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। সত্যাসত্যনির্দ্ধারণ জন্য বিধুভূষণবাবুকে পত্র লিখিয়া সপ্তাহ পরে যে জবাব পাইলেন, তাহার অর্থ এইরূপ :—"মহাশয়ের সংবাদদাতা ঠিক কথাই বলিয়াছেন। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ আপনার পৌঁছানর কথা ছিল, কিন্তু ১৭ই মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যখন কোন খবর পাইলাম না, আমি ভাবিলাম কি, যে দূরপথ, মহাশয় হয় ত কোন সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তাহা ছাড়া আপনার কন্যাটি এগার-বছরে পড়িয়াছে, কিন্তু আমার পুত্র বলেন যে আর্য্যজাতি যে নবমবর্ষে গৌরীদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাই বিজ্ঞানসম্মত। কলিকাতার মেয়েটি সাড়ে দশ বৎসরের বটে, কিন্তু তথাপি ছয়-মাসের ছোট। মহাশয়কে অসুবিধায় পড়িতে দেখিয়া আমি এবং আমার পুত্র, উভয়েই বাস্তবিক বড় দুঃখিত, কিন্তু দুঃখপ্রকাশ ছাড়া আমরা আর কি করিতে পারি?" শশাঙ্ক-শেখর অবশ্য বুঝিতে পারিলেন, ভিতরের কথাটা কি? খাস্ বাংলায় নিত্য নূতন অনেক পরিবর্ত্তনের কথা কাশীধামে থাকিয়া তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন, কিন্তু ছয় বছরের ভিতর বঙ্গীয় সমাজবন্ধন এতটা শিথিল হইয়াছে, ইহা তিনি জানিতেন না।

যাহা হউক, তাঁর বাড়ী আসার পর কন্যার সৌন্দর্য্যখ্যাতিগুণে অথবা তদীয় পৈতৃক বিষয়টুকুর লোভে রোজ রোজ নূতন নূতন সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। তাহাতে আর কিছু না হউক, রায়মহাশয়ের গৃহে মিষ্টান্ন-খরচটা বড়ই বাড়িয়া গেল। আর কখন্ কে দেখিতে আসিবে, এইরূপ অনিশ্চয়তায় সুহাসিকে সর্ব্বদা প্রায় সাজিয়া গুজিয়া থাকিতে হইত। কাজেই তাহার যুটিং

খেলায় এবং দৌড়াদৌড়ি কি সাঁতার-কাটায় পূর্ব্বের সে স্বাচ্ছন্দ্য রহিল না। সুহাসি তিক্ত-বিরক্ত হইয়া বাপের কাছে থোট ধরিল, একবার সে মামার বাড়ী যাইবে। কেন না, তাহার সন্নিহিত কালিকাপুর-গ্রামে রথের বড় ধুম, ইহা সকলের মুখেই শুনা যাইতেছিল।

বাস্তবিক কালিকাপুরে রথের বড় ধুম। পদ্মা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রকাণ্ড বট এবং অশ্বত্থ বৃক্ষরাজির চারিদিকে ক্রোশব্যাপী শ্যামল ক্ষেত্র 'রথতলা' নামে পরিচিত। আষাঢ়ের প্রথমে আকাশে নবীন জলদরাজি সঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-বৎসর এখানে উৎসব আরম্ভ হইয়া থাকে। বেশীর ভাগ এবার দুর্গাপুরের জমিদার ভবানীচরণবাবু নীলামে কালিকাপুরের দশ-আনা খরিদ করায়, এইখানেই পুণ্যাহ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। যমুনার অনতিদূরে নবীন জমিদারের নূতন কাছারি-বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। ধুমধামের সীমা নাই,—ঘোড়দৌড় ও আতসবাজির ব্যবস্থা হইয়াছে, কলিকাতা হইতে থিয়েটার আসিবে, জনরব এইরূপ।

দুই দিন হইল, শশাঙ্কশেখর কন্যাটিকে লইয়া শ্বশুরালয় দুর্গাপুরে আসিয়াছেন। শ্বশুরের ভিটা এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ছাড়া সেখানে আকর্ষণের বড়-কিছু লৌকিক-চক্ষে ছিল না, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় তাঁহার সাধ্বী পত্নীর স্মৃতিমোহ জড়িত ছিল। অন্তিমশয্যায় শয়ানা গৃহিণীর অনুরোধে দুর্গাপুরের যমুনা-তীরে স্বহস্তে চিতারচনা করিয়া প্রেমময়ীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের সকল সুখশান্তি চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছিলেন। আজ প্রায় ছয় বৎসর পরে প্রীতির সে সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া শোকে তিনি মুহ্যমান হইলেন।

রথের দিন প্রভাতে ঘনকৃষ্ণ মেঘজালে পদ্মা-যমুনার নূতন জলধারা ছায়ান্ধকার-পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। রথতলায় জনস্রোতের বিরাম-বিশ্রাম নাই এবং তাহার কল্লোল তটপ্লাবিসমুদ্রগর্জ্জনবৎ বহুদূর পর্য্যন্ত প্রহত হইতেছিল। শুনিয়া সুহাসি রথ দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। শশাঙ্কশেখরের শরীর ও মন ভাল ছিল না, তিনি শ্যালক উমাচরণের উপর ছেলেমেয়েদের রথ দেখাইবার ভার দিয়া নির্জ্জনে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে চিত্ত সমাহিত করিলেন।

কিন্তু সুহাসিরা কালিকাপুরে চলিয়া গেলে রায়মহাশয় কিছু বিমনা হইলেন। সর্ব্বদা কন্যাকে কাছে-কাছে রাখিয়া তিনি তাহাকে আর ক্ষণমাত্রের জন্য চক্ষের আড় করিতে পারিতেন না। সুহাসি রথতলায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তিনি স্নানোদ্দেশে বাহির হইলেন এবং যমুনাতটে সহধর্ম্মিণীর চিতাস্থানে উপবেশন করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মাতুল উমাচরণ রথতলায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে সুহাসিকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সে ইহারই ভিতর বিস্তর ভেঁপু ও খাবার কিনিয়া মামাতো ভাই বোনদের মধ্যে বিতরণপূর্ব্বক অবশিষ্ট গরিবদুঃখীদের ছেলেদের দিবার জন্য চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কাজেই মাতুলকে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া চঞ্চলা ভাগিনেয়ীর অনুসরণ করিতে হইতেছিল। মণিহারীর দোকানগুলোর দিকেই সুহাসির বেশী ঝোঁক। কেন না, পাড়াগাঁয়ের বধূ ও কন্যারা যেরূপে মুখ বিকট করিয়া বেলওয়ারি চুড়ি ও শাঁখা পরিবার যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল, তেমন দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে সে আর কখন দেখে নাই। দেখিয়া দেখিয়া তাহার ভারি হাসি পাইতেছিল এবং কাশীতে ফিরিয়া কেমন তাহার খেলার সাথীদের সে অভিনয় দেখাইবে ভাবিতে তাহার আনন্দের সীমা ছিল না।

বেলা প্রহর উত্তীর্ণ হইলে পুরাতন জমিদারগৃহ হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ মহাধুমধামে আনীত হইয়া রথে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে রথটানা সুরু হইল। "জয় জগন্নাথ" রবে আকাশ-প্রান্তর-নদীবক্ষ কম্পিত করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী রথরশ্মি আকর্ষণ করিয়া চলিল। ঘোর ঘর্ঘর-ধ্বনি জাগ্রত করিয়া রথচক্রসকল আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু সহস্রহস্তপরিমিত স্থান অতিক্রম করিতে না করিতে পুলিসের আদেশে রথের গতি বন্ধ হইয়া গেল। সুহাসি মাতুলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া রথটানায় যোগ দিয়াছিল। সহসা রথচলা বন্ধ হওয়ায় তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। কনেষ্টবলদের লক্ষ্য করিয়া নির্ভয়ে সে বলিয়া উঠিল, "মর্, পোড়ারমুখো মিন্সেরা!"

মধ্যাহ্নে সহসা পশ্চিম গগনপ্রান্ত আচ্ছাদিত করিয়া কালো মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড় দেখা দিল। রথের দিনে বৃষ্টিপাতের জন্য সচরাচর লোকে প্রস্তুত থাকে, কিন্তু এরূপ প্রবল বাত্যা বড় দেখা যায় না। জনস্রোত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রামাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

উমাচরণ ছোট একখানি পান্সী করিয়া সুহাসিদের রথ দেখাইতে আনিয়াছিলেন। ক্ষুদ্রনদী যমুনার তীরে অশ্বত্থবটের ছায়াস্নিগ্ধ একটু নির্জ্জন স্থান ছিল, ঝড় ও বৃষ্টির প্রাক্‌কালে নিরাপদ জানিয়া সেইখানে তাঁহারা নৌকা লইয়া গেলেন।

ঝড় উঠিবার সময় কেহ লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে, পদ্মাগর্ভে একখানি সওয়ারি নৌকা বেগে রথতলার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। মাঝিমাল্লারা প্রাণপণ যত্নে নৌকা যমুনার মোহনায় আনিয়া ফেলিয়াছে, এমন-সময় একটা দমকা বাতাস আসিয়া উহাকে একেবারে উলটাইয়া দিল। মন্দীভূত জনস্রোতের ভিতর সকলেই আপন-আপন প্রাণ লইয়া ব্যস্ত, বিপন্ন নৌযাত্রীদের উদ্ধার করিবার কেহ ছিল না।

শশাঙ্কশেখর রায় প্রায় সমস্তদিন প্রাণাধিকা কন্যাকে না দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। কিছুতে মনঃস্থির করিতে না পারিয়া ঝড়বৃষ্টির পূর্ব্বেই পদব্রজে তিনি রথতলাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং বিপন্ন নৌকাখানি জলমগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা-যমুনার সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলেন।

তখন পদ্মার ভয়ঙ্কর অবস্থা। রুষিয়া, ফুলিয়া, গর্জ্জিয়া রাক্ষসীর মত সে ঝড়ের সহিত যুঝিতেছিল। সেই অবস্থায় রায়মহাশয় সহসা দেখিলেন, তাঁহার সুহাসির মত কেহ সন্তরণ করিয়া যমুনার তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে —পশ্চাতে অদূরে অর্দ্ধনিমজ্জিত মনুষ্যদেহ, কষ্টে সে বালিকার অঞ্চল ধরিয়া ভাসিয়া আসিতেছে।

শশাঙ্কশেখর নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। ইহা কি সম্ভব যে, উমাচরণ বালক-বালিকা সহ জলমগ্ন হইয়াছে? এই সময়ে ঝড়বৃষ্টির বেগ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইতেছিল। তিনি ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, তাঁহার সন্তরণপটু কন্যা নিমজ্জনোন্মুখ মূর্ত্তিমৎস্কন্দবীরতুল্য যুবকের প্রাণরক্ষা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুহাসি আর্দ্রকেশ ও আর্দ্রবস্ত্রে পিতার চক্ষে মূর্ত্তিমতী উমারাণীর মত প্রতিভাত হইতেছিল। বাপকে দেখিয়া প্রথমত সে একটু অপ্রতিভ হইল। তার পর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বাবা, মামাকে লুকিয়ে নৌকোর জান্‌লা দিয়ে কেমন পালিয়েছি দেখ, এখনও হয়

ত তিনি জান্‌তে পারেন নি। তা ভাল করিচি কি না, তুমিই বল ত বাবা! দেখলুম একখানা নৌকো ডুবে গেল, কিন্তু সেজন্যে কারু মায়া হলো না,—মামারও নয়। একটুর জন্যে বামুনের ছেলেটি মারা যেতে বসেছিল আর কি!" শশাঙ্কশেখর দেখিলেন, যুবকের গলদেশে উপবীত জড়িত। সস্নেহে সজলনেত্রে কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তিনি যুবকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। চিনিতে দেরি হইল না। পিতার কণ্ঠে "কে ও ষোড়শীচরণ" উচ্চারিত হইবামাত্র সুহাসি ছুটিয়া পলাইল। তখন তার ভারি লজ্জা হইয়াছিল। কেন না, চৌধুরাণীর কাশীত্যাগের পর এই নাম অনেকবার সে শুনিয়াছিল।

ষোড়শীচরণ সন্তরণে একান্ত অপটু নহে। কিন্তু বালিকার অঞ্চলসাহায্য ব্যতীত পদ্মাগর্ভ হইতে সেদিন তার বাঁচিয়া আসার সম্ভাবনা ছিল না। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সে শশাঙ্কশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিল। প্রাণদাত্রী বালিকার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিল না।

রায়মহাশয় ষোড়শীচরণকে কাছারিবাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। পুত্রের প্রাণরক্ষার খবর পাইয়া ভবানীচরণবাবু সস্ত্রীক বাটী হইতে ছুটিয়া আসিলেন। সকল শুনিয়া তাঁহারা শশাঙ্কশেখরের নিকট উপস্থিত হইলেন। চৌধুরাণী মহাশয়ার আদর চুম্বনে সুহাসির কোমল গণ্ড লাল হইয়া উঠিল। হাসিয়া কাঁদিয়া সেই পুণ্যাহ বাসরেই তিনি সুহাসির সঙ্গে ষোড়শীচরণের বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন।

তার পর ষোড়শীচরণ চিরদিনের মত সুহাসিনীর আঁচলে বাঁধা পড়িয়াছেন। শাশুড়ীর বড় আদর এবং স্নেহের বউ হইলেও, সুহাসি মুখ তুলিয়া কখন তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারে না। "চৌধুরাণীর বউ" বলিলে তার লজ্জা এবং অভিমানের সীমা থাকে না।

"বঙ্গদর্শন" : ১৩০৯ ২য় বর্ষ—ভাদ্র

মা য়া বি নী

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈপ্সিত, চিরদয়িত, এস হে! নয়নের মণি, প্রাণের উত্তমার্ধ, কোথায় তুমি! আমি তোমার পথ চাহিয়া, কোথায় তুমি! তুমি শুনিলে না, বুঝিলে না, আমার দিকে চাহিলে না—দেখ, আমি তোমার জন্য অস্থিরচিত্ত হইয়া তোমার পথ চাহিয়া আছি। কখনো তোমায় সকল কথা বলিতে পারি নাই, আজ বলিব। শুন—

এ কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? কাহার কণ্ঠস্বর আমার শ্রবণকুহরে বাজিতেছিল? কি এ প্রহেলিকা?

স্বপ্নের অপেক্ষা সত্য আরও প্রহেলিকাময়। আকাশে শুক্ল চতুর্দশীর চন্দ্র উঠিয়াছে, পর্বতের উপর দেবদারুবৃক্ষমূলে আমি শয়ন করিয়া রহিয়াছি। পর্বততলে বিশাল হ্রদ বায়ুবিহনে নিস্তরঙ্গ; স্থির নির্মল জলে শত শত চন্দ্রবিম্ব প্রতিবিম্বিত হইতেছে। জলে কুমুদ, কহ্লার, অগণিত লোহিত পদ্ম মুদিত, প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে—চারিদিকে নয়নাভিরাম অতি মনোহর অতুলনীয় দৃশ্য, ঘন নীল মহীরুহ-সমাকীর্ণ, তুঙ্গশিখর পর্বতশ্রেণী, নিম্নে সেই স্নিগ্ধ, শীতল, দুরবগাহ সলিলরাশি, পার্শ্বে গাঢ় হরিদ্বর্ণ, বহুদূর-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র—সর্বোপরি ফুল্ল জ্যোৎস্নার মায়াময়ী ছায়া। এমন দৃশ্য কখনো দেখি নাই। অতি গোপনে, এই দুস্তীর্ণ পর্বতমালার অন্তরালে প্রকৃতি কৃপণের মতো এত ঐশ্বর্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। যে দিকে চাহিয়া দেখি, সকলই নূতন, সকলই অলৌকিক। এমন পর্বত, নদী, হ্রদ কোথাও দেখি নাই; এমন বৃক্ষ, এমন ফুল কোথাও দেখি নাই; এমন শস্য, এমন তৃণও কোথাও দেখি নাই। এ কোন মায়াপুরে উপনীত হইলাম? শীত এ পর্যন্ত আগত হয় নাই। শীতকালে তুষারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়, তখন এ স্থানে বাস অসম্ভব। অপরাহ্ণে এই স্থানে উপনীত হইয়া পথশ্রান্তি অপনোদন করিবার মানসে এই মনোহর বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলাম। শয়ন করিয়া নিদ্রিত হই। নিদ্রাভঙ্গে দেখি, রাত্রি হইয়াছে। অপহৃত দিবালোকের পরিবর্তে জ্যোৎস্না-

লোকে প্রকৃতি সুষুপ্তির হাসি হাসিতেছে। আমি বিগতনিদ্রালস্যজড়িত চক্ষে সেই অপূর্ব-সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

স্বভাবতঃই সে স্থানে মনুষ্যসমাগম বিরল। এক্ষণে নিশাকালে চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। সহসা দূরাগত ক্ষীণ সংগীতধ্বনি শ্রবণে পশিল। ধ্বনি না প্রতিধ্বনি, না পূর্বশ্রুত গীতের স্মৃতিমাত্র? আবার দূর হইতে গীত শ্রুত হইল, কণ্ঠধ্বনি নিকটে আসিতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া, কোথা হইতে সংগীতের শব্দ আসিতেছে, প্রথমে স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে দেখিলাম, দূর হইতে তরণী আসিতেছে। হ্রদের স্থির জলে দূরে ছায়া দেখা যাইতেছে। সেই তরণী হইতে সংগীতধ্বনি উঠিতেছে। আমি পর্বত হইতে হ্রদের কূলে অবতরণ করিতে লাগিলাম, তরণী নিকটে আসিতে লাগিল। দেখিলাম, অতি অপরূপসুন্দরী যুবতীগণ ক্ষেপণীহস্তে নৌকা চালিত করিতেছে, মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী বসিয়া গীত গাহিতেছে। তালে তালে ক্ষেপণী পড়িতেছে, তালে তালে চরণে নূপুর শিঞ্জিত হইতেছে, তালে তালে নৌকা চলিতেছে। এক পার্শ্বে এক তেজস্বী পুরুষ বসিয়া অর্ধমুদ্রিত নয়নে সেই রূপভঙ্গ, ক্ষেপণীনিক্ষেপ দর্শন করিতেছে ও আলস্য সহকারে সেই গীত শ্রবণ করিতেছে। পার্শ্বে কয়েকজন অনুচর। স্বর উঠিতেছে, পড়িতেছে, ক্ষেপণী উঠিতেছে, পড়িতেছে, কণ্ঠ কম্পিত হইতেছে, স্থির জলে এবং বায়ুতে যেন স্পন্দন-তরঙ্গ উঠিতেছে। জ্যোৎস্নায় ক্ষেপণীস্রুত জলবিন্দু জ্বলিতেছে, যুবতী-দিগেব অঙ্গের অলংকার জ্যোৎস্নালোকে জ্বলিতেছে। নৌকা কখনো বামে কখনো দক্ষিণে যাইতেছে, কখনো ঘুরিতেছে, কখনো জলের উপর নৃত্য করিতেছে, আর সেই নিস্তব্ধ আকাশ পরিপূরিত করিয়া, দূর পর্বতগুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সংগীতধ্বনি উঠিতেছে।

এই ত কাব্যপরিচিত অপ্সরাপুরী! এই ত ইন্দ্রালয়। হয় ত চির-যৌবনসম্পন্না উর্বশী এবং রম্ভা এই জ্যোৎস্নালোকে মানসসরোবরের বক্ষে গান করিতেছে! হয় ত এই পুরুষ স্বয়ং ইন্দ্র কিংবা অর্জুনতুল্য অতিথি! বিস্ময়ের উপর বিস্ময় উদয় হইতে লাগিল। এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্য কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যলোকে এমন রূপও ত কখনো দেখি নাই! কে বলে গন্ধর্বলোক পৌরাণিক উপন্যাসমাত্র? অপ্সরোলোক ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি!

কৌতূহল-আগ্রহে আমি জলের তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম। তরণী আসিয়া

সেই স্থানে লাগিল। তরণীতে উপবিষ্ট সেই পুরুষ আমার দিকে কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে ?"

কয়েকজন অনুচর ও দাঁড়বাহিনী কয়েকটি রমণী নৌকা হইতে উঠিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

একজন অনুচর ব্যঙ্গস্বরে কর্কশভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই ?"

আমার পরিধানে গৈরিক বসন, মস্তকে দীর্ঘ রুক্ষ কেশ, এখনও জটা পড়ে নাই। কিছু সঙ্কুচিত, কিছু ভীত হইয়া বলিলাম, "আমি সাধু।" সাধু বলিতে সকল রকম বিরাগী সন্ন্যাসী বুঝায়।

অনুচরবর্গ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের দেখাদেখি স্ত্রীলোকেরাও হাসিয়া উঠিল। সংগীতশব্দ যেমন মধুর ও কোমল শুনাইতেছিল, হাস্যধ্বনি আর তেমন শুনাইল না। প্রথম প্রশ্নকর্তা বলিল, "সাধুর ভেকে অনেক চোর বেড়ায়। তোকে ত চোরের মতো দেখাইতেছে।" রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। নৌকায় বসিয়া পুরুষ সস্মিতমুখে রঙ্গ দেখিতেছিল।

আমি বিপদে পড়িলাম। ইহারা কে, কিছু জানি না। আমি সাধু না হই, নির্দোষ পথিক, আমাকে বিদ্রূপ করিয়া ইহাদের কি লাভ ? পুরুষ ও স্ত্রীলোক মিলিয়া যেরূপ করিয়া আমাকে ঘিরিয়াছে, তাহাতে পলায়নও অসম্ভব। বলিলাম, "চোর হইলে কি আর এই পর্বতে বসিয়া থাকিতাম ? আমি বিদেশী পথিক, এ স্থানে আজই আসিয়াছি। আমাকে তোমরা ত্যাগ কর, এরূপ করিয়া বিদ্রূপ করিও না।"

অনুচরগণ আমাকে আরও বিদ্রূপ করিতে লাগিল, রমণীগণ হাসিতে লাগিল। নৌকায় যে পুরুষ উপবেশন করিয়া ছিল, সে ডাকিয়া বলিল, "উহাকে নৌকায় লইয়া আইস।" অনুচরেরা বলপূর্বক আমাকে ধরিয়া নৌকায় তুলিল। রমণীগণ পূর্বের মতো ক্ষেপণী করিয়া নৌকা গভীর জলে লইয়া চলিল।

যে রমণী গীত গাহিতেছিল, সে আমার পার্শ্বে বসিল। আমার অঙ্গে তাহার অঙ্গস্পর্শ হইল। চারিদিকে অপর রমণীগণ ঘিরিয়া বসিল। রমণী-ব্যূহের মধ্যে আমি বন্দী হইলাম। সেই পুরুষ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। পুনরায় গীতধ্বনি উঠিল—আলস্য-লালসাপূর্ণ, কাতর প্রণয়সাধনার গীতি—কখন কণ্ঠ বাষ্পপূর্ণ হইয়া রোরুদ্যমান হইয়া ভঙ্গ হইয়া যায়, কখন

তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতো আসিয়া হৃদয়ে আঘাত করে, আবার করুণাকাতর রাগিণীতে হৃদয়ের মর্মস্থানে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে অলংকার-শিঞ্জন, হৃদয়ভেদী দীর্ঘ সুবর্ণশলাকার ন্যায় কটাক্ষ, অথবা কটাক্ষে বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভা। থাকিয়া থাকিয়া রোমহর্ষণ অঙ্গস্পর্শ, কখন পার্শ্বে রমণীর করতালিধ্বনি, কখন নূপুরনিক্কণ, কখন ক্ষেপণীর পতনশব্দ, কখন জলের মৃদু মৃদু ভঙ্গরব।

রূপ এবং সংগীতের মোহ আমার চিত্ত হইতে তিরোহিত হইতেছিল। বিস্ময়, বিরক্তি এবং আশঙ্কা হৃদয়কে অধিকাব করিতেছিল। এ পুরুষ কে? এই রমণীগণ কেন আমাকে বেষ্টন করিয়াছে? আমি রিক্তহস্ত উদাসীন, আমাকে লইয়া ইহারা কি করিবে? কোথায় আমাকে লইয়া যাইতেছে? কিছু স্থির করিতে না পারিয়া পূর্বের ন্যায় নীরব রহিলাম। কিছু দূর গিয়া হ্রদের তীরে নৌকা লাগিল। তীরে অট্টালিকা। নৌকা ত্যাগ করিয়া সকলে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। আমি অন্যত্র গমন করিবার মানসে অন্য দিকে গমন করিতে উদ্যত হইলাম। অমনি একটি যুবতী আমার হস্ত ধারণ করিল, বলিল "কোথা যাও?"

আমি বলিলাম, "আমি বিরাগী, এ অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার প্রয়োজন কি? আমি ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করি। তোমাদের মঙ্গল হউক, আমার হস্ত ত্যাগ কর, আমি অন্যত্র গমন করি।"

সেই যুবাপুরুষ এতক্ষণে প্রথমবার কথা কহিল, মধুর অথচ ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "বিরাগীব পক্ষে অট্টালিকাও যেমন, কুটীরও তদ্রূপ। যেখানে তোমাকে লইয়া যাইবে, সেইখানে গমন করিবে।"

আর এক জন যুবতী দ্বিতীয় হস্ত ধারণ করিল। দেখিলাম, বলপ্রকাশ বৃথা। যদি বলপূর্বক রমণীদিগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করি, তাহা হইলে অনুচরগণ আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। আমি বল প্রকাশ না করিয়া রমণীদিগের সহিত চলিলাম।

অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া দেখি, প্রশস্ত কক্ষসমূহ বহুবিধ বহুমূল্য উপকরণে সজ্জিত। উজ্জ্বল আলোকে গৃহ আলোকিত হইয়াছে। রমণীগণ আমাকে লইয়া গিয়া একটি মনোহর কক্ষে উপবেশন করাইল। সে স্থানে সেই পুরুষ এবং তাহার অনুচরদিগকে দেখিতে পাইলাম না; কেবল কয়েকটি রমণী। তাহারা অত্যন্ত সমাদরপূর্বক আমাকে অভ্যর্থনা করিল। এক জন

আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া পার্শ্বের গৃহে হস্তমুখ প্রক্ষালনের নিমিত্ত সুবাসিত জল দেখাইয়া দিল। হস্তমুখাদি ধৌত করিয়া আমি সেই স্নানাগারের বহির্দ্বার মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। দেখি, দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, দুইটি রমণী অন্য দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, আমাকে ফিরিতে দেখিয়া এক জন কহিল, "তুমি পথ ভুলিয়া গিয়াছ? ও দিকে পথ নয়, এ দিকে আইস।" আমি লজ্জিত হইয়া পূর্বের গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

গৃহের মধ্যস্থলে রৌপ্য-থালায় নানাবিধ উৎকৃষ্ট আহার্য সামগ্রী সজ্জিত রহিয়াছে। রমণীগণ আমাকে আহার করিতে অনুরোধ করিল। সমস্ত দিন অনশনে গিয়াছিল, আহারের জন্য পীড়াপীড়ির প্রয়োজন হইল না। আহারান্তে জল দেখিতে না পাইয়া পানীয় চাহিলাম। একটি রমণী সুরাপাত্র আনয়ন করিয়া, আমার হস্তে দিল। আমি বিস্মিত হইয়া পাত্র তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি জল চাহিতেছি, আমাকে সুরা দিলে কেন? সুরা আমার পানীয় নহে, আমাকে কিঞ্চিৎ শীতল জল দাও।"

রমণী বলিল, "সুরা এবং জল তোমার পক্ষে তুল্য। যাহা পাইবে, তাহাই পান করিবে।"

আমি কহিলাম, "না, অমৃত এবং গরল তুল্য নহে। আমি কখন সুরাপান করিব না।"

"তবে শরবৎ আনিয়া দিই?"

"শুধু জল পাইলেই আমি চরিতার্থ হইব।"

দ্বিতীয়বার গিয়া রমণী শরবৎ লইয়া আসিল, জল আনিল না। অগত্যা আমি তাহাই পান করিয়া আচমন করিলাম। শরবৎ মিষ্টি, সুগন্ধ বিশিষ্ট, অত্যন্ত উপাদেয়, কিন্তু কিসের গন্ধ, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। আহারান্তে দুইটি রমণী আমাকে একটি রম্য শয়নগৃহে লইয়া গেল। প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পর্যন্ত কোনো পুরুষ দেখিতে পাই নাই। ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম; কিন্তু কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, প্রবৃত্তিও হইতেছিল না। শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া রমণীদ্বয় পর্যঙ্কে আমার জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিল। এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু প্রয়োজন আছে?"

আমি বলিলাম, "না, এখন তোমরা যাও, আমি শয়ন করি।"

দ্বিতীয় রমণী কহিল, "পদ-সংবাহন করিব? তাহা হইলে উত্তম নিদ্রা আসিবে।"

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, "না না, কিছু করিতে হইবে না, তোমরা আপন আপন স্থানে গমন কর।"

রমণীদ্বয় বাহিরে গমন করিলে অত্যন্ত সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমি শয়ন করিলাম।

অলক্ষ্যে বাদ্যধ্বনি উঠিল, অতি মৃদু মৃদু, ধীরে ধীরে কোথায় বাদ্য বাজিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমার দেহে যেন মাদকতার মতো সেই শব্দ প্রবেশ করিতে লাগিল। তৎপরে যে অবস্থা উপস্থিত হইল, তাহা নিদ্রা কি তন্দ্রা কিংবা জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নমাত্র, তাহা এ পর্যন্ত নিরূপণ করিতে পারি নাই। সেই শ্রুতিমধুর শব্দ যেন ক্রমে দূরে যাইতে লাগিল, অবশেষে মিলাইয়া গেল। সহসা চক্ষে যেন তীব্র আলোক পতিত হইল, চক্ষু উন্মীলিত হইল। দেখি, শয়নগৃহ মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখর আলোকে ঝলসিত হইতেছে। সে আলোক চক্ষে সহ্য হইল না, চক্ষু মুদিত করিলাম। আবার চক্ষু খুলিলাম—দেখিলাম, আলোকের তেজ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। ক্রমে জ্যোতি কোমলতর হইতে লাগিল; কভু নীল, কভু লোহিত, কভু হরিদ্রাবর্ণ—আলোক নানা বর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ সেই আলোকে দুইটি অপ্সরাতুল্য কিশোরী নৃত্য করিতে করিতে আমাব সম্মুখে উপনীত হইল। পদক্ষেপ এত লঘু যে, ধরণীতে পডিতেছে কিনা, বুঝিতে পারা যায় না। তাহারা কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল, এরূপ প্রশ্ন আমার মনে একবারও উদয় হইল না। নর্তকীদ্বয় সহসা অদৃশ্য হইল। নির্ঝর-শব্দ শুনিতে পাইলাম, কোথায় যেন ঝরঝর রবে অবিশ্রান্ত জল পড়িতেছে। বিহঙ্গ-কাকলী যেন কাননে শ্রুত হইল। কত পুষ্পের গন্ধ বহিয়া আসিতে লাগিল, কত রূপের ছবি চক্ষের সম্মুখে আসিল, কত আনন্দ-অভিনয় হৃদয়কে পুলকিত করিতে লাগিল। সহসা ঝটিকার সম্মুখে প্রদীপের ন্যায় সমস্ত নির্বাপিত হইয়া গেল। অন্ধকারে আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। সে অবস্থাও জাগরণের অথবা সুষুপ্তির, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

গভীর রাত্রে কিংবা রাত্রিশেষে অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। এবার একেবারে সংশয়-রহিত হইলাম। দেখিলাম, মাণিক্যখচিত স্বর্ণপ্রদীপ হস্তে

অবগুণ্ঠনবতী রমণী আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ গালিচামণ্ডিত গৃহতল হইতে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এ রমণী কেমন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল? দ্বার যেমন রুদ্ধ ছিল, সেইরূপ রহিয়াছে, অন্য কোথাও প্রবেশ-পথ দেখিতে পাইলাম না। এমন সময় রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "পথিক, রাত্রে উত্তম নিদ্রা হইয়াছিল?"

দেবী সরস্বতীর পদ্মাঙ্গুলির আঘাতে যেরূপ বীণা ঝংকার দিয়া উঠে, রমণীর বাক্যে আমার হৃদয়ে সেইরূপ ঝংকার উঠিল। মানবকণ্ঠে যে এরূপ মধু থাকে, পূর্বে তাহা জানিতাম না। কেবল স্বর মিষ্ট নহে। যেন সেই কণ্ঠ শুনিবামাত্র কত পূর্বস্মৃতি মনে উঠিতে লাগিল, যেন ভবিষ্যতের স্বর্ণদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল, যেন হৃদয়ের মূলকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি রমণীর কথায় উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?"

অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মনে হইল, রমণী যেন মৃদু মৃদু হাসিল। সেই অমৃত-নিস্যন্দিনী স্বরে কহিল, "এ আমার গৃহ। আমার গৃহে যেখানে যখন ইচ্ছা যাইতে পারি। তুমি পর্যঙ্ক ত্যাগ করিয়া ধরণীতে শয়ন করিয়াছিলে কেন?"

প্রশ্নের উত্তরে আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "তুমি কে?"

উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গের ন্যায় রমণী হাসিয়া উঠিল; কহিল, "আমি গৃহকর্ত্রী। যে প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা আমারই জিজ্ঞাসা করা শোভা পায়। তুমি কে?"

"আমি পথিক, ভিক্ষুক। আমাকে বন্দী করিয়া তোমার কি ফল হইবে?"

রমণী আবাব হাসিল; বলিল, "বন্দীর কি এইরূপ শয়ন-গৃহ? এ গৃহে কি তোমার সহিত বন্দীর ন্যায় আচরণ হইয়াছে?"

"আমি বৈরাগ্যব্রতাবলম্বী, বিলাস চাহি না। আমাকে বলপূর্বক এ গৃহে লইয়া আসিয়াছে। যদি তুমি এই গৃহের কর্ত্রী হও ত আমাকে মুক্ত করিয়া দাও, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া যাই।"

"আইস, তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতেছি," বলিয়া রমণী গৃহের প্রাচীরে হস্তস্পর্শ করিল। তৎক্ষণাৎ প্রাচীরে একটি দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। এ কৌশল না দেখিলে প্রত্যয় করা যায় না। রমণী সেই দ্বার দিয়া বাহির হইল, আমি তাহার পশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পশ্চাৎ হইতে দেখিলাম, রমণীর আপাদমস্তক

বিচিত্র শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত, কোমল পদক্ষেপে গমন করিতে লাগিল। কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া রমণী আর একটা দ্বারের সম্মুখে উপনীত হইল। আমার নিকটে আসিয়া আমার কর্ণে মৃদু মৃদু কহিল, "এই দ্বার খুলিলেই তুমি যথেচ্ছা গমন করিতে পার। যাইবার পূর্বে কোনো কথা বলিবার নাই?"

আমার শরীর পুলকাঞ্চিত হইল। কহিলাম, "একটা কথা—" যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, বলিতে পারিলাম না, লজ্জায় অধোবদন হইলাম।

রমণী কহিল, "কি বলিতেছিলে, বল।"

আমি কহিলাম, "সে কথা বলা আমার পক্ষে পাপ। তুমি দ্বার মুক্ত কর, আমি বাহির হইয়া যাই।"

রমণী আবার আমার কানে কানে বলিল, "আমি বলিব? তুমি যাইবার পূর্বে একবার আমার মুখ দেখিতে চাও।"

এই ইচ্ছাই আমার মনে উদয় হইয়াছিল। কোনো কথা কহিতে না পারিয়া আমি মস্তক অবনত করিলাম।

রমণী কহিল, "এই ইচ্ছা তোমার আজ নূতন হয় নাই। এ দিকে দেখ।"

পার্শ্বে একটা দ্বার মুক্ত করিয়া রমণী একটি গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার অনুজ্ঞামতো আমিও সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম। রমণী প্রদীপ তুলিয়া দেখাইল, গৃহের প্রাচীরে নানাবিধ বহুসংখ্যক সন্ন্যাসীর বেশ রহিয়াছে। রমণী কহিল, "যাহারা এই বেশ ধারণ করিত, তাহারা সকলেই আমার মুখ একবার দেখিতে চাহিয়াছিল। পার্শ্বের গৃহে দেখ।" সেই গৃহের পার্শ্বে আর একটি গৃহ। তাহার প্রাচীরে বহুসংখ্যক বহুমূল্য পরিচ্ছদ রহিয়াছে। রমণী কহিল, "ইহারাও সকলে আমার মুখ দেখিতে চাহিয়াছিল। তুমি আপনার বেশ ত্যাগ করিয়া অন্য বেশ ধারণ কর, পরে আমাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে বলিও।"

আমি বিনয়পূর্বক কহিলাম, "এরূপ কৌতূহল আমি ত্যাগ করিয়াছি। তোমাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে হইবে না। দ্বার মুক্ত কর, আমি বাহির হইয়া যাই।"

রমণী কহিল, "এমন কথা আমাকে কেহ বলে নাই। সকলে বেশ পরিবর্তন করিয়াই যে আমার মুখ দেখিতে পাইত, তাহা নয়। কিন্তু তুমি আমার মুখ দেখিবার ইচ্ছাই ত্যাগ করিয়াছ। তোমার কথায় আমি প্রীত হইয়াছি।"

আমি কহিলাম, "তোমার নিকট আমি মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি, অপর কিছু প্রার্থনীয় নাই।"

রমণী আমার হস্ত স্পর্শ করিল—মলয়বাহিত সৌরভের ন্যায় মৃদুস্পর্শ, কিন্তু সেই স্পর্শে আমার আপাদমস্তক তীব্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গে কম্পিত হইয়া উঠিল। মৃদু মৃদু, ঈষৎ কম্পিতস্বরে রমণী কহিল, "তুমি বার বার ঐ কথা কেন বলিতেছ? তুমি ত বন্দী নও যে, মুক্তি প্রার্থনা করিতেছ। আর যদি বন্দীই হও ত রূপের, প্রেমের বন্দী, রমণীর কোমল বাহুলতার বন্দী, সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিতে চাহিতেছ কেন? আমি রূপসী কি কুৎসিতা, না দেখিয়াই চলিয়া যাইবে?"

আমি কহিলাম, "রূপের মোহই যদি অন্বেষণ করিব, তাহা হইলে এ বেশ ধারণ করিয়া এই দূরদেশে ভ্রমণ করিতেছি কেন? তুমি যে সকল কথা কহিতেছ, তাহা শ্রবণ করাও আমার পক্ষে নিষিদ্ধ।"

রমণী কহিল, "তোমার নবীন যৌবন, বৈরাগ্যের কথাই তোমার মুখে কঠোর শুনায়। আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, আইস, আমি স্বয়ং তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

দ্বার মুক্ত করিয়া রমণী প্রদীপ নির্বাপিত করিল। দেখিলাম, বাহিরে অল্প অন্ধকার, প্রভাত আগতপ্রায়। রমণী আমাকে পথ দেখাইয়া অগ্রে চলিল। অল্প দূর গিয়া অতি মনোহর উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। উদ্যানে লতাবেষ্টিত কুঞ্জগৃহের মধ্যে রমণী আমাকে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং পার্শ্বে বসিল।

আমি উঠিবার চেষ্টা কবিলাম, কিন্তু রমণী আমার হস্ত ধারণপূর্বক আমাকে নিবারণ করিল। তাহার পর মৃদু মৃদু আমার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ আমার চিত্ত বিহ্বল হইল। অবশেষে অস্থিরচিত্তে রমণীব হস্ত ধারণ করিয়া কহিলাম, "তোমার অবগুণ্ঠন মোচন কর, তোমার মুখ দেখিব। অতৃপ্তনয়নে কতক্ষণ তোমার অবগুণ্ঠন দেখিব?"

এই কথা আমি বলিবামাত্র রমণী চকিতের ন্যায় আমার পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল। মধুর ব্যঙ্গসূচক হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তাহার পর রমণী দ্রুতগমনে চলিয়া গেল।

প্রভাত হইয়াছে, সূর্যোদয়ের সূচনা হইতেছে। অকস্মাৎ মোহভঙ্গ হইয়া

অত্যন্ত আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। বেগে পলায়ন করিবার প্রয়াস করিলাম। কোথায় পলায়ন করিব? উদ্যানের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, প্রাচীরের উপর উঠিবার অথবা তাহা লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া উদ্যানের একান্তে উপবেশন করিলাম।

সূর্যোদয়ের কিছু পরে পূর্বরাত্রির পরিচিত একটি যুবতী আমাকে ডাকিতে আসিল। তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "অবগুণ্ঠনবতী এই গৃহকর্ত্রী কে?"

যুবতী হস্তদ্বারা আমার মুখরোধ করিয়া কহিল, "ও কথা আর কখনও জিজ্ঞাসা করিও না। যদি নিজে জানিতে পার ত জানিবার চেষ্টা করিও। আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিলে বিপদ ঘটিবে।"

যুবতীর মুখ দেখিয়া বোধ হইল, বিদ্রূপ নহে। অগত্যা আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

দিবাভাগে অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে আর দেখিতে পাইলাম না। রাত্রি-কালে আমাকে গৃহের বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেল। আবার সেইরূপ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। অট্টালিকার সম্মুখে সেই হ্রদ। সোপানশ্রেণীর তলে সেই তরণী রহিয়াছে। সেই পুরুষ সেইরূপ হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার সংকেতমতো তাহার পার্শ্বে গমন করিলাম। দুই জনে একত্রে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলাম। পুরুষ কহিল, "তুমি এখনও বেশ-পরিবর্তন কর নাই?"

আমি কহিলাম, "কেন, বেশ কেন পরিবর্তন করিব?"

পুরুষ কহিল, "এখানে যে আসে, সেই করে। তুমি বাদ যাইবে কেন?"

আমি কহিলাম, "বলপ্রয়োগ করিলে আমি নিরুপায়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক আমি কখনো বেশ পরিবর্তন করিব না।"

পুরুষ কহিল, "মূর্খ, আমিও তোমার মতো এক দিন ঐ কথা বলিয়া-ছিলাম।"

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "তুমিও বেশ পরিবর্তন করিয়াছ? তুমিও কি অবগুণ্ঠনবতী রমণীর মুখ— ?"

পুরুষের মুখ ভয়ে শুষ্ক ও মলিন হইয়া গেল। আমার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "চুপ কর। ও সকল কথার কখনো উল্লেখ করিও না।"

পূর্বরাত্রির মতো জল-বক্ষে আবার সংগীত-ধ্বনি উঠিল। সেইরূপ রূপের

উচ্ছ্বাস, সেইরূপ তালের মিলন, তরণীর সেইরূপ আনন্দ-হিল্লোল। অবশেষে তরণী হ্রদের পরপারে উপনীত হইবামাত্র আমি লম্ফ দিয়া তীরে উঠিলাম। কহিলাম, "তোমাদের আনন্দ তোমাদের থাকুক, আমি আর তোমাদের সঙ্গে যাইব না।" বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলাম। পশ্চাতে হাস্যতরঙ্গ উঠিল। ফিরিয়া দেখিলাম, রমণীগণ নৌকা হইতে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, অনুচরগণ বেগে ধাবিত হইতেছে। আমি যথাসাধ্য বেগে ধাবমান হইলাম, কিন্তু পথ আমার অপরিচিত, স্থান বন্ধুর, এরূপ স্থানে যাতায়াতের অভ্যাস নাই। অনুচররা অবলীলাক্রমে বেগে আসিতে লাগিল, তাহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। কিছু দূর উপরে উঠিয়া দেখি, নিকটেই কয়েকটি কুটির। তখন আমি সহায়তা পাইবার আশায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম। অনুচররাও আসিয়া আমাকে ধরিল।

এমন সময় কুটির হইতে জটাজুটধারী কয়েকটি মহাকায় পুরুষ নির্গত হইলেন। আমার গৈরিক বেশ দেখিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অতি গম্ভীরস্বরে অনুচরদিগকে কহিলেন, "ইহাকে মুক্ত কর!"

তাঁহাদিগের বিশাল মূর্তি দেখিয়া অনুচরগণ আমাকে ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ মুখে ফিরিয়া গেল। আমি সেই পুরুষদিগের অনুবর্তী হইয়া কুটিরে প্রবেশ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে কুটিরে প্রবেশ করিলাম, তাহার অভ্যন্তরে এক জন সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন। মুখশ্রী অত্যন্ত প্রশান্ত, চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আমি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। আমার সঙ্গে যে কয় জন সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, বিবৃত করিলেন। তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া আসনস্থ সন্ন্যাসী আমাকে কহিলেন, "কোনো চিন্তা নাই, অদ্য রাত্রে বিশ্রাম কর। কল্য তোমায় সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

অনুচরগণ আরও লোকবল লইয়া আমায় না ধরিতে আইসে, আমি সেই আশঙ্কা প্রকাশ করিলাম। সন্ন্যাসী কহিলেন, "কোনো আশঙ্কা নাই, এ স্থানে উপদ্রুত হইবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম কর।"

অপর সন্ন্যাসীরা আমাকে আর একটি কুটির দেখাইয়া দিলেন। পর্ণ-শয্যায় শয়ন করিলাম।

প্রভাত হইলে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নির্ঝরের জলে স্নান করিলাম। স্নানান্তে সন্ন্যাসিপ্রদত্ত ফলমূল ভোজন করিলাম। পূর্বোক্ত প্রধান সন্ন্যাসী সেই কুটিরে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি ইঙ্গিতপূর্বক আমাকে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। আমি উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ব্রহ্মচারী ?"

আমি ব্রহ্মচর্য বা অন্য কোনো আশ্রমই গ্রহণ করি নাই। সন্ন্যাসীকে প্রকৃত কথাই বলিলাম। বলিলাম, "এই বেশে ভ্রমণ করিবার সুবিধা, সেই জন্য গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছি। আমি নিঃস্ব পথিকমাত্র, নানা দেশে, নানা তীর্থে পর্যটন করিতেছি। এ পর্যন্ত কিছুই শিক্ষা হয় নাই।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়ঃক্রম অল্প দেখিতেছি, তুমি সংসার ত্যাগ করিলে কেন ?"

সকল কথা আমি খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আনুপূর্বিক সকল কথা আমি বলিতে পারিব না, আমাকে মার্জনা করিবেন। সংসারে সুখ না পাইয়া, বিরক্ত হইয়া আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি।"

সন্ন্যাসী স্মিতমুখে কহিলেন, "গোপনীয় কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। সুখের সন্ধানই ভ্রম। সংসারের ভিতরেও সুখ নাই, সংসারের বাহিরেও সুখ নাই।"

আমি কহিলাম, "বিষয়ীর অপেক্ষা ত্যাগী যে অধিক সুখী, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তাহা নহে। সুখকে ত্যাগ করিলে তবেই সুখ পাওয়া যায়। সুখ ত বাহিরে নাই। আপনাতেই সুখ। আপনার ভিতরে অনুসন্ধান কর, সুখ পাইবে। সে অনুসন্ধানের ক্ষমতা না থাকে, যথাসাধ্য ইহজীবনের কর্তব্য পালন করিয়া যাও। নিষ্ঠাতেও তৃপ্তি আছে।"

উপদেশের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আমি নিরুত্তর রহিলাম।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তোমার কি ইচ্ছা ? এই আশ্রমে কিছু দিন অবস্থান করিবে, কিংবা অন্যত্র যাইবে ?"

আমি কহিলাম, "যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে কিছুদিন আপনাদের আশ্রয়ে থাকি। যে দেশে উপস্থিত হইয়াছি, একা ভ্রমণ করিতে কিঞ্চিৎ আশঙ্কা হয়।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কেন, আশঙ্কা কিসের ?"

পূর্ব দুই দিবসে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আদ্যোপান্ত কহিলাম। সন্ন্যাসী শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন , কহিলেন, "ইহা উপকথার মতো শুনাইতেছে।"

আমি কহিলাম, "যাঁহারা কল্য রাত্রে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা কতক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমার মুখে যাহা শুনিলেন, তাহা আমি না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "অবগুণ্ঠনবতী রমণী কে ?"

"আমি কিছুই জানি না। তাহার মুখ পর্যন্ত দেখি নাই।"

সন্ন্যাসী মৌন হইলেন। কিয়ৎকাল পরে কহিলেন, "আমার সন্দেহ হইতেছে, এই রমণীদ্বারা বহু অনিষ্ট ঘটিয়া থাকিবে।"

"আমার তাহাই বিশ্বাস।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "ইহার কি কোনো প্রতিকার নাই ?"

আমি কহিলাম, "রাজা না করিলে কে করিবে ?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমরা বলশূন্য, কিন্তু একটা স্ত্রীলোকের অত্যাচার কি নিবারণ করিতে পারি না ?"

"কি করিবেন ?"

"তাহাই ভাবিতেছি," বলিয়া সন্ন্যাসী মৌন হইলেন।

রাত্রে আমি শয়ন করিয়া আছি, এমন সময় সন্ন্যাসী গাত্র স্পর্শ করিয়া আমায় জাগরিত করিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন, "উঠিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। কুটির হইতে বাহির হইয়া সন্ন্যাসী হ্রদের অভিমুখে চলিলেন। হ্রদের সম্মুখে উপনীত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যাইতেছেন ?"

"সেই রমণীর গৃহের অভিমুখে। আমাকে পথ দেখাইয়া দাও।"

ভীত হইয়া কহিলাম, "আমি সে দিকে যাইব না। এবার ধৃত হইলে আর পলায়ন করিতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কোনো আশঙ্কা নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া আমার সঙ্গে আইস।"

আজ রাত্রে সংগীতের ধ্বনি নাই, হ্রদে তরণীর চিহ্ন নাই। অট্টালিকা কোন্ দিকে, আমার স্মরণ নাই। সন্ন্যাসীকে কেমন করিয়া পথ দেখাইয়া দিব?

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি। তুমি কেবল গৃহ চিনিয়া লইবে।"

সন্ন্যাসী অগ্রে চলিলেন, আমি তাঁহার পদানুসরণ করিলাম। বহুদূর গমন করিয়া দেখিলাম, হ্রদের তীরে বৃহৎ প্রাসাদ জ্যোৎস্নায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি কহিলাম, "এই বাড়ি।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি এই গৃহে প্রবেশ করিব।"

তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া আমি পিছাইয়া পড়িলাম। সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার যাহাই হউক, আমার সমূহ বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং দ্বিতীয়বার ধৃত হইলে কি দুর্গতি হইবে, তাহাও জানি না। সন্ন্যাসীর কথায় আমার ভয় হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি স্মিতমুখে কহিলেন, "তোমার মনে যদি শঙ্কা হয় ত গৃহের নিকটে অবস্থান করিও না। দূরে কোনো এমন স্থানে গমন কর, যেখান হইতে এ গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ ভয়ের কারণ হইলে সহজে পলায়ন করিতে পারিবে। আমার জন্য কোনো চিন্তা করিও না।"

সন্ন্যাসীর কথার শ্লেষ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু ভয় ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাঁহার কথামতো কিছু দূর গমন করিয়া এক ছায়াবহুল বৃহৎ বৃক্ষতলে অবস্থান করিলাম। সে স্থান হইতে সে গৃহ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পলায়নের পথও অবারিত। ছায়ান্ধকারে আমাকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বৃক্ষতলে অন্ধকারে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া সেই সমুখস্থিত অট্টালিকা-নিহিত রহস্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। কোন সাহসে সন্ন্যাসী সেই গৃহে একা প্রবেশ করিলেন? কিরূপেই বা সেই স্থান হইতে মুক্ত হইয়া আসিবেন? কে সেই রমণী? কিসের জন্য এরূপ করিয়া এমন স্থানে বাস করে?

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। পথে পথিক নাই। হ্রদে তরণী নাই। চারি-

দিকে কেবল ভীতিসাধক অস্ফুট নিশীথধ্বনি। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

অনুমান রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। সহসা অট্টালিকার প্রবেশদ্বার মুক্ত হইল। সেই পথে সন্ন্যাসী বাহিরে আসিলেন। পশ্চাতে অবগুণ্ঠনাবৃতা সেই রমণী। সঙ্গে আর কেহ নাই। তাঁহারা নিষ্ক্রান্ত হইলে গৃহদ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল। সন্ন্যাসী স্থির অবিচলিত পদক্ষেপে আমার সন্নিধানে আগমন করিলেন। সংকেতপূর্বক আদেশ করিলেন, "আইস।" আমি তাঁহার অনুবর্তী হইলাম। রমণী পূর্বের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।

বিস্ময় বর্ধিত হইতে লাগিল। এই রমণী ঐশ্বর্যশালিনী, দাসদাসীপূর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া কেন এই সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ আগমন করিতেছে? কিরূপ কৌশলে অথবা কোন বলে সন্ন্যাসী এই নারীকে কিঙ্করীর মতো সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন? সন্ন্যাসীর মুখে কথা নাই। রমণীও নীরব। অন্ধকারে পদধ্বনি শুনা যায়। মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি কোথাও শ্রুত হয় না। বর্ধিত-কৌতূহল হইয়া আমি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলাম। যে স্থান হইতে সন্ন্যাসী পূর্বে আগমন করেন, সে দিকে ফিরিলেন না। হ্রদের কূল ত্যাগ করিয়া লোকালয়ের অভিমুখ পশ্চাতে রাখিয়া, আর এক দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখি, সম্মুখে অন্ধকার অরণ্য। সন্ন্যাসী নিঃশঙ্কচিত্তে সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণী একবার দাঁড়াইল। কিন্তু সন্ন্যাসী পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহাব প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করাতে পূর্বের ন্যায় নীরবে তাহার অনুগামিনী হইল। আমি রমণীর পশ্চাৎ অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। রাত্রি অন্ধকার। অরণ্যের বাহিরে অন্ধকার। অরণ্যের ভিতরে অতি গাঢ় সূচিভেদ্য অন্ধকার। পথ আছে কি না, দেখিতে পাওয়া যায় না। পথ থাকিলেও লক্ষ্য হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু সন্ন্যাসী পূর্বের ন্যায় অভ্রান্ত অবিচলিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রমণী এবং আমি যথাসম্ভব তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম।

কিছু দূর এইরূপ গেল। ক্বচিৎ পেচকরব, বৃক্ষশাখায় বাদুড়ের পক্ষশব্দ, দূর কখনও কোনো নিশাচর শ্বাপদের হৃৎকম্পকারী গর্জন। অকস্মাৎ অনতিদূরে আলোক দেখিতে পাইলাম। নিকটে উপনীত হইয়া দেখি,

অতি প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির। পার্শ্বে ভগ্নচূড়া স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে। চারিদিকে অতি বিশাল বটবৃক্ষশ্রেণী। চারিদিকে জটা ভূমিতে পতিত হইয়াছে। মন্দিরের প্রকোষ্ঠে আলোক জ্বলিতেছে। সন্ন্যাসীর সহিত আমরা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আলোক প্রদীপের নহে—ভূগর্ভস্থ কোনোরূপ প্রজ্বলিত বাষ্প হইতে আলোক নির্গত হইতেছে। ক্ষীণ নীল শিখা। কখনও ম্লান, কখনও উজ্জ্বল। কখনও নির্বাণোন্মুখ, কখনও জ্বালাময়। মন্দিরের বাহিরের যেরূপ ভগ্নাবস্থা, ভিতরে সেরূপ নহে। আয়তন বৃহৎ। কক্ষ অনেকগুলি আছে, এরূপ মনে হয়। আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী কিছুকাল চিন্তা করিলেন। পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তিষ্ঠ", রমণীকে কহিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।" কক্ষে দুইজন প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইল। আমি বাহিরে সেই আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আলোকের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে চিত্তের বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। কোথায় আসিয়াছি, কাহার সহিত আসিয়াছি, সে জ্ঞান ক্রমশঃ লুপ্ত হইল। আলোকে নানাবিধ মূর্তি দেখিতে লাগিলাম। কখনও বালিকার অবয়ব, কখনও তরুণী, কখনও ভয়ংকর নৃশংস পুরুষমূর্তি, কখনও আলোক এবং ছায়ার নৃত্য। ক্রমশঃ দৃষ্টি স্থির হইল। দেখিলাম, সম্মুখে রত্নময় পালঙ্কের উপর সুন্দরী রমণী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। পালঙ্কের চারিপার্শ্বে মুগ্ধলোচনে বহুসংখ্যক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমণী চক্ষু উন্মীলন করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ পুরুষদিগকে দেখিয়া অল্প হাসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। আপাদমস্তক বসনে আচ্ছাদিত করিল। বস্ত্রাবরণে তাহার দেহ আন্দোলিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই আবরণ পুনর্মুক্ত হইল। কোথায় সে সুন্দরী নয়নমোহিনী রমণী! শয্যা হইতে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ নিঃশ্বসিতা ফণিনী ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। আমি চীৎকার করিয়া পশ্চাতে সরিয়া আসিলাম।

সেই সময় কক্ষদ্বার মুক্ত হইল। রমণী বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। সন্ন্যাসী পূর্বের ন্যায় অবিচলিত, বিশাল দেহ স্থির। অতি গম্ভীর বজ্রস্বরে কহিলেন, "অবগুণ্ঠন মুক্ত কর।"

কম্পিতহস্তে ধীরে ধীরে রমণী অবগুণ্ঠন মুক্ত করিল। আমার মতো

কত ব্যক্তি হয় ত বহু যত্ন করিয়াও এই রমণীর মুখ কখনো দেখিতে পায় নাই। এখন সন্ন্যাসীর কঠিন আদেশে তাহার মুখ অনাবৃত হইল। আমি রুদ্ধনিশ্বাসে নির্নিমেষ লোচনে রমণীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

তেমন রূপ আমি কখনো দেখি নাই, কেবল রূপ নহে, চক্ষে সেরূপ তীব্র জ্বালা পূর্বে দেখি নাই। বুঝিতে পারিলাম যে, যাহার এত রূপ, সে ইচ্ছা করিলে বহু অনর্থ ঘটাইতে পারে। পূর্বরাত্রে রমণীর গৃহে যে সকল পরিচ্ছদ দেখিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হইল।

সন্ন্যাসী একবার রমণীর মুখের দিকে দেখিলেন, আর বার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর রমণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি ঐ রূপ লইয়া অসংখ্য লোকের সর্বনাশ করিয়াছ। এই যুবক সন্ন্যাসিবেশে আসিয়াছিল, তুমি ইহারও বিপদের প্রয়াস পাইয়াছিলে। তোমার মতো নারীবেশে রাক্ষসী আর আছে কি না, জানি না, কিন্তু তোমার এই দুষ্ক্রিয়া যদি রোধ না করিতে পারি, তাহা হইলে বৃথাই আমার সাধনা।"

মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসী পূর্বের ন্যায় পথ দেখাইয়া চলিলেন। অরণ্য অতিক্রান্ত হইলে রমণীকে কহিলেন, "এখন গৃহে যাও। এখন প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

রমণী রোদন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

তখন সন্ন্যাসী আমার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কোমলস্বরে কহিলেন, "বৎস, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। কঠোর সন্ন্যাস-আশ্রম তোমার তরে নহে। তুমি যে রমণীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, সে গুণবতী, তাহাকে লইয়ে তুমি সুখে গৃহস্থ-আশ্রম কর।"

তখন স্বপ্নশ্রুত সেই স্বর আমার শ্রবণে পুনঃ প্রবেশ করিল—"ঈপ্সিত, চিরদয়িত, এস হে!"

সন্ন্যাসী দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। আমি পরদিবস প্রাতে গৃহমুখে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

ভিখারিণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাশ্মীরের দিগন্তব্যাপী, জলদস্পর্শী শৈলমালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরগুলি আঁধার আঁধার ঝোপঝাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। এখানে সেখানে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষছায়ার মধ্য দিয়া একটি দুইটি শীর্ণকায়, চঞ্চল, ক্রীড়াশীল নির্ঝর গ্রাম্য কুটিরের চরণ সিক্ত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলগুলির উপর দ্রুত পদক্ষেপ করিয়া এবং বৃক্ষচ্যুত ফুল ও পত্রগুলিকে তরঙ্গে তরঙ্গে উলটপালট করিয়া নিকটস্থ সরোবরে লুটাইয়া পড়িতেছে। দূরব্যাপী, নিস্তরঙ্গ সরসী, লাজুক ঊষার রক্তরাগে, সূর্যের হেমময় কিরণে, সন্ধ্যা স্তর-বিন্যস্ত মেঘমালার প্রতিবিম্বে, পূর্ণিমার বিগলিত জ্যোৎস্নাধারায় বিভাসিত হইয়া শৈললক্ষ্মীর বিমল দর্পণের ন্যায় সমস্ত দিনরাত্রি হাস্য করিতেছে। ঘন-বৃক্ষ বেষ্টিত অন্ধকার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আঁধারের অবগুণ্ঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লুকাইয়া আছে! দূরে দূরে হরিৎ শস্যময় ক্ষেত্রে গাভী চরিতেছে, গ্রাম্য বালিকারা সরসী হইতে জল তুলিতেছে, গ্রামের আঁধার কুঞ্জে বসিয়া অরণ্যের ম্রিয়মাণ কবি বউ-কথাকও মর্মের বিষণ্ণ গান গাহিতেছে। সমস্ত গ্রামটি যেন একটি কবির স্বপ্ন।

এই গ্রামের দুইটি বালকবালিকার বড়োই প্রণয় ছিল। দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া বকুলের কুঞ্জে কুঞ্জে দুইটি অঞ্চল ভরিয়া ফুল তুলিত; শুকতারা আকাশে ডুবিতে ডুবিতে ঊষার জলদমালা লোহিত না হইতে হইতেই সরসীর বক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া ছিন্ন কমল দু'টির ন্যায় পাশাপাশি সাঁতার দিয়া বেড়াইত। নীরব মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ায় শৈলের সর্বোচ্চ শিখরে বসিয়া ষোড়শ বর্ষীয় অমরসিংহ ধীর মৃদুলস্বরে রামায়ণ পাঠ করিত, দুর্দান্ত রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ পাঠ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত, দশম বর্ষীয়া কমল দেবী তাহার মুখের পানে স্থির হরিণ-নেত্র তুলিয়া নীরবে শুনিত, অশোক বনে সীতার বিলাপ-কাহিনী শুনিয়া পক্ষ্মরেখা অশ্রুসলিলে সিক্ত করিত। ক্রমে গগনের বিশাল প্রাঙ্গণে তারকার দীপ জ্বলিলে, সন্ধ্যার অন্ধকার-অঞ্চলে

জোনাকী ফুটিয়া উঠিলে, দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া কুটিরে ফিরিয়া আসিত। কমল দেবী বড়ো অভিমানিনী ছিল, কেহ তাহাকে কিছু বলিলে সে অমরসিংহের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত, অমর তাহাকে সান্ত্বনা করিলে, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলে, আদর করিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত কপোল চুম্বন করিলে বালিকার সকল যন্ত্রণা নিভিয়া যাইত; পৃথিবীর মধ্যে তাহার আর কেহই ছিল না; কেবল একটি বিধবা মাতা ছিল, আর স্নেহময় অমরসিংহ ছিল, তাহারাই বালিকাটির অভিমান, সান্ত্বনা ও ক্রীড়ার স্থল।

বালিকার পিতা গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন; রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, এবং সম্ভ্রমের সুদূর চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া কমল গ্রামের বালিকাদের সহিত কখনো মিশে নাই, বাল্যকাল হইতে তাহার সাধের সঙ্গী অমরসিংহের সহিত খেলিয়া বেড়াইত। অমরসিংহ সেনাপতি অজিতসিংহের পুত্র, অর্থ নাই কিন্তু উচ্চ বংশজাত, এই নিমিত্ত কমল ও অমরের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। একবার মোহনলাল নামে একজন ধনীর পুত্রের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয়, কিন্তু কমলের পিতা তাহার চরিত্র ভালো নয় জানিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই।

কমলের পিতার মৃত্যু হইল, ক্রমে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গেল, ক্রমে তাঁহার প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকাটি আস্তে আস্তে ভাঙিয়া গেল, ক্রমে তাঁহার পারিবারিক সম্ভ্রম অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইল, এবং ক্রমে তাঁহার রাশি রাশি বন্ধু একে একে সরিয়া পড়িল। অনাথা বিধবা জীর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করিলেন। সম্পদের সুখময় স্বর্গ হইতে দারুণ দারিদ্র্যে নিপতিত হইয়া বিধবা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। সম্ভ্রম রক্ষা করিবার উপায় দূরে থাক জীবন রক্ষারও কোনো সম্বল নাই, আদরিণী কন্যাটি কি করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ সহ্য করিবে? স্নেহময়ী মাতা ভিক্ষা করিয়াও কমলকে কোনো মতে দারিদ্র্যের রৌদ্র ভোগ করিতে দেন নাই।

অমরের সহিত কমলের শীঘ্রই বিবাহ হইবে, বিবাহের আর দুই এক সপ্তাহ অবশিষ্ট আছে, অমর গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে কমলকে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কত কি সুখের কাহিনী শুনাইত; বড়ো হইলে দুইজনে ঐ

শৈলশিখরে কত খেলা খেলিবে, ঐ বকুলের কুঞ্জে কত ফুল তুলিবে, চুপি চুপি গম্ভীরভাবে তাহারি পরামর্শ করিত। বালিকা অমরের মুখে তাহাদের ভবিষ্যৎ ক্রীড়ার গল্প শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিহ্বল নেত্রে অমরের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। এইরূপে যখন এই দুইটি বালক বালিকা কল্পনার অস্ফুট জ্যোৎস্নাময় স্বর্গে খেলা করিতেছিল তখন রাজধানী হইতে সংবাদ আসিল যে রাজ্যের সীমায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। সেনানায়ক অজিতসিংহ যুদ্ধে যাইবেন এবং যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পুত্র অমরসিংহকেও সঙ্গে লইবেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে, শৈলশিখরের বৃক্ষচ্ছায়ায় অমর ও কমল দাঁড়াইয়া আছে। অমরসিংহ কহিতেছেন "কমল! আমি ত চলিলাম, এখন রামায়ণ শুনিবি কার কাছে?" বালিকা ছল ছল নেত্রে মুখের পানে চাহিয়া রহিল। "দেখ কমল, এই অস্তমান সূর্য আবার কাল উঠিবে, কিন্তু তোর কুটিরদ্বারে আমি আর আঘাত দিতে যাইব না, তবে বল দেখি, আর কাহার সহিত খেলা করিবি?" কমল কিছুই কহিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল। অমর কহিল—"সখি! যদি তোর অমর যুদ্ধ ক্ষেত্রে মরিয়া যায়, তাহা হইলে"—কমল ক্ষুদ্র বাহু দুটিতে অমরের বক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, "আমি যে তোমাকে ভালোবাসি অমর, তুমি মরিবে কেন?" অশ্রুসলিলে বালকের নেত্র ভরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "কমল, প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, আজ এই শেষবার তোকে কুটিরে পৌছাইয়া দিই।" দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া কুটিরের অভিমুখে চলিল। গ্রামের বালিকারা জল তুলিয়া গান গাহিতে গাহিতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, বনশ্রেণীর মধ্যে অলক্ষিতভাবে একটির পর একটি পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া সারা হইতেছে, আকাশময় তারকা ফুটিয়া উঠিল। অমর কেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এই অভিমানে কমল কুটিরে গিয়া মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অমর অশ্রুসলিলে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

অমর পিতার সহিত সেই রাত্রেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিল, গ্রামের শেষ প্রান্তের শৈলশিখরোপরি উঠিয়া একবার ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, শৈলগ্রাম জ্যোৎস্নালোকে ঘুমাইতেছে, চঞ্চল নির্ঝরিণী নাচিতেছে, ঘুমন্ত গ্রামের সকল কোলাহল স্তব্ধ, মাঝে মাঝে দুই একটি রাখালের গানের অস্ফুট স্বর গ্রাম-শৈলের শিখরে গিয়া মিশিতেছে! অমর দেখিল, কমলদেবীর লতাপাতা

বেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটিরটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় ঘুমাইতেছে, ভাবিল ঐ কুটিরে হয়ত এতক্ষণে শূন্যহৃদয়া মর্ম-পীড়িতা বালিকাটি উপাধানে ক্ষুদ্র মুখখানি লুকাইয়া নিদ্রাশূন্য নেত্রে আমার জন্য কাঁদিতেছে। অমরের নেত্র অশ্রুতে পূরিয়া গেল। অজিতসিংহ কহিলেন, "রাজপুত-বালক! যুদ্ধযাত্রার সময় কাঁদিতেছিস্!" অমর অশ্রু মুছিয়া ফেলিল।

শীতকাল। দিবা অবসান হইয়া আসিতেছে, গাঢ় অন্ধকারময় মেঘরাশি উপত্যকা, শৈলশিখর, কুটির, বন, নির্ঝর, হ্রদ, শস্যক্ষেত্র একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, অবিশ্রান্ত বরফ পড়িতেছে, তরল তুষারে সমস্ত শৈল আচ্ছন্ন হইয়াছে, পত্রহীন শীর্ণ বৃক্ষ সকল, শ্বেত মস্তকে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান; দারুণ তীব্র শীতে হিমালয় গিরিও যেন অবসন্ন হইয়া গিয়াছে, এই শীত-সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া, গাঢ় বাষ্পময় স্তম্ভিত মেঘরাশি ভেদ করিয়া একটি ম্লান-মুখশ্রী ছিন্নবসনা দরিদ্র-বালিকা অশ্রুময় নেত্রে শৈলের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে; তুষারে পদতল প্রাস্তরের ন্যায় অসাড় হইয়া গিয়াছে, শীতে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, মুখ নীলবর্ণ, পার্শ্ব দিয়া দুই একটি নীরব পান্থ চলিয়া যাইতেছে, হতভাগিনী কমল করুণ নেত্রে এক একবার তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেছে, কি বলিতে গিয়া বলিতেছে না, আবার অশ্রুসলিলে অঞ্চল সিক্ত করিয়া তুষারস্তরে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিতেছে। কুটিরে রুগ্না মাতা অনাহারে শয্যাগত, সমস্ত দিন বালিকা এক মুষ্টিও আহার করিতে পায় নাই, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, সাহস করিয়া ভীতিবিহ্বলাবালা কাহারো কাছে ভিক্ষা চাহিতে পারে নাই, বালিকা কখনো ভিক্ষা করে নাই, কি করিয়া ভিক্ষা করিতে হয় জানে না, কাহাকে কি বলিতে হয় জানে না; আলুলায়িত কুন্তল রাশির মধ্যে সেই ক্ষুদ্র করুণ মুখখানি দেখিলে, দারুণ শীতে কম্পমান তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহখানি দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইত। ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইল, নিরাশ বালিকা ভগ্ন হৃদয়ে শূন্য অঞ্চলে কুটিরে ফিরিয়া যাইতেছে; কিন্তু অসাড় পা আর উঠে না, অনাহারে দুর্বল, পথশ্রমে ক্লান্ত, নিরাশায় ম্রিয়মাণ, শীতে অবসন্ন বালিকা আর চলিতে পারে না, অবশ হইয়া পথপ্রান্তে তুষার-শয্যায় শুইয়া পড়িল, শরীর ক্রমে আরো অবসন্ন হইতে লাগিল, বালিকা বুঝিল ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া তুষারে চাপা পড়িয়া মরিবে, মাকে স্মরণ করিয়া

কাঁদিয়া উঠিল, জোড় হস্তে কহিল, "মা ভগবতি, আমাকে মারিয়া ফেলিও না, আমাকে রক্ষা কর, আমি মরিলে যে আমার মা কাঁদিবে, আমার অমর কাঁদিবে।" ক্রমে বালিকা অচেতন হইয়া পড়িল, কমল আলুলায়িত কুন্তলে, শিথিল অঞ্চলে তুষারে অর্ধমগ্না হইয়া বৃক্ষচ্যুত মলিন ফুলটির মতো পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিল। তুষারের উপর তুষার পড়িতে লাগিল, বালিকার বক্ষের উপর তুষারের কণা পড়িতেছে ও গলিতেছে, এবং ক্রমে জমিয়া যাইতেছে। এই আঁধার রাত্রিতে একজন পান্থও পথ দিয়া যাইতেছে না। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; বরফ জমিতে লাগিল, বালিকা একাকিনী শৈলপথে পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কমলের মাতা ভগ্ন কুটিরে রোগ শয্যায় শয়ান, জীর্ণ গৃহ ভেদ করিয়া শীতের বাতাস তীব্রবেগে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। বিধবা তৃণশয্যায় শুইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন। গৃহ অন্ধকার, প্রদীপ জ্বালিবার লোক নাই, কমল প্রাতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছে, এখনো ফিরিয়া আসে নাই, ব্যাকুল বিধবা প্রত্যেক পদশব্দে কমল আসিতেছে বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। কমলকে খুঁজিবার জন্য বিধবা কতবার উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই, কত কি আশঙ্কায় আকুল হইয়া মাতা দেবতার নিকট কাতর ক্রন্দনে প্রার্থনা করিয়াছেন, অশ্রুজলে কতবার কহিয়াছেন, "আমি হতভাগিনী, আমার মরণ হইল না কেন? কখনো ভিক্ষা করিতে জানে না যে বালিকা, তাহাকেও আজ অনাথার মতো দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইতে হইল? ক্ষুদ্র বালিকা অধিক দূরে চলিতে পারে না, সে এই অন্ধকারে, তুষারে, বৃষ্টিতে কি করিয়া বাঁচিবে?" উঠিতে পারেন না, অথচ কমলকে দেখিতে পাইতেছেন না, বিধবা বক্ষে করাঘাত করিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। দুই একজন প্রতিবাসী, বিধবাকে দেখিতে আসিয়াছিল, বিধবা তাহাদের চরণ জড়াইয়া ধরিয়া সজল নয়নে কাতরভাবে মিনতি করিলেন, "আমার পথহারা কমল কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একবার তাহাকে খুঁজিতে যাও।" তাহারা বলিল, "এই তুষারে, অন্ধকারে আমরা ঘরের বাহিরে যাইতে পারি না।" বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন, "একবার যাও, আমি অনাথ দরিদ্র, অর্থ নাই, তোমাদের কি দিব বল। ক্ষুদ্র বালিকা, সে পথ চিনে না, সে আজ

সমস্ত দিন কিছু খায় নাই, তাহাকে মাতার ক্রোড়ে আনিয়া দেও, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন।" কেহ শুনিল না, সে বৃষ্টিবজ্রে কে বাহির হইবে? সকলেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুর্বল বিধবা ক্লান্ত হইয়া গিয়াছেন, নির্জীবভাবে শয্যায় পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল, বিধবা চকিত নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "কমল, মা, আইলি?" একজন বাহির হইতে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে কে আছে?" গৃহ হইতে কমলের মাতা উত্তর দিলেন। সে শাখাদীপ* হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল এবং কমলের মাতাকে কি কহিল, শুনিবামাত্র বিধবা চীৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে তুষার-ক্লিষ্ট কমল ক্রমে ক্রমে চেতন লাভ করিল, চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দেখিল, একটি প্রকাণ্ড গুহা ইতস্ততঃ বৃহৎ শিলাখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, গাঢ় ধূম্র মেঘে গুহা পূর্ণ; সেই মেঘের অন্ধকার ভেদ করিয়া শাখাদীপের আলোকদীপ্ত কতকগুলি কঠোর শ্মশ্রুপূর্ণ মুখ কমলের দিকে চাহিয়া আছে। প্রাচীরে কুঠার, কৃপাণ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র লম্বিত আছে, কতকগুলি সামান্য গার্হস্থ্য উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বালিকা সভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিল। আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল, একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?" বালিকা উত্তর দিতে পারিল না, বালিকার বাহু ধরিয়া সবেগে নাড়াইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?" কমল ভীতকম্পিত মৃদুস্বরে কহিল, "আমি কমল।" সে মনে করিয়াছিল এই উত্তরেই তাহারা তাহার সমস্ত পরিচয় পাইবে। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আজ সন্ধ্যার দুর্যোগের সময় পথে ভ্রমণ করিতেছিলে কেন?" বালিকা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আজ আমার মা সমস্ত দিন আহার করিতে পান নাই"—সকলে হাসিয়া উঠিল, তাহাদের নিষ্ঠুর অট্টহাস্যে গুহা প্রতিধ্বনিত হইল, বালিকার মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল, কমল সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল, দস্যুদের

* পার্বত্য লোক চীড় বৃক্ষের শাখা জ্বালাইয়া মশালের ন্যায় ব্যবহার করে।

হাস্য বজ্রধ্বনির ন্যায় বালিকার বক্ষে গিয়া বাজিল, সে সভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমাকে আমার মায়ের কাছে লইয়া যাও।" আবার সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্রমে তাহারা কমলের নিকট হইতে তাহার বাসস্থান, পিতামাতার নাম প্রভৃতি জানিয়া লইল। অবশেষে একজন কহিল, "আমরা দস্যু, তুই আমাদের বন্দিনী, তোর মাতার নিকট বলিয়া পাঠাইতেছি, সে যদি নির্ধারিত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না দেয় তবে তোকে মারিয়া ফেলিব।" কমল কাঁদিয়া কহিল, "আমার মা অর্থ কোথায় পাইবেন? তিনি অতি দরিদ্র; তাঁহার আর কেহ নাই; আমাকে মারিও না, আমি কাহারো কিছু করি নাই।" আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। কমলের মাতার নিকটে একজন দূত প্রেরিত হইল। সে গিয়া কহিল, "তোমার কন্যা বন্দিনী হইয়াছে, আজ হইতে তৃতীয় দিবসে আমি আসিব, যদি পাঁচশত মুদ্রা দিতে পার তবে মুক্ত করিয়া দিব, নচেৎ তোমার কন্যা নিশ্চিত হত হইবে।" এই সংবাদ শুনিয়াই কমলের মাতা মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

দরিদ্র বিধবা অর্থ পাইবেন কোথায়? একে একে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, বিবাহ হইলে কমলকে দিবেন বলিয়া কতকগুলি অলংকার রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি বিক্রয় করিলেন, তথাপি নির্দিষ্ট অর্থের চতুর্থাংশও হইল না। আর কিছুই নাই, অবশেষে বক্ষের বস্ত্র মোচন করিলেন, সেখানে তাঁহার মৃত স্বামীর একটি অঙ্গুরীয়ক রাখিয়া দিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, সুখ হউক, দুঃখ হউক, দারিদ্র্যই হউক, কখনো সেটি ত্যাগ করিবেন না, চিরকাল বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন, মনে করিয়াছিলেন, এই অঙ্গুরীয়কটি তাঁহার চিতানলের সঙ্গী হইবে, কিন্তু অশ্রুময়-নেত্রে তাহাও বাহির করিলেন। সে অঙ্গুরীটিও যখন তিনি বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার বুকের এক একখানি অস্থিও ভাঙিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু কেহই কিনিতে চাহিল না। অবশেষে বিধবা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন গেল, দুইদিন গেল, তিনদিন যায়, কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থের অর্ধেকও সংগৃহীত হয় নাই। আজ সেই দস্যু আসিবে; আজ যদি তাহার হস্তে অর্থ দিতে না পারেন, তবে বিধবার সংসারের একমাত্র বন্ধন আছে, তাহাও ছিন্ন হইবে। কিন্তু অর্থ পাইলেন না, ভিক্ষা করিলেন, দ্বারে দ্বারে রোদন করিলেন, সম্পদের সময় যাহারা তাঁহার স্বামীর সামান্য অনুচর

ছিল, তাহাদের নিকটও অঞ্চল পাতিলেন, কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থের অর্ধেকও সংগৃহীত হইল না।

ভয়বিহ্বলা কমল গুহার কারাগারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। সে ভাবিতেছে তাহার অমরসিংহ থাকিলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিত না। অমরসিংহ যদিও বালক কিন্তু সে জানিত অমরসিংহ সকলই করিতে পারে। দস্যুরা তাহাকে মাঝে মাঝে ভয় দেখাইয়া যায়, দস্যুদের দেখিলেই সে ভয়ে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিত। এই অন্ধকার কারাগৃহে, এই নিষ্ঠুর দস্যুদিগের মধ্যে একজন যুবা ছিল। সে কমলের প্রতি তেমন কর্কশ ব্যবহার করিত না, সে ব্যাকুল বালিকাকে স্নেহের সহিত কত কি কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু কমল ভয়ে কোনো কথারই উত্তর দিত না, দস্যু কাছে সরিয়া বসিলে সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। ঐ যুবাটি দস্যুপতির পুত্র, সে একবার কমলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দস্যুকে বিবাহ করিতে কি তাহার কোনো আপত্তি আছে? এবং মাঝে মাঝে প্রলোভন দেখাইত যে, যদি কমল তাহাকে বিবাহ করে তবে সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু কমল কোনো কথারই উত্তর দিত না। একদিন গেল ও দুইদিন গেল, বালিকা সভয়ে দেখিল, দস্যুরা মদ্যপান করিয়া ছুরিকা শানাইতেছে।

এদিকে বিধবার গৃহে দস্যুদের দূত প্রবেশ করিল, বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিল অর্থ কোথায়? বিধবা ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সকলি দস্যুর পদতলে রাখিয়া কহিলেন, "আমার আর কিছুই নাই, যাহা কিছু ছিল, সকলি দিলাম, এখন তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি আমার কমলকে আনিয়া দেও।" দস্যু সে মুদ্রাগুলি সক্রোধে ছড়াইয়া ফেলিয়া কহিল, "মিথ্যা প্রতারণা করিয়া পার পাইবি না, নির্দিষ্ট অর্থ না দিলে নিশ্চয় আজি তোর কন্যা হত হইবে, তবে চলিলাম, আমাদের দলপতিকে বলিয়া আসি যে, নির্দিষ্ট অর্থ পাইবে না, তবে এখন নর-শোণিতে মহাকালীর পূজা দেও।" বিধবা কত মিনতি করিলেন, কত কাঁদিলেন, কিছুতেই দস্যুর পাষাণ হৃদয় গলাইতে পারিলেন না। দস্যু গমনোদ্যত হইলে কহিলেন, "যাইও না, আর একটু অপেক্ষা কর, আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোহনলালের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয়। কিন্তু তাহা সম্পন্ন না হওয়াতে মোহন মনে মনে কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া আছে। কমলের সমুদয় বৃত্তান্ত মোহনলাল প্রাতেই শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুলপুরোহিতকে ডাকাইয়া শীঘ্র বিবাহের উত্তম দিন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

গ্রামের মধ্যে মোহনের ন্যায় ধনী আর কেহ ছিল না; আকুল বিধবা অবশেষে তাঁহার বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহন উপহাসের স্বরে হাসিয়া কহিলেন, "এ কি অপূর্ব ব্যাপার! এতদিনের পর দরিদ্রের কুটিরে যে পদার্পণ হইল?"

বিধবা।—"উপহাস করিও না, আমি দরিদ্র, তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।"

মোহন।—"কি হইয়াছে?" বিধবা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। মোহন জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তা আমাকে কি করিতে হইবে?"

বিধবা।—"কমলের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।"

মোহন।—"কেন অমরসিংহ এখানে নাই?"

বিধবা উপহাস বুঝিতে পারিলেন, কহিলেন "মোহন, যদি বাসস্থান অভাবে আমাকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইত, অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় যদি পাগল হইয়া মরিতাম, তথাপি তোমার কাছে একটি তৃণও প্রার্থনা করিতাম না। কিন্তু আজ যদি বিধবার একমাত্র ভিক্ষা পূর্ণ না কর, তবে তোমার নিষ্ঠুরতা চিরকাল মনে থাকিবে।"

মোহন।—"আইস তোমাকে একটি কথা বলি! কমল দেখিতে কিছু মন্দ নহে, আর তাহাকে যে আমার পছন্দ হয় নাই এমনও নহে, তবে তাহার সহিত আমার বিবাহের ত কোনো আপত্তি দেখিতেছি না। তোমার কাছে ঢাকিয়া কি করিব বিনা কারণে ভিক্ষা দিবার মতো আমার অবস্থা নহে।"

বিধবা।—"অগ্রেই যে অমরের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" মোহন কিছু উত্তর না দিয়া হিসাবের খাতা খুলিয়া লিখিতে বসিলেন, যেন কেহই ঘরে নাই, যেন কাহারো সহিত কিছু কথা হয় নাই। এদিকে সময় বহিয়া যায়, দস্যু আছে কি গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। বিধবা

কাঁদিয়া কহিলেন, "মোহন, আর আমাকে যন্ত্রণা দিও না, সময় অতীত হইতেছে।"

মোহন।—"রোস, কাজ সারিয়া ফেলি।" অবশেষে যদি বিধবা, বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত দিনে কাজ সারা হইত কি না সন্দেহস্থল। বিধবা মোহনলালের নিকট অর্থ লইয়া দস্যুকে দিলেন, সে চলিয়া গেল। সেই দিনই ভয়ে আশঙ্কায় ত্রস্তা হরিণীটির ন্যায় বিহ্বলা বালিকা মাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহার বাহুপাশে মুখখানি প্রচ্ছন্ন করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত করিল। কিন্তু অনাথিনী বালিকা এক দস্যুর হস্ত হইতে আর এক দস্যুর হস্তে পড়িল।

কত বৎসর গত হইয়া গেল। যুদ্ধের অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে। সৈনিকেরা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। বিধবা সংবাদ পাইলেন যে, অজিতসিংহ হত ও অমর কারাবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কন্যাকে এ সংবাদ শুনান নাই।

মোহনের সহিত বালিকাব বিবাহ হইয়া গেল। মোহনের ক্রোধ কিছুমাত্র নিবৃত্ত হইল না। তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি বিবাহ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। সে নির্দোষী অবলা বালার প্রতি অনর্থক পীড়ন করিত; কমল মাতৃক্রোড়ের স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়া হইতে এই নিষ্ঠুর কারাগৃহে আসিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, অভাগিনী কাঁদিতেও পায় না। বিন্দুমাত্র অশ্রু নেত্রে দেখা দিলে মোহনের ভর্ৎসনার ভয়ে ত্রস্ত হইয়া মুছিয়া ফেলিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শৈলশিখরের নিষ্কলঙ্ক তুষার-দর্পণের পর উষার রক্তিম মেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল। ঘুমন্ত বিধবা দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, সৈনিকবেশে অমরসিংহ দাঁড়াইয়া আছেন। বিধবা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন। অমর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কমল কোথায়?" শুনিলেন, স্বামীর আলয়ে। মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি কত কি আশা করিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন কত দিনের পর দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। যুদ্ধের উন্মত্ত ঝটিকা হইতে প্রণয়ের শান্তিময় স্নিগ্ধ নীড়ে ঘুমাইতে যাইতেছেন; তিনি যখন অতর্কিত-ভাবে দ্বারে

গিয়া দাঁড়াইবেন, তখন হর্ষবিহ্বলা কমলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। বাল্যকালের সুখময় স্থান সেই শৈলশিখরের উপর বসিয়া কমলকে যৌদ্ধ-গৌরবের কথা শুনাইবেন, অবশেষে কমলের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রণয়ের কুসুম-কুঞ্জে সমস্ত জীবন সুখের স্বপ্নে কাটাইবেন। এমন সুখের কল্পনায় যে কঠোর বজ্র পড়িল তাহাতে তিনি দারুণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু মনে তাঁহার যতই তোলপাড় হইয়াছিল, প্রশান্ত মুখশ্রীতে একটিমাত্র রেখাও পড়ে নাই।

মোহন কমলকে তাহার মাতৃ-আলয়ে রাখিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে কমল-পুষ্পকলিকাটি ফুটিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কমল একদিন বকুল বনে মালা গাঁথিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই, দূর হইতে শূন্যমনে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আর একদিন সে বাল্যকালের খেলনাগুলি বাহির করিয়াছিল, আর খেলিতে পারিল না, নিরাশার নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেগুলি তুলিয়া রাখিল, অবলা ভাবিয়াছিল যে, যদি অমর ফিরিয়া আসে, তবে আবার দুইজনে মালা গাঁথিবে, আবার দুইজনে খেলা করিবে। কতকাল তাহার বাল্য-সখা অমরকে দেখিতে পায় নাই, মর্ম্মপীড়িতা কমল এক একবার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিত। এক একদিন রাত্রিকালে গৃহে কেহ দেখিতে পাইত না, কমল কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে তাহার বাল্যের ক্রীড়াস্থল সেই শৈলশিখরের উপর গিয়া দেখিত, ম্লানবদনা বালিকা অসংখ্য তারাখচিত অনন্ত আকাশের পানে নেত্র পাতিয়া আলুলায়িত কেশে শুইয়া আছে।

কমল মাতার জন্য, অমরের জন্য কাঁদিত বলিযা মোহন বড়োই রুষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহাকে মাতৃ-আলয়ে পাঠাইয়া ভাবিয়াছিল যে, দিনকতক অর্থাভাবে কষ্ট পাক তাহার পর দেখিব কে কাহার জন্য কাঁদিতে পারে।

মাতৃভবনে কমল লুকাইয়া কাঁদে। নিশীথ বায়ুতে তাহার কত বিষাদের নিঃশ্বাস মিলাইয়া গিয়াছে, বিজন শয্যায় সে যে কত অশ্রুবারি মিশাইয়াছে, তাহা তাহার মাতা একদিনও জানিতে পারেন নাই। একদিন কমল হঠাৎ শুনিল তাহার অমর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার কত দিনকার কত কি ভাব উথলিয়া উঠিল। অমরসিংহের বাল্যকালের মুখখানি মনে পড়িল।

দারুণ যন্ত্রণায় কমল কতক্ষণ কাঁদিল। অবশেষে অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বাহির হইল।

সেই শৈলশিখরের উপরে, সেই বকুলতরুচ্ছায়ায় মর্মাহত অমর বসিয়া আছেন। এক একটি করিয়া ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত জ্যোৎস্না রাত্রি, কত অন্ধকার সন্ধ্যা, কত বিমল উষা অস্ফুট স্বপ্নের মত তাঁহার মনে একে একে জাগিতে লাগিল। সেই বাল্যকালের সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অন্ধকারময় মরুভূমির তুলনা করিয়া দেখিলেন, সঙ্গী নাই, সহায় নাই, আশ্রয় নাই, কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না, কেহ তাহার মর্মের দুঃখ শুনিয়া মমতা প্রকাশ করিবে না, অনন্ত আকাশে কক্ষছিন্ন জ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায়, তরঙ্গাকুল অসীম সমুদ্রের মধ্যে ঝটিকাতাড়িত একটি ভগ্ন তরণীর ন্যায়, একাকী নীরব সংসারে উদাস হইয়া বেড়াইবেন।

ক্রমে দূর গ্রামের কোলাহলের অস্ফুট ধ্বনি থামিয়া গেল, নিশীথের বায়ু আঁধার বকুল-কুঞ্জের পত্র মর্মরিত করিয়া বিষাদের গম্ভীর গান গাহিল। অমর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, শৈলের সমুচ্চ শিখরে একাকী বসিয়া দূর নির্ঝরের মৃদু বিষণ্ণ ধ্বনি, নিরাশ হৃদয়ের দীর্ঘনিঃশ্বাসের ন্যায় সমীরণের হু-হু শব্দ, এবং নিশীথের মর্মভেদী একতানবাহী যে একটি গম্ভীর ধ্বনি আছে, তাহাই শুনিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন, অন্ধকারের সমুদ্রতলে সমস্ত জগৎ ডুবিয়া গিয়াছে, দূরস্থ শ্মশান-ক্ষেত্রে দুই একটি চিতানল জ্বলিতেছে, দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত নীরন্ধ্র স্তম্ভিত মেঘে আকাশ অন্ধকার। সহসা শুনিলেন উচ্ছ্বসিত স্বরে কে কহিল "ভাই অমর"—এই অমৃতময়, স্নেহময়, স্বপ্নময় স্বর শুনিয়া তাঁহার স্মৃতির সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিলেন কমল। মুহূর্তের মধ্যে নিকটে আসিয়া বাহুপাশে তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কহিল, "ভাই অমর"—অচল-হৃদয় অমরও অন্ধকারে অশ্রু বিসর্জন করিলেন, আবার সহসা চকিতের ন্যায় দূরে সরিয়া গেলেন। কমল অমরকে কত কি কথা বলিল, অমর কমলকে দুই একটি উত্তর দিলেন। সরলা আসিবার সময়ে যেরূপ উৎফুল্ল-হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিল, যাইবার সময় সেইরূপ ম্রিয়মাণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। কমল ভাবিয়াছিল সেই ছেলেবেলাকার কমল, কাল হইতে আবার খেলা করিতে আরম্ভ করিব। যদিও অমর মর্মের গভীর তলে সাংঘাতিক আহত হইয়া-

ছিলেন, তথাপি তিনি কমলের উপর কিছুই ক্রুদ্ধ হন নাই বা অভিমান করেন নাই। তাঁহার জন্য বিবাহিতা বালিকার কর্তব্যকর্মে বাধা না পড়ে এই নিমিত্ত তিনি তাহার পরদিন কোথায় যে চলিয়া গেলেন তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

বালিকার সুকুমার হৃদয়ে দারুণ বজ্র পডিল ; অভিমানিনী কতদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, এতদিনের পর সে বাল্য-সখা অমরের কাছে ছুটিয়া গেল, অমর কেন তাহাকে উপেক্ষা করিল ? কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। একদিন তাহার মাতাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মাতা তাহাকে বুঝাইয়া দিযাছিলেন যে, কিছুকাল রাজ-সভার আডম্বররাশির মধ্যে থাকিয়া সেনাপতি অমরসিংহ পর্ণকুটিরবাসিনী ভিখারিণী ক্ষুদ্র বালিকাটিকে ভুলিয়া যাইবেন তাহাতে অসম্ভব কি আছে ? এই কথায় দরিদ্র বালিকার অন্তরতম দেশে শেল বিঁধিয়াছিল। অমরসিংহ তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিল মনে করিয়া কমল কষ্ট পায় নাই। হতভাগিনী ভাবিত, আমি দরিদ্র, আমার কিছুই নাই, আমার কেহই নাই, আমি বুদ্ধিহীনা ক্ষুদ্র বালিকা, তাঁহার চরণরেণুরও যোগ্য নহি, তবে তাঁহাকে ভাই বলিব কোন অধিকারে, আমি দরিদ্র কমল, আমি কে যে তাঁহাব স্নেহ প্রার্থনা করিব ? সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়া যায়, প্রভাত হইলেই সেই শৈলশিখরে উঠিয়া ম্রিয়মাণ বালিকা কত কি ভাবিতে থাকে, তাহার মর্মের নিভৃত তলে যে বাণ বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা যদিও সে মনেই লুকাইয়া বাখিয়াছিল, পৃথিবীব কাহাকেও দেখায় নাই, তথাপি ঐ মর্মে লুক্কায়িত বাণ ধীরে ধীরে তাহার হৃদযেব শোণিত ক্ষয় করিতে লাগিল। বালিকা আর কাহারো সহিত কথা কহিত না, মৌন হইয়া সমস্ত দিন সমস্ত বাত্রি ভাবিত, কাহারো সহিত মিশিত না, হাসিত না, কাঁদিত না ; এক একদিন সন্ধ্যা হইলেও দেখা যাইত, পথ-প্রান্তেব বৃক্ষতলে মলিন ছিন্ন অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া দীনহীন কমল বসিয়া আছে। বালিকা ক্রমে দুর্বল ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, আর উঠিতে পারে না, বাতায়নে একাকিনী বসিয়া থাকিত, দেখিত, দূর শৈলশিখরের উপর বকুল-পত্র বায়ুভরে কাঁপিতেছে। দেখিত, রাখালেরা সন্ধ্যার সময় উদাস-ভাবোদ্দীপক স্বরে মৃদু মৃদু গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে।

বিধবা অনেক চেষ্টা করিয়াও বালিকার কষ্টের কারণ বুঝিতে পারেন

নাই এবং তাহার রোগের প্রতিকার করিতেও পারেন নাই। কমল নিজেই বুঝিতে পারিত যে সে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার আর কোনো বাসনা ছিল না, কেবল দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত যে, মরিবার সময় যেন অমরকে দেখিতে পাই।

কমলের পীড়া গুরুতর হইল। মূর্ছার পর মূর্ছা হইতে লাগিল। শিয়রে বিধবা নীরব, কমলের গ্রাম্য সঙ্গিনী বালিকারা চারিধারে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দরিদ্র বিধবার অর্থ নাই যে, চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন। মোহন দেশে নাই, এবং দেশে থাকিলেও তাহার নিকট হইতে কিছু আশা করিতে পারিতেন না। তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া কমলের পথ্যাদি যোগাইতেন। চিকিৎসকদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা চাহিতেন যে, তাহারা কমলকে একবার দেখিতে আসুক। অনেক মিনতিতে চিকিৎসক কমলকে আজ রাত্রে দেখিতে আসিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

অন্ধকার রাত্রের তারাগুলি ঘোর নিবিড় মেঘে ডুবিয়া গিয়াছে, বজ্রের ঘোরতর গর্জন শৈলের প্রত্যেক গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং অবিরল বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ-চকিতচ্ছটা শৈলের প্রত্যেক শৃঙ্গে শৃঙ্গে আঘাত করিতেছে, মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রচণ্ড বেগে ঝটিকা বহিতেছে, শৈল-বাসীরা অনেকদিন এরূপ ঝড় দেখেন নাই। দরিদ্র বিধবার ক্ষুদ্র কুটির টলমল করিতেছে, জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা গৃহে প্রবাহিত হইতেছে এবং গৃহপার্শ্বে নিষ্প্রভ প্রদীপশিখা ইতস্ততঃ কাঁপিতেছে। বিধবা এই ঝড়ে চিকিৎসকদের আসিবার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হতভাগিনী নিরাশ-হৃদয়ে নিরাশা-ব্যঞ্জক স্থির দৃষ্টিতে কমলের মুখের পানে চাহিয়া আছেন ও প্রত্যেক শব্দে চিকিৎসকদের আশায় চকিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। একবার কমলের মূর্ছা ভাঙিল, মূর্ছা ভাঙিয়া মাতার মুখের দিকে চাহিল। অনেকদিনের পর কমলের চক্ষে জল দেখা দিল, বিধবা কাঁদিতে লাগিলেন, বালিকারা কাঁদিয়া উঠিল। সহসা অশ্বের পদধ্বনি শুনা গেল, বিধবা শশব্যস্তে উঠিয়া কহিলেন চিকিৎসক আসিয়াছেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে চিকিৎসক গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আপাদমস্তক বসনে আবৃত, বৃষ্টিধারায় সিক্ত বসন হইতে বারি-বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। চিকিৎসক বালিকার তৃণ-শয্যার

সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অবশ বিষাদময় নেত্র চিকিৎসকের মুখের পানে তুলিয়া কমল দেখিল সে চিকিৎসক নয়, সে সেই সৌম্য গম্ভীর মূর্তি অমরসিংহ। বিহ্বলা বালিকা প্রেমপূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিশাল নেত্র ভরিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল এবং প্রশান্ত হাস্যে কমলের বিবর্ণ মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু এই রুগ্ন শরীরে অত আহ্লাদ সহিল না। ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত নেত্র নিমীলিত হইয়া গেল, ধীরে ধীরে বক্ষের স্পন্দন থামিয়া গেল, ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভিয়া গেল। শোক-বিহ্বলা সঙ্গিনীরা বসনের উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। অশ্রুহীন নেত্রে, দীর্ঘশ্বাস-শূন্য বক্ষে, অন্ধকারময় হৃদয়ে, অমরসিংহ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। শোকবিহ্বলা বিধবা সেইদিন অবধি পাগলিনী হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন এবং সন্ধ্যা হইলে প্রত্যহ সেই ভগ্নাবশিষ্ট কুটিরে একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেন।

'ভারতী' : শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১২৮৪
'দেশ' : সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬১

আদরের, না অনাদরের?

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

মঙ্গল আরতির মঙ্গল ধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে শরতের মধুর জ্যোৎস্নায় মগ্ন দেখিলাম। পার্শ্বে শায়িতা স্বকুমারী বালা আমারই,—আমারই সে—নির্ভয়ে নিস্পন্দে ঘুমাইতেছে। পাছে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়, তাই বড় সাধ হইলেও চুম্বন করিলাম না। মধুর জ্যোৎস্নায়, মৃদুমন্দ বাতাসে, ঈষৎ ঘুমঘোরে দেখিলাম, ধরণী নিজ সন্তান সন্ততি লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রায় মগ্ন—বুকের কাছে নিঃশঙ্ক চিত্তে বাছারা ঘুমাইতেছে—সকলেই মাতৃস্নেহে, মাতৃআদরে আপ্লুত। হেথায় পক্ষপাতিতা নাই—সকলেই মাতার সমান যত্ন স্নেহের ধন। সুমধুর জ্যোৎস্নাটুকু মায়ের হাসিখানির মত প্রকৃতি জননীকে হাস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে—মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলাম—ঘুমন্ত

প্রকৃতি কি সুন্দর! দেখিতে দেখিতে তখন বহু দিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল —এমনই কত জ্যোৎস্নায় আপনাকে প্রিয়জনে বেষ্টিত দেখিলাম। স্মৃতিতে মধুর জ্যোৎস্না আরও মধুরতর মনে হইতেছিল, মনে পড়িল—"তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে, কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার।" সহসা তীব্র কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলাম—শুনিতে পাইলাম, আমার বাতায়নের সম্মুখবর্তী পুষ্করিণীর ঘাটে একটা কথাবার্তা আরম্ভ হইয়াছে।

"কে ও?—কেষ্টদাসী, আজ যে বড় রাত থাকতে থাকতে ঘাটে এসেছিস? —কাল রাতে তোদের পাড়ায় শাঁখ বাজছিল, তোদের বৌয়ের কি এবার তবে বেটাছেলেটি হ'ল?"

"না গো ছোট কাকী, সে কথা আর ব'লো না—আমাদের যেমন অদৃষ্ট, বৌয়ের আবার বেটাছেলে এ জন্মে হবে! যা হয়, একটা মেয়ে হয়েছে।"

"এবার তিনটে মেয়ে হ'ল বুঝি?"

"হ্যাঁ গো, কাকী, তিনটে হল।"

"তা হ'লে গণ্ডা ভর্তি হবে—তবে যদি বেটাছেলে হয়।"

"হ্যাঁ গো খুড়ী, তারই ত মতন দেখছি। তা মেয়েটা হয়েছে শুনে দাদা বলে—কেষ্ট, আমি আর উঠতে পারি না, আমার গায়ে আর বল শক্তি নেই। মায়ের কাছে ধাই বিদেয় চাইলে, মা আসলে বিছানা থেকে উঠলো না, কথা কইলে না। বৌ মেয়ে তুলবে না; কত বলা কওয়ায় কোলে নিলে, তা বলে যে, গলা টিপে দেবো। আমি এখানে না থাকলে মেয়েটা বোধ করি মাটিতে পড়ে থেকে সন্থ মারা যেত। বাড়ীসুদ্ধ দুঃখেতে যেন কেমন হয়ে হয়েছে।"

"তা থাকবে বৈ কি, তিন তিনটে মেয়ে, কায়েতের ঘরে বিয়ে দিতে প্রাণ বেরুবে। অভাগীর মেয়ের যেমন অদৃষ্ট, দশ মাস গর্ভে ধরে কি না একটা মাটির ঢেলা হ'ল।"

"আহা খুড়ী, পাছে এবার আবার মেয়ে হয় ব'লে বৌ ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেছে। আর পোড়া মেয়েগুলোরও সকলই বিশ্রী কি না, এবার বৌয়ের এমন অরুচি হয়েছিল যে, পেটে জল যেত না। মেয়েটা এই সবে চার বছরের; খুকী হয়েছে শুনে বলছে, ও ত খোকা নয়, তবে ওকে বিলিয়ে দাও।"

"কচি ছেলে, ওরা যেমন শোনে তাই বুঝে ; একটা একটা কথা পাকা মতন বলে ফেলে, তা আটকৌড়ে হবে ত ?"

"তা এখন কি জানি, হয়ত অমনি নিয়ম রক্ষা, আটটি ছেলে ডেকে কুলো বাজিয়ে দেবে। মা এবার কত সাধ করেছিল খোকাটি হবে, আট-কৌড়েতে ভাল করে হাঁড়ি করবে, তবে ষষ্ঠী পূজোতে তেল সন্দেশ বিলোবে, তা কিছুই হ'ল না, সকলই মিথ্যা হ'ল।"

"তা মেজদিদি নরেশের বিয়ে দিক না। এর হ'ল না হ'ল না করে এত দিন পরে শেষে মেয়ে হতেই চললো। নরেশ একটি ছেলে, কেবল মেয়ে হ'লে নাম রাখবে কে ?"

"তা খুড়ী, দাদা কি করবে। এ-কালের ছেলে, ওরা ঝগড়া-ঝাঁটির ভয় পায়। বৌয়ের ছেলে হ'ল না হ'ল না ক'রে মা যখন হেদিয়ে দাদার বিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখনই দাদা বিয়ে করতে চায় নি, তা এখন ত মেয়ে হচ্ছে—ছেলে হবার আশা হয়েছে। তবে মায়ের কিনা একটি ছেলে, মা তাড়াতাড়ি সকলই চায়। বৌয়ের কিছু এমন বেশী বয়সে মেয়ে হয় নি, বছর আঠারতে বুঝি বড় মেয়েটা কোলে হয়েছে—তা মা একেবারে অস্থির হয়ে বৌকে কত ওষুধ বিষুধ খাইয়েছিল, কত মাদুলি, কত ঠাকুরের দোর ধরা, কত কি করার পর ঐ মেয়ে হ'ল। তা তখন আশা হ'ল, মেয়ে হয়েছে, তা এইবার তবে নাতি হবে—ও মা, বার বার তিন বার, আর কত সহ্য করবে! তা, মা ত বলে যে, বৌয়ের এবার মেয়ে হ'লেই ছেলের আবার বিয়ে দেব। তা দাদা ত রাজী হয় না, নইলে মা কন্সে পর্যন্ত দেখে রেখেছে। আর মাও একটু চিরকাল অধৈর্য আছে। আমরা তাই বলি, অত ভেবে হাতড়ে পাতড়ে বেড়ালে কি হবে, মেয়ে হয়েছে, ছেলেও হবে, তা এবার আর আমাদের কিছু বলবার রইল না।"

এখনও সূর্যোদয় হয় নাই ; ঊষার ঈষৎ মাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে। এখনও কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ পশ্চিমাকাশে জ্বলজ্বল করিতেছে। মৃদু মৃদু প্রভাত-সমীরণ কত দূর হইতে কেয়াফুলের সুমিষ্ট গন্ধ বহিয়া লইয়া আসিতেছে। জনকোলাহল এখনও উত্থিত হয় নাই। এমন সময় আমাদের পরিচিত গৃহিণীর কলকণ্ঠস্বরে পাড়ার সকল লোক জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমিও উঠিয়া জানালায় গিয়া বসিলাম। একদিকে বাখারির বেড়া এবং তিনদিকে ইমারৎ-

বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র বাগান নামধারী স্থানের মধ্যে একটি ছোট রকম পুষ্করিণী। এমন বর্ষাতে কূলে কূলে জল হইয়াছে। কিন্তু চারি পাশের জল হিংচা, কলমি, শুশুনি শাকে সবুজ—কেবল মাঝখানে খানিকটা জল কতকটা পরিষ্কার আছে। পুকুরটির পাড়ে এক ধারে আম, জাম, জামরুল প্রভৃতি দু-চারিটি ফলবান্ বৃক্ষ—বৃক্ষের তলা কেহ কখনও পরিষ্কার করে না। এক ধারে পাঁচ ছয়টি কলাগাছ—প্রায়ই তাহাদের একটি-না-একটি গাছকে ফলভারে পুকুরের উপর অবনত দেখা যায়। এক ধারে দু-একটি আধ-মরা গাঁদাফুলের গাছ—দু-একটি জীর্ণ গোলাপগাছ—কখন তাহাতে ফুল হইতে দেখা যায় না। কদাচিৎ দু-একটি কুঁড়ি দেখা যায়, কিন্তু তাহা অর্ধস্ফুট না হইতে হইতে শুকাইয়া যায়। একটি অপরাজিতা লতা, হতাদরে বেড়ার গায়ে লতাইয়া উঠিয়া বেড়ার কঙ্কালের কতক অংশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—মাঝে মাঝে দু-চারিটি ফুলও লতার বুকে শোভা পায়—সে ফুলে দেবপূজাও হয়। রোপণকালে লতাটির কত না আদর ছিল, কিন্তু এখন আর কেহ তাহার দিকে চাহে না—তবুও সে এখনও ধীরে ধীরে নিজ কার্য করিতেছে।

"ও মা, কথা কইতে কইতে যে ভোর হয়ে এল—আজ আর জাহ্নবী নাইতে যাওয়া হ'ল না। তা থাক্—একটু জাহ্নবীর জল পরশ করব এখন—একেবারে তবে পুকুর থেকে চান করেই যাই। ওগো, ও নাতবৌ, এইখানে আমায় একটু তেল দিয়ে যা।" আজ ঘাটের শুভ দিন—ভারি মজলিস—গৃহিণী নহিলে ঘাট ভাল মানায় না।

"তাই ত বলি কেষ্টদাসি, এ-কালের ছেলেপিলে কি মা-বাপকে মানে? আমার শ্বশুর বড় গিন্নীর (ইঁহার সপত্নীর) ছেলে হ'ল না ব'লে অমনই আমার সঙ্গে কর্তার বিয়ে দিলেন—তা বাছা, পরমেশ্বর মুখ রক্ষা করলেন তেমনই, বছর দুই বিয়ে হ'তে না হ'তে প্রথমেই আমার রাধানাথ হল—তা আঃ, কোথা গেল আমার সে ছেলে—আমি পোড়াকপালী বসে আছি—ভাগ্যিস্ তার দুটো গুঁড়ো আছে, তাই নিয়ে সংসারে আছি—নইলে পাগল হয়ে কোন্ দেশে চলে যেতুম। তার পর জানিস্ বাছা, তার বছরখানেক বাদে বড় গিন্নীর হরলাল হ'ল। আমার যখন বিয়ে হ'ল, তখন বড় গিন্নীর ছেলে হবার বয়েস যায় নি—তবে ওর বাপ শুনেছি খুব ছোট বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন—আর কর্তার চেয়ে বড় গিন্নী বছর দুয়ের বয়সে ছোট ছিল—বিয়ের সময় মাথায়

প্রায় এক দেখে সুতো জোঁকা দিয়ে তবে বিয়ে হয়। আমার একটু ডাগর হয়ে বিয়ে হয়েছিল, কর্তার ত আমি দোজপক্ষের মত নই—আমিই সময়কালে বিয়ের পরিবারের মত হলুম। তা সেকালের কর্তারা অত হিসেব-কিতেব বুঝতেন না, বললেন বিয়ে কর—এঁরাও অমন এ-কালের ছেলেদের মত মা-বাপের কথা ঠেলতে পারতেন না। আমার শ্বশুর বলতেন, যে-আবাগের বেটী কোঁদল করবে, সে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকুক—আমার বাড়ী তার ঠাঁই হবে না। তাঁদের দবন্ ছিল কত—কর্তা বাড়ীর ভেতর এলে আমরা কচিকাঁচা বৌ-ঝি ত ভয়ে কাঁটা হতুম—ঠাকরুণ সুদ্ধ ভয়ে সারা হতেন। একেলে মেয়েরা যেমন দিবা রাত্রি স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখি করে থাকে—জানিস কেষ্ট, আমাদের তা হবার জো ছিল না। রাত্রে সকল নিষুতি হ'লে তবে ঘরে কেউ দিয়ে আসত, তবে যেতুম। এক-এক দিন বারান্দায়, কি দালানে ঘুমিয়ে পড়তুম—আর কেউ ঘরে যেতে বলতে যদি ভুলে যেত, তবে সেইখানেই রাত কাটত। রাধানাথ ছ-মাসের হ'লে তবে শাশুড়ী একদিন রাধানাথের বিছানা ঘরে দিলেন, সেই দিন থেকে যার যেদিন পালা পড়ত, সে সেই দিন ঘরে শুতে যেতুম। আমাদের ছেলে হ'লে ছ-মাস কর্তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার হুকুম থাকত না—তবে এদানী কিছু দরকার হলে কর্তা লুকিয়ে চুরিয়ে ভাঁড়ার-ঘরে, কি রান্নাঘরে এসে ব'লে যেতেন। তা বাছা, আমরা দিনের বেলা কথা কইতুম না, শাশুড়ী টের পেলে গঞ্জনা সহিতে হবে, এমন কথা নাই বা কইলুম। তা এ-কালে সব রকমই আলাদা দেখে শুনে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।"

মুখে অনর্গল বক্তৃতা চলিতেছে—হস্ত তৈলসমেত সর্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইতেছে। ক্রমে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে অনেকগুলি রমণীমুখকমল ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সকলেরই মন গৃহিণীর বক্তৃতার দিকে, সকলেই নিজ নিজ স্নান ভুলিয়া গিয়াছেন—কাহারও দাঁত মাজা আর শেষ হয় না, কেহ গামছা দিয়া গাত্র মর্দন করিয়াও তৃপ্ত হইতেছেন না। মূল কথা, মিত্রদের মেয়েটা হইয়াছে শুনিয়া সকলেই—তাই ত, আহা, মেয়েটা হ'ল, বেটাছেলেটি হ'লেই সার্থক হ'ত, বলিয়া আহা উহু করিতেছেন। একজন আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তা হোক, কত লোকের সাত মেয়ের পর ছেলে হয়—আমার পিসতুত বোনের সে দিন চার মেয়ের পর খোকাটি হয়েছে—খোকাটি এই ষেটের এক বছরের হ'ল।"

এই রমণীমণ্ডলীর মধ্যে দু-একটি ঘোমটাবৃত যুবতী বধূ ও কন্যা স্নান করিতেছিল—একটি চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যা আর থাকিতে পারিল না। মাতৃ সম্বোধনে কৃষ্ণদাসীকে কহিল,—"তা মা, মামীর মেয়ে হয়েছে ব'লে তোমাদের দুঃখু রাখবার যেন ঠাঁই নেই, তাই ঘাটে এসেও সেই কাহিনী হচ্ছে—তা তুমি যা বল, আমার কিন্তু বাপু ঘোষদের কালো কালো ছেলের চেয়ে মামীর মেয়েদের বেশ ভাল লাগে—অমন একটা কালো ছেলের চেয়ে সাতটা সুন্দর মেয়ে ভাল। তোমাদের এক কথা, মেয়ে বুঝি কোন কাজে লাগে না? তুমি এই যে আষাঢ় মাসে এখানে এসেছ, দু-তিন মাস যে ক'রে দিদিমার সেবা করছ, মামা তেমন করেন? দিদিমাই ত দুঃখ করেন, আমার মেয়ে অসময়ে যত্ত করে, ছেলে আমার তেমন করে না। তার বেলা বুঝি মেয়ের দরকার? —এদিকে মেয়ে হয়েছে শুনলেই সর্বনাশ বাধে। এই যে ও-বাড়ীর ছোট ঠাকুরমা—কাকা ত এক পয়সা আনতে পারেন না—যাই ক্ষেমা পিসি ছিলেন, তিনি খরচপত্র দিচ্ছেন, তবে কাকার সুদ্ধ চলছে। কিন্তু শুনেছি, ক্ষেমা পিসির আগে আর দু বোন হয়, তাই ওঁর নাম ক্ষেমা রেখেছিল।" এমন বিদ্রোহসূচক কথা শুনিয়া ঘাটসুদ্ধ সকলে অবাক্ হইয়া গেল। কাক আর ডাকে না, গাছের পাতা আর নড়ে না। গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, "ওলো পেরভা, থাম্ থাম্—যখন তোর হবে, তখন বুঝবি—এখন ছেলেমানুষ কি বুঝবি—ছেলেমানুষের মুখে অত পাকা পাকা কথা ভাল শোনায় না।"

"তা ছোট ঠাকুরমা, সত্যি কথা বলছি—কেন এই ও-বাড়ীর ছোট মামীও বলছেন যে, ওঁর যদি মেয়ে হয়, তাতে কিছু দুঃখু হবে না। মামীও ত মেয়েদের কত ভালবাসেন, কেবল দিদিমার লাঞ্ছনার ভয়েই ত পাছে মেয়ে হয় ব'লে অত ভয় পান। মেয়ে হয়েছে, এখন ছেলে হবার সাধ হয়, দিদিমার ভয়ে মেয়েদের ভাল করে আদর পর্যন্ত করতে পারেন না। মামাবাবু ভয়ে পূজোর ভাল কাপড় অবধি করতে দিতে সাহস পেলেন না—নইলে মেয়েকে দিতে তাঁর ইচ্ছা হয়—কে জানে বাপু, তোমরা কি বোবা—তোমরা কি মেয়ে নও—?"

"হ্যাঁ গো জ্যাঠাইমা ঠাকরুণ, আমরা মেয়ে বটে, তা আমার কত আদর ছিল জানিস? আমি মায়ের প্রথম সন্তান—দিদিমার আদুরে, ঠাকুরমার আদুরে—ঠাকুরমা বলতেন, ও কি আমার মেয়ে, ও আমার সাত বেটা, তা ব'লে বাপু গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে হওয়া গৃহস্থের অলক্ষণ।"

ক্রমে প্রভার সমবয়স্কা আরও দু-চারিটি কন্যা ঘাটে আসিয়া জুটিল। হরিদাসী কহিল—"কি ঠান্‌দিদি, আজ যে ঘাট জাঁকিয়ে তুলেছ, ব্যাপারখানা কি ?"

"কি লো হরিদাসি, এসেছিস ? তাই ত বলি, তুই নইলে কি ঘাট মানায় ? আমরা বুড়ো মানুষ, আমরা আর ঘাট জাঁকাব কি, দুটো দুঃখের সুখের কথা কইছি বই ত নয়। তোদেরই এখন জাঁকের বয়েস—তাই বলছিলুম, বলি হরিদাসী যে এখনও এল না—কাল রাতে বুঝি নাতজামাই এসেছিল ?"

"সে আমি কি জানি ঠান্‌দিদি, সে তোমরা জান। আমরা ঘাটে আসতে আসতে পথের ধারে হরকালী কাকার বাড়ী গেছলুম—তাদের খোকা হয়েছে দেখে এলুম ; তাই আসতে একটু দেরি হ'ল।"

"বটে ! ওদের কেমন অদৃষ্ট দেখেছিস—এখন সময় ভাল, সব দিকে ভাল হয়—বৌয়েদের কেবলই বেটাছেলে হচ্ছে। আর ঘটাও তেমনি করে—এই আটকৌড়েতে হাঁড়ি করা রে—ষষ্ঠী পূজোয় তেল সন্দেশ দেওয়া রে—ভাতে বোগ্‌নো করা রে—খাওয়ানো রে, দাওয়ানো রে, সব করে। কেষ্টর মার যেমন অদৃষ্ট—একটা বৌ—কেবল গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে হচ্ছে।"

হরিদাসী। "—তা হলই বা—মেয়ে বুঝি ফেল্‌না ?"

"ও বাবা ! তোদের এ-কালের যে সবই সমান দেখি—পেরভাও ঐ কথা নিয়ে কত মুখনাড়া দিলে—মেয়েছেলে আবার কোন কাজের গা ?"

"কোন্ কাজের নয় গা ? বাপ মা, স্বামী পুত্র, কারও অসুখ হোক, কারও অনটন হোক, মেয়েতে যত করে, এত কোন্ ছেলেতে করে গা ? মাকে মেয়ে যত যত্ন করে, মায়ের দুঃখ যত মেয়েতে বোঝে, এত কি ছেলেতে বোঝে ? ওগো, ওগো, স্ত্রীলোক হচ্ছে লক্ষ্মী—হাজার টাকাকড়ি থাক্, দেখ, যে বাড়ীতে গৃহিণী নেই, সে ঘরকন্না কেমন বেশৃঙ্খল, যে ছেলেদের মা নেই, সে ছেলেপিলের কত অযত্ন ! মেয়ে হয়েছে শুনেই তোমরা লাফিয়ে ওঠ, কি না বিয়ে দিতে হবে ! তা বাপু, ছেলের জন্য কি কিছু খরচ নেই ? সেনেদের বাড়ী দেখতে পাই, ছেলেদের খাওয়া হ'লে তবে সেই পাতে মেয়েদের অমনি যা-তা দিয়ে খেতে দেয়। ছেলেদের জুতো জামা, সাফ কাপড়, মেয়েদের ময়লা পাঁচী ধুতি। ছেলেদের দু পয়সা ক'রে এক-এক জনের খাবার বরাদ্দ, মেয়েদের এক পয়সার আটার রুটি করে তিন

চারদিকে দেয়। ছেলেরা ভাল গদিতে খাটে শোয়—মেয়েগুলি মেঝেতে মাছুরে একটা ছেঁড়া লেপ পেতে শোয়। বড় বড় ছেলেরাও মা-বাপের সঙ্গে শুতে পায়, ছোট বোন দুটি রাঁধুনীর কাছে শোয়।—আহা, তাদের যদি একটু যত্ন আছে! সে দিন ও-বাড়ীর মেজ কাকীর মেয়ে মামার বাড়ী থেকে বাড়ী এসেছে, ঠাকুরমার কাছে সকালে ভাত চেয়েছে, তখনও কেউ খায়নি ব'লে ঠাকুরমা স্বচ্ছন্দে তাকে বললে কিনা, মেয়েমানুষ আগ-দোফের ভাত খাবি কি! এখনও কেউ খায়নি, আগে ভাগে ভাত দাও! আগে বাপ খুড়ো খাগ, তবে সেই পাতে খাস। আহা, সে ছ-সাত বৎসরের মেয়ে, অত কি জানে, ভাতের জন্য কাঁদতে লাগল, শাশুড়ীর ব্যাভার দেখে মেজ কাকীমা রাগ করে তখনই তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। আমাদের কাছে কত দুঃখু করতে লাগল যে, বাছা একদিন বাড়ী এল, দুটো ভাতের জন্যে কেঁদে চলে গেল। এ কি মায়ের প্রাণে সয়! তা কে জানে, মেয়ে আদরের না অনাদরের!"

"বাবা, এ-কালের মেয়েগুলোব মুখের তোড় দেখ, যেন ঝড় বয়ে গেল, যা যা, আর জলে পড়ে থাকিস নে, অসুখ হবে।"

যাহা হউক, অল্পবয়স্কারা আর অধিক উত্তর প্রত্যুত্তর করিল না। তাহারা স্নান সমাপনান্তে গৃহে চলিয়া গেল। সকলেই আসিতেছে, অল্পবিস্তর শুনিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু পুষ্করিণী-অধিকারিণীর সেই তৈলমর্দনই চলিতেছে। এমন সময় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া হরকালীর মায়ের প্রবেশ—কি ব্যাপার!—ইনি ভারি ব্যস্ত—ইঁহারই গৃহে কাল শাঁখ বাজিয়াছে—বধুর পুত্রসন্তান হইয়াছে।

"এ কি—ঠাকুরঝি যে, আজ গঙ্গা নাইতে যাস্‌নি? আমি বলি, আজ কেবল আমারই যাওয়া হয়নি—তা বোন্, কি করি, মেজ বৌমার কাল রাত্রে বেটাছেলেটি হ'ল—তা ফেলে যাই কি ক'রে? জানিস ত, এ-কালের মেয়েগুলো সব বিবি হয়েছে—তাপ সেঁক নেবে না, ঝাল খাবে না। আমি তেমন মেয়ে নই—ঐ জন্যে বৌয়েদেব কখন প্রসবকালে বাপের বাড়ী পাঠাই না। সেজ বৌয়ের বাপ আবার ডাক্তার, তিনি তাপ নিতে দেবেন না, ঝাল খেতে দেবেন না—মেয়েকে গদি পেতে শোয়াতে চান। জান ঠাকুরঝি, আমাদের যেমন নিয়ম আছে, ডাক্তার বলেন, ও-সব ফেলে দাও— আমি তেমন মেয়ে নই—এই ব'সে থেকে বৌকে ভাজা ভাজা ক'রে তাপ

দিয়ে এলুম, এইবার নেয়ে গিয়ে ঝাল খেতে দেব। ডাক্তার আছেন, তিনি আছেন,—তাঁর মেয়ে ঘরে এনে কি আমি নিয়মভঙ্গ করব। সে-বার আঁতুড়ে সেজ বৌয়ের মেয়েটা গেল, ডাক্তার দেখতে এসে বললেন, এই সব স্যাঁতানে জায়গায় পড়ে ব্যায়রাম হয়েছে,—ব'লে আঁতুড় নাড়তে চান—আমি তা কিছুতে করতে দিই নি।"

"সে মেয়েটার কই কি ব্যায়রাম হয়েছিল, আমি ত শুনি নি—তার উপর না সেই বাবার দৃষ্টি পড়েছিল?"

"তাই ত বলছি ভাই—ওঁরা বড় বোঝেন, শিশি শিশি ওষুধ এল, গেলাতে চান—গিলবে কে?—বাবা মুখ চেপে ধরে আছেন—সে জ্ঞান নেই। ও রোগের যা, রোজা এনে সব করলুম, তা কিছু হ'ল না। হবে কি—রোজা বললে যে, পোয়াতি চাঁপাফুলের গাছের নীচে গেছল—তাই দৃষ্টি পড়েছে। সাহেবের মেয়ে, বেটী হয়ত কোন গাছতলায়-মাছতলায় গেছল, ও-সব ত মানা হয় না। এবার আমি আর বাপের বাড়ীমুখো হতে দিই নি। সেবার যেন মেয়েটা গেল গেল, কিছু ক্ষতি হ'ল না—এবার বেটাছেলেটি হয়েছে, একটু ভাল করে তাপ সেঁক না দিলে কি হয়? পোয়াতি ভাল থাকলে, তবে ছেলের পিত্তেশ—কি বলিস ভাই?"

"তা বই কি, বংশ রক্ষার জন্য বৌয়ের আদর, নইলে পরের মেয়ে ঘরে এনে জঞ্জাল বই ত নয়। তা হোক, বেটাছেলেটি হয়েছে—আটকৌড়েতে হাঁড়ি করিস। তোদের সুতিকাপূজো আছে ত?"

"হ্যাঁ, সুতিকাপূজো হবে বই কি—তা লক্ষ বামনের পায়ের ধুলো কোথায় পাব,—বারোটি বামনের পায়ের ধুলো দেব—আর পূজা-আশ্রয় সব হবে। আটকৌড়ে যেমন আর সব বৌয়ের ছেলেদের বেলা করেছি, এরও তেমনি হবে—এক হাঁড়ি জলপান, একটি ক'রে সিকি, চারটে ক'রে মেঠাই, এই সব ঘরে ঘরে দেব—আর বাড়ীতে ছেলেরা যারা আসবে, তাদের বেটাছেলেদের দু আনা, মেয়েদের চার পয়সা ক'রে দেব। আর বেঁচেবত্তে থাকে ত ভাতটিও দিতে হবে। যেমন বেটাছেলেটি হয়েছে আহ্লাদের, তেমনি খরচপত্রও হবে। এই ধাইকে নগদ এক টাকা, একটা ঘড়া কালই দিতে হ'ল—আবার আসবে বিদেয় নিতে। মেয়ে হ'লে, সেই যা নাড়ীকাটা একটা টাকা ধরা আছে—আর কি!"

"তা পরমেশ্বর দিন দিয়েছেন, আমোদ-আহ্লাদ খরচপত্র করবি বই কি! আমার দু মেয়ে এখানে আছে, আমার ঘরে তিনটে হাঁড়ি দিস, আর আমার সতীন-পো বৌও ভিন্ন হয়েছে।"

"হ্যাঁ ভাই, তা বললে ভাল। এই বাড়ী গিয়ে হাঁড়ির ফর্দ করতে হবে। আবার বাজনা আসবে, তবে নাচ আসবে, তার বিদায় খরচ ঢের"—

"শুনেছিস, মিত্তিরদের বৌয়ের আবার মেয়ে হয়েছে!"

"ও মা, বলিস কি, আবার মেয়ে—কে বললে?"

"এই কেষ্ট রাত থাকতে এসেছিল, আঁতুড় ছুঁয়েছিল কিনা, সেই কত দুঃখ খেদ করতে লাগল—তারই সঙ্গে কথায় কথায় ত জাহ্নবী নাইতে যাওয়া হ'ল না—আমি ভোরে কাপড় কাচতে এসেছি, আর কেষ্ট এল।"

"হ্যাঁ ঠাকুরঝি, গঙ্গা তোমার কার নাম গা?"

"আমার ছোট খুড-শাশুড়ীর নাম 'ফঙ্গামণি', তাই আমরা জাহ্নবী বলি—ঠাকুরদের নাম আমাদের প্রায় করবার জো নেই। আমাদের বৃহৎ পরিবার, সকল নাম বেছে চলতে হয় ত—আমরা ত একেলে নই যে, সুদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর নামটি হদ্দ মেরে কেটে বাছব।"

"তাই ত ঠাকুরঝি, মিত্তিরদের বৌটো কি গা—এবার গোটা চার পাঁচ মেয়ে হ'ল বুঝি—আমার বড় বৌমার ষেটের কোলে এই দুটি; দুটি নষ্ট হয়েছে; তাই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মেজ বৌমারও দুটি বেটা, একটা মেয়ে, তা মেয়েটা মামার বাড়ী থাকে, দিদিমার আদুরে, মেজ বৌমা বাপের একটি মেয়ে কি না। তা ঐ প্রথম মেয়ে দিদিমাই মানুষ করেছে, সে মেয়ের ভার আর আমাদের নিতে হবে না—দিদিমা তাকে হাতের তেলোয় করে নাচিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, বেটাছেলে ক'রে কাপড় পরানো হয়, হেমন্তকুমারী নাম, তা হেমবাবু বলে ডাকা হয়। সে মেয়ের আদিখ্যেতা কত। আর সেজ বৌয়ের দুটো মেয়ের একটা সেই আঁতুড়ে গেছে, আর এই খোকাটি হয়েছে।"

"তা বেঁচে থাক্, আমরা সব পাঁচ কর্ম্মে যাব, খাব, নেব। আমাদের ঘরের কথা। মেয়েগুলো কেবল মিথ্যা বই ত নয়। সূতিকাপূজো নেই, আটকড়াই কর আর না কর, ভাত—তা বড় সাধ হয় ত পাঁচজনকে এনে খাওয়াও। একটু কেবল পেসাদ মুখে দেওয়া, তার ক্রিয়া নেই, কর্ম্ম নেই, পিতৃপুরুষ এক

গণ্ডূষ জল পায় না। ঐ যা বিয়ের সময় একবার পিতৃপুরুষ জল পান বই ত নয়।"

"যাই, এই বেলা বাড়ী যাই ; সেজ বৌয়ের বাপ হয়ত এসে এতক্ষণ কত হাঙ্গামা করছে। ছেলেরা ছেলেমানুষ, তারা ত কথা কইতে বড় পারে না—আমি এমন জবরদস্তি না হ'লে রক্ষা ছিল! আর ছেলেগুলোরও ঐ মত—সব একেলে কিনা। তা আমার উপর বড় কথা কয় না, বেশী বললেই আমি বলি যে, এখন বড় হয়েছিস, আমায় মানবি কেন? আমি তোদের চারটি নিয়ে বিধবা হয়ে কত কষ্ট করে তোদের এত বড় করলুম, এখন আমি পর হলুম, শ্বশুরই আপনার হ'ল। তা ওরা আর বড় কথা কইতে পারে না। এই ছোট ছেলে—ঐ একটু মুখফোঁড়—আর কোলের কিনা, আতুরে—ওকে কিছু বলতে পারি নে, ও আঁতুড়ে-মাতুড় ছুঁয়ে-নেপে সৃষ্টি করে। এই আঁতুড় উঠবে আর বৌগুলোকে দিয়ে নেপ বালিশ পর্যন্ত সব কাচিয়ে নেব।"

"ও কথা আর বলিস্ নে—জাত-জন্ম আর রইল না। এ কালের ছেলে, ওরা সব এক রকম। আমার ছোট জামাই অমনি, সে-বার বিধু প্রসব হতে এখানে এসেছিল, জামাই রোজ দেখতে আসত, সেই বিছানায় বসে গল্প-সল্প করে চলে যেত। প্রথম যে দিন এল—আমি তখন নাইতে গেছি—মালা হাতে করে দাঁড়িয়েছি, আর আঁতুড় থেকে বেরিয়ে আমার থপ্ ক'রে পায়ের ধুলো নিলে। কি করব, বললুম—'বাবা, আঁতুড় ছুঁয়ে কি আমায় ছুঁতে আছে? আবার হাতে মালা।' তা অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'আমার অত মনে ছিল না।' আমি আর কি করব—মালা গেল, আবার পুকুরে নেয়ে মরি। তা জামাইয়ের যে মত, মেয়েকে সেই মতেই রাখতে হয়—আমি লুকিয়ে দুটো দুটো গুঁড়ো ঝাল দিই—মেয়েগুলোও তেমনি, হাত পেতে নিলে, কতক খেলে, কতক বা না খেলে,—বলে, 'ঝাল খেলে মা কেবল জলতেষ্টা বাড়ে বই ত নয়, তোমরা ত জল দেবে না—সুদ্ধ সাবু খেয়ে থাকলে তেষ্টাও হয় না, জলও চাই না।' কে জানে ভাই, ওদের কেমন কথা। আঁতুড়ে তেষ্টা পায় না—আমাদের এমনি তেষ্টা ছিল যে, অতি ময়লা জলও এক কোষ চুরি ক'রে খেয়েছি। আমাদের কালে ঝাল দিয়ে সুদ্ধ মুখ ধুতে জল দিত। তাতে কি প্রাণ বাঁচে!"

"তা বই কি, আমার এই চারটি গুঁড়ো হয়েছে, ফি বারই আঁতুড়ে মাগীকে

দূরের আলো

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপূর্ব্ববাবু সাত বছরের ডিপুটি। আমাদের গ্রামেই বিবাহ করেছেন। ক্বচিৎ কখনো তাঁর আবির্ভাব হ'ত; ম্যালেরিয়ার ভয়ে তিনদিন কখনো কাটাতেন না। মাথার অসুখ হওয়ায় কবিরাজের স্মরণ নেন। তিনি বলেছেন—এই সময় দিনকতক নথিপত্র থেকে মাথাটা নড়িয়ে, সহরের ধূলি-ঘন বায়ুর বাইরে গঙ্গাকূলে—কোন বৃক্ষলতাবহুল শীতল পল্লীতে থাকা, আর প্রাতে নিয়মিত গঙ্গাস্নান। আড্ডা দিতে পারলে আশু ফল পাবে,—অবশ্য দাবা পাশা বাদ, সেরেফ গান গল্প গুড়ুক, হাসি-তামাসা; তাস খেলো ত' এক ঘণ্টা,—বাস্, তার বেশী নয়। এই হলেই সেরে যাবে; ঔষধের আবশ্যক নেই। তাই এক মাসের ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, যেহেতু আমাদের গ্রামখানি গঙ্গার ওপরেই,—আর বৃক্ষলতাবহুল ত' বটেই।

আমাদের বৈঠকের আড্ডাটা ছিল বিশুদ্ধ। তিনি খোঁজ নিয়ে তাইতেই ভর্ত্তি হয়ে পড়লেন। বেশ মিশুক লোক, দু'তিন দিনেই বেমালুম আপনার লোক ব'নে গেলেন।

আমার "অমৃতবাজার পত্রিকা" আসতো,—একদিনের পুরাতন সংখ্যাখানা দুপুর বেলাটা কাটাবার জন্যে নিয়ে যেতেন। সেদিন ইংরিজি ১৯২২ সনের ২রা জুলায়ের কাগজখানা ফিরিয়ে দেবার সময় বললেন—কতবড় জাত দেখুন—ওরা বড় হবে না তো হবে কে! আকাশে ওড়া, জলের মধ্যে থাকা, হাজার হাজার মাইলে বেতার বার্ত্তার আদান-প্রদান, বৃদ্ধকে যৌবন দান, ইত্যাদি ইত্যাদি অল্পদিনের মধ্যে সেরে ফেললে। এবার দেখছি মৃত্যুর পরপারের পাত্তা লাগিয়েছে। দেখবেন সপ্তলোক ভেদ করতে ওদের সাতটা বছরও লাগবে না,—আয়না বানিয়ে ফেলবে,—ডাক বসিয়ে দেবে।

—বলেন কি? পরলোকের সাড়া কিছু পেলেন নাকি?

—আপনি বুঝি কাগজখানা কেবল নেন—দেখেন না! Sir Conan Doyle-এর (সার কোনান দয়াল-এর) নাম শুনেছেন তো। তিনি যে-সে লোক নন—তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক—এডিনবরার LL. D., লণ্ডনের

নামজাদা ডাক্তার, অসাধারণ বক্তা—আবার সাহিত্য-জগতে দশ জনের একজন। যেমনি হাতে বহরে, তেমনি স্বাস্থ্য, তেমনি মাথা। তিনি বিনা প্রমাণে বা চক্ষে না দেখে একটি কথাও বিশ্বাস করবার লোক নন। আজ ১৫|২০ বৎসর তিনি অলৌকিক বা পারলৌকিক রহস্যের পেছনে পড়েছিলেন। এখন প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে অর্থাৎ ভূতের বা সূক্ষ্মদেহের ফোটো নিয়ে আর পারলৌকিক স্ত্রী-পুরুষ ডেকে এনে তাদের কথা শুনে, জগতে সেই বাণী প্রচার করতে দেশবিদেশে বেড়িয়েছেন। অনেক ঘুরে সম্প্রতি আমেরিকায় লেকচার দিচ্ছেন। সর্ব্বত্রই লোকারণ্য—স্থানাভাব—চড়াদরে টিকিট কিনেও লোক দাঁড়াতে স্থান পায় না। তিনি এক পয়সাও ছোঁন না,—সব টাকাটা Psychic (আধ্যাত্মিক) গবেষণার জন্যে দেন।

তাঁর হচ্ছে—মৃত্যুর পর মানুষের জীবন নিয়ে কথা, অর্থাৎ ভৌতিক জীবন এবং তাদের সুখ বা দুঃখানুভূতি সম্বন্ধে*। আর তাঁর প্রধান বাণী হচ্ছে, "এ জীবনে যে কোন বীজ ছড়াবে বা যা বুনবে, পরলোকে তার কড়ায় গণ্ডায় আদায় পাবে বা আদায় নিতে হবে।"†

তিনি বলেছেন—যে বাণী (message) তিনি শোনাচ্ছেন—হয় এটা একটা ভয়ঙ্কর ভ্রান্তি,—মায়া। তার পরই তিনি বলছেন—"আমি যা দেখেছি, আমি যা শুনেছি, আর আমি যা সত্য বলে জেনেছি, সেইটাই শপথ করে জানালুম।"‡

—শুনলেন? কতবড় ব্যাপারটা বলুন দেখি?—ওদের অসাধ্য কিছুই নেই।

বললুম—ওঁর যা বর্ণনা শোনালেন, তাতে মহাপুরুষ বলেই মনে হয়। মানবের এতটা উপকার করছেন—একটি পয়সা নেন না! ওঁর Sherlock Holmes পড়ে ভারি আকৃষ্ট হয়েছিলুম বটে। যা হোক—উনি যে-কথা শুনিয়ে দিয়েছেন—অর্থাৎ এর চেয়ে মহত্তম বাণী মানুষকে কেউ কখনো

* Life in the Spirit world and the realization of happiness or woe.

† Whatever is sown in this life will be reaped to the uttermost limit on the other.

‡ He says himself—The message he is delivering is either the greatest ever transmitted to mankind, or it is the most appalling delusion. I testify to that which I have seen and heard and known to be true.

দেয়নি, তাতেই বোঝা যায়, বিশ্বের সব দেশ সম্বন্ধে ঘোঁটা অভিজ্ঞতা না থাকলে, এতবড় কথা উচ্চারণ করতে পারতেন না। আনন্দের কথা এই, —আমরা সব হারলেও "দয়াল" আমাদের জোটেই, দয়ালের কম্‌তি কখনো হয়নি।

ডিপুটিবাবু একটু অবাক্ হয়ে আমার মুখের ওপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—আপনার ভাবটা বুঝতে পারলুম না।

—কেন—সত্য কথা নয় কি! বরং কবে যে ওঁরা দয়া করে বলে দেবেন —"মৃত মা-বাপের শ্রাদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" সেই সাইন্টিফিক্ বাণী শোনবার অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে আছি। যখন অতদূর পৌছেচেন—দেবেনই একদিন। ওঁরা না বললে বিশ্বাস করতে পারি না যে!

তিনি একটু হেসে বোধ হয় মেনে নিলেন। আমিও আর কথা বাড়ালুম না।

ডিপুটিবাবুর ঝোঁক ছিল গল্প শোনবার। পল্লীর প্রাচীন কথা শুনতে তিনি ভালবাসতেন। একদিন একটা বলেছিলুম, সেইদিন থেকে নিত্যই তাঁর অনুরোধ পেতুম।

বললেন—নির্ম্মলবাবু, আজ আপনাকে এত বড় জিনিসটে শোনালুম—আপনার ত দৃষ্টি এড়িয়েই গিয়েছিল, তার বদলে এমন একটি গল্প শোনাতে হবে যাতে আপনাদের গ্রামের পূর্ব্বেকার ইতর-ভদ্র, ছেলে-বুড়ো দেখতে পাই।

বললুম—সেটা তাহলে গল্পের আইন-কানুন ছাড়িয়ে, পূর্ব্বের পল্লী-পরিচয়ে দাঁড়াবে—আর তার মধ্যে অনেক কিছু ঢুকে পড়বে। সেটা ঠিক গল্প হবে না।

তিনি হেসে বললেন—আপনার বলবার ধরণে সেটা যে গল্প হয়ে দাঁড়াবে সে ধারণা আমার হয়ে গেছে। তা ছাঁড়া আমি তো নিছক মিছে গল্প শুনতে চাচ্ছি না।

বললুম,—বেশ, তবে তামাকটা সেজে বসি।

১

সে-দিন ছিল শনিবার।

সকাল আন্দাজ ছ'টা হবে। বাড়ীর সামনে ছোট বাগানটাতে পাইচারি করতে করতে দাঁতন করচি। পাড়ার একজন প্রৌঢ়া কলসী-কাঁখে গঙ্গাস্নানে

যাচ্ছিলেন ; দেখি, একটি ছোট মেয়ে তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আমার দিকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

মেয়েটি কে ? কই কখনো ত দেখিনি। শ্যাম বর্ণ, একখানি ডুরে কাপড় পরা, কোঁকড়া কোঁকড়া রুক্ষ কেশ কপালের ওপর দুলচে, বয়স হবে আট, কিন্তু সঙ্কোচমাখা সুন্দর চোখ দুটির বিনম্রভাব বয়সটাকে যেন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে,—চোখে চাঞ্চল্যের চিহ্ন মাত্র নাই। অবাক্ হয়ে চেয়ে আছি, মেয়েটি বেড়ার ধারে এসে বললে—আমি যে আপনার কাছে যাব।

—এস না,—ওই ওখান-দে এস।

মেয়েটি ধীরে ধীরে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার পদদ্বয় স্পর্শ করে মাথায় দিয়ে, উঠে বললে—আমি বিন্দুবাসিনীতলার মাধব ঘোষের মেয়ে ; আপনিই তো আমার বাবার দাদাঠাকুর !

হাসিমুখে বললুম, হাঁ আমি তোমার বাবার দাদাঠাকুর আবার দাদা-বাবুও। তোমার বাবা কেমন আছেন ?

মেয়েটির মুখ ম্লান হয়ে গেল ; সে বললে—আমার বাবার বড় অসুখ জ্যাঠামশাই ; কাল ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, আজ আবার দীনেশ-কাকা ডাকতে গেছেন। বাবা আপনার পায়ের ধুলো চেয়েছেন।

শুনেই প্রাণটা দমে গেল। মুখে বললুম—ভয় কি, সেরে যাবেন ; চল তোমার সঙ্গেই আমি যাচ্চি,—চাদরখানা নিয়ে আসি।

আমার স্ত্রী শুনে বললেন—মেয়েটিকে বাড়ীর ভেতর আনলে না কেন ? হাতে কিছু দিতুম।

—'এরপর দিও' বলেই চাদর নিয়ে বেরিয়ে এসে বললুম, চল—তোমার নামটি কি মা ?

—আমার নাম গৌরী।

আজ প্রায় বিশ বৎসর মাধবের সঙ্গে কোন সংস্রব না থাকলেও আমি কোন দিনই তাকে ভুলতে পারিনি। তার নামটি আজ আমার প্রাণে এই প্রভাতের পবিত্রতার মতই পরশ দিলে। প্রাণ যে তার কোন্ অদৃশ্য কক্ষে দুর্লভ স্মৃতিগুলিকে তাদের সত্যরূপ দিয়ে সসম্মানে অথচ গোপনে রাখে তা বলতে পারি না। আজ নাম মাত্রই মাধবকে যেন সর্ব্বাঙ্গে—শুধু অনুভব নয়,—উপভোগ করলুম।

২

মাধব ছিল গয়লার ছেলে। তার বাপের ছিল ৫।৭টি গরু, আর ৯।১০ বিঘে ধানজমি। তাইতেই তাদের বেশ চলে যেত। ঐ একমাত্র ছেলেটিকে হীরু ঘোষ পাঁঠশালে লেখা-পড়া শিখতে দেয়। মাধব পাঠশালের পড়া শেষ করলে; কিন্তু তার পড়বার ইচ্ছা শেষ হল না। হীরু নিজের জাতের অনেক কথা অনেক বিদ্রূপ সয়ে, তাদের কাছে বিনীত ভাবে মঞ্জুরী আদায় করে আর বাবুদের অনুমতি নিয়ে, মাধবকে ইংরিজি ইস্কুলে পাঠায়।

মাধব আমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হয়। সে এল যেন ভদ্রলোকের ছেলেদের ভৃত্য, তাদের হুকুম তামিল করাই তার কাজ। কারুর পেন্‌সিল কি বই পড়ে গেলে মাধব তা কুড়িয়ে দেয়, কারুর মার্ব্বল্ হারিয়ে গেলে কি দূরে গিয়ে পড়লে, মাধব তা খুঁজে আনে। কেউ তারে কিছু হুকুম করলে মাধব সেটা সৌভাগ্য বলে নেয়। রোজ সকলের শ্লেট ধুয়ে দেওয়াই ছিল তার কাজ। আমি জানি মার্ব্বল খেলায় মাধবের টিপ্ ছিল খুব সুন্দর। পাঠশালে কোন ছেলে তাকে কোনদিন খাটাতে পারেনি; কিন্তু ইস্কুলে এসে পর্য্যন্ত যদি কেউ দয়া করে তাকে নিয়ে খেলতো—হেরে খাটাটাই ছিল তার কাজ! আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি বাবুদের ছেলেদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে ইচ্ছে করেই সে হারতো,—সব খেলাতেই!

ইস্কুলে প্রথম বছরটা তার কি নির্য্যাতনের মধ্যেই কেটে ছিল! বোধ হয় কোন ছেলেই সে-অবস্থায় এতটা দিন টেঁকে থাকতে পারতো না। একটা ভাল কথা কি হুকুম পাবার জন্যে কিরূপ লালায়িত হ'ত, কি সঙ্কোচেই সে আড়ষ্ট থাকতো,—ভয়ে ভয়ে সরে সরে থাকতো পাছে কারুর গায়ে পা ঠ্যাকে, কি কাপড়ে কাপড় ঠ্যাকে। অজান্‌তে সামান্য স্পর্শেই তাকে শুনতে হোতো—'এই বেটা গয়লার ছেলে—দেখতে পাস্ না!'

আবার দয়াল পণ্ডিতমশাই তার সম্বন্ধে নিজের নামের বিপরীত অর্থটাই বরাবর বাহাল রেখেছিলেন। তার বিরুদ্ধে যে যা অভিযোগ কোরতো তিনি নির্ব্বিচারে তাকে শক্ত সাজা মুক্ত হস্তেই দিতেন। আমি তার হয়ে কিছু বলতে গিয়ে তাঁর মুক্ত হস্তের দান প্রায়ই পেতুম। তাতে মাধব যে কতটা কুণ্ঠা বোধ করত আর আড়ালে আমাকে কাতর ভাবে বলত—"দাদাবাবু আপনার পায়ে পড়ি, আমার হয়ে কিছু বলবেন না, আপনাকে

মারটাই আমাকে বড় বেশী লাগে।" তার সব চেয়ে বড় গুণ ছিল সে কথনো মিথ্যা কথা কইতে পারত না। এ সাহস ও-বয়সের ছেলেদের মধ্যে খুবই বিরল ছিল। বরং মিছে কথা কয়ে মাষ্টারদের ঠকাতে পারলে ভারি একটা আনন্দ আর বাহাদুরী ছিল। একটা দিনের একটা কথা আজও ভুলতে পারিনি।

নটবর খবর দিলে—বসাকের-বাগানে গোলাপজাম পেকেছে। যারা বাগান জমা নিয়েছে দু-এক দিনের মধ্যে পেড়ে হগ্‌সাহেবের বাজারে পাঠাবে। আমাদের গ্রামের জিনিস আমাদের চোখের সামনে-দে বেরিয়ে যাবে আর আমরা হাঁ করে চেয়ে থাকবো—এমনি আমরা অপদার্থ! আমরা কি কেবল গরুর মত গাছে ফুলধরা থেকে ফল পাকা পর্য্যন্ত দেখতেই আছি! ইত্যাদি—

নটবরের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনে বন্ধুবরেরা একবাক্যে রায় দিলে—তা হতেই পারে না, তাতে গ্রামের বদনাম আছে—শুনেছি কর্ত্তারা ঐ বাগানেই মালীদের ছেকল দিয়ে—সাত-সাতটা নীচু গাছ নেড়া করে বেড়া ডিঙিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। ওঃ—এক-একজনের জোর ছিল কত! শ্যাম জ্যাঠামশাই পাকা দু-কাঁদি মর্ত্তমান কলা দুহাতে ঝুলিয়ে নিমতে থেকে এই চার মাইল ছুটে এসেছিলেন—কোনো বেটা ধরতে পারেনি! ইত্যাদি, ইত্যাদি। পশ্চাতে এত বড সব tradition থাকায় তখনি পরামর্শ স্থির হয়ে গেল সেইদিন সন্ধ্যার সময় গোলাপজাম পেড়ে আনতেই হবে, তা না তো আমরা অপদার্থ—আমাদের মুখ দেখানো উচিত নয়। একজন এ সংবাদও দিলে—বাগানের লোকেরা সন্ধ্যার সময় গঙ্গা দর্শনে যায়।

কথা হ'ল, কেহ দূরে, কেহ নিকটে পাহারায় থাক্‌বে, আর মাধব বেশ নিশ্চিন্তে গাছে উঠে ডাল-সমেত গোলাপজামের তোড়া ছুরি-দে কেটে কেটে তলায় ফেল্‌বে, নটবর আর কার্ত্তিক কুড়িয়ে হাতে হাতে চালান দেবে।

শুনে মাধব যেন নিমেষে শুকিয়ে গেল। সে কাতর চোখে চেয়ে বললে,—আপনারা আমাকে মাপ করুন, এ কাজটি আমি পারব না, আমি গরীব ছোটলোক, বাবুদের বাগানে ঢুকতেই আমার পা ওঠে না। আবার বাবার জর দেখে এসেছি, সন্ধ্যের সময় আমাকেই আজ বাড়ী বাড়ী দুধ দিতে যেতে

হবে। সাহস ক'রে সে 'চুরি করতে পারব না' কথাটা মুখে আন্‌তে পারলে না,—সেইটাই ছিল তার প্রাণের কথা।

—পারবিনি? আচ্ছা বেটা! ছোটলোকেই ভাল পারে,—ঐ ক'রে খায়,—তাই বলা। তারা আবার কিনে খায় কবে? ভাল চাস্ তো এখনো বলছি!

মাধব কম্পিতকণ্ঠে বললে,—আপনারা যখন যা বলেন তখুনি করি, কখনো কি না বলিচি? এ কাজটি আমি পারব না—আমাকে মাপ করুন।

—থাক্ থাক্, দেখ্‌চো না বেটা ধর্ম্মপুত্তুর! ছোটলোকের বাড় দেখেচো। সেক্রেটারী অতুলবাবুই ত এইটি করলেন, দয়াল পণ্ডিতমশাই ঢের বারণ করেছিলেন।

—যা না বেটা কানা গরু, এখানে আর কেন, দূর হ—

মাধব মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, একবার কেবল অন্যের অলক্ষ্যে আধ-চাওয়া-গোছ আমার দিকে চাইতেই আমি ইসারায় যেতে বললুম। সে যেন ফাঁসির হুকুম পেয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী চলে গেল। সে কি করুণ দৃশ্য! তার সেই অবস্থাটা আমাকে ভারি আঘাত করতে লাগ্‌ল। কিন্তু তার হ'য়ে একটি কথাও কইতে পারিনি।

* * *

অভিযান বন্ধ রইল না, কিন্তু সেটা সফলও হ'ল না—সুফলও দিলে না। গোলাপজামগুলি বৃক্ষচ্যুত হ'য়ে ধরাশায়ী হ'ল বটে, কিন্তু বাগানের লোকেরা এসে পড়ায় একটিও হাতে এল না। আমাদের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় যত্র-তত্র পথ দেখতে হ'ল।

পরদিন বেলা ১১টার সময় ঝুড়ি ঝুড়ি গোলাপজাম ইস্কুলে এসে উপস্থিত হ'ল। যারা এনেছিল তারা কেঁদে জানালে, তাদের চাকরি ত' যাবেই, মাইনেও পাবে না। ২।৩ জনকে সনাক্তও কর্‌লে। হেডমাষ্টার দয়াল পণ্ডিত-মশায়ের উপর বিচারের ভার দিয়ে গেলেন।

রাতের দেখা সনাক্ত মঞ্জুর হ'ল না। ক্লাসের সব ছেলেদের এক এক করে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, এ কাজ কে করেছে? সবাই একবাক্যে বললে, —করেছে মাধব। সে-ই গাছে উঠে কেটে কেটে ফেলে, আমরা তার পরামর্শ মত রাস্তায় ছিলুম ইত্যাদি। কেবল হরিবিহারী আর আমি

বলি—মাধব সে বলেই ছিল না; তার বাপের অসুখ ব'লে বাড়ী চলে গিছ্‌লো।

সওয়াল-জবাবের উল্লেখ অনাবশ্যক। মাধব নীরবে যে মারটা খেলে, একটা জানোয়ারেও তা পারতো বলে মনে হয় না। স্কুলেই তার জ্বর এলো। মিথ্যা কথা কবার অজুহাতে হরিবিহারী আর আমি যা পেলুম তাতে জ্বরটা শুধু আসেনি।

এক-কুড়ি সেরা সেরা ফল পণ্ডিতমশায় স্বহস্তে বেছে নিয়ে, বাগানের লোকদের বিদায় দিলেন। আশ্বাস দিয়ে বললেন—তোমাদের কোন ভয় নেই, বাবুদের কাছে ইস্কুল থেকে চিঠি পাঠাচ্ছি—আর ফলের এই নমুনো রাখলুম,—দর জেনে ফাইনের ব্যবস্থা করাব।

তারা ফলের ঝুড়ি নিয়ে চলে গেল। আর সেই বাছা বাছা "উৎকৃষ্ট এক-কুড়ি"টা দর-যাচাইয়ের জন্যে নটবরের-মারফত্‌ পণ্ডিতমশার বাড়ী প্রস্থান করলে। সে-দিন তার ছুটি হয়ে গেল।

ঘণ্টা শেষ হয়ে গেল। পণ্ডিতমশাই অন্য ক্লাশে চলে গেলেন।

আঘাতগুলোর জ্বালা তখনো জীর্ণ হয় নি। কানে পৌঁছুতে লাগলো, পণ্ডিতমশাই ছোট ছেলেদের জোর গলায় পড়াচ্ছেন—সদা সত্য কথা কহিবে; প্রবঞ্চনা করিয়া পরের দ্রব্য লইবে না। অবিচার করা মহাপাপ। ইত্যাদি—

হরিবিহারীর চোখের জল তখনো হু-হু করে পড়ছে, সে পিঠে হাত বুলোচ্ছিল—খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠ্‌ল! সবাই তার দিকে চেয়ে যোগ দিলে। আবার ভাব হয়ে গেল।

মাধব আরো দু'বছর স্কুলে পড়ে। তখন আর ভদ্রছেলেদের তার উপর সে পূর্ব্বভাব ছিল না। সে ব্যবহারে আর চরিত্রগুণে সকলকে জয় করেছিল। বয়সের সঙ্গে বোধ হয় অনেকে তাকে চিনেও ছিল।

সকলে যে চিনেছিল এমন কথা বলতে পারি না। তার বিনীত আনুগত্য আর সুমধুর ব্যবহারকে কেহ কেহ অবশ্য প্রাপ্য বলেই ভাবতো।

বাপ মারা যাওয়ায়—সংসার, দু'টি অবিবাহিতা ভগ্নী একেবারে মাথার ওপর এসে পড়ায়, সে ইস্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। এই ছাড়াটা আমি যে কতখানি বেদনা দিয়েছিল, সে যে-দিন সকলের কাছে বিদায় নিলে,—

দিন সবাই তা অনুভব করেছিল। সে যখন হাত জোড় করে অবনত শিরে—অজ্ঞানে যে-সব অপরাধ হয়ে থাকবে তার জন্যে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে চোখের জল সামলাতে সামলাতে দীনহীনের মত চলে গেল,—সেই দিন আমরা—ভদ্রলোকের ছেলেরা—ক্লাসে বসে স্পষ্ট অনুভব করেছিলুম—ক্লাসটা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তার চরিত্রমাধুর্য্যই আমাদের অনেককেই চরিত্র জিনিসটির মূল্য বুঝিয়ে দিয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ দিন চলে গেছে—বোধ হয় বিশ বাইশ বছর। সে বাপের কাজগুলি—চাষ-বাস, গরু-বাছুর দেখা, দুধ জোগানো প্রভৃতি মাথা পেতে নিয়ে সংসারে প্রবেশ করেছে, ভগ্নী দু'টির বিবাহ দিয়েছে, নিজেও সংসারী হয়েছে। সংসারও বেড়েছে।—তার শ্রমের বিরাম নেই, ছুটি নেই; বোধ হয় সে-বেশে সে দেখা করতে লজ্জাও বোধ করে, তাই বড় একটা দেখাও হয় না। সে সকাল-সন্ধ্যা কাজে ব্যস্ত—আমরা উদয়াস্ত চাকরির পশ্চাতে! দু'তিন মাসে একবার দেখা হলে, সেও পূর্ব্বের মত অবাধে কথা কইতে পারে না।

ভগ্নী দু'টির বিবাহে সে দীনের মত এসে দাঁড়িয়েছিল। আমরা গিয়ে বন্ধুর মত সব কাজের ভার নি। তাতে সে কি উৎসাহই পেয়েছিল। সে যে আমাদের নিয়ে কি করবে তা ভেবেই পায় না। কি অমায়িক কুণ্ঠামিশ্রিত হাসি!

মধ্যে মধ্যে বাংলা কি ইংরাজী বই চাইতে আস্‌তো। তাকে পেলে ছাড়তে ইচ্ছে হ'ত না, কিন্তু তার কাজে ফুরশৎ কোথায়! "নরোত্তম চরিত" আর The Imitation of Christ বই দু'খানার সুখ্যাতি তার মুখে ধরত না। তাই ও-দু'খানা আমি তাকে দিয়ে দিয়েছিলুম—সে কণ্ঠস্থ করেছিল। দেখা শোনার দূরত্ব তাকে কি দূরে ফেলতে পারে! সে-যে আদর্শের মত হয়ে, হৃদয় অধিকার করেছিল। তারপর তো অনেক বড়বাবু, বড় ধনী, বড় বিদ্বান, বড় গুণী দেখেছি—অনেক বড় বড় কথা শুনেছি, কিন্তু তথা-কথিত এই ছোট লোকটির সেই ছোট ছোট বিনীত ব্যবহারগুলির দুর্লভ দীনতার পশ্চাতে কি যে একটা পবিত্র মাধুর্য্য ছিল—যার শীতল সৌন্দর্য্য বড়-বড়র মধ্যে মেলেনি।

৩

মাধব মুখে একটু হাসি এনে বললে—আমি জানি, দাদাবাবু আমাকে পায়ের ধূলো দেবেনই।

বললুম—ব্যাপার কি মাধব, কি হয়েছে, অসুখটা কি?

সেই ভাবেই হাসিমুখে, খুব নীচু গলায় মাধব বললে—এবার বিদেয় নেবার অসুখ দাদাবাবু—তাই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। জীবনের আরম্ভকালে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমার জন্যে অনেক নির্য্যাতন স্বইচ্ছায় সয়েছিলেন, এখন বিদায় বেলায় আপনি বই আর কে সইবে দাদাবাবু!

সেই মধুর কণ্ঠ, সেই সুমধুর কথা, কিন্তু আজ তা শুনে আগের মত উপভোগ করতে পারলুম না,—প্রাণটা সহসা ব্যথায় ভরে উঠ্‌লো। বললুম— এ সব তুমি কেন বলচো মাধব,—তুমি নিজে তো আমাকে কখনো ব্যথা দাওনি ভাই,—

এইবার মাধবের দুই চক্ষু জলে ভরে এল,—সে সামলে নিয়ে বললে—সে যে অনেক কথা দাদাবাবু, আপনার আপিসের বেলা হয়ে যাবে। পরে নিমেষ মাত্র নীরব থেকে বললে—কিন্তু এর পরের জন্যে রাখলে, আমার বেলা যে ফুরিয়ে যাবে! আচ্ছা আমার কথা থাক, দীনেশের কথাটা আপনাকে না বললে তো নয় দাদাবাবু!

—কে দীনেশ?

—আমাদের লক্ষ্মীদিদির ছেলে বললে বুঝতে পারবেন কি? ও পাড়ার হরলাল চাটুয্যে মশায়ের বিধবা পত্নী—লক্ষ্মীদিদি। আমাদের বাঁড়ুয্যে মশাইদের বাড়ীর মেয়ে। বিধবা হয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন, বড় কষ্ট। ঐ দীনেশ ছেলেটিই তাঁর আশা-ভরসা। ছেলেটি বড় ভাল।

এইবার সে এণ্ট্রেন্স্ দেবে। পূর্ণবাবু বলেছেন, পাশ হলেই তিনি পোষ্ট আপিসে ৩০৲ টাকায় নিয়ে নেবেন। দিদি বড় দুঃখে কষ্টে মানুষ করেছেন—পাশ সে হবেই দাদাবাবু।

একটু থেমে মাধব বললে—এইবার আর একটু কষ্ট দেব—আমার শক্তি নেই। দোরের মাথায় ঐ যে হাঁড়ি কটা আছে তার বাঁ দিকের নীচের হাঁড়িটা পাড়তে হবে দাদাবাবু,—একটু ভারি ঠেকবে

একটু নয়—বেশ ভারি; পেড়ে দেখি টাকা,—আধুলি, সিকি, দোয়ানি, পয়সা আর আধলায় আধহাঁড়ি হবে।

আমি অবাক্ হয়ে মাধবের মুখের দিকে চাইলুম। সে তার সেই পাণ্ডুর মুখে একটু হাসি ছড়িয়ে বললে—অনটনের সংসার, কিছু রাখা তো সম্ভবই নয়, এটা না রাখলে নয়,—তাই যখন যা পেয়েছি চোখ কান বুজে ঐতে ফেলেছি,—ওতে আধলাও পাবেন। ঐ আমার ৮।৯ মাসের সঞ্চয়! কত হয়েছে তাও জানি না, আমার চাই অন্ততঃ কুড়িটি টাকা।

আমি গুণতে আরম্ভ করে দিয়েছিলুম। শেষ হলে বললুম—প্রায় ২৩৲ টাকা হয়েছে।

উত্তেজিত আগ্রহে 'প্রায় ২৩৲ টাকা হয়েছে' বলবার সঙ্গে সঙ্গে কি যে একটা আনন্দপ্রবাহ তার চোখে-মুখে তরঙ্গিত হয়ে গেল, তা প্রকাশ করা যায় না। তার পরেই সে চোখ বুজলে,—দুটি চোখের বাইরের কোণ দিয়ে দুটি ধারা গড়িয়ে পড়লো!

তারপর শীর্ণ মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল করে বললে—পায়ের ধূলোর পরেই —এই হাঁড়িটির ভার দেবার জন্তেই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। ঐ যা আছে ওরি মধ্যে দীনেশের এণ্ট্রেন্স দেবার ফি আর পরীক্ষার ক'দিন তার কলকেতায় থাকবার ব্যবস্থাদি আপনাকে করে দিতে হবে। কম পড়ে তো—আপনাকে আর কি বলব দাদাবাবু,—আমার আর তো কিছু নেই।

আমার কথা সরছিল না,—চেষ্টা করে বললুম—কম তো পড়বেই না ভাই, বরং কিছু বাঁচবে। কিন্তু আমি বলি কি—পরীক্ষার এখনো ২।৩ মাস বিলম্ব আছে—সম্প্রতি—

মাধব কাতরভাবে বাধা দিয়ে বললে—না দাদাবাবু, ও আজ্ঞে করবেন না! আমাদের বাক্স, প্যাঁটরা, লোহার সিন্দুক—সবই ওই হাঁড়ি। যে টানাটানির সংসার—আজই এক সময় সব হাঁড়িকুঁড়ি ওটকাবে। আজ ৮।৯ মাস সংসারকে বঞ্চিত করে অনেক চেষ্টায় ওই যা হয়েছে, ও-থেকে ওষুধে ডাক্তারে দিলে—আমি তো মরবই দাদাবাবু, কিন্তু বড় অশান্তিতে ছট্‌ফট্ করে মরব!

—না মাধব,—ও আমি নিয়ে যাচ্ছি ভাই, তোমার ইচ্ছামতই খরচ হবে!

—আঃ, ও সম্বন্ধে আমি এখন সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হলুম। ও কাজটি আপনার মত আর কে পারতো! আপনাকে দেবতা বলে জানি, আর একটি কথা যদি দয়া করে বলে দেন, আমি বল পাই, সম্পূর্ণ শান্তিতে মরতে পারি। আমি মুখ্যু গয়লা, এ-জন্মে কিছু দেখা-শোনার সুযোগ হল না।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ধ্যান-ধারণা শোনাই রইল, কি করে সকলে দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবে এই ধাক্কায় শয্যা ত্যাগ থেকে শয্যা গ্রহণ পর্য্যন্ত চিন্তা আর পরিশ্রমে জীবনটা কেটেছে। শ্রান্ত শরীর শয্যায় পড়লেই রাতটা নিদ্রায় কেটে যেত। 'তোমার সংসারে তুমি আমাকে চাকর রেখেছ, তোমার ইচ্ছামত তুমি আমাকে চালিয়ে নিও,—শক্তি দিও। অপরাধ থেকে রক্ষা কোরো।' এইরূপ একটা মূর্খের মনগড়া প্রার্থনা নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম! আজ যাত্রা শেষে তাঁর সংসার তাঁর হাতে দেবার সময় মনটা এক একবার নড়ে উঠছে—দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে—কষ্ট দিচ্ছে। হাঁ দাদাবাবু—চাকর থাকলে, মনিব একটু নিশ্চিন্ত থাকেন। সে গেলে—তিনি নিজে না দেখে কি থাকতে পারেন?—সব তো তাঁর? চাকরের দেখার চেয়ে ঢের বেশী দেখবেন। তিনি ত শুধু মালিক নন—তিনি অনাথনাথ,—নয় কি দাদাবাবু?

তারপরই ম্লান হাসির সঙ্গে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—ভেবে আর কি করব!

মনটা দমে তো গিছলই,—বুঝলুম মাধব মস্ত একটা অশান্তি ভোগ করছে,—প্রাণটাও বেদনা-চঞ্চল হয়ে উঠলো। জোর করে বললুম,—যে আজীবন সত্যকে ধরে চলেছে—তিনি নিজে তাকে ধরে থাকেন, তার ধারণা কখন মিথ্যা হয় না ভাই! তুমি যা ঠাউরেছ তার চেয়ে সত্য আর নেই, এই আমার বিশ্বাস। এর বেশী আমি বুঝি না—তোমার ভাবনা আসছে কেন?

মাধব কেঁদে ফেললে! বললে—বড় অপরাধ হয়ে গেছে দাদাবাবু! আমার মাথা ঠিক থাকচে না, সেই আমাকে ডোবাচ্ছিল। আর নয়—আর হবে না —বলেই সে তার শীর্ণ হাত দুটি একত্র করে কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজলে। দুই চক্ষে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিন মিনিট শ্বাস নেই! আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম।

সেই একটি নমস্কারে বোধ হয় সে সর্ব্বস্ব সমর্পণ শেষ করলে, আর একটা ঝড়ের মত নিঃশ্বাসে বাইরের সব-কিছু হটিয়ে দিলে—তারপর আঃ—বলে চোখ খুলে আমার দিকে হাসি মুখে চেয়ে বললে—এইবার মন খুলে পায়ের ধূলোটা দিয়ে যান, আফিসের বেলা হল।

সে কি প্রফুল্ল মুখ! চোখের সামনে যেন পদ্মের বিকাশ দেখলুম। আমি কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। মিনিট দুই কেটে গেল। সে-ই কথা কইলে,—

কাল রবিবার না,—পারেন তো এদের একবার—এই পর্য্যন্ত বলেই—হাসিমুখে বললে—ছিঃ অভ্যাস কি মলেও যাবে না দাদাবাবু! তা আপনাদের হাত দিয়েই তো তাঁর দেখা দেখি।

বললুম—মাধব, এ-সব তুমি কি বোকচো, তোমার এমন কি হয়েছে? সে তো একদিন সকলেরই আছে,—তোমার ত ভাই ৯ বিঘে ধান জমি রয়েছে,—ভাতের ভাবনা নেই,—আমার কথা অসমাপ্ত রইল।

'সে আর নেই দাদাবাবু' বলে আমার মুখের ওপর চেয়ে একটু জোরে হাসতে গিয়ে, তার কাশি এল, ঘুরে ওপাশ ফিরলে—কি থানিকটে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। বিছানাতেই ফর্শা ন্যাকড়া ছিল, তাইতে মুখ মুছে, সেটা চাপা দিলে।

একটু আগে দীনেশ ওষুধ খাওয়াতে আসে, মাধব তাকে বলেছিল—বাবা—ওষুধ আর আমাকে দিসনি,—গঙ্গাজল দিলেই বেশী উপকার হবে। সে ক্ষুণ্ণ হচ্চে দেখে বলে,—আচ্ছা দাও। আর দেখো বাবা—বাড়ীতে খোঁজটা নাও, চাটুয্যে মশায়ের ছেলের দুধটা গেছে কি না। খোকার দুধটা যেন সকাল সকাল যায়—ভুল না হয়।

ভাবলুম, ওষুধটা উঠে গেল,—আমি বসে রয়েছি—তাই কু-দৃশ্যটা চাপা দিলে।

একটু পরে বললুম—সে আর নেই? কি রকম?

—সেই জমিটে?

দেখি, মাধব চোখ বুজে সামলাচ্ছে, সেই অবস্থাতেই বললে—পরে শুনবেন দাদাবাবু।

বুঝলুম সে কষ্ট বোধ করচে—এখন তাকে প্রশ্ন করাটা ভাল হয় নি। মনে মনে অপ্রতিভ হয়ে বললুম—আমি এখন চললুম মাধব, তুমি একটু স্থির হয়ে শোও ভাই, বড় বেশী কথা কওয়া হয়েচে—কাজটা ভাল হয় নি। আমি সন্ধ্যার সময় না হয় কাল সক্কালেই আসব অখন।

মাধব ক্ষীণ স্বরে বললে—সে যা হয় করবেন—এখন ত পায়ের ধূলো আমার মাথায় দিয়ে যান, আমি যে নিতে পাচ্ছি না দাদাবাবু!

তার ওই শেষের কাতর কথা কয়টি আমার হৃদয়ে যেন আসন্ন বিপদের ছায়ার মত এসে পড়লো। এতক্ষণ আমি তার কথাগুলির মধ্যে অবসাদ-

মাথা নৈরাশ্যের সান্ধ্য-স্বর পেয়ে ব্যথা বোধই করছিলুম, তার পশ্চাতে যে বিদায়ের আয়োজন বিপুল হয়ে উঠেছে—সেটা একবারও মনে উদয় হয় নি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ছিলুম, তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইলুম। সে চোখ বুজেই বললে—কই দাদাবাবু!

আমি যন্ত্রের মত 'এই যে ভাই' বলে, ভগবানকে স্মরণ করে, তাড়াতাড়ি তার মাথায় পায়ের ধূলো দিলুম। আমার রুদ্ধ শ্বাসটা পড়লো, সে বোধ করি জানতে পারলে, তার মুখে একটু হাসির আভাস দেখলুম, কিন্তু আর সে কথা কইলে না! আমারো কিছু জোগালো না। ব্যথাভরা বুকে ধীরে ধীরে দাওয়ায় পা দিতেই—বিপদ-শঙ্কিতা কম্পিতহৃদয়া—সমগ্র বিশ্বের মুর্ত্তিমতী দীনতার মত মলিনাঞ্চলখানি গলায় দিয়ে গৌরীর মা আমার পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে গিয়ে প্রায় লুটিয়েই পড়লো,—দেহ তার হতাশ-শিথিল হয়ে গেছে!

৪

রাস্তায় হরিবিহারীর সঙ্গে দেখা।

হরিবিহারী আমাদের সহপাঠী ছিল। সেও মাধবের জাত, বোধ হয় দূরসম্পর্কও আছে। তারা ২।৩ পুরুষ জমিদার, তাই গ্রামের সকলের সঙ্গে তাদের মেলামেশা সহজ ভাবেই চলে। হরিবিহারীর স্বভাব বরাবরই নিরীহ আর পরোপকারপরায়ণ।

—হাতে হাঁড়ি যে—বিদেয় নাকি? বলে সে হাসলে।

আমার হাসবার মত মনের অবস্থা ছিল না, বললুম—বিদেয় বটে,—মাধব দিলে।

—মাধবকে দেখতে গিছলে নাকি,—কেমন দেখলে—সে আছে কেমন?

—অসুখ তো বটেই, কিন্তু তার অতটা হতাশ হবার মত কিছু তো দেখলুম না। তবে বোধ হল যেন তার ভেতরে কি একটা কঠিন অসুখ আছে, যার ব্যথা তার মর্ম্মে পৌঁছে গেছে—তার উদ্যম উৎসাহ, আশা ভরসা একেবারে মুছে দিয়েছে।

—তোমাকে কিছু বললে?

—না।

—তুমি কিছু শোন নি?

—না।

—সে অনেক কথা। তার পরিবার কামিনী—আমাদের আপনা-আপনির মধ্যে, আমার সঙ্গে কথা কয়—সে-ই আমাকে ডেকে পাঠায়, তা না ত' তার অসুখের খবরও পেতুম না। যাক—গুপী দত্তকে চেন ত'—যিনি আজ তিন বছর হল আমাদের গ্রামে এসে বাস করেচেন? ওর জন্ম কেটেচে জমিদারী সেরেস্তায়। সেরেস্তার একটি দক্ষ দানব। মজিলপুর মজিয়ে, আমাদের গ্রামে এসে নতুন করে গজিয়ে উঠেচেন। এই তিন বছরের মধ্যেই মামলা মকর্দ্দমা শতকরা ঘাটে পৌঁছে দেছেন। আমাদের ৭।৮ জন প্রজার ১৭ বিঘে ধান জমি সাফ উড়িয়ে নেছেন। তারা নাকি, টাকা ধার নিছলো। তারা বলে ওঁকে চিনিই না! আমাদের সেরেস্তার রামহরি সরকার বলে—এখনও ওঁর পরিচয় পান নি—সবুর করুন। ঐ দত্তটি ব্রজপুরের বাবুদের সত্বকত্ব রেখে আসেন নি। জালে অমন সিদ্ধহস্ত কাল কলিতে জন্মায় নি। কোথাও আবির্ভাবের এক সপ্তাহ মধ্যে উনি লোক চেনাটা সেরে ফেলেন। দেখেন উনি দুটি জিনিস,—কারা ভাল মানুষ, তাদের উনি কোন একটি স্বনামখ্যাত পশু বলেই জানেন। আর দেখেন—সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত বংশের কে কে খুব কষ্টে দিনপাত করচে; তাদের উনি সহানুভূতি দেখিয়ে আপনার জন করে নেন—কখন কিছু সাহায্যও করেন। অর্থাৎ মুঠোর মধ্যে করেন। তাঁরাই ওঁর কার্য্যাদির সাফাই গান, সাক্ষী হন,—অপরের সাক্ষী দিইয়ে তাঁদের কিছু কিছু পাইয়েও দেন।

—সকালে গুপী দত্তর কথা কেন?

—বলছি। মাধবকে আর মারলে কে? আজ দশদিনের কথা—মাধব একখানা রেজিষ্ট্রী করা চিঠি পায়। খুলে দেখে—গুপী দত্তর উকিল উমেশবাবু লিখেচেন—আমার মক্কেল শ্রীযুক্ত গুপীনাথ দত্তের নিকট তুমি হ্যাণ্ডনোটে যে ৩৫০৲ টাকা দু' বছর সাত মাস পূর্ব্বে কর্জ্জ নিয়েছিলে, সে টাকা মায় সুদ, যেন আজ হইতে সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। নচেৎ আজ হইতে এক সপ্তাহ অন্তে তোমার নামে আদালতে নালিশ রুজু করিয়া উক্ত টাকা আদায় করিতে আমার মক্কেল বাধ্য হইবে। ইত্যাদি—

মাধব ভেবেছিল—চিঠিখানা ভুলক্রমে তার কাছে এসেছে, এ মাধব আর

কেউ হবে। ছু দিন আগে তার জ্বর হয়েছিল। জরুরী জিনিস ভেবে সেই রাতেই জ্বর গায়ে সে উমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করে বলে—এ পত্রখানা বোধ হয় ভুলে তার কাছে গিয়ে পড়েছে, তাই সে দিতে এসেছে। গুপীবাবুকে সে একবার মাত্র দেখেছে, তখন সে তাঁর নামও জানত না। তিনি তাঁর লক্ষ্মী বলে যে গাইটি ৬॥০ সের দুধ দেয়, সেইটি কিছু দিয়ে নিতে চান। তাতে সে হাত জোড় করে বলে,—আমি অতি গরীব গয়লা, ঐটির কৃপায় কোন প্রকারে চলে যায়—আমাকে ক্ষমা করুন বাবু।

তিনি তাতে—'বেশ বেশ—লক্ষ্মীকে রাখাই তো পুরুষার্থ হে!' এই বলে চলে যান। আমি ভদ্র লোকের কথা রাখতে না পেরে আর তাঁর কথার ভাব বুঝতে না পেরে—মনটায় বড় অস্বস্তি বোধ করেছিলুম। তারপর তাঁর সঙ্গে আর কখনো কথা হয় নি,—দূরে দূরেই তাঁকে দেখেছি।

উমেশ উকিল মাধবকে জানতেন, তিনি বলেন—তুমি দেখছি আর সে মাধব নেই! তোমার সঙ্গে গুপীনাথ দত্ত মশায়ের যদি আর দেখাই না হয়ে থাকে ত' তোমার এই হ্যাণ্ডনোটখানা তাঁকে দিয়েছিল কে, আর টাকাটাই বা তুমি কার হাত থেকে নিয়েছিলে। এই বলে তিনি মাধবের হ্যাণ্ডনোটখানি দেরাজ থেকে বার করে—মাধবকে দেখতে দিয়ে বললেন—এ লেখা কার,—সইটে কার?

মাধব সাগ্রহে দেখতে গিয়ে সহসা যেন ধাক্কা খায়। সাক্ষীরূপে ভগবতী চাটুয্যে মশাই সই করেছেন দেখে চমকে ওঠে। তার মুখের বর্ণটা মুহূর্ত্তে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উমেশবাবুর হাতে কাগজখানা দিয়ে বিমূঢ়ের মত মাথা নীচু করে থাকে। উমেশবাবু বলেন—এখন কি বল? এ হ্যাণ্ডনোট কি তোমার নয়? মাধব কাতরতা মিশ্রিত বিনীত কণ্ঠে বললে—না বলবার তো যো নেই উকিলবাবু!

—তবে কি এ হ্যাণ্ডনোট তোমার নয়?

—নয় তো নিশ্চয়ই কিন্তু সে কথা ত' আপনিও বিশ্বাস করতে পারবেন না উকীলবাবু!

এইবার তিনি স্বর বদলে বললেন—এ কুবুদ্ধি তোমায় কে দিলে? ওসব ফন্দি ছাড়—বিপদে পড়বে, বুঝলে—

—যে আজ্ঞে, ছাড়লুম।

—হ্যাঁ আদালতে ও সব টঁ্যাকে না, বুঝলে। ধর্ম্মের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। তা যদি হ'ত ত ধর্ম্ম এতদিন ধৃতরাষ্ট্র হয়ে যেত। তোমার মত অনেকে অনেক চেষ্টা করেচে আর করেও, তাতে বাধা দিয়ে ধর্ম্মকে রক্ষা করবার তরেই আদালত আছে আর আমরা আছি—বুঝলে।

মাধবের ও-সব কোন কথাতেই কান ছিল না। উমেশবাবু বলে চললেন,—তুমি গ্রামের লোক, ভাল লোক বলেও জানতুম—কারুর কুপরামর্শে পড়েছো দেখছি,—যাক্,—টাকা জোগাড় করতে যদি না পার ত' যা বলি তাই করগে, সুবিধে হলেও হতে পারে। গুপীবাবু—মহাশয় লোক—তাঁর কাছে গিয়ে দুঃখু জানালেই কাজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। কিছু ধান জমি আছে না?

—আজ্ঞে—৯ বিঘে।

—তাতে তো অর্দ্ধেকও হয় না হে। আচ্ছা যাও দিকি একবার, তিনি তেমন লোক নন, হাতে-পায়ে ধরলে,—বুঝলে? যাও,—গ্রামের লোক তুমি—না হয় আধঘণ্টার মধ্যে আমিও উপস্থিত হচ্ছি, দেখছি সুদটো যাতে, —বুঝলে? যাও।—হরে গয়লা বেটা নিছক্ খাঁটি জল খাওয়াচ্ছে হে! মোটা হচ্ছি কি ড্রপ্‌সি দাঁড়ালো বুঝতে পারচি না। তোমাদের জাতের উপকার করাই ভুল, তবে শুনেছি তুমি ভাল লোক,—দেখি।—আচ্ছা, আগে গুপীবাবুর কাছে যাও তো, সংসারে নিজের কাজ আগে—শুভস্য শীঘ্রং—বুঝলে,—

মাধব অতিষ্ঠ হ'য়ে শুনছিল, জ্বরটাও যাতনা দিচ্ছিল, সে প্রণাম ক'রে, টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে বাঁচে।

* * *

আমাদের বাল্যবন্ধু রাম রায়, উমেশ উকিলের ক্লার্ক্ (মুন্সি) কি না,— সে তখন উপস্থিত হল। জানই ত' সে নকুলে লোক—'শোন শোন বিদুর-দুর্য্যোধন সংবাদটা শুনে যাও' ব'লে ডেকে সমস্ত কথাবার্ত্তা যেমন যেমন হয়েছিল, অভিনয়ের মত ক'রে শুনিয়ে শেষ বললে—মাধবের ও ন-বিঘে ত' গেছেই—আবার সুদের বদলে দুধ চাই, ওর লক্ষ্মী ব'লে গরুটাও গিল্‌বে। আমার হাতে ভাই অনেক কাগজ আসে, কিন্তু অন্যের লেখার এমন নিখুঁৎ নমুনো কখনো নজরে পড়েনি। তায় গুপীর দৌলতে উকিলবাবুর এখন যথেষ্ট 'রূপী' আস্‌ছে, দু'জনে হরিহরাত্মা। কোন উপায়ই ত' দেখি না ভাই?

থাক্, রাম রায় যা যা বলেছিল ঠিক্ তার কথাগুলিই তোমাকে বলেছি। বাদ গেছে কেবল তার ভাব-ভঙ্গি আর কণ্ঠস্বর।

বললাম—মাধব উমেশবাবুর পরামর্শ মত গুপী দত্তর কাছে গিয়েছিল?

—তুমি কি মাধবের প্রকৃতি জান না। সে এই কদর্য্য প্রস্তাব শুনে, অতবড় মিথ্যাটা মাথা পেতে নিতে যেতে পারে? তার চেয়ে সে মরণটাই বরণ ক'রে নিলে দেখছি। এই ব'লে হরিবিহারী উদাস ভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেললে।

বললে—জ্বর নিয়ে বেরিয়েছিল রাত ৮টা আন্দাজ, যখন উমেশবাবুর বাড়ী থেকে ফেরে, তখন জ্বর অনেক বেড়ে গেছে। চৌধুরী পাড়া পেরুতে পারে নি, পোলটার উপর শুয়ে পড়ে। সন্ধ্যের আগে ঝড়বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিল, সব ভিজেছিল, জোলো হাওয়াও দিচ্ছিল। রাত হওয়ায় দীনেশকে বলে পাঠানয় সে খুঁজতে যায়। যখন বাড়ী আনলে, তখন ১২টা বেজে গেছে। মাধবের ভাল সংজ্ঞা ছিল না, দৃষ্টি লক্ষ্যহীন,—কথার মধ্যে—'না, না'—'তা হ'তেই পারে না', কখনো—'ব্রাহ্মণ—অত বড় পবিত্র বংশ'—কখনো—'আহা, বড় কষ্টেই পড়ে থাকবেন', কখনো বা—'বড় অভাবেই করে থাকবেন', কখনো 'তাতে কি হয়েছে, ব্রাহ্মণ দেবতা—অভাব যে বুঝি গো, সেই তো মানুষকে ভুল করায়।' 'কামিনি খবরদার, ছেলের দুধ না বন্ধ হয়, সকাল সকাল পাঠিয়ে দিও। ওটা অভাবেতে করিয়েচে—অভাবেতে। ওঁর দোষ নেই।' 'উনি করতেই পারেন না—ব্রাহ্মণ যে'; সারারাত এই সব অসংলগ্ন কথাই বার বার করেছিল। সকালে ঘুমিয়ে পড়ে, জ্বর কমে যায়।

সাত দিনের দিন ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, ডবল-নিউমোনিয়া। কাল থেকে রক্তও দেখা দিয়েছে।

শুনে চম্‌কে উঠলুম, প্রাণটা অবলম্বন খুঁজে পেলে না—হায় হায় করে উঠলো। বুঝলুম—সে 'কু-দৃশ্য' চাপা দেয় নি, আমি না বেদনা-বিচলিত হই, তাই কালের জরুরি ডাকের রক্ত-লিপিখানা ঢাকা দিয়েছিল!

বললুম,—হরিবিহারী তুমি ভাই মাধবের কাছ থেকে আর নোড়ো না, আমি এলে তোমার ছুটি। আমার দুর্ভাগ্য, এমন একটা কাজ ফেলে এসেছি আমাকে আপিসে যেতেই হ'বে ভাই। তা ছাড়া চাবিও আমার হাতে,—তুমি গিয়েই মহেন্দ্র ডাক্তার মশাইকে আনতে দীনেশকে পাঠিয়ে দেবে, রাজকুমারবাবুরও থাকা চাই, খরচ সব আমার।

বেশ—তাই হবে। কেবল ব'লে যাও, হাঁড়িটাতে কি?

বললুম। শুনে ম্লান-হাসির সঙ্গে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে—জানো ওর জন্যে সে কি কাণ্ড করেছে! কাপড়, কপি, কড়াইশুঁটি, আঁব, পান, ইলিশমাছ এ-সব থেকে ও-বাড়ী আজ প্রায় এক-বৎসর বঞ্চিত। গয়লার বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা দুধ খায়নি,—ওই দীনেশ ছেলেটির এণ্ট্রেন্স্‌ দেবার খরচ সঞ্চয়ের জন্যে,—ওর লক্ষ্মীদিদির দুঃখ দূর হবার আশায়।

পাঁচ দিন আগেও জানতে পেলুম না। অসহায় বালকের মত হাত পা আছড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল, বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি বললুম—হরিবিহারী আর শোনাস্‌নি ভাই, মাধব যাতে বাঁচে তাই কর। মহেন্দ্র ডাক্তার যা বলবেন—ঠিক ঠিক তাই করা চাই—খরচ যতই হোক্‌। আমার ফিরতে সন্ধ্যে—

তখন কুটীর-পানসীব চলন কমে গেছে। আমাদের গঙ্গা পার হয়ে, বালী থেকে ট্রেণে কলকাতায় যাতায়াত করতে হয়। মেঘনাদ মাঝি আমাদের পারাপার করে। খালের একটা ঘাটে আমরা উঠতুম নাবতুম। ট্রেণের টাইম বুঝে দুবেলাই নৌকো ছাড়া হত,—এমন দু'তিন বার। আমরা ছিলুম মাসিক বন্দোবস্তের যাত্রী,—অপর কারুর কাজ পড়লে, তাঁরাও আসতেন যেতেন—মানা ছিল না। কোন কোন দিন বাঁধাব্যবস্থার বাবুরা তাতে বিরক্ত হতেন,—বিশেষ করে আপিস যাবার সময়,—বেশী বোঝাই হলে পাছে বেলা হয়, ট্রেণ মিস্‌ হয়। মেঘনাদ তখন হাত জোড় করে ধীরে ধীরে বলতো—কোথায় এখন ঘুরে বেড়াবেন, কষ্টে পড়বেন, কাজের ক্ষেতি হয়ে যাবে,—আসতে দিন বাবু, আমি খেটে পৌঁছে দেব অখন। পয়সার লোভে নয়,—পয়সা সে কারুর কাছেই চাইতে পারতো না। আসল কথা, সে কারেও ক্ষুণ্ণ করতে পারতো না—'না' বলতে পারতো না।

মেঘনাদ জাতে মালা হ'লেও মালাদের মত তার কোনখানটাই ছিল না। তার স্বভাব-চরিত্র কথা-বার্ত্তা ব্যবহার-বিনয় লক্ষ্য করলে আশ্চর্য্য হ'তে হ'ত। কোন নেশাই তার ছিল না। গভীর-রাত্রে বা যে কোন সময় তাকে ডাকলে সে বিরক্ত হত না—পার করে দিত, কখনো বলতো না—'কি দেবেন?' ফল-কথা, এই নিরক্ষর মালার মধ্যে যে-সব সদ্‌গুণ লক্ষ্য করেছি, শিক্ষিত ভদ্রের মধ্যে তা বিরল। তাই সে সম্বন্ধে মেঘনাদের সঙ্গে কথা ক'য়ে

দেখবার আমার একটা ভারি কৌতূহল ছিল,— এতটা বৈশিষ্ট্য তা'তে কোথা হ'তে এলো,—নিশ্চয় সে কোন শক্তিমান গুরু পেয়ে থাকবে। কিন্তু কথাটা পাড়বার আর আমার সুযোগ ঘটত না, ইচ্ছাটাই থেকে যেত।

আজ শনিবার, আফিস থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে কিছু বেদানা, আঙুর আর আপেল নিয়ে, ৪॥০টার ট্রেণ ধরলুম। মহেন্দ্রবাবু নিশ্চয় আশা দিয়ে গেছেন—এতক্ষণ তাঁর ওষুধ বোধ হয় তিন-দাগ পড়ে গেছে।

খালধারে পৌঁছে দেখি, মেঘনাদ নৌকা নিয়ে হাজির আছে। আমার আগেই কে দু'জন নৌকায় উঠে বাইরে গলুয়ের দিকে ব'সেছে।

নৌকায় পা দিয়েই চমকে গেলুম; ভগবতী চাটুয্যে মশাই বললেন—এই যে নির্ম্মল—ভাল আছ বাবা, বাড়ীর সব ভাল? সেই চির-পরিচিত সদ্বংশসুলভ সরল অমায়িক সহজ সুর! কেবল চক্ষু দু'টি বোধ হল কলুষমত। ঘৃণা আমার ভেতর থেকে ঘুলিয়ে উঠেছিল, সেটা মুখে-চোখে পৌঁছবার পূর্ব্বেই—আজ্ঞে ভালই আছি, বাড়ীর সব ভাল;—ভেতরে এসে বসুন না, বলতে বলতে হালের দিকে নৌকার ছইয়ের উপরে গিয়ে বসলুম। না—এইখানেই আমরা বেশ আছি বাবা, দেরী ত' হবেই, সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নিতে পারবো।

আমার শনিবার-সোমবার ছিল না, স-ছটার ট্রেণেই আসতুম। মেঘনাদের দিকে চাইতে সে বললে—আজ পাঁচটা বিশ মিনিটের গাড়ীতেই বাবুরা সব আসেন, সেইটাই শনিবারের বড় গাড়ি। ভেঁটেল ঠেলে গিয়ে, সময়ে এসে জুটতে পারবো কি? তাড়া আছে কি বাবু?

বাবুদের মেজাজ আমার জানা ছিল, পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে হলে মেঘনাদকে অনেক কথা শুনতে হবে। সারাদিন খাটুনির পর ক্লান্ত ক্ষুধিত বাড়ীমুখো বাঙালীর মেজাজ ঠিক রাখার আশা করাও অন্যায়। বললুম—তাড়া ত খুবই ছিল মেঘনাদ, কিন্তু উপায় কি,—থাক্।

মেঘনাদ বড় কুণ্ঠায় পড়ে বললে—বলেন তো—

বললুম—না—থাক মেঘনাদ, বিশ পঁচিশ জনকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে।

মেঘনাদ ভারি কিন্তু হয়ে বললে—একখানা নৌকা দেখবো কি বাবু? আমি তাকে শান্ত করবার জন্যে বললুম—না, মেঘনাদ, আমি ওই পাড়িতেই

যাব। অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো করবো করে করা হয় নি, আজ এই ফাঁকে সেইটাই শুনি।

মাধবই মাথার মধ্যে ঘুরছিল। হঠাৎ মেঘনাদের মধ্যে তার ছায়া যেন দেখতে পেলুম। তাই কথাটা মনে পড়ে গেল। ভালই হল, তা না হলে মেঘনাদ সারা ক্ষণটা ক্ষুণ্ণ মনেই ছট্‌ফট্ করতো।

গুপী দত্ত চাটুয্যে মশায়ের গা ঠেলে—ঠোঁট উলটে ভুরু তুলে বিদ্রূপের হাসি ফলিয়ে বললে—আজ-কালের উদারতা! চুলোয় যাক্, আটটার পরই উমেশ আসবে, আজ তো তোমার পেটের চিন্তা নেই—ঠোঙা-পোরা খাবার, আর—এই দুটো রাখো। এই বলে চাটুয্যে মশায়ের হাতে কি দিয়ে বগল থেকে নথিপত্রের বাণ্ডিল বার করে—চাটুয্যে মশাইকে কি সব বোঝাতে লাগলেন। সেটা আর শোনা গেল না।

বেশ বোধ হল চাটুয্যে মশাই অনিচ্ছায় একটু ঝুঁকলেন মাত্র, কান আমাদের দিকেই রইল—

তিনি আমার কাছ থেকে ৪।৫ হাত মাত্র তফাতে ছিলেন। মেঘনাদের কাছে আমি যা শুনতে চেয়েছিলুম, সেটা নিশ্চয়ই তাঁর কানে গিয়ে থাকবে।

দু-চার-বার ইতস্তত করে মেঘনাদ সহাস্য বিনয়ে বললে—সে শুনলে আপনি হাসবেন বাবু,—বিশ্বাস করবেন না।

বললুম—তুমি মিছে কথা কইবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে মেঘনাদ, তা না তো শুনতে চাইতুম না।

—সে অনেক দিনের কথা বাবু—তখন আমার বয়েস ১৫।১৬, এখন দুকুড়ি চোদ্দ চলছে। ঐ বয়সেই আমি লম্বা-চওড়া জোয়ান হয়ে পড়েছিলুম। মালা-পাড়ায় কেউ আমার সঙ্গে পারতো না, সবাই ভয় করত। সাঁতার কেটে দু' বেলা ও-পারে গাঁজা খেতে যেতুম,—ছোটলোকের আরো যে সব আয়েব তা ধরতে আরম্ভ করেছিল। এ-পারে ও-পারে সঙ্গীও জুটেছিল তেমনি। এমন সময় আমার কলেরা হল। মধু ডাক্তার মশাই দেখলেন, বাঁচাতে পারলেন না। সন্ধ্যে থেকে ঘরের মধ্যে বড় বড় অচেনা চেহারা আর কুকুর দেখতে লাগলুম। ভয়ে আর কথা কইতে পারলুম না। তাদের একজন বললে—৯টা হয়েছে, আর নয়, এইবার চলে আয়। আমাকে যেন যাদু করলে,—না বলতে পারলুম না, কেবল বললুম—কি করে যাব? আর

একজন ধমকে বললে—দেরি হয়ে যাচ্চে—হাঁ করে চলে আয়! হাঁ করতেই দেখি আমি বাইরে—দেহটা মাহুরে পড়ে। মা-বোনেরা চীৎকার করে কাঁদচে, পাড়ার সবাই ছুটে আসছে, কেউ বলচে অসুর পাত হয়ে গেল, অত বড় জোয়ান আর দেখবো না, দূরে কেউ কেউ বলাবলি করছে—যে বাড় বেড়েছিল—ও কি থাকে—পাপ গেল।

আমি তখনো আমার ঘরে আর বাড়ীর চারদিকে ঘুরচি, দেহটাকে ছেড়ে যেতে পারচি না। কোথায় যাব? ঐ তো আমার ঘর। দেহ ছেড়ে থাকবো কোথায়? এমন সময় তারা ধমকে বললে—আয় আমাদের সঙ্গে—তোর থাকবার জায়গায় চল।—একজন বললে—এখানেও আসতে পাবি—এখন আয়। এই বলতেই কুকুরগুলো এগুলো—তার পরই তাদের সঙ্গে আমরাও শূন্যে চললুম। খানিকক্ষণ কিছুই বুঝলুম না। তারপর—সে যে কি তা বোঝাতে পারবো না বাবু,—ভিজে ভিজে কালো স্যাঁতসেঁতে জমাট-বাঁধা অন্ধকার,—তা থেকে আবার কোয়াশার মত ধোঁ উঠছে—দম আটকে যেতে লাগলো। লক্ষ লক্ষ দুঃখী অসহায় স্ত্রীপুরুষের হাহাকার একসঙ্গে কানে ঢুকে মাথা বোঁ বোঁ করতে লাগল। ছটফট করতে লাগলুম। একজন বললে—দুধার বেশ করে দেখতে দেখতে চল। কোন দিকেই দৃষ্টি ছিল না—ভাল করে দেখবার চেষ্টা করতে গিয়ে শিউরে উঠলুম—ওরে বাপরে—এ কি! আমাদের দুধারে মিশমিশে কালো—দয়ের মত ঘন নদী চলেছে,—কি দুর্গন্ধ! তাতে সব মানুষ! মাছের মত গিশ্ গিশ্ করছে! কেউ ভাসছে, কেউ এক কোমর, কেউ গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ ডুব দিচ্ছে, কেউ কিনারায়। স্থান নেই! তাদেরি চীৎকারে যেন হাজারটা পাটের-কল চলছে! তাদের অবস্থা আর কষ্টের কথা বলতে পারবো না বাবু, মাপ করবেন। ৫।৬ জন চেনা লোকও দেখলুম,—উঃ ও-পাড়ার দাদাঠাকুরের কান্না দেখে কেঁদে উঠেছিলুম—তিনি চিনতে পেরে বললেন—মেঘা এলি নাকি, আহা! এই পথ দিয়ে, আহা! তা তোদের এতটা নয় বাবা, আমি যে ব্রাহ্মণ ছিলুম। আমার কোনটারই মাপ নেই। এই দু বছর তো এসেছি, কি করেছিলুম জানিস তো সব। চৌধুরী মশাই দেশান্তরি হলেন, তারি ফল। একটু এগিয়ে—কেও দেখতে পাবি। অন্তরে আঘাত—উঃ! তোকে এখন আর বলে লাভ কি! তারপরই তাঁর,—না বাবু তা মুখে আনতে পারবো না,

উঃ কি কষ্ট—কি ভোগ! আর—, এই বলে মেঘনাদ তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে মাপ চাইলে। বললেন—আরও ছ মাস, তারপর আবার ফিরতে হবে।

আমি আর দেখতে পারলুম না। সঙ্গীরা বিদ্রূপ করে বললে—তুই এর চেয়েও বড় জায়গা পাবি! তারা মজা দেখে আনন্দ পায়। তারাও আগে ভুগেছে কিনা, এখন এই কাজ নিয়েছে, যেমন জেলের কয়েদীরা কেউ কেউ খালাস পেলে জেলেই কাজ করে—জমাদার হয়। তারাই বেশী নিষ্ঠুর হয়—কষ্ট দেয়।

সবই কষ্টের কথা, মন্দ কথা, সে আর কি শুনবেন; আরো ঢের আছে—ঢের রকম; সে-সব আপনার শুনে কাজ নেই। আপনার সামনে বলতে পারবো না। বিশ্বাস করেন তো শুনেই হৃদ্‌কম্প হবে। সরল বিশ্বাসীদের সংসার ছেড়ে যায়,—সে এমনি বাবু। কেবল যাতনা, কেবল কষ্ট, আর সকলেই নিজের নিজের অপরাধ নতুন লোক পেলেই চীৎকার করে বলে।

রকম-রকমের পাঁচ-থাক্ পেরিয়ে—বাড়ী ঘর দেখা দিলে,—ইট চুণের নয়, কিসের তা তখন ঠাওরায় কে! প্রকাণ্ড একটা কালো রঙের ফটক—তার দুদিকে হাতীর মত দুটো মোষ বাঁধা, দুই চূড়োয় দুটো কাক, তার মধ্যে আমাকে ঢোকালে। দুধারে বাড়ী,—অনেকটা গিয়ে—সামনের বড় বাড়ীর ঘণ্টায় তারা ঘা দিলে। শব্দে প্রাণ চমকে উঠলো—কাঁপতে লাগলুম। তারা হেসে বললে—আর কি পৌঁছে গিছিস তো—এইবার আরাম পাবি। দেখি—দুজন ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন—আমাদের চেয়ে দেখতে কিছু বড়—একজন কালো—দেখলে ভয় হয়, একজন গৌরবর্ণ, বেশ ঠাণ্ডা মূর্ত্তি। কালো লোকটি আমার বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি কাঁপতে কাঁপতে বলতেই তিনি—'এ কি করলি' বলে সঙ্গীদের এমন ধমক দিলেন যে তার ধাক্কায় আমি পড়ে গেলুম। এ তো পে-র ছেলে নয়? কখন বেরিয়েছে?

—৯টা রাতে।

—শীগ্‌গির নে যা,—এখন ১২টা বাজে, দেহ থাকলে হয়—

ঠাণ্ডা মূর্ত্তিটি বললেন—সোজা দেব-পথে যাবি, তা না ত সময়ে পৌঁছুতে পারবিনি,—লোকটির অদেষ্ট ভাল—

—এই জানোয়ারদের দোষে, আসুক ফিরে! জান্ নিয়ে খেলা!

তারা কাঁপতে কাঁপতে বললে—ওরই সঙ্কট অবস্থা ছিল—তাই—

আবার সেই ধমক। তেষ্টায় আমায় সব শুকিয়ে গিছলো,—ভাল লোকটির দিকে চেয়ে একটু জলের প্রার্থনা করলুম। তিনি কালোটির দিকে চাইলেন। সঙ্গীদের ওপর হুকুম হল—দক্ষিণ খাড়ী।

তারা আমাকে নিয়ে ছুটলো,—ফটক পার হবার পরই—শিগ্‌গির জল খেয়ে নে বলে একটা খাড়ী দেখিয়ে দিলে। আমি ফিরে এসে বললুম ও যে আর কিসের মত—

—তোর আর ওর বেশী পাবার নেই,—তেষ্টা নেই বল্। এখানে থাকলে ওই ত' খেতে হবে। আমার দেহটা কেঁপে উঠলো। ওই তো পাবি। সে দিনও আসবে, চল্ এখন—

তারপর কি সুন্দর পথ, কি উজ্জ্বল ঠাণ্ডা আলো, সেখানে রাত নেই। কি বাতাস, কি সুগন্ধ, দুধারে কি ফুল ফল, কি সব পাখী, কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব লোক। দুধারে যাকে দেখি সবার মুখেই হাসি আর আনন্দ—চিন্তার দাগ একটাও নেই। তাঁরা চাইলেই মনে হয় যেন মা-বাপের চাউনি, ভাই বোনের চাউনি। যেন ভালবাসা আর স্নেহ উপচে পড়চে। কি নদীই দেখলুম! দুধারে চন্দনের গাছ—হাওয়ায় যেন চন্দন মাখিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে! জলে কেউ স্নান করছেন, কূলে কত স্তব-পাঠ চলেছে, পদ্মের বন, হাঁসের খেলা, পাখীর গান, সে কি আমি বলে উঠতে পারি, আপনারা দেখলে বলতে পারতেন। আমার সে তেষ্টা, জ্বালা ভয় সব জুড়িয়ে গেল। একটা কেমন আরামে-আনন্দে আমার সবটা যেন নতুন হয়ে গেল। আর ফিরতে ইচ্ছা হল না, কিন্তু থাকতে দেবে কে? বললে—তোর বড় ভাগ্যি দু'দিকে দেখে যাচ্ছিস্।

সেই আলো পার হ'তেই আমাকে এক ধাক্কায় এখানে এনে ফেললে। তখন আমাদের উঠোনে লাশ নে যাবার জন্যে সব তয়ের। চালি বাঁধা হয়ে গেছে, লোকেরা কোমর বেঁধে হাজির; কেবল মা'র জন্যে দেরি হচ্ছিল, তিনি আমার ওপর পড়ে চীৎকার করছিলেন, ছাড়ছিলেন না। আমি ঘরে ঢুকতেই তারা বললে—নে—শীগগির দেহের মধ্যে ঢুকে পড়্।

কোত্থেকে আমারও তখন দেহের মোহ এসে গেল, বললুম—কি করে ঢুকি? একজন বললে—মুখ দে ঢুকে পড়—মুখ বন্ধ থাকে ত' কান দে। আমি মুখ-দে ঢুকে পড়েই 'মা' ব'লে ডাকলুম।

তার পর যা হয়, সকলে ঘরে ঢুকলো, কেউ ভয় পেলে। কথা কইলুম, তবু বিশ্বাস হ'তে আধ ঘন্টা সময় লেগেছিল। ইন্দির, ভুলু, গোপাল, প্রেমচাঁদ, এই সব বড় বড় মোড়ল মালার মত দেওয়ায়, তবে আমার বাঁচা ঠিক হয় বাবু। এত সহজে হ'ত না, যদি না আধঘণ্টা পরেই প্রেমচাঁদের বাড়ী জোর কান্না উঠতো; পঞ্চায়েৎ সেই দিকেই সব ছুটলো। গিয়ে দেখে প্রেমচাঁদের ছেলে, মদ খেয়ে এসে দাওয়ায় শুয়েছিল, হঠাৎ বুকে ব্যথা ধ'রে সেইমাত্র মোলো,—তার নামও ছিল—মেঘনাদ!

চাটুয্যে মশাই অসীম বিস্ময়ে বলে উঠ্‌লেন,—অ্যাঁ—সেই রাত্রেই!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আধঘণ্টার মধ্যেই—

গুপী দত্ত রুষ্ট হ'য়ে, তাড়নাস্বরে চাটুয্যে মশাইকে বলে উঠলো—আমি কি তোমার চাকর যে সেই পর্য্যন্ত ব'কে যাচ্ছি, আর তুমি শুনচো মালার মুখে ঐ গাঁজাখুরি গল্প।

একে ত গুপী দত্তের ওপর ঘৃণায় রাগে, আমাকে আগে থেকেই বিষাক্ত করে রেখেছিল, তায় মেঘনাদের উপর তার ঐরূপ ইতর ইঙ্গিতে, আমাকে জ্বালিয়ে দিলে। মেঘনাদ সেটা বুঝতে পেরে, আমার পা' দুটো চেপে ধ'রে নিম্নস্বরে বললে—আমাকে মাপ করুন বাবু, উনি আমার নৌকায় এসেছেন।

আমি তার কথাটা বুঝে আর তার কাতর ভাব দেখে, অতি কষ্টে সামলে উঠেই বললুম—

হ্যাঁ,—তারপর?

—তারপর সেরে উঠলুম। কিন্তু আগের মেঘনাদ্ আর রইল না। যেন বোবা হ'য়ে গেলুম। মা অনেক করে চারটি খাওয়াতেন। ঘাটের ওপরেই ঘর, ঘাটেই বসে দিন-রাত কাটতো, রাতে নৌকোতেও পড়ে থাক্‌তুম। সকলে 'জড়ভরত' বলতে সুরু করেছিল।

যাবার সময় যা দেখেছিলুম, তা তো আর আপনাকে সব খুঁটিয়ে বলতে পারিনি, সেই সব চোখের সামনে থাকতো আর কি বাবু কথা কইতে পারি, না কাজকর্ম করতে পারি। ভয় হ'ত যদি মিথ্যে বেরিয়ে যায়, কি কারুর প্রাণে বাজে! তিন কোশের মধ্যে সংকীর্তন কি কথা হচ্ছে শুনতে পেলেই যেতুম। লুকিয়ে গুরু করলুম, কণ্ঠি নিলুম। তখন সকলে জোর করে বে দিলে। এত পায়ে ধরলুম—কত কাঁদলুম, কেউ শুনলে না। তারপর সংসার

ঘাড়ে পড়লো। তখন থেকে আপনাদের কাজ নিয়ে, আপনাদের চরণে পড়ে আছি। যতটুকু পারি করতে চেষ্টা পাই। ভগবানকে কেবল জানাই—কারুর প্রাণে যেন আঘাত না দিয়ে ফেলি। ওইটিই সর্ব্বনেশে জিনিস বাবু।

আমি মুখ্‌খু ছোটলোক, কিছুই জানি না, আপনাদের চরণে থাকার জন্যে এত কথা কইতে পারলুম। সব সত্যি বলে জানবেন বাবু—এই চোখে দেখা। তারপর কি আর বাবু লোক মন্দ কাজ করতে পারে! কিন্তু পারলুম কই—কত হয়ে যাচ্ছে—হবে। এই বলে মেঘনাদ বিমর্ষ মুখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। পরে বললে—আহা দাঁওয়ানজি-বাড়ীর সেই বুড়ো ঠাকুরদা মশাইকে মনে পড়ে ত বাবু,—এখানেও যেমন সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, সেখানেও তেমনি দেখলুম। এই নদীর ধারে একটা কাঞ্চন গাছের তলায় স্ত্রী-পুরুষে বসে জপ করছেন—এক গাছ ফুলের নীচে যেন দেবদেবী দেখলুম, সেই হাসি! বললেন—

আর বলা হল না, এই সময় পেরো-বাবুরা সব এসে গেলেন। মেঘনাদ নৌকা খুললে খাল পেরিয়ে গঙ্গায় পড়তেই বড়বাজারের গোল-গজার ঠোঙাটা টেনে নিয়ে গুপী দত্ত একমুঠো মুখে ফেলে দিয়ে ঠোঙাটা এগিয়ে ধরে চাটুয্যে মহাশয়কে বললে—খাও না। তিনি অন্যমনস্কে বললেন—হুঁ।

—হুঁ কি?—আমি ধরে থাকবো নাকি—নাও ধর—এই বলে আর এক মুঠো তুলে গালে দিয়ে, ঠোঙাটা চাটুয্যে মশায়ের শিথিল-হস্তে ঠেকিয়ে ছেড়ে দিতেই তিনি ধরতে না ধরতেই সেটা গঙ্গার জলে পড়ে গেল। দু'তিন জন আহা—আহা করে উঠতেই, দত্ত বলে উঠলো—অদেষ্টে থাকলে তো,—ভেতর থেকে কে একজন বললেন—তা বটে—প্রসাদটা—

মেঘনাদ অবস্থাটা বুঝতে পেরে আর তার শেষটা ভেবে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে—দু তিনটে জোর ঝিঁকি মেরে নৌকা ঘাটে ভিড়িয়ে দিলে।

চাটুয্যে মশাই বহুক্ষণ থেকেই অন্যমনস্ক ছিলেন, তাঁর মন বোধ হয় মেঘনাদের সেই কাহিনীর মধ্যে ঘুরছিল। এ সব কথায় তাঁর কানই ছিল না। নৌকা জোরে ডাঙায় লাগতে তাঁর হুঁস হল। দত্ত 'এস' বলায় তিনি বললেন—আমার একটু দেরি আছে। আটটার মধ্যে কিন্তু আসা চাই—উমেশ আমার চাকর নয়,—বসে থাকবে না। বলে দত্ত এগিয়ে পড়লো।—চাটুয্যে মশাই বিমর্ষভাবে কেবল বললেন—দেখি। ঘাটে ওঠবার সময়

দত্ত আপনা আপনি বলতে বলতে চললো—টাকা দুটো আগে দিয়ে কি কু-কাজই করেছি,—সঙ্গ দোষে আমারও বামুনে বুদ্ধি দাঁড়াচ্ছে দেখছি।

সকলে চলে গেল, আমি শেষে ছিলুম, ঝপ ক'রে একটা শব্দ হওয়ায় ফিরে দেখি—চাটুয্যে মশাই জামা, চটি, চাদর সব সুদ্ধ গঙ্গায় ডুব দিলেন। এক ধারে দাঁড়ালুম। দেখি—মেঘনাদকে বলছেন—মেঘনাদ, বাবা এখন আমি ব্রাহ্মণ, মা গঙ্গার কোলে তুমি আমি দু' জনেই, বাবা ঠিক বলিস—নির্ম্মলকে যা বলছিলি তা সব সত্যি কথা?

মেঘনাদ হাত জোড় করে বললেঁ—কমই বলেছি ঠাকুর মশাই, সব কি আমি বলতে পারি, তবে যা বলেছি—তা আমার নিজের চোখে দেখা, তার একটুও আমার কাছে মিথ্যে নয়।

—হয়েছে বাবা, বলে ওঠবার আগে, ট্যাঁক থেকে টাকা দুটো বার করে, গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে, আবার হাত গুটিয়ে ঘাটে উঠতে লাগলেন।

ঘাটে একটি অসহায় গরীব রোগী থাকতো—তার হাতে টাকা দুটি দিয়ে মুক্ত পুরুষের মত দ্রুত স্বচ্ছন্দ গতিতে বাড়ী চললেন।

৬

পরে শুনেছি— *

—চাটুয্যে মশাই শুনেই বেরিয়েছিলেন—রাত্রের কোন উপায় নেই। বাড়ী ঢোকবার আগে সে কথাটা বোধ হয় স্মরণ হওয়ায়, মাথাটা সজোরে নেড়ে বলে উঠলেন—তা হোক্—ব্রাহ্মণদের নারায়ণ আছেন, ভিক্ষা আছে, উপবাস আছে, না হয় মৃত্যু ত আছে,—তা বলে—উঃ, নারায়ণ রক্ষা করেছেন—

দালানে পা দিয়েই দেখেন—কা'রা বোশেখ-চাঁপার বৈকালী পাঠিয়েছে।

---

* চাটুয্যে মশায়ের বড় বউঠাকরুণ সেকেলে মাটির মানুষ। সংসার ভিন্ন হয়ে গেলেও নিত্য খোঁজ খবর নিতেন—যতটুকু সম্ভব সাহায্যও করতেন। তিনি জেনেছিলেন—সেদিন রাত্রের কোন ব্যবস্থাই নেই। তাই আঁচল ঢাকা দিয়ে এক সরা মুড়ি ও গোটা ছয়েক নারকেল নাড়ু নিয়ে আসছিলেন। চাটুয্যে মশাইকে বাড়ীর পথে দেখে—পেছিয়ে গা ঢাকা হয়ে দাঁড়ান। ছোট দেবরের কাছে লজ্জার কোনই কারণ ছিল না, কিন্তু দুঃখের অবস্থায় সাহায্য হিসাবে কিছু দিতে যাবারও মস্ত বড় একটা সঙ্কোচ আছে। তাই তিনি তাঁর পেছনে পেছনে বাড়ী ঢোকেন, এবং অন্তরালেই ছোট জা'র জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। পরদিন তিনিই কাঁদতে কাঁদতে এই সব কথা বলেন।

বিবিধ ফল মূল মিষ্টান্ন—দালানে ধরে না। ছেলেটি আনন্দে হাসিমুখে খবর দিতে ছুটে আসছে। 'হা ভগবান আমি পেটের জন্যে কি করছিলুম' বলেই তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ছেলেটি হকচকিয়ে বাবার কাপড় টেনে বারবার বলতে লাগলো—বাবা তুমি কেঁদ না, দেখ না—তুমি, আমাদের কত খাবার।

ব্রাহ্মণী অন্যত্রে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ছেলেকে কোলে করে ঘরে ঢুকতেই, মাথার কাপড় টেনে ব্রাহ্মণী বলে উঠলেন—ওগো তুমি এ কি করলে, বামন হয়ে দেবতা চিনলে না,—মাধবকে মেরে ফেললে! সে যে আমাদের দুঃখু দেখে আজ তিন বছর দু' বেলা দুধ খাইয়ে মণ্টুকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বাছা এ-বেলাও যে দুধ পাঠিয়েছে!—নারায়ণ আমার পেরমাই নিয়ে তাকে রক্ষা কর, আমাদের এমন করে মের না ঠাকুর; এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

চাটুয্যে মশাই সহসা এই আঘাতে কাঠ হয়ে গেলেন। অপরাধীর মত জড়িত-কণ্ঠে বললেন—মাধবের অসুখ—সে বাঁচবে না? কে বললে—না—না বলতে বলতে ছেলেকে কোল থেকে নাবিয়ে দিয়ে 'আমি আসছি' বলেই তিনি বেরিয়ে পড়েন।

*   *   *

আমি ঘাট থেকে সোজা মাধবের বাড়ী ছুটেছিলুম;—পাড়ায় ঢুকতেই দ্বিধায় বুকটা সহসা বিষম দুলে উঠলো! সামনের সব জিনিস—ঘর-বাড়ী গাছ-পালা আকাশ বাতাস সব যেন থমথমে, নিষ্প্রভ, ঠিক গেরোণ লাগার অবস্থা। দুটি ছেলে ছুটে এসে বললে—শীগ্‌গির আসুন, হরিবিহারীদা আপনাকে এগিয়ে দেখতে বললেন, কাকা আপনাকে কেবল খুঁজচেন।

বাড়ীর মধ্যে তখন যে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অপসানির হাহাকার উঠছে, সে সব আমার কানে যায়নি; আমি যেন যন্ত্রের মত হয়ে গেলাম—এক দৌড়ে একেবারে উঠানে উপস্থিত।

সেইখানেই তুলসীতলায় শুয়ে মাধব তখন প্রাণটা নিবেদন করছে।

হরিবিহারী চেঁচিয়ে বললে—মাধব, তোমার দাদাবাবু এসেছেন। তখনো সে ছিল—বোধ হয় আমার অপেক্ষায়। ধীরে ধীরে চাইলে। মুখখানা তার হাসি-মাখা হয়ে গেল। মুখের কাছে বসে বললুম—নিশ্চিন্ত হও ভাই, ভগবান তোমার সব ভার আমাদের দিলেন, গৌরীর বে আমার! মাধব আমার চোখে চোখ রেখে চলে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে 'সর—সর, মাধব—মাধব যাননি বাবা,—শুনে যা—' বলতে বলতে ভিড় ঠেলে ঝড়ের মত চাটুয্যে মশাই এসে পড়লেন।

মাধবকে দেখতে পেয়ে—'অ্যাঁ,—না, শুনতে হবে বাবা' বলেই হাঁটু গেড়ে বসে তার কানে মুখ দিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন—অভাবে স্বভাব নষ্ট হচ্ছিল বাবা, নারায়ণ হতে দেননি—আমি সে ব্রাহ্মণই আছি। বিশ্বাস কর বাবা—আমি ও কাজ হতে দেবো না মাধব—প্রাণ থাকতে না। সংসার দেখার ভার আমার। আমি ভিক্ষা করে পালবো,—যতদিন থাকবো—এই তোর দাওয়ায় এসে পড়ে থাকবো। সকলের দিকে চেয়ে প্রফুল্ল মুখে মাথা নেড়ে বললেন—শুনেছে! বল হরি—হরি বোল! চল—

* * *

পাগলের মত হয়ে গেলেও তিনি তাঁর কথা বারবার রক্ষা করে গেছেন, আমরা কিছুতেই তাঁকে নিরস্ত করতে পারিনি।

গৌরীর মা কিছু রেখে, বাকি সমস্তই গোপনে তাঁর বাড়ী দিয়ে আসতো।

শুনলুম—গুপী দত্ত উমেশ উকিলের কাছে বলেছে—বেটা বেইমান বামুন—শিন্নিও খেলে ভরাও ডোবালে—এই ছ মাসের মধ্যে খুব কম হবে তো ১২।১৩ টাকা খাইয়েছি হে!

* * *

ডিপুটি বাবু নির্ব্বাক হয়ে শুনছিলেন। আমার বলা শেষ হলে দু-তিন মিনিট মাটির দিকে পলকহীন চেয়ে থেকে, রুমালখানা বার করে মুখটা মুছলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, লাঠিগাছটি নিয়ে ধীরে ধীরে অন্যমনস্কের মত বেরিয়ে গেলেন, একটি কথাও কইলেন না। আমারো কোন কথা এল না,—আস্তে আস্তে উঠে তামাক সাজতে বসলুম।

সহসা ক্ষেত্তর নাপিতের গলা শুনতে পেয়ে চেয়ে দেখি—ডিপুটিবাবু গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে একাগ্র হয়ে শুনছেন। সে গাইছিল।

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জমিন্ রইল পড়ি,—
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

উত্তরা

মো হি নী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সেদিন বসন্তের বায়ু বহিতেছিল। কোকিল ডাকিতেছিল। চন্দ্র হাসিতেছিল।

পুষ্করিণীর ধারে মোহিনী একাকিনী বসিয়া পুষ্করিণীর জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকিরণ দেখিতেছিলেন।

২

মোহিনীর স্বামী থাকিতেও তিনি বিধবা। তাঁহার স্বামী বহুদিন হইতে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি অদ্য অতি বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল ইংরাজীতে তাঁহার শ্বশুরকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি আর দেশে ফিরিবেন না। কি উপায়ে বিলাতে তাঁহার সংসার চলিবে, বিলাতে তিনি কি করিবেন, কেন তিনি গৃহে ফিরিবেন না, এ সকল বৃত্তান্ত তিনি কিছুই লিখেন নাই। তাঁহার নিজের পিতার বিশেষ সঙ্গতি কিছুই ছিল না। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন অর্থের জন্য, স্ত্রীর জন্য নহে। তিনি শ্বশুরের অর্থে বিলাত গিয়াছিলেন। এরূপ জামাতা সুশীলচন্দ্র সহসা শ্বশুরমহাশয়কে কি প্রকারে ধীর, শান্ত এবং সংযত ভাবে এরূপ পত্র লিখিলেন, মোহিনীর পিতা রমেশচন্দ্র নানা দিক হইতে প্রশ্নটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও যখন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না, তখন তিনি একটি মাঝারি রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার বন্ধু প্রাণকৃষ্ণের গৃহে প্রয়াণ করিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ প্রবীণ ব্যক্তি। বহুতর কষ্টের তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া তিনি হাঁটিয়া গিয়াছেন। পায়ে ফোস্কা হইয়াছে, কিন্তু বসিয়া পড়েন নাই। দৈন্যের অগ্নিপরীক্ষায় তিনি 'অনরের' সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাতে পুড়িয়া তাঁহার চরিত্র-স্বর্ণ কেবল বিশুদ্ধতর হইয়াছিল।

প্রাণকৃষ্ণ যখন তথাকথিত ব্যাপার শুনিলেন, তখন তিনি শিষ দিলেন; পরে দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িলেন; পরে ভাবিলেন, পরিশেষে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন "হা।"

প্রাণকৃষ্ণ যখন অত্যন্ত করুণভাবে "হা" উচ্চারণ করিলেন, তখন

রমেশ সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রাণকৃষ্ণ তাহার পরেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবেন।

কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ তাহা করিলেন না। তিনি সহসা উঠিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন; রমেশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে (অনধিক পাঁচ মিনিট কাল হইবে) প্রাণকৃষ্ণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "রমেশ বাড়ি যাও।"

রমেশ কহিলেন, "বাড়ি যাইব কি! তোমার কাছে পরামর্শ চাই।"

প্রাণকৃষ্ণ কহিলেন "চাও না কি!—পাবে না!"

রমেশ। "কেন!"

প্রাণকৃষ্ণ। "পরামর্শ দিবার কিছু নাই।"

রমেশ। "এখন মেয়ের কি হবে?"

প্রাণকৃষ্ণ। "ব্রহ্মচর্য্য শিখুক। মনে কর সে বিধবা।"

রমেশ প্রাণকৃষ্ণের উত্তরটিকে অত্যন্ত সন্তোষকর বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "মোটে ষোল বৎসরের মেয়ে।"

প্রাণকৃষ্ণ। "১০ বছর বয়সেও কি মেয়ে বিধবা হয় না? এই ছয় বৎসর কাল সে যে সধবা ছিল, তার জন্য সমাজকে ধন্যবাদ দাও।"

রমেশ। "তোমার কি আর কিছু বলবার নেই?"

প্রাণকৃষ্ণ। "আছে। তোমার আর তিনটি মেয়ে আছে ত?"

রমেশ। "আছেই ত!"

প্রাণকৃষ্ণ। "তোমার কন্যার চেয়ে রৌপ্যের দিকে যার বেশী লক্ষ্য, তার সঙ্গে কদাপি কোন কন্যার বিবাহ দিও না। আর দেরী করো না। আমার আহার প্রস্তুত।"

রমেশ। "আমিও নাহয় আজি এখানে খেলাম।"

প্রাণকৃষ্ণ। "ও খাবে বেশ!" এই কথা বলিয়াই প্রাণকৃষ্ণ ভিতরে চলিয়া গেলেন। মিনিট পনের পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—"ওঠো আহার প্রস্তুত।"

রমেশ সে রাত্রিকালে সেখানে ভোজন করিলেন। কিন্তু অনেক প্রশ্নবাদ করিয়াও প্রাণকৃষ্ণের কাছে স্বীয় কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিমত আদায় করিতে পারিলেন না।

৩

ইংলণ্ডের একটি পরিবারের "ড্রয়িংরুম" আলোকিত! সুন্দর পুরুষ ও সুন্দরী নারী একত্র সমবেত। তাহাদের ভূষার পারিপাট্যে, উজ্জ্বল আলোকে, নৃত্যে, সঙ্গীতে সেই কক্ষটি ইন্দ্রালয় বলিয়া দর্শকের ভ্রম হইতে পারিত—যদি ইন্দ্রালয় তিনি চক্ষে পূর্ব্বে দেখিতেন।

তাহার পরে নৃত্য, তাহার পরে বিশ্রাম ও সুরা, তাহার পরে আবার নৃত্য। রাত্রিশেষে নৃত্য ভঙ্গ হইলে সুশীলচন্দ্র কম্পিত কলেবরে গৃহে চলিয়া আসিলেন।

৪

সুশীলচন্দ্রের সহিত মার্গারেটের বিবাহের সব ঠিক, নিয়তির খড়্গ সুশীলচন্দ্রের স্কন্ধের উপর উঠিয়াছে, পড়িতে উদ্যত, এমন সময়ে প্রাণকৃষ্ণের পুত্র নীলাম্বর তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুশীলচন্দ্র দিবাদ্বিপ্রহরে সোফায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। কল্যকার রাত্রি-জাগরণের পর দুপেয়ালা কাফি এবং পাউণ্ডখানেক ষ্টেক নিঃশেষ করিয়া তিনি রেণল্ডের মিষ্টরিস্ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। রেণল্ডখানি ভূতলে পড়িয়া গেল।

যখন সুশীলচন্দ্র যীশুখ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞাত স্বর্গ ও মার্গারেটের অঙ্গীকৃত আলিঙ্গন একসঙ্গে অনুভব করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নীলাম্বর দরোজায় টোকা দিয়া উত্তর না পাইয়াও সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাকিলেন, "হ্যালো সুশীল! নিদ্রিত!"

সুশীল। (উঠিয়া) "শয়তানের দোহাই! কে তুমি?" (সুশীল যেরূপ ইংরাজী বলিলেন আমি তাহা যথাসম্ভব বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিলাম।) নীলাম্বর একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "আমি নীলাম্বর।"

সুশীল। "নীলাম্বর! হ্যালো! তুমি এখানে!"

নীলাম্বর। "আশ্চর্য্য হচ্ছ! এবার ছুটিটা ব্রাইটনে কাটাবো ঠিক করেছি।"

সুশীল। "তা যেন করেছো! কিন্তু—" এই মাত্র বলিয়া সুশীল মাথা চুলকাইলেন; তাহার পরে ভ্রষ্ট কলার তুলিয়া লইয়া গলায় পরিলেন; পরে

দাঁড়াইয়া উঠিয়া fireplaceএর উপরিস্থ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নেকটাই ঠিক করিয়া লইলেন; পরে আসিয়া নীলাম্বরকে হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন—"চাটার্জ্জি, আমার সুখে সুখী হও।"

(সুশীল ইংরাজীতে যাহা কহিলেন, Congratulate me, তাহা বাঙ্গালায় ভাষান্তর হয় না! যত দূর সম্ভব তাহা ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম।)

নীলাম্বর তাহার হস্ত হস্তে লইয়া কহিলেন, "ব্যাপারখানা কি, বানার্জ্জি?"

সুশীল। "তবে শোন।" এই বলিয়া সুশীল পুনর্ব্বার fireplaceএর কাছে গিয়া তদুপরিস্থ তাক হইতে একটি সিগারেট কেস লইয়া নীলাম্বরকে দিলেন। নীলাম্বর তাহা হইতে একটি সিগারেট লইয়া ধরাইলেন। সুশীল সিগারেট কেসটি নীলাম্বরের হস্ত হইতে গম্ভীরভাবে লইয়া তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। উভয়ে এইরূপে ভাবী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইলে সুশীল অতিকাতর ভাবে কহিলেন, "জানো, চাটার্জ্জি, তুমি এসে আমার কি ভেঙ্গেছো", বলিয়া দ্বারের দিকে অতীব মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

নীলাম্বর আশ্চর্য্য হইলেন। দ্বার যদি ভাঙ্গিয়া থাকিত তবে ত একটা শব্দ নিশ্চয়ই হইত। তিনি দ্বারের নিকটে গিয়া দ্বার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "কৈ দরজা ত ভাঙ্গেনি।"

সুশীল। "শয়তান তোমায় গ্রহণ করুক। কে বলেছে যে, তুমি আমার ঘরের দ্বার ভেঙ্গেছো! তুমি যা ভেঙ্গেছো—সর্ব্বনাশ করেছো! ওহো জানো না—তুমি জানো না,—সুখী তুমি যে, জানো না যে তুমি আমার কি ভেঙ্গেছো! কারণ তুমি আমার বন্ধু। আমার কি ভেঙ্গেছো তা যদি জান্তে, যদি বুঝতে পার্ত্তে, যদি ধারণা কর্ত্তে পার্ত্তে—তাহ'লে তাহ'লে—তাহ'লে—এক কথায় দুঃখিত হতে। যাক, জানো না; সে ভালোই হয়েছে! আমি কিছু মনে কর্ব্বো না। ভুলে যাবো, যদি ভোলা সম্ভব হয়।"

নীলাম্বর। "বল না আমি তোমার কি ভেঙ্গেছি। আমি তার দাম দিতে প্রস্তুত আছি।"

সুশীল। "দাম!—চাটার্জ্জি! দাম দেবে, তার দাম তুমি দেবে! তোমার বাপের বিষয় বিক্রয় করেও তার দাম দিতে পারো না।"

নীলাম্বর উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিলেন। আবার ঘরের চারিদিকে চাহিলেন। কিছুই ভগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন না। শেষে অতি করুণ

স্বরে কতক স্বগত কহিলেন, "ভাঙ্গলাম কি!" তাঁহার সেই কাতরোক্তিটি মৃতবৎসা ছাগীর অস্ফুট ক্রন্দনের মত শুনাইল। তাঁহার সেই কাতরোক্তিতে সুশীল বিচলিত হইলেন। তিনি কহিলেন, "চাটার্জ্জি, তবে শোন, তুমি কি ভেঙ্গেছো। আমি ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম জানো?"

নীলাম্বর। "না।"

সুশীল। "আমি মার্গারেটকে স্বপ্নে দেখছিলাম। তুমি সেই স্বপ্ন ভঙ্গ করেছো।"

নীলাম্বর আশ্বস্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার বাপের বিষয় বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হইবে না। তিনি মার্গারেটের প্রতি সুশীলের অনুরাগের কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। কিন্তু সে ব্যাপার যে এতদূর গড়াইবে তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না।

সুশীল আবার কহিলেন, "আমি মার্গারেটকে—এ্যাঁ—বিবাহ কর্ত্তে যাচ্ছি। বিবাহ এই তেসরা মার্চ্চ। সব স্থির। তাই বলছিলাম বন্ধু আমার সুখে সুখী হও।"

যদি ঠিক সেই সময়ে গৃহকর্ত্রী স্বয়ং চায়ের সরঞ্জাম লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেন নীলাম্বর তাহাতে অধিকতর বিস্মিত হইতেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে সুশীল চারি বৎসর পূর্ব্বে শ্যামপুকুরের গলির ১৫।১ নং ভবনস্থ রমেশচন্দ্রের কন্যা মোহিনীকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন; কারণ তিনি জানিতেন যে সুশীল শ্বশুরের অর্থেই বিলাতে আইন পড়িতে আসিয়া প্রতি ছুটিতে ব্রাইটনে সামুদ্রিক বাতাস সেবন করিয়া থাকেন; কারণ তিনি জানিতেন যে আইনে দ্বিবিবাহের (bigamy) শাস্তি বেশ একটু গুরুতর। তিনি জানিতেন না কেবল মানবচরিত্র। মানুষ যে এতদূর হেয় কৃতঘ্ন হইতে পারে, তাহা কদাপি তিনি সম্ভব বিবেচনা করেন নাই।

নীলাম্বর কহিলেন, "সে কি! এ যে দ্বিতীয়বার বিবাহ।"

সুশীল ব্যঙ্গহাসি হাসিলেন, কহিলেন—"হ্যাঁ তা জানি।"

নীলাম্বর। "জেলে যাবে?"

সুশীল। "মার্গারেটকে নিয়ে জেলে কেন, হেলে অর্থাৎ নরকেও যেতে প্রস্তুত আছি। তুমি জানো না! তাকে দেখনি।"

নীলাম্বর। "নাই বা দেখলাম!"

সুশীল। "তার গায়ের রং তুহিনের চেয়ে শুভ্র।"

নীলাম্বর। "অনেক সাদা চামড়ার নীচে—"

সুশীল। "তার কেশদাম—ওঃ ঠিক যেন গোধূলি।"

নীলাম্বর। "হলেই বা—"

সুশীল। "তুমি দেখোনি, সে চুল নয়, উল।"

নীলাম্বর। তার না হোক তোমার ত বটে। তার চুল উল হোক আর না হোক ; তুমি 'ফুল' হোয়ো না। শোন।"

সুশীল। "তার বক্ষ সমুদ্রের তরঙ্গের মত।"

নীলাম্বর। "বক্ষ সমুদ্রতরঙ্গের মত হলেই যে তার সঙ্গে কেবল একটি মাত্র সম্বন্ধ হতেই হবে, এ কথা কেউ বলেছে কি !"

সুশীল। "কেন শেলি !"

নীলাম্বর। "ঐ কথা বলেছে ? নিয়ে এসো শেলি।"

সুশীল। "আমাদের বৈষ্ণব কবিরা।"

নীলাম্বর। "তাঁরা এই কথা বলেছেন যে সুন্দর পুরুষ সুন্দরী নারীর মধ্যে সম্বন্ধ ঐ একটি মাত্র। তা হলেও, এক মাত্র বিবাহই এই পশুর প্রবৃত্তিকে মানুষের ধাপে তুলতে পারে। বিবাহে এক কর্ত্তব্যজ্ঞানই এই সম্বন্ধকে পবিত্র করে দেয়।"

সুশীল। "আমি ত তাকে বিবাহ কর্ত্তে যাচ্ছি।"

নীলাম্বর। "এ বিবাহ নয়, এ স্বেচ্ছাচার। এ বিবাহ হয় না। ঈশ্বরের আইনেও হয় না, মানুষের আইনেও হয় না। একজনকে বিবাহ করে এসে—"

সুশীল। "হিন্দুসমাজে কি দুই স্ত্রী হয় না ? কুন্দনন্দিনী—"

নীলাম্বর। "উচ্ছন্ন যাক্ কুন্দনন্দিনী। কুন্দনন্দিনীও যা রোহিণীও তাই।"

সুদূর বিলাতে ব্রাইটনে সমুদ্রের ধারে 'সোফা' শোভিত গৃহকক্ষে এরূপ কথোপকথন অপ্রত্যাশিত। কিন্তু বাঙ্গালা উপন্যাস যে অনেক নব্যযুবকের মস্তক বিগড়াইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্যকার দিনে এ অসংযত প্রবৃত্তির মাত্রা চড়িয়াছে। এ প্রবৃত্তি নব্যযুবকের কাছে বড় মনোরম ; বড় প্রীতিপ্রদ। রেণল্ডের উপন্যাস এই প্রবৃত্তিতে আহুতি দিতেছে। এ কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন প্রবৃত্তি নির্ব্বাণ করিতেই হইবে। কারণ এ ব্যাধি বড় সংক্রামক।

বলা বাহুল্য যে নীলাম্বরের যুক্তি সুশীলের প্রবৃত্তির গতিরোধ করিতে পারিল না। সুশীলের বিবাহ হইয়া গেল।

৫

"আমার পুত্রের বিপক্ষে মোকদ্দমা আনতে আমি নীলাম্বরকে লিখেছি।"—কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধ সিদ্ধেশ্বর এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিলেন।

রমেশ কহিলেন, "সে কি ভশ্চার্যি মহাশয়! সে আপনার পুত্র।"

সিদ্ধেশ্বর। "আমার ত্যাজ্যপুত্র।"

"আমার" বলিতে সিদ্ধেশ্বরের স্বব এরূপ উচ্চে উঠিয়াছিল যে রমেশ ভাবিয়াছিলেন যে সিদ্ধেশ্বর নিশ্চয় তৎপরেই একটা অশ্রুতপূর্ব্ব ভীষণ অভিশাপ উচ্চারণ কবিবেন। কিন্তু যখন সে চীৎকার "ত্যাজ্যপুত্রে" মাত্র পর্য্যবসিত হইল তখন রমেশ কতক আশ্বস্ত হইয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন—"আর সে আমার জামাই—"

সিদ্ধেশ্বর ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, "জামাই বটে।" কিন্তু এ ঝাল নিজের উপর ঝাড়িলেন, কি বৈবাহিকের উপর ঝাড়িলেন কি স্বীয় পুত্রের উপর ঝাড়িলেন, তাহা বক্তা কি শ্রোতা কাহারও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইল না। বৃদ্ধের স্বর কাঁপিতেছিল। বমেশ ইহার উত্তরে কি কহিবেন তাহা তাঁহার কোন-রূপে মনে আসিল না। তিনি উত্তর খুঁজিতেছেন, এমন সময় ষ্টেশনে যাত্রীর কাছে প্রত্যাশিত ট্রেণের মত প্রিয় প্রাণকৃষ্ণ সেই স্থানে উপনীত হইলেন।

রমেশ আশা করিয়াছিলেন যে প্রাণকৃষ্ণ বুদ্ধিবলে সিদ্ধেশ্বরকে তাঁহার ভীষণ সংকল্প হইতে বিরত করিবেন। প্রাণকৃষ্ণের ধীশক্তির প্রতি রমেশের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। পুত্রকে নির্য্যাতন করার অস্বাভাবিকতা রমেশ বুঝিতে-ছিলেন, কিন্তু বুঝাইতে পারিতেছিলেন না। নৌকা ডুবু-ডুবু, এমন সময়ে উপযুক্ত নাবিক উপযুক্ত স্থানে আসিয়া বসিল। তিনি উৎসুক ভাবে প্রাণকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিলেন। ক্রমে প্রাণকৃষ্ণ সিদ্ধেশ্বরের প্রতিজ্ঞা শুনিলেন। শুনিয়াই চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিলেন "সাবাস্।"

ইহা শুনিয়া রমেশ ব্যথিত হইলেন। তিনি প্রাণকৃষ্ণের গাত্রে হস্ত দিয়া কহিলেন—"কিন্তু শোন প্রাণকৃষ্ণ"—

প্রাণকৃষ্ণ সেদিকে দৃকপাত বা কর্ণপাত না করিয়া সাগ্রহে সিদ্ধেশ্বরকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে আবার কহিলেন, "সাবাস্ সিদ্ধেশ্বর! আজ মানুষের মত একটা মানুষ দেখলাম।"

রমেশ। "কেন?"

প্রাণকৃষ্ণ। "রোমে ব্রুটস্ পুত্রের প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন তাই তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাদের দ্বিগুণ স্নেহ বক্ষে ধরে এই বঙ্গদেশে কত ব্রাহ্মণ ব্রুটস্ আছে কে জানে' তাদের মধ্যে তুমি একজন। এসো আবার আলিঙ্গন করি।"

রমেশ উঠিলেন। বোধ হয় তিনি ভাবিলেন যে তর্কের এমন অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যাহাতে তিনি না দাঁড়াইলে আর উপায় নাই। নহিলে তাঁহার উঠিয়া দাঁড়াইবার আর কোন কারণ লক্ষিত হইল না।

সিদ্ধেশ্বর। "আমি চিঠি লিখে দিয়েছি। তোমার ছেলে আমায় চিরকাল গুরুর মত ভক্তি করে। আমার কথা অমান্য করবে না।"

প্রাণকৃষ্ণ। "সাধ্য কি? আমি তার উপর একটা তারে খবর পাঠাচ্ছি। বাপের কথা ত সে কখনই অবহেলা করতে পারবে না। এমন ছেলেই তৈয়ের করিনি, রমেশ।"

এই প্রথম সে দিন প্রাণকৃষ্ণ রমেশের সহিত কথা কহিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ। "আমি 'তার' পাঠাচ্ছি এখনই।"

এই বলিয়া প্রাণকৃষ্ণ উঠিয়া দ্বারের কাছে যাইলে রমেশ অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে সিদ্ধেশ্বরের দিকে চাহিলেন। সিদ্ধেশ্বর কন্যার পিতার ব্যথা বুঝিলেন। নানারূপ বিপরীত অনুভূতি আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি কহিলেন, "প্রাণকৃষ্ণ, দাঁড়াও।"

প্রাণকৃষ্ণ দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রমেশ। "ক্ষমা কর।"

সিদ্ধেশ্বর রমেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"কিন্তু সে ক্ষমার যোগ্য নয়—পাষণ্ড।"

প্রাণকৃষ্ণ। "ব্যভিচারী—"

সিদ্ধেশ্বর। "নরাধম।"

প্রাণকৃষ্ণ। "মহাপাপী।"

এই সময়ে মোহিনী কক্ষে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "যাই হৌন্ তিনি আমার স্বামী।"

৬

এরূপ ঘটিবে রমেশ তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ষোড়শী কন্যা এরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার করিবে, তাঁহার বৈবাহিকের সমক্ষে আসিয়া বিশেষতঃ তাঁহার বন্ধু প্রাণকৃষ্ণের সমক্ষে আসিয়া পড়িবে, এরূপ তিনি কখন প্রত্যাশা করেন নাই। নাটকে এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবজীবনে—সত্য কথাটা কি—তিনি এরূপ দেখেন নি! আমরাও স্বীকার করিতেছি যে আমরাও দেখি নাই। কিন্তু নারী-হৃদয়ের ব্যথা, চাঞ্চল্য, নারী-হৃদয়ের বল, আমরা অধম পুরুষ কতটুকু জানি।—নারী! নারী! ঈশ্বর কি দিয়া তোমার ঐ শুভ্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্র গড়িয়াছেন তিনিই জানেন। স্বর্গে দেবীরা কি এর চেয়েও সুন্দরী!

ফলকথা দাঁড়াইল এই যে সে টেলিগ্রাম গেল না। অন্য টেলিগ্রাম গেল। তাহার মর্ম্ম "নালিশ করাইও না। পুত্রকে বলিও যে তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রীই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে।"

৭

সুশীলের বিবাহের পর এক বৎসর গিয়াছে। শ্বেতচর্ম্মের সখ তাঁহার ইতি-পূর্ব্বেই মিটিয়াছিল। তৎপরে তাঁহার ইংরাজ-স্ত্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার অনুমতি পাইলেন। একদিন পরিত্যক্ত সুশীল আবার সেই ব্রাইটনে সমুদ্র-ধারে একা বসিয়া ভাবিতেছিলেন। স্ত্রীর অর্থ নিঃশেষ করিয়া নিজের রিক্ত পকেটে হস্ত দিয়া ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে আবার তাঁহার বন্ধু নীলাম্বর সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পূর্ব্বকথিত পত্র ও টেলিগ্রাম দেখাইলেন। সুশীলের চক্ষে জল আসিল। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া অন্যমনে পত্র ও টেলিগ্রাম বক্ষের পকেটে রাখিলেন।

৮

মোহিনী চন্দ্রালোকে ভাবিতেছিলেন! দূরে সানাই বাজিতেছিল! সানাইয়ের তান কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

এমন সময়ে মোহিনীর মা আসিয়া ডাকিলেন, "মোহিনী।"

মোহিনী। "মা! এই যে যাচ্ছি! রাত্রি হয়ে গিয়েছে, জাস্তে পারিনি।"

যেন কত সঙ্কোচ। যেন অপরাধ তাঁহারই।

মোহিনীর মা কহিলেন, "এসো মা, জামাই এসেছে।" মোহিনী উঠিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

'বঙ্গদর্শন' : ১৩১৬ মাঘ

সরস্বতী

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আষাঢ়ের প্রবল বর্ষণে আফিসের ফেরৃতা ঘরমুখো হরিবাবু বড়ো ফাঁপরে পড়িলেন। প্রায় বারো আনা রকম পাড়ি জমাইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ছাতায় মাথা আট্‌কান যায় না; আজকালকার কালে ভগবানের গড়া মাথা অপেক্ষা চর্মকারের গড়া জুতার দরদই বেশি, কেননা মাথা ভিজিলে সহজে মুছিয়া শুকাইয়া লওয়া যায়, কিন্তু জুতা ভিজিলে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া পড়ে। অথচ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জামা-কাপড়ের বেলায় যা কিছু বাহুল্য থাকুক, জুতার বেলায় এক প্রস্থর বেশি আর দুই প্রস্থ কপালে জোটে না। জুতা হাতে করাটাও হালফ্যাশানের ভদ্রলোকের পক্ষে কেমন বেয়াড়া দেখায়। এই জুতা-সমস্যায় পড়িয়া অগত্যা হরিবাবু একটি বাড়ির দরজা খোলা দেখিয়া অসংকোচে দরজার ভিতর গিয়া দাঁড়াইলেন। নীচে লোকজনের সমাগম নাই, কিন্তু উপরের বারান্দা হইতে একজন আগন্তুকের দরজায় প্রবেশ লক্ষ্য করিল। হরিবাবুর উপর-দিকে চাওয়া অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তিনি সেটা জানিতে পারিলেন না।

একটু পরে একজন ঝি আসিয়া বলিল, "বাবু, এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবেন? ওপরে গিয়ে বসবেন আসুন।" হরিবাবু সারাদিন কলম

পিষিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলেন, কোথায় বাড়ি গিয়া গা-পা ছড়াইয়া একটু আরাম করিবেন ও শ্রান্তিহারিণী, তামাকুদেবীর প্রসাদে ক্লান্তি দূর করিবেন, তা' না এই দুর্যোগ উপস্থিত। এমন অবস্থায় তিনি এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, ঝির পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিলেন। উপরে উঠিয়া দেখিলেন, একটি ঘরের ভিতর দিয়া আর একটি ঘরে যাইতে হয়, প্রথম ঘরটিতে বিশেষ বেশি আসবাব নাই, কিন্তু দ্বিতীয় ঘরটির সাজসজ্জা ও গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চেহারা দেখিয়া হরিবাবু অনুমানে বুঝিলেন এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেন দুই পা পিছাইয়া যাইবার ভাব দেখাইলেন। গৃহস্বামিনী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আপনি ভদ্রলোক, কষ্ট পাচ্ছেন দেখে' ঝিকে উপরে ডেকে আন্‌তে বলেছি। আমার কোনো কু-মতলব নেই। এ ঘরে আস্‌তে যদি আপত্তি থাকে, তা' বেশ ঐ ঘরেই বসুন।"

এই বলিয়া সে একখানি সুদৃশ্য ও সুপরিসর গালিচা বিছাইয়া দিল ও বলিল, "আমার গুরুদেবের ব্যবহারের জন্যে এই আসন কিনেছি, কোনো দ্বিধা বোধ না ক'রে এই আসনে বসুন।" হরিবাবু একটু অপ্রস্তুতভাবে রমণীর প্রদত্ত আসনে বসিয়া পড়িলেন। রমণী তখন ভরসা পাইয়া বলিল, "আকাশের যে রকম গতিক, আপনাকে অনেকক্ষণ বস্‌তে হ'বে বোধ হ'চ্ছে। জামাটামা ছাড়ুন, ঝিকে দিয়ে মাজাঘষা পেতলের ঘটিতে জল আনিয়ে দিচ্ছি, হাতমুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হ'ন। আর তামাক অভ্যাস আছে কি?" হরিবাবু শেষের কথাটায় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। তখন রমণী বলিল, "গুরুদেব আস্‌বেন ব'লে নতুন হুঁকো-কল্‌কে কিনে রেখেছি, আপনি তাইতে তামাক সেবা করুন; ঝি সেজে দিচ্ছে। গুরুদেবের জন্যে আবার হুঁকো-কল্‌কে আনালেই হবে।"

হরিবাবু না-হুঁ না-হুঁ করিয়াও শেষটা রমণীর নির্দেশমতো সব কাজই করিলেন। তখন আর একটু সাহস পাইয়া রমণী বলিল, "আপনার আফিসের কাপড়চোপড় দেখ্‌ছি, সারাদিন খাটুনির পর অবিশ্যিই ক্ষিদে-তেষ্ণা পেয়েছে, যদি অনুমতি করেন, ঝিকে দিয়ে বাজার থেকে ডাব আর সন্দেশ আনিয়ে দিই, একটু জলযোগ করুন।" "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" বুঝিয়া রমণী ঝিকে ডাকিয়া ভিতরের ঘরে লইয়া গিয়া পয়সা দিল ও কি কি আনিতে হইবে

বলিয়া দিল। এ সব স্থানের ঝি-চাকরের এমন তরিবৎ যে বাদলাবৃষ্টি ঝড়-ঝাপটা বজ্রাঘাতেও তাহারা মনিবের ফরমাস খাটিতে অবহেলা করে না। আর ঝির জুতা ভিজিবারও ভয় নাই!

একটু পরে ঝি ফিরিল। হরিবাবু তাহার হাত হইতে সন্দেশ ও মুখকাটা ভাব লইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা দমন করিলেন ও আর এক কিস্তি গম্ভীরভাবে তামাকু-দেবীর আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

ক্রমে দুর্যোগের অবসান হইল। তিনিও আস্তে আস্তে উঠিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। যাইবার সময় কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল, রমণীকে আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া ঘটিয়া উঠিল না। রমণী তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত গেল ও সপ্রতিভভাবে বলিল, "তবে আসুন বাবু, দেরির জন্যে ঘরের লোকে না জানি কত ভাব্‌ছে! আবার কবে আ—" এই পর্যন্ত বলিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "এই দেখুন বাবু, কেমন বদ্ অভ্যেস হ'য়ে গেছে, কি বল্‌তে যাচ্ছিলাম। যাক্, কিছু মনে কর্‌বেন না।" হরিবাবু হাঁ না কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘাড় গুঁজিয়া দরজার বাহির হইয়া গেলেন।

২

হরিবাবু গৃহে ফিরিলে গৃহিণী একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এত দেরি যে! বৃষ্টিতে আফিসের বা'র হ'তে পারনি বুঝি?" তিনি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "বৃষ্টির জন্যে পথে আট্‌কা পড়েছিলাম।" মোটের উপর সত্য কথাই বলিলেন, কোথায়, কি বৃত্তান্ত, গৃহিণীও জিজ্ঞাসা করিলেন না, তিনিও ভাঙিয়া বলিলেন না। আজ বড়ো ক্ষুধা নাই, একটু রাত্রি করিয়া আহারাদি করিব—এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িলেন, ও হাতমুখ ধুইয়া নূতন করিয়া ধূমপানে মন দিলেন। অমৃতে কি কখনো অরুচি হয়? তাহাতে আবার এক্ষেত্রে তামাকু গৃহিণীর শ্রীহস্তের সাজা। রাত্রে আহারাদির পর গৃহকর্মবিরতা গৃহিণীর সঙ্গে কিছুক্ষণ প্রেমালাপের পর নিদ্রার শরণ লইতে উন্মুখ হইলেন। কিন্তু সুনিদ্রা হইল না। থাকিয়া থাকিয়া অতিথিসেবা-পরায়ণা নবপরিচিতার যত্ন-আদর ও অতিথির নিষ্ঠারক্ষার জন্য আগ্রহ, এই সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের হাবভাব-সম্বন্ধে

তাঁহার যে ধারণা ছিল, ইহার চরিত্রে তাহার বিপরীত ধরণ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় সেই রমণীর প্রতি কেমন একটা শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

যাহা হউক, প্রাতে উঠিয়া যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ও স্নানাহার করিয়া তিনি আফিসে গেলেন। কিন্তু সেদিন অন্যদিনের মতো চাপিয়া আফিসের কাজ করিতে পারিলেন না, কেমন যেন অন্যমনস্ক! মনে কেবলই সেই রমণীর আদর-যত্নের কথা উঠিতে লাগিল। মোহের এই তো প্রকৃতি!

আফিসের ছুটি হইলে অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে ঠিক সেই বাড়ির দরজায় তাঁহার গতিরোধ হইল। আজ দৈবদুর্যোগ নাই, তবুও একবার সেখানে আশ্রয় লইতে মন টানিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি 'ঝি, ঝি' বলিয়া ডাকিলেন। গলার সাড়া পাইয়া ঝি আসিল না, কিন্তু গৃহস্বামিনী বারান্দায় বাহির হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল ও একটু চমকিত হইয়া মৃদু-মধুরস্বরে বলিল, "ওপরে আসুন, ঝি দোকানে গেছে।"

হরিবাবু এই কোমল আহ্বানে উৎসাহের সহিত সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিলেন এবং বরাবর ভিতরের ঘরেই গেলেন। আজ আর রমণী তাঁহাকে গুরুদেবের আসন দিল না, একখানি চেয়ারে বসিতে বলিল। আসন-গ্রহণান্তে হরিবাবু গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "কাল তোমার আদর-যত্নে বড়ো আপ্যায়িত হয়েছি, তখন ধন্যবাদ দিতে পারিনি, তাই আজ সে ত্রুটি শোধ্‌রাতে এসেছি।" রমণী এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া একটু মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে হাত-মুখ ধুইতে জলের ঘটি সরাইয়া দিল এবং ধূমপান ও জলযোগের ব্যবস্থা করিল; তবে আজ ঘরের তৈয়ারি খাবার—বাজারের নহে। হরিবাবু খাবার খাইতে একটু মৃদু আপত্তি করিয়া শেষে জিনিসগুলির সদ্‌ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

জলযোগান্তে গৃহস্বামিনীর তৈয়ারি তামাক টানিতে টানিতে শয্যাপার্শ্বে হারমোনিয়ামটা দেখিয়া তিনি একটু আবদারের স্বরে বলিলেন, "বাজনাটা দেখে লোভ হচ্ছে একটু গান শুনি। আমার এ অনুরোধটা না রাখ্‌লে অতিথি-সৎকারে ত্রুটি থেকে যাবে কিন্তু।" রমণী দ্বিরুক্তি না করিয়া আবার একটু মৃদু হাসিয়া যন্ত্রে স্বর দিয়া কীর্তন ধরিল এবং উপরি-উপরি ৩।৪টি বিরহ গাহিয়া তাহার পর চাবিটা বন্ধ করিয়া দিল।

গানের রেশ যতক্ষণ কানে রহিল, ততক্ষণ হরিবাবু কেমন এক রকম হইয়া

৪

শ্রাদ্ধাদির পরে শোকের প্রথম বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে অভাগিনী বিধবা বিধবা বেশধারিণী সরস্বতীকে বলিলেন, "বোন, আমার ইচ্ছা বাড়িখান বেচে ও আফিসের টাকা তুলে' নিয়ে কাশীবাস করি। তুমি আর কতদিন আমার কাছে পড়ে থাকবে ?" সরস্বতী ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "দিদি, তুমি তীর্থযাত্রা করবে, বাধা দেব না। কিন্তু এই বাড়িই আমার মহাতীর্থ, আমি এ বাড়ি ছাড়তে পারব না। দশজন পাড়ার লোক ডেকে বাড়ির ন্যায্য দাম ঠিক কর, আমিই তোমাকে সে দাম দেব। তবে ইচ্ছে ছিল, যে ক'দিন এ পোড়াপ্রাণ থাকবে, তোমার মতো সতীলক্ষ্মীর সেবা ক'রে পূর্বজন্মের ও এ জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব, কিন্তু দয়াল ঠাকুর আমার কপালে তা লেখেন নি !"

কথাটা শুনিয়া বিধবা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। পরে বলিলেন, "বোন্, তুমি যে বল্‌ছ এ বাড়ি আমাদের মহাতীর্থ, তা' বটে। আমারও ইচ্ছে করে, তাঁর চরণ স্মরণ ক'রে, এইখানেই প'ড়ে থাকি, কিন্তু আফিসের সামান্য টাকায় তো পোড়া পেট কুলোবে না। আরও কতকাল বাঁচতে হ'বে তা' কে জানে ? তাই বাড়ি বিক্রি করতে চাই।" সরস্বতী উত্তর করিল, "দিদি, তোমার যদি এই বাড়িতে থাকা মত হয়, তবে সে জন্যে ভাবতে হ'বে না। আমি তার ব্যবস্থা করব। আমি তো তোমার আশ্রয়েই থাকব, আমার বাড়িখানার আর দরকার কি ? সেইখানাই বেচে ফেলি। তুমি এতে অমত করো না, লক্ষ্মী দিদি, সে বাড়ি আমার পৈতৃক—পাপের ধনের নয়। তুমি অনুমতি দাও, সেই বাড়িবেচা টাকা সুদে খাটালে দুটো বিধবার পেট বেশ চ'লে যাবে।"

হয়ত অন্য সময় হইলে বিধবা এ প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেন ; কিন্তু আর মনের জোর নাই। তাহা ছাড়া সর্বদা সরস্বতীর সংসর্গে থাকিয়া তাহার স্বভাবচরিত্র দেখিয়া, তাহার সেবা পাইয়া, তাঁহার মনটা আর তাহার দিকে বিমুখ ছিল না। তিনি গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "সরি, তুই আর জন্মে আমার বোন ছিলি ! তোর যা' ভালো বোধ হয় তাই কর্, আমি কোনও কথা কইব না।"

এই কথাবার্তার পর সরস্বতী পাপের অর্জিত সমস্ত অর্থ অনাথাশ্রমে দান করিল ও বাড়ি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইল শুধু তাহাই সম্বল করিয়া দুই

জনের জন্য পুঁজি করিল। সে যত দিন বাঁচিয়া ছিল, বিধবার নিয়ম পালন করিয়া ও 'দিদি'র সেবা করিয়া কাটাইয়াছিল। তাহার পর একদিন হতভাগিনীর জীবন-বর্তিকা নিভিল; সে 'দিদি'র চরণে মাথা রাখিয়া, তাঁহার ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়া, মহাযাত্রা করিল। বিধবা সেই যুগল শ্মশান-স্মৃতি হৃদয়ে বহন করিয়া আরও কিছুদিন দারুণ মনঃকষ্টে জীবন কাটাইয়া শেষে পরলোকে পতির সহিত মিলিত হইলেন। কে জানে সেখানে লক্ষ্মী-সরস্বতীর ন্যায় উভয়েই স্বামি-নারায়ণের পদসেবার অধিকার পাইয়াছিলেন কি না?

'মোহিনী'

রহমান

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রথমে তাহার নাম ছিল 'দেল্‌জান্', পরে সকলে তাহাকে রহমান বলিত। প্রথমে তার রুটির দোকান ছিল, পরে সেটা পানের দোকানে পরিণত হইল। বহুদূর হইতে দেল্‌জানের হাতের রুটি কিনিতে লোকে আসিত। এমন রুটি মোগল বাদশাহের আমলেও কেউ খাইয়াছিল কিনা সন্দেহ। দোকান এখন শ্রীহীন। রুটির পরিবর্ত্তে পানের আস্‌বাব। সববত্ তাহার পার্শ্বে।

দিবা দ্বিপ্রহর। প্রায় এক মাস ধরিয়া দিল্লীনগরে 'লু' চলিতেছিল, আজ অনেকটা শান্ত। একজন পথিক ছাতা মাথায় দিয়া ক্যান্‌ভাসের ব্যাগ-হস্তে দোকানের সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ পাইচারি করিল। পরে রহমানের নিকট গিয়া বলিল, "বন্দিগি খাঁ সাহেব! আমাকে মনে পড়ে কি?"

রহমানের স্মৃতিশক্তির সুব্যবহার অনেক দিন হইতে বন্ধ। যখন রুটির দোকান ছিল, তখন তাহার মানস-পটে পুরাতন ও নূতন চিত্রগুলি মধ্যে মধ্যে উদয় হইত। সেকালে সুখ ও দুঃখ নামক দুইটি পদার্থের স্বতন্ত্র অনুভূতি তাহার ছিল। এখন সেই পট এবং সুখ, ও দুঃখ, অনৈতিহাসিক যুগের ইতিহাসের মত কোথায় পড়িয়া আছে, তাহার খবর সে রাখে না।

রহমান প্রতিনমস্কারপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি 'সুদেল্ বাবু' ?"

পথিক। "আবার মনে করুন।"

রহমান। "তবে বোধ হয় 'জানকীবাবু'।"

পথিক। "এইবার ঠিক। আমারই নাম সেই। জানকীবাবু—ইতিহাসের অধ্যাপক। আমি আপনার রুটি খুব পছন্দ করিতাম, কিন্তু দুইমাস আসি নাই, কই রুটির টুকরি ত আর দেখ্ছি না।"

রহমান। "আপনি ত ইতিহাসের ওস্তাদ, এ-সম্বন্ধে আমাকে তালিম দিতে পারেন ? রুটি চিরকাল থাকিবে, এমন কোনো কথা আছে কি ? রুটি যে তৈয়ারি করিত সে যেখানে গিয়াছে রুটিও সেখানে—"

পথিক। "কে সে ?"

রহমান। "দেল্জান্।"

পথিক। "আপনিই ত দেল্জান্ ?"

রহমান। "দেল্জান্ স্ত্রীলোক। আমি পুরুষ—মৌলবি রহমান খাঁ। ইচ্ছা ছিল 'দেল্জান্ ও রহমান মিলিয়া একটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইবে'। এখন আমি একাকী। রহমান—উল-রহমান। আপনি এক পেয়ালা সরবত্ খাইয়া ইতিহাস ব্যাখ্যা করুন। আমি পান তৈয়ারি করি।"

একজন টোঙ্গা হাঁকাইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইল।

রহমান। "কি ইয়ার ? তুমি এখনও টোঙ্গা চালাও ?"

টোঙ্গাওয়ালা। "এক পেয়ালা সরবত হবে কি ?"

রহমান। "নিশ্চয়, তার সঙ্গে পান ও জরদা।"

টোঙ্গাওয়ালা অশ্বের রাস্ দোকানের খুঁটাতে বাঁধিয়া বসিয়া পড়িল। ক্রমে সরবত্ ও পানে তাজা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দুনিয়াদারির খবর কি ?"

রহমান। "ইয়ার! দুনিয়া কি বস্তু তাহার কিনারা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। দুনিয়া চলে, তাহার পিঠে আমরাও চলি। তবে এটা ঠিক যে, কোথায় যায় তাহা কেহই জানে না। শুনিতে পাই, দুনিয়া ও জীব, উভয়েই খোদার দিকে চলে।"

টোঙ্গাওয়ালা। "একদিন একজন বাঙালী বাবু আমার টোঙ্গাতে সওয়ার হইয়া তাহারই উপর চলিতে সুরু করিলেন। আমি বলিলাম, 'বাবু সাহেব,

এটা অসম্ভব, কেননা টোঙ্গা ছোট, স্থির হইয়া না বসিলে আপনি পড়িয়া যাইবেন।' তিনি বলিলেন, 'এক জায়গায় বসিয়া থাকা সম্পূর্ণ অধীনতা, এই জন্য ইতিহাস ক্রমে চলিতে থাকে'।"

(গৃহাভ্যন্তর হইতে নিদ্রাতুর জানকীবাবু)। "ওহো! তুমি সেই টোঙ্গাওয়ালা?"

টোঙ্গাওয়ালা। (উঁকি মারিয়া) "সেলাম-আলেগম্! সাহেব! আজ কাহার টোঙ্গাতে তস্‌রিফ আনিয়াছেন?"

জানকী। "পদব্রজে। যখন যার যেমন অবস্থা, সেই রকম তার মতিগতি। দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুন ও ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা যুধিষ্ঠির উভয়েই এক পথের পথিক। অথচ ইতিহাস বলে যে, হুমায়ুনের বংশ ভারতবর্ষে থাকিয়া গেল, যুধিষ্ঠিরের বংশ স্বর্গের পথেই লোপ পাইয়াছিল।"

রহমান। "বিহিস্তের কোনো তওয়ারীখ্ নাই?"

জানকী। "স্বর্গের ইতিহাস ও ভূগোল কিছুই নাই। আমি একখানা বহি এসম্বন্ধে শীঘ্রই বাহির করিব।"

রহমান। "তাহাতে বুঝাইয়া দিবেন যে, দেল্‌জান্ যদি রহমানকে ছাড়িয়া যায়, তবে সেটা দেল্‌জানের দোষ, না, রহমানের দোষ।"

সময় নষ্ট হয় দেখিয়া টোঙ্গাওয়ালা উঠিতেছিল, কিন্তু পরিশ্রান্ত ঘোড়া তাহার ঐতিহাসিক বিশ্রামের দাবীস্বরূপ চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

টোঙ্গার পার্শ্বে একটু ছায়া দেখিয়া একজন বানরওয়ালা তাহার লাল গোদা বানর ও ছাগল লইয়া বসিয়া গিয়াছিল। অবসর পাইয়া বানরটা ছাগলের স্কন্ধ বাহিয়া টোঙ্গার উপর উঠিল ও টোঙ্গা হইতে অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ঘোড়া তাহাতেও ভ্রূক্ষেপও করিল না।

টোঙ্গাওয়ালা। "কি বেয়াদব!"

জানকী। "বানর বেয়াদব, না, তোমার ঘোড়া শান্ত?"

রহমান। "আপনার ইতিহাস কি বলেন?"

জানকী। "ইতিহাসের এ সম্বন্ধে একবাক্য। শান্ত বিশ্রামশীল জীব দেখিলেই, অশান্ত ও উপদ্রবশীল জীব তাহার স্কন্ধে চড়ে। ইহাতে তাহাকে বেয়াদব বলা অন্যায়। ইহা স্বাভাবিক আদব-কায়দা।"

টোঙ্গাওয়ালা। (বানরওয়ালার প্রতি) "তোমার বানরকে একবার নাচিয়ে দেও ইয়ার!"

কথাটা বুঝিতে পারিয়া বানর নিজেই টোঙ্গা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তাহার পোষাক-পরিচ্ছদের ঝুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

বানরওয়ালা। "মদারি! তৈয়ার হও।"

মদারি (Mandarin শব্দের অপভ্রংশ) প্রভুর ঝুলি হইতে তাহার সরঞ্জাম বাহির করিল। একটু ভিনোলিয়া সোপ দিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিল। একটা ভাঙা দর্পণের সাহায্যে তাহার দ্বিখণ্ডিত মুখ ও সম্পূর্ণ মুখ পুনঃ পুনঃ চক্ষু উল্‌টাইয়া দেখিল। একখানা চিরুণী দিয়া সম্মুখের মাথার লোমগুলি যথাসম্ভব ঝাড়িয়া, তাহার মধ্যে যে-কটা উকুণ ছিল তাহা গলাধঃকরণ করিল। অতঃপর জাঙ্গিয়া, লালটুপি ও ওয়েষ্টকোট সাবধানে পরিধান করিল, একটা টিনের ক্ষুদ্র তলোয়াব দক্ষিণ দিকে ঝুলাইয়া, ইতস্ততঃ তাকাইয়া বোধ হয় আহার্য্যের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রহমান। "জানকীবাবু! এ-সম্বন্ধে ইতিহাস কি বলেন?"

জানকী। "যতই সভ্য হউক না কেন, পুরাতন অভ্যাস ছাড়া বড় শক্ত।"

বানরওয়ালা ডুগডুগি-ধ্বনিসহকারে—"মদারি মিয়া, একবার পিয়া অন্বেষণে বিদেশে যাও।"

বানর বুকে চপেটাঘাত কবিয়া জানাইল যে, প্রিয়ার বিরহে তাহার বুক ভাঙিয়া গিয়াছে। ছাগল, তাহার সময় হইয়াছে দেখিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল যে, ভগবান্ সর্ব্বজীবেব উপর দয়া করেন।

রহমান অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহার ভাব গ্রহণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিল, "হা, দেল্‌জান্! তোর মনে কি—ইহাই ছিল?"

বানরওয়ালা। "মদারি মিয়া! একবার ছাগলের পিঠে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ কর। পূজা মানাও। আমি একবার সারঙ্গি বাজাই।"

সারঙ্গি সহযোগে বানরওয়ালা গাইল—ভীমপলশ্রী রাগিণীতে।—

'পিয়ার বিরহে আমি দেওয়ানা'—ইত্যাদি।

বিরহ ঘনীভূত হওয়াতে টিনের তরোয়ালখানা গলায় বসাইয়া আত্মহত্যার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে, প্রভু সেখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "বৎস মদারি! আত্মহত্যা করিও না। অনেক প্রিয়া পাইবে, প্রিয়ার দল আসে যায়।"

রহমান। "আমি এ কথা মানি না। ভালবাসা একবারই হয়, গেলে আর আসে না।"

বানরওয়ালা। "বানর ও মাহুষে অনেক তফাৎ হয় হুজুর! মাহুষের প্রেম পর্দানশীন। বানর গাছে গাছে বেড়ায়, যাহাকে যখন খুসি অবসর মত ভালবাসিতে পারে।"

টোঙ্গাওয়ালা। "আমি অনেকবার প্রেমে পড়িবার মত হয়েছিলাম, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম যে, প্রেম যদি চলে, তবে টোঙ্গা চালান দুষ্কর হইয়া পড়িবে এবং টোঙ্গা যদি না চলে, তবে দিনই চলিবে না।"

বানরওয়ালা। "মদারি! বিবাহ করিলে প্রেমিকের কি রকম অবস্থা হয় একবার দেখাইয়া দাও ত বেটা!"

বানর এক লম্ফে ছাগলের পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া টোঙ্গার নীচে কাঁটা ও চামচ লইয়া চলিয়া গেল এবং সেখানে গিয়া দেখাইল কি করিয়া স্বামী হোটেলে পয়সা খরচ করিয়া খায়, এবং অবশেষে মদিরা পান করিয়া খানায় পড়িয়া যায়।

বানরওয়ালা। "যদি বিবাহ না করে তবে কি রকম অবস্থা হয় বেটা?"

বানর সেখানে চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া গেল ও হাত পা ছুঁড়িয়া আকাশের দিকে তাকাইতে লাগিল।

টোঙ্গাওয়ালা। "অনেকটা বটে।"

রহমান। "হা দেল্‌জান্‌! তোর মনে কি এই ছিল?"

জানকী। "খাঁ সাহেব! আর দুঃখ করিবেন না। আপনার দুঃখ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আজ এইখানে আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করুন। যত খরচ লাগে আমি দিব।"

'বিবাহ কবাটা দিল্লীর লাড্ডু। যে খায় সেও পস্তায়, যে না খায় সেও পস্তায়।' এই পুরাতন কথা উচ্চারণ করিয়া ইতিহাসের অধ্যাপক জানকী-বাবু রহমান মিয়ার দোকানটা বানরওয়ালা ও টোঙ্গাওয়ালার সাহায্যে সংস্কার এবং পরিষ্কার করিতে বসিয়া গেলেন।

তখন সন্ধ্যা সমাগত। দিল্লী নগরের আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় হইয়াছে। সরবত্‌ ও গোলাপের ছড়াছড়ি। দোকানে পেস্তা ও বাদামের বর্ফি, ক্ষীরের লাড্ডু ও ডালমুট্‌ ঘিয়ে ভাজা। হোটেলে চপ্‌, কট্‌লেট্‌, চা। দলে দলে দেশী

বিদেশী লোক জমায়েত হইয়া স্থানে স্থানে বসিয়া গিয়াছে ও যাহার যতদূর বিদ্যা—তাহা প্রকাশ করিতেছে।

কিন্তু এ-সব দিকে রহমান মিয়ার লক্ষ্য ছিল না। রহমান কেবল দেল্‌জানের কথা ভাবিতেছিল। দিল্লীর আনন্দ তাহার পক্ষে বিষতুল্য। দেল্‌জান্‌ই তার আনন্দের কাঠি।

কতই স্ত্রীলোক চলিয়া গেল সেই পথ দিয়া, কেহই তাহার দেল্‌জান্‌ নহে।

রহমানের অবস্থা দেখিয়া টোঙ্গাওয়ালা বলিল, "খাঁ সাহেব, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আমার টোঙ্গায় একটু ঘুরিয়া আসিতে পারেন।"

রহমান। "যদি তাই হয়, তবে আমি নিজেই ঘোড়া চালাইব, আমার সঙ্গে কেহ যাবে না।"

টোঙ্গাওয়ালা। "কোন আপত্তি নেই। খুব ঠাণ্ডা ঘোড়া।"

রহমান অতিথিগণের বসিবার বন্দোবস্ত করিয়া টোঙ্গা আরোহণে দিল্লীর এক নির্জ্জন প্রান্তে চলিয়া গেল।

সে স্থান সমাধিভূমি। দিল্লী নগরের অনেক আমীর ওমরাও ও বেগমের দেহ এককালে সেখানে ধূলার সঙ্গে মিশিয়াছিল। খাঁ সাহেব সেখানে নেমাজ পাঠ করিয়া চিন্তামগ্ন হইল। অশ্ব সবুজ ঘাস পাইয়া চরিতে বসিল।

রহমানের মন পরলোকের দিকে ঝুঁকিয়াছিল। পরলোকের কথা কে জানে? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? এই গোরস্থানের নিকটে পরলোকবিদ্‌ মহাপুরুষ কি কেহ আসেন না? ব্যাকুল হইলে কি ভগবান্‌ পরলোকের সন্ধান বলিয়া দেন না?

এইসব কথা ভাবিতে ভাবিতে রহমান্‌ খাঁ একটা কবর হইতে অন্য কবর ক্রমশঃ যাতায়াত করিতে লাগিল।

অশ্ব মনের সুখে রসাল ঘাস চর্ব্বণ করিতেছিল। এইরকম প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, যখন পূর্ণিমার চন্দ্র বৃহৎ বটবৃক্ষের শীর্ষ পার হইতেছিল—তখন রহমান দেখিল যে, একটি ভগ্ন সমাধিস্তূপের পার্শ্বে দুইটি স্ত্রীলোক বসিয়া।

তার মধ্যে একটি বৃদ্ধা ও অন্যটি অল্পবয়স্কা। অল্পবয়স্কা ছিন্নবস্ত্রপরিধৃতা, অবগুণ্ঠনাবৃতা। সে বৃদ্ধার কন্যা। বৃদ্ধা তাহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আর কতক্ষণ গোরস্থানে কাটাইবি মা?"

কন্যা। "আম্মাজান! যখন এই রাস্তা হইয়া যাইতে হইবে, তখন কালের বিচার কেন?"

মাতা। "চল্, একবার তোকে দিল্লী লইয়া যাই। হয়ত তার অনুতাপ হইয়াছে নিশ্চয়।"

কন্যা। (জিহ্বা কাটিয়া) "তা কখন হইতে পারে না মা। যে বলিতে পারে, 'তুমি বাটি হইতে দূর হও', সে নিবাসে আমি কেমন করিয়া আবার যাইব মা? যখন সেখানে স্থান নাই তখন দুনিয়াতে আমার স্থান নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম একদিন যে তার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিলাম, সে অন্ধবিশ্বাস আমার গিয়াছে।"

মা। "তাকে ছাড়িয়া যাইতে মায়া হইবে না?"

কন্যা। "তা হবে না, কেননা আমি তাকে অন্তরে লইয়া যাইব। কিন্তু একটি ঋণ আছে মা। আমাকে সে তিন বৎসর ভরণ-পোষণ করিয়াছিল, আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারি নাই।"

মাতা। "আমার গহনা আছে, তাহা বেচিয়া শোধ করিয়া দিব। এই যে কবর দেখিতেছ, এটা তোমার মাতামহের।"

কন্যা। "তিনি কে ছিলেন?"

মাতা। "দিল্লীর প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি দিল্লীর ভবিষ্যৎ এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ছন্দে গাহিয়া গিয়াছেন।"

কন্যা কবর উদ্দেশ্য করিয়া অভিবাদন করিল।

* * *

সমাধির আড়াল হইতে রহমান ডাকিল, 'দেল্‌জান্'!

* * *

মাতা ও কন্যা উভয়ে ভীত হইয়া দেখিল যে, একজন পুরুষ মূর্চ্ছিতাবস্থায়।

মাতা। "তুমি ওর মাথায় অঞ্চল দিয়া বাতাস কর। আমি জল আনি।"

দেল্‌জানের অঞ্চলের বাতাস ও তাহার হৃদয়োত্থিত দীর্ঘনিশ্বাস রহমানের পার্থিব চৈতন্য পুনঃসঞ্চারিত করিয়াছিল।

রহমান। "জীবনসর্ব্বস্ব, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

* * *

অশ্বপ্রবর আরোহীর দেখিয়া প্রথম প্রহরের সুনিদ্রার উদ্রেকে যত্নবান

হইয়াছিল,। রহমান তাহার স্ত্রী দেল্‌জান্ ও দেল্‌জানের মাতাকে লইয়া দোকানের দিকে টোঙ্গা চালাইয়া দিল।

দোকানে যাহারা প্রতীক্ষা করিতেছিল তাহারা সকলেই অবাক্! দিল্লী সহরের মিষ্টান্ন, চপ ও কট্‌লেটের একত্রিত টুকরিগুলি হাতে করিয়া রহমান কি সত্যই সস্ত্রীক উপস্থিত?

ঠিক তাই। রহমান বলিল, "পিয়া ঘরে এসেছে, তোমরা ভূপালি রাগিণীতে মঙ্গল-গান গাও।"

বানরওয়ালা সারঙ্গি বাঁধিয়া বানরকে বলিল, "মদারি, তোর শুভদিন। অন্ততঃ দশ টাকা তোর অদৃষ্টে নৃত্যশীল।"

টোঙ্গাওয়ালা ঘোড়ার পৃষ্ঠ ঠুকিয়া বলিল, "সাবাস টাট্টু ঘোড়া! তোর প্রপিতামহের প্রপিতামহ দিল্লীর শেষ বাদশা মহম্মদ শাহের আস্তাবলে পেন্সন-ভোগী ছিল, আজ কর্ম্মস্থলে তোর বংশের পরিচয় পাওয়া গেল! অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা তোর প্রাপ্য।"

রহমান। (সাহ্লাদে) "আলবৎ!"

অধ্যাপক জানকীবাবু। "দেখ ভাই রহমান, আমি তোমার মেহ্‌মান্, এখন বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী দেল্‌জান্‌ই পূর্ব্বে রুটি তৈয়ারি করিতেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা দেল্‌জান্-রহমান কোম্পানী হইয়া রুটির জোরে পয়সা রোজগার কর।"

রহমান। "আমার সেলাম লইবেন জানকী বাবু। দেল্‌জান্ আপনাকে দেখিয়াই রুটি তৈয়ারি করিতে বসিয়াছে।"

জানকী। "কি শুভ কথা! কি আনন্দের কথা!"

দস্তরখাঁ পাত'। ভাই ভাই মিলিয়া বসিয়া খাও। কোথাকার ধন-দৌলত? কাহার রুটি কে খায়? দেল্‌জান্! একবার চাহিয়া দেখ। তুমি তোমার প্রিয়তমের ঘরে ফিরিয়াছ, আমাদের আজ কত আনন্দ!

মদারি। তুমি ছাগলের সঙ্গে বসিয়া খাও, ঘোড়াকে খাওয়াও! হে টোঙ্গাওয়ালে! মনের মত প্রিয়া খুঁজিয়া দেখ।

'উত্তরা' : বৈশাখ ১৩৩৩

চাহার দরবেশ

প্রমথ চৌধুরী

বি. এন. আর. যখন প্রথম খোলে, তার কিছুদিন পরেই আমি উক্ত-পথে C. P.-র কোন সহরে যাত্রা করি।

রেলগাড়ী আমি প্রথম দেখি ও তাতে চড়ি পাঁচ বৎসর বয়েসে। যে গাড়ী গরুতে টানে না, ঘোড়ায় টানে না, আপনি চলে—সে গাড়ী দেখে আমি আনন্দে অধীর হইনি।

তারপর রেলগাড়ীতে অসংখ্য বার যাতায়াত করেছি। কিন্তু এই C. P. যাত্রার পথে একটু নতুনত্ব ছিল—সেই কথাই আজ বলব।

কলকাতা থেকে আসানসোল যাই—আর বোধ হয় সেখানেই ই. আই. আর. এর গাড়ী ছেড়ে বি. এন আর.-এর গাড়ীতে চড়ি।

রাত্তিরে কোন হোটেলে এসে ডিনার খেতে পাব—আশা করি। আমি ভোজনবিলাসী নই। চব্বিশ ঘণ্টা উপবাস করলেও আমার নাড়ী ছেড়ে যায় না—এমন কি, পিত্তিও পড়ে না। তাহলেও রাত্তিরে কিছু খাওয়া আমার অভ্যাস ছিল। সেইজন্যই ডিনারের আশায় গাড়ীতে বসেছিলুম।

পুরুলিয়া ছাড়বার ঘণ্টা দুয়েক পর আমি গাড়ীর চালচলন দেখে অবাক হয়ে গেলুম। গরুর গাড়ীর চাইতে সে গাড়ীর চলন কিছু দ্রুত নয়। মধ্যে মধ্যে গাড়ীটা পা টিপে টিপে হেঁটে যেতে আরম্ভ করলে। আমি ছিলুম সেকেণ্ড ক্লাশের যাত্রী—আর আমার সহযাত্রী ছিলেন একটি রেল-কর্মচারী। রেলের এই বিলম্বিত চাল সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন—এ দেশের মাটি Black Cotton Soil বলে রেলের রাস্তা আজও Consolidated হয়নি, তাই সাবধানে যেতে হয়।

গরুর গাড়ী যদি রেলগাড়ীর মত দৌড়ায়, তাহলে তার আরোহীদের ভয় হওয়া স্বাভাবিক। অপরপক্ষে রেলগাড়ী যদি গরুর গাড়ীর মন্দগতিতে চলে, তাহলে সে গাড়ীর আরোহীদেরও মন প্রসন্ন হয় না। আমি এই অচল ট্রেনে বসে বসে ঈষৎ কাতর হয়ে পড়লুম। আমার সহযাত্রীটি ছিলেন নিম্নশ্রেণীর ইংরেজ, কিন্তু কথায় বার্তায় ভদ্র। তিনিও একটি ছোট

স্টেসনে নেমে গেলেন, যেখানে তাঁর বাসস্থানে তাঁর মেম ছিল ও খানাপিনা ছিল।

তারপর সারা রাত্তির গাড়ী খোঁড়াতে খোঁড়াতে, হাঁপাতে হাঁপাতে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে অগ্রসর হতে লাগল। প্রতি ষ্টেশনে এঞ্জিনের দম জিরতে ও একপেট জল খেতে অন্তত আধঘণ্টা লাগল।

পথিমধ্যে খোঁজ করে জানলুম যে, চক্রধরপুরে অন্তত এক পেয়ালা চা পাব।

তার পরদিন সকালে অর্থাৎ বেলা বারোটায় চক্রধরপুর পৌছলুম। কিন্তু সেখানেও এক পেয়ালা চা মিলল না। আমি চা-খোর নই, কিন্তু সকালে এক পেয়ালা চা না পেলে ভীষণ অসোয়াস্তি অনুভব করি।

সে যাই হোক, চক্রধরপুরে দু'টি ভদ্রলোক এসে আমার গাড়ীতে চড়লেন; তার ভিতর একজন যেমন বেঁটে, অন্যটি তেমনি লম্বা। বেঁটে ভদ্রলোকের গায়ে আলপাকার কোট ও জিনের পেণ্টলুন, মাথায় একটি বনাতের গোল-টুপি, হাতে একটি ছোট ব্যাগ। লম্বা ভদ্রলোকের পরণে লংক্লথের চুড়িদার পায়জামা, আজানুলম্বিত গরম কোট আর মাথায় স্বরচিত পাগড়ী। লম্বা লোকটিকে দেখে প্রথমে নজরে পড়ল—তাঁর চোখ। এমন প্রকাণ্ড, এমন হাঁ-করা চোখ মানুষের মুখে ইতিপূর্বে দেখিনি। তারপর মনে হল সে-চোখ আলাপী চোখ—অর্থাৎ কথা কয়। তার পরেই প্রমাণ পেলুম ভদ্রলোক চোখে মুখে কথা কন—আর সে কথার স্রোত আমাদের রেলগাড়ীর চাইতে দ্রুত। তিনি কামরাতে ঢুকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন:

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—কলকাতা।

—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

—রায়পুর।

—মশায়ের নাম?

আমি আমার নাম বললুম। তিনি তা শুনে বললেন—"চৌধুরী" যে কোন্ জাত তা জানা যায় না।

আমি বললুম—ব্রাহ্মণ।

—ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

তারপর বেঁটে ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করলেন :

—মশায়ের নাম ?

—পতিরাম পাঙ্গা।

—কি বললেন ?

—পাঙ্গা।

—আমি শুনেছিলুম পাঙ্গাবী। আপনার পাঞ্জাবীর মত চেহারাও নয়, বেশও নয়। মশায় ব্রাহ্মণ ?

—না।

—বাঁচালেন। তিন ব্রাহ্মণে একত্র যাত্রা করা নিরাপদ নয়। মশায়ের বাড়ী কোথায় ?

—বাঁকুড়া জেলায়।

—কি করা হয় ?

—ডাক্তারী।

—এম. বি. ?

—না, আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

—এই বুনো দেশে ডাক্তারী ব্যবসা চলে ?

—চলে ত যাচ্ছে।

—ওষুধ ত আপনাদের হয় এক ফোঁটা জল, নয় তিলপ্রমাণ বড়ি !

—ওষুধের গুণ কি তার পরিমাণের উপর নির্ভর করে ?

—অবশ্য নয়। সব গুণী লোক ত তালগাছের মত লম্বা হয় না।

—সে যাই হোক, মশায়ের নাম কি, জিজ্ঞেস করতে পারি ?

—সরদার শরকেল।

—বাঙলা ত আপনি আমাদের মতই বলেন।

—তার কারণ, আমিও বাঙালী।

—আমি ভেবেছিলুম বুঝি পাঞ্জাবী, আপনার চেহারা দেখে ও বেশভূষা দেখে, তারপর আপনার নাম শুনে—।

—আমার নাম শ্রীধর সরখেল। খোট্টাদের মুখ থেকে শ্রীধর বেরোয় না, তাই ওরা সরদার বলে, আর সরখেলকে বলে শরকেল—

—আপনার বাড়ী কোথায় ?

—বর্ধমান জেলায়, কুলীনগ্রামে।

—মশায় ব্রাহ্মণ ?

—শুধু ব্রাহ্মণ নয়, একেবারে নৈকষ্য কুলীন। ইচ্ছে করলে ৩৬৫টি বিয়ে করতে পারতুম, আর পুরো বছর ৩৬৫টি শ্বশুরবাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে কাটাতে পারতুম।

—বিয়ে কটি করেছেন ?

—একটিও না। বাঁশবনে ডোম কানা।

—কি করা হয় ?

—কিছুই নয়। আমি এখন ভবঘুরে।

—আগে কি করতেন ?

—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। তাব অর্থ, কি যে করিনি বলা শক্ত।

—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনে।

—বুঝতে পারবেনও না। আমি ছিলুম পণ্টনে।

—সেপাই ?

—না। Camp follower।

—তাদেব কাজ কি ?

—তার কোনও লেখাজোখা নেই। ক্ষেত্রে কাযো বিধীয়তে। কখনও পাচকব্রাহ্মণ, সেপাইদের বিয়ে-শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য, কখনও রসদ কেনা, কখনও খাতা লেখা—ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি শিখ পণ্টন আমাদের গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমাব বয়স চোদ্দ বৎসর। তাদের সঙ্গেই আমি জুটে যাই। আর কুচ করতে করতে লাহোর যাই। তারপর চল্লিশ বৎসর তাদেব সঙ্গে ঘুরে বেডাই। পণ্টনের একটা নেশা আছে, সেই নেশাই আমাকে পেয়ে বসেছিল। এতদিনে সে নেশা ছুটেছে।

—আপনি নেহাৎ ছোকরা বয়সেই পণ্টনে ভর্তি হলেন ?

—আমি ত ছোকরা, Camp follower-দের মধ্যে দেদার স্ত্রীলোক পর্যন্ত থাকে। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি সুন্দরী, তারা কর্ণেল সাহেবদের প্রিয়পাত্রী হয়।

—আপনি এখন বুঝি পেন্সন নিয়েছেন ?

—আমার চাকরির পেন্‌সন নেই। চাকরি থাকতে যা রোজগার করতে পার। আর মাইনে যদিচ নামমাত্র, উপরি পাওনা বে-হিসেবী।

—কি রকম?

—যুদ্ধের সময় লুট, আর শান্তির সময় চুরি। হিন্দুস্থানীতে একটি কথা আছে—সরকারকে মাল, দরিয়ামে ঢাল। এ দরিয়া হচ্ছে army, আর আমরা Camp-follower-রা সেই বে-হিসেবী খরচের ভাগ পাই। আমি এই খাতে দেদার রোজগার করেছি।

—তাই আপনারা পেন্‌সনের তোয়াক্কা রাখেন না।

—এই ছুটো চাকরির আয়ও যেমন, ব্যয়ও তেমনি। আমরা মরণের যাত্রী সব বেপরোয়া। ফলে, এখন আমার বিশেষ কিছু নেই। তাই এ জঙ্গলে এসেছি বুনো রাজাদের ঘাড় ভেঙে কিছু আদায় করতে পারি কিনা দেখতে।

—কি কাজ খুঁজছেন?

—এক ডাক্তারী ছাড়া যে কাজ জোটে তাই করতে পারি। এমন কি গুরুগিরি পর্যন্ত। হিমালয়ে যোগ অভ্যাস করেছি।

চক্রধরপুরেও এক পেয়ালা চা পেলুম না, কিন্তু শ্রীধর বাবুর সত্য-মিথ্যা গল্প শুনে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গিয়েছিলুম। শেষটায় তিনি বললেন, আর তিনচার ঘণ্টা বসে আঙুল চুষুন—ঝাড়সুগড়ায় গিয়ে চা, রুটি, মাখন সব জোগাড় করে দেব। ষ্টেশন মাস্টার আমাদের রেজিমেণ্টে Soldier ছিলেন—আমরা এক সানথির ইয়ার। লোকটা যেমন অসম্ভব লড়িয়ে, তেমনি অসম্ভব ভাল লোক।

বেলা চারটেয় আমার চব্বিশ ঘণ্টার নির্জলা উপবাস শেষ হবে শুনে একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

শ্রীধরবাবু বকেই চললেন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে; আর তাঁর কাছে এদেশের রাজাদের বিষয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। ডাক্তারবাবুর নাকি এই রাজারাজড়াদের মধ্যেই প্র্যাক্‌টিস্ বেশি। কারণ তাঁরা দিনে এক বোতল ব্রাণ্ডি খান—কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ তাঁদের সহ্য হয় না—বেশি কড়া বলে। আর তাঁরা নাকি সব গরু, গাধা ও বোকা পাঁঠা—আর শিকার করেন গেরস্তের ঝি-বউ। আর তাঁদের সহায় রাজমন্ত্রী ও রাজ-পুরোহিত।

বেলা চারটেয় গাড়ী ঝাড়সুগড়া ষ্টেশনে পৌছল, আর শ্রীধরবাবুর আদেশে

তাঁর সঙ্গে আমি প্ল্যাটফরমে নামলুম। তিনি বললেন—আপনি খানাকাম্‌রায় ঢুকুন, আমি ষ্টেশন মাস্টারের সঙ্গে একটা কথা কয়ে আসছি।

খানাকাম্‌রায় ঢুকে আমি তার মাদ্রাজী ম্যানেজারকে চা ও রুটিমাখনের অর্ডার দিলুম। সে বললে—কিছুই নেই, সব বিক্রী হয়ে গেছে।

আমি অগত্যা শ্রীধরবাবু গোরা ষ্টেশন মাস্টারের সঙ্গে যেখানে কথোপকথন করছিলেন, সেইখানে গেলুম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, চা পেলেন? আমি বললুম, না।

শ্রীধরবাবু ষ্টেশন মাস্টারকে পল্টনী ইংরেজীতে আমার দুরবস্থার কথা বললেন। তিনি তখনই শ্রীধরবাবুকে হুকুম দিলেন, শালা মাদ্রাজীকো কান পাকড়কে লে আও।

শ্রীধরবাবু অমনি খানাকাম্‌রায় ঢুকে ম্যানেজারের কান ধরে নিয়ে এলেন। সাহেব হুকুম দিলেন যে, চা বানাও, আর রুটিমাখন বাবুকে দাও।

মাদ্রাজী বললে, নেই হ্যায়।

—সরদারজী! উস্‌কো এক থাপ্পড় লাগাও, আওর আলমারী খোল। শালা চোর হ্যায়।

শেষে সবই পেলুম ও খেলুম।

গাড়ীতে ফেরবার পথে শ্রীধরবাবু বললেন, ষ্টেশন মাস্টারকে জানালুম যে সঙ্গে টিকিট নেই,—গাডকে বলে দেবেন—রাস্তায় কেউ যেন উৎপাত না করে। তিনি বললেন, all right। আর ওই মাদ্রাজীটা এক টাকার জিনিস আপনার কাছে দু'টাকা নেবার ফন্দী করেছিল, এক থাপ্পড়ে বিনা পয়সায় হয়ে গেল। এরি নাম পল্টনী কায়দা।

গাড়ীতে ঢুকেই দেখি, দুটি নতুন ভদ্রলোক বসে আছেন। দুজনেরই পরণে ইংরেজী পোষাক;—একজনের চাঁদনির তৈরী, আর একজনের ব্রিচেস-পরা আর হাঁটু পর্যন্ত পট্টি জড়ান।

শ্রীধরবাবু গাড়ীতে উঠেই জেরা সুরু করলেন। তার ফলে আমরা জানলুম একজনের নাম তারক তলাপাত্র—Timber Merchant। আর যাঁর বেশ ঘোড়সোয়ারের মত, তিনি হচ্ছেন Forest Officer, নাম সুষেণ সেন। তাঁর পৈতৃক উপাধি ছিল দাস, তিনি অনুপ্রাসের খাতিরে "সেন" অঙ্গীকার করেছেন।

তারপর ঘণ্টা তিন চার ধরে শ্রীধরবাবু মজলিস জমিয়ে রাখলেন। এমন অনর্গল বকতে আমি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কখন দেখিনি। তিনি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করেছেন, তাই তিনি নতুন যাত্রীদের ব্যবসার বিষয় সব জানেন। তিনিও কিছুদিন কাঠের ব্যবসা করেছিলেন,—যেখানে হিমালয়ের গায়ে প্রকাণ্ড শালবন আছে, আর তার মধ্যে মধ্যে ছোটখাটো নদী—যার বর্ষাকালে হয় অসম্ভব তোড়। বড় বড় শালগাছ কেটে সেই নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, যেখানে গিয়ে সেই গুঁড়িগুলো ঠেকে, সেখানে সেগুলি জল থেকে তুলে বেচতে হয়। এ ব্যবসায় লাভ খুব বেশি। কিন্তু কোন্‌টা কার গুঁড়ি, এই নিয়ে ঝগড়া হয়—আর এই ঝগড়াঝাঁটিতে লাভ সব খেয়ে যায়। শ্রীধরবাবু বললেন,—তা যদি না হত, তাহলে আমি আজ লক্ষপতি হতুম। একা মানুষ, তাই আমি পয়সার জন্য কেয়ার করতুম না। হিমালয়ের ট্যাঁকে-গোঁজা ছোট-ছোট রাজ্যের রাজারা সব রাজপুত, আর সকলেই আফিংখোর। এদের আদালত আছে, কিন্তু আইন-কানুন নেই। এদের বিচারপ্রার্থী হওয়া ঝক্‌মারি।

তারকবাবু বললেন,—লোকে কাজ কি শুধু স্ত্রীপুত্রের জন্যে করে? আমার স্ত্রীপুত্র নেই। ডাক্তারবাবু বললেন, তাঁরও নেই। ফরেস্ট অফিসার বললেন, তাঁরও নেই।

সহযাত্রীদের কারও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নেই শুনে শ্রীধরবাবু সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হলেন, তা তাঁর বক্তৃতায় বোঝা গেল না। তিনি শুধু বললেন—আপনারা সকলেই দেখছি চিনির বলদ। টাকার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনিও অবিবাহিত, কিন্তু তাঁর যেমন কামিনী নেই, তেমনি কাঞ্চনও নেই। ভূতের ব্যাগার খাটা তাঁর ধাতে নেই। তারপর তিনি গেরস্ত লোকের যে বিবাহ করা উচিত, সে বিষয়ে নানা যুক্তি দেখালেন। তাঁর কথায় কেউ বিশেষ আপত্তি করলেন না। কিন্তু সকলেই আলোচনায় যোগ দিলেন। বিবাহ জিনিসটা এদেশে জন্ম-মৃত্যুর মত নিত্য হয়, এ বিষয়ে যে এত মতভেদ আছে তা জানতুম না। আমি একমনে এই সব তর্ক-বিতর্ক শুনছি, এমন সময়ে বাঁ দিকে একটি বেজায় ফাঁপা ও ফুলো নদী দেখতে পেলুম—তার নাম বোধহয় মহানদী। বর্ষায় তার এই চেহারা, গ্রীষ্মে কিন্তু এ নদীতে কোমর-জল থাকে না। ডাক্তারবাবু বললেন যে, রাতভর হয়ত তীরে বসে ঢেউ গুণতে হবে। আমি

জিজ্ঞাসা করলুম, কেন ? তিনি উত্তর করলেন—এ রেলগাড়ী গরুর গাড়ী হতে পারে, কিন্তু জাহাজ নয়। আর ঘোড়া পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তারা সিন্ধু-ঘোটক নয়।

ডাক্তারবাবু যা বলেছিলেন, তাই ঘটল। রাত্তির প্রায় সাড়ে আটটায় রায়গড় ষ্টেশনে পৌঁছে শুনলুম যে, সে রাত্তির আর গাড়ি এগোবে না। এর পরের রাস্তা বানের জলে ডুবেছে ও সম্ভবত বিপর্যস্ত হয়েছে। রাস্তা যদি কোথাও বে-মেরামত হয়ে থাকে, আজ রাত্তিরেই তা মেরামত হয়ে যাবে। অগত্যা আমরা কি করে রাত কাটাব, সেই ভাবনাতে অস্থির হয়ে পড়লুম।

ষ্টেশন মাস্টার ত্রিলোচন চক্রবর্তী বললেন,—আমি দু' একখানা বেঞ্চি জোগাড় করে দিচ্ছি, তাতেই পালা করে রাত কাটাতে পারবেন। অবশ্য আপনাদের কষ্ট হবে! কিন্তু উপায় নেই।

শ্রীধরবাবু বললেন যে,—যাত্রা শুনেও ত সারারাত জেগে কাটান যায়। এ যাত্রা আমরা বকে ও গল্প করে রাত কাবার করে দেব। কি বলেন বনবিহারী বাবু ?

ফরেস্ট অফিসার বললেন—তার আর সন্দেহ কি ?

তারপর শ্রীধরবাবু ষ্টেসনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—খাবার কিছু পাওয়া যায় ?

ষ্টেশনবাবু বললেন—দেদার ভুট্টা।

—তাই আনিয়ে দিন।

ডাক্তারবাবু বললেন—পোড়াবে কে ?

ফরেস্টবাবু বললেন—আমার চাকর গোপাল।

ভুট্টা এল। পোড়ান হল। শ্রীধরবাবু বললেন—এক বোতল "রম্" থাকলে ভুট্টার চাটের সঙ্গে খাওয়া যেত।

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন—আপনি "রম্" খান নাকি ?

—আমি পল্টনে চাকরি করতুম, মদ-মাংস খেয়েই মানুষ। পল্টনে কেউ হবিষ্যি করে না। বিলিতি সভ্যতা পঞ্চ-'ম'কারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

—তা যেন হল। কিন্তু 'রম্' ত অতি খারাপ জিনিস ?

ফরেস্টবাবু বললেন—গোপালের কাছে দু'এক বোতল হুইস্‌কি আছে।

শ্রীধরবাবু বললেন—ব্যোম ভোলানাথ !

গোপাল এক বোতল হুইস্‌কির ছিপি খুললে।

ফরেস্টবাবু বললেন—থাকি একা বন-জঙ্গলে, বাঘভালুকের মধ্যে। বিদ্যের মধ্যে শিখেছি এই হুইস্‌কি খাওয়া।

ডাক্তারবাবু বললেন যে, তিনি হোমিওপ্যাথিক নিয়মে, অর্থাৎ dilute করে খেতে পারেন।

তারকবাবু বললেন, তিনি dilute না করেই গলাধঃকরণ করবেন। কেননা মদ সকলের হাতে খাওয়া যায়, কিন্তু জল নয়।

আমিই একা নির্জলা উপবাস করলুম।

অতঃপর আমার সহযাত্রীরা ধীরে-সুস্থে হুইস্‌কি পান করতে আর মধ্যে মধ্যে ভুট্টা চিবতে লাগলেন।

শ্রীধরবাবু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারেন না। তিনি হঠাৎ প্রস্তাব করলেন যে, আমরা সকলেই অবিবাহিত, অবশ্য বিভিন্ন কারণে। কেন আমরা গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিনি, তারই ইতিহাস বলা যাক। আমার নিজের কথাই প্রথমে বলছি ঃ

আমি যে বিবাহ করিনি, তাতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। চল্লিশ বৎসর নানা পল্টনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। মধ্যে মধ্যে বেশ পয়সাও রোজগার করি। কিন্তু সে রোজগার অনিশ্চিত। তাই বহু স্ত্রীলোক দেখেছি, কিন্তু তাদের কাউকেও বিয়ে করবার কথা কখনও মনে হয়নি। পল্টনে অবশ্য বিয়ে হয়, কিন্তু সে বিয়ে নিকে ও ঠিকে মাত্র। ও একরকম গান্ধর্ব বিবাহ, যার ভিতর জাতবিচার নেই, দেনাপাওনা নেই। এমন কি সৈনিকের দৈনিক বিবাহও চলে।

আমি কুলীনের ছেলে, বহুবিবাহে আমার আপত্তি নেই। আমরা বিবাহ করি কুলীন-কন্যাদের কুল রক্ষা করবার জন্য, কিন্তু তাতে তাদের শীল রক্ষা হয় না। আমরা বিবাহ করেই খালাস—তারাও তাই। আমাদের ওই শ্রেণীর স্ত্রীদের বিশেষরূপে বহন করতে হয় না। তারা luggage নয়। আর luggage ঘাড়ে করে পল্টনের Camp-follower হওয়া যায় না। এখন বুঝলেন, আমি কিসের জন্য চিরকুমার। বয়স যখন পঞ্চাশ পেরল, তখন আমি পল্টন থেকে আল্‌গা হলুম। কিছু টাকা হাতে করে দেশে ফিরিনি, হিমালয়েই থেকেগেলুম—কখনও ডালহৌসী ও কখনও শিমলায়।

এই সময় আমার এক ভাইপো আমার এক বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠালেন। আমি উত্তরে তাঁকে লিখলুম—গতা বহুতরা কান্তা, স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্বরী।—এই ত শুনলেন আমার ইতিহাস! চৌধুরী মশায়, আপনি অবশ্য এখনও বিয়ে করেন নি। আপনি কলেজের ছোকরা। আমার পরামর্শ শোনেন ত বাড়ী ফিরে গিয়েই বিয়ে করুন।

এর পর ডাক্তারবাবু তাঁর আত্মজীবনচরিত বলতে শুরু করলেন:

আমার বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়। আমি ব্রাহ্মণ নই; যদি হতুম ত পাচক ব্রাহ্মণ হতুম। আমাদের পারিবারিক ব্যবসা ডাক্তারি। অ্যালোপ্যাথি নয়, হোমিওপ্যাথি নয়—হাতুড়েপ্যাথি। আজকাল হাতুড়েপ্যাথির ব্যবসা চলে না। তাই কাকার পরামর্শে হোমিওপ্যাথির একখানা বাঙলা বই মুখস্থ করে ডাক্তারি স্থরু করলুম। প্রথমে গাঁয়ে। আমাদের একটা বদনাম আছে, আমরা নাকি হামবড়ামি করি। Bailyর ভাই Kelly যে রোগ সারাতে পারে না, আমরা নাকি এক ফোঁটা ওষুধে তা সারাই। কিন্তু আমরা নিজের বিদ্যের বড়াই করিনে, আমাদের ওষুধের গুণগান করি।

আমি ব্যবসা স্থরু করলুম। আমারি কাকা আমার বিয়ে স্থির করলেন একজন মোক্তারের মেয়ের সঙ্গে। মেয়ে দেখে আমি ভড়্কে গেলুম। কাকা কিন্তু নাছোড়বান্দা—টাকাটা সিকেটার লোভে। মেয়ের হল ওলাউঠো—আমি বললুম, আমি এক বড়িতে সারিয়ে দেব। আমিও বড়ি খাওয়ালুম, সেও মারা গেল।

মোক্তারবাবু বললেন যে, আমি বিষবড়ি খাইয়ে তাকে মেরেছি। এর পর গাঁয়ের লোক রটালে যে, আমি খুনে ডাক্তার। বেগতিক দেখে আমি দেশ থেকে পলায়ন করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলুম। সেই অবধি এই বুনো দেশে আমাদের ছোট-ছোট সাদা বড়ি দিয়ে চিকিৎসা করছি, আর তাতেই খোরপোষ চলে যাচ্ছে। যে যাই বলুন, ঐ নিরীহ বড়ির তুল্য ওষুধ আর নেই।

এক গুলি হোমিওপ্যাথিক ওষুধে যে লোক মারা যায়—এ কথা শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেলেন। একমাত্র শ্রীধরবাবু বললেন যে, তিনি এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ওষুধ গিলতে প্রস্তুত।

তারপর তারকবাবু বললেন:

এখন আমার কথা শুনুন। আমার দাদা রেলওয়েতে চাকরি করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পরমাসুন্দরী। তিনি একদিন হঠাৎ heart-failure-এ মারা গেলেন—কিন্তু দাদাকে ছেড়ে গেলেন না। যখন তখন দাদার সুমুখে এসে উপস্থিত হতেন, কিন্তু কোনও কথা কইতেন না। দাদা তাঁর স্ত্রীর প্রেতাত্মার উৎপাতে প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন, আর আমাদের সকলকেই প্রায় পাগল করে তুললেন। আমরা গয়ায় প্রেতশিলায় বৌদিদির শ্রাদ্ধ করলুম। কিন্তু পারলৌকিক বৌদিদি দাদাকে ছাড়লেন না। এমন কি, দাদা ট্রেণে যাচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর স্ত্রী এসে তাঁর কাছে আবির্ভূত হলেন। তিনি অমনি ভয়ে চীৎকার-করতে সুরু করলেন। শেষটায় তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন, এবং দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদিন পরে তিনিও মারা গেলেন। আমি তাঁর সঙ্গেই ঘুরতুম, কিন্তু কখনও তাঁর স্ত্রীর ছায়া দেখিনি। দেখেছি, শুধু দাদার অসাধারণ কষ্ট। ডাক্তাররা বলল যে, দাদার যা হয়েছে তা mental disease। যদি তাই হয় ত mental disease যে কি ভয়ঙ্কর বস্তু, তা বলা যায় না। এই ব্যাপারে আমার মনে যে ধাক্কা লেগেছিল, তাতে বিয়ের নাম শুনলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সেই ধাক্কায় আমি চিরকুমার।

শ্রীধরবাবু বললেন: "monogamyতে এই বিপদ; বহুবিবাহের বিপদ নেই। আপনারা বুঝি কুলীন নন, তাতেই আপনার দাদা এই ঘোর বিপদে পড়েছিলেন। অন্য কেউ রা কাড়লেন না।

শেষটায় বনবিহারীবাবু বললেন:

আমার বিয়ে না করবার কারণ আরও অদ্ভুত। আমার বাবা ছিলেন একজন বড় ফরেস্ট অফিসার; তিনি সাহেবদের বলে কয়ে আমাকে এ চাকরিতে বাহাল করেন। আমি ছিলুম Rangaroon ফরেস্টের অফিসার। ঐ প্রকাণ্ড বনের ভিতর একটা ছোট্ট ইনস্পেকশন বাংলো আছে। মধ্যে মধ্যে আমাকে সেখানে গিয়ে দু'তিন রাত কাটাতে হত। সে বাঙলোর খবরদারি করত একটি বৃদ্ধ নেপালী, আর তার সঙ্গে থাকত তার একটি নাতনী। অমন সুন্দরী মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি। রং ফরসা, আর নাক চোখ বাঙালীর মত। আমার তখন যাকে বলে প্রথম যৌবন। তাই আমি সেই মেয়েটিকে বিবাহ করব স্থির করলুম। তারপর শুনলুম যে, সে পূর্ব অফিসার দাস সাহেবের মেয়ে। দাস সাহেব হচ্ছেন আমার পিতা। এ কথা শুনে

আমি গভর্ণমেণ্টের চাকরি ইস্তফা দিয়ে চলে আসি। তারপর এ অঞ্চলের একটি রাজার ফরেস্ট অফিসার হয়েছি। এর পর থেকে বিয়ের নাম শুনলে আমার গা পাক দিয়ে ওঠে।

চার চিরকুমারের চারটি গল্প শুনে শ্রীধরবাবু বললেন—এখানে যদি কোনও লেখক থাকত ত এই চারটি গল্প লিখলে একখানি নতুন চাহার দরবেশ হত।

ডাক্তারবাবু বললেন যে, আমরা ত দরবেশ নই!

শ্রীধরবাবু উত্তর করলেন—যে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে, সে-ই দরবেশ। আমার ও দুই নেই। আপনারা অবশ্য এখনও কাঞ্চন ছাড়েননি। ও শুধু ভূতের ব্যাগার খাটা। শুনতে পাই যে শাস্ত্রে বলে, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। যার গৃহিণী নেই, তার গৃহও নেই। আর যে গৃহহীন, সেই ত দরবেশ।

গল্প-সংগ্রহ

দেবতার ভর

দীনেন্দ্রকুমার রায়

দেওয়ানগঞ্জের জমিদার ভবকিঙ্কর চৌধুরী কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্যকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পৈতৃক জমিদারির আয় দ্বিগুণ বর্ধিত করিয়াছিলেন, এ জন্য দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলের জনসাধারণের ধারণা হইয়াছিল, যদি কিঞ্চিৎ 'গোব্যরস' কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্যের পেটে পড়িত, অর্থাৎ ইংরাজি বিদ্যায় তাঁহার একটু দখল থাকিত, তাহা হইলে তিনি সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান স্বর্গীয় কার্তিকেয়চন্দ্র রায় বা রাজীবলোচন রায় অপেক্ষাও অধিক খ্যাতি অর্জন করিতে পারিতেন; এমন কি, তাঁহার জমিদারকে ডিঙাইয়া সেকাল-দুর্লভ "রায় বাহাদুর" খেতাবও লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি মনিবের ও সেই সঙ্গে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রজাপীড়নের এরূপ নূতন নূতন কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শাসন ও শোষণ-দক্ষতার পরিচয় পাইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহার মনিবকে "জুলুমবাজ" জমিদার নামে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এবং জেলার

ম্যাজিস্ট্রেট খুশি হইয়া তাঁহাকে "স্পেশাল কনষ্টবলে"র পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনিবের আয়বৃদ্ধির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিলেও স্বকীয় স্বার্থের প্রতিও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং এইজন্যই একশত টাকা মূল্যের দেওয়ান হইয়াও তিনি বার্ষিক ছয়হাজার টাকা মুনাফার ভূ-সম্পত্তি অর্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। "বিদ্যাসাগর" বলিলে যেমন দয়ার সাগর, "কাঙাল-বিধবাবন্ধু অনাথের গতি" প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বুঝাইত, সেইরূপ "দেওয়ান" বলিলে এ অঞ্চলে কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্যকেই বুঝাইত। তাঁহার বাসগ্রাম গোবিন্দপুরে এখনও তাঁহার বাসভবন "দেওয়ানবাড়ি", তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অধুনা জীর্ণ ও বিবর্ণ ভগ্নচক্র কাঠের রথ "দেওয়ানের রথ", তাঁহার সুবিস্তীর্ণ আম-কাঁঠালের বাগান "দেওয়ানের বাগান" এবং তাঁহার গৃহবিগ্রহ 'রাধামাধব' "দেওয়ানের ঠাকুর" নামে পরিচিত হইয়া অর্ধশতাব্দী পরেও গ্রামবাসিগণের নিকট তাঁহার ঐশ্বর্য ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কথিত আছে, কৃষ্ণনাথ দেওয়ান ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া একবার একজন নিষ্ঠাবান্ পরমধার্মিক ব্রাহ্মণ প্রজাকে তাঁহার দেবার্চনার সময়, পূজা সমাধা করিবার অবসর না দিয়াই এক জন পাইক পাঠাইয়া গলায় গামছা দিয়া জমিদারি কাছারিতে হাজির করিয়াছিলেন; ইহাতে অপমানিত মর্মাহত ব্রাহ্মণ উপবীত স্পর্শ করিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, "তুমি নির্বংশ হও, দুশ্চিকিৎস্য রোগে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, তিল তিল করিয়া যেন তোমার প্রাণবিয়োগ হয়।"

ব্রাহ্মণের এই অভিসম্পাত সফল হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র, কন্যা, জামাতা দৌহিত্রাদি সকলের মৃত্যুর পর দুশ্চিকিৎস্য রোগে দীর্ঘকাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি "সাধনোচিতধামে" প্রস্থান করিয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দেওয়ানজী জীবিত অবস্থায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা দেওয়ান-পত্নী যে কয়েকটি বালককে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদেরও কেহই জীবিত রহিল না! দেওয়ানজী মৃত্যুর পূর্বে পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বগৃহে রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি রাধামাধবের নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছিলেন। গ্রামের দুষ্ট লোকরা বলিয়া থাকে, ইহাও দেওয়ানজীর একটি "চাল!" তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি কেহ ফাঁকি দিয়া লইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা।

২

দেওয়ানজীর মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য সহধর্মিণী শ্যামাসুন্দরী রাধামাধবের সেবাইতরূপে জমিদারি পরিচালিত করিতে লাগিলেন। শ্যামাসুন্দরীর বয়স এখন আশি বৎসর। বপুখানি এরূপ স্থূল যে, তিনটি পরিচারিকার সহায়তা ব্যতীত তিনি নড়িয়া বসিতে পারেন না। তিনি বিশ্বাস করেন, পূর্বজন্মে তিনি অহল্যা বাঈ বা মীরা বাঈ ছিলেন, শাপভ্রষ্ট হইয়া বাঙালীর ঘরে তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। ২০ বৎসর পূর্বে ছানি পড়িয়া তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল, আর একটি চক্ষুতেও বার্ধক্যজনিত দৃষ্টিক্ষীণতা বশতঃ তিনি প্রায় কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহাকে সম্পূর্ণ অন্ধ করিতে পারিলে উপার্জনের পথ প্রশস্ত হইবে বুঝিয়া তাঁহার নায়েব জহরলাল নাগের পরামর্শে তাহার অনুগৃহীতা ও তাঁহার পেয়ারের পরিচারিকা খুদী ঘোষানী প্রত্যহ রাত্রিতে তাঁহার নিষ্প্রভ চক্ষুতে এক প্রকার আরক দুই এক ফোঁটা ঢালিয়া দিয়া পাখার বাতাসে তাঁহার সন্তাপ হরণের চেষ্টা করে। সুতরাং তাঁহার নিঃশেষিতপ্রায় দৃষ্টিশক্তির পরমায়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার দিব্যদৃষ্টি ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইতেছে। রাম, শিব, লক্ষ্মী, কালী এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া প্রতি মঙ্গলবারে রাত্রিকালে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, এবং তাঁহার নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবারণ করেন! ইহার ইতিহাস পরে বলিতেছি।

দেওয়ানজীর মৃত্যুর পর শ্যামাসুন্দরী স্বয়ং জমিদারির পরিচালনাভার গ্রহণ করিলেও তাঁহার স্বামীর আমলের নায়েব হারাধন চাটুয্যেকে পদচ্যুত করেন নাই, কিন্তু হারাধনের কর্তৃত্বে গোমস্তা পদা গাঁড়াল ও মুহুরী অনন্ত অধিকারীর উপরি আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় তাহারা হারাধনের বিরুদ্ধে এরূপ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল যে, কিছুদিনের মধ্যেই তাহার অন্ন উঠিল। হারাধনকে বরখাস্ত করিয়া পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারীর উপর আদেশ জারি হইল,—তাহাদিগকে অবিলম্বে একটি সুদক্ষ বিশ্বাসী এবং দুর্দান্ত প্রজাদের শাসনে রাখিতে পারে, এরূপ নায়েব সংগ্রহ করিয়া হুজুরে হাজির করিয়া দিতে হইবে।

অন্যান্য জমিদারের তহশীলদারী, গোমস্তাগিরি বা আমিনী করিয়া জমিদারি কার্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, এরূপ অনেক লোক এই "লুঠের"

মহালটির প্রতি লুব্ধদৃষ্টিপাত করিলেও তাহাদের কেহই এই কুড়ি টাকার নায়েবী পদের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না; কারণ, গোমস্তা পদা গাঁড়াল ও মুহুরী অনন্ত অধিকারী বুঝিতে পারিল—তাহাদের কাহাকেও এই পদে নিযুক্ত করিলে উপরিলাভের পথ রুদ্ধ হইবে; তাহারা গাছেরও পাড়িবে, তলারও কুড়াইবে, কেবল আমড়ার আঁটিগুলি গোমস্তা ও মুহুরীর জন্য রাখিয়া দিবে! এ অবস্থায় গোমস্তা ও মুহুরীর সহিত "কাঁধে মেলে" এরূপ লোকের অনুসন্ধানে তাহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইল।

জহরলাল বহুদিন পুলিসে চাকরি করিয়াছিল; সে ফরিদসিংহ জিলায় পুলিসের হেড্ কনেষ্টবলের পদে নিযুক্ত ছিল, সেই সময় উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে তাহাকে চাকুরি হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। পুলিসের অনেক কর্মচারীই এই কার্যটি করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের চাকরি যায় না; কিন্তু জহরলালের অপরাধ কিছু গুরুতর। সে পুলিস "সাহেবের" বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। পুলিস "সাহেবের" জন্য মুরগী ও মুরগীর ডিম সংগ্রহ করিয়া ইন্স্পেক্টরের নিকটে সে তাহার মূল্যের "বিল" দিয়াছিল; সুতরাং জিলা-পুলিসের ধারণা হইয়াছিল, লোকটি অকর্মণ্য। এই ঘটনার কিছু দিন পরে তাহার বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত হয়; এই জন্যই তাহার চাকরি খসিতে বিলম্ব হয় নাই।

জহরলাল গোবিন্দপুরে আসিয়া চাকরির উমেদারিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু খুদী ঘোষানীর প্রতিবেশীরা প্রায় প্রতিদিনই প্রত্যুষে তাহাকে খুদীর ঘর হইতে বাহির হইতে দেখিত। খুদী দেওয়ান-গিন্নীর "ন্যাড়া" মাথায় তৈলমর্দন করিতে করিতে জহরলালকে নায়েবী দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিতে লাগিল। জহরলালও দুই এক দিন পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারীকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিল; তাহারা জহরলালের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিল, জহরলালই দেওয়ানজীর "ইষ্টেটে" নায়েবী করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। একে খুদী চাকরাণীর সুপারিশ, তাহার উপর পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারী যখন দেওয়ান-গিন্নীকে বলিল, জহরলাল পুলিসের ফেরতা লোক, "দারোগা-গিরী" করিয়া বিস্তর আসামীকে জেলে পুরিয়াছে, সে দুর্দান্ত প্রজাদের উপযুক্ত মুগুর হইবে; বিশেষতঃ কর্ত্রী ঠাকুরাণীর মতো তাহারও একটি চক্ষু নাই; সুতরাং সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র; তাহাকে নায়েবী পদে নিযুক্ত করিলে

"ইষ্টাটের" কাজ সুন্দররূপে চলিবে এবং জমিদারির উন্নতি হইবে, দেওয়ান-গিন্নী তখন তাঁহার দরবারে জহরলালকে হাজির করিতে আদেশ করিলেন।

জহরলাল পরদিন অপরাহ্ণে ফোঁটা-তিলক কাটিয়া, গলায় তিনকণ্ঠী তুলসীর মালা জড়াইয়া, নামাবলী দ্বারা সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, একজোড়া খড়ম পায়ে দিয়া পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারীর সঙ্গে দেওয়ান-গিন্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে দেখিল, দেওয়ান-গিন্নী একটি পাকা হেঁড়ে তাল দ্বারা আবৃত জলের জালার মতো সুগুরু দেহভারখানি সুপ্রশস্ত জলচৌকির উপর সংস্থাপিত করিয়া মালা জপ করিতেছেন। তাঁহার উভয় প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা বলয়াকারে সংরক্ষিত, বাহুমূলে রুদ্রাক্ষের তাগা, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ-খচিত স্বর্ণহার, পরিধানে লোহিত গরদ।

জহরলাল দেওয়ান-গিন্নীর পদপ্রান্তে লম্বা হইয়া পড়িয়া জলচৌকির সম্মুখে পাঁচটাকা প্রণামী দিল এবং গদগদকণ্ঠে বলিল, "কি রূপ দেখালে মা। না জানি, কোন্ পুণ্যে তোমার শ্রীচরণদর্শন ঘটলো! মা, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি শাপভ্রষ্টা, 'কাশীতে অন্নদা তুমি, কৈলাশে ভবানী।' মা অন্নপূর্ণা! এই অধম সন্তানের অন্নকষ্ট নিবারণ কর। যে ক' দিন বাঁচি, যেন তোমার 'ছিরিচরণে'র ছায়ায় বঞ্চিত না হই।"—তাহার কানা চক্ষু হইতে অশ্রুরাশি বিগলিত হইয়া সিমেণ্টের মেঝের উপর লবণাম্বুর স্রোত বহিল!

পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারী কিছু দূরে দাঁড়াইয়া একচক্ষু জহরলালের অভিনয়-পারিপাট্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। পদা অনন্তকে বলিল, "দাদাঠাকুর, লাগ মোশায় আমাদের চেয়েও সরেশ যাবে বোধ হচ্ছে! উনি পূর্বে চাকরি করবার সময় কি কোনো সখের যাত্রা-দলে 'এ্যাক্টো' করত?"

অনন্ত বলিল, "পুলিস-ফেরতা লোক! কিছু দিন এ সরকারে চাকরি করলে ঠিক গিন্নীর হাতে খোলা দিতে পারবে। শেষে আমাদের রুটি মারা না যায়!"

পদা বলিল, "না সে ভয় নেই। কলকাঠি আমাদের হাতেই আছে; দেখে নেবেন, দাদাঠাকুর!"

দেওয়ান-গিন্নী জহরলালের যোগ্যতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া, হাতের ঝুলিটি ললাটস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ওঠো, বাবা! তুমি একচক্ষু দিয়ে দেখে আমাকে যতখানি চিন্‌তে পেরেছ, এ সংসারের লোক দুই চক্ষুতে দেখেও তা

পারে নি, তুমি আমার জমিদারি রক্ষে করতে পারবে। তোমাকেই নায়েবীতে বহাল করা গেল।"

৩

সেই দিনই জহরলাল নাগ দেওয়ানজীর জমিদারি সেরেস্তায় নায়েবের পদে নিযুক্ত হইল। সে অল্পদিনেই দেওয়ান-গিন্নীর মহালের সুবন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। রথ, ঝুলন, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, কার্তিকপূজা, রাস প্রভৃতি পার্বণগুলি বেশ সমারোহেই সুসম্পন্ন হইতে লাগিল। বিদ্রোহী প্রজারাও তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল।

কিছু দিন পরে দেওয়ান-গিন্নী নায়েবকে বলিলেন, "দেখ বাবা, কাল রাত্তিরে রাধামাধব স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়ে বড়ো রাগ করছিলেন। তিনি বললেন, 'বেটী, তুই আমার জমিদারি ভোগ করছিস, আর আমাকে একখান পচা ঘরে ফেলে রেখেছিস! তোর লজ্জা হয় না? তিন মাসের মধ্যে মন্দির গড়িয়ে দে, আমি মন্দিরে বাস করব।' তুমি বাবা রাজমিস্ত্রী ডাকিয়ে বাইরের উঠোনে আমার রাধামাধবের মন্দির তৈয়েরী করিয়ে দাও।"

নায়েব মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তাই ত মা! মন্দির গড়তে যে বিস্তর ইটের দরকার; সে দিন মহামায়ার পূজোয় মবলগ টাকা খরচ করতে হয়েছে, তবিলে টাকা নেই, ইটের জোগাড় করি কি দিয়ে?"

দেওয়ান-গিন্নী বলিলেন, "ধার-কর্জ ক'রে কাজ আরম্ভ কর, পরে কোনো রকমে দেনা শোধ ক'রো। রাধামাধবের হুকুম ত আর অমান্যি করা যায় না।"

নায়েব বলিল, "বেশ তাই করা যাক। রাধামাধবের হুকুম, তাঁর দেনা তিনিই শোধ করবেন।"

গ্রামের একজন জমিদার—ভজহরি ঘোষাল একটি বৈঠকখানা নির্মাণের জন্য লাখখানেক ইট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি সেই সংকল্প ত্যাগ করেন। ইটের পাঁজা অব্যবহার্য অবস্থায় দীর্ঘকাল পড়িয়া ছিল এবং তাহার উপর কতকগুলো লাল ভেরেণ্ডা ও কালকাসিন্দে গাছ জন্মিয়া একদল শৃগালকে আশ্রয় দান করিতেছিল। রাধামাধবের মন্দিরের জন্য এই ইট ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইল। ধর্মপ্রাণ জমিদার বিনা লাভেই রাধামাধবের

জন্য ইষ্টক বিক্রয়ে সম্মত হইলেন। দেওয়ান-গিন্নীর বাড়িতে প্রত্যহ তিন গাড়ি ও নায়েবের বাড়িতে পাঁচ গাড়ি ইট পড়িতে লাগিল। নায়েব খড়ের বাড়িতে বাস করিত, এত দিন পরে রাধামাধব তাহাকে ইষ্টকালয় নির্মাণের সুযোগ দান করিলেন। মন্দির-নির্মাণ-খরচের খাতায় উভয় স্থানের ইট জমা হইতে লাগিল। পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারী বখরায় বঞ্চিত হইয়া নায়েবের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করিতেই নায়েব তাহাদিগকে বলিল, "একটা গোলমাল বাধিয়ে দেবতার কাজটি নষ্ট ক'রো না, ভাই; ইটগুলা 'পড়তা-দরে' আট টাকা হাজার পাওয়া গিয়াছে, এখন ইটের বাজার-দর বারো টাকা। বাজার দরেই জমাখরচ করবে, হাজার-করা ঐ চার টাকা তোমরা বখরা করে নিও।" সুতরাং গৃহ-বিচ্ছেদের আর কোনো কারণ রহিল না।

রাধামাধবের মন্দির-নির্মাণ এবং নায়েবের গৃহ-নির্মাণ একসঙ্গেই আরম্ভ হইল। কিন্তু দ্বার, জানালা, কড়ি-বরগা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নায়েব কিঞ্চিৎ বিপন্ন হইল, তবে রাধামাধবের অনুগ্রহে তাহার অগাধ বিশ্বাস, সে হতাশ হইল না। অবশেষে সুযোগ বুঝিয়া একদিন সে কর্ত্রীকে "যুড়ি দুই পাণি" নিবেদন করিল, "রাধামাধবের কৃপায় মাথা রাখবার জন্যে একখান ছোটোখাটো ইমারৎ আরম্ভ করেছি, কিন্তু দুয়োর-জানালার অভাবে ঘরখানা শেষ করতে পারছিনে। সে দিন কাঁঠালবাগানের জঙ্গল কাটাতে গিয়ে দেখলাম, গোটা দুতিন কাঁঠালগাছ শুকিয়ে গিয়েছে, আপনার হুকুম পেলে সেই গাছ ক'টা কাটিয়ে খানকতক দুয়োর-জানালা বরগা-টরগা করি। এ জন্যে যদি কিছু প্রণামী দিতে হয়, তাতেও রাজি আছি। দেবতার জিনিস, 'মাঙনা' নেওয়া উচিত হবে না, আর তা'তে পাঁচজন দশ কথা বল্‌তেও পারে কি না!"

দেওয়ান-গিন্নী বলিলেন, "বেশ তো শুক্‌নো কাঁঠালগাছ ক'টা কাটিয়ে নাও; রাধামাধবের ভোগের জন্য পাঁচটা টাকা দিও, তাহ'লেই দোষটুকু কেটে যাবে।"

দুই সপ্তাহের মধ্যে নায়েবের বাড়ির আঙিনায় ছয় সাত হাত বেড়ের পাঁচটি কাঁঠালের গুঁড়ি আসিয়া পড়িল। তাহার আগাগোড়া কাঁচা সোনার মতো সার। গোকুল মিস্ত্রী (ছুতোর) সেই কাঠ দেখিয়া অতি কষ্টে লালা

সংবরণ করিয়া বলিল, "নায়েব মোশাই, দেওয়ানজীর বাগান থেকে কি জবর জবর হেতেরই কাটিয়ছ! এক একটা গুঁড়ি আমি তিন কুড়ি টাকায় কিনতে পারি।" নায়েব মোটা মোটা ডালগুলি চৌকাঠ-বরগার জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট কাঠ জ্বালানি কাঠের দরে তুষ্টু সেখকে ষাট টাকায় বিক্রয় করিল। তুষ্টু জ্বালানি কাঠের গাড়ি গ্রামস্থ গৃহস্থগণের নিকট আড়াই টাকা হার মূল্যে বিক্রয় করিয়া নায়েবকে ষাট টাকা দিল ও স্বয়ং ত্রিশটাকা লাভ করিল। রাধামাধব নায়েবের কপাট, চৌকাঠ, কড়ি-বরগার কাঠ জোগাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, করাতী ও ছুতোর মিস্ত্রীর খরচ পর্যন্ত সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

কিন্তু ভজহরি ঘোষালের ইট কিনিয়া দেওয়ান-গিন্নী বিপন্ন হইয়া উঠিলেন। ভজহরি পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়া টাকা আদায় করিতে পারিলেন না; তখন দেওয়ান-গিন্নীকে তিনি উকিলের চিঠি দিলেন।

নিরুপায় হইয়া নায়েব জহরলাল ভজহরি ঘোষালের সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু নগদ টাকার কোনো ব্যবস্থা করিতে পারিল না। দেওয়ানজী বহু দিন পূর্বে চারি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে গ্রামের বাহিরে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। দেওয়ানজী এই পুষ্করিণীর জন্য যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিতেন; তাহার জল নির্মল ও গভীর ছিল, এ জন্য তিনি যখন-তখন বলিতেন "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।" তিনি যে পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন, এই পুষ্করিণীটিই তাহার অব্যর্থ প্রমাণ। এই পুষ্করিণীটির প্রতি অনেক দিন হইতেই ঘোষাল মহাশয়ের লোভ ছিল। তিনি নায়েবের নিকট প্রস্তাব করিলেন, এই পুষ্করিণীটি পাইলেই তিনি ইটের মূল্যের দাবী ত্যাগ করিবেন।

নায়েব আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, "বলেন কি ঘোষাল মশায়! আপনার ষাট আর ত্রিশ এই নব্বুই হাজার ইটের দামের বদলে পাঁচ হাজার টাকার অত বড়ো একটা পুকুর—দীঘি বল্‌লেই চলে, আপনাকে বিক্রী কোবলা লেখাপড়া ক'রে দিতে হবে? বিশেষতঃ এ রাধামাধবের সম্পত্তি; কর্ত্রী শুন্‌লে কি বলবেন?"

ঘোষাল বলিলেন, "কিছুই বল্‌বেন না, কারণ, তাঁর টাকা দেওয়ার শক্তি নেই, আর ঐ পুকুরেরও অন্য কোনো খদ্দের নেই। রাধামাধবের মন্দির, আর তাঁর মুখ্য সেবাইৎ—'দেওয়ান-ইন্‌-চার্জোব' 'গ্রেহ' নির্মাণের জন্য যে

নব্বুই হাজার ইট খরিদ হয়েছে, তার দেনাটা ঠাকুরের জলীয় সম্পত্তি বিক্রয় ক'রে পরিশোধ করলে গিন্নী দুঃখও করবেন না, রাগও করবেন না।"

নায়েব বলিল, "কিন্তু আমার ত একটা দায়িত্ব আছে। সম্পত্তির মূল্য যে চার পাঁচ হাজার টাকা!"

ঘোষাল বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু পেটে খেলে পিঠে সয়। না হয়, রাধামাধবের প্রণামী ব'লে আরও একশ' এক টাকা নিও।"

নায়েব বলিল, "আজ্ঞে এ যে পুকুর চুরি! একশ' টাকার কর্ম নয়! পাঁচশ' টাকার কম আমি এ 'প্রেস্তাব' মুখেই আনতে পারব না।"

"অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—বৈষয়িক কার্যে মহাপণ্ডিত জহরলাল অবশেষে আড়াই শ' টাকায় রাজি হইয়া মনিববাড়ি ফিরিয়া আসিল।

৪

নায়েবকে হাসিমুখে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া দেওয়ান-গিন্নী মালা ঘুরাইয়া বলিলেন, "কোনো সুবিদেটুবিদে করে আস্‌তে পারলে? ঘোষাল মিন্‌সে কি বল্‌লে?"

দেওয়ান-গিন্নীর মুখখানি একে তো কালি-পড়া তোলো হাঁড়ির মতো কৃষ্ণবর্ণ, গোল ও গম্ভীর; তাহার উপর প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে তাঁহার মুখে সজারুর ছোটো ছোটো কাঁটার মতো কতকগুলি গোঁফ গজাইয়াছিল! সেই মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিবার সময় নায়েবের বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিত; কিন্তু সেদিন তাহার দৌত্য সফল হইয়াছিল, এইজন্য সে নিঃশঙ্কচিত্তে বলিল, "শাস্তর কি মিথ্যে হবার যো আছে, মা! শাস্তরেই ত আছে—'জয়ন্তে পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ' একে আপনার মতো সাক্ষেৎ অন্নপুন্নোর আশীর্বাদ, আর তার ওপর শ্রীরাধামাধবজীর কাজ; সে কাজ কি পণ্ড হয়? ঘোষাল ত' নালিশ করতে উদ্যত, আর্জি পর্যন্ত লেখা শেষ; সোমবারেই তা আদালতে দাখিল করতো। আমি তার হাতে পায়ে ধ'রে এক রকম আপোষ ক'রে এসেছি, কেবল আপনার হুকুমের প্রতীক্ষে।"

গিন্নী বলিলেন, "বটে? কি সর্তে আপোষ করলে?"

নায়েব বলিল, "ঐ যে ছুঁচোমারির মাঠে আমাদের একটা এঁদো পুকুর আছে, টোপা-পানায় আর শ্যাওলায় পুকুরের জল চোখে দেখবার যো নেই,

আবার জলেরই বা কি 'সৈরভ', মুখে দিলে অন্নোপেরাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে যায়! পুকুরে কর্তার আমলের ছু'পাঁচটা মাছ ছিল শুনেছি, কিন্তু ঢেঁকির মতো সাতটা কুমীর সেই পুকুরে বাসা নিয়েছে, মাছগুলো তারাই সেবা করেছে। সেই পুকুরটা ঘোষালকে বিক্রী-কবলা ক'রে দিয়ে, ইটের দেনা পরিশোধের 'প্রেস্তাবে' তাকে রাজি ক'রে এসেছি। শুধু কি তাই? রাধামাধবজীকে সে পঞ্চাশটাকা প্রণামী দিতেও রাজি হয়েছে। এত সহজে কার্য-সিদ্ধি হবে—সে আশা ছিল না; কিন্তু শ্রীরাধামাধবজীর ইচ্ছেয় কি না হয়?" (উদ্দেশে প্রণাম)

গিন্নী খুশি হইয়া বলিলেন, "বেশ ভালোই করেছ। কোবলা রেজেষ্ট্রীর খরচটা কিন্তু ঘোষালের কাছেই আদায় করা চাই।"

দেওয়ান-গিন্নীর মেজাজ ভালো আছে বুঝিয়া নায়েব মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "এ হাঙ্গামাটা ত কোনো রকমে চুকলো, কিন্তু ওদিকে যে আর এক বিপদ্ উপস্থিত! লাটের খাজনা দাখিলের সময় হয়েছে, অথচ তবিলে টাকা নেই; মহালের তৌশীলদার বেটারা লিখেছে—এবার কোনো প্রজা ধান পায়নি, চোতেলী ফসল উঠবার আগে তারা একটি পয়সাও দিতে পারবে না। আমি বলি কি—বাজারের পাশে আমাদের যে দৌড়ঘরটা পড়ে আছে, কর্তার আমলে দোলে, রথে, 'পূজো পাব্বণে' যাত্রাওয়ালাদের সেই ঘরে বাসা দেওয়া হ'তো। এখন মেরামতের অভাবে ঘরখানা ভেঙে পড়েছে, সাপ, ছুঁচো আর চামচিকের আড্ডা হয়েছে, ভাঙা ইমারত, মবলক টাকা খরচ ক'রে মেরামত করিয়েই বা ফল কি? ঐ সাপের পুরী কেউ ভাড়া নিতে চায় না। একদিন দুয়োর খুলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে, ওরে বাপ রে! সাপের কি ফোঁসফোসানি! পালিয়ে এসে বাঁচি। তা বাজারের ঐ বেঁয়ে বেটা,—সাগরমল হনুমানজী—ঐ ঘরখানা পাটের গুদাম করবার জন্যে কিন্‌তে চায়; সে ছ'শো টাকা দর বলেছে। পাগলের মতো কথা!—আমি বলেছি—'হাজার রূপেয়ার এক আধেলা কম্‌তি হোগা নেই।' বেটার ভারি গরজ, ঠিক ঐ টাকাতেই রাজি হবে।' ঐ ঘরখানা বিক্রি করলে এবারকার লাটের হাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়েও তবিলে কিছু জমে,—তা আপনার মত না জেনে ত সেই মেড়ো বেটাকে কথা দিতে পারছি নে।"

গিন্নী বলিলেন, "হাজার টাকার ওপরে উঠ্‌বে না?"

নায়েব বলিল, "রাধামাধব! ঘরের যে অবস্থা, পাঁচ ছ শো টাকার বেশি দিয়ে কেউ কিনতো না। গরজে পড়ে মেড়োটা কিছু বেশি দিতেই রাজি হবে। কিন্তু হাজার টাকার ওপরে উঠবে না।"

গিন্নী বলিলেন, "টাকার দরকার, ভাঙা ঘরের মায়া ক'রে আর কি হবে? হাজার টাকাতেই রাজি হ'য়ো।"

নায়েবের মনে হইল, "সেদিন সে শিয়াল বাঁ হাতি" করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল। সাগরমল হনূমানজী নগদ্ দেড়হাজার টাকায় সেই অট্টালিকা ক্রয় করিতে সম্মত হইল। কিন্তু জহরলালের সহিত বন্দোবস্ত হইল—দলিলে হাজার টাকার উল্লেখ থাকিবে। অবশিষ্ট পাঁচ শত টাকা সে "মফস্বলে" লইবে।

পুষ্করিণী ও 'ইমারত' বিক্রয় করিয়া একমাসে কাণা নায়েবের সাত শত টাকা উপরি আদায় হইল। সে ভাবিল, রাধামাধবের দয়ায় তাহার ধূলামুঠা সোনামুঠা হইতেছে!

এই সকল ঘটনার কিছুদিন পরে মুন্সেফী আদালত হইতে দেওয়ান-গিন্নীর নামে এক নিমন্ত্রণপত্র আসিয়া হাজির! তিনি নায়েবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কি বাবদ নালিশ রুজু করেছে, নায়েব?"

কানা চশমার ভিতর দিয়া এক চক্ষুতে বাদীর আর্জির নকলখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিল, "এ একটা উড়ো ফ্যাঁসাদ! আনন্দনগরের মাঠে আমাদের সত্তর আশি বিঘে খড়ের জমি আছে, কর্তা ওয়াষ্টিন কোম্পানীর কাছে ওটা বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছিলেন; বছরে যে টাকা খাজনা দিতে হয়, খড় বিক্রি ক'রে তার অর্ধেক টাকাও ওঠে না! বছর বছর কেবল লোকসান দিয়ে আসতে হচ্ছে। বাকি খাজনা বাবদ সাহেব কোম্পানি ১৬৫॥৴১৭॥০ টাকার দাবীতে নালিশ রুজু করেছে। আমি বলি কি, ও লোকসানী জমা রেখে দরকার নেই। ওটা একতরফা নীলাম হয়ে যাক, আমাদেরও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ুক।"

দেওয়ান-গিন্নী বলিলেন, "বছর বছর লোকসান দিয়ে ও খড়ের জমি রাখবার দরকার দেখিনে! খাজনার টাকা আমি ঘর থেকে দিচ্ছিনে, কিন্তু কম টাকায় নীলেম হ'লে আমাকে আবার বাকী টাকার জন্য দায়িক হ'তে হবে না ত?"

নায়েব মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে আমি দেখে নেব। নীলেমে বাকী খাজনার টাকা উঠ্‌বে। খড়ের জমি কি না, ওর ওপর অনেকেরই 'ঠোক' আছে।"

যথাসময়ে খড়ের জমি নীলাম হইল। জহরলাল তাহার পুত্র পান্নালালের বেনামীতে দুই শত টাকায় নীলাম ডাকিয়া লইল। এই জমির খড় কোনো বৎসর সাত শত, কোনো বৎসর আট শত টাকায় বিক্রয় হইত। কিন্তু কানা নায়েব খাতাপত্রে ক্রমাগত লোকসান দেখাইয়া আসিয়াছে। বার্ষিক গড়ে ছয় শত টাকা আয়ের সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে তাহার হস্তগত হইল। রাধামাধবের প্রতি তাহার ভক্তিও ক্রমে দুই কূল ছাপাইয়া উঠিল।

৫

কিন্তু এত বড়ো একটা কাণ্ডও দেওয়ান-গিন্নীর গোমস্তা পদা গাঁড়াল ও মুহুরী অনন্ত অধিকারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিবে—তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তাহারা এক দিন মুখ ভার করিয়া কানা নায়েবকে বলিল, "দাদা, সেই কালেই বলেছিলাম, শেষ রক্ষে করতে পারবে না। আমরা দু'জনে চার চক্ষুতে যা দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, তুমি এক চক্ষুতে তা দিব্যি দেখতে পাচ্ছ, আর দুই হাতে কুড়িয়ে নিয়ে কোঁচড়ে গুঁজছো, এ কি ভালো হচ্ছে? আমরা শালারা কি বানের জলে ভেসে এসেছি! পূজোপাব্বণগুলো ত আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। একটি উপরি পয়সার মুখ দেখবার যো নেই; আর তুমি যোলো আনার উপর আঠার আনা পুষিয়ে নিচ্ছো। বেশ, আমরাও দেখে নেব।"

কানা নায়েবের একটু ভয় হইল। সে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ ভাই, তোমাদের কথা কি আমি ভুলতে পারি? এ ত মুলোর ক্ষেত নয়, বেগুনের ক্ষেত, হপ্তায় হপ্তায় তোমাদের হাতেও কিছু কিছু যাতে আসে, আমি তার ব্যবস্থা না ক'রেই কি চুপ ক'রে ব'সে আছি?"

পদা গাঁড়াল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ব্যবস্থাটা কি শুনি।"

অতঃপর দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাদের পরামর্শ চলিল; পরামর্শ শেষ হইলে পদা ও অনন্ত উভয়েই উৎফুল্ল হইল।

*　　*　　*

পরদিন প্রভাতে নায়েব দেওয়ান-গিন্নীর চরণবন্দনা করিয়া বলিল, “কাল রাত্তিরে বড়োই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি! সে কথা মনে হওয়ায় সর্বশরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে! কাল চার প্রহর রাত্তিরে রাম, শিব, লক্ষ্মী, কালী—এই চারজন দেবদেবী স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়ে বল্‌লেন, ‘দেওয়ান-গিন্নী পূর্বজন্মের তপিস্তের জোরে ভক্তিডোরে আমাদের বেঁধে রেখেছে। কিন্তু এ জন্মে সে রাধামাধবের পূজো-আর্চা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, বিস্তর টাকা খরচ ক’রে সে রাধামাধবের মন্দির ‘পিত্তিষ্টে’ করল। কিন্তু আমরা যে তার ভক্তিডোরে বাঁধা আছি, সে কথা সে ভুলে গিয়েছে! কথাটা কালই তাকে স্মরণ করিয়ে দিবি। সে হয়ত তোর কথা বিশ্বেস করবে না; কিন্তু আমরা প্রতি মঙ্গলবার রাত্রিকালে তাকে দেখা দিয়ে তার মনস্কামনা পূর্ণ করব। তোরাও সেখানে উপস্থিত থাকিস; আর আমাদের ভোগের আয়োজন ক’রে রাখতে বলিস।’ মা, কাল মঙ্গলবার। কাল থেকেই আপনার উপর দেবতাদের ভর হবে।”

দেওয়ান-গিন্নী রোমাঞ্চ-দেহে এই অদ্ভুত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া গদগদ স্বরে বলিলেন, “বাঁধা পড়েছে! তাই ত বলি, আমার এত দিনের তপিস্তে কি বৃথা হবে? বাবা জহর, দেবদেবীরা আসবেন, তাঁদের ভোগের আয়োজনে যেন ত্রুটি না হয়। ক্ষীর, ছানা, লুচি-সন্দেশের, নানারকম ফলফুলারীর জোগাড় করবে। টাকার জন্যে ভেব না, টাকার অভাব হয়, আমার ছোটো বাগান-খানা বিক্রি করবে।”

পরদিন রাত্রিকালে দেওয়ান-গিন্নীর শয়নকক্ষে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিল; প্রকাণ্ড ধুনুচিতে ধূপ জ্বালিয়া ঘর অন্ধকার করিয়া তুলিল; বিভিন্ন পাত্রে ভোগের উপকরণ সজ্জিত হইল; কোনও পাত্রে ক্ষীর, কোনও পাত্রে ছানা, গোল্লা, রসগোল্লা, গাওয়া ঘিয়ে ভাজা রাশি রাশি ফুলকো লুচি। আয়োজন দেখিয়া পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারীর লালা সংবরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিল।

পদা গাঁড়াল দ্বারপ্রান্তে বসিয়া মন্দিরা বাজাইতে লাগিল, অনন্ত অধিকারী একখানি আসনে বসিয়া বিড় বিড় করিয়া নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের স্তব আবৃত্তি করিতে লাগিল, তাহা রামের স্তব কি ষষ্ঠীপূজার মন্ত্র, তাহা কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না। দেওয়ান-গিন্নী একখানি কুশাসনে বসিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিতে লাগিলেন, “এসো রাম, সীতাপতি রামচন্দর এসো! একবার

দেখা দাও, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। তুমি গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়েছ, পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করেছ ; বাঞ্ছাকল্পতরু! একবার তোমার দাসীকে দেখা দাও।" গিন্নীর আকুল কণ্ঠের প্রার্থনায় সেই কক্ষ পূর্ণ হইল।

দপ করিয়া একটা নীল রঙের দিয়াশলাই জ্বলিয়া উঠিল, তাহা নির্বাপিত হইবামাত্র সেই ধূমপূর্ণ কক্ষে জটাবল্কলধারী রামচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। নূপুরের শব্দে দেওয়ান-গিন্নী বুঝিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে। রাম দেখা দিতে আসিয়াছেন।

"এসেছিস্ বাপ! আয়, একবার কোলে আয়, আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর্।" কানা নায়েবই রাম সাজিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। গিন্নীর এই আকুল আহ্বানে সে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার কোলের উপর বাখারির ধনুক ও কঞ্চির বাণটি নিক্ষেপ করিল। দেওয়ান-গিন্নী তাহা মস্তকে স্পর্শ করিলেন ; কিন্তু ধূমান্ধকারপূর্ণ কক্ষে দৃষ্টির ক্ষীণতা বশতঃ একটা আবছায়া ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

রামচন্দ্র অদৃশ্য হইলে পদা গাঁড়াল মন্দিরা ফেলিয়া উঠিয়া গেল। দেওয়ান-গিন্নী এবার 'বাবা ভবতারণ! বাবা হরিতারণ।' বলিয়া শিবকে আহ্বান করিলেন। কয়েক মিনিট পরে পদা গাঁড়াল মুখে দাড়ি-গোঁফ ও মাথায় সুদীর্ঘ জটা বাঁধিয়া, নূপুরধ্বনি করিতে করিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। অনন্ত অধিকারী 'জয় শিব শম্ভু! বোম্ বোম্ মহাদেব' শব্দে শিবের অভ্যর্থনা করিয়া দেওয়ান-গিন্নীকে বলিল, "মা তোমার ভবতারণ এসেছেন।" তৎক্ষণাৎ শিবের জটা চাবুকের মতো গিন্নীর হাতে পড়িল। গিন্নী জটা টিপিতে লাগিলেন, জটা হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিতে লাগিল। পতিতপাবনী গঙ্গা জটায় লুকাইয়া আছেন, মনে করিয়া দেওয়ান-গিন্নী জটানিংড়ানো জল ভক্তিভরে মাথায় লইলেন।

শিবের অন্তর্ধানের পর অনন্ত অধিকারী লক্ষ্মীর স্তব আরম্ভ করিল। দেওয়ান-গিন্নী ব্যাকুল স্বরে লক্ষ্মীকে ডাকিতে লাগিলেন। অনন্ত অধিকারী দেওয়ান-গিন্নীর প্রতিবেশী, একটি প্রাচীরমাত্র ব্যবধান! অনন্তের স্ত্রী গুঞ্জমালা কক্ষান্তরে অপেক্ষা করিতেছিল ; সে নূপুর বাজাইয়া দেওয়ান-গিন্নীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; এবং তাঁহার ন্যাড়া মাথায় হাত বুলাইয়া, এক গোছা ধানের শিষ তাঁহার মুখে বুলাইয়া দিল। তাহার পর বিকৃত স্বরে

বলিল, "তোর ভক্তিতে আমি চিরদিন তোর ঘরে বাঁধা আছি মা!" মুহূর্তমধ্যে 'লক্ষ্মী' অদৃশ্য হইলেন।

অতঃপর অনন্ত অধিকারী কালীর স্তব আরম্ভ করিল। দেওয়ান-গিন্নী "কোথায় মা কালী! এসো মা কালী! তোমার দাসীকে দেখা দাও" বলিয়া কালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পদা গাঁড়ালের ভগিনী সুনন্দাও যথা-সময়ে আসিয়া অন্য কক্ষে বসিয়াছিল। সে এলোচুলে, গলায় মাটির মুণ্ডমালা পরিয়া, আধ হাত জিহ্বা বাহির করিয়া দেওয়ান-গিন্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাহার হাতের খাঁড়া তাঁহার কোলে রাখিল। খাঁড়ায় খানিক 'খুনখারাপি' রং মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দপ্ করিয়া লাল দেশলাই জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে দেওয়ান-গিন্নী এক চক্ষুতে মা কালীর নৃমুণ্ডমালিনী মূর্তি মুহূর্তের জন্য নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি খাঁড়ায় হাত দিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কি, খাঁড়া ভিজে কেন?"

অনন্ত অধিকারী বলিল, "ম্লেচ্ছদেশে যুদ্ধ চল্‌ছে কিনা। মা যবন বধ করছিলেন, আপনার আহ্বানে আর স্থির থাকৃতে না পেরে সেই খাঁড়া হাতে নিয়েই চলে এসেছেন। খাঁড়ায় সেই রক্তই লেগে আছে!"

দেওয়ান-গিন্নী সভয়ে বলিলেন, "যবনের রক্ত! তাজা রক্ত যে! নাঃ বেটি দেখছি এই রাত্তির কালে স্নান না করিয়ে ছাড়লে না!" তাঁহাকে দাসীরা স্নান করাইয়া দিল। তাহার পর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, প্রসাদের অধিকাংশ পদা গাঁড়াল, অনন্ত অধিকারী ও কানা নায়েব বাড়ি লইয়া গেল। প্রতি মঙ্গলবার রাত্রিতে দেওয়ান-গিন্নীর উপর দেবতাদের ভর হইতে লাগিল। ভোগরাগের আয়োজনে সেই রাত্রিতে পনের ষোল টাকা ব্যয় হইতে লাগিল বটে, কিন্তু অর্থাভাব হইল না। দেওয়ান-গিন্নী আম-কাঁঠালের ৪০ বিঘার বাগান পাঁচ শত টাকায় বিক্রয় করিলেন। কানা নায়েব তাহা তাহার রক্ষিতা এবং দেওয়ান-গিন্নীর পরিচারিকা খুদী ঘোষানীর বেনামীতে কিনিয়া লইল। সেই বাগানের মূল্য হাজার টাকারও অধিক।

৬

পল্লীগ্রামে কাহারও সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল হইলে দরিদ্র আত্মীয় প্রতিবেশীরা তাহার মুখাপেক্ষী হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দেওয়ান-গিন্নীরও

মুখাপেক্ষিণী সধবা বিধবা প্রতিবেশীনির অভাব ছিল না। দেওয়ান-গিন্নীর উপর দেবতার ভর হইয়াছে শুনিয়া প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর তাঁহার গৃহে আট দশটি প্রতিবেশীনির সমাগম হইতে লাগিল। দেওয়ান-গিন্নী কি ভাবে প্রতারিত হইতেছেন, তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না; কিন্তু প্রসাদের লোভে ও স্বার্থের অনুরোধে কেহই এই প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিল না। সকলেই তাঁহাকে ভাগ্যবতী পুণ্যবতী তপস্বিনী বলিয়া তাঁহার গুণকীর্তন করিতে লাগিল।

দেওয়ান-গিন্নীর কুল-পুরোহিত 'বিশু চাটুয্যে' অর্থাৎ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। শিব আছেন, কালী আছেন, লক্ষ্মী আছেন, তাঁহাদের আবাহনের জন্য অনন্ত অধিকারী মন্ত্র পাঠ করে, আর কি না কুলপুরোহিত মহাশয় তাঁহার ভাগ্যবতী পুণ্যবতী যজমানটির অসাধারণ সৌভাগ্য ও পুণ্যপ্রভাবের পরিচয় পাইলেন না! ইহা ভাবিয়া দেওয়ান-গিন্নীর মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুরোহিত মহাশয় এক মঙ্গলবার নিশাকালে দেওয়ান-গিন্নীর গৃহে আহূত হইলেন।

পুরোহিত সকলই প্রত্যক্ষ করিলেন, এবং কানা নায়েব, মূর্খ গোমস্তা ও প্রতারক মুহুরী ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার যজমানটিকে 'জেরবার' করিতে উদ্যত হইয়াছে অথচ এই হুজুগে পূজাপার্বণাদি হ্রাস হওয়ায় তাঁহার উপার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং জহরলাল পদা ও অনন্তকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন; বলিলেন, তাহাদের এই বুজরুকি 'ফাঁস' করিয়া দিবেন, হাটে হাঁড়ি ভাঙিবেন। নায়েব ও গোমস্তা তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, "ঠাকুর মশায়, আপনি রাগ করবেন না, শীঘ্রই আপনার প্রাপ্তির ব্যবস্থা কচ্ছি।"—পুরোহিত মহাশয় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, ক্রোধটাও তিনি তখনকার মতো মুলতুবী রাখিলেন।

দুই দিন পরে নায়েবের উপদেশে খুদী ঘোষানী এক পোয়া দধির সহিত অল্প হলুদ মিশাইয়া সেই পীতাভ তরল পদার্থ রাত্রিকালে গিন্নীর বিছানায় ঢালিয়া দিল।

দেওয়ান-গিন্নীর মস্তিষ্ক এতই বিকৃত হইয়াছিল যে, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, শিশু যেমন রাত্রিকালে মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়, তাঁহার রাধামাধবও সেইরূপ রাত্রিকালে মন্দির ত্যাগ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন

করেন, এবং প্রত্যুষে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই নিঃশব্দে উঠিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। তিনি নিদ্রাঘোরে কোনো কোনো দিন রাধামাধবের নূপুরধ্বনি শুনিতে পান। সুতরাং পরদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গে তিনি তাঁহার শয্যায় সেই হরিদ্রাভ দ্রব পদার্থ লিপ্ত দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার রাধামাধবের আমাশয় হয়েছে, বিছানা নষ্ট ক'রে গিয়েছে, এখন উপায় ?"

পদা গাঁড়াল বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "এ ত ভারি মুশকিলের কথা হ'ল! আমাদের চিন্তাহরণ ডাক্তারকেই ডাকি, না ভগবতীচরণ কবরেজ মশায়কে খবর দিই ?"

কানা নায়েব বলিল, "এ কি তোমার আমার আমাশা যে, ডাক্তার-কবরেজের ওষুধে আরাম হবে? এ দেবতার রোগ—দৈবকার্য করতে হবে। চাটুয্যে মশায়কে খবর দাও—তিনি শান্তিকার্য করুন।"

পুরোহিত বিশু চাটুয্যে মহাশয় তালপাতের পুঁথি হাতে দর্শনদান করিলেন। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তিনি পুঁথির পাতা উল্‌টাইয়া বলিলেন, "শান্তিপ্রকরণে দেবতার আমাশয়াদি রোগের ঔষধের ব্যবস্থা আছে। শান্তি-ক্রিয়া অবশ্য কর্তব্য। এ জন্য রাধামাধবের মুরলীর অনুরূপ একটি সোনার মুরলীর প্রয়োজন। দুই ভরি সোনাতেই ঐরূপ মুরলী প্রস্তুত হইবে।"

তাহাই হইল। সেইরূপ সোনার বাঁশি নির্মিত হইল, পুরোহিত মহাশয় তদ্দারা শান্তি-কর্ম শেষ করিলেন। দুই ভরি স্বর্ণ ও শান্তি-কর্মের বিবিধ উপকরণ হস্তগত হওয়ায়, রাধামাধবের আমাশয়ের ও পুরোহিতের ক্রোধের শান্তি হইল; তাহার পর তিনিও দলে ভিড়িলেন।

কয়েকদিন পরে গভীর রাত্রিতে দেওয়ান-গিন্নীর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি শয্যা হাতড়াইয়া রাধামাধবকে পাইলেন না, "রাধামাধব, রাধামাধব! বাবা, কোথায় তুমি!" বলিয়া আর্তনাদ করিলেন।

পদা গাঁড়াল পাশের ঘরে শয়ন করিত; সে উঠিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "যা বেটী! তোর আর ভালোবাসা জানাতে হবে না। আমি শীতে থর্ থর্ কাঁপছি, তোর ঘরে বাক্স বোঝাই শাল-আলোয়ান। কোনো দিন একখানা গায়ে দিতে দিয়েছিস ?"

দেওয়ান-গিন্নীর বড়োই অনুতাপ হইল। পরদিন প্রভাতে তিনি খুদী

ঘোষানীকে চাবি দিয়া বাক্স খুলাইলেন এবং তাঁহার স্বামীর ক্রীত একখানি অব্যবহৃত মূল্যবান্ কাশ্মীরী শাল বাহির করিয়া রাধামাধবের ব্যবহারের জন্য পদা গাঁড়ালের হাতে দিলেন।

পদা সুযোগ বুঝিয়া তাহা বাড়ি লইয়া গেল। সেই শাল ব্যবহার করিলে তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে বুঝিয়া, এক দিন সে তাহা গোপনে 'বিক্রমপুর' প্রেরণ করিল। কিন্তু কানা নায়েবের মুখ চুলকাইতে লাগিল!

৭

আর একটু বাকি আছে। শারদীয়া উৎসবের সময় সরস উপসংহারটুকু বাদ দিয়া রসভঙ্গ করিব না।

আশ্বিন মাস আসিল। দেওয়ান-গিন্নী প্রতি বৎসর মহামায়াকে মহা-সমারোহে ঘরে আনেন, কিন্তু সে বার অর্থকষ্টে বিব্রত হইয়া তিনি সংকল্প করিলেন, দুর্গোৎসব বন্ধ রাখিয়া নির্দিষ্ট দিনে কেবল কুমারী পূজা করিবেন। অল্প ব্যয়েই তাহা সুসম্পন্ন হইবে।

তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া পুরোহিত চাটুয্যে মহাশয় মুখ ভার করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার চিরহিতৈষী নায়েব, গোমস্তা ও মুহুরীও প্রমাদ গণিল! মহামায়া ঘরে আসিলে, তাঁহার আশীর্বাদে বিলক্ষণ দশ টাকা ঘরে উঠিত; 'সে গুড়ে বালি' পড়িবার সম্ভাবনায় তাহারা ম্রিয়মাণ হইল। তাহার পর পুরোহিত মহাশয়ের সহিত বকুলতলায় দাঁড়াইয়া তাহাদের কি পরামর্শ হইল, বলিতে পারি না।

প্রতিমা-নির্মাতা মালাকরের নাম ফটিকচাঁদ। ফটিকচাঁদই প্রতি বৎসর দেওয়ান-গিন্নীর চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গা-প্রতিমা নির্মাণ করিত। সেবার দুর্গোৎসব হইবে না, কুমারী-প্রতিমা নির্মাণের জন্য সে মাটিতে জল ঢালিল।

মুহূর্ত পরেই ফটিক মালাকর আর্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, সবেগে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল, তাহার পর চিৎকার করিয়া বলিল, "মেরো না বাবা নন্দী! ভৃঙ্গী মশায়, দোহাই তোমার, আমাকে সিঙ্গী লেলিয়ে দিও না, ওরে বাবা, মস্ত দাঁত! মেরে ফেল্‌লে!"—সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা।

ফটিকচাঁদকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া সকলে মহাকলরব আরম্ভ করিল। দেওয়ান-

গিন্নী অন্দর হইতে সেই চিৎকার শুনিয়া, ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন। তাঁহার আদেশে মূর্ছিত ফটিক অন্দরে নীত হইল। পদা ও অনন্ত তাহাকে ধরিয়া রহিল।

নায়েব ও গোমস্তার বহু চেষ্টায় ফটিকের মূর্ছাভঙ্গ হইল। দেওয়ান-গিন্নী তাহার আর্তনাদ ও মূর্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে হাত-যোড় করিয়া বলিল, "আমি কুমারী-প্রতিমের জন্যে মাটিতে জল ঢেলেছি,—আর অমনিই মা দুর্গা সিঙ্গীর পিঠে চেপে আমার সামনে এসে দশ হাত নেড়ে বল্‌লেন—'কি, গিন্নীর এতো বড়ো আস্পর্ধা, আমার পূজো বন্ধ রেখে তার কুমারীপূজোর সখ! নন্দী, লাগাও সাট; ভৃঙ্গী, ওকে ধ'রে আমার সিঙ্গীর মুখে ফেলে দাও',—বল্‌তে না বল্‌তে সিঙ্গীটা মূলোর মতো লম্বা দাঁতগুলো বের ক'রে—" কথা শেষ না করিয়া ফটিক আসন্ন-ম্যালেরিয়ার রোগীর মতো প্রচণ্ডবেগে কাঁপিতে লাগিল।

দেওয়ান-গিন্নী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হাসিমুখে নায়েবকে বলিলেন, "জহর, বেটী আমার বাড়ি এবারও পূজো না খেয়ে ছাড়বে না, তা' বুঝলে ত?—কুমারীপূজো মুলতুবী থাক্; দুর্গোৎসবেরই আয়োজন কর। সকলকে ছেড়ে বেটি আমার কাঁধে ভর করেছে!"

নায়েব মাথা নাড়িয়া বলিল, "ধন্য আপনি! মহামায়ার এ অনুগ্রহ কি আর কারও ওপর হয়? অবিশ্বাসী, পাষণ্ড, নাস্তিক বেটারা তবু বলে গিন্নী-মায়ের ওপর দেবতার ভরটর সব মিথ্যে! মিথ্যে কি সত্যি, তা একদিন তিনি জানিয়ে দেবেন।"

পূজার আয়োজন আরম্ভ হইল। নায়েব ষষ্ঠীর কয়েক দিন পূর্বে পূজার বাজার করিতে কলিকাতায় যাত্রা করিল। ঘি, ময়দাও সে কলিকাতা হইতে সংগ্রহ করিল এবং এক টিন ঘিয়ের পরিবর্তে এক টিন তেল কিনিল। পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে—সেবার কুসুমবীজের তেল খাইয়া কলিকাতার অনেক লোক ভেদবমিতে মৃতকল্প হইয়াছিল। জহরলাল সস্তায় কিস্তী পাইয়া সেই তেল এক টিন কিনিয়াছিল। তৈলের ঐরূপ অসাধারণ গুণের কথা সে তখন জানিত না।

মহাষ্টমীর দিন দেওয়ান-গিন্নী গ্রামের বহু লোককে মহামায়ার প্রসাদ পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কানা নায়েব ক্যানেস্তারার ঘিয়ের সঙ্গে

সেই তেল সপরিমাণে মিশাইয়া তদ্দ্বারা লুচি ভাজাইল। ডাল, তরকারি, আলুর দম প্রভৃতিতেও সেই তৈল ব্যবহৃত হইল।

যথাসময়ে গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা মহামায়ার প্রসাদ পাইলেন; কিন্তু আহারান্তে কাহারও মুখ ধুইবারও তর সহিল না। অনেকে পথের ধারেই বমি করিতে বসিয়া গেল। বড়ো বড়ো উকিল, মোক্তার, ডাক্তার কাছা হাতে করিয়া বাড়ির দিকে দৌড়াইলেন; কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত পৌছাইতে হইল না। চতুর্দিকে বমনের মিশ্রতান।

দেওয়ান-গিন্নী হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, "জহরলাল, এ কি ব্যাপার? এ যে বড়োই সর্বনেশে কাণ্ড!"

জহরলাল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, "কিছু না যে সকল অবিশ্বাসী নাস্তিক আপনার উপর দেবতার ভরের কথা অবিশ্বাস করে, মা মহামায়া তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—দেবমহিমায় অবিশ্বাস করলে কি শাস্তি হয়!"

'বার্ষিক বসুমতী' : ১৩৩৩

পা ড়া গেঁ য়ে

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশ বাতাস ও আলোর প্রভাবে রমানাথের জীবন নিতান্ত সহজভাবে প্রকৃতির কোলে ফুটিয়া উঠিতেছিল। জন্মাবধি সে সহরের মুখ দেখে নাই। সহরের ইঁট-কাঠ-চূণ-সুরকীনির্মিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, বৈদ্যুতিক গাড়ি, আলো পাখা, কলকারখানা—এ সকলের কথা সে অনেকবার শুনিয়াছিল, কিন্তু এগুলিকে রমানাথ বাস্তবরাজ্যের অন্তর্ভূত বলিয়া মনে করিতে পারিত না। শান্ত বনানীর অসংখ্য শাখাপরিবেষ্টিত, ছায়ালোকমণ্ডিত তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীর ও তাহার আশপাশই রমানাথের বাস্তবরাজ্যের একমাত্র পরিসীমানা ছিল। ইহার বাহিরে যে আর কিছু থাকিতে পারে, রমানাথ তাহা কল্পনায়ও

আনিতে পারিত না। সে নির্জনে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়ার কণ্ঠস্বরে স্বর মিলাইয়া শিস্ দিতে থাকিত, কোঁচড় ভরিয়া শিউলি, চাঁপা, রজনীগন্ধা ফুল তুলিয়া বেড়াইত, নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার কাটিয়া দিন কাটাইত।

রমানাথ আশৈশব পিতৃমাতৃহীন। রমানাথের এক বৃদ্ধা মাসী তাহাকে লালন-পালন করিতেছিলেন।

রমানাথের লেখাপড়া সামান্যই হইয়াছিল। গ্রামের এক প্রাচীন দোকানদারের নিকট সে প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, শিশুবোধ পর্যন্ত পড়িয়াছিল, এবং মাঝে মাঝে সুর করিয়া রামায়ণ পড়িয়া তাহার মাসীকে শুনাইত। অধিকাংশ সময়ই রমানাথ বাঁশঝাড়ের তলায় চঞ্চল রৌদ্রের খেলা দেখিত, মধ্যাহ্নে, উত্তপ্ত-বাতাসে, সুনির্মল আকাশের নীচে যে দু' একখানা মেঘ ভাসিয়া যাইত, তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ছুটাছুটি করিত,—অনেকদূরে যে গাছটা আর সব গাছগুলার মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়া তাহার উপরকার শাখা-প্রশাখা রৌদ্রে বিছাইয়া দিয়া শান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহার দিকে হাঁ করিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিত। সব চেয়ে রমানাথের গাছপালারই সখ ছিল;—ছোটো ছোটো গাছ পুঁতিয়া, মাটি খুঁড়িয়া, জল ঢালিয়া তাহাদের বড়ো করার মতো এমন আনন্দ সে আর কিছুতেই পাইত না। তাহাদের ছোট্ট গ্রামখানির ভিতর এমন শতাধিক বৃক্ষ তাহারই যত্নে বর্ধিত হইয়াছিল।

রমানাথ এক দিন স্নান করিতে গিয়া দেখিল, তীরে একখানি নৌকা বাঁধা আছে। অনেকগুলি বালক জলে নামিয়া কোলাহল করিতেছে। কেহ জল ছুঁড়িতেছে, কেহ কাদা মাখিতেছে, কেহ বা তীরের কাছে হাত-পা ছুঁড়িয়া সাঁতার শিখিতেছে। নৌকার উপর বসিয়া একটি ভদ্রলোক তামাক খাইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ছেলেদের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতেছিলেন।

হঠাৎ একটি বালক "গেলুম, বাবা রে গেলুম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে বেশী জলে গিয়া পড়িয়াছিল, অথচ ভালো সাঁতার জানিত না। নৌকার ভিতর হইতে স্ত্রীলোকেরা "ওগো, কি হ'ল গো", বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল, ভদ্রলোকটি "ধর, ধর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রমানাথ মুহূর্তের মধ্যে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বালকটির কাছে গিয়া, তাহাকে টানিয়া তীরের কাছাকাছি লইয়া আসিল।

রমানাথের আদর আর ধরে না। মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে

নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিল। বালকের পিতা রমানাথকে কোলে করিয়া নৌকায় লইয়া আসিলেন, তাহার ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া দিয়া নূতন জামা কাপড় পরাইয়া দিলেন, তাহাকে বসাইয়া খাওয়াইলেন ; রমানাথের মুখে তাহার পরিচয় পাইয়া বলিলেন, "তুমি বাবা, আজ থেকে আমাদের ছেলের মতো হ'লে। আমাদের সঙ্গে কলকাতায় চল। তোমার মাসীকেও আমরা নিয়ে যাব।"

ভদ্রলোকটি তখন রমানাথের মাসীকে ডাকাইয়া আনিয়া সব বলিলেন, নিজেরও পরিচয় দিলেন। তিনি কলিকাতায় এক সওদাগর-আফিসে বড়ো চাকরি করেন, নাম নগেন্দ্রনাথ রায়, জাতিতে বৈদ্য। পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলেন। ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছে, স্ত্রীর শরীর ভালো নাই, তাই নৌকাপথে হাওয়া খাইতে খাইতে কলিকাতায় ফিরিতেছেন। তাঁহার ছেলেটি রমানাথের প্রায় সমবয়সী, দুইজনে একসঙ্গে বেশ থাকিবে। তিনি সমস্ত ভার লইতে প্রস্তুত। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "আমার হারু এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে রমানাথকে অনেককালের পুরোণো বন্ধুর মতো করে ফেলেচে—ঐ দেখ না!"—হারু তখন আপনার ব্যাগের জিনিসপত্র রমানাথকে দেখাইতেছিল,—মায়ের কথা শুনিয়া সে একমুখ হাসি লইয়া রমানাথের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি একে আর ছেড়ে দেব না।"

রমানাথের মাসী কলিকাতায় যাইতে চাহিলেন না। তাঁহার গ্রাম ছাড়িয়া, চাষের জমি ছাড়িয়া যাইতে মন সরিল না। তবে রমানাথকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। মাসী বলিলেন, "রমাকে নিয়ে যেতে চাচ্চ, নিয়ে যাও। আমি বুড়োসুড়ো হয়েছি, কখন কি হয়। ওর যদি একটা উপায় হয় সে ত ভালো কথা।"

আশৈশব পল্লীগ্রামে থাকিয়া রমানাথের মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইত, সহর দেখিয়া আসে। তাহাদের গ্রামবাসী দু'একটি লোকের মুখে কলিকাতার বিবরণ শুনিয়া ইদানীং তাহার কলিকাতা দেখিবার ইচ্ছাটা খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এইজন্য, সে তাহার মাসী এবং পল্লীধাত্রীকে ছাড়িয়া যাইতে বিশেষ কোনো আপত্তি করিল না।

সেইদিন অপরাহ্ণে যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, রমানাথের মাসী অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন।

২

কলিকাতায় আসিয়া রমানাথ যাহা দেখে তাহাতেই অবাক হইয়া যায়। সে তাহার মাসীর নিকট পরীরাজ্যের গল্প শুনিয়াছিল, তাহার মনে হইল, এ সকল সেই পরীরাজ্যেরই অন্তর্ভূত। তাহার আগ্রহাতিশয্যে তাহার বন্ধু হারাধনেরও দিনকতক আহারনিদ্রা ত্যাগ হইল।

অপরিচিতকে কলিকাতার মধ্যে পরিচিত করিয়া দেওয়াকে হারাধন বিশেষ একটা গৌরবের কাজ বলিয়া মনে করিল। এক একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখায়, আর রমানাথ অবাক হইয়া তাহা দেখে। ঐ দেখ, পাঁচ-ঘোড়ার গাড়ি, ঐ দেখ মনুমেণ্ট, ঐ দেখ বড়োলাটসাহেবের বাড়ি—রমানাথ হাঁ করিয়া দেখে। হারু বিজয়ী বীরের মতো উল্লাসে রমানাথকে লইয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল।

কিন্তু হারুর মনে শীঘ্রই ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রমানাথ পাড়াগেঁয়ে বলিয়া সময়ে সময়ে বিপদে পড়িত। একদিন অসাবধানতাবশতঃ এক ঘোড়ার গাড়ির সম্মুখে পড়িয়া সে চাবুক খাইল, আর একদিন ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, হারুর সঙ্গে একদিন ফুটবল খেলিতে গিয়া এমন এক ধাক্কা খাইল যে, ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এইসকল ব্যাপারে রমানাথকে লক্ষ্য করিয়া যে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিত, হারু তাহাতে যোগ দিত। হারু মনে করিত, রমানাথ তাহার বিশেষ সম্পত্তি, এবং তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে হাসাইবার এক আশ্চর্য কল।

রমানাথ বাড়িতে আসিয়া হারুর নিকট প্রায়ই করুণভাবে অনুযোগ করিত। সে বলিত, "অন্য লোকে হাসে হাসুক, তুমি তাদের সঙ্গে হাস কেন! ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেলুম, তুমি কোথায় আমাকে ধরে তুলবে, না তোমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আরও হাসতে লাগলে! সেদিন গাড়োয়ানটা আমায় চাবুক মারলে, তুমি হেসে উঠে বললে, বেশ হয়েছে! ছেলেগুলো সেদিন আমার কান ম'লে দিলে, কত রকম ঠাট্টা করলে, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লে। তোমার কি ভাই এ সব উচিত?"

হারু বলিত, "বাঃ রে, আমিও বুঝি তোমার সঙ্গে ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য করব—লোকে আমাকে পাড়াগেঁয়ে, বোকা বলুক আর কি!"

রমানাথ বলিত, "আমি হ'লে অমন্ করতুম না।"

রমানাথের একটি প্রধান দোষ ছিল, সে সব সত্যকথা বলিয়া ফেলিত। হারু যদি বাপকে লুকাইয়া ঘুড়ি উড়াইত, কিংবা পেটের অসুখের উপর চানাচুর খাইত, অথবা দুপুর বেলায় ইডেন্ গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত,—রমানাথের জন্য সে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িত। হারু বলিত, "তুমি ত আচ্ছা বোকা! বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, আর সব বলে ফেল্লে! আচ্ছা বোকা ত!" রমানাথ বলিত, "আমি কি করব, আমি কি মিথ্যে কথা বলব!"

উত্তর শুনিয়া হারু মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যাইত। ক্রমে ক্রমে সে রমানাথের সঙ্গে বেড়ানো একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। রমানাথ একলাটি এঘর সেঘর করিয়া বেড়াইত।

রমানাথের জন্য হারু তাহার বাপের নিকট প্রায়ই মার খাইত। ইহাতে হারুর মাও রমানাথের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; বলিতেন, "কি রকম হাবা ছেলে, কেবলই আমার হারুর নামে লাগায়!"

এইরূপে রমানাথ নগেন্দ্রবাবুর গৃহে অনাদরে দিন কাটাইতে লাগিল।

৩

নগেন্দ্রবাবু রমানাথকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন, সে হারুর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়িত। পড়াশুনায় রমানাথের খুব মন ছিল, এজন্য নগেন্দ্রবাবু তাহাকে খুব ভালোবাসিতেন এবং ভালো ভালো জিনিস কিনিয়া দিতেন। হারুর মনে ইহাতে খুব হিংসা হইত, সে রাতদিন রমানাথকে জব্দ করিবার ফন্দী খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হারু জানিত, রমানাথ খুব গাছপালা ভালোবাসে; সে তাহার কাছে কত রকম গাছের নাম করিত, স্কুলে যাইবার সময় পথে কত রকম গাছ চিনাইয়া দিত, কত রকম ফুলের নাম করিত,—কোন্ ফুল কখন্ ফোটে, কোন্ ফুলের কি রকম রঙ্, তাহাদের বাড়িতে কি কি গাছ আছে, সব বলিত।

একদিন শনিবারে স্কুল হইতে ফিরিবার সময় হারু রমানাথকে সঙ্গে লইয়া নারিকেলডাঙায় এক বাবুর বাগান-বাড়িতে গেল। মালী ছাড়া আর কেহই তখন সেখানে ছিল না। দুজনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিল; কত

রকমের ফল-ফুলের গাছ, কত রকমের লতাপাতা,—দেখিয়া রমানাথের আনন্দ আর ধরে না। এত রকমের গোলাপ গাছ সে কখনও চক্ষে দেখে নাই।

হারু বলিল, "এস ভাই, আমরা একটা গোলাপ-গাছ চেয়ে নিই, টবে পুঁতে ছাতে রেখে দেব—কেমন ?"

রমানাথের ভারি আনন্দ হইল, সে বলিল, "বেশ ভাই, বেশ !"

হারু বলিল, "তুমি ভাই, তা' হ'লে এখানে একটু দাঁড়াও, আমি মালীর কাছে গিয়ে সব ঠিক করচি।"

রমানাথ দাঁড়াইয়া রহিল। হারু মালীর কাছে গিয়া তাহার হাতে একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "একটা গোলাপফুলের গাছ দিতে পার ?"

মালী টাকা পাইয়া একটার পরিবর্তে দুইটা গাছ আনিয়া হারুকে দিল। হারু তখন রমানাথকে দেখাইয়া দিয়া মালীকে চুপি চুপি কি কহিল; তাহার পর রমানাথের কাছে গিয়া তাহার হাতে দুইটা গাছ দিয়া কহিল, "এই দেখ, কেমন গাছ এনেছি। কাউকে বোলো না ভাই যে, আমি তোমাকে গাছ দিয়েচি। বলবে না ত, এঁ্যা! তোমার আবার বলে দেওয়া রোগ আছে।"

রমানাথ প্রতিশ্রুত হইল, কাহাকেও সে বলিবে না। উভয়ে বাড়ি ফিরিল; দুইটা ভাঙা মাটির কলসীতে মাটি ভরিয়া, গাছ পুঁতিয়া ছাতে রাখিয়া দিল। মালী তাহাদের পিছনে পিছনে আসিয়া তাহাদের বাড়ী দেখিয়া গেল।

পরদিন নগেন্দ্রবাবু বৈকালে আপিস হইতে আসিলে মালী আসিয়া তাঁহার কাছে গাছ-চুরির নালিশ করিল,—তাঁহারই বাড়ীর এক ছেলে তাহার মনিবের বাগান হইতে গাছ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু, হারু রমানাথ উভয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উভয়ে আসিলে, মালী রমানাথকে দেখাইয়া কহিল, "এই বাবুই আমার গাছ নিয়েচে।"

নগেন্দ্রবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। রমানাথ ত সে রকমের ছেলে নয়! নগেন্দ্রবাবু ভাবিলেন, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোনো রহস্য আছে, বোধ হয় মালীর দেখিবার ভুল হইয়া থাকিবে।

নগেন্দ্রবাবু রমানাথকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "বল ত রমা, কি হয়েছিল ?" রমানাথ প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াও হারুর নিকট প্রতিশ্রুত বলিয়া কোনো

কথাই প্রকাশ করিল না। রমানাথ ছলছলনেত্রে বলিল, "ক্ষমা করবেন, আমি কিছু বলতে পারব না।" নগেন্দ্রবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। রমানাথ কখনও তাঁহার মুখের উপর কথা বলে নাই। নগেন্দ্রবাবু রাগিয়া গিয়া বলিলেন, "সে কি! বলতে পারবে না কি! রমানাথ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি কিছু বলতে পারব না।" নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা' হ'লে নিশ্চয়ই তুমি গাছ নিয়েচ!" রমানাথ চুপ করিয়া রহিল।

হারু দূরে দাঁড়াইয়া রমানাথের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, প্রতিমুহূর্তে তাহার ভয় হইতেছিল, রমানাথ কি বলিয়া ফেলে।

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, "তা' হ'লে বুঝলুম্, তোমার উপর আমার যে বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাসের তুমি সম্পূর্ণ অযোগ্য।"—একটু থামিয়া নগেন্দ্রবাবু আবার বলিলেন, "বুঝেছি, তুমি যে কেবল বিশ্বাসের অযোগ্য তা' নও, তুমি চোর, তুমি প্রবঞ্চক! তুমি আমাকে এতদিন প্রতারণা করে এসেছ!"—নগেন্দ্রবাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বেত লইয়া রমানাথকে উপর্যুপরি আঘাত করিতে লাগিলেন—বেত্রাঘাতে তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া গেল।

হারু সমস্তদিন আর রমানাথের কাছে ভিড়িল না; নগেন্দ্রবাবু রমানাথের সঙ্গে সেদিন কোনো কথা বলিলেন না, বাড়ির কেহই রমানাথের কোনো খোঁজ লইল না। নিতান্ত উপেক্ষায়, অনাদরে, বেদনায় রমানাথ আস্তে আস্তে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

হারুর মা বলিলেন, "যা হোক্ বাপু, অমন ছেলেকে বাড়িতে রাখতেও আমাদের ভয় করে।" তাঁহার দিদি বলিলেন, "আমি ত প্রথমেই বলেছিলুম, পাড়াগেঁয়ে ছেলে—পেটে পেটে নষ্টামি বুদ্ধি! ওদের কি বাড়িতে জায়গা দিতে আছে!"

রাত্রে খাবার সময় হারুর মা রমানাথকে ডাকিতে আসিলেন। রমানাথ বলিল, "আমার ক্ষিদে নেই, আমি খাব না।"

মাঝরাত্রে রমানাথ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। জ্বরের তাপে তাহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছিল, বেদনায় পা হইতে মাথা পর্যন্ত খসিয়া পড়িতেছিল। রমানাথ একাকী একঘরে থাকিত; সে উঠিয়া ঘরময় ছুটাছুটি করিতে লাগিল, তাহার মাসী, তাহার পল্লীভবনের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ভোর হইতে না হইতে রমানাথ দুইটি টাকা সঙ্গে লইয়া, খালিপায়ে খালিগায়ে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

পথের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া, ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিয়া, গাড়ি চড়িয়া, রমানাথ একেবারে তাহার পল্লীবাসভবনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দ্বিপ্রহরের প্রখর তেজে সমস্ত বনভূমি শুষ্ক, ম্রিয়মাণ; রৌদ্রের দাপটে গাছগুলি লুটাইয়া পড়িয়াছে। রমানাথ দৌড়াইয়া গিয়া, নদীর জলে কাপড় ভিজাইয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া সমস্ত গাছের তলায় জল দিয়া বেড়াইতে লাগিল। এখানে বকুল গাছটি একেবারে মরিয়া গিয়াছে, এখানে শিউলিগাছের সব পাতা খসিয়া পড়িয়াছে, এখানে গোলাপগাছটি কিসে ভাঙিয়া দিয়াছে। রমানাথ জ্বরগায়ে রৌদ্রে পুড়িয়া পুড়িয়া সব ঠিক করিতে লাগিল।

অপরাহ্ণের দিকে হঠাৎ মেঘ করিয়া টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দুইজন কৃষক লাঙল কাঁধে করিয়া মাঠে যাইতে যাইতে দেখিল, এক বালক ছোটো একটি সন্ধ্যামণির চারাগাছ নিজের শরীর দিয়া ঢাকিয়া বসিয়া আছে। তাহার কাছে গিয়া দেখিল, বালকটির জ্ঞান নাই—কোনো কথার উত্তর দিতে পারিতেছে না, কেবল মাঝে মাঝে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিতেছে, "একবার রোদে পোড়ায়, আবার বৃষ্টিতে ভেজায়,—এ কি কাণ্ড!"

কৃষকদের মধ্যে একজন রমানাথকে চিনিতে পারিল। সে রমানাথের মাসীকে খবর দিল। মাসী আসিলে সকলে ধরাধরি করিয়া রমানাথকে ঘরে লইয়া গেল। রমানাথের মাথা দিয়া তখন আগুন বাহির হইতেছে, চোখদুটা জবাফুলের মতো লাল হইয়া উঠিয়াছে—সে বিছানায় শুইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মাসী কাঁদিতে কাঁদিতে ঘটিতে জল আনিয়া রমানাথের মুখে চোখে দিতে লাগিল, পাখা করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিল। কৃষক দুইজনের মধ্যে একজন ক্ষেতের কাজে চলিয়া গেল, আর একজন পাড়া-প্রতিবেশিনীকে খবর দিতে ছুটিল। মাসী রমানাথকে লইয়া একলা বসিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই নগেন্দ্রবাবু হারুকে লইয়া রমানাথের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হারু রমানাথকে দেখিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে

কাঁদিতে বলিল, "আমি বাবাকে সব বলেছি ভাই, আর কথ্খনো এমন করব না—কথ্খনো না, কথ্খনো না! চল ভাই, আমাদের বাড়ি ফিরে চল।"

রমানাথ কোনো কথা কহিল না—অনেকক্ষণ নিস্পন্দের মতো থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া, দুইহাতে প্রাণপণে হারুর গলা জড়াইয়া ধরিল, তখনই আবার ছাড়িয়া দিয়া ঘটি লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। সকলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

কাঁটা মাড়াইয়া, বনজঙ্গল ভাঙিয়া, রমানাথ সন্ধ্যামণির গাছতলায় আসিয়া ঘটিটি একেবারে উপুড় করিয়া দিল। তখন তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, পায়ে বল নাই, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—মাটিতে শুইয়া পড়িল।

সকলে যখন রমানাথের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শ্রান্ত বালক ঘটিটি হাতে করিয়া সন্ধ্যামণির গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

লবতী' : আশ্বিন ১৩১৮

তী র্থে র প থে

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

মহামায়া বলিল, "তুমি মর।"

যোগমায়া বলিল, "আমি ত অনেকদিন মরিয়াছি আজ তোর কথায় নূতন করিয়া মরিতে পারিব না।"

মহামায়া বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর কন্যা। সে তাহার স্বামী রামদয়াল ঘোষালের সহিত রুগ্ন পিতাকে দেখিতে আসিয়াছিল।

যোগমায়া বিশ্বেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সে বিধবা। বিশ্বেশ্বরের পরিবারে থাকিয়াই সে ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছিল।

মহামায়ার বয়স উনিশ। যোগমায়া তাহার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়ো হইবে। মহামায়া সুন্দরী, যৌবনের উচ্ছলিত তরঙ্গে তাহার রূপরাশি তরঙ্গিত হইতেছিল। মহামায়ার রূপের গাঙে ভরা জোয়ার। আর বালবিধবা

যোগমায়াকে রূপসী বলিলে হয় ত সঙ্গত হইবে না। কিন্তু তাহার চঞ্চল নয়নের দিকে চাহিলে দৃষ্টি সহজে ফিরিতে চাহিত না। যোগমায়ার যৌবনে এখনও ভাঁটা পড়ে নাই। কিন্তু মহামায়ার মতো তাহার ভরা জোয়ারও নয়; বরং তটপ্লাবিনী খর-বাহিনী বন্যার সহিত তাহার অধিকতর সাদৃশ্য ছিল।

আকৃতির ন্যায় উভয়ের প্রকৃতিও অত্যন্ত ভিন্ন ছিল। মহামায়া গম্ভীর, স্থির, ধীর, আপনাতে আপনি নিমগ্ন। যোগমায়া চঞ্চল, অস্থির, অধীর, আপনার বিফলতায় আপনি অসন্তুষ্ট। বৈধব্যচিহ্নের সহিত, তাহার রূপের সহিত, এই চাঞ্চল্য শোভা পাইত না। পক্ষান্তরে, মহামায়ার সৌন্দর্য যেন এই যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যের অভাবে প্রাণহীন হইয়া থাকিত। মহামায়ার সৌন্দর্য মলিন; যোগমায়ার রূপেও বিশেষত্ব ছিল না। কিন্তু হৃদয়ের কোনও আবেগ, উচ্ছ্বাস যখন সহসা যোগমায়ার মুখে প্রতিবিম্বিত হইত, তখন তাহা মুহূর্তের মধ্যে সূর্যকরসমুজ্জ্বল শিশিরবিন্দুর মতো মনোহর শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

দুই ভগিনীতে কথা হইতেছিল। মহামায়া স্থির, অচঞ্চল। অপরা অস্থির, চঞ্চল,—সমীরসংক্ষুব্ধ তটিনীর মতো আপনার চাঞ্চল্যে আপনি কম্পিত তরঙ্গিত হইতেছিল।

মহামায়া বলিল, "আমার জন্য বলিতেছি না; এখনও বুঝিয়া দেখ।"

যোগমায়া বলিল, "আমি তোমার নিধি কাড়িয়া লইব না!"

মহামায়ার মুখে তাহার হৃদয়ভাব অনুসন্ধান করিলে কেহ বুঝিতে পারিত না, সে ক্রুদ্ধ, বিষণ্ণ, না বিরক্ত। কিন্তু যোগমায়ার হাস্যকিরণদীপ্ত মুখে চোখে কৌতুক উচ্ছলিত হইতেছিল।

যোগমায়া বলিল, "তুই সাবধানে পাহারা দিস্, নহিলে আমি চুরি করিব।"

মহামায়া বলিল, "চুরি করিয়া কোথায় বামাল রাখিবি? আমার জিনিস আমারই থাকিবে, তোর অদৃষ্টে কেবল চোর অপবাদ—"

যোগমায়া বলিল, "সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে।"

অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া যোগমায়া চাহিয়া দেখিল, রামদয়াল সেই দিকে আসিতেছেন। সে ছুটিয়া পলাইল।

রামদয়াল সন্নিহিত হইলে মহামায়া বলিল, "তুমি বাড়ি যাও।" রামদয়াল দেখিল, মেঘমেদুর অম্বরে সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো মহামায়ার গম্ভীর মুখে কিসের ছায়া ;—তাহা উদ্বেগের না আশঙ্কার, তাহা সে ভালো বুঝিতে পারিল না। কখনও সে তা পারিত না। রামদয়াল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন" ?

মহামায়া বলিল, "দু' জনে ঘরসংসার ছাড়িয়া কত দিন এখানে থাকিব? বাবাকে ফেলিয়া আমি ত যাইতে পারিব না, তুমি যাও।"

রামদয়াল বলিল, "তা কি হয় ? তোমাকে বাখিয়া রুগ্ন শ্বশুরকে ফেলিয়া চলিয়া গেলে লোকে কি বলিবে ?"

মহামাযার মুখে চোখে একটু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি শরতের শুভ্র মেঘের বিদ্যুতের মতো ক্ষণিক ও ক্ষীণ, কিন্তু বর্ষার বিদ্যুতের মতো তীব্র ! রামদয়াল কিছু বুঝিতে পারিল না। সে গত কয়েক দিবস হইতে কেমন অন্যমনস্ক হইয়াছিল, আপনাকে আপনি বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার উপব, মহামায়ার এই প্রহেলিকা দেখিয়া একটু অবাক্ হইয়া আবার অন্যমনস্ক হইতেছিল। এমন সময়ে মহামায়ার কণ্ঠ শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল।

মহামায়ার কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছিল, "লোকে কি বলিবে—তাই ভাবিয়া ত তোমার ঘুম হয না , যোগমায়া কি বলিবে,—তাই—"

ঘনঘটাচ্ছন্ন দুর্যোগে ঘোর নিশীথের গাঢ় অন্ধকারে মুক্ত প্রান্তবে দূরে সহসা বজ্রপাত হইলে পথিক যেমন বজ্রশব্দে চমকিয়া উঠে, আর চপলার চকিত আলোকে পলকের মধ্যে তাহার উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে এক মুহূর্তের জন্য প্রলয়ংকরী প্রকৃতির মূর্তি উদ্‌ভাসিত হয়, মহামায়ার এই ক'টি কথা শুনিয়া রামদয়াল তেমনই চকিত হইয়া উঠিল, মহামায়াব কণ্ঠোচ্চারিত যোগমায়ার নামে সে সহসা তাহার জীবনপথের সম্মুখে এক অদৃষ্টপূর্ব অস্পষ্ট ছবির আভাস দেখিতে পাইল।

রামদয়াল আত্মস্থ হইবাব পূর্বেই মহামায়া সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। রামদয়াল চাহিয়া দেখিল, মহামায়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার চর্মচক্ষুর উপর এই প্রকৃত দৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রজালমুগ্ধের ন্যায় সে আর এক নূতন ছবি দেখিতেছিল ! তাহাকে আসিতে দেখিয়া যোগমায়া যখন ছুটিয়া পলায়, তখন রামদয়াল তাহা দেখিয়াও দেখে নাই ; ইহাও

সম্পূর্ণ সত্য, তাহা দেখিবার মতো, তাহাও রামদয়ালের মনে হয় নাই। কিন্তু এখন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, পলায়মানা অসংবৃত-কেশবাসা যোগমায়ার চিরপরিচিত মূর্তি নিতান্ত নবপরিচিতের মতো, নিত্যনূতনের মতো, তাহার নয়নপটে অনবরত প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল।

২

রামদয়াল ইতিপূর্বে মহামায়ার সহিত এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই, এখন তাহা নিতান্ত কঠোর সত্যে পরিণত হইল। মহামায়ার চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরে জাগিয়া সে দেখিল, তাহার হৃদয়ের সিংহাসন শূন্য, সেখানে মহামায়া নাই। আর এক জন বিনা আহ্বানে, অজ্ঞাতসারে, মহামায়ার শূন্য সিংহাসন কখন অধিকার করিয়াছে! সে বিস্মিত বিরক্ত বিচলিত হইল বটে, কিন্তু কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না।

একবার মনে করিল, চলিয়া যাই। কিন্তু তাহা সঙ্গত মনে হইল না! পীড়িত শ্বশুরকে ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বৃদ্ধের আর কেহ ছিল না; বিষয়-আশয়ের কি বন্দোবস্ত হয়, তাহাও দ্রষ্টব্য বটে।

কিন্তু এ দিকে? রামদয়াল ভাবিল এ হয় ত স্বপ্ন। এ হয় ত ক্ষণিক। এই মরীচিকায় আমি কি সত্যই মুগ্ধ হইব?

রামদয়াল আপনার মনে আপনার মনের মতো বিবিধ যুক্তির রচনা করিল। শেষে সিদ্ধান্ত করিল, এক দিকে সম্ভাবনা, অন্য দিকে কর্তব্য। সম্ভাবনার ভয়ে কর্তব্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব কেন? মন কি এত লঘু? জীবন কি এত অসার? সংযম কি এত কঠোর? মানসিক ব্যাধি কি এত দুঃসাধ্য? তাই যদি হয়, আজ না হয় পলাইয়া বাঁচিলাম, কাল? পৃথিবীতে কোথায় প্রলোভন নাই? কোথায় গিয়া নিশ্চিন্ত হইব?

এই সব তর্কজালের অন্তরালে যে যোগমায়া লুকাইয়াছিল; তাহার কামনা, তাহার দর্শনলালসাই যে রামদয়ালের কর্তব্যবুদ্ধিকে এতটা উৎসাহিত করিতেছিল; যে আত্মসংযমের ভরসায় নির্ভর করিয়া সে আত্মজয়ের আশা করিতেছিল, তাহাই যে অসংযমের নামান্তর, তাহা রামদয়াল বুঝিতে পারিল না।

মহামায়া বুঝিল, কিন্তু উপায় ছিল না। যোগমায়া বুঝিল কিন্তু ফিরিতে

পারিল না। রামদয়াল বুঝিয়াও বুঝিল না, আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিল। ফলে কিন্তু মরিল মহামায়া।

মুমূর্ষুর অন্তিম-শয্যায়, মৃত্যুচ্ছায়ার আলো-আঁধারে, পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিন জনের কেহ অবসন্ন হইত না। আশায় নিরাশায়, সংশয়ে যাতনায়, শঙ্কায় ভাবনায়, তিন জনের হৃদয় মথিত হইতেছিল; তিন জনেই নীরবে স্রোতে ভাসিয়া চলিল, কেহ আর কিছু ভাবিল না।

৩

যোগমায়ার চঞ্চলতা কোথায় গেল? তাহার কামনা-পূর্ণ হৃদয় এখন নিস্তরঙ্গ। সেই চঞ্চল নয়নযুগল এখন প্রশান্ত, তাহাতে আর কৌতুকের রশ্মি নাই। সে হাস্যদ্যুতি কোথায় অন্তর্হিত হইল? অতৃপ্তির চাঞ্চল্য গেল, কিন্তু তৃপ্তির সে সান্ত্বনা, সে শান্তি কই? তবু এই পরিবর্তনে যোগমায়া যেন সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

মহামায়াও স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য হারাইল। তাহার সৌন্দর্যের সহিত গাম্ভীর্যের যে অসংগতি ছিল, তাহা দূর হইল। মহামায়া এখন প্রায় হাসে, সময়ে সময়ে হাসিয়া আকুল হয়, কেন? জীবনের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হারাইয়া সে চঞ্চল হইতেছিল। জীবনের নিষ্ঠুরতায় দলিত পিষ্ট ব্যথিত হইয়াও সে প্রতিজ্ঞা করিল, সুখ যায় যাক্, শান্তি ছাড়িব না।

আপনার ঘর পুড়িতে দেখিয়া যে নিকটে দাঁড়াইয়া হাসে, সে জানে, দু'দশ কলসী জলে এ আগুন নিভিবে না! তবু না কাঁদিয়া সে হাসে কেন? হায় বিড়ম্বনা!

৪

একদিন মুমূর্ষু পিতার শিয়রে বসিয়া মহামায়া ঢুলিতেছিল।—আর জাগিয়া থাকিতে পারে না। মনে করিল, হয় রামদয়ালকে, নয় যোগমায়াকে ডাকিয়া দিয়া নিজে একটু ঘুমাইবে। মহামায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় গেল। রামদয়ালের ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল, গৃহমধ্যে অন্ধকার। কথোপকথনের মৃদু অস্পষ্ট শব্দ মহামায়ার কানে আসিতেছিল। সে নীরবে দ্বারে হাত দিল। বুঝিল, দ্বার মুক্ত। দরজা একটু মুক্ত করিয়া দেখিল, ঘোর অন্ধকার, কিছু

দেখা যায় না। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ক্রমে সেই অন্ধকারে দেখিল, গৃহমধ্যে যোগমায়া ও রামদয়াল। মহামায়া না দেখিলেও তাহা বুঝিতে পারিত। তবু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। সেই গাঢ় অন্ধকার তাহার চোখে গাঢ়তম হইয়া আসিতেছিল। অনেক কষ্টে সে আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা করিল। তাহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহামায়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিল। সহসা মহামায়ার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল "বেশ!"

গৃহমধ্যে কণ্ঠস্বর নীরব হইল। মহামায়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া পিতার শয্যাতলে আসিয়া বসিল। তাহার শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিতেছিল;—নয়নের সমস্ত অশ্রু ঢালিয়াও তাহার জ্বালা ভুলিতে পারিল না।

মহামায়া স্বপ্ন না জাগরিত, তাহা আপনিই বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার একবার মনে হইল, সোপানে কাহার পদশব্দ! তাহার পর যেন শুনিতে পাইল, কে ধীরে ধীরে সদর-দরজা উন্মুক্ত করিল! সে স্বপ্নোত্থিতের মতো উঠিয়া বসিল, ধীরে ধীরে প্রদীপ হইতে একটি শলিতা জ্বালিয়া লইয়া পার্শ্বের গৃহের দ্বারে গিয়া দেখিল,—দ্বার মুক্ত। কম্পিতহস্তে শলিতাটি ধরিয়া ভিতরে চাহিল, সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সোপানমূলে আসিয়া দাঁড়াইল; এই সময়ে তমোময়ী যামিনীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের মতো সহসাগত পবনবেগে শলিতাটি নিভিয়া গেল। অন্ধকারে প্রাচীর ধরিয়া সে নীচে নামিল; অন্ধকারে বাহির-দরজার দিকে যাইতে লাগিল। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া উন্মুক্ত-দ্বারপথে একাদশীর চন্দ্রালোক প্রবেশ করিতেছে, সম্মুখে অনন্তপ্রসারিত নক্ষত্রভূষিত গগনের কিয়দংশ, আর তাহার নিম্নে আলোক ও আঁধারে অস্পষ্ট গ্রামপথ।

মহামায়া আর দাঁড়াইতে পারিল না, ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

একবার মনে করিল, এ যাতনা সহি কেন? মরিলে ত জুড়াইতে পারি। কিন্তু তাহা হইলে পীড়িত পিতার কি হইবে? আবার ভাবিল, আর একবার না দেখিয়া মরিব? কিন্তু আর কি দেখা পাইব?

তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল,—কৃতাঞ্জলি হইয়া ঊর্ধ্বমুখে

কহিল, "যাও,—মরিবার আগে আর একবার তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করে!"

৫

এগার বৎসর অতীত হইয়াছে। স্বামিপরিত্যক্তা পিতৃহীনা মহামায়া এই কয় বৎসর শোকে দগ্ধ ও দুঃখে জীর্ণ হইয়াও বাঁচিয়া আছে। সংসারে তাহার কোনও অবলম্বন ছিল না, বন্ধন ছিল না। কেবল এক আশাবৃন্তে তাহার জীবনকুসুম সম্বদ্ধ হইয়াছিল ;—মরিবার আগে অভাগীর অদৃষ্টে কি একবার তাঁহার চরণদর্শন ঘটিবে না ?

এই সময়ে গ্রামে এক জন পুরুষোত্তম সেথো উপস্থিত হইল। গ্রামে গ্রামে কোলাহল পড়িয়া গেল। সন্নিহিত সাত আটখানি গ্রামের নরনারী মিলিয়া পুরুষোত্তমতীর্থে দারুব্রহ্ম-দর্শনে যাত্রা করিল।

মহামায়াও তাহার সঙ্গী হইল। মনে মনে ভাবিল, তাঁহার দর্শন পাইলাম না, ঠাকুরের চরণ পাইব কি ?

৬

দূর পথ। যাত্রীর দল পদব্রজে যাত্রা কবিল। ক্রমে তাহারা মেদিনীপুর পার হইয়া উৎকলের সীমায় প্রবেশ করিল।

যাত্রার দশ দিন পরে যাত্রীর দল একটি চটীতে উপস্থিত হইল। রথের যাত্রী চলিয়াছে, পথে জনতার সংখ্যা হয় না। মহামায়ার গ্রামস্থ যাত্রীর দল যখন রাসপুরের চটীতে পঁহুছিল, তখন সেখানে বিসূচিকা বড়ো প্রবল। তীর্থযাত্রীর মৃতদেহে ক্ষুদ্র গ্রাম পরিপূর্ণ। পথের ধারে, প্রান্তরে, বৃক্ষতলে, সরোবরতীরে, সর্বত্র মৃতদেহ। কেহ বা অর্ধমৃত, সঙ্গীরা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এ পথে কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। দলের কেহ পীড়িত হইলে সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া যায়। পরিত্যক্ত হতভাগ্য অভীষ্ট তীর্থের পথেই চরম ও পরম তীর্থে চলিয়া যায়।

চটীতে স্থানাভাব। অনেক কষ্টে সন্ধ্যার পর একটি দোকানে মহামায়ার দলস্থ সকলে আশ্রয় লইলেন।

সেই দিন মধ্যরাত্রে সেই দোকানে পূর্বাগত যাত্রীর দলের এক জন পুরুষ

বিসূচিকায় আক্রান্ত হইল। মহামায়ার গ্রামের দল ভয়ে চটী পরিত্যাগ করিয়া সেই রাত্রেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

সকলে বাহিরে সমবেত হইলে দেখা গেল, মহামায়া দলে নাই।

বৃদ্ধ রামহরি চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "মহামায়া কই ? মহামায়া !"

একজন বলিল,—"সে চটীতে পড়িয়া আছে, তাহার উঠিবার শক্তি নাই। তাহাকেও রোগে ধরিয়াছে।"

এ পথের এই দস্তুর। কোন্ পথেই বা নয় ? আপনাকে বিপন্ন করিয়া কে পরের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিবে ? যাত্রীর দল চলিয়া গেল। মহামায়া একাকিনী, অসহায়াঁ, মরণাহতা, সেই চটীতে পড়িয়া রহিল।

চটীর এক প্রান্তে মহামায়া ও অন্য প্রান্তে অপর দলের সেই রুগ্ন যাত্রী— উভয়েরই জীবনবন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছিল। মহামায়াকে দেখিবার কেহ ছিল না, কিন্তু এক বর্ষীয়সী রমণী রোগাক্রান্ত পুরুষের শুশ্রূষায় নিরত ছিল। অপরিচিতার কি প্রাণের ভয় নাই ? অথবা যে মৃত্যুশয্যায়, সে ইহার প্রাণাধিক ?

মহামায়া যাতনায় অস্থির হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার কাতর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া অপরিচিতা প্রদীপহস্তে তাহার শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইল। মহামায়ার মুখের দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "তোমার অদৃষ্টে জগন্নাথ-দর্শন নাই।"

মহামায়া বলিল, "তাহাতে দুঃখ নাই। মরণেও দুঃখ নাই। কিন্তু তাঁহাকে না দেখিয়া—"

অপরিচিতা বলিল, "কাহাকে ? মরণেও যদি দুঃখ নাই, তবে তোমার এ দুঃখ কিসের ?"

"বড়ো আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম, মরিবার আগে তাঁহার পদধূলি লইয়া মরিব। মরি, তাতে দুঃখ নাই। তাঁহাকে দেখিয়া মরিলাম কই ?"

অপরিচিতা প্রদীপ রাখিয়া মহামায়াকে তুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। তখন সে মহামায়ার শয্যা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

মহামায়া মনে করিল, এই শেষ ,—বাহিরে ফেলিয়া দিতে যাইতেছে।

সেই গৃহের অপর প্রান্তে, আর এক জন মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে মহামায়ার

শয্যা রাখিয়া, অপরিচিতা প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিল। তাহার পর মহামায়াকে বলিল, "দেখ !"

মহামায়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "কি ?"

সে বলিল, "তোমার স্বামী।"

মহামায়া চমকিয়া উঠিয়া বসিতে গেল, পারিল না। আবার শয্যায় পড়িয়া সবিস্ময়ে সাগ্রহে বলিল, "সে কি ?"

অপরিচিতা কহিল, "তোমার স্বামী রামদয়াল ঐ মৃত্যুশয্যায়। দেখ।"

মহামায়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "আমি যে আর দেখিতে পাই না,—দেখাও, দেখাও,—তুমি কে ?"

অপরিচিতা মহামায়াকে তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—"দেখ ! তোমার স্বামীকে দেখ। আমি যোগমায়া—"

মহামায়া চীৎকার করিয়া উঠিল !—যোগমায়া পাষাণপ্রতিমার ন্যায় অবিচল। সে মহামায়াকে শয্যায় শায়িত করিয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল।

মহামায়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "তাঁর পদধূলি দাও, মরিবার আগে দাও দিদি, আমি সুখে মরি।"

যোগমায়া মুমূর্ষু রামদয়ালের পদধূলি আনিয়া তাহার মাথায় দিল।

রামদয়াল জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?—কে ?"

মহামায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, নয়নদ্বয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছিল। ইঙ্গিতে বুঝাইল, রামদয়ালের শয্যার কাছে লইয়া যাও।

যোগমায়া তাহার শয্যা আরও নিকটে টানিয়া আনিল,—মুমূর্ষুকে বলিল, "চিনিতে পার ? মহামায়া—"

রোগী একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। রোগী হস্ত প্রসারিত করিল। যোগমায়া মহামায়ার শীতল হাতখানি লইয়া মুমূর্ষুর শীতল হস্তে সমর্পণ করিল। উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া অনন্ত পথে যাত্রা করিল।

তাহার পর বহুকাল সেই চটীর পথের ধারে একটা পাগলী বেড়াইত। তাহার মুখে আর অন্য কথা ছিল না, যাত্রীর দল সবিস্ময়ে শুনিত,—পাগলী বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে, "বড়ো সুখ ! বড়ো সুখ !"

'সাজি'

মোহিনী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফেরি-ষ্টীমারে অবিনের সঙ্গে অনেক বছরের পর দেখা হতেই সে আমাকে একেবারে একখানা ছবি দেখিয়ে বললে—দেখতে পাচ্ছ? তোমার-আমার মতো হলে প্রথম প্রশ্ন হতো—তুমি কে হে? বা তোমাকে তো চিনলেম না! কিন্তু অবিন, সে কোনোদিনই আমাদের মতো সাধারণ একটা-কিছু ছিল না, সুতরাং সে আমাকে না চিনলেও, সে যে অবিন এটার প্রমাণ পেতে আমার একটুও দেরী হল না। ছবিটার সবটা দেখলেম অন্ধকার; কেবল নীচে একটা পিতলের ফলকে বড়-বড়-করে লেখা ছিল—'মোহিনী'। আমি সেইটে দেখিয়ে বললেম—মোহিনী বুঝি?

অবিন খানিকটা নিশ্বাস ফেলে বললে,—পেলে না। তবে শোনো!—বলেই আমাকে টেনে মাঝের বেঞ্চে বসালে। তখন শীতের সকাল, কুয়াশা ঠেলে জাহাজখানা আস্তে আস্তে জল-কেটে চলেছে। অবিন সুরু কল্লে—

কলকাতায় আমাদের বাসা-বাড়ীখানা অনেক-দিনের। এখন সেটা আমাদের বসত-বাড়ি হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালে কর্ত্তারা সে বাসাটা কেবল গঙ্গাস্নান আর কালীঘাট করবার জন্যেই বানিয়েছিলেন। খুবই পুরোনো এই বাসাবাড়ির ঘরগুলো, ঝাড়-লণ্ঠন কৌচ-কেদারা ওয়াটার-পেণ্টিং অয়েল-পেণ্টিং বড় বড় আয়না এবং সোনার ঝালর-দেওয়া মখমলের ভারি-ভারি পরদা দিয়ে যতদূর সম্ভব জাঁকালো এবং মানুষের প্রতিদিন বসবাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে কর্ত্তারা সাজিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে সেকালের সেই ধূলোয় ভরা, পুরোনো মদের ছোপ্-ধরা, সাবেকী আতরের গন্ধমাখানো এই সব ফারনিচার তখন কতক বিক্রি করে, কতক ঝেড়ে-ঝুড়ে মেরামত করে, আর কতক-বা একেবারে ফেলে দিয়ে বাড়িখানাকে একালের বসবাসের মত করে নিতে হচ্ছিল। আমি এখনো যেমন, তখনো অবিবাহিত। সেই সময় একদিন এই ছবিটা আমার হাতে পড়ল। খানিকটা কালো অন্ধকারের রং লেপা;—কেবলমাত্র দুটি সুন্দর চোখ—তাও অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে চেয়ে থাকলে তবে দেখা যেত।

জাহাজ এসে কাশীপুরের জেটিতে লাগল। একদল থার্ড ক্লাস যাত্রী মাড়োয়ারী নেমে গেল, এবং তার চেয়ে আরও বড় একদল কলের কুলী, মিলের চিনে মিস্ত্রী উঠে এল। অবিন ডেকের এধার থেকে ওধারে একবার পায়চারি করে নিয়ে ফিরে এসে বল্লে—

এই ছবিটা রাবিস্ বলে নিশ্চয়ই বৌবাজারে পুরোনো জিনিসের সঙ্গে চালান যেতো, কিন্তু যে-ঘরের দেয়ালে এটা খাটানো ছিল, সেই ঘরটার ইতিহাসটা বেশ-একটু রকমওয়ারী রকমের ছিল বলেই সে ঘরটায় আমি কোনো অদল-বদল ঘটতে দিইনি। আমাদের যিনি ছোট-কর্ত্তা তাঁরই সেটা বৈঠকখানা। এই ছোট-কর্ত্তাই আমাদের সেকালের শেষ-ঐশ্বর্য্যের বাতিগুলো দিনের বেলায় ঝাড়ে-লণ্ঠনে জ্বালিয়ে-জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছেন ; এবং নিজের হাতের হীরের আংটির বড়-বড় আঁচড়ে বিলিতি আয়নাগুলোকে সেই সব দিনকে রাত, রাতকে দিন করবার ইতিহাসের সন তারিখ এবং নামের তালিকায় ভরে দিয়ে গেছেন। এই কর্ত্তাব বাবুগিরির কীর্ত্তিকলাপের গল্প ছেলেবেলায় আরব্য-উপন্যাসের মতোই আমার কাছে লাগতো ; এবং বড় হয়ে যখন আমি এই ঘরের চাবি খুললুম, তখন গোলাপী আতর-মাখানো পুরোনো কিংখাবের গন্ধ-ভরা একটা অন্ধকারের মধ্যে এই ছবির দুটি কালো চোখ আমার দিকে এমনি একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে রইল যে সে-ঘরটায় কোনো অদল-বদল করতে আমার সাহস হল না। কিন্তু সে ঘরটাকে তালা-বন্ধ করে ফেলে রাখতেও আমার ইচ্ছে ছিল না। বাড়িব মধ্যে সেই ঘরটা সব-চেয়ে আরামের,—একেবারে ফুল-বাগানেব ধারেই ; দক্ষিণের হাওয়া এবং পূবের আলোর দিকে সম্পূর্ণ খোলা ঘবখানি! আমি সেইখানেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাস-মজলিস—সেকালের মতো নয়, একালের ক্লাব-রুমের ধরণে—গড়ে তুল্লেম। আমরা সেই সাবেককালের নাচ-ঘরটায় বসে চা-চুরুটের সঙ্গে পলিটিক্স সোসিওলজি থিওলজি এবং জার্ম্মান-ওয়ারের চর্চ্চায় ঘোরতর তর্কযুদ্ধে যখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছি তখন হঠাৎ এক-একদিন এই ছবিখানার দিকে আমার চোখ পড়লেই সেকালের বিলাসিতার সাজসরঞ্জামের মধ্যে, বিলাতী কেতায় আমাদের এই একালের মজলিস এত কুশ্রী বোধ হতো—দুই কালের ব্যবধানটা এমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত যে আমাদের তর্ক আর অধিক দূর অগ্রসর হতো না। আমাদের মনে হতো এ ঘরের স্বামী যিনি তাঁর

অবর্ত্তমানে অনাহূত আমরা একদল এখানে অনধিকার প্রবেশ করে গোলমাল বাধিয়েছি ; এখনি যেন বাবুর খানসামা এসে আমাদের এখান থেকে ঘাড়-ধরে বিদায় করে দেবে। মনের এই সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে ও-ঘরখানার মধ্যে আড্ডা জমিয়ে তোলা অসম্ভব দেখে আমার বন্ধুরা বলতে লাগল—ওহে অবিন্, তোমার ভাই ওই মোহিনীকে এখান থেকে না নড়ালে চলছে না ; ওর ওই ভুতুড়ে-রকমের চাহনিটায় আমাদের এখানে স্থির হয়ে থাকতে দেবে না দেখছি। কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষে হল না ;—মোহিনী যেখানকার সেইখানেই রইলেন ; বন্ধুরা একে-একে সরে পড়তে থাকলেন। এই সময় আমার মনে হতো—একালটা যেন একটা খোলসের মতো আস্তে আস্তে আমার চারিদিক থেকে খসে যাচ্ছে, আর আমার নিজ মূর্ত্তিটা পুরোনো খাপ থেকে ছোরার মতো ক্রমে বেরিয়ে আসছে। আমার মধ্যে যে সেকালটা ছিল, সে যেন দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠছে,—বুঝছি আমার রক্তের সঙ্গে সেকালের বিলাসিতার গোলাপী আতর এসে মিশছে, আমার দুই চোখের কোণে উদ্দাম বাসনার অগ্নিশিখা কাজলের রেখা টেনে দিচ্ছে ! এই সময় আমি এক-এক দিন এই ছবিখানার দিকে চেয়ে-চেয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছি। ঐ ছবির অন্ধকার ঠেলে ওপারে গিয়ে পৌছবার জন্য—ঐ কালোর মাঝখানে যে সুন্দর চোখ তারি আলোক-শিখায় নিজেকে পতঙ্গের মতো পুড়িয়ে মারবার জন্যে আমার দেহ-মন আবেগে থর-থর-করে কাঁপতো। আমার মনের এই তিমিরাভিসার বন্ধুরা পাগলামির প্রথম লক্ষণ বলে ধার্য্য করে নিয়ে আমাকে সাবধান কল্লেন, উপহাস কল্লেন, নানাপ্রকার উত্ত্যক্ত করে ভয় দেখিয়ে শেষে আমার ভরসা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গমন কল্লেন—যেখানে চায়ের এবং চুরুটের আড্ডা ভালো জমতে পারে।

আমি একলা ঘরে ; আর আমার মনের শিয়রে অন্ধকারের পরদার ওপারে 'মোহিনী' ! যবনিকা তখনো সরেনি, চাঁদ তখনো ওঠেনি। এ সেই-সব দিনের কথা হৃদয়তন্ত্রীতে যখন মিনতির সুর অন্ধকারে লুটিয়ে পড়ে বিনয় করছে—"এসো এসো দেখা দাও।" একখানা ছবি, তাও আবার প্রায় ষোলোআনাই ঝাপসা—সে যে এমন করে মনকে টানতে পারে এটা আমার নিজেরই স্বপ্নের অগোচর ছিল, বন্ধুদের কথা তো দূরে থাক। বললে বিশ্বাস করবে না, তখন বসন্তকালে ফুলের গন্ধ যদি আসতো, আমার মনে হতো ঐ

ছবিখানার মধ্যে যে আছে তারি যেন মাথাঘষার সুবাস পাচ্ছি! হাফেজ যে সজীব ছবিটি দেখে দেওয়ানা হয়েছিলেন তার চেয়ে পটের অন্দরে লুকিয়েছিল যে 'মোহিনী' সে যে কম জীবন্ত, কম সুন্দরী তা তো আমার মনে হতো না। নীল ঘেরাটোপ-দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আমার শ্যামা পাখী! তার সুর আমি শুনতে পাই, তার দুখানি ডানার বাতাসে নীল আবরণ দুলছে দেখতে পাই। আমার প্রাণের কান্না সে গান দিয়ে সাজিয়ে সুর দিয়ে গেঁথে আমাকেই ফিরে দেয়—কেবল চোখে দেখা আর দুই বাহুর মধ্যে—বুকের মধ্যে এসে ধরা দেওয়ার বাকি!

এতটা বলে অবিন হঠাৎ চুপ কল্লে। তখন আধখানা নদীর উপর থেকে কুয়াশা সরে গিয়ে জলের গায়ে সকালের আকাশ থেকে বেলফুলের মতো সাদা আলো এসে পড়েছে, আর আধখানা নদীর বুকে ভোরের অন্ধকার টল্‌টল্‌ করছে—এরি মাঝে দুই ডিঙায় দুই জেলে কালোর আলোর বুকে জাল ফেলে চুপ-করে বসে রয়েছে দেখছি। আমাদের জাহাজ থেকে একটা ঢেউ গড়িয়ে গিয়ে ডিঙা দুখানাকে খুব-একটা দোলা দিয়ে চলে গেল। অবিন সুরু কল্লে—

শুনেছিলাম তান্ত্রিক সাধকেরা না-কি মন্ত্রবলে জড়ে জীবনদান, অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলতে পারেন; আমি আমার মোহিনীকে মন্ত্রবলে কাছে—একেবারে আমার চোখের সম্মুখে—টেনে আনবার জন্য এমন-এক সাধকের সন্ধান করছি, সেই সময় আমার এক আর্টিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় 'মোহিনী'র ছবিটা যে কেমন-করে আমাকে পেয়ে বসেছে সেই ইতিহাস উঠল। বন্ধু আগাগোড়া ব্যাপারটা আমার মুখে শুনে বললেন—তোমার দশা সেই গ্রীস দেশের ভাস্করটার সঙ্গে মিলছে দেখছি! আমি বললেম—তার সামনে তো তবু তার 'মোহিনী' প্রাণটুকু ছাড়া আর-সমস্তটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু আমার 'মোহিনী' যে অবগুণ্ঠনের আড়ালেই রহে গেছে হে! এর উপায় কিছু বাৎলাতে পার? বন্ধু আমায় উপায় বাৎলে—বাড়ি গিয়ে এক শিশি আরক আমাকে দিয়ে পাঠালেন। সেকালটা যদি আমাকে বারো-আনা গ্রাস করেছিল তবু মনের এক-কোণে একালের বিজ্ঞানটার উপরে একটু যে শ্রদ্ধা তা তখনো দূর হয়নি। আমি বন্ধুবরের কথামতো ঘড়ি-ধরে হিসাব করে সেই আরকটা সমস্ত 'মোহিনী'র ছবিখানায় ঢেলে দিলেম। সে আরকটার এমন তীব্র গন্ধ যে আমায় যেন মাতালের মতো বিহ্বল করে তুললে।

তারপর কখন যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছি তা মনে এইটুকু মাত্র জানি যে আরক চালবার পরে 'মোহিনী'র ছবিখানা ধোঁয়ায় ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে আর আমি ভাবছি এইবার মেঘ কাটলো।

একমাস পরে কঠিন রোগশয্যা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আর-একবার এই ছবিখানার দিকে চেয়ে দেখলেম, সেটার উপর থেকে সেই চাহনিটা সরে গেছে কেবল তার নামটা আঁটা রয়েছে—সোনালী ফলকে, বড়-বড় অক্ষরে।

তখন শিবতলার ঘাটে জাহাজ লেগেছে, আমি তাড়াতাড়ি অবিনকে নমস্কার করে নেমে চলেছি, এমন সময় সে সজোরে আমার হাতে এক ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল—ওহে আর্টিষ্ট! মোছেনি হে, ভয় নেই; ছবিখানা পটের গম্ভীর থেকে গভীরতর অংশে গিয়েই আমার অন্তর থেকে অন্তরতম স্থানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভারতী : চৈত্র ১৩২৩

ব উ - চু রি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে সময়ে নব্য-বঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার একটা ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময়ের কথা বলিতেছি।

মহামায়া বর্দ্ধমান জেলার একটি সুনিবিড় পল্লীগ্রাম। সুনিবিড় অর্থাৎ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কুড়ি মাইল এবং পোষ্ট আফিস হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যভাগে দেবী মহামায়ার একটি বিগ্রহ স্থাপিত আছে—সেই হইতেই ইহার নামোৎপত্তি।

এই ক্ষুদ্র গ্রামটির একটি ক্ষুদ্র জমিদার আছেন তাঁহার নাম বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মধ্যম পুত্র অনাথশরণ, বি. এ. পরীক্ষা দিয়া কয়েকদিন হইল বাটী আসিয়াছে। ছেলেটির বয়স বাইশ বৎসর হইবে, বেশ পারিপাট্য

আছে, চেহারাটি মন্দ নহে। কিন্তু পিতা তাহার উপরে কয়েকটি কারণে অত্যন্ত চটা। প্রথমতঃ সে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া থাকে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ গৃহে ষোড়শী স্ত্রী রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে না। তাহার কারণ কি জান? সে বলে, যাহাকে আমি ভালবাসিয়া বিবাহ করি নাই, সে আমার স্ত্রী নহে ভগ্নী। যদি জিজ্ঞাসা কর, উহাকে বিবাহ করিলে কেন? সে বলিবে, যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আমার এ সমস্ত মতাদি ছিল না। বালিকার দশায় কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমরা উভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইব, তাহার পর ব্রাহ্মবিবাহের যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, সেই আইন অনুসারে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিব। ও তখন ভালবাসিয়া আর যাহাকে ইচ্ছা স্বামিত্বে বরণ করিতে পারিবে।

বিবাহের পর কলিকাতায় গিয়া অনাথশরণের একটি প্রাণের বন্ধু জুটিয়াছিল—তাহার নাম হেমন্তকুমার সিংহ। সে দীক্ষিত ব্রাহ্ম। তাহার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রপাতের অল্পকাল পরেই, অনাথের মনে ধারণা জন্মিল যে সে হেমন্তকুমারের দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী নগেন্দ্রবালাকে ভালবাসে। মনের এই চপলতায় প্রথমে অনাথ অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু হেমন্তকুমার তাহাকে সান্ত্বনা দিল। সে বলিল, ভালবাসা একটি ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ, কোনও অবস্থাতেই তাহাতে পাপ স্পর্শিতে পারে না। বিশেষতঃ হেমন্তকুমারের প্রবল বিশ্বাস, প্রেম-সম্পর্ক-বিহীন পূর্ব্বরাগ-বর্জ্জিত বিবাহ বিবাহই নয়। অনাথ মন্দাকিনীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করে নাই, সুতরাং সে তাহার স্ত্রী নহে ভগ্নী, এই অদ্ভুত মত হেমন্তই অনাথের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়াছে। নগেন্দ্রবালাও যে অনাথের প্রতি প্রণয়শালিনী ইহাও দুই বন্ধু অনুমান করিয়া লইল। এই বিবাহ হইলেই যথার্থ আদর্শ বিবাহ হয়, ইহাই হেমন্তকুমারের মত। কিন্তু অনাথের তথাকথিত স্ত্রী বর্ত্তমানে তাহা অসম্ভব। নগেন্দ্রবালার প্রতি প্রণয় ব্যক্ত করিবার অধিকার পর্য্যন্ত অনাথের নাই। হেমন্ত প্রায়ই বলিত—প্রাণে প্রাণে যোগ, আত্মায় আত্মায় মিলন, ইহাই ভালবাসার চরম সফলতা,—বিবাহ না-ই হইল। কিন্তু নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইন হইবার কথা উঠা পর্য্যন্ত, তাহারা অন্যরূপ পরামর্শ করিয়াছে।

মধ্যাহ্নকাল বিগত প্রায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের আম্র-পাকান রৌদ্র বাহিরে

ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। অনাথশরণ বহির্ব্বাটীর একটি কক্ষে ডেস্কের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট। এই কক্ষটি তাহার নিজস্ব। এইখানেই রাত্রে শয়ন করে। ভিত্তিগাত্রে কয়েকখানি বিলাতী ছবির সঙ্গে একটি একতারা টাঙ্গানো, প্রভাতে ও সায়াহ্নে এইটি বাজাইয়া সে ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া থাকে। গৃহসজ্জার মধ্যে একটি ক্লক, একটি আলমারি, একটি আলনা এবং শয়নের খাট ছাড়া আর কিছুই নাই।

ডেস্কের ভিতর হইতে অনাথ হেমন্তকুমারের একখানি সদ্যঃপ্রাপ্ত চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার যেখানে যেখানে নগেন্দ্রবালার নাম ছিল, সেখানে সেখানে চুম্বন করিল। চিঠিখানি সম্মুখে রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কি যেন ধ্যান করিতে লাগিল। ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল।

অনাথ তখন ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া, পত্রখানি খামে বন্ধ করিল। এক টুকরা কাগজ লইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল :—

"আজ রাত্রি বারটার পর সকলে নিদ্রিত হইলে তুমি একবার আমার ঘরে আসিও।"

লিখিয়া কাগজখানিকে পাকাইয়া পাকাইয়া ছোট করিল। পূর্ব্বকথিত খামসুদ্ধ চিঠিখানি ডেস্কে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখে, অঙ্গন জনশূন্য। প্রথম কক্ষে, তাহার বউদিদি কয়েকজন সখীকে লইয়া তাস খেলিতেছেন। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পালঙ্কের উপর জননী নিদ্রামগ্না। কুলুঙ্গীর কাছে তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি দাঁড়াইয়া, চুরি করিয়া কুল আচার ভক্ষণ করিতেছে। কাকাকে দেখিয়া সে অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া ফেলিল। কাকা তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না কবিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। তৃতীয়টি পূজার ঘর; নারায়ণ-শিলা আছেন। মূর্ত্তিবিদ্বেষবশতঃ ইদানীং অনাথশরণ এই কক্ষে প্রবেশ করিত না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী মন্দাকিনী মেঝের উপর বঁটি পাতিয়া তেঁতুল কাটিতেছে। দক্ষিণ হস্তের কাছে কলার পাতার উপর কতকটা কাটা তেঁতুল; বঁটির নিম্নে একরাশি কাঁইবীচি ছড়ান। মন্দাকিনীর ওষ্ঠাধর তাম্বুলরাগরঞ্জিত; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম; অঞ্চলাগ্র গলায় জড়ান। মন্দা আপন মনে হেঁট হইয়া তেঁতুল কাটিতেছিল। স্বামীকে

দেখিতে পায় নাই। অনাথ প্রায় এক মিনিটকাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ত্রীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। বিবাহের পর এই সে প্রথম মন্দাকে ভাল করিয়া দেখিতেছে।

উঠানে আমগাছের শাখা হইতে একটা পাকা আম বাতাসে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে মন্দা চমকিয়া বাহিরের পানে চাহিল ;—দেখিল বারান্দায় স্বামী দাঁড়াইয়া। তৎক্ষণাৎ সে বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। আধহাত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া জানালার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবিগুলি ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

অনাথ মৃদুপদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিল। মন্দাকিনীর পা লক্ষ্য করিয়া পাকানো কাগজখানি ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে মন্দা কাগজখানি কুড়াইয়া লইল। প্রথমতঃ দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। জানালার কাছে আসিয়া কাগজখানি খুলিয়া পাঠ করিল। তাহার পর একবার বাহিরে চাহিল। একটা আমগাছে কাঁচা পাকা অসংখ্য আম ধরিয়া রহিয়াছে। তাহার ভিতরে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। অনেক দূরে ঘুঘু ডাকিতেছে। আবার কাগজখানি পড়িল ; আবার আম-গাছের পানে চাহিল। গাছের ফাঁকে আকাশ দেখা যাইতেছে। মন্দা কাগজখানিকে বুকে চাপিয়া ধরিল। গলবস্ত্র হইয়া, নারায়ণ শিলার সিংহাসনের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। উঠিয়া আবার জানালার কাছে গিয়া কাগজখানি পাঠ করিল।

আজ তাহার জীবনের কি দিন ? বিবাহের পর এই প্রথম স্বামী তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন। জরগায়ে মন্দার বিবাহ হইয়াছিল। ফুলশয্যা হইতে পায় নাই। যে তিনদিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিল, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন সে তেরো বৎসরের। মাঝে একবার আসিয়া কয়েক মাস ছিল, তখন অনাথের নূতন "মতাদি" হইয়াছে। পরিজনবর্গের বহু আকিঞ্চন সত্ত্বেও অনাথ অন্তঃপুরে শয়ন করে নাই। এবার রাগ করিয়া তাহাকে কেহ বাটীর ভিতর আনিবার চেষ্টা করে নাই। অনাথের মাতা প্রতিদিনই নবীনাগণকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেন। কেহ কর্ণপাত করিত না। এতদিনে স্বামীর কি মনে পড়িয়াছে ? মন্দার এ জন্মটা কি তবে বিফল হইবে না ? স্বামী থাকিতেও তবে কি তাহাকে বিধবার জীবন যাপন করিতে হইবে না ?

তাহার আত্মীয়াগণের, সখীদের, স্বামীর ভালবাসার কথা, সোহাগের কথা, শুনিয়া শুনিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইত। মনে হইত, কি পাপ সে করিয়াছে যাহার জন্য ঈশ্বর তাহাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছেন! এইবার কি সে সব দুঃখ তবে দূর হইবে?

হঠাৎ মন্দাকিনীর চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল। অর্গলিত দুয়ারে বাহির হইতে কে গুম্ গুম্ করিয়া কিল মারিতেছে।

ব্যস্ত হইয়া মন্দাকিনী দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার ছোট ননদ হরিমতি। হরিমতি বালবিধবা। আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহার এ দশা ঘটিয়াছে। হরিমতি মন্দার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়; তবু দুই জনে খুব ভাব। দুই জনে একত্র এক শয্যায় শয়ন করে। দুই জনে দুই জনের সকল সুখ-দুঃখের ভাগী।

মন্দাকে দেখিয়া হরিমতি চমকিয়া বলিল—"তোর কি হয়েছে লা?"

মন্দা ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"হবে আবার কি?"

"দোর বন্ধ করে কি করছিলি?"

মন্দা চুপ করিয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হরিমতির ভারি সন্দেহ হইল। মন্দার গলাটি জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে বলবিনে ভাই?"

"বলব।"

"কখন বলবি?"

"রাত্তিরে।"

"না এখনি বল্।"

মন্দাও বলিবে না, হরিমতিও ছাড়িবে না। শেষে মন্দা বলিল।

শুনিয়া প্রথমটা হরিমতি চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

মন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"হাসছিস কেন ভাই?"

হরিমতি বলিল—"হাসছি তোর বরটির রকম দেখে। আমি যা ভেবেছিলাম তাই। এবার এসে অবধি ছোড়দার উস্‌খুস্ করে বেড়ান হচ্ছে। বলেও ছিলাম বড় বউদিদিকে।"

"কি বলেছিলি?"

"বলেছিলাম, ওগো, এবার হয়ত ছোড়দার মন হয়েছে। এবার তোমরা চেষ্টা কর দেখি, এবার হয়ত ঘরে আসবেন। তা বউদিদি বল্লেন—মন হয়েছে ত আসুক না। আমি কি বারণ করেছি নাকি? আমি বল্লাম—এতদিন আসেন নি, এখন আপনা হতে কি আসতে পারেন? লজ্জা করে হয়ত। তিনি বল্লেন—সে বার অমন করে আমাদের অপমান করলে, আবার আমি সাধ্‌তে যাব! আমি তেমন মেয়ে নই। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। দু মাস ত এখন ছুটি আছে। ভুগুক, জব্দ হোক।"

মন্দা বলিল—"আমি কিন্তু ভাই যেতে পারব না।"

"কেন?"

"সে আমার ভারি লজ্জা করবে।"

হরিমতি হাত নাড়িয়া বলিল—"ওলো দেখিস! কচি খুকীটি কিনা; বরের কাছে যেতে লজ্জা করবে! কতক্ষণে যাবি, ঘণ্টা গুণছিস, তাই বল্। মুখে আর ন্যাকামো করতে হবে না।"

মন্দা বলিল—"না ভাই ঠাট্টা রাখ্। আমার ভারি ভয় হচ্ছে।"

"প্রথম দিনটে ভয় হতে পারে। তা, একদিন বই ত নয়।"

"রোজ রোজ আমি যাব বুঝি? তা হলে একদিন ধরা পড়তে হবে না?"

"ধরা না পড়লে আর উপায় কি ভাই? একদিন লজ্জা ত ভাঙ্গতেই হবে।"

"তার চেয়ে তুই বরং বউদিদিকে বল্‌গে আর একবার। তিনি যা হয় করবেন।"

"আচ্ছা তা বলব, কিন্তু আজকের দিনটে চুরি করেই তোদের দেখা হোক। দেখিস্ চুরির কাঁচা পেয়ারাটা আমটার মতন চুরির সব জিনিসই বড় মিষ্টি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"ছোট বউ, ও ছোট বউ, ঘুমুলি ভাই?"

রাত্রে শয্যায় হরিমতি মন্দাকিনীকে ডাকিল। মন্দাকিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল—"বারোটা হয়েছে?"

"বারোটা ছেড়ে এই একটা বাজল ছোড়দার ঘড়িতে।"

"তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?"

"নাঃ—আমার চোখে কি আর ঘুম আছে ? যত ঘুম তোর। যার বিয়ে তার হুঁস নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।"

এই কথা বলিয়া হরিমতি প্রদীপ জ্বালিল। আলনা হইতে একখানা ধোয়া দেশী শাড়ী পাড়িয়া বলিল—"নে এইখানা পর্।" মন্দা বলিল—"না ভাই,—আর অততে কাজ নেই।" হরিমতি বলিল—"দূর ছুঁড়ি, এই ময়লা কাপড় পরে কি যায় ?" বলিয়া মন্দার আঁচল ধরিয়া টান দিল। তখন মন্দা হরিমতির আদেশ পালন করিতে পথ পাইল না।

কাপড় পরা হইলে হরিমতি বলিল—"বল্ এগিয়ে দিতে আসতে হবে না কি ?" মন্দাকিনী একটা প্রচলিত দেশীয় ঠাট্টা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া লইল। কারণ এ সময় হরিমতিকে রাগানো সুবুদ্ধির কর্ম্ম হইবে না। সুতরাং বলিল—"নইলে আমি বউ মানুষ একা যাব নাকি ?"

দুই জনে দুয়ার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইল। নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রি। মন্দাকিনীর পায়ে মল ছিল, ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। হরিমতি সে শব্দে চমকিয়া বলিল—"আ মরণ! মল চারগাছা খুলিস্নি ? ভাবে ভোর হয়েছিস্ যে।"

মন্দাকিনী মল খুলিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া আসিল। তারপর দুই জনে বৈঠকখানা অভিমুখে চলিল। কাছাকাছি পর্য্যন্ত গিয়া হরিমতি মন্দাকিনীর কানে কানে বলিল—"দোর ভেজিয়ে রাখব, আস্তে আস্তে সাবধানে আসিস এখন।" বলিয়া সে ফিরিয়া গেল।

মন্দা ধীরে ধীরে সিঁড়ি চারিটি ভাঙ্গিয়া স্বামীর ঘরের বারান্দায় উঠিল। দুয়ারের ফাঁক দিয়া দেখিল, আলো জ্বলিতেছে। প্রবেশ করিতে তাহার অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। বুকটি দুড়্ দুড়্ করিতে লাগিল। পা আর উঠে না। শেষে সাহসে ভর করিয়া দুয়ারটি নিঃশব্দে খুলিয়া প্রবেশ করিল।

দেখিল, মাথার শিয়রে বাতি জ্বালিয়া স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন।

পিছু ফিরিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া মন্দাকিনী খিল দিল। বাতিটা নিবাইয়া দিল। ঘরে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল, এখন তাহা যেন হাসিয়া উঠিল। স্বামীর বিছানায়, স্বামীর মুখে, জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। মন্দা দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ

সেই সুপ্ত মুখখানি দেখিল। ভাবিল—ইনি আমার স্বামী। আমার স্বামী বড় সুন্দর।

এইরূপে এক মিনিট অতিবাহিত হইল। মন্দা মনে মনে বলিল—"বেশ মানুষ ত। লোককে ডেকে এনে নিজে দিব্যি করে নিদ্রা হচ্চে।"

কি করিবে কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। শেষে স্থির করিল, কখনও ত পদসেবা করিতে পাই নাই, এই প্রথম সুযোগ ছাড়ি কেন?

তখন সে সন্তর্পণে স্বামীর পদতলে উপবেশন করিযা, পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আরামে অনাথশরণের নিদ্রা গভীরতর হইল। জানালা দিয়া মিঠা মিঠা দক্ষিণা বাতাস আসিতেছে। এই ভাবে কিয়ৎকাল—প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিলে, মন্দা স্বামীর পার কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দুইটা বাজিবা মাত্র অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চেতনা প্রাপ্তির প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত অনুভব করিল, তাহার মন যেন কিসের প্রতীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। ক্রমে স্মরণ হইল, আজ মন্দাকিনীকে আসিতে বলিয়াছে, যতক্ষণ জাগিযা ছিল, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন সাড়ে বারোটা হইয়া গেল তখন মন্দাকিনী আসিবে না বুঝিয়া শয়ন করিয়াছে। এই ভাবিতে ভাবিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। অমনি তাহার পা মন্দাকিনীর গায়ে ঠেকিল। কোমল স্পর্শে অনাথ বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল মন্দাকিনী ঘুমাইতেছে। জ্যোৎস্না তখন সরিয়া গিয়াছে, মন্দাকিনীর মুখখানির উপর পড়িয়াছে। সেই আলোকে অনাথ সুপ্তিমগ্না নবযৌবনা পত্নীকে দেখিতে লাগিল। বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইল। ঠোঁট দুখানি এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে, মন্দা বুঝি তখন কোনও স্বপ্ন দেখিতেছিল।

স্ত্রীর মুখপানে চাহিযা অনাথ ভাবিতে লাগিল, এ বড সুন্দর ত। এ যেন নগেন্দ্রবালার চেয়েও সুন্দর। দুই তিন মিনিট এইভাবে কাটিলে অনাথ সহসা মুখ ফিরাইয়া লইল, চক্ষু বুজিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—হে ঈশ্বর, আমার হৃদয়ে বল দাও।

চন্দ্রালোক হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে ভাবিযা অনাথ ঝটিতি বাতিটা জ্বালিয়া ফেলিল। কেরোসিনের তীব্র আলোকে মনে হইল বুঝি স্বপ্ন-জড়িমা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দাকিনীর পায়ে হাত দিয়া তাহাকে জাগাইল।

মন্দা উঠিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কাপড়চোপড়গুলা কিছুতেই

যেন আর বাগ মানে না। অনেক চেষ্টার পর, রীতিমত ঘোমটা দিয়া অনাথের পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া, মুখ নত করিয়া বসিল।

অনাথ ডাকিল—"মন্দাকিনী।"

মন্দা নিমেষমাত্র কাল ঘোমটার ভিতর হইতে অনাথের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার চক্ষু নামাইল।

"মন্দাকিনী, আজ তোমায় কেন ডেকেছি জান?"

মন্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিল সে জানে না।

অনাথ বলিল—"তবে শোন। আমার সঙ্গে তোমায় কল্‌কাতায় যেতে হবে। যাবে?"

মন্দা উত্তর করিল না।

অনাথ বলিল—"যাবে কি?"

অতি মৃদুস্বরে মন্দা বলিল—"আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানে যাব।"

"আমার বাপ মার অমতে অজান্‌তে। যেতে পারবে?"

মন্দা কোনও উত্তর কবে না। অনাথ বলিল—"কথা কও। এখন লজ্জার সময় নয়। যেতে পারবে? বল।"

মন্দা বলিল—"মা বাপের অজান্‌তে কেন? তাঁদের অনুমতি নাও না, এখন ত সকলেই বিদেশে স্ত্রী নিয়ে যাচ্চে।"

"সে প্রস্তাব আমি হারু কাকাকে দিয়ে করিয়েছিলাম। বাবার মত নেই। বলেছেন—ওর এখন মতি গতির স্থিরতা কি? নিজে যে চুলোয় ইচ্ছে হয় সেই চুলোয় যাক্। বাড়ীর বউটোকে যে জুতো মোজা পরিয়ে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে, সে আমি বেঁচে থাকতে দেখতে পারব না।"

"তুমি আমায় ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে সত্যি কি?"

"আমরা দুজনে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হব।"

মন্দাকিনী প্রমাদ গনিল। স্বামী কি রহস্য করিতেছেন? বলিল—"আমি ঠাকুর দেবতা মানি, আমি কি করে ব্রহ্মজ্ঞানী হব?"

অনাথ রীতিমত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—"ও সকল বিশ্বাস তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে। ও সব ভুল। আমি কি করে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি?"

"তুমি লেখাপড়া শিখেছ। আমার কি বুদ্ধি আছে?"

"তোমাকেও লেখাপড়া শেখাব। কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেব। মেয়েদের ইস্কুলে ভর্তি করে দেব।"

মন্দাকিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"লেখাপড়া যদি শিখতে হয় তবে আমি তোমার কাছে শিখব। বুড়ো বয়সে আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।"

অনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"তুমি ভুল বুঝছ। আমরা দুজনে একত্র এক বাড়ীতে থাকব না ত।"

মন্দাকিনী বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে আমি কোথায় থাকব?"

"সেই ইস্কুলেই ; সেইখানে মেয়েরা পড়ে, থাকে, রীতিমত সকল বন্দোবস্ত আছে।"

মন্দা স্থির স্বরে বলিল—"তবে আমি যাব না।"

অনাথ দেখিল, যেখানে রোগ, সেখানে চিকিৎসা হইতেছে না। সকল কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। বলিল—"কেন আমি এতদিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিনি তুমি কিছু শুনেছ?"

মন্দা বলিল—"শুনেছি, কিন্তু ভাল বুঝতে পারিনি।"

"তবে বুঝিয়ে বলি, শোন। প্রথমতঃ আমাদের বিবাহ ভালবাসার ফল নয়। দ্বিতীয়তঃ, তাব অনুষ্ঠানাদি পৌত্তলিক মত অনুসারে হয়েছে। এই দুটি কারণে, আমার মতে, আমাদের বিবাহ, অসিদ্ধ। সুতরাং তুমি আমার স্ত্রী নও, বোনের মত। বুঝ্‌লে?"

"না।"

"তবে আব একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বলি শোন। আমি তোমায় ভালবাসিনে।"

মন্দা বলিল—"তা ত দেখতেই পাচ্চি।"

"আমি আর একজনকে ভালবাসি।"

"তবে আমায় কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে কি করবে?"

"দেখ মন্দা, আমি তোমায় ভাল না বেসে বিয়ে করেছি, তাই তোমার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে। তার ওপর বাকী জীবনটা নিষ্ফল করে দিয়ে আর সর্ব্বনাশ করব না। আমরা দুজনেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করলে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা যাবে। তখন তুমি স্বাধীন হবে, যাকে

ইচ্ছে বিবাহ কোরো। এই জন্যে কল্‌কাতায় গেলে আমাদের একত্রবাস অসম্ভব। সব কথা বুঝতে পারলে?"

মন্দাকিনী বেশী করিয়া ঘোমটা দিল। কোনও উত্তর করিল না, প্রশ্ন করিল না, কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অনাথ জানিতে পারিল, মন্দা কাঁদিতেছে।

ইহাতে অনাথ মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ইচ্ছা করিল মন্দার মুখের আবরণ খুলিয়া তাহার চক্ষু দুইটি মুছাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাহাকে বাধা দিল। এই রাত্রে, নির্জ্জন গৃহে, যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গ-স্পর্শ করা নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং শুধু বলিল—"মন্দা, কাঁদ কেন? আমি তোমার মঙ্গলের জন্যেই ত বলছি।"

কিন্তু মন্দাকিনী কিছুই বলিল না, তাহার ক্রন্দনও থামিল না।

অনাথ ডাকিল—"মন্দা!"—এবার স্বর অন্যরূপ; এ যেন আদরের স্বর। এ স্বর শুনিয়া মন্দা বেশী কাঁদিতে লাগিল।

অনাথ বিস্মিত হইয়া ভাবিল—এ কথায় মন্দার এত দুঃখ? এত ক্লেশ? একটা ভাবী পরিত্রাণের আনন্দ সে অনুভব করিল না? আমি ভালবাসি না—ভালবাসিতে পারি না,—তাহা জানে, এ বন্ধন ছিন্ন হইলে, জীবনের সুখময় পথে চলিবার অবসর পাইবে। তথাপি এ প্রস্তাবে এত দুঃখ কেন? তবে কি আমায় ভালবাসে?

এই সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া তিনটা বাজিল। মন্দা উঠিয়া বলিল—"আমি যাই।"

অনাথ মন্দাকে স্পর্শ করিল। তাহার হাতখানি ধরিল,—ধরিয়া বলিল—"তোমার মনের কথা আমায় খুলে বল মন্দা।"

মন্দা কম্পিত স্বরে উত্তর করিল—"আমার এখন মাথার ঠিক নেই।"

"তবে কাল এস। আসবে?"

"দেখব।"

"দেখব না মন্দা, কাল নিশ্চয় এস। অনাথের কণ্ঠস্বরে একটা আগ্রহ ধ্বনিত হইল। মন্দা বলিল—"আচ্ছা।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি পত্র পাঠমাত্র পূর্ব্ব পরামর্শ-মত শ্রীমতী মন্দাকিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলিয়া আইস। তোমার উত্তর পাইলেই আমি মহিলা বিদ্যালয়ে তাঁহার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব।

আমার সহিত দেখা হইলেই নগেন্দ্রবালা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তোমার প্রতি তাহার প্রেম যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগ্নী মন্দাকিনীকে লইয়া আসা সম্বন্ধে তুমি কিছু মাত্র দ্বিধা বা শঙ্কা করিও না। যদি বাধা প্রাপ্ত হও ত স্মরণ করিও পৃথিবীতে অধিকাংশ শুভকার্য্য সম্পাদনেই বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল ; ঈশা স্বীয় প্রিয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সর্ব্বমঙ্গল বিধাতা তোমার সহায় হউন।

ভবদীয়

শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ

অনাথ হেমন্তকুমারের পত্রের কোনও উত্তর দিল না। মন্দাকিনীর অশ্রুমাখা মুখখানি কেবল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে সম্মত নয়! সে যে ভারি দুঃখিত। কি করিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে?

অদ্য প্রভাতে মাখন সর্দ্দারের ব্যাপার দেখিয়া তাহার মত ও বিশ্বাসে একটু আঘাত লাগিয়াছে। হয় ত মন্দাকিনী তাহাকে ভালবাসে, তাই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রস্তাবে সে অত দুঃখাতুর। বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়সঞ্চার না হইলে, পরে যে তাহা হইবেই না, তাহার স্থিরতা সম্বন্ধে অনাথের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি আসিয়া তাহার হাতে একটি খাম দিয়া সবেগে পলায়ন করিল। খাম আঠা দিয়া বন্ধ, ভিতরে চিঠি রহিয়াছে, অথচ কোনও শিরোনামা নাই। অনাথ খামখানি ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল ; তাহাতে লেখা আছে :—

প্রিয়তমেষু

তুমি আমায় যেখানে লইয়া যাইবে, যাইতে প্রস্তুত আছি। যে দিন যে সময়ে বলিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব। আজ রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।

চরণাশ্রিতা দাসী

শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী

এ পত্র পাইয়া অনাথ ভারি বিস্মিত হইল। যাইতে প্রস্তুত? বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে আর দুঃখ নাই?

কয় পংক্তি অনাথ বারম্বার পাঠ করিল। যদি দুঃখ নাই তবে ভালবাসে না। অথচ লিখিয়াছে "প্রিয়তমেষু"—"চরণাশ্রিতা দাসী"—ইহার অর্থ কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিল, ওগুলা বাঁধিগৎ, ওগুলার কোনও বিশেষ অর্থ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাহার মনে ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র। মনকে সে দুই তাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে তোমাকে ভালবাসে না বাসে তাহাতে তোমার কি? মন বলিল—নাঃ—তাহার জন্য আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই। নগেন্দ্রবালার মানসী প্রতিমাকে সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বুকে চাপিয়া ধরিল, ভাবিল আর এক দিনও বিলম্ব করা হইবে না। কল্যই মন্দাকিনীকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। রাত্রি একটার সময় বাহির হইবে। দুই ক্রোশ দূরে রতনপুর গ্রাম; সে অবধি পদব্রজেই যাইবে। সেখান হইতে গোরুর গাড়ি করিয়া ষ্টেশনে যাইবে। তারকেশ্বর দিয়া যাইলে আট ক্রোশ, পাণ্ডুয়া দিয়া যাইলে এগারো ক্রোশ, পাণ্ডুয়া দিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। গ্রামের লোকজনের সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। একটু দূর হইবে, বিলম্ব হইবে, তা আর কি হইবে? সারারাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার কাল্পনিক আয়োজনে তাহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই মন্দাকিনীকে লিখিল :—

প্রিয় ভগ্নি,

আজ রাত্রি একটার সময় যাত্রা করিতে হইবে। ঐ সময় আমার ঘরে আসিও। জিনিসপত্রের মধ্যে দ্বিতীয় একখানি বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই লইও না।

শ্রীঅনাথশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রি একটার সময়, স্ত্রীকে চুরি করিয়া অনাথ পলায়ন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুইদিন পরে বেলা বারোটার সময় যখন পাণ্ডুয়ার বাজারে অনাথশরণ গোশকট হইতে মন্দাকিনীর সহিত অবতরণ করিল, তখন রৌদ্র অত্যন্ত প্রচণ্ডভাব

ধারণ করিয়াছে। দুইজনে স্বেদাক্ত কলেবর। গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া অনাথ একটা দোকানে উঠিল। দোকানী অভ্যর্থনা করিয়া মাদুর বিছাইয়া তাহাকে বসাইল। একটা ঝি আসিয়া মন্দাকিনীকে আড়ালে স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থানে লইয়া গেল।

সেই ঘরের সম্মুখেই বারান্দা। বারান্দার নিম্নেই একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। জল বড় নির্ম্মল; মন্দাকিনীর শরীর বড উত্তপ্ত; পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ। ঝিকে বাজার করিতে পাঠাইয়া মন্দাকিনী স্নান করিতে নামিল। তখনও সে যথেষ্ট বিশ্রাম করে নাই; গায়ের ঘাম পর্য্যন্ত মরে নাই। যতক্ষণ ঝি ফিরিল না, ততক্ষণ—আধঘণ্টা হইবে,—মন্দা জলে পডিয়া বহিল। ঝি আসিলে, উঠিয়া মাথা গা মুছিয়া রান্না চডাইয়া দিল।

এই অত্যাচারের প্রতিফল পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। রন্ধন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মন্দা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল।

অনাথ স্নান করিয়া জল খাইয়া ষ্টেশনে গিয়াছিল গাড়ীর খবর লইতে, এবং হেমন্তকুমারকে টেলিগ্রাম পাঠাইতে। ফিরিয়া আসিয়া দেখে, এই ব্যাপার। মন্দার গায়ে হাত দিল, গা একবারে পুডিয়া যাইতেছে। চক্ষু দুইটি জবার মত লালবর্ণ। শীতে হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

সঙ্গে না আছে বিছানা বালিস না আছে বাহুল্য বস্ত্র। মন্দা কিসেই বা শয়ন করে, কি বা গায়ে দেয়! অনাথ বলিল—"একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি কম্বল চেয়ে এনে বিছানা করে দিচ্চি।"

মন্দাকিনী বলিল—"তুমি আগে খেতে বস। তোমাকে ভাত বেড়ে দিই, তারপর শোব এখন।"

অনাথ বলিল—"পাগল! এখন ভাত বাড়তে হবে না। তোমার এমন অসুখ, আমি কি খেতে পারি?"

মন্দা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আমার অসুখ তা কি? তা বলে' তুমি উপবাসী থাকবে? দুদিনের কষ্টে তোমার মুখ শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে।"

অনাথ দোকানীর নিকট চাহিয়া একখানা বালাপোষ আর খান দুই তিন কম্বল লইয়া আসিল। সেইগুলি দিয়া বিছানা করিয়া মন্দাকে বলিল—"শোবে এস।" মন্দা বলিল,—"ও কি কথা? তুমি না খেলে আমি শোব না।"

অনাথ শুনিল না, মন্দাকিনীকে শয়ন করাইল। বিছানায় শুইয়া মন্দাকিনী

দুই তিন বার বলিল—"ভাত বেড়ে নিয়ে খাও তুমি আপনি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে কষ্ট হবে।" কিন্তু আর বেশীক্ষণ জিদ করিবার শক্তি তাহার রহিল না, অল্পে অল্পে জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল।

* * *

তিন দিন পরে যখন মন্দাকিনীর জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন সে চক্ষু খুলিয়া দেখিল, বিছানার কাছে স্বামী বসিয়া।

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"মন্দা কেমন আছ ?"

মন্দা বলিল—"ভাল আছি। তুমি ভাত খেয়েছ ?" বলিতে বলিতে আশে পাশে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, সে দোকান নহে, এ গৃহ ; পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি ! আমি এ কোথায় রয়েছি ?"

অনাথ বলিল—"মন্দা, তোমাকে যে আর কথা কইতে শুনব, তা ভাবিনি। তিন দিন কেটে গেছে। এ এখানকার জমিদারের বাড়ী।"

মন্দা বলিল—"তিন দিন !"

"হ্যাঁ মন্দা, তিন দিন তুমি অচেতন হয়ে ছিলে। এখন তোমায় যদি বাঁচাতে পারি, তবেই সব সার্থক।"

মন্দা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলিল—"তোমায় একটা কথা বলব।"

অনাথ বলিল—"কি মন্দা ?"

"আমাকে বাঁচিও না।"

এ কথা শুনিয়া অনাথের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বলিল—"ছি মন্দা, ও কথা কি বলতে আছে ? তুমি ভাল হবে, তুমি বাঁচবে।"

মন্দার ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল। জলভরা চোখ দুইটি অনাথের পানে ফিরাইয়া বলিল—"কি হবে আমার বেঁচে ? আমায় যেতে দাও।"

অনাথ বলিল—"না মন্দা, তোমাকে আমি যেতে দেব না।"

"কি করবে আমায় নিয়ে ?"

"আমি তোমায় ভালবাসব।"

রোগিণীর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক চিন্তার ভার আর সহিতে পারিল না। চক্ষু দুইটি মন্দা যেন ঘুমাইয়া পড়িল।

হইতে য়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু আসিলেন। অনাথ সহাস্যমুখে তাঁহাকে

নমস্কার করিয়া বলিল,—"দুপুর বেলাকার ওষুধটায় বেশ ফল হয়েছে। জ্ঞান হয়েছে। এই কিছুক্ষণ আগে কথাবার্ত্তা কয়েছেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"তবে আর ভাবনা নেই। এ জ্বরটুকু দুদিনে সারিয়ে দেব। কিন্তু আপনি যে মারা গেলেন। এ তিন দিন ত এক রকম না খেয়ে আপনি ঠায় বসে আছেন। আপনার মত পত্নীপ্রেমিক স্বামী আমি খুব কম দেখেছি।"

অনাথ মনে মনে বলিল—"খুব কম বটে।" প্রকাশ্যে বলিল—"আমার স্ত্রী, আমি ত স্বভাবতঃই কবব। কিন্তু আপনি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই।"

প্রবীণ ডাক্তার বাবু, আত্মপ্রশংসায় সঙ্কুচিতচিত্ত হইয়া বলিলেন,—"আমি বেশী কি করেছি? আমি যা করেছি সেই ত আমার পেশা, জীবিকা।"

"আপনি যদি বাবুদের বলে বাগানবাড়ী খুলিয়ে না দিতেন, তাহলে দোকানেব সে স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় কম্বলের ওপর শুয়ে আমার স্ত্রী কদিন বাঁচতেন?"

ডাক্তার বাবু কথা উল্টাইয়া লইয়া, অন্য কথা পাড়িলেন। তাহার পর ঔষধ পথ্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেদিন রাত্রি দশটায মন্দার জ্বর মগ্ন হইল। সে সারারাত্রি সুনিদ্রা উপভোগ করিল। তাহাব পার্শ্বে শয়ন করিয়া অনাথও কয় দিনের পর খুব ঘুমাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রভাতে যখন ডাক্তার বাবু আসিলেন, তখন মন্দাকিনী তাঁহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড দিল। জ্বর ছাড়িয়াছে শুনিয়া ডাক্তার বাবু অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, আর কিছু মাত্র ভয় নাই। এখন ইহাকে খুব প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন।

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে, অনাথ মন্দাকে নিয়মিত ঔযধ পথ্যাদি সেবন করাইল। তাহার পর দুইজনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

মন্দা বলিল—"এ কদিন কি খেলে?"

"ডাক্তার বাবুদের বাড়ী থেকে খাবার আসত।"

"তবে চেহারা এমন হয়ে গেল কেন ? একেবারে শুকিয়ে যে আধখানি হয়ে গেছ। আমিই তোমার যত কষ্টের মূল। আমার জন্যে কেন এত করলে ?"

অনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল—"যদি আমার ব্যারাম হয়, তা হলে তুমি আমার জন্যে কর না ?"

মন্দা বিছানার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"আর ব্যারামের প্রার্থনায় কাজ নেই।"

অনাথ মন্দার একখানি হাত ধরিয়া আদর করিয়া বলিল—"প্রার্থনা নাই করলাম, হলে কর কি না ?"

"করি না ত কি ?"

"কেন ?"

অশ্রুবদ্ধ কণ্ঠে মন্দা বলিল—"তুমি যে আমার স্বামী।"

অনাথ মন্দার হাতখানি চাপিয়া বলিল—"তুমি যে আমার স্ত্রী।"

মন্দা সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল—"কবে থেকে ?"

"যে দিন তোমায় ভালবেসেছি।"

মন্দাকিনী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বলিল—"তুমি না ব্রাহ্ম ? তুমি না মিছে কথা বল না ?"

অনাথ বলিল—"আমি ব্রাহ্ম, আমি মিছে কথা বলিনে, আমি তোমায় ভালবাসি।"

"তবে সে দিন বল্লে 'ভালবাসব'। কেন বলনি 'ভালবাসি' ?"

অনাথ নিরুত্তর। বলিল—"তুমি ত আমায় ভালবাস না।"

"কিসে জানলে ?"

"তুমি ত আমাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হতে দিতে সম্মত হয়েছিলে তাই ত কলকাতায় যাচ্ছিলে।"

মন্দা হাসিয়া বলিল—"তা বুঝি ?"

"কি তবে ?"

"আমি বুঝি আসতে চেয়েছিলাম ? ঠাকুর্ঝিই ত আমাকে পাঠালে।"

"তার ভারি ইচ্ছে তোমার আর একটি বিয়ে হয় ?"

"হ্যাঁ,—পাত্রও ঠিক করে দিয়েছিল।"

"কে ?"

"যমরাজা।"

অনাথ হাসিতে লাগিল। মন্দা বলিল—"ঠাকুঝি বলেছিল, তোকে যেমন দাদা বাড়ী থেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্চে, তুইও তেমনি পথে তার মন ডাকাতি করবি। না যদি পারিস, তবে—"

অনাথ বাধা দিয়া বলিল—"তবে ঐ বিয়ের বন্দোবস্ত ? তা ডাকাতিই করেছ বটে। এদিকে অন্য বিয়ের যোগাড়যন্ত্রটিও বেশ করে তুলেছিলে।"

মন্দা বলিল—"কিন্তু সে ভালবাসার বিয়ে হচ্ছিল না। তাই ব্যাঘাত হল। ঠিক কখন আমি ডাকাতিটে করেছি, শুন্‌তে পাইনে ?"

"সে সব পরে বলব।"

"কখন করেছি, সেইটে বল।"

"কখন ? যেদিন প্রথম আমার বিছানায় পার তলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে, তখন আরম্ভ করেছ আর কি। তার পর সারাপথে।"

চাণক্যপণ্ডিত বুধগণের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন, ঘৃতকুম্ভসমা নারী এবং তপ্তাঙ্গারসম পুরুষকে একত্র স্থাপন করিবে না, করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। সেই নরনারী স্বামী স্ত্রী হইলে এবং তরুণ বয়স্ক হইলে কি আর রক্ষা আছে!

মন্দা অল্প হাসিতে হাসিতে বলিল—"পথে তবে কেন আত্মসমর্পণ করনি ?"

অনাথ কিছুই না বলিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল—"নগেন্দ্রবালা ? আমার স্বামীকে নগেন্দ্রবালা নেবে, নগেন্দ্রবালার বড় সাধ্যি! চল একবার কলকাতায়, তাকে আমি দেখব।"

অনাথ বলিল—"কলকাতায় ত যাব না। পশ্চিম যাব, তোমার শরীর সারাতে।"

মন্দা এ কথা যেন কানে তুলিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি সে তোমায় ভালবাসে ? তা হলে তার ত ভারি দুঃখ হবে।"

"সে আমায় ভালবাসে কি না, সেই জানে আর ঈশ্বরই জানেন।"

"বলেনি ? জিজ্ঞাসা করনি ?"

"তার সঙ্গে কখনও এ কথা হয়নি।"

"তুমি ভালবাসতে তা সে জানে ?"

"কি করে জানবে ?"

মন্দা অভিমান ভরে বলিল—"সে না জানুক, তুমি ত বাসতে।"

অনাথ বলিল—"কৈ আর বাসতাম ? তা হলে তুমি এত শীঘ্র এত সম্পূর্ণ-ভাবে আমাকে জয় করলে কি করে ? এই ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেল আমি তাকে যথার্থ ভালবাসতাম না। শুধু চোখের ভালবাসা ছিল, অন্তরে প্রবেশ করেনি। তার বিদ্যা, তার বুদ্ধি, তার আচার ব্যবহারের সৌন্দর্য্য, এই সমস্ত আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল।"

দুইদিন পরে মন্দা পথ্য পাইল। দুইটি দিন দুই জনে বাগান বাড়ীতে বড়ই আনন্দে যাপন করিল।

আজ সন্ধ্যায় ডাক্তার বাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া, কল্য প্রভাতের গাড়ীতে তাহারা মুঙ্গের যাত্রা করিবে। সমস্ত ঠিকঠাক।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া অনাথ হেমন্তকুমারের নিকট হইতে এই পত্র পাইল—

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্

কলিকাতা
২৫ জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গলবার

প্রিয় ভ্রাতঃ

ভগ্নী মন্দাকিনীর অসুস্থতার সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বর শীঘ্র তাঁহার আরোগ্যবিধান করুন।

আজ তোমায় একটা দারুণ দুঃসংবাদ দিব, প্রস্তুত হও। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, নগেন্দ্রবালা তোমাকে ভালবাসেন। আমারও বিশ্বাস তাহাই ছিল। কিন্তু কল্য সন্ধ্যাকালে আমার সে ধারণা চূর্ণ হইয়াছে। শুনিলাম, শরতের সঙ্গে নগেন্দ্রবালার বিবাহ স্থির। আরও, শুনিলাম, দুই বৎসর হইতে তাঁহারা পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ। সুতরাং নগেন্দ্রবালার ব্যবহারে তুমি যে অনুমান করিয়াছিলে তোমার প্রতি তিনি প্রণয়রতা, তাহা তোমার ভ্রান্তি মাত্র।

এখন তুমি কি করিবে ? এ দুঃসহ শোক কেমন করিয়া বহন করিবে ?

তোমার আর একটা ভুল হইয়াছে। হিন্দু মতে যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে,

নূতন ব্রাহ্ম-বিবাহ আইনের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং তোমরা উভয়ে ব্রাহ্ম হইলেও, সে বন্ধন ছিন্ন করিবার পথও বন্ধ।

তুমি কি কলিকাতায় আসিবে? চারি পাঁচ দিনের মধ্যেও যদি ভগ্নী আরোগ্য লাভ করেন, এখানে আসিতে পার, তাহা হইলেও পূর্ব্বকথিত রাজ-বাড়ীর সেই কার্য্যটি হস্তান্তরিত হইবে না। কিন্তু আমার পরামর্শ, ভগ্নীকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া তুমি কিয়দ্দিন হিমালয়ের কোনও নিভৃত প্রদেশে গমন করতঃ তপস্যা ও উপাসনায় চিত্তস্থির ও আত্মশান্তিবিধান করিবে।

ভবদীয়

শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ

রাত্রি নয়টার পর ডাক্তার বাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া অনাথ স্ত্রীকে পত্রখানি দেখাইল। মন্দা পড়িয়া হাসিয়া বলিল,—"তবে আর নগেন্দ্রবালার ওপর আমার রাগ নেই। মুঙ্গেরে না গিয়ে কলকাতাতেই চল, নগেন্দ্রবালার বিয়েটা দেখতে হবে।"

অনাথ বলিল—"তাই চল। মুঙ্গেরে যাবার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, আমায় ভুলে যেতে নগেন্দ্রবালাকে অবসর দেওয়া।"

শুনিয়া মন্দাকিনী ভারি অভিমানের ভান করিল। বলিল—"তাই তখন মনের কথা খুলে বল্লেই ত হত! বলা হল তোমার শরীর সারাবার জন্যে পশ্চিম যাচ্চি।"

বাহিরে অন্ধকার বকুলগাছে একটা কোকিল বসিয়াছিল, সে হয়ত মানবের ভাষা বুঝিতে পারে। বুঝি মন্দাকিনীর এ ছলনাময় মানকথা শুনিয়া সে ভারি আমোদ পাইল। তাই মুহুর্মুহু ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল। অনাথ স্ত্রীকে বক্ষের নিকট টানিয়া লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"না গো না,—তা নয়।"

ভারতী : বৈশাখ ১৩০৭

স্মৃতিচিহ্ন

সরলাবালা সরকার

দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে যখন কাত্যায়নীর শ্বশুর, দেবর, স্বামী ও পুত্রকন্যা সকলেই একে একে ভবসংসারের বন্ধন কাটাইয়া চলিয়া গেলেন এবং বিষয়-সম্পত্তিও সেই সঙ্গে পরহস্তগত হইয়া পড়িল, তখন একমাত্র শিশুপুত্র নরেশ ও পর-প্রত্যাশা ভিন্ন আর তাঁহার কোন সম্বল রহিল না। রঘুপুরের মিত্রবংশ চিরদিন বিদ্যা-গৌরবের জন্য বিখ্যাত; নরেশের পিতা ও পিতামহ উভয়েই দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। সেই বংশের একমাত্র বংশধর নরেশ যে মূর্খ হইয়া থাকিবে, এ কথা মনে করিতেও কাত্যায়নীর কষ্ট বোধ হইত, কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া তিনি কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না।

রঘুপুরের জমিদার চৌধুরী মহাশয়কে সকলে অতি সদাশয় বলিত, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একটু কোপনস্বভাব বলিয়াও তাঁহার একটা অখ্যাতি ছিল। কাত্যায়নী মনে করিলেন, চৌধুরী মহাশয়ের একটু কৃপাদৃষ্টি হইলেই নরেশ "মানুষ" হইতে পারে। কিন্তু জমিদার মহাশয় দশ-পনেরো বৎসর হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপাতে স্বগ্রাম পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় গিয়া সপরিবারে বসবাস করিতেছিলেন; বৎসরের মধ্যে একবার পূজার সময় তিনি বাড়ী আসিতেন। তাঁহার ভদ্রাসনে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইত, তিন দিন গ্রামের কাহাকেও অভুক্ত থাকিতে হইত না। সেবার অষ্টমীর রাত্রে সন্ধি-পূজা শেষ হইলে স্ত্রীলোকেরা যখন দেবী-প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিবেন, ঠিক সেই সময়টিতে কাত্যায়নী জমিদার-গৃহিণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৌ, আজ মায়ের সম্মুখে আমাকে একটি ভিক্ষা দাও, তোমার অক্ষয় পুণ্য লাভ হবে।" জমিদার-পত্নী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "কি ভিক্ষা ঠাকুরঝি?" কাত্যায়নী ছেলের হাত ধরিয়া তাহাকে তাঁহার কোলের কাছে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আমার নরুকে তোমার হাতে দিলাম, ছেলে যাতে মূর্খ না হয় তোমাকে তাই করতে হবে।" জমিদার-পত্নী দুঃখিনী বিধবার এই কাতর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না, তিনি স্বামীর সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় নরেশকেও সঙ্গে লইয়া চলিলেন। কলিকাতায় গিয়া নরেশ স্বচ্ছন্দে

থাকিয়া, কি কায়ক্লেশে দিনপাত করিয়া বিদ্যা উপার্জন করিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই, তবে এ কথা সকলেই জানিল যে নরেশ যখন প্রবেশিকা-সাগর সন্তরণে পার হইয়া পুরস্কারস্বরূপ দশ টাকা বৃত্তি লাভ করিল তখন রায়গঞ্জের রমানাথ বসু স্বয়ং উপযাচক হইয়া তাহাকে তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যাদানে সমুৎসুক হইলেন ; নরেশকে দেখিয়া তাঁহার এতই মনে ধরিয়াছিল যে, গরীবের ঘর বলিয়া অধিকাংশ আত্মীয় আপত্তি করিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

'রায়গঞ্জের রমানাথ বসু' এই নামটা সে অঞ্চলে কে না জানিত? বসুজা মহাশয় স্বনামধন্য পুরুষ, কিন্তু তাঁহার পিতৃনামে মধ্যম পঞ্চ-সন্তানের মধ্যে হেমাঙ্গিনী তাঁহার একমাত্র কন্যা ও শৈশবে মাতৃহীনা বলিয়া অত্যন্ত আদরণীয়া। তিনি সর্বদা বলিতেন, "মা আমার যেমন লক্ষ্মী, তেমনি আমি নারায়ণ এনে জামাই করব।" এই জন্য, নরেশচন্দ্র তাঁহার মনোনীত হইলে তিনি আর কাহারো কথা না শুনিয়া তাহাকে কন্যা হেমাঙ্গিনীকে সম্প্রদান করিলেন। কেহ কথাপ্রসঙ্গে নরেশের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করিলে তিনি বলিতেন, "যে মানুষ হয়, সে কি তার স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করতে পারে না? আমি মানুষ চাই, ধন-সম্পত্তি থাক্ না থাক্, তা দেখতে চাই না।"

নরেশের শ্যালকেরা কিন্তু বুঝিলেন, পিতা মুখে যাহাই বলুন না কেন, কার্যতঃ তাহাদের সম্পত্তির অংশ নিশ্চয়ই হেমকে উইল করিয়া দিয়া যাইবেন। ভাই বিষয়ের ভাগ পায় এ ব্যবস্থা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া যে একরকম সহিয়া গিয়াছে, কিন্তু বোন বিষয়ের ভাগ পাইলে তাহা সহজে সহ্য হয় না। বসু মহাশয় বুদ্ধিমান হইয়াও বুঝিতে পারিলেন না যে, এই বিবাহের ফলে হেম তাহার ভ্রাতাদের বিদ্বেষের পাত্রী হইয়া দাঁড়াইল।

বিবাহের পর গোলমাল চুকিয়া গেলে নরেশ আবার কলিকাতায় গিয়া চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে পূর্বের মত থাকিয়া পড়াশুনা করিবে, মাতা-পুত্রে ইহাই স্থির করিলেন। দশ টাকা বৃত্তিতে পড়িবার খরচ চলিবে না, বিশেষ এতদিন চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিপালিত হইয়া আজ বড়মানুষের জামাই হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়াটা কোনমতেই সঙ্গত নহে। কলিকাতায় ফিরিবার পূর্বে শ্বশুরের সহিত দেখা করিতে গেলে বসু মহাশয় জানিতে চাহিলেন যে, সে এখন কোথায় থাকিয়া পড়াশুনা করিবে।

নরেশ যাহা ঠিক করিয়াছিল তাহা জানাইলে তিনি বলিলেন, "কেন বাবা, ওখানে যদি তোমার পড়াশুনার অসুবিধা হয়, তবে এবার পৃথক বাসা ক'রেই পড় না কেন, যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয় সে ভার না হয় আমার উপর থাকবে।" বলিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন তিনি নরেশের পড়িবার খরচ দিবেন। নরেশ সবিনয়ে তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, "সেখানে আমার বিশেষ অসুবিধা হয় না।" রমানাথবাবু মুগ্ধ হইলেন। তিনি যে আদর্শ খুঁজিয়া আসিয়াছেন, নিজের ছেলের নিকট যাহা পান নাই, আজ পরের ছেলের নিকট তাহা পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। এই তরুণ সৌম্যমূর্তি বালকটির অন্তরের প্রকৃত পরিচয় যেন সেই সবিনয় আপত্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইল। তিনি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "তাই ভাল বাবা, সেইখানেই তুমি থাক, আমি না বুঝে অন্যত্র থাকতে বলেছিলাম। তাঁরা তোমাকে এতদিন প্রতিপালন করেছেন—যে ভাবেই করুন, তবুও তাঁদের ঋণ তুমি কখনও শোধ দিতে পারবে না, আর আমিও তাঁদের কাছে চিরঋণী যে, তাঁদের দয়াতেই তোমাকে পেয়েছি।"

নরেশ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার সম্বন্ধে বাড়ীর আর সকলেরই কিছু না কিছু ভাব ও ব্যবহারের পরিবর্তন হইয়াছে, কেবল পরিবর্তন হয় নাই কমলের। কমল, চৌধুরী মহাশয়ের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা, তাহার বয়স দশ বৎসর।

নরেশ বাড়ীর ভিতর যাইবামাত্র চৌধুরী মহাশয়ের গৃহিণী সস্নেহহাস্যে বলিলেন, "এই যে বড়মানুষের জামাই! কখন এলে?" নরেশ তাঁহার পদপ্রান্তে অবনত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "এই ভোরের গাড়ীতে।"

"থাক্ বাবা থাক্, প্রাতঃবাক্যে চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক। মা যেমন দুঃখ ক'রে মানুষ করেছে, সে দুঃখ তার সার্থক হোক। আর আমরাও বাবা, ফণী আর তোমাকে তো কখনও ভিন্ন ভাবিনি। তোমার মা যেদিন আমার হাতে সঁপে দিলে, সেদিন থেকে পেটের ছেলের মতই যখন যা করা দরকার তাই ক'রে আসছি।"

গৃহিণীর এইরূপ বক্তৃতা আরও বহুক্ষণ চলিত, কিন্তু হঠাৎ ঝম্ ঝম্ করিয়া মল বাজাইতে বাজাইতে ও তালে তালে দ্রুত দুপ্ দুপ্ শব্দের পদধ্বনি করিতে করিতে কমল ছুটিয়া আসিয়া একেবারে নরেশের পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া

পড়িল, "নরেশ দাদা, নরেশ দাদা, বিয়ে ক'রে এলে, তোমার বৌ কই? বৌ কি শেয়ালকে দিয়ে এসেছ নাকি? শেয়াল বলছে 'টোপরের বদলে বৌ পেলাম, টাকডুমাডুমাডুম'!"

এক মুহূর্তেই ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল। ঘরের ভিতর যেন একটা সৌরভ-মিশ্রিত আনন্দের দমকা বাতাস বহিয়া গেল; গৃহিণী রাগ করিয়া বকিয়া উঠিলেন, "দেখ না মেয়ে যেন দিনে দিনে ধিঙ্গী হচ্ছেন!" কিন্তু তিনি যতই বকুন, তাঁহার সেই দুরন্ত মেয়েটিকে তিনি কোন মতে সামলাইতে পারিতেন না।

গৃহিণীর বকুনির অবসরে নরেশ চুপি চুপি কমলকে বলিল, "বৌ আছে রে, শেয়ালে নেয় নি; নিয়ে আসব এর পর, দেখিস।" কিন্তু বলিয়াই আবার ভয় হইল, কমল পাছে আবদার ধরিয়া বসে "এখনি নিয়ে এস।"

এই বাড়ীতে আসিয়া অবধি কমলের সঙ্গে নরেশের গাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল, কমল তখন চার বৎসরের। কমলের সঙ্গে বন্ধুত্বরক্ষা নিতান্ত সহজ নয়, তাহার যেমন সকলের সঙ্গেই অতি শীঘ্র বন্ধুত্ব হইত তেমনি একটুতেই তাহার বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিত। একমাত্র নরেশই কেবল ছয় বৎসর পর্যন্ত কমলের সকল আবদার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া সেই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিয়াছিল। যথার্থ কথা বলিতে কি, এক হিসাবে কমলেব জন্যই নরেশ এতদিন এ বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছে, নহিলে পরের ঝঞ্ঝাট এমন ভাবে দীর্ঘকাল ঘাড়ে রাখিতে গৃহিণী বোধ হয় স্বীকৃত হইতেন না।

যাহা হউক, কথাবার্তা শেষ হইলে নরেশ বলিল, "জ্যাঠাইমা, তবে বাজারের পয়সাটা দিন, বেলা হয়ে গিয়েছে।"

গৃহিণী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "থাক্ বাবা, তোমার আর বাজারে যেয়ে কাজ নেই, মাধবই যাবে। সকালবেলা তোমার পডার বড় ক্ষেতি হয়! তবে কি জান, চাকর-বাকরের বাজার করা, ওরা তো কেবল অর্ধেক চুরি করবে বই তো নয়, আর তুমি যেমন আপনার মনে বুঝে জিনিসপত্র আন—"

নরেশ তাঁহার কথা শেষ হইবার অবসর না দিয়া বলিল, "না, একবার বাজারে ঘুরে আসব তাতে পড়ার আর কি ক্ষতি হবে? বেলা হয়ে গেলে আর ভাল মাছ পাওয়া যাবে না জ্যাঠাইমা, আপনি আর দেরি করবেন না।"

"পড়ার ক্ষতি হবে"—গৃহিণীর মুখে এ কথা যে নরেশ প্রথম শুনিল তাহা

নহে, আগেও অনেকবার শুনিয়াছে, কিন্তু তাহার স্বর অন্য রকম ছিল। সন্ধ্যার সময় লণ্ঠন পরিষ্কার করা হয় নাই, অঙ্ক কষিতে কষিতে নরেশ সে কথা হয়তো ভুলিয়া গিয়াছে, যতক্ষণ আলো দেখা যায় ন[illegible]ছাদে বসিয়া ততক্ষণ একমনে অঙ্ক কষিয়াছে, কিন্তু যখন আর চোখে দেখা যায় না, তখনই নরেশের ছাঁৎ করিয়া মনে পড়িয়া গিয়াছে "ওঃ, আজ যে আলো সাজানো হয় নাই!" তাড়াতাড়ি অপরাধীর মত নীচে নামিয়া আসিয়া লণ্ঠনে হাত দিবামাত্র গৃহিণী তখনই বলিয়াছেন, "থাক্ থাক্, তোমার পড়ার ক্ষেতি হবে, আমিই লণ্ঠন সাজাচ্ছি। চাকররা পারে না, নষ্ট ক'রে ফেলে, তুমি পার তাই, নইলে কি আর সাধ ক'রে বলি? সন্ধ্যা উৎরে গেল, এখন এলেন আলো সাজাতে!"

হয়তো কোন দিন ছোট খোকা আবদার লইয়াছে, গৃহিণী রাগিয়া তার পিঠে ভাদ্র মাসের কিল বর্ষণ করিতেছেন, নরেশ খোকার কান্না শুনিয়া ছুটিয়া গেলেই বলিয়াছেন, "থাক্, থাক্, তুমি কেন আবার এসেছ? যাও, তোমার আর ছেলে ধরতে হবে না, তোমার পড়ার ক্ষেতি হবে।"

এটা গেল নরেশের জীবনের কেবল এক অংশের ইতিহাস, কিন্তু তাহার জীবনের আর একটি অংশ ছিল, যাহার ইতিহাস কেবল তাহার নিজের মনের মধ্যেই লেখা ছিল, অন্যের চক্ষে সে ইতিহাস কখনও পড়ে নাই। সে ইতিহাস কেবল স্বপ্নের ইতিহাস, অথবা জাগরণ ও স্বপ্নে মিশ্রিত এক অপূর্ব অনুভূতির ইতিহাস। অতি শৈশবে ছোটকাকা কোনদিন তাহাকে আদর করিয়া রাসের মেলা হইতে একটি লাটিম কিনিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন, সে কথাটিও সে ইতিহাসের এক কোণে লিখিত আছে। যে টিয়া পাখীটা খাঁচায় থাকিয়া কেবল ক্যা ক্যা করিয়া চেঁচাইত, তাহার স্মৃতির সহিত মা দুপুরবেলায় বসিয়া তাহাকে ধারাপাত পড়াইতে পড়াইতে যে তাহার ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতেন সে কথার কোন বিশেষ মিল না থাকিলেও হয়তো টিয়ার কথার সঙ্গেই মার কাপড় সেলাইয়ের কথা একত্রে সংযুক্ত হইয়া মনে পড়িত, আবার হয়তো সেই সঙ্গে পদ্মবিলের ধারে যে একটা গাবগাছে মস্ত বড় মৌচাক হইয়াছিল, আর মৌচাক ভাঙ্গিয়া লইবার পর মাছিরা যে আট দশ দিন পর্যন্ত ক্রমাগত সেই শূন্য গাবগাছের ডালের চারি পাশে গুন গুন

করিয়া ঘুরিয়াছিল, সে কথাও তাহার মনে পড়িয়া যাইত। বস্তুতঃ হয়তো এই সকল ইতিহাসের মধ্যে এমন একটি নিগূঢ় সংযোগ সূত্র ছিল, যাহাতে বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন স্মৃতিগুলি মাল্যের মত গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু কি সে সূত্র,—দিনে দিনে, পলে পলে, ঘটনার প্রতিকূলতা ও অনুকূলতার তরঙ্গে খণ্ডিত মানবজীবন যাহাকে আশ্রয় করিয়া অখণ্ড ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে? দার্শনিক বলেন, কবি বলেন, সে সূত্র ভালবাসা; আর অন্য কিছুতেই বহুকে এমন করিয়া এক করিতে পারে না। নরেশের সমস্ত বাল্য জীবনের স্মৃতিও একই সূত্রে গ্রথিত ছিল, সে সূত্র জননীর স্নেহ। আপনাকে বাদ দিয়া লোকে যেমন স্বপ্ন দেখিতে পারে না, সকল স্বপ্নের মধ্যে যেমন 'অহং'-এর অস্তিত্ব বর্তমান থাকেই, নরেশের জীবনের সকল স্বপ্নের মধ্যে সেইরূপ মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। জননীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। জননীর কূলপ্লাবিনী স্নেহের বন্যায় তাহার জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার সকল ব্যথা ভাসিয়া যাইত। লোকে দেখিত নরেশের বড় দুঃখ, কিন্তু নরেশ আপনার আনন্দে আপনি ভরপূর থাকিত।

হেমের সঙ্গে বিবাহের কথা উঠিলে কনে'র সম্বন্ধে প্রথমেই তাই তাহার মনে হইয়াছিল, "আহা, বেচারীর মা নাই!" বারো বছরের মেয়ে এখনকার দিনে যেমন চালাক-চতুর হইয়া উঠে, হেম তাহা হয় নাই। বেশভূষা করা কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না। হেমের দুই বৌদিদি স্বামীর সঙ্গে বিদেশে থাকিতেন; যিনি বাড়ীতে থাকিতেন তিনি চুলের পারিপাট্য, নভেল, পশমের শিল্প ও দিবানিদ্রা লইয়া এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, নিজের সন্তানদেরই খোঁজ লইবার অবকাশ পাইতেন না, ননদের খোঁজ লওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু অযত্ন-মলিনা হেমকে যেন আরও সুন্দর দেখাইত,—অন্ততঃ নরেশের তাহাই মনে হইয়াছিল। শুভদৃষ্টির সময় চকিত নেত্রে হেমের মুখখানি দেখিয়া নরেশ ভাবিয়াছিল, "এ যেন ঠিক র‍্যাফেলের আঁকা একখানি ম্যাডোনার ছবি।" কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন সে হেমকে দেখিল, তখন তাহার মনে হইল, "ছবিতে কখনও এত সৌন্দর্য্য ও এত কোমলতা প্রস্ফুটিত হতে পারে না।"

নরেশের বিবাহের পর অনেকে বলিয়াছিলেন, "ছোকরা বেশ পড়াশুনা করছিল, কিন্তু বিয়ে ক'রে এবার মাটি হয়ে যাবে।" কিন্তু কার্যতঃ হিতৈষীদের

শুভকামনা ফলবতী হইবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বিবাহের পর নরেশের পাঠের উৎসাহ বাড়িল বই কমিল না। এল-এ পরীক্ষা দিবার পর সে যে নিশ্চয়ই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবে, সে বিষয়ে তাহার সহাধ্যায়ী অথবা অধ্যাপকগণের কোন সন্দেহ রহিল না।

নরেশ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী গেল। মা বলিলেন, "বাবা, এবার তো তোর পরীক্ষা হয়ে গেল, এখন রায়গঞ্জে গিয়ে বৌমাকে নিয়ে আয়। আমি আর কতদিন এ শূন্য ঘরে একা থাকব বল্ দেখি ?"

নরেশ হাসিয়া বলিল, "আমি তো এখন তোমার কাছে ব'সে আছি মা, তবু তোমার একলার দুঃখ আর যাচ্ছে না ?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "তুমি কি বাবা, আমার কাছে থাক ? তুই যখন বিদেশে থাকবি, শাশুড়ী বৌ সুখ-দুঃখের সাথী, তোর কথা মনে ক'রে দুজনে দিন কাটাব। তোকে দূরে রেখে একলা যে প্রাণ কি করে, তুই তার কি বুঝবি, বাবা ?"

মা যখন এ কথা বলিতেছিলেন, নিয়তি তখন যে কি নিষ্ঠুর হাসি হাসিতেছিল, তিনি তাহা জানিতেন না।

নরেশ মিনতি করিয়া বলিল, "তোমার কাছে দুদিন থাকি মা, তারপর না হয় রায়গঞ্জে যাব। সেখানে গেলেও হয়তো আবার ফিরে আসতে দিন-কতক দেরি হবে। তোমার কাছ ছেড়ে আর আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না, মা।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "পাগলা ! কবে যে তোর বুদ্ধি হবে !"

ইহার প্রায় দুই মাস পরে চৌধুরী মহাশয় একদিন খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ মফঃস্বলস্তম্ভে একটি সংবাদ পড়িয়া চমকিত হইলেন। সংবাদটি এই—"গত শুক্রবার সন্ধ্যার সময় রায়গঞ্জের জমিদার রমানাথ বসু মহাশয় হৃদ্‌রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সেইদিনই অপরাহ্ণে তাঁহার একমাত্র জামাতার বিসূচিকায় মৃত্যু হয়। বসু মহাশয় জামাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। বসু মহাশয়ের তুল্য মহাপ্রাণ, সদাশয় ও দীনবৎসল জমিদার এ অঞ্চলে আর আছেন কিনা সন্দেহ। ভরসা করি, সেই স্বর্গীয় মহাত্মার দৃষ্টান্তে তাঁহার পুত্রেরাও পিতৃপদানুসরণ করিবেন। বসু মহাশয়ের জামাতা

নরেশচন্দ্রও অতি সচ্চরিত্র ও প্রতিভাবান যুবক ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, উনবিংশতি বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার অকালমৃত্যু হইল। কয়েকদিন মাত্র পূর্বে তাঁহার পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছিল। জামাতার সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সংবাদ পাইয়া বসু মহাশয় মহাসমারোহে কালীপূজা ও কাঙ্গালীভোজন করাইয়াছিলেন। উৎসবের সমারোহ মিটিতে না মিটিতেই বায়গঞ্জ অন্ধকার হইয়া গেল। ভগবান এই শোকাভিভূত পরিবারকে শান্তিদান করুন।"

চৌধুরী মহাশয় সংবাদ পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর আলবোলার নল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অন্দরের দিকে ছুটিলেন, গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো শোন, শোন, কি সর্বনাশের কথা!"

"কি সর্বনাশ আবার হ'ল তোমার?"

"নরেশ যে মারা গিয়েছে।"

"নরেশ? কি বল গো? আমাদের নরেশ? সে যে কালীপূজায় শ্বশুর-বাড়ী গিয়েছিল? খবর পেলে কার কাছে? কি হয়েছিল তার?"

এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে চৌধুরী মহাশয় কেবল বলিলেন, "কলেরা হয়েছিল।" অশ্রুর আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল।

"চুপ কর, চুপ কর, এ কথা নিয়ে আর তোলাপাড়া ক'রো না। কমল শুনলে এখনি কেঁদে কেটে অনর্থ করবে। আহা, মাগী কত কষ্টেই ছেলে মানুষ করেছিল, সবই কপাল!"

তখন খুব ভোর, পূর্বদিক কেবল লাল হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। গাছ, পাতা, ঘাস সমস্ত শিশিরে আর্দ্র, কিন্তু কুয়াসা তেমন বেশী নাই। ছিন্ন লেপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে হেমাঙ্গিনী তাহার শাশুড়ীকে ডাকিল, "মা!"

একবার আহ্বানে শাশুড়ীর ঘুম ভাঙ্গিল না।

হেমাঙ্গিনী আবার ডাকিল, "মা, ওঠ, বেলা হয়ে গেল, ডাল ধুতে ঘাটে যাবে না? বড়ি দেওয়া হবে কখন?"

শাশুড়ীর এইবার ঘুম ভাঙ্গিল। নিদ্রাবিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "এত ভোরেই উঠেছিস পাগলীর ঝি? বড় শীত, আয়, আর একটু লেপের ভিতর শুয়ে থাক্।"

বউ বলিল, "মা যেন কি! ঘুমোলে আর কিছু জ্ঞান থাকে না। দত্তদের বাড়ী থেকে যে দশ সের ডাল এনেছ বড়ি দিতে, তা কি ভুলে গিয়েছ নাকি? ধুতে বাটতে কত বেলা হবে বল দেখি? বড়ি দেওয়া হবে কখন? এই বড়িগুলি তুলে দিলে পাঁচ আনা পয়সা পাওয়া যাবে, তবে আমাদের তেল নুন কেনা হবে, ঘরে একটুও যে নেই।"

বউয়ের কথা শুনিয়া শাশুড়ীর নিদ্রা সম্পূর্ণরূপে দূর হইল। বার কতক এপাশ ওপাশ করিয়া হাই তুলিলেন, তারপর তুড়ি দিতে দিতে ও অনুচ্চস্বরে প্রাতঃস্মরণ করিতে করিতে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। বউ ইতিমধ্যে দুয়ারের আগড় খুলিয়া ফেলিল; ঘরে আলো দেখিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "তাই তো, সকাল হয়ে গিয়েছে যে!"

দুই ধারে ঝোপ ও আগাছার বন, তাহার ভিতর দিয়া নদীর পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, দুইজনে ডালের ধামা লইয়া সেই পথে চলিলেন। তখন দুই-একজন লোক উঠিয়াছে। মাঠে খেজুর গাছ হইতে রস পাড়িবার জন্য চাষীরা কেহ গাছের উপর উঠিয়াছে, কেহবা ভাঁড় হাতে নীচে দাঁড়াইয়া আছে। নরেশের মা অন্যমনস্কভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন, হেমাঙ্গিনী বেলা হইবার আশঙ্কায় আগেই চলিয়াছে; এমন সময় "ওগো, মা গো!" এই চীৎকার শব্দ তাঁহার কর্ণে গেল;—তাহার পর আর কোন শব্দ নাই।

চীৎকার শুনিয়া নরেশের মা, "ওগো দেখ, কি হ'ল" বলিয়া ছুটিয়া গেলেন। মাঠে যাহারা ছিল তাহারাও দৌড়িয়া গেল। একটু গিয়াই সকলে দেখিতে পাইল, ঘাটের উপর হেমাঙ্গিনী মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে, ধামার ডাল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বধূকে এই অবস্থায় দেখিয়া শাশুড়ী ললাটে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আঃ অভাগীর ঝি! তোর কপালে এত দুঃখ ছিল? এত লোক মরে, তোর কেন মরণ হয় না, তা হ'লে যে আমি নিশ্চিন্ত হই। দেশে কি মানুষ নেই রে, নিত্যি নিত্যি এই রকম অত্যাচার? গরীবের উপর এত অত্যাচার ধর্মে সইবে না।"

"দিদি, শুনেছ? নরেশের বৌ আজ ভোরে ঘাটে ডাল ধুতে গিয়েছিল, আর বাঁশবন থেকে কে নাকি বেরিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরেছিল!

বৌটা ভয় পেয়ে 'আঁউ-মাউ' ক'রে তখনি ঘাটের উপর ভিরমি দিয়ে পড়েছিল। ওদের হ'ল কি দিদি? সে দিন নাকি রাতে চাল কেটে কে মটকা ব'য়ে ঘরে নেমেছিল, পড়বি তো পড়্ একেবারে গিয়ে ধানের ডোলের উপর। আবার রোজ সন্ধ্যার পর নাকি ওদের বাড়ীর উঠানে ঢিল গোহাড় এই সব পড়ে, কিন্তু জনমনিষ্যি দেখতে পাওয়া যায় না। হ'ল কি দিদি? বৌটাকে ভূতে-টুতে পায় নি তো?"

"তুইও যেমন ক্ষেপী, তাই ওই সব কথা শুনিস। নরেশের বৌয়ের রীত-চরিত্রির সবই তো জানিস, তবে আবার ন্যাকা সাজিস কেন? বৌটা যেন মিট্‌মিটে ডান, দেখতে কত শিষ্টশান্ত, এদিকে ভেতরে ভেতরে ছেলে খাবার রাক্ষস। কুমুর মুখে আমি শুনেছি, এ তো আর মিথ্যে হবার নয়? লোক-দেখানো কাঁথা সেলাই ক'রে, দড়ির শিকে ক'রে বিক্রি করা হয়। যারা নাকি শিকে ভেঙে, কাটনা কেটে, পরের ঘরেব বড়ি আমসত্ত্ব দিয়ে দিন গুজরান করে, তাদের ঘরে এত আতর গোলাব আসে কোত্থেকে? কাঁথার সুতো বার করতে বেতের ঝাঁপি খুলেছিল, কুমু স্বচক্ষে দেখে এসেছে। যেদিন আমি এ কথা শুনেছি, সেই দিনই বলেছি, ওর স্বভাব কখনও ভাল নয়। তা না হ'লে, এত রাজ্যের লোক থাকতে যত লোক যায় ওর বাড়ীর মটকায় উঠতে, আর ওরই ঘরের বেড়া কাটতে। কই, কত লোকের বৌ-ঝি ঘাটে যাচ্ছে, কারু তো কেউ হাত চেপে ধরে না, ওরই বা হাত চেপে ধরে কেন?"

"সত্যি দিদি তাও বটে, আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু দিদি বৌটিকে দেখলে তো মন্দ ব'লে মনে হয় না, আহা, মুখখানি যেন দিনরাত মলিন ক'রেই আছে।"

"ও-সব ঢং লো ঢং! শাশুড়ী মাগী আবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গাল দেয়। আমি যেন আর বুঝতে পারি নে যে, আমাকেই বলছে। ভুবো আমার সুবোধ ছেলে, সাতেও নেই পাঁচেও নেই, কেউ কোন দিন তার উঁচু নজরটি দেখে নি। আমার সেই ছেলের উপর ঠেস দিয়ে কথা বলে। আবার বলে, 'ভগবান বিচার করবেন,' ভগবান যেন ওর হাত ধরা!"

"হ্যাঁ দিদি, ভুবোর কথা আর মেজদার কথা, তুজনের কথাই বলেছে শুনেছি। নরেশের মা নাকি একদিন তাদের ঘরের কানাচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।"

"দেখেছিল দাঁড়িয়ে থাকতে! বিষ্টি হচ্ছে কোথায় যাবে? ঘরের কানাচে দাঁড়ালেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! আঃ, মাগীর আস্পদ্দা দেখ একবার! চাল কেটে ওদের গাঁ থেকে বিদেয় ক'রে দিক না গা! আপদ রাখা কেন?"

"কি লো কার কথা হচ্ছে?" বলিয়া রেবতী পিসি আসিয়া আসরে অবতীর্ণা হইলেন।

মেনী বলছিল, "নরেশের বৌ নাকি ঘাটের পথে ভূত দেখে ভিরমি গিয়েছিল!"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া পিসি বলিলেন, "ধর ধর ললিতে, আর না পারি চলিতে!" কথা শেষের সঙ্গেই একটা হাসির রোল উঠিল।

অঘোরের মা পিছন হইতে বলিলেন, "দিদি, ওদের কথা আর ব'লো না, যেমন শাশুড়ী তার তেমনি বৌ হয়েছে। চৌধুরীকে বললেন নরেশের মা, 'কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আমার ছেলে পড়াতে হবে,' কর্তা অমনি তটস্থ। আর আমি যে এত পায়ে ধ'রে সাধলাম, 'আমার অঘোরকে নিয়ে যাও,' তা কই শুনলে? এতেই বোঝ দিদি, আর বেশী কি বলব! বাছার আমার কোন দোষ নেই, কেবল একটু গাছে চড়তে, পাখী পাড়তে, আর একটু সাঁতার দিতে ভালবাসে। আর, হ'ল, খেলতে গিয়ে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়লে, কদাচ কখনও যদি কারও কলসী ভাঙল তা হ'লে আর রক্ষে নেই। তা, কলকাতায় তো আর গাছও নেই, পুকুরও নেই, কলসী নিয়ে ঘাট থেকে জল আনাও নেই। বাছার আমার কোন ঝঞ্ঝাট নেই, খেলা পেলে তো সমস্ত দিন নাওয়া-খাওয়া মনেই থাকে না। কর্তা বললেন, ওর পড়াশুনো হবে না। পড়াশুনো হবে কেবল সেই হাড়হাবাতীর ছেলের! যেমন ছেলের বিদ্যের অহঙ্কারে চোখে দেখতে পেতেন না, তেমনি হয়েছে। দর্পহারী মধুসূদন আছেন।"

রেবতী পিসি বলিলেন, "ছি! ছি! ওদের মুখ দেখলে প্রাচিত্তির কত্তে হয়, দত্তরা নিঘিন্নে, তাই ওদের হাতের জল খায়।"

যেদিন বিকালে মুখুয্যেদের রোয়াকে এইরূপ মেয়ে-মজলিস বসিয়াছিল, সেইদিন রাত্রে অন্ধকার ভাঙ্গা ঘরে শাশুড়ী-বৌতে সুখ-দুঃখের কথা হইতেছিল। শাশুড়ী বলিতেছিলেন "কি করব মা, উপায় তো ভেবে পাই না।

দেশে এমন লোক নেই যে, গরীবের মুখের দিকে চায়। কেবল এক দত্তরা আছে ব'লে এখনও ভিটেয় আছি, না হ'লে কোন্ দিন ভিটে ছেড়ে পালাতে হ'ত। তা দত্ত-গিন্নিও তো পশ্চিমে চ'লে যাচ্ছে, আর কার ভরসায় দেশে থাকব মা! এ জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ, যাই কোথা?"

হেমাঙ্গিনী কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। অনেকক্ষণ পরে রুদ্ধস্বরে বলিল, "আমরা কার কি করেছি মা, কেন আমাদের উপরেই লোকে এত অত্যাচার করে? এই গ্রামে তো কত লোক বাস করছে, আমাদেরই বা কোন্ অপরাধে লোকে ভিটে-ছাড়া করতে চায়? মা, এই ভিটে—" বলিতে বলিতে হেম আর বলিতে পারিল না, তাহার দুই চোখ দিয়া অনবরত জল পড়িতে লাগিল।

"আমাদের কি অপরাধ, মা! আমাদের অপরাধ আমরা গরীব, আমাদের অপরাধ আমরা অনাথ, আর আমাদের অপরাধ আমরা কখনও কারো মন্দ করি নি। এ অপরাধ ছাড়া আর কি অপরাধ আছে, তা জানি না। আর এক অপরাধ—" বলিয়া কাত্যায়নী কি বলিতে গিয়া একবার বধূর দিকে চাহিয়া থামিলেন।

কিন্তু তিনি না বলিলেও হেমাঙ্গিনী তাহা বুঝিল। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে শান্তস্বরে বলিল, "মা, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু মরণ ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পাই না। মা, মরলে হয় না? তা হ'লে তো তোমার আর দিন দিন আমাকে নিয়ে এত কষ্ট ভুগতে হয় না!"

শাশুড়ী বধূর কথায় চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাড়াতাড়ি তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "ছি মা, ও-কথা আর মনে এনো না। আত্ম-ঘাতী হওয়ার বড়ো আর পাপ নেই। ভগবান এত লোককে রক্ষা করছেন, আমাদেরই কি উপায় করবেন না? দত্ত-গিন্নি পশ্চিমে যাচ্ছে, চল, না হয় ঘর-দুয়োর বিক্রি ক'রে ঐ সঙ্গে কাশী চ'লে যাই।"

হেমাঙ্গিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মা, আমি কাশী যাব না। তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে সেখানে গিয়েও শান্তি পাবে না। বরং তুমি দাদাকে ভাল ক'রে একখানা চিঠি লিখে দেখ, তিনি যদি নিয়ে যান।"

শাশুড়ী মুখে বলিলেন, "হ্যাঁ, ভাইরা সাত জন্মে খোঁজ নেয় না, সেই ভাই

আবার নিয়ে যাবে!" কিন্তু মনে মনে বধূর সহিত বিচ্ছেদ কল্পনা করিয়াই জগৎ শূন্যময় দেখিলেন।

সকালবেলায় হেমাঙ্গিনী দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া পূর্ব-রাত্রে সে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহাই ভাবিতেছিল। স্বপ্নে সে নরেশকে দেখিয়াছিল, যেন তিনি তার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; সেই কাপড় জামা, সেই কপালে লম্বা চুল পড়িয়া কপালের আধখানা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, সেই হাসি-হাসি চোখ, তেমনি সব। মাথায় হাত দিয়া তিনি যেন হেমের এলোমেলো চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে কত কথা বলিয়াছিলেন, সে সমস্ত কিছুই মনে পড়িতেছে না, তবু একটা সুবিমল তৃপ্তি ও সুগভীর আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আজ যেন তার আর কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না, কলরবপূর্ণ সংসারের ভাষা আর কর্ণে স্থান পাইতেছে না, চোখে যাহা দেখিতেছে, কর্ণে যাহা শুনিতেছে, সে সমস্তই যেন নদীর স্রোতের উপরে পত্ররাশির মত ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাসিয়া যাইতেছে. শুধু কোন্ দূর আকাশের পূর্ণচন্দ্র নদীতরঙ্গে বিম্বিত হইয়া হিল্লোলে হিল্লোলে শত চন্দ্রের রূপ ধরিয়া খেলা কবিতেছে! আজ আর তাহার নিজের অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া শঙ্কা হইতেছে না, আপনাকে দুভাগিনী মনে করিয়া ক্ষোভও হইতেছে না। গত রাত্রির স্বপ্ন যেন সমস্ত জগৎকেই স্বপ্নের সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া আজ তাহার চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছে। যে জগতে সে বাস করে, যে জগতের সঙ্গে তাহার প্রতিদিনের সম্বন্ধ, এ যেন সে জগৎ বলিয়া মনে হইতেছে না।

গতরাত্রে হেমাঙ্গিনীর জ্বর হইয়াছিল, শাশুড়ী আজ তাই তাহাকে সকালে স্নান করিতে দেন নাই, ভোরে উঠিয়া বাসি পাট সারিয়া তিনি নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। ডাকহরকরা চিঠি দিতে আসিয়াছিল, হেমাঙ্গিনীকে একা দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, দুই-একবার "মা ঠাকুরুণ কি বাড়ী আছেন?" বলিয়া ডাকিয়া "একখানা চিঠি আছে" বলিয়া চিঠিখানি উঠানে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

একমুহূর্তে হেমাঙ্গিনীর মন স্বপ্নজগৎ হইতে বাস্তব জগতে নামিয়া আসিল। নীচজাতীয় ডাকহরকরার এই ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল। মুহূর্তের মধ্যে জীবনে সে যত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, সকলই

তাহার মনে পড়িয়া গিয়া তাহার মনের অভিমানসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এতদিন সে কাহারও উপর অভিমান করে নাই। আজ এ অভিমান কাহার উপর? বোধ হয় যাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, তাঁহারই উপর।

হেমাঙ্গিনী পত্র কুড়াইয়া লইয়া দেখিল, তাহার দাদার পত্র। কাত্যায়নী হেমকে লইয়া যাইবার জন্য যে পত্র দিয়াছিলেন, এ তাহারই উত্তর।

হেমাঙ্গিনীর দাদা তাহাকে লিখিয়াছেন, "তোমার শাশুড়ীর পত্র পাইলাম। তোমার সমস্ত বিবরণ আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। যাহার জন্য বংশে কলঙ্ক পড়িয়াছে, তাহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তোমার এখন মরণই মঙ্গল। আমরাও ভাবিব, তুমি মরিয়া গিয়াছ।"

পত্র পড়িয়া হেমের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে যে ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, প্রস্তর-পুত্তলিকার ন্যায় ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

শাশুড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, অপূর্ব কি লিখেছে?"

হেমাঙ্গিনী নীরব।

শাশুড়ী ভীতা হইয়া বলিলেন, "সকলে ভাল আছে তো?"

গৃহিণী চৌধুরী মহাশয়ের নিকট গিয়া বলিলেন, "ওগো, নরেশের বৌ আর তার মা এসেছে।"

চৌধুরী মহাশয় চমকিত হইয়া বলিলেন, "নরেশের বৌ!—কলকাতায়? সে কি? সে কেন আমার বাড়ীতে?"

গিন্নি বলিলেন, "থাকবে ব'লে এসেছে।"

কর্তা মহা উগ্র হইয়া বলিলেন, "না, না, তা হবে না। আমার বাড়ীতে স্থান হবে না। এখনি বিদেয় কর। গ্রামে কলঙ্ক রাখবার স্থান নেই, আবার কলকাতায় আসা হয়েছে!"

গিন্নি বলিলেন, "রাগ কর কেন? আগে সব কথা শোন।"

"তুমিই শোনগে, আমার কিছু শোনবার দরকার নেই।"—বলিয়া কর্তা চটিয়া উঠিয়া গেলেন।

গৃহিণী তাঁহার কন্যা কমলকে ডাকিলেন। কমলকে দেখিলে এখন আর সে কমল বলিয়া চেনা যায় না। এক বৎসর হইল কমল বিধবা হইয়াছে। মুখখানি যেন সন্ধ্যাবেলার পদ্মের মত,—তেমনি সুন্দর, তেমনি মলিন।

গৃহিণী বলিলেন, "এ যে বিষম দায় হ'ল মা, কি করি বল দেখি ?"

কমল বলিল, "মা, ওরা দুদিন উপোস ক'রে এসেছে, এই মাত্র দুটি ভাত মুখে দিয়ে শুয়েছে, এখন আর ওদের কিছু জিজ্ঞাসা করতে যেও না। বাবা যদি বকেন, সব দোষ আমি ঘাড়ে নেব।"

"ওঁর রাগ তো জানিস, হয়তো বলবেন, দারোয়ান দিয়ে বার ক'রে দাও। দেখি একবার ঘুমিয়েছে কিনা ?" বলিয়া গৃহিণী নরেশের মা বধূকে লইয়া যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই ঘরে গেলেন।

তিন রাত্রি জাগরণের পর হেম আজ নিরাপদ আশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কমল মায়ের পিছনে পিছনে আসিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া হেমের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার চিন্তাবিবর্ণ ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবিল, "হে ভগবান, এ ঘুম যদি আর না ভাঙত !" গৃহিণীর চিন্তার গতি কিন্তু অন্যদিকে ছিল, সচকিতা গৃহিণী বলিলেন, "ওলো কমল, দেখ্ তো মা, এ আবার কি ? ওমা, এ যে কাগজের বাক্সে করা খোসবোর শিশি! লোকে যা বলে তা তবে মিথ্যে নয় ? ছুঁড়ির গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে গিয়ে দেখি ঘুমে একেবারে এলিয়ে পড়েছে, আর দেখি কি না বুকের কাপড়ের মধ্যে লুকোনো ছোট একটা কাগজের বাক্স। দেখে আমার হাত পা কাঁপছিল, মা, কি জানি কার কি চুরি ক'রেই বা এনেছে! বাইরে গিয়ে বাক্স খুলে দেখি কিনা, দুটো শিশি! আমি ছুঁড়িকে দেখে ভেবেছিলাম, বুঝি ভাল, এসেছে, থাক্ এখানে। কর্তাকে ব'লে ক'য়ে না হয় রাখিয়েই দেব। খাবে পরবে, অতুলের খোকাকে রাখবে, হ'ল বা ঝি না থাকলে দুখানা কাজই ক'রে দিলে। তবুও একটা লোক তো প্রতিপালন হবে। হাজার হোক নরেশ আমার ছেলের মত ছিল, তারি তো বৌ, দেখে মায়া হয়েছিল। ওমা, তা নয়! পেটের ভেতর হারামের ছুরি! বিধবা হয়েছে, এখনও গন্ধ মাখবার শখ যায় নি, তাই বুকের কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে এনেছে। আমি বাপু ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এমন ডাইনি রাখতে পারব না।"

কমল আলোর কাছে বাক্স লইয়া গিয়া বলিল, "দেখ মা, বাক্সর গায়ে কার হাতের লেখা।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কার ?"

কমল বলিল, "নরেশদাদার।"

কথা শেষ হইবার সঙ্গে তাহার চোখ হইতে বড় বড় দুই ফোঁটা জল মাটিতে পড়িল। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া গৃহিণীর চক্ষুও অশ্রুময় হইয়া উঠিল।

'কুন্তলীন পুরস্কার : ১৩০৯

বি লা সী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই—দশ-বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লীগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশি জনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পডিলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব কবিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা কবিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়—চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি—বর্ষার দিনে মাথার উপব মেঘের জল ও পায়েব নীচে এক-হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদাব বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-সরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি মুখ লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তার পরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বডো হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আব ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান—তাঁদের চার ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকেই বা কি সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর এত দুর্দশা হয় না।

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক্, কিন্তু ঐ চার ক্রোশ-হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পালান, তাহার আর সংখ্যা নাই। তার পরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু সহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাঁদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক্ এ-সকল বাজে কথা। ইস্কুলে যাই—দু' ক্রোশের মধ্যে এমন আরও ত দু' তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন্ বনে বঁইচি ফল অপর্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপেব মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর-পাড়ের খেজুর-মেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পডিবাব সম্ভাবনা অল্প, এই-সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসল যা বিদ্যা—কামস্কট্‌কার রাজধানীর নাম কি, এবং সাইবিবিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে—এ-সকল দরকাবি তথ্য অবগত হইবার ফুরসৎই মেলে না।

কাজেই এক্‌জামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারস্যিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগ্‌লক খাঁ—এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক বকমই আছে—তার পরে প্রোমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাষ্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্তব্য।

আমাদের গ্রামে একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলের পথে দেখা হইত। তার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে অনেক বড়ো। থার্ড ক্লাশে পড়িত। কবে যে সে প্রথম থার্ড ক্লাশে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না—সম্ভবতঃ তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়—আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাশটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার

---

* জনৈক পল্লী-বালকের ডায়েরী হইতে নকল। তাহার আসল নামটা কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই, নিষেধও আছে। ডাকনামটা না হয় ধরুন ন্যাড়া।

ফোর্থ ক্লাশে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেণ্ড ক্লাশে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের এক-প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা—সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে-কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রান্না করিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত, এবং ভালো করিয়াই চলিত। যেদিন দেখা হইয়াছে, সেইদিনই দেখিয়াছি ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই—বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে, ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে এ-কথাও কোনো বাপ ভদ্র-সমাজে কবুল করিতে চাহিত না—গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর মর। আর এক দিন শোনা গেল, মালপাড়ার এক বুড়া মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ-যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেকদিন তাহার অনেক মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি—মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে

গেলাম। তার পোড়ো-বাড়ির প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তাপোষের উপর পরিষ্কার ধপ্‌ধপে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায় বাস্তবিকই যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানীতে জল দিয়া ভিজাইয়া-রাখা বাসি ফুলের মতো। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে, ন্যাড়া?

বলিলাম, হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, ব'সো।

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটা কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম এই যে, প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল সে, শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কয়েক-দিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কত বড়ো গুরুভার! দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য, কত রাত-জাগা! সে কত বড়ো সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য-সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে

ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এইবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি ?

বড়ো বড়ো আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মতো বোধ হইতেছিল, পথ দেখা ত দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না ত ? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব ?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত! সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা 'না' বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, ঘন-জঙ্গলের পথ একটু দেখে দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথটা পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়। এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন! মৃত্যুঞ্জয় ত যে কোনো মুহূর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কি করিত! কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত!

এই প্রসঙ্গের অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি—বাটীতে ছেলেপুলে চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য-বিধবা স্ত্রী, আর আমি। তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপা-দাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাঁহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে

চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি ? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না ? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই ? তাহারা কি পাষাণ ? আর এই রাত্রেই গ্রামের পাঁচজনে যদি নদীর তীরের কোনো একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় ত পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া ? এমনি কত কি ! কিন্তু আমার ত আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেওয়া চাই—অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই, যা হবার সে ত হয়েচে, আর বাইরে গিয়ে কি হবে ? রাতটা কাটুক না।

বলিলাম, অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।

তিনি বলিলেন, হোক কাজ, তুমি ব'সো।

বলিলাম, বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হবে, বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে বাপ রে ! আমি একলা থাকতে পারব না।

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ তখন বুঝিলাম, যে-স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি-বা সহে, তাঁর মৃতদেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না।

বুক যদি কিছুতে ফাটে ত সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাঁহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাঁটি নয় এ-কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শুধু কর্তব্য-জ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোনো মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোনো সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সেই শক্তির পরিচয় যখন কোনো নর-নারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়ার

আবশ্যক যদি হয় ত হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোনোমতে থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ঐ রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে অত-বড়ো অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই! তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এ-ই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াসুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামের ছিল কি না, কিন্তু একালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন সে যে বাঁচিয়া আছে এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না—অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে! গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়! কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ একথা শুনিলে যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে-বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা! অ্যাঁ—এ হইল কি? কলি কি সত্যই উল্‌টাতেই বসিল!

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে, তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো! তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুক সবাই। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায় না! এ যে মিত্তিরবংশের নাম ডুবিয়া যায়! গ্রামের যে মুখ পোড়ে!

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তির-বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম, গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এইজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো বাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দার একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠিসোঁটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের উপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট্ করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া, সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোনো খুড়া কোনোকালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে, মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকে দিয়েচে জানো?

খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারোজন বীর-দর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো—এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না, তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ, সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে অতবড়ো দুনাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃ-পক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে। এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নর-নারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তার পরে একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া

বলিতে লাগিল, বাবুরা আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে—রোগা-মানুষ রাতে খেতে পাবে না।

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মতো মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেন না আমিও বার বার সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামেব বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভালো কাজ করিতেছি, সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা যাক।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বডলোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক্ হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত, তাহা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা—এ ত একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা! কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া! হোক না সে আড়াই মাসের রুগী, হোক না সে শয্যাশায়ী! কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়! ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ! সে ত আর সত্য সত্যই মাফ করা যায় না। তা নইলে পল্লীগ্রামের লোক সংকীর্ণচিত্ত নয়। চার-ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যা যে-সব ছেলের পেটে, তারাই ত একদিন বড়ো হইয়া সমাজের মাথা হয়। দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া!

এই ত ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর-দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া

আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এই ভয়েই ছোটোবাবু অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে সেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে! যাই হোক, ছোটোবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্যে, গ্রামের বারওয়ারী পূজা-বাবদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদ্ব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাশ দিয়া বিদায় করিলেন তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কি, পথে আসিতে অনেকেই দেশের এবং দশের কল্যাণের নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়োলোক, তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সব সদনুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?

কিন্তু যাক। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেকদিন ঘুরিয়া, গৌরব করিবার মতো অনেক বড়ো বড়ো ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পূরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কসিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলেই দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসর-খানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসিগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ-দুই দূরের মালপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তার মাথায় গেরুয়া-রঙের পাগড়ী, বড়ো বড়ো দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা—কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়! কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গেছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ-পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরাণী বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদ্ব্রাহ্মণের ছেলেকে এণ্ট্রান্স পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভালো কায়স্থসন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে

বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোনোকালে সে কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল! কিন্তু সকলেরই ঐ একই হেতু। আমার তাই ত মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে, তাহারা কি এমনই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না। যে পল্লীগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নীচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক্। ঝোঁকের মাথায় হয়ত বা অনধিকার-চর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুশকিল হইয়াছে এই যে, আমি কোনোমতেই ভুলিতে পারি না দেশের নব্বুইজন নর-নারীই ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ এবং সেইজন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সে-ও ভারি খুশি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, তুমি না আগলালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্যে কত মারই না জানি তুমি খেয়েছিলে।

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশঃ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে, এ-কথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ-ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের উপর আমার প্রবল সখ ছিল। এক ছিল গোখরো কেউটে সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস-খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ-ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল এবং কব্জিতে ওষুধ-সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমতো সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে—

ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—
মনসা দেবী আমার মা—
ওলট-পালট পাতাল-ফোঁড়—
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
—দুধরাজ মণিরাজ!
কার আজ্ঞে—বিষহরির আজ্ঞে।

ইহার মানে যে কি, তাহা আমি জানি না। কারণ যিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন— নিশ্চয় কেহ না কেহ ছিলেন—তাঁর সাক্ষাৎ কখনো পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য-মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল, ততদিন সাপ-ধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে! সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে; এতটুকু বয়সের মধ্যে এতবড়ো ওস্তাদ হইয়া অহংকারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি জো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার গুরু যে, সে ত ভালো-মন্দ কোনো কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এ সব ভয়ংকর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া ক'রো। বস্তুতঃ বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলা এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সে-সব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে, সাপ-ধরাও কঠিন নয়, এবং ধরা সাপ দুই-চারি দিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর

নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার-কয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তার পরে তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক আব একটা কাঠিই দেখান হোক, সে যে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন করিয়া মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে—এতে দোষ কি?

বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। আমাদের ত খাবার ভাবনা নেই, আমবা কেন মিছি মিছি লোক ঠকাতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। সাপ-ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানা প্রকার বাধা দিবার চেষ্টা করিত—আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার ত একরকম নেশার মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানা প্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভালো করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে-ঘরের মেজে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে—সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয়, এক-জোড়া ত আছে বটেই, হয়ত বা বেশিও থাকতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখচ না বাসা করেছিল ?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত ইঁদুরেও আনতে পারে।

বিলাসী কহিল, দুই-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বলছি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল, এবং মর্মান্তিক-ভাবেই সেদিন ফলিল। মিনিট দশেকের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটা ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্‌টা পিঠ দিয়া বার বার করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা যেন সবাই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পলাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে এক হাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবারমাত্র দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চীৎকার কবিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি ত ছিলই, তাহার উপরেও আমাব মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার ঊর্ধ্বে আর উঠিবে না। এবং আমার সেই "বিষহরির আজ্ঞে" মন্ত্রটা সতেজে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকেও সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পডার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনেরো-কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির উপরে একেবারে আছাড খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, বিষহরির দোহাই বুঝি-বা আর খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই-চারিজন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন, এবং আমরা কখনো বা একসঙ্গে কখনো বা আলাদা তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল ভালো কথায় হইবে না, তখন

তিন-চারজন রোজা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে, মৃত্যুঞ্জয় ত মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধঘণ্টা ধ্বস্তা-ধ্বস্তির পরে, রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি, সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক, তাহার দুঃখের কাহিনীটা আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাতদিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রইল, এ-সব তুমি আর কখনো ক'রো না।

আমার মাদুলি-কবজ ত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা নয়, এবং সাপের বিষ যে বাঙালীর বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে ত আর বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয় নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোনো একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পারি।

খুড়োমশাই ষোলো আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত-মৃত্যু হবে, ত হবে কার? পুরুষ-মানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে ত তেমন আসে-যায় না—না হয় একটু নিন্দাই হ'ত। কিন্তু, হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মলো আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হ'ল একটা ভুজ্যি-উচ্ছুগ্যু।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অন্ন-পাপ! বাপ্ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে!

ম র ণ - আ লি ঙ্গ নে

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

"মাপ কর, ভাই……মাপ কর……" রহমান ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে।

শঙ্কর বল্‌লে—"চুপ কর, ভাই, চুপ কর, কেঁদে আর কি হ'বে বল? এতে আমারও ত দোষ আছে, আমি নিজের কর্মফল ভোগ করছি, তুমি নিমিত্ত মাত্র……"

শঙ্করের কণ্ঠস্বরে অনুতাপ বা সান্ত্বনা বেশ সুস্পষ্ট আকার ধ'রে প্রকাশ পেল না, তার কথাগুলো কেমন ছাড়া-ছাড়া ফাঁকা-ফাঁকা।

রহমান কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মাথা নেড়ে বল্‌লে—"আমার এমন করা উচিত হয় নি……হাজার হো'ক, তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু!……কিন্তু তুমি যে এত বড়ো মহৎ, তা' আগে জানতাম না……"

শঙ্কর বল্‌লে, "আমাকে যতটা মহৎ মনে করছ, তা' আমি মোটেই নই। তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু, একসঙ্গে খেলা ক'রে বড়ো হয়ে উঠেছি—একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি, এখনও এক পাড়াতেই আমাদের বাস; তোমার প্রতি আমার ত কোনো বিদ্বেষ থাক্‌তেই পারে না; কোনো মুসলমানের প্রতিই আমার বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু যখন আমি শুনলাম, মুসলমানরা কালীবাড়ি ভাঙতে আসছে, তখন আমি আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাক্‌তে পারিনি; তুমি জানো, ঠাকুর-দেবতার প্রতি খুব বেশি বিশ্বাস আর ভক্তি আমার নেই; কিন্তু যে বস্তুকে অনেক লোক শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, তার অপমান সহ্য করায় মনুষ্যত্ব খর্ব হয়; আমি শুনেছি, হিন্দুরা মুসলমানদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ অনেক মসজেদ অপবিত্র করেছে; আমি যদি তখন ভালো থাকতাম, তা হ'লে আমিও মুসলমানদের সঙ্গে মসজেদ রক্ষার জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াতাম। আমি তোমার সঙ্গে আমাদের পাড়ারই আখড়ায় একই ওস্তাদের কাছে লাঠি-খেলা শিখেছিলাম। ওস্তাদের দেওয়া সেই লাঠি কখনো কোনো কাজে লাগে নি। এখন আমার পিতৃ-পিতামহের ধর্মবিশ্বাসের অপমান হ'তে যাচ্ছে দেখে সেই লাঠি অবলম্বন ক'রে কালীবাড়ির সামনে

পাহারায় নিযুক্ত হয়েছিলাম। মুসলমানদের আক্রমণ লাঠির চোটে চার-চারবার হটিয়ে যখন আমরা মনে করছিলাম, মুসলমানরা আর আস্‌বে না, তখন পঞ্চম বারে এলে তুমি তাদের দলের নেতা হয়ে। দুই বন্ধুতে অনেক বার মহরমের সময় আপোষে লাঠি খেলেছি. সে দিনও মনে হ'ল, এই লাঠিখেলা দুই বন্ধুর আপোষেই হবে। কিন্তু তোমার লাঠির চোট আমার লাঠি দিয়ে ঠেকিয়েই আমি বুঝতে পারলাম, তুমি বন্ধুভাবে আমাকে আক্রমণ কর নি। যাই হ'ক, বীরে বীরে অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা হচ্ছিল; হঠাৎ আমার মুখের উপর দিয়ে আগুন জ্ব'লে গেল; তখন বুঝলাম, আমি বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করছি না······"

রহমান আপনার কাপুরুষতায় লজ্জায় ও অনুতাপে সন্তপ্ত হয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাতর স্বরে ব'লে উঠল—"থাক্‌, ভাই সে কথা; আমাকে আর লজ্জা দিও না······"

শঙ্কর রহমানের কাতরতা গ্রাহ্য না করেই বল্‌তে লাগল—"আমার মুখে আগুন জ্বলে উঠতেই আমি বুঝতে পারলাম, তুমি আমার মুখের উপর সালফিউরিক অ্যাসিড্‌ ঢেলে দিয়েছ!"

রহমান আবার কাতর স্বরে ব'লে উঠল—"মাপ কর, ভাই, আমার কসুর মাপ কর ·····"

শঙ্কর রহমানের কথা যেন শুনতেই পায়নি, এমনই ভাবে ব'লে চল্‌ল—"আমি অনুভব করলাম, আমার দুটো চোখই পুড়ে গেল, সমস্ত মুখখানা চিতায় মুখাগ্নি-করা মড়ার মতন বীভৎস হয়ে উঠল, হয়ত বা এই আমার অন্তিম মুখাগ্নি। তখন তোমার প্রতি আমার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, তা'কে বন্ধুত্বের প্রীতি-নাম কিছুতেই দেওয়া যায় না।"

রহমান আবেগভরে ব'লে উঠল—"কিন্তু পরে······আমার বিচারের সময় তুমি ত বন্ধুত্বের চেয়েও মহৎ ভাবের পরিচয় দিয়েছ।"

এবার শঙ্কর রহমানের কথার উত্তর দিল—"সেই ভাব হঠাৎ আমার মনে আসেনি······এ রকম অবস্থায় অদৃষ্টের হাতে মানুষ অকস্মাৎ আত্মসমর্পণ ক'রে হিংসাশূন্য হ'তে পারে না। তখন আমার মনে হয়েছিল, তোমায় হাতের কাছে পেলে নখ দিয়ে তোমার দুটো চোখ উপড়ে ছিঁড়ে তোমার মুখের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলে দিই।"

রহমান কুণ্ঠিত ও কাতরভাবে বল্‌লে—"কিন্তু—"

শঙ্কর বল্‌তে লাগল—"কিন্তু তখনই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম, আর আমি কিছুই করতে পারিনি। তারপর হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে চির-অন্ধকারের মধ্যে আমার যখন ধীরে ধীরে জ্ঞানোন্মেষ হ'ল, তখন অনেকখানি শান্তভাবে সমস্ত ব্যাপার তলিয়ে ভাববার অবসর পেলাম। তখন আমার চোখের দৃষ্টি ছিল না; তাই মানসদৃষ্টি খুলে গিয়েছিল—দেখলাম, সেই আমাদের পাড়ায় আমরা দু'টি বালক ধর্ম ও আচারের পার্থক্য সত্ত্বেও কেমন পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তোমার গৌরবর্ণ সুশ্রী মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে-পড়া কোঁকড়া চুল আর মিষ্টি হাসি আমাকে তোমার প্রীতির পিয়াসী ক'রে তুলেছিল; আমাদের বাল্য থেকে যৌবনের বন্ধুত্ব-প্রীতির কত কথাই মনের মধ্যে ভেসে ভেসে উঠতে লাগল। তখন এও মনে হ'ল যে, সেই সুদর্শন তুমি কেমন ক'রে আমাকে এমন নির্মমভাবে চিরজীবনের জন্য কুৎসিত বীভৎসদর্শন ক'রে ফেলতে পারলে!"

রহমান কুণ্ঠিত ও অনুতপ্ত স্বরে বল্‌লে—"আমি তখন ভাবিনি যে, তুমি বেঁচে যাবে। এ রকম হয়ে থাকার চেয়ে ....."

শঙ্কর রহমানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে—"ম'রে যাওয়া ঢের ভালো ছিল। কিন্তু আমি মরি নি! ক্রমে যখন পোড়া মুখ আর অন্ধ চক্ষু নিয়ে ভালো হয়ে উঠলাম, তখন এল তোমার বিচারের পালা! আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আমাকে দেখে তোমার হৃৎকম্প হয়েছিল নিশ্চয়ই—তোমার নিজের হাতের এই বীভৎস কীর্তি দেখে আর আমার সাক্ষীতে তোমার দীর্ঘকালের কারাবাস সুনিশ্চিত জেনে। কিন্তু আমি হাসপাতাল থেকে ভেবে এসেছিলাম, তোমাকে আজীবন কারারুদ্ধ রেখে অথবা ফাঁসী দিয়েও আমার নষ্ট দৃষ্টি আর মুখশ্রী ত ফিরে পাব না।"

রহমান শঙ্করের এই কথা শুনতে শুনতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে বল্‌লে—"তোমার আশ্চর্য মহৎ চরিত্র! তোমার সাক্ষীতেই আমি বেঁচে গেলাম। তুমি যখন বল্‌লে,—তোমার চোখে অ্যাসিড্ পড়েছিল, তাই কে তোমায় অ্যাসিড্ দিয়েছিল, তা' তুমি দেখতে পাও নি, তখন আমার মন অনুতাপে, লজ্জায় ও কৃতজ্ঞতায় এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, আর একটু হ'লে আমি নিজের মুখেই দোষ কবুল ক'রে ফেলতাম।

কিন্তু আমি আমার বিহ্বল মনের চিন্তা গুছিয়ে নিয়ে কিছু বলতে পারবার আগেই ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে প্রমাণ অভাবে মুক্তি দিয়ে দিলেন। কিন্তু তোমার মহত্ত্বের দণ্ড বিচারকের দণ্ডের চেয়েও দুঃসহ হয়ে উঠেছে, আমি যে তোমার বন্ধুত্বের কৃতজ্ঞতা বরদাস্ত করতে পারছি নে।"

রহমান কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল।

শঙ্কর বল্‌লে,—"কেবলমাত্র বন্ধুত্বের টানেই আমি তোমাকে রেহাই দিই নি। তুমি সুন্দর সুপুরুষ, তোমার এই রূপে ভুলিয়ে তুমি একটি হিন্দুর বিধবাকে কুলত্যাগিনী ক'রে নিকা করেছ। তুমি জেল থেকে কুশ্রী হয়ে ফিরে এলে তোমার সেই নব-পরিণীতা প্রণয়িনী মনে ক্লেশ পাবে, এই চিন্তাও আমার মনে প্রবল হয়ে তোমাকে অব্যাহতি দিতে প্রবর্তিত করেছিল।"

রহমান তখনও অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ক্রন্দন সংবরণ করতে পারে নি।

শঙ্কর বল্‌তে লাগল—"যা হবার, তা হয়ে গেছে, গতস্য শোচনা নাস্তি। আমি তো অন্ধ অকর্মণ্য হয়ে রইলাম, জড়পিণ্ডের মতো ঘরের কোণে প'ড়ে থাকব, আব কখনও তোমার চোখের সামনে পড়বার সম্ভাবনা রইল না। তুমিও আমার কথা একেবারে ভুলে যেও ....."

রহমান আবেগ-ভবা স্বরে বলে উঠল, "অসম্ভব! অসম্ভব। তোমার মহত্ত্ব আমার মনে আমরণ জাগরূক থাকবে।"

শঙ্কব শুষ্ক স্বরে জোর দিয়ে বল্‌লে—"না। মিথ্যা ভাবুকতা ক'রে নিজের জীবনটাকে বিরস ক'রে রেখ না। আজ তুমি একবার আমাকে শেষ আলিঙ্গন ক'রে চিববিদায় দিয়ে যাও......"

শঙ্করের কুৎসিত পোড়া মুখের কাছে মুখ নিয়ে তা'কে আলিঙ্গন করতে হবে ভেবে রহমানের দেহ ও মন ভয়ে ও ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে কেঁপে উঠল। শঙ্কর এতক্ষণ মুখের উপরে একটা পাতলা রঙিন বেশমের রুমাল ঢাকা দিয়ে কথা বল্‌ছিল, কিন্তু রহমান আদালতে একবার শঙ্করের মুখের যে ভয়ানক ছবি দেখেছিল, তা'র ছাপ সে কিছুতেই নিজের মনের উপর থেকে মুছে ফেলতে পারে নি।

রহমানকে নিরুত্তর দেখে শঙ্কর বল্‌লে—"এখন ত রাত্রি হয়ে গেছে...... ঘরে আলো জ্বলছে বোধ হয়......আলোর আভাও আমি আর অনুভব করতে পারি নে......তুমি আলোটা নিবিয়ে দাও......তা হ'লে আমার ভীষণ মূর্তি

তোমার চোখে পড়বে না, আমার কাছে আসতে তোমার ঘৃণা বা ভয় হবে না……”

শঙ্করের কথা শুনে শঙ্করের মূর্তির কদর্যতা আবার রহমানের মনে প'ড়ে গেল ; সে আলো নিবিয়ে দিতে পারলে না ; ভূতের মতো ভয়ংকরমূর্তি শঙ্করের সঙ্গে এক ঘরে অন্ধকারে থাকতে তা'র গা ছম্‌ছম্‌ করছিল ; তা'তে আবার শঙ্কর তা'কে আলিঙ্গন করতে আহ্বান করছে।

শঙ্কর যদিও আলোর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছিল না, তথাপি আলোক-নির্বাণের কোনো শব্দ শুনতে না পেয়ে সে আবার বল্‌লে—“আলোটা নিবিয়েই দাও, ভাই। আমি আর আগেকার মতো দর্শনযোগ্য নই, আমার চেহারা ভয়ংকর রকমে বদলে গেছে। আমার সঙ্গে কোলাকুলি করতে তোমার কি ঘৃণা বা ভয় হচ্ছে?”

রহমান শুষ্ক কণ্ঠে বল্‌লে—“না, না, এই ত আমি তোমার কাছে এতক্ষণ বসে আছি।”

শঙ্কর মৃদুস্বরে বল্‌লে—“আচ্ছা, আর একটু আমার কাছে স'রে এস—তোমার হাতটা আমার হাতে দাও……হা, সেই আমার বন্ধুর হাত!”

শঙ্কর এই কথা ব'লে রহমানের হাত একটু জোরে চেপে ধরলে।

রহমান শঙ্করের হাতের চাপে তা'র বন্ধুত্বের প্রগাঢ় প্রীতি অনুভব ক'রে অনুতপ্ত স্বরে বল্‌লে—“আমি এই হাত দিয়ে আমার বন্ধুকে চিরজীবনের জন্য বিশ্রী অন্ধ ক'রে দিয়েছি।”

শঙ্কর দৃঢ়মুষ্টিতে রহমানের হাত চেপে ধ'রে তা'কে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে করতে বল্‌লে—“তোমার হাতের এই আঘাত আমার প্রাণের বন্ধুত্ব-প্রীতির পরিমাণ প্রমাণ করে দিয়ে গেছে!……তোমার হাত কাঁপছে!……আমরা……অন্ধরা চোখে না দেখেও স্পর্শ দিয়ে অনেক ভাব অনুভব করতে পারি।……তোমার ভয় করছে, বন্ধু? তা হ'লে আলোটা আমিই নিবিয়ে দিই, আলোটা আমার হাতের কাছেই আছে……”

শঙ্কর হাত বাড়িয়ে কেরোসিন-ল্যাম্পের প্যাঁচ ঘুরিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিল। ঘর ঘন অন্ধকারে ভ'রে গেল।

শঙ্করের মুষ্টির মধ্যে রহমানের হাত আবার কেঁপে উঠল।

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব। শঙ্কর ধীর স্বরে বল্‌লে—“ভয় নেই, বন্ধু, ভয়

নেই, আমি তোমাকে বেশিক্ষণ ধ'রে রাখব না; তুমি আমাকে একবার আলিঙ্গন ক'রে চির-বিদায় দিয়ে যাও।······ঘরটা বোধ হয়, এখন অন্ধকার হয়ে গেছে,····· এখনও আমার অন্ধের অনুভবশক্তি সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে নি, কিছু দিন সময় লাগবে······আমি যেন ছোটো শিশুর মতো পৃথিবীর সঙ্গে নূতন পরিচয় স্থাপন করেছি······"

রহমানকে নীরব থাকতে দেখে শঙ্কর স্বপ্নাবিষ্টের মতো বলতে লাগল—"তুমি যে দয়া ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, তা'তে যে কি সুখী হয়েছি, তা ব'লে বোঝাতে পারব না। তোমায় যখন ডেকে পাঠিয়েছিলাম, তখন ভয় হয়েছিল, তুমি হয়ত আসবে না। কিন্তু তোমাকে একবার বুকে চেপে ধরবার জন্যে আমার প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করছিল······আমাদের এত কালের বন্ধুত্ব কি এত সহজে ভোলবার! কিন্তু তোমাকে ডেকে এনে আমি ভালো করি নি······"

রহমান বিব্রত হয়ে প্রতিবাদের স্বরে ক্ষীণভাবে বল্‌লে,—"না, না·· ···"

অন্ধকারের মধ্যে শঙ্করের মুখের উপর দিয়ে হাসি খেলে গেল। সে বল্‌লে—"অস্বীকার করা অনর্থক। আমার মুখ যে আর মানুষের মুখ নেই, তা আমি বুঝতে পারি। আমার বন্ধু তুমি, তুমিও আমার এই বিভীষিকা-মূর্তি দেখে ভয়ে কাঁপছ! আমার এই বিভীষিকা-মূর্তি ভূতের ভয়ের মতো তোমাকে অনেক দিন পেয়ে থেকে পীড়া দেবে······এই সম্ভাবনাতেই আমার কষ্ট হচ্ছে। যাক্‌, আমার কথা আর না তোলাই ভালো।······আমার কাছে অন্ধকারে ব'সে থাকার দুঃখ চট্‌পট্‌ চুকিয়ে ফেল······"

শঙ্কর রহমানের হাত ধ'রে নিজের দিকে আকর্ষণ করলে।

রহমান আবার কেঁপে উঠল।

শঙ্কর ব'লে উঠল—"ভয়ে কাঁপছ, দোস্ত?"

শঙ্করের কথার মধ্যে ঈষৎ বিদ্রূপ ধ্বনিত হয়ে গেল।

রহমান তাড়াতাড়িতে বল্‌লে—"না, না, আজকে আমার কেমন একটু জ্বরভাব হয়েছে······"

শঙ্কর রহমানকে হাত ধ'রে এক টান দিয়ে নিজের বুকের উপরে এনে ফেললে। রহমানের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। কিন্তু সে নিজের কৃতকর্মের গ্লানিতে শঙ্করের প্রতি ঘৃণা ও ভয়ের ভাব ডুবিয়ে দিয়ে তার মুক্ত হাত দিয়ে শঙ্করকে

শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রীতির সহিত বেষ্টন করে ধরলে। কিন্তু যে-ই তার মনে হ'ল যে, শঙ্করের পোড়া মুখ তার মুখের অত্যন্ত নিকটে এসেছে, অমনই সে ভয়ে ও ঘৃণায় আবার কম্পিত হয়ে উঠল।

শঙ্কর রহমানকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরলে।

রহমান বলিষ্ঠ হ'লেও শঙ্করের আলিঙ্গনে নিপীড়িত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ স্বরে বল্‌লে—"দোস্ত, হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাবে যে! এ যেন ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীম আলিঙ্গন!"

শঙ্কর বল্‌লে—"দেখছ ত আমি তোমার চেয়ে ঢের বলবান্! সে দিন হঠাৎ তুমি বেকায়দায় অ্যাসিড ঢেলে দিয়ে আমাকে কাবু করেছিলে!"

রহমান শঙ্করের আলিঙ্গন-পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য চেষ্টা করলে, তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

শঙ্কর বিদ্রূপ-ভরা স্বরে বল্‌লে—"তোমাকে একবার বুকের কাছে যখন পেয়েছি, দোস্ত, তখন তোমাকে কি সহজেই ছেড়ে দেব?"

শঙ্কর রহমানের যে হাতটা আগে থাকতে চেপে ধরেছিল, সেটাকে বগল-দাবা ক'রে চেপে ধ'রে তার অপর হাতটা সেই হাত দিয়ে আবার চেপে ধরলে এবং তার অপর মুক্তহস্ত পকেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে একটা কাচের শিশি বা'র ক'রে আনলে; শিশির কাচের ছিপি দাঁত দিয়ে খুলে ছিপিটা মাটিতে ফেলে দিলে। কাচের ছিপিটা মাটিতে ঠং ক'রে প'ড়ে দু'খণ্ড হয়ে গেল। শিশি খোলার ও ছিপি ভাঙার শব্দ শুনে রহমান চম্‌কে উঠল এবং চঞ্চল হয়ে শঙ্করের বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল।

শঙ্কর প্রশান্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে বল্‌লে—"চম্‌কো না, দোস্ত, ছট্‌ফট্ ক'র না। শিশিতে অন্য কিছু নেই, তোমার সেই সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্ই একটুখানি, বন্ধুত্বের উপহার ব'লে সংগ্রহ করে রেখেছি! বাল্য-বন্ধু আমরা, দু' জনের চেহারা হুবহু এক রকম হয়ে যাবে!......কাঁপছ?......ভয় কি? অল্প খানিকক্ষণ জ্বালা করবে! তা'র পর মুখের এক পরদা চামড়া উঠে গেলে আর চোখদুটো গ'লে গেলে, তোমার আমার সমান দশা হয়ে যাবে।... ..."

রহমান ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে ছট্‌ফট্ করতে করতে শঙ্করকে মিনতি ক'রে কি বলতে গেল।

রহমানের কণ্ঠ থেকে অস্ফুট স্বর শুনতে পেয়েই শঙ্কর দৃঢ়স্বরে হুকুম করলে—"খবরদার! মুখ বুজে থাক। তোমাকে আমি একেবারে মেরে ফেলতে চাই নে! মৃত্যু হ'লে তুমি ত বেঁচে যাবে! এত সহজেই তোমায় অব্যাহতি দেব মনে করেছ!"

শঙ্কর রহমানকে বাঁ-হাতের কনুইয়ের ভাঁজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে চেপে ধ'রে বাঁ-হাতের আঙুল দিয়ে তার মুখ চেপে ধরলে এবং ডান-হাত দিয়ে শিশি ধ'রে রহমানের কপালে, চোখে ও গালের উপর আস্তে আস্তে অ্যাসিড্ ঢেলে দিল। সেই অ্যাসিডের ধারা গড়িয়ে এসে তার নিজের হাতেও লাগল। তথাপি সে মুক্তি-প্রয়াসী রহমানকে চেপে ধ'রে রেখে স্থির স্বরে বল্‌লে—"আর একটু সবুর কর। বড়ো জ্বালা করছে, না? অ্যাসিড্ গায়ে পড়লে এই রকম একটু জ্বালা করে!......পশুর মতো আমাকে কামড়াচ্ছ? তা'তে আর আমার এমন বেশি কি লাগবে, বন্ধু? তুমি কি মনে করেছ, তোমাকে জখম ক'রে জেল খাটবার জন্য আমি বেঁচে থাকব?"

শঙ্কর এই কথা বলতে বলতেই শিশির অবশিষ্ট অ্যাসিড্ মুখ হাঁ ক'রে নিজের গলায় ঢেলে দিলে।

যন্ত্রণায় উন্মত্তপ্রায় রহমান প্রাণপণ বলে শঙ্করের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতেই শঙ্করের প্রাণহীন দেহের ভারে সে চৌকির উপর থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং দারুণ যন্ত্রণায় মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তখন রহমানের মুখখানা সদ্য ছাল-ছাড়ানো রক্তাক্ত এক-ডেলা মাংসপিণ্ড হয়ে গেছে!

রহমানের যখন চেতনা ফিরে এল, তখন সকাল। সে অনুভব করলে, শঙ্করের প্রাণহীন আড়ষ্ট দেহ তাকে তখনও মরণ-আলিঙ্গনে চেপে ধ'রে পড়ে আছে। সে নিজেকে মড়ার কঠিন আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করবার অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু মড়ার বাহু-বন্ধন ছাড়াতে না পেরে ভয়ে সে আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

বার্ষিক বসুমতী : ১৩৩৩

শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

রাজশেখর বসু

মাঘ মাস ১৩২৬ সাল। এই মাত্র আরমানী গির্জার ঘড়িতে বেলা এগারটা বাজিয়াছে। শ্যামবাবু চামড়ার ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া জুডাস লেনের একটি তেতলা বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। বাড়িটি বহু পুরাতন, ক্রমাগত চুন ও রঙের প্রলেপে লোলচর্ম কলপিত-কেশ বৃদ্ধের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। নীচের তলায় অন্ধকারময় মালের গুদাম। উপরতলায় সম্মুখভাগে অনেকগুলি ব্যবসায়ীর আপিস, পশ্চাতে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি পরিবার পৃথক পৃথক অংশে বাস করেন। প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই তেতলা পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশের দেওয়াল আগাগোড়া তাম্বুলরাগচর্চিত—যদিও নিষেধের নোটিস লম্বিত আছে। কতিপয় নেংটে ইঁদুর ও আরসোলা পরস্পর অহিংসভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ইহারা আশ্রমমৃগের ন্যায় নিঃশঙ্ক, সিঁড়ির যাত্রিগণকে গ্রাহ্য করে না। অন্তরালবর্তী সিন্ধী-পরিবারের রান্নাঘর হইতে নির্গত হিঙের তীব্র গন্ধের সহিত নরদমার গন্ধ মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান আমোদিত করিয়াছে। আপিস-সমূহের মালিকগণ তুচ্ছ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া কেনা-বেচা তেজি-মন্দি আদায়-উসুল ইত্যাদি মহৎ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছেন।

শ্যামবাবু তেতলায় উঠিয়া একটি ঘরের তালা খুলিলেন। ঘরের দরজার পাশে কাষ্ঠফলকে লেখা আছে—ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনার্ল্ মার্চেণ্ট্স। এই কারবারের স্বত্বাধিকারী স্বয়ং শ্যামবাবু (শ্যামলাল গাঙ্গুলী) এবং তাঁহার শ্যালক বিপিন চৌধুরী, বি. এস-সি। ঘরে কয়েকটি পুরাতন টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রভৃতি আপিস-সরঞ্জাম। টেবিলের উপর নানা-প্রকার খাতা, বিতরণের জন্য ছাপানো বিজ্ঞাপনের স্তূপ, একটি পুরাতন থ্যাকার্স ডিরেক্টরি, একখণ্ড ইণ্ডিয়ান কম্পানিজ অ্যাক্ট, কয়েকটি বিভিন্ন কম্পানির নিয়মাবলী বা articles, এবং অন্যবিধ কাগজপত্র। দেওয়ালে সংলগ্ন তাকের উপর কতকগুলি ধূলিধূসর কাগজমোড়া শিশি এবং শূন্যগর্ভ মাদুলি। এককালে শ্যামবাবু পেটেণ্ট ও স্বপ্নাদ্য ঔষধের কারবার করিতেন, এগুলি তাহারই নিদর্শন।

শ্যামবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকণ্ঠলম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝোঁক, কিন্তু এ পর্যন্ত নানাপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ই. বি. রেলওয়ে অডিট আপিসের চাকরিই তাঁহার জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায়। দেশে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এবং একটি জীর্ণ কালীমন্দির আছে, কিন্তু তাহার আয় সামান্য। চাকরির অবকাশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন—এ বিষয়ে শ্যালক বিপিনই তাঁহার প্রধান সহায়। সন্তানাদি নাই, কলিকাতার বাসায় পত্নী এবং শ্যালক সহ বাস করেন। ব্যবসায়ের কিছু উন্নতি হইলেই চাকরি ছাড়িয়া দিবেন, এইরূপ সংকল্প আছে। সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি লইয়া নূতন উদ্যমে ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল নামে আপিস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্যামবাবু ধর্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং অবসর-মত তান্ত্রিক সাধনা করিয়া থাকেন। বৃথা—অর্থাৎ ক্ষুধা না থাকিলে—মাংসভোজন, এবং অকারণে কারণ পান করেন না। কোন্ সন্ন্যাসী সোনা করিতে পারে, কাহার নিকট দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ বা একমুখী রুদ্রাক্ষ আছে, কে পারদ ভস্ম করিতে জানে, এই সকল সন্ধান প্রায়ই লইয়া থাকেন। কয়েক মাস হইতে বাটীতে গৈরিক বাস পরিধান করিতেছেন এবং কতকগুলি অনুরক্ত শিষ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্যামবাবু, আজকাল মধ্যে মধ্যে নিজেকে 'শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী' আখ্যা দিয়া থাকেন, এবং অচিরে এই নামে সর্বত্র পরিচিত হইবেন এরূপ আশা করেন।

শ্যামবাবু তাঁহার আপিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি সার্ধত্রিপাদ ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন—'বাঙ্কা, ওরে বাঙ্কা।' বাঙ্কা শ্যামবাবুর আপিসের বেয়ারা—এতক্ষণ পাশের গলিতে টুলে বসিয়া ঢুলিতেছিল—প্রভুর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। শ্যামবাবু বলিলেন—'গঙ্গাজলের বোতলটা আন্, আর খাতাপত্রগুলো একটু ঝেড়ে-মুছে রাখ, যা ধুলো হয়েছে।' বাঙ্কা একটা তামার কুপি আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তার পর টেবিলের দেরাজ হইতে একটি সিন্দূর-চর্চিত রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিলেন। স্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার

ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়। এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' এবং পেটেন্ট লইবার চেষ্টায় আছেন

উক্তপ্রকার নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্যামবাবু প্রসন্নচিত্তে ব্যাগ হইতে ছাপাখানার একটি ভিজা প্রুফ বাহির করিয়া লইয়া সংশোধন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জুতার মশমশ শব্দ করিতে করিতে অটলবাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন—'এই যে শ্যামদা, অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি? বড় দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না—হাইকোর্টে একটা মোশন ছিল। ব্রাদার-ইন-ল কোথায়?'

শ্যামবাবু। বিপিন গেছে বাগবাজারে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের কাছে। আজ পাকা কথা নিয়ে আসবে। এই এল ব'লে।

অটলবাবু চাপকান-চোগা-ধারী সদ্যোজাত অ্যাটর্নি, পিতার আপিসে সম্প্রতি জুনিয়ার পার্টনার-রূপে যোগ দিয়াছেন। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, বিপিনের বাল্যবন্ধু। বয়সে নবীন হইলেও চাতুর্যে পরিপক্ক। জিজ্ঞাসা করিলেন—'বুড়ো রাজী হ'ল? আচ্ছা, ওকে ধরলেন কি ক'রে?'

শ্যাম। আরে তিনকড়িবাবু হলেন গে শরতের খুড়শ্বশুর। বিপিনের মাস্তুতো ভাই শরৎ। ঐ শরতের সঙ্গে গিয়ে তিনকড়িবাবুকে ধরি। সহজে কি রাজী হয়? বুড়ো যেমন কঞ্জুস তেমনি সন্দিগ্ধ। বলে—আমি হলুম রায়সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপুটি, গভরমেণ্টের কাছে কত মান। কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে কি শেষে পেনশন খোয়াব? তখন নজির দিয়ে বোঝালুম—কত রিটায়ার্ড বড় বড় অফিসার তো ডিরেক্টরি করছেন, আপনার কিসের ভয়? শেষে যখন শুনলে যে, প্রতি মিটিংএ ৩২৲ টাকা ফী পাবে, তখন একটু ভিজল।

অটল। কত টাকার শেয়ার নেবে?

শ্যাম। তাতে বড় হুঁশিয়ার। বলে—তোমার ব্রহ্মচারী কোম্পানি যে লুঠ করবে না, তার জামিন কে? তোমরা শালা-ভগ্নীপতি মিলে ম্যানেজিং এজেণ্ট হয়ে কোম্পানিকে ফেল করলে আমার টাকা কোথায় থাকবে? বললুম—মশায়, আপনার মত বিচক্ষণ সাবধানী ডিরেক্টর থাকতে কার সাধ্য লুঠ করে। খরচপত্র তো আপনার চোখের সামনেই হবে। ফেল হ'তে দেবেন

কেন ? মন্দটা যেমন ভাবছেন, ভালর দিকটাও দেখুন। কি রকম লাভের ব্যবসা! খুব কম ক'রেও যদি ৫০ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ড পান তবে দু-বছরের মধ্যেই তো আপনার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর বললে—আচ্ছা, আমি শেয়ার নেব, কিন্তু বেশী নয়, ডিরেক্টর হ'তে হ'লে যে টাকা দেওয়া দরকার তার বেশী নেব না। আজ মত স্থির ক'রে জানাবেন, তাই বিপিনকে পাঠিয়েছি।

অটল। অমন খুঁতখুঁতে লোক নিয়ে ভাল করলেন না শ্যাম-দা। আচ্ছা, মহারাজাকে ধরলেন না কেন ?

শ্যাম। মহারাজাকে ধরতে বড়-শিকারী চাই, তোমার আমার কর্ম নয়। তা ছাড়া পাঁচ ভূতে তাঁকে শুষে নিয়েছে, কিছু আর পদার্থ রাখে নি।

অটল। খোট্টাটি ঠিক আছে তো ? আসবে কখন ?

শ্যাম। সে ঠিক আছে, এই রকম দাঁও মারতেই তো সে চায়। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। প্রসপেক্টসটা তোমাদের শুনিয়ে আজই ছাপাতে দিতে চাই। তিনকড়িবাবুকে আসতে বলেছিলুম, বাতে ভুগছেন, আসতে পারবেন না জানিয়েছেন।

'রাম রাম বাবুসাহেব !'

আগন্তুক মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধুতি, লম্বা কাল বনাতের কোট, পায়ে বার্নিশ-করা জুতা, মাথায় হলদে রঙের ভাঁজ-করা মলমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কানে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।

শ্যামবাবু বলিলেন—'আসুন, আসুন—ওরে বাঙ্গা, আর একটা চেয়ার দে। এই ইনি হচ্ছেন অটলবাবু, আমাদের সলিসিটর দত্ত কোম্পানির পার্টনার। আর ইনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু—বাবু গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া।'

গণ্ডেরি। নোমোস্কার, আপনের নাম শুনা আছে, জানপহ্‌চান হয়ে বড় খুশ হ'ল।

অটল। নমস্কার, এই আপনার জন্যই আমরা ব'সে আছি। আপনার মত লোক যখন আমাদের সহায়, তখন কোম্পানির আর ভাবনা কি ?

গণ্ডেরি। হেঁ হেঁ, সোকোলি ভগবানের হিস্থা। হামি একেলা কি করতে পারি ? কুছু না।

ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়। এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' এবং পেটেণ্ট লইবার চেষ্টায় আছেন

উক্তপ্রকার নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্যামবাবু প্রসন্নচিত্তে ব্যাগ হইতে ছাপাখানার একটি ভিজা প্রুফ বাহির করিয়া লইয়া সংশোধন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জুতার মশমশ শব্দ করিতে করিতে অটলবাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন—'এই যে শ্যামদা, অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি? বড় দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না—হাইকোর্টে একটা মোশন ছিল। ব্রাদার-ইন-ল কোথায়?'

শ্যামবাবু। বিপিন গেছে বাগবাজারে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের কাছে। আজ পাকা কথা নিয়ে আসবে। এই এল ব'লে।

অটলবাবু চাপকান-চোগা-ধারী সদ্যোজাত অ্যাটর্নি, পিতার আপিসে সম্প্রতি জুনিয়ার পার্টনার-রূপে যোগ দিয়াছেন। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, বিপিনের বাল্যবন্ধু। বয়সে নবীন হইলেও চাতুর্যে পরিপক্ক। জিজ্ঞাসা করিলেন—'বুড়ো রাজী হ'ল? আচ্ছা, ওকে ধরলেন কি ক'রে?'

শ্যাম। আরে তিনকড়িবাবু হলেন গে শরতের খুড়শ্বশুর। বিপিনের মাস্তুতো ভাই শরৎ। ঐ শরতের সঙ্গে গিয়ে তিনকড়িবাবুকে ধরি। সহজে কি রাজী হয়? বুড়ো যেমন কঞ্জুস তেমনি সন্দিগ্ধ। বলে—আমি হলুম রায়সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপুটি, গভরমেণ্টের কাছে কত মান। কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে কি শেষে পেনশন খোয়াব? তখন নজির দিয়ে বোঝালুম—কত রিটায়াড বড় বড় অফিসার তো ডিরেক্টরি করছেন, আপনার কিসের ভয়? শেষে যখন শুনলে যে, প্রতি মিটিংএ ৩২৲ টাকা ফী পাবে, তখন একটু ভিজল।

অটল। কত টাকার শেয়ার নেবে?

শ্যাম। তাতে বড় হুঁশিয়ার। বলে—তোমার ব্রহ্মচারী কোম্পানি যে লুঠ করবে না, তার জামিন কে? তোমরা শালা-ভগ্নীপতি মিলে ম্যানেজিং এজেণ্ট হয়ে কোম্পানিকে ফেল করলে আমার টাকা কোথায় থাকবে? বললুম—মশায়, আপনার মত বিচক্ষণ সাবধানী ডিরেক্টর থাকতে কার সাধ্য লুঠ করে। খরচপত্র তো আপনার চোখের সামনেই হবে। ফেল হ'তে দেবেন

কেন? মন্দটা যেমন ভাবছেন, ভালর দিকটাও দেখুন। কি রকম লাভের ব্যবসা! খুব কম ক'রেও যদি ৫০ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ড পান তবে দু-বছরের মধ্যেই তো আপনার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর বললে—আচ্ছা, আমি শেয়ার নেব, কিন্তু বেশী নয়, ডিরেক্টর হ'তে হ'লে যে টাকা দেওয়া দরকার তার বেশী নেব না। আজ মত স্থির ক'রে জানাবেন, তাই বিপিনকে পাঠিয়েছি।

অটল। অমন খুঁতখুঁতে লোক নিয়ে ভাল করলেন না শ্যাম-দা। আচ্ছা, মহারাজাকে ধরলেন না কেন?

শ্যাম। মহারাজাকে ধরতে বড়-শিকারী চাই, তোমার আমার কর্ম নয়। তা ছাড়া পাঁচ ভূতে তাঁকে শুষে নিয়েছে, কিছু আর পদার্থ রাখে নি।

অটল। খোট্টাটি ঠিক আছে তো? আসবে কখন?

শ্যাম। সে ঠিক আছে, এই রকম দাঁও মারতেই তো সে চায়। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। প্রসপেক্টসটা তোমাদের শুনিয়ে আজই ছাপাতে দিতে চাই। তিনকড়িবাবুকে আসতে বলেছিলুম, বাতে ভুগছেন, আসতে পারবেন না জানিয়েছেন।

'রাম রাম বাবুসাহেব!'

আগন্তুক মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধুতি, লম্বা কাল বনাতের কোট, পায়ে বার্নিশ-করা জুতা, মাথায় হলদে রঙের ভাঁজ-করা মলমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কানে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।

শ্যামবাবু বলিলেন—'আসুন, আসুন—ওরে বাঙ্গা, আর একটা চেয়ার দে। এই ইনি হচ্ছেন অটলবাবু, আমাদের সলিসিটর দত্ত কোম্পানির পার্টনার। আর ইনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু—বাবু গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া।'

গণ্ডেরি। নোমোস্কার, আপনের নাম শুনা আছে, জানপহচান হয়ে বড় খুশ হ'ল।

অটল। নমস্কার, এই আপনার জন্যই আমরা ব'সে আছি। আপনার মত লোক যখন আমাদের সহায়, তখন কোম্পানির আর ভাবনা কি?

গণ্ডেরি। হেঁ হেঁ, সোকোলি ভগবানের হিস্থা। হামি একেলা কি করতে পারি? কুছু না।

শ্যাম। ঠিক, ঠিক। যা করেন মা তারা দীনতারিণী। দেখ অটল, গণ্ডেরিবাবু যে কেবল পাকা ব্যবসাদার তা মনে ক'রো না। ইংরিজী ভাল না জানলেও ইনি বেশ শিক্ষিত লোক, আর শাস্ত্রেও বেশ দখল আছে।

অটল। বাঃ, আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় সুখী হলুম। আচ্ছা মশায়, আপনি এমন সুন্দর বাংলা বলতে শিখলেন কি ক'রে ?

গণ্ডেরি। বহুত বাঙ্গালীর সঙে হামি মিলা মিশা করি। বাংলা কিতাব ভি অনেক পঢেছি। বঙ্কিমচন্দ্, রবীন্দরনাথ, আউর ভি সব।

এমন সময় বিপিনবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ইনি একটু সাহেবী মেজাজের লোক, এককালে বিলাত যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিধানে সাদা প্যাণ্ট, কাল কোট, লাল নেকটাই, হাতে সবুজ ফেল্ট হ্যাট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায়, গোঁফের দুই প্রান্ত কামানো। শ্যামবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হ'ল ?'

বিপিন। ডিরেক্টর হবেন বলেছেন, কিন্তু মাত্র দু-হাজার টাকার শেয়ার নেবেন। তোমাকে অটলকে আমাকে পরশু সকালে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। এই নাও চিঠি।

অটল। তিনকড়িবাবু হঠাৎ এত সদয় যে ?

শ্যাম। বুঝলুম না। বোধ হয় ফেলো ডিরেক্টরদের একবার বাজিয়ে যাচাই ক'রে নিতে চান।

অটল। যাক, এবার কাজ আরম্ভ করুন। আমি মেমোরাণ্ডম আর আর্টিকেল্‌সের মুসাবিদা এনেছি। শ্যাম-দা, প্রসপেক্টসটা কি রকম লিখলেন পড়ুন।

শ্যাম। হাঁ, সকলে মন দিয়ে শোন। কিছু বদলাতে হয় তো এই বেলা। দুর্গা—দুর্গা—

জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ

১৯১৩ সালের ৭ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিত

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

মূলধন—দশ লক্ষ টাকা, ১০৲ হিসাবে ১০০,০০০ অংশে বিভক্ত। আবেদনের সঙ্গে অংশ-পিছু ২৲ প্রদেয়। বাকী টাকা চার কিস্তিতে তিন মাসের নোটিসে প্রয়োজন-মত দিতে হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র

ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোনও কর্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন—ধর্মের ফল পরলোকে লভ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে। এতদর্থে সদ্য সদ্য চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলির কিরূপ বিপুল আয় তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশের একটি দেবমন্দিরের দৈনিক যাত্রিসংখ্যা গড়ে ১৫ হাজার। যদি লোক-পিছু চার আনা মাত্র আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। খরচ যতই হউক, যথেষ্ট টাকা উদবৃত্ত থাকে। কিন্তু সাধারণে এই লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত।

দেশের এই বৃহৎ অভাব দূরীকরণার্থে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে একটি জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি স্থাপিত হইতেছে। ধর্মপ্রাণ শেয়ারহোল্ডারগণের অর্থে একটি মহান্ তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং জাগ্রত দেবী সমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইবে। উপযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্টের হস্তে কায নির্বাহের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কোনও প্রকার অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। শেয়ারহোল্ডারগণ আশাতীত দক্ষিণা বা ডিভিডেণ্ড পাইবেন এবং একাধারে ধর্ম অর্থ মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

ডিরেক্টরগণ।—(১) অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ বিচক্ষণ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট রায়সায়েব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) বিখ্যাত ব্যবসাদার ও ক্রোরপতি শ্রীযুক্ত গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া। (৩) সলিসিটর্স দত্ত অ্যাণ্ড কোম্পানির অংশীদার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত, M.A., B.L. (৪) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিস্টার বি, সি, চৌধুরী, B Sc., A.S.S. (U.S.A.) (৫) কালীপদাশ্রিত সাধক ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ (ex-officio)।

অটলবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—'বিপিন আবার নতুন টাইটেল পেলে কবে?'

শ্যাম। আর বল কেন। পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে আমেরিকা না কামস্কাটকা কোথা থেকে তিনটে হরফ আনিয়েছে।

বিপিন। বা, আমার কোয়ালিফিকেশন না জেনেই বুঝি তারা শুধু শুধু একটা ডিগ্রী দিলে? ডিরেক্টর হ'তে গেলে একটা পদবী থাকা ভাল নয়?

গণ্ডেরি। ঠিক বাত। ভেক বিনা ভিখ মিলে না। শ্যামবাবু, আপনিও এখন্‌সে ধোতি-উতি ছোড়ে লঙোটি পিনহুন।

শ্যাম। আমি তো আর নাগা সন্ন্যাসী নই। আমি হলুম শক্তিমন্ত্রের সাধক, পরিধেয় হ'ল রক্তাম্বর। বাড়িতে তো গৈরিকই ধারণ করি। তবে

আপিসে প'রে আসি না, কারণ, ব্যাটারা সব হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে। আর একটু লোকের চোখ-সহা হয়ে গেলে সর্বদাই গৈরিক পরব। যাক, পড়ি শোন—

মেসার্স ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল এই কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন—ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহারা লাভের উপর শতকরা দুই টাকা মাত্র কমিশন লইবেন, এবং যতদিন না—

অটলবাবু বলিলেন—'কমিশনের রেট অত কম ধরলেন কেন? দশ পার্সেণ্ট অনায়াসে ফেলতে পারেন।'

গণ্ডেরি। কুছ দরকার নেই। শ্যামবাবুর পরবস্তি অপ্‌নেসে হোয়ে যাবে। কমিশনের ইরাদা থোড়াই করেন।

এবং যতদিন না কমিশনে মাসিক ১০০০্ টাকা পোষায়, ততদিন শেষোক্ত টাকা অ্যালউয়েন্স রূপে পাইবেন।

গণ্ডেরি। শুনেন অটলবাবু, শুনেন। আপনি শ্যামবাবুকে কী শিখ্‌লাবেন?

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর গ্রামে ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবী বহু শতাব্দী যাবৎ প্রতিষ্ঠিতা আছেন। দেবীমন্দির ও তৎসংলগ্ন দেবত্র সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সম্প্রতি স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন যে উক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে অধুনা সর্বপীঠের সমন্বয় হইয়াছে এবং মাতা তাঁহার মাহাত্ম্যের উপযোগী সুবৃহৎ মন্দিরে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী অবলা বিধায় এবং উক্ত দৈবাদেশ স্বয়ং পালন করিতে অপারগা বিধায়, উক্ত দেবত্র সম্পত্তি মায় মন্দির বিগ্রহ জমি আওলাত আদি এই লিমিটেড কোম্পানিকে সমর্পণ করিতেছেন।

অটল। নিস্তারিণী দেবী আবার কোথা থেকে এলেন? সম্পত্তি তো আপনার ব'লেই জানতুম।

শ্যাম। উনি আমার স্ত্রী। সেদিন তাঁর নামেই সব লেখাপড়া ক'রে দিয়েছি। আমি এসব বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে চাই না।

গণ্ডেরি। ভালা বন্দোবস্ত্ কিয়েছেন। আপনেকো কোই ছুস্‌বে না। নিস্তার্ণী দেবীকো কোন্ পহ্‌চানে। দাম কেতো লিচ্ছেন?

অতঃপর তীর্থপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরনির্মাণ, দেবসেবাদি কোম্পানি কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং এতদর্থে কোম্পানি মাত্র ১৫,০০০্ টাকা পণে সমস্ত সম্পত্তি খরিদার্থে বায়না করিয়াছেন।

গণ্ডেরি। হদ্দ্ কিয়া শ্যামবাবু! জঙ্গল কি ভিতর পুরানা মন্দিল, উস্‌মে

দো-চার শও ছুছুন্দর, ছটাক ভর জমীন, উস্‌পর দো-চার বাঁশ ঝাড়—বস্‌, ইসিকা দাম পন্দ্র হজার!

শ্যাম। কেন, অন্যায়টা কি হ'ল? স্বপ্নাদেশ, একান্ন পীঠ এক ঠাঁই, জাগ্রত দেবী—এসব বুঝি কিছু নয়? গুড-উইল হিসেবে পনের হাজার টাকা খুবই কম।

গণ্ডেরি। অচ্ছা। যদি কোই শেয়ারহোল্ডার হাইকোর্ট মে দরখাস্ত পেশ করে—স্বপন-উপন সব ঝুট, ছকৃলায়কে রূপয়া লিয়া—তব্‌?

অটল। সে একটা কথা বটে, কিন্তু এই সব আধিদৈবিক ব্যাপার বোধ হয় অরিজিনাল সাইডের জুরিস্‌ডিক্‌শনে পড়ে না। আইন বলে—caveat emptor, অর্থাৎ ক্রেতা সাবধান! সম্পত্তি কেনবার সময় যাচাই কর নি কেন? যা হোক একবার expert opinion নেব।

শীঘ্রই নূতন দেবালয় আরম্ভ হইবে। তৎসংলগ্ন প্রশস্ত নাটমন্দির, নহবতখানা, ভোগশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গৃহাদিও থাকিবে। আপাতত দশ হাজার যাত্রীর উপযুক্ত অতিথিশালা নির্মিত হইবে। শেয়ারহোল্ডারগণ বিনা খরচায় সেখানে সপরিবারে বাস করিতে পারিবেন। হাট বাজার যাত্রা থিয়েটার বায়োস্কোপ ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন যথেষ্ট থাকিবে। যাঁহারা দৈবাদেশ বা ঔষধপ্রাপ্তির জন্য হত্যা দিবেন তাঁহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিবে। মোট কথা, তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করিবার সর্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইবে। স্বয়ং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী ৺ সেবার ভার লইবেন।

যাত্রিগণের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, তাহা ভিন্ন আরও নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। দোকান হাট বাজার অতিথিশালা মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদ্ভিন্ন by-product recoveryর ব্যবস্থা থাকিবে। ৺ সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলীতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগসমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।

গণ্ডেরি। বকড়ি মারবেন? হামি ইস্‌মি নহি, রামজী কিরিয়া। হামার নাম কাটিয়ে দিন।

শ্যাম। আপনি তো আর নিজে বলি দিচ্ছেন না। আচ্ছা, না হয় কুমড়ো-বলির ব্যবস্থা করা যাবে।

অটল। কুমড়োর চামড়া তো ট্যান হবে না। আয় ক'মে যাবে। কিহে বৈজ্ঞানিক, কুমড়োর খোসার একটা গতি করতে পার?

বিপিন। কষ্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে বোধ হয় ভেজিটেব্‌ল ঘৃ হ'তে পারে। এক্সপেরিমেণ্ট ক'রে দেখব।

গণ্ডেরি। জো খুশি করো। হমার কি আছে। হামি থোড়া রোজ বাদ আপ্‌না শেয়ার বিলকুল বেচে দিব।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে কোম্পানির বাৎসরিক লাভ অন্তত ১২ লক্ষ টাকা হইবে এবং অনায়াসে ১০০ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ট দেওয়া যাইবে। ৩০ হাজার শেয়ারের আবেদন পাইলেই অ্যালটমেণ্ট হইবে। ত্বরায় শেয়ারের জন্য আবেদন করুন। বিলম্বে এই সুবর্ণসুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গণ্ডেরি। লিখে লিন—ঢাই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে। হামি এক লাখ লিব, বাকী দেড় লাখ শ্যামবাবু বিপিনবাবু অটলবাবু সমান হিস্‌সা লিবেন।

শ্যাম। পাগল আর কি! আমি আর বিপিন কোথা থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হাজার বার করব? আপনারা না হয় বড়লোক আছেন।

গণ্ডেরি। হামি-শালা রূপয়া ডালবো আর তুমি লোগ মৌজ করবে? সো হোবে না। সব্‌কা ঝোঁথি লেনা পড়েগা। শ্যামবাবু মতলব সমঝ্‌লেন না? টাকা কোই দিব না। সব হাওলাতী থাকবে। মেনেজিং এজিণ্ট মহাজন হোবে।

অটল। বুঝলেন শ্যাম-দা? আমরা সকলে যেন ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের কাছ থেকে কর্জ ক'রে নিজের নিজের শেয়ারের টাকা কোম্পানিকে দিচ্ছি; আবার কোম্পানি ঐ টাকা ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের কাছে গচ্ছিত রাখছে। গাঁট থেকে এক পয়সাও কেউ দিচ্ছেন না, টাকাটা কেবল খাতাপত্রে জমা থাকবে।

শ্যাম। তারপর তাল সামলাবে কে? কোম্পানি ফেল হলে আমি মারা যাই আর কি! বাকী কলের টাকা দেব কোথা থেকে?

গণ্ডেরি। ডরেন কোনো? শেয়ার পিছ তো অভি দো টাকা দিতে হোবে। ঢাই লাখ টাকার শেয়ারে সির্ফ্‌ পচাস হজার দেনা হোয়। প্রিমিয়ম মে সব বেচে দিব—সুবিস্তা হোয় তো আউর ভি শেয়ার ধ'রে রাখবো। বহুত মুনাফা মিলবে। চিম্‌ড়িমল ব্রোকারসে হামি বন্দোবস্ত কিয়েছি। দো চার দফে হম লোগ আপ্‌না আপ্‌নি শেয়ার লেকে খেলবো, হাঁথ বাদ্‌লাবো,

দাম চড়বে, বাজার গরম হোবে। তখন সব কোই শেয়ার মাংবে, দাম কা বিচার করবে না। কবীরজী কি বচন শুনিয়ে—

ঐসী গতি সন্‌সারমে যো গাড়র কি ঠাট।
এক পড়া যব গাঢ়মে সবৈ যাত তেহি বাট॥

মানি হচ্ছে—সন্‌সারের লোক সব যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খাদ্দেমে গির পড়ে তো সব কোই উসিমে ঘুসে।

শ্যামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'তারা ব্রহ্মময়ী, তুমিই জান। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার কাজ তুমিই উদ্ধার ক'রে দাও মা—অধম সন্তানকে যেন মেরো না।'

গণ্ডেরি। শ্যামবাবু, মন্দিল-উন্দিলকা কোম্পানি যো করনা হ্যায় কিজিয়ে। উস্‌কি সাথ ঘই-এর কারবার ভি লাগায় দিন। টাকায় টাকা লাভ।

অটল। ঘই কি চিজ?

গণ্ডেরি। ঘই জানেন না? ঘিউ হচ্ছে আস্‌লি চিজ—যো গায় ভঁইস বকড়িকা দুধসে বনে। আউর নক্‌লি যো হ্যায় সো ঘই কহ্‌লাতা। চর্বি, চীনাবাদাম তল ওগায়রহ্‌ মিলা কর্ বনায়া যাতা। পর্ সাল হামি ঘই-এর কামে পচিশ হজার লাগাই, সাঢে চৌবিশ হজার মুনাফা মিলে।

অটল। উঃ বিস্তর সাপ মেরেছিলেন বলুন!

গণ্ডেরি। আরে সাঁপ কাঁহাসে মিল্‌বে? উ সব ঝুট বাত।

অটল। আচ্ছা গণ্ডারজী—

গণ্ডেরি। গণ্ডার নেহি, গণ্ডেরি।

অটল। হাঁ হাঁ, গণ্ডেরিজী। বেগ ইওর পার্ডন। আচ্ছা, আপনি তো নিরামিষ খান, ফোঁটা কাটেন, ভজন-পূজনও করেন।

গণ্ডেরি। কেনো করবো না? হামি হর্ রোজ গীতা আউর রামচরিত-মানস পঢ়ি, রামভজন ভি করি।

অটল। তবে অমন পাপের ব্যাবসাটা করলেন কি ব'লে?

গণ্ডেরি। পাঁপ? হামার কোনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকত্তা, ঘই বনে হাথরস্‌মে। হামি ন আঁখসে দেখি, ন নাকসে শুংখি—হনুমানজী কিরিয়া। হামি তো সির্ফ মহাজন আছি—রুপয়া দে কর্ খালাস। সুদ লি, মুনাফার আধা হিস্‌সা ভি লি। যদি হামি

টাকা না দি, কাসেম আলি দুসরা ধনীসে লিবে। পাপ হোবে তো শালা কাসেম আলিকা হোবে। হামার কি? যদি ফিন কুছ দোষ লাগে—জানে রন্‌ছোড়জী—হামার পুন্‌ভি থোড়া-বহুত জমা আছে। একাদসী, শিউরাত, রামনওমীমে উপবাঁস, দান-খয়রাত ভি কুছু করি। আট আটঠো ধরমশালা বানোআয়া—লিলুয়ামে, বালিমে, শেওড়াফুলিমে—

অটল। লিলুয়ার ধর্মশালা তো আশরফিলাল ঠুনঠুনওয়ালা করেছে।

গণ্ডেরি। কিয়েছে তো কি হইয়েছে? সভি তো ওহি কিয়েছে। লেকিন বানিয়ে দিয়েছে কোন্? তদারক কোন্ কিয়েছে? ঠিকাদার কোন্ লাগিয়েছে সব হামি। আশরফি হমার চাচেরা ভাই লাগে। হামি সলাহ্ দিয়েছি তব্ না রুপয়া খরচ কিয়েছে!

অটল। মন্দ নয়, টাকা ঢাললে আশরফি, পুণ্য হ'ল গণ্ডেরির।

গণ্ডেরি। কেনো হোবে না? দো দো লাখ রুপেয়া হর্ জগেমে খরচ দিয়া। জোড়িয়ে তো কেতনা হোয়। উস পর কম্‌সে কম সঁয়কড়া পাঁচ রুপয়া দস্তুরি তো হিসাব কিজিয়ে। হাম তো বিলকুল ছোড় দিয়া। আশরফি-লালকা পুন্ যদি সোলহ্ লাখকা হোয়, মেরা ভি অসসি হাজার মোতাবেক হোনা চাহ্‌তা।

অটল। চমৎকার ব্যবস্থা! পুণ্যেরও দেখছি দালালি পাওয়া যায়। আমাদের শ্যাম-দা গণ্ডেরি-দা যেন মানিকজোড়।

গণ্ডেরি। অটলবাবু, আপনি দো চাব অংরেজী কিতাব পঢ়িয়ে হামাকে ধরম কি শিখ্‌লাবেন? বঙ্গালী ধরম জানে না। তিস রুপয়ার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে। হামার জাত রুপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন্ ভি করে হিসাবসে। আপ্‌নেদের রবীন্দরনাথ কি লিখছেন—

বৈরাগ সাধন মুক্তি সো হমার নহি।

হামি এখন চলছি, রেস খেলনে। কোল্টি গেরিল ঘোড়ে পর্ আজ দো-চারশও লাগিয়ে দিব।

অটল। আমিও উঠি শ্যাম-দা। আর্টিকেলের মুসাবিদা রেখে যাচ্ছি, দেখে রাখবেন। প্রস্‌পেক্টস তো দিব্বি হয়েছে। একটু-আধটু বদ্‌লে দেব এখন। পরশু আবার দেখা হবে। নমস্কার।

বাগবাজারে গলির ভিতর রায়সাহেব তিনকড়িবাবুর বাড়ি। নীচের তলায় রাস্তার সম্মুখে নাতিবৃহৎ বৈঠকখানা-ঘরে গৃহকর্তা এবং নিমন্ত্রিতগণ গল্পে নিরত, অন্দর হইতে কখন ভোজনের ডাক আসিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আজ রবিবার, তাড়া নাই, বেলা অনেক হইয়াছে।

তিনকড়িবাবুর বয়স ষাট বৎসর, ক্ষীণ দেহ, দাড়ি কামানো। শীর্ণ গোঁফে তামাকের ধোঁয়ায় পাকা খেজুরের রং ধরিয়াছে—কথা কহিবার সময় আরসোলার দাড়ার মত নড়ে। তিনি দৈব ব্যাপারে বড় একটা বিশ্বাস করেন না। প্রথম পরিচয়ে শ্যামবাবুকে বুজরুক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কেবল লাভের আশায় কম্পানিতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু আজ কালীঘাট হইতে প্রত্যাগত সদ্যঃস্নাত শ্যামবাবুর অভিনব মূর্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্যামবাবুর পরিধানে লাল চেলী, গেরুয়া রঙের আলোয়ান, পায়ে বাঘের চামড়ার শিং-তোলা জুতা। দাড়ি এবং চুল সাজিমাটি দ্বারা যথাসম্ভব ফাঁপানো, এবং কপালে মস্ত একটি সিন্দূরের ফোঁটা।

তিনকড়িবাবু তামাক-টানার অন্তরালে বলিতেছিলেন—'দেখুন স্বামীজী, হিসেবই হ'ল ব্যাবসার সব। ডেবিট ক্রেডিট যদি ঠিক থাকে, আর ব্যালান্স যদি মেলে, তবে সে বিজনেসের কোনও ভয় নেই।'

শ্যামবাবু। আজ্ঞে, বড় যথার্থ কথা বলেছেন। সেইজন্যেই তো আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে আমরা মধ্যে মধ্যে এসে বিরক্ত করব, হিসেব সম্বন্ধে পরামর্শ নেব—

তিনকড়ি। বিলক্ষণ, বিরক্ত হব কেন। আমি সমস্ত হিসেব ঠিক ক'রে দেব। মিটিংগুলো একটু ঘন ঘন করবেন। না হয় ডিরেক্টর্স্ ফী বাবদ কিছু বেশী খরচ হবে। দেখুন, অডিটার-ফডিটার আমি বুঝি না। আরে বাপু, নিজের জমাখরচ যদি নিজে না বুঝলি তবে বাইরের একটা অর্বাচীন ছোকরা এসে তার কি বুঝবে? ভারী আজকাল সব বুক-কিপিং শিখেছেন! সে কি জানেন—একটা গোলকধাঁধা, কেউ যাতে না বোঝে তারই চেষ্টা। আমি বুঝি—রোজ কত টাকা এল, কত খরচ হ'ল, আর আমার মজুদ রইল কত। আমি যখন আমড়াগাছি সবডিভিজনের ট্রেজারির চার্জে, তখন এক নতুন কলেজ-পাস গোঁফকামানো ডেপুটি এলেন আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকরা কিছুই বোঝে না, অথচ অহংকারে ভরা। আমার

কাজে গলদ ধরবার আস্পর্ধা। শেষে লিখলুম কোল্ডহাম সাহেবকে, যে হুজুর, তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দিশী ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না। তখন সাহেব নিজে এসে সমস্ত বুঝে নিয়ে আড়ালে ছোকরাকে ধমকালেন। আমাকে পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন —ওয়েল তিনকড়িবাবু, তুমি হ'লে কতকালের সিনিয়র অফিসর, একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদর কি বুঝবে? তার পর দিলেন আমাকে নওগাঁয়ে গাঁজা-গোলার চার্জে বদলি ক'রে। যাক সে কথা। দেখুন, আমি বড কড়া লোক। জবরদস্ত হাকিম ব'লে আমার নাম ছিল। মন্দির টন্দির আমি বুঝি না, কিন্তু একটি আধলাও কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। রক্ত জল করা টাকা আপনার জিম্মায় দিচ্ছি, দেখবেন যেন—

শ্যাম। সে কি কথা! আপনাব টাকা আপনারই থাকবে আর শতগুণ বাড়বে। এই দেখুন না—আমি আমার যথাসর্বস্ব পৈতৃক পঞ্চাশ হাজার টাকা এতে ফেলেছি। আমি না হয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, অর্থে প্রয়োজন নেই, লাভ যা হবে মায়েব সেবাতেই ব্যয় করব। বিপিন আর এই অটল ভায়াও প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার ফেলছেন। গণ্ডেরি এক লাখ টাকার শেয়ার নিয়েছে। সে মহা হিসেবী লোক—লাভ নিশ্চিত না জানলে কি নিত?

তিনকড়ি। বটে, বটে? শুনে আশ্বাস হচ্ছে। আচ্ছা, একবার কোল্ডহাম সাহেবকে কনসল্ট করলে হয় না? অমন সাহেব আব হয় না।

'ঠাঁই হয়েছে'—চাকর আসিয়া খবর দিল।

'উঠতে আজ্ঞা হ'ক ব্রহ্মচাবী মশায়, আসুন অটলবাবু, চল হে বিপিন।' তিনকড়িবাবু সকলকে অন্দরের বারান্দায় আনিলেন।

শ্যামবাবু বলিলেন—'করেছেন কি রায়সাহেব, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ। কই আপনি বসলেন না?'

তিনকড়ি। বাতে ভুগছি, ভাত খাইনে, দু-খানা সুজির রুটি বরাদ্দ।

শ্যাম। আমি একটি ফেৎকারিণী-তন্ত্রোক্ত কবচ পাঠিয়ে দেব, ধারণ ক'রে দেখবেন। শাক-ভাজা, কড়াইয়েব ডাল—এটা কি দিয়েছ ঠাকুর, এঁচোড়ের ঘণ্ট? বেশ, বেশ? শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ক কদলী আর গব্যঘৃত বাড়িতে হবে কি? আয়ুর্বেদে আছে—পনসে কদলং কদলে ঘৃতম্। কদলী-ভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্যগুণ দূর

হয়। পুঁটিমাছ ভাজা—বাঃ। রোহিতাদপি রোচকাঃ পুন্টিকাঃ সত্তর্জিতাঃ। ওটা কিসের অম্বল বললে—কামরাঙা? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ঐ ফলটি জগন্নাথ প্রভুকে দান করেছি। অম্বল জিনিসটা আমারও সয়ও না—শ্লেষ্মার ধাত কি না। উস্‌প্, উস্‌প্, উস্‌প্। প্রাণায় অপানায় সোপানায় স্বাহা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে তু জনার্দনম্। আরম্ভ কর হে অটল।

অটল। (জনান্তিকে) আরম্ভের ব্যবস্থা যা দেখছি তাতে বাড়ি গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে।

তিনকড়ি। আচ্ছা ঠাকুরমশায়, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কোন প্রক্রিয়া নেই যার দ্বারা লোকের—ইয়ে—মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে?

শ্যাম। অবশ্য আছে। যথা কুলার্ণবে—অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হ'লে অমানী ব্যক্তিকেও মান দেন। কেন বলুন তো?

তিনকড়ি। হাঃ হাঃ, সে একটা তুচ্ছ কথা। কি জানেন, কোল্ডহাম সাহেব বলেছিলেন, সুবিধা পেলেই লাট সাহেবকে ধ'রে আমায় বড় খেতাব দেওয়াবেন। বার বার তো রিমাইণ্ড করা ভাল দেখায় না তাই ভাবছিলুম যদি তন্ত্রে-মন্ত্রে কিছু হয়। মানিনে যদিও, তবুও—

শ্যাম। মানতেই হবে। শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে আমার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত ক'রব। তবে সদ্‌গুরু প্রয়োজন, দীক্ষা ভিন্ন এসব কাজ হয় না। গুরুও আবার যে-সে হ'লে চলবে না। খরচ—তা আমি যথা সম্ভব অল্পেই নির্বাহ করতে পারব।

তিনকড়ি। হুঁ। দেখা যাবে এখন। আচ্ছা, আপনাদের আপিসে তো বিস্তর লোকজন দরকার হবে, তা—আমার একটি শালীপো আছে, তার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পারেন না? বেকার ব'সে ব'সে আমার অন্ন ধ্বংস করছে, লেখাপড়া শিখলে না, কুসঙ্গে মিশে বিগড়ে গেছে। একটা চাকরি জুটলে বড় ভাল হয়। ছোকরা বেশ চটপটে আর স্বভাব-চরিত্রও বড ভাল।

শ্যাম। আপনার শালীপো? কিছু বলতে হবে না। আমি তাকে মন্দিরের হেড-পাণ্ডা ক'রে দেব। এখনি গোটা-পনর দরখাস্ত এসেছে—তার মধ্যে পাঁচজন গ্র্যাজুয়েট। তা আপনার আত্মীয়ের ক্লেম সবার ওপর।

তিনকড়ি। আর একটি অনুরোধ। আমার বাড়িতে একটি পুরনো

কাঁসর আছে—একটু কেটে গেছে, কিন্তু আদত খাঁটী কাঁসা। এ জিনিসটা মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না? সস্তায় দেব।

শ্যাম। নিশ্চয়ই নেব। ওসব সেকেলে জিনিস কি এখন সহজে মেলে?

* * *

গণ্ডেরির ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের জোরে এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টায় সমস্ত শেয়ারই বিলি হইয়া গিয়াছে। লোকে শেয়ার লইবার জন্য অস্থির, বাজারে চড়া দামে বেচা-কেনা হইতেছে।

অটলবাবু বলিলেন—'আর কেন শ্যাম-দা, এইবার নিজের শেয়ার সব ঝেড়ে দেওয়া যাক। গণ্ডেরি তো খুব একচোট মারলে। আজকে ডবল দর। দু-দিন পরে কেউ ছোঁবেও না।'

শ্যাম। বেচতে হয় বেচ, মোদ্দা কিছু তো হাতে রাখতেই হবে, নইলে ডিরেক্টর হবে কি ক'রে?

অটল। ডিরেক্টরি আপনি করুন গে। আমি আর হাঙ্গামায় থাকতে চাইনে। সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় আপনার তো কার্যসিদ্ধি হয়েছে।

শ্যাম। এই তো সবে আরম্ভ। মন্দির, ঘরদোর, হাট-বাজার সবই তো বাকী। তোমাকে কি এখন ছাড়া যায়?

অটল। থেকে আমার লাভ? পেটে খেলে পিটে সয়। এখন তো ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানির মরসুম চলল। আমাদের এইখানে শেষ।

শ্যাম। আরে ব্যস্ত হও কেন, এক যাত্রায় কি পৃথক্ ফল হয়? সন্ধ্যেবেলা যাব এখন তোমাদের বাড়িতে,—গণ্ডেরিকেও নিয়ে যাব।

* * *

দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানির আপিসে ডিরেক্টরগণের সভা বসিয়াছে। সভাপতি তিনকড়িবাবু টেবিলে ঘুষি মারিয়া বলিতেছিলেন—'আ—আ—আমি জানতে চাই, টাকা সব গেল কোথা। আমার তো বাড়িতেই টেঁকা ভার,—সবাই এসে তাড়া দিচ্ছে। কয়লাওয়ালা বলে তার পঁচিশ হাজার টাকা পাওনা, ইটখোলার ঠিকাদার বলে বারো হাজার, তার পর ছাপাখানাওলা, শার্পার কোম্পানি, কুণ্ডু মুখুজ্যে, আরও কত কে আছে। বলে আদালতে যাব। মন্দিরের কোথা কি তার ঠিক নেই—এর মধ্যে দু-লাখ টাকা ফুঁকে গেল? সে ভণ্ড জোচ্চোরটা

গেল কোথা ? শুনতে পাই ডুব মেরে আছে, আপিসে বড়-একটা আসে না।'

অটল। ব্রহ্মচারী বলেন, মা তাঁকে অন্য কাজে ডাকছেন—এদিকে আর তেমন মন নেই। আজ তো মিটিংএ আসবেন বলেছেন।

বিপিন বলিলেন—'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন সার, এই তো ফর্দ রয়েছে, দেখুন না—জমি-কেনা, শেয়ারের দালালি, preliminary expense, ইট-তৈরি, establishment, বিজ্ঞাপন, আপিসখরচ—'

তিনকড়ি। চোপ রও ছোকরা। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

এমন সময় শ্যামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—'ব্যাপার কি ?'

তিনকড়ি। ব্যাপার আমার মাথা। আমি হিসেব চাই।

শ্যাম। বেশ তো, দেখুন না হিসেব। বরঞ্চ একদিন গোবিন্দপুরে নিজে গিয়ে কাজকর্ম তদারক ক'রে আসুন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আমি এই বাতের শরীর নিয়ে তোমার ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে মরি আর কি। সে হবে না—আমার টাকা ফেরত দাও। কোম্পানি তো যেতে বসেছে। শেয়ারহোল্ডাররা মার-মার কাট-কাট করছে।

শ্যামবাবু কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিলেন—'সকলই জগন্মাতার ইচ্ছা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এতদিন তো মন্দির শেষ হওয়ারই কথা। কতকগুলো অজ্ঞাতপূর্ব কারণে খরচ বেশী হয়ে গিয়ে টাকার অনাটন হয়ে পড়ল, তাতে আমাদের আর অপরাধ কি ? কিন্তু চিন্তার কোনও কারণ নেই, ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা call-এর টাকা তুললেই সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে, কাজও এগোবে।'

গণ্ডেরি বলিলেন—'আউর টাকা কোই দিবে না, অপকো থোড়াই বিশোআস করবে।'

শ্যাম। বিশ্বাস না করে, নাচার। আমি দায়মুক্ত, মা যেমন ক'রে পারেন নিজের কাজ চালিয়ে নিন। আমাকে বাবা বিশ্বনাথ কাশীতে টানছেন, সেখানেই আশ্রয় নেব।

তিনকড়ি। তবে বলতে চাও, কোম্পানি ডুবল ?

গণ্ডেরি। বিশ হাঁথ পানি।

শ্যাম। আচ্ছা তিনকড়িবাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই অবিশ্বাস, বেশ তো, আমরা না-হয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার নাম আছে সম্ভ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করে, আপনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না ?

অটল। এইবার পাকা কথা বলেছেন।

তিনকড়ি। হ্যাঃ, আমি বদনামের বোঝা ঘাড়ে নিই, আর ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়াই।

শ্যাম। বেগার খাটবেন কেন ? আমিই এই মিটিংএ প্রস্তাব করছি যে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ব্যানার্জি মহাশয়কে মাসিক ১০০০৲ পারিশ্রমিক দিয়ে কোম্পানি চালাবার ভার অর্পণ করা হোক। এমন উপযুক্ত কর্মদক্ষ লোক আর কোথা ? আর, আমরা যদি ভুলচুক করেই থাকি, তার দায়ী তো আর আপনি হবেন না।

তিনকড়ি। তা—তা—আমি চট্ ক'রে কথা দিতে পারিনে। ভেবে-চিন্তে দেব।

অটল। আর দ্বিধা করবেন না রায়সাহেব। আপনিই এখন ভরসা।

শ্যাম। যদি অভয় দেন তো আর একটি নিবেদন করি। আমি বেশ বুঝেছি, অর্থ হচ্ছে সাধনের অন্তরায়। আমার সমস্ত সম্পত্তিই বিলিয়ে দিয়েছি, কেবল এই কোম্পানির ষোল-শ খানেক শেয়ার আমার হাতে আছে। তাও সৎপাত্রে অর্পণ করতে চাই। আপনিই সেটা নিয়ে নিন। প্রিমিয়ম চাই না—আপনি কেনা-দাম ৩২০০৲ মাত্র দিন।

তিনকড়ি। হ্যাঃ; ভাল ক'রে আমার ঘাড় ভাঙবার মতলব।

শ্যাম। ছি ছি। আপনার ভালই হবে। না হয় কিছু কম দিন,—চব্বিশ-শ—দু-হাজার—হাজার—

তিনকড়ি। এক কড়াও নয়।

শ্যাম। দেখুন, ব্রাহ্মণ হ'তে ব্রাহ্মণের দান-প্রতিগ্রহ নিষেধ, নইলে আপনার মত লোককে আমার অমনিই দেবার কথা। আপনি যৎকিঞ্চিৎ মূল্য ধ'রে দিন। ধরুন—পাঁচ-শ টাকা। ট্রান্স্‌ফার ফর্ম আমার প্রস্তুতই আছে—নিয়ে এস তো বিপিন।

তিনকড়ি। আমি এ—এ—আশি টাকা দিতে পারি।

শ্যাম। তথাস্তু। বড়ই লোকসান হ'ল, কিন্তু সকলই মায়ের ইচ্ছা।

গণ্ডেরি। বাহ্বা তিনকৌড়িবাবু, বহুত কিফায়ত হুয়া!

তিনকড়িবাবু পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া সদ্যঃপ্রাপ্ত পেনশনের টাকা হইতে আটখানা আনকোরা দশ টাকার নোট সন্তর্পণে গনিয়া দিলেন। শ্যামবাবু পকেটস্থ করিয়া বলিলেন—'তবে এখন আমি আসি। বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা আছে। আপনিই কোম্পানির ভার নিলেন এই কথা স্থির। শুভমস্তু—মা-দশভুজা আপনার মঙ্গল করুন।'

শ্যামবাবু প্রস্থান করিলে তিনকড়িবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'লোকটা দোষে গুণে মানুষ। এদিকে যদিও হাম্‌বগ, কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। কোম্পানির ঝক্কিটা তো এখন আমার ঘাড়ে পড়ল। ক-মাস বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলুম, কিছুই দেখতে পারি নি, নইলে কি কোম্পানির অবস্থা এমন হয়? যা হোক, উঠে-প'ড়ে লাগতে হ'ল—আমি লেফাফা-দুরস্ত কাজ চাই, আমার কাছে কারও চালাকি চলবে না।'

গণ্ডেরি। অপ্‌নের কুছু তকলিফ করতে হোবে না। কম্পানি তো ডুব গিয়া। অপ্‌কোভি ছুট্টি।

তিনকড়ি। তা হ'লে কি বলতে চাও আমার মাসহারাটা—

গণ্ডেরি। হাঃ, হাঃ, তুম্‌ভি রুপয়া লেওগে? কাঁহাসে মিলবে বাতলাও। তিনকৌড়িবাবু, শ্যামবাবুকা কার্‌রবাই নহি সমঝা? নব্বে হাজার রুপয়া কম্প্‌নিকা দেনা। দো রোজ বাদ লিকুইডেশন। লিকুইডেটের সিকিও কল আদায় করবে, তব্‌ দেনা শুধবে।

তিনকড়ি। অ্যাঁ, বল কি? আমি আর এক পয়সাও দিচ্ছি না।

গণ্ডেরি। আলবত দিবেন। গবরমিণ্ট কান পকড়্‌কে আদায় করবে। আইন এইসি হ্যায়।

তিনকড়ি। আরও টাকা যাবে। সে কত?

অটল। আপনার একলার নয়। প্রত্যেক অংশীদারকেই শেয়ারপিছু ফের দু-টাকা দিতে হবে। আপনার পূর্বের ২০০ শেয়ার ছিল, আর শ্যাম-দার ১৬০০ আজ নিয়েছেন। এই ১৮০০ শেয়ারের ওপর আপনাকে ছত্রিশ শ টাকা দিতে হবে। দেনা শোধ, লিকুইডেশনের খরচা—সমস্ত চুকে গেলে শেষে সামান্য কিছু ফেরত পেতে পারেন।

তিনকড়ি। তোমাদের কত গেল ?

গণ্ডেরি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—'কুছ্‌ভি নহি, কুছ্‌ভি নহি! আরে হামাদের ঝড়তি-পড়তি শেয়ার তো-সব শ্যামবাবু লিয়েছিল—আজ আপ্‌নেকে বিক্‌কিরি কিয়েছে।'

তিনকড়ি। চোর—চোর—চোর! আমি এখনি বিলেতে কোল্‌ডহাম সাহেবকে চিঠি লিখছি—

অটল। তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের তো আর শেয়ার নেই, কাজেই আমরা এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চল গণ্ডেরি।

তিনকড়ি। অ্যাঁ—

গণ্ডেরি। রাম রাম!

গড্ডলিকা

সারদা মাতাল

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সারদা মাতাল আমার বাল্যবন্ধু।

শুধু বাল্যবন্ধুই নয়, আমরা উভয়ে এক গ্রামের অধিবাসী। ই. আই. রেলের উত্তরগামী লুপ লাইন যে স্থলে অজয় নদ অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছে, তার অব্যবহিত পূর্বদিকে নদীর উপকূলে আজকাল যে পাঁচ-সাত ঘর ভগ্ন ও অর্ধভগ্ন কোঠা বাড়ির সমষ্টিরূপে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যায়, তথায় সুদূর অতীতকালে আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

গ্রাম নগণ্য। যে সময়ের কথা বলছি তখন সেখানে, স্কুল ত দূরের কথা, একটা চলনসই পাঠশালা পর্যন্ত ছিল না। আমাদের পাঠগ্রহণ চলত গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অভিভাবকদের নিকট যৎ-সামান্যর তালে; এবং গৃহের বাইরে সারাদিন অজয়ের তীরে তীরে বনে-জঙ্গলে প্রকৃতির পাঠশালায় আড়াঠেকার

বেয়াড়া ছন্দে। এরূপ শিক্ষার দ্বারা মানুষ হওয়া যায় যতটা, পুরুষ মানুষ ততটা হওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের বংশের ও গ্রামের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সারদা এবং আমি বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে অল্প বয়সেই বর্ধমান শহরের একটি গৃহে বাসা বাঁধলাম।

বাসা আমাদের জন্য নতুন ক'রে বাঁধতে হয় নি। বহুদিন থেকে এই বাসাটি আমাদের এবং আমাদের আশপাশের দু-তিনখানা গ্রামের অধিবাসীদের জন্য বাঁধা আছে। স্কুল-কলেজের ছাত্র থেকে আরম্ভ ক'রে আপিসের কেরানী, মামলা-মকদ্দমাকারীর দল, বিবাহ-উপনয়নের বাজারকর্তা পর্যন্ত যার যখন এবং যেমন প্রয়োজন এ বাসায় এসে আশ্রয় নেয়; তারপর প্রয়োজন শেষ হ'লে প্রস্থান করে। এণ্ট্রান্স পাস ক'রে ফার্স্ট আর্টস পড়তে পড়তে একদিন সারদার এ বাসার প্রয়োজন শেষ হ'ল। এক সঙ্গে রেলকর্মচারী-দুহিতা আর রেলের চাকরি লাভ ক'রে বাসা ছেড়ে সে চ'লে গেল।

২

বছর পনের পরের কথা। আমি তখন পাটনার দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করি। বছর দশেকে পসার একরকম জমিয়ে নিয়েছি।

কোর্ট থেকে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে সবে মাত্র জলযোগে বসেছি, এমন সময়ে বাইরে ডাকাত-পড়া-পড়ি চিৎকার, "কিষ্টো! কিষ্টো! কিষ্টোরাম আছিস না-কি রে?"

চকিত হ'য়ে উঠলাম! 'কিষ্টোরাম আছিস না-কি রে' ব'লে পাটনা শহরে আমাকে কে ডাকে! মক্কেলরা কিষণরামবাবু ব'লে ডাকে, বাঙালীরা ডাকে কৃষ্ণরামবাবু, বড় জোর কেষ্টোরামবাবু ব'লে। কিষ্টোরাম ত মথুরার ডাক নয়, এ যে একেবারে ব্রজের ডাক! কণ্ঠস্বরও যেন পরিচিত মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠাহর করতে পারছি নে ঠিক। 'যাই' ব'লে উচ্চৈঃস্বরে সাড়া দিয়ে খাদ্যদ্রব্য অভুক্ত রেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

গৃহিণী ছিলেন কাছেই; ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, "ও কি? উঠছ কেন? অসময়ে কে এসে হাজির হ'ল, কতক্ষণ জ্বালাবে, খেয়ে তারপর যেয়ো।"

বললাম, "ক্ষেপেছ! কোন্ এক ব্রজের বালক এসে ডাক দিয়েছে, কিষ্টোরাম কখনো নিশ্চিন্তি হ'য়ে খেতে পারে?"

মুচকি হেসে গৃহিণী বললেন, "নামটা তা হ'লে পছন্দ হয়েছে দেখছি।"

"খুব বেশি রকম পছন্দ হয়েছে।" ব'লে দ্রুতপদে প্রস্থান করলাম।

বাইরে এসে দেখি, সারদা। তার আকৃতি দেখে বিস্মিত হলাম। ছেলেবেলায় সারদা ছিল কৃশ ও দীর্ঘ। পরিহাস ক'রে আমরা ছেলেবেলায় তাকে GL, অর্থাৎ Geometrical Line বলতাম। সেই অতিদীর্ঘতায় কেমন ক'রে, কোথা থেকে একরাশ মাংসের আমদানি হ'য়ে এখন সে হ'য়ে উঠেছে দশাসই। নিকষকৃষ্ণ দেহের শীর্ষদেশে ভ্রমরকৃষ্ণ হাফ বাবরি চুল। পান খেয়েছে বোধকরি একসঙ্গে তিন-চার খিলি, মুখের দুই কশ বেয়ে পিকের দরানি নেমেছে লাল রঙের।

হিসাবমতো সারদাকে না চিনতে পারাই উচিত ছিল, যদি না তার অদ্ভুত উজ্জ্বল জ্বলজ্বলে চোখ জোড়া তাকে সনাক্ত করিয়ে দিত।

সবিস্ময়ে বললাম, "এ কি, হঠাৎ সারদা কোথা থেকে রে!"

অট্টহাস্য ক'রে উঠে সারদা বললে, "অবাক হচ্ছিস বটে? জামালপুর থেকে এক লাফ মেরে তোর মাথা ডিঙিয়ে একেবারে দানাপুরে এসে বসেছি।"

"বদলি হ'য়ে এসেছিস?"

কুঞ্চিত চক্ষে স্মিত মুখে সারদা মাথা নাড়লে।

"তা এতদিন আসিস নি কেন?"

নিমেষের মধ্যে সারদার কুঞ্চিত চক্ষু গোল-গোল হ'য়ে উঠল, "ওই! কেমন বেকুবের মতো কথা বলে দেখ!" ডান হাতের পঞ্চাঙ্গুলি আমার দিকে স্থাপিত ক'রে বললে, "পাঁচ দিন সবে এসেছি; তার মধ্যে চার দিন গেল সংসার পাততে; পাঁচমা দিনে আপিস কামাই ক'রে তোর কাছে হাজির হয়েছি;—আর বলছিস কি-না এতদিন আসিস নি কেন?"

বললাম, "তা হ'লে ঠিক আছে। ব'স্ সারদা, ব'স্।"

দুখানা চেয়ার নিয়ে দুজনে মুখোমুখি উপবেশন করলাম।

সারদা বললে, "পাটনায় এসে তুই কিন্তু একদম গোরু ব'নে গেছিস কিষ্টোরাম।"

হাসিমুখে বললাম, "কেন রে? আমাকে গোরু খোঁজা করতে হয়েছিল না-কি?"

সারদা ফুঁসিয়ে উঠল, "উওহ্! সে কথা আর বলিস কেন? যাকে তোর

ঠিকানা শুধাই সে-ই মাথা নাড়ে, বলে—জানি নে। শেষকালে বুদ্ধি ক'রে আদালতে গিয়ে বার লাইব্রেরির কেরানীর কাছ থেকে তোর ঠিকানা নিই। তারপর খুশি হ'য়ে আত্মারামকে সওয়া তেরো আনার সিন্নি চড়িয়ে তোর কাছে হাজির হয়েছি।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

বললাম, "তা বুঝেছি আত্মারামের মুখ থেকে এখনো সিন্নির গন্ধ ছাড়ছে।"

সারদার মুখে নিঃশব্দ হাস্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল; বললে, "খোসবায় পাচ্ছিস না-কি? তবুও তোর ভয়ে একরাশ জর্দা দিয়ে খিলি চারেক পান চিবুতে চিবুতে এসেছি। কিন্তু শাক দিয়ে কি মাছের গন্ধ ঢাকা চলে রে ভাই? বদ্‌বু ছাপিয়ে খুসবু বেরোবেই।" ব'লে পুনরায় উচ্চ হাস্য ক'রে উঠল।

বললাম, "মদ ধরলি কবে?"

বিস্ময়ে সারদার চক্ষু কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল; বললে, "এই দেখো আহাম্মুকের মতো কথা বলে। ছাড়বার সময় হ'ল, আর বলে কি না—মদ ধরলি কবে? তুই ধরেছিস?"

অনুশোচনার আর্তকণ্ঠে বললাম, "না ভাই, এ পর্যন্ত ধ'রে উঠতে পারি নি। আমাদের পয়সায় ধানের ব্যবস্থা উচিত মতো হ'তে পারে না, তা আবার ধান্যেশ্বরী! তোর মতো তো আর রেলের কাঁচা পয়সা নয়!"

সন্তোষস্থচক ঘাড় নেড়ে সারদা বললে, "সে কথা মিছে বলিস নি। মালবাবু হ'য়ে কাঁটার পাশে বসতে পারলে দিনান্তে দশ টাকা গালাগাল কিষ্টোরাম, গালাগাল। মাস কাবারে মাইনেটা ঠেকে উপরির মতো।" ব'লে হা-হা ক'রে হাসতে লাগল।

সারাদিন আদালতে চেঁচামেচি ক'রে ক্ষুধার্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরে খেতে বসব, এমন সময়ে অকস্মাৎ সারদার আবির্ভাব। পেটের মধ্যে দুর্বিনীত ক্ষুধা অসম্ভব রকম দাপাদাপি লাগিয়েছে। এর একমাত্র প্রতিকার সারদাকে সরিক ক'রে কিছু খেয়ে নেওয়া। বললাম, "সারদা, কি খাবি বল্?"

সারদা বললে, "চাট।"

বিস্মিত হ'য়ে বললাম, "চাট? চাট আবার একটা খাবার না-কি?"

সারদা বললে, "এ অবস্থায় ওর চেয়ে ভাল খাবার আর নেই রে ভাই কিষ্টো। ঘোড়া খায় চানা, আর মাতাল খায় চানাচুর।" তারপর কতকটা সুর সংযোগে আবৃত্তি লাগালে,—

"চানাচুর ঘুগঁনিদানা
নেই তো ঘরে কিনে আনা!
দু-চার আনার কিনে আনা।"

বুঝলাম সারদার নেশার বাতাস লেগেছে, খালি পেটে থাকলে হু-হু ক'রে বেড়ে উঠবে। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে দুজনের জায়গা করালাম। সারদার পাতে চাট থেকে চাটনি কিছুরই অভাব দেখা গেল না। ডজন তিনেক লুচি এবং তদনুযায়ী আনুষঙ্গিকের সদ্ব্যবহার ক'রে বৈঠকখানায় ফিরে এসে চুরুট ধরালে; তারপর একটা বিকট আয়তনের ঢেঁকুর তুলে লাঠি বাগিয়ে ধ'রে ওঠবার উপক্রম করলে।

বললাম, "ওঠবার মতলব না-কি?"

সারদা বললে, "হ্যাঁ ভাই। এক্কাওয়ালার সঙ্গে কড়ার আছে, রাত নটার মধ্যে দানাপুরে ফিরতে হবে।"

বিস্মিত হ'য়ে বললাম, "বরাবর এক্কা আছে না-কি সঙ্গে?"

"আছে বইকি। ঐ এক্কাওয়ালাই ত তোর বাসা খুঁজে বার করলে।"

"এখন বরাবর বাসায় ফিরবি ত?"

মাথা নেড়ে সারদা বললে, "বরাবর বাসাতেই ফিরব, তবে এক জায়গায় মিনিট দশেক বিলম্ব হবে। সওয়া তেরো আনার আর এক দফা সিন্নি চড়িয়ে নোব।"

"কেন, আত্মারাম এখনো ঠাণ্ডা হন নি না-কি?"

হেসে উঠে সারদা বললে, "বেকুবের মতো কথা শোন। আরে, আত্মারাম ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে ব'লেই ত আর এক দফা সিন্নি চড়িয়ে গরম ক'রে নিতে হবে। তবে না পুরো মৌজে বাসায় পৌঁছে আমার এই লাঠিতে আর কাদুর ঝাঁটায় লড়াই চলবে!"

"কাদু কে?"

"কাদু আমার স্ত্রী বটে। পুরো নাম কাদম্বিনী।"

বিস্মিত হ'য়ে বললাম, "তোর স্ত্রী তোর সঙ্গে ঝাঁটা নিয়ে লড়াই করে?"

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল সারদা, "করবে না?—আলবাৎ করবে। মাল টেনে বাড়ি ঢুকে আমি তার চোদ্দ পুরুষকে উদ্ধার করব, আর সে ছেড়ে কথা কইবে?"

"তবে আবার লাঠি নিয়ে লড়াই বাঁধাস কেন ?"

সারদার মুখে নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল। "ওটা বুঝলি নে ? লাঠি দিয়ে ভয় দেখাই, আর ঝাঁটা থেকে দেহ রক্ষে করি। তবে মৌকা মাফিক এক-আধ ঘা বসিয়েও যে দেই নি তা নয়।" তারপর জিভ কেটে মাথা নেড়ে বললে, "কিন্তু তাই ব'লে জোরে নয়, আস্তে। আঁটকুড়ীর বেটীকে ভালও বাসি কিষ্টোরাম।" হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর গদগদ হ'য়ে এল।

বললাম, "তুই আমাকে কথায় কথায় বেকুব বলছিস, তুইও ত কম বেকুব নোস।"

ভ্রূভঙ্গভরে সারদা বললে, "ক্যানে ?"

"তোর বউ আঁটকুড়ীর বেটী কেমন ক'রে হবে ?"

সদর্পে আমার প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত ক'রে সারদা বললে, "ক্যানে, ওর যে একটিও সন্তান হয় নি।"

"কিন্তু সে কারণে তোর শাশুড়ীকে আঁটকুড়ী বলছিস কেমন করে ?"

সারদার-মুখে-চক্ষে বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না ; তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, "এই দেখ্, বেকুবের মতো শাশুড়ীকে এর মধ্যে টেনে আনে! আমি কি এ পাপমুখে শাশুড়ীর নাম একবারও করেছি ?"

স্ত্রী আঁটকুড়ীর বেটী হ'লে শাশুড়ীর আঁটকুড়ী না হ'য়ে উপায় নেই, এই অতি-স্থূল যুক্তিটি উপস্থিত যে-ক'রেই হোক সারদার মস্তিষ্ক থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে ; সুতরাং প্রসঙ্গ পরিবর্তিত ক'রে বললাম, "তোর বউয়ের আদৌ সন্তান হয় নি না-কি সারদা ?"

নিমেষের মধ্যে সারদার কঠোর মূর্তি মোলায়েম হ'য়ে গেল ; সন্তোষস্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "আদৌ হয় নি কিষ্টো। আর কোনো গুণ না থাকুক, শালীর ঐ গুণটি আছে, আমাকে ঝরঝরে রেখেছে, ঝামেলায় ফেলে নি।" ব'লে হুড় হুড় ক'রে চেয়ার সরিয়ে উঠে পড়ল।

স্ত্রীকে শালী ব'লে উল্লেখ করলে খানিকটা অসঙ্গতির দোষ হয়, সারদার মস্তিষ্কের বর্তমান অবস্থায় সে কথা উত্থাপন করতে সাহস করলাম না। 'শালীর বোন শালী না হ'য়ে শালা হবে না-কি' ব'লে হয়ত আমাকেই বেকুব বানিয়ে বসত।

রাজপথ পর্যন্ত সারদাকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। সারদার একা পথের ওপারে খোলা মাঠে অপেক্ষা করছিল।

৩

এর পর ছুটি-ছাটার দিনে সারদা মাঝে মাঝে আসতে লাগল। আমিও একদিন তার বাসায় গিয়ে বেড়িয়ে এলাম।

তখনকার দিনে বন্ধুপত্নীরা সাধারণত পর্দানশীনই ছিল। দ্বারান্তরাল থেকে দেহের, অথবা অবগুণ্ঠনের তলা থেকে মুখের, যেটুকু পরিচয় পাওয়া যেত, তারই উপর তাদের বিষয়ে ধারণা গ'ড়ে তুলতে হ'ত। সেই রকম ধারণার সাহায্যে সারদার স্ত্রী কাদম্বিনীকে দেখে আমার আকাশের কাদম্বিনীর মতোই মনে হয়েছিল ; শুধু দেহের রঙের শ্যামলতাতেই নয়, অবগুণ্ঠনপ্রান্তবর্তী ওষ্ঠাধরের ক্বচিৎ মৃদু স্ফুরণেও।

এরূপ স্ত্রীর উপর সারদার কতটা নেশা ছিল ঠিক বলতে পারি নে ; কিন্তু মদ ছাড়া তার আর এক প্রবল নেশা ছিল দাবাখেলার। দাবাখেলায় সে ছিল নিপুণ খেলোয়াড় ; বিশেষত বোড়ের খেলা সে এমন সাংঘাতিক ভাবে খেলতে পারত যে, তার বোড়ের সম্মুখের কোণাকুণি দুটো ঘরে এসে প্রাণ হারাবার আশঙ্কায় প্রতিপক্ষের হাতী ঘোড়া বলগুলো সর্বদা সিঁটিয়ে থাকত। সে বলত, রাজাকে মাৎ করবার সর্বোত্তম মাৎ হচ্ছে বোড়ের চালে মাৎ।

দেখতে দেখতে দাবাখেলা জ'মে উঠল। প্রথমে সারদা আমাকে নিয়েই খেলতে বসত ; তারপর একে একে অনেক খেলোয়াড় জুটতে লাগল। ছুটির দিনগুলো সারদা সাধ্যমতো বাদ দিত না। প্রথম দিকে খেলাটা আমার বৈঠকখানার পাশের ঘরেই বসত, কিন্তু ক্রমশ সারদার দাবাখেলার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে, দিকে দিকে তার ডাক পড়তে লাগল।

বৎসর দুই এই ভাবে চলার পর একদিন সারদা তার অফিসে এক অভাবনীয় কাণ্ড ক'রে বসল। পূর্বরাত্রে টানটা বোধ হয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় বেশি হ'য়ে গিয়েছিল, সে যখন অফিস যেতে উদ্যত হ'ল তখনও সম্পূর্ণভাবে খোঁয়াড়ি ভাঙে নি,—শরীর ম্যাজম্যাজ করছে, মন অবসন্ন, শুয়ে পড়বার জন্য শয্যা অসম্ভব রকম আকর্ষণ করছে। এ অবস্থায় কাদম্বিনী অফিস কামাই করবার পরামর্শ দিলে। পরামর্শটা বোধহয় সুপরামর্শই ছিল,

কিন্তু অফিসে সেদিন জরুরি কাজ আছে, কামাই করা সারদা সমীচীন মনে করলে না। খোঁয়াড়ি ভাঙবার জন্য সে নূতন ক'রে আর একটু মদ খেয়ে নিলে। কাদম্বিনীকে বললে, "কোনো চিন্তা নেই কাদু, ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে ধাতস্থ হ'য়ে যাব।"

কিন্তু ঘণ্টা দুয়েকের অনেক পূর্বেই সঙ্কট দেখা দিলে। যে জরুরি কাজের জন্য অফিস যাওয়া, তাই হ'ল কাল। অফিসে পৌঁছবার মিনিট দশেকের মধ্যে ছোট সাহেব হ্যামিল্টনের ঘরে ডাক পড়ল সেই জরুরি কাজের সম্পর্কে। হ্যামিল্টন নূতন লোক, মুড়ি-মিছরির পার্থক্য জানে না; দেহ একটু দুর্বল, মেজাজ কিন্তু চতুর্গুণ কড়া। নূতন মদ্যের কল্যাণে সারদার মেজাজ তখন বেশ একটু রঙিলা হ'য়ে উঠেছে। একজন সহকর্মী বললে, "কোনো ছুতো ক'রে কিছুক্ষণের জন্য গা-ঢাকা দিন সারদাবাবু, এ অবস্থায় সাহেবের কাছে যাবেন না।"

সারদা বললে, "কেন, মদ খেয়েছি ব'লে? কিন্তু তার বাবার পয়সায় ত খাই নি! নিজের পয়সায় খেয়েছি। তবে অপরাধটা কোথায়?'

মস্তিষ্কের তরল অবস্থায় এই যুক্তিটা সারদার যথেষ্ট জোরালো ব'লে মনে হ'ল; এবং এর দ্বারা হ্যামিল্টনের সন্তুষ্ট না হ'য়ে উপায়ান্তর থাকবে না— মনের মধ্যে এই প্রতীতি ভ'রে নিয়ে ফাইল হস্তে সে হ্যামিল্টনের নিকট উপস্থিত হ'ল। মনে করলে যুক্তিটা তিক্ত অবস্থার জন্য ফেলে না রেখে আগেভাগেই সেরে ফেলা ভাল।

"স্যার!"

মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ ক'রে নির্গত হচ্ছে দেশী মদের উৎকট দুর্গন্ধ।

হ্যামিল্টন একটা ফাইলে নিমগ্ন ছিল; মুখ তুলে চেয়ে দেখে কঠোর স্বরে বললে, "তুমি মদ খেয়েছ?"

কুঞ্চিত চক্ষে শান্ত কণ্ঠে সারদা বললে, "ঠিক সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। খেয়েছি; কিন্তু নিজের পয়সায় খেয়েছি, তোমার বাপের পয়সায় খাই নি।" সারদা মনে করলে, সে মাত্র একটি সরল সত্যের উল্লেখ করছে।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে হ্যামিল্টন চিৎকার ক'রে উঠল, "What! You dare say like that damn swine?"

ফাইলটা টেবিলে রেখে তেমনি শান্ত কণ্ঠে সারদা জবাব দিলে, "A swine does not drink wine, but a gentleman does."

মারমুখ হ'য়ে হ্যামিল্টন এগিয়ে এল,—"Get out at once, or I kill you!"

কিন্তু হায়! হ্যামিল্টন যদি তখন স্বপ্নেও জানত কোন্ কদর্য বিপদের মধ্যে এগিয়ে আসছে, তা হ'লে এগোনোর পরিবর্তে বোধহয় দু-চার হাত সে পেছিয়েই যেত। ঘুষি পাকিয়ে সে কাছে আসা মাত্র বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দুই বাহু দিয়ে তাকে সাপটে জড়িয়ে ধ'রে সোহাগস্নিগ্ধ কণ্ঠে সারদা ব'লে উঠল, "You come to kill the swine, but the swine will kiss you darling."

মদের বিকট গন্ধ থেকে এবং তদপেক্ষা স্থূলতর বিপত্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য মস্তক বারংবার যথাসম্ভব পশ্চাতে ও এ-পাশ ও-পাশ সরাতে হচ্ছিল ব'লে হ্যামিল্টন নেশার দ্বারা পুষ্টতর সারদার স্বাভাবিক শক্তিকে পরাভূত করতে বাগ পাচ্ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে সে 'চাপরাসী, চাপরাসী' ব'লে চিৎকার করতে লাগল।

উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তার আভাস পেয়ে চাপরাসীরা বারান্দা থেকেই বুঝেছিল, ভিতরে একটা বিতণ্ডা চলেছে। সাহেবের উৎকণ্ঠিত ডাক শুনে দ্রুতপদে ঘরের ভিতরে উপস্থিত হ'য়ে জন-দুই মিলে হ্যামিল্টনের দেহ থেকে সারদাকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিলে।

ক্রোধে ও অপমানে হ্যামিল্টনের মস্তিষ্ক টগবগ ক'রে ফুটছিল। সুযোগ পেয়ে সে উন্মত্ত ভাবে সারদাকে আক্রমণ ক'রে পেটে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলে। আঘাতটা হ'ল গুরুতর। কোঁক ক'রে একটা শব্দ ক'রে সারদা মেঝের উপর নেতিয়ে পড়ল, তারপর একটু বাদে অল্প অল্প রক্তবমন আরম্ভ করলে।

চাপরাসীদের মধ্যে একজন ব'লে উঠল, "মর গিয়া সার্দাবাবু।" সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অফিস জুড়ে হল্লা উঠে গেল। হ্যামিল্টনের উপরিওয়ালা চীফ এঞ্জিনিয়ার প্রেস্টন ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন।

৪

তৃতীয় দিনে সারদা হাসপাতাল থেকে অফিসে এক মাস ছুটির দরখাস্ত আর চাকরিতে ইস্তফার চিঠি দিলে। তার তিন-চার দিন পরে দশ হাজার টাকার ড্যামেজ দাবি ক'রে সারদার পক্ষ থেকে হ্যামিল্টনের নামে আমি রেজিষ্ট্রি চিঠি পাঠালাম।

উকিলের চিঠি পেয়ে হ্যামিল্টন ব্যস্ত হ'য়ে প্রেস্টনের শরণাপন্ন হ'ল। প্রেস্টন সারদাকে নিজের গৃহে ডাকিয়ে পাঠিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার জন্যে আর ইস্তফার চিঠি প্রত্যাহার করবার জন্য অনুরোধ করলে। বললে, "হ্যামিল্টনের অবশ্য অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু প্রথম অপরাধ তুমিই করেছিলে। যাই হোক, হ্যামিল্টন দুঃখিত, আর সে কথা তোমার কাছে প্রকাশ করতে রাজি।"

কাজের লোক ব'লে প্রেস্টন সারদাকে ভালবাসত, চাকরি না ছাড়বার জন্য সে তাকে চেপে ধরলে।

সারদা কিন্তু সম্মত হ'ল না। বললে, "মিস্টার হ্যামিল্টনের আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করবার দরকার নেই ; কিন্তু স্যার, চাকরি আর আমি করব না। আমার দুর্বল লিভারে চোট লেগেছে, ডাক্তার বিশেষ সাবধানে থাকতে বলেছে। যে-কোন মুহূর্তে স্রাব আরম্ভ হ'য়ে জীবন সংশয় হ'তে পারে। আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম, মেডিক্যাল অজুহাতে আমার হাফ পেনশনের ব্যবস্থা করিয়ে দিন।"

অগত্যা সারদার পেনশন হ'য়ে গেল।

৫

পেনশন নিয়ে কিন্তু সারদা বিপদে পড়ল। নেশায় আর নিদ্রায় রাত এক রকম কেটে যায়, দিন কিন্তু কিছুতেই কাটতে চায় না। অফিসের সময় হ'লে বেলা দশটা থেকে গৃহ যেন কামড়াতে থাকে।

অবশেষে দাবাখেলার নেশার মধ্যে সে খুঁজে পেলে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ। প্রত্যহ বেলা দশটার সময়ে যথারীতি আহার ক'রে দানাপুর থেকে বেরিয়ে প'ড়ে মুরাদপুরে আমার বাসায় উপস্থিত হয়। তখন আমার আদালতে যাবার সময়। সমস্ত দিন খবরের কাগজ আর বই প'ড়ে কাটায়। বেলা চারটে থেকে এক-আধজন ক'রে দাবা-খেলোয়াড় আসতে থাকে ; খেলা

জ'মে ওঠে। সন্ধ্যার পর অবসর থাকলে আমিও মাঝে মাঝে এক-আধ দান বসি। তারপর রাত আটটা সাড়ে আটটার সময়ে সারদা দানাপুর ফিরে যায়।

এ ব্যবস্থায় কিন্তু জুৎ হয় না। এক্কা ভাড়া আর অন্যান্য অসুবিধার মূল্য দিয়ে খেলার বহর ঠিক পোষায় না। অবশেষে মতলব ঠাউরে সারদা শ দেড়েক টাকা দিয়ে মায় ঘোড়া একটা এক্কা কিনে ফেললে। রামলাল নামে পনের-ষোল বৎসর বয়সের তার এক ছোকরা চাকর ছিল। মাসিক এক টাকা বেতন-বৃদ্ধির দ্বারা উপরন্তু সে হ'ল এক্কার চালক আর ঘোড়ার সইস।

এই নূতন সুযোগের ফলে পদ্ধতিটা একেবারে ঢেলে সাজা হ'ল। রাত চারটের সময়ে উঠে কাদম্বিনী ডাল ভাত আর তরকারি রেঁধে ফেলে, রামলাল বাজার থেকে দই মিষ্টি কিনে আনে; তারপর সাড়ে পাঁচটার পূর্বেই প্রভু-ভৃত্যে স্নানাহার সেরে বাঁকিপুরের পথে বেরিয়ে পড়ে। ঘোড়ার গলায় তিন সার সুরেলা ঘন্টি বাঁধা। ঝুনঝুন ঝুনঝুন শব্দ করতে করতে সুদীর্ঘ পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে বেলা সাড়ে ছটা পৌনে সাতটার সময়ে এসে পৌছয় বাঁকিপুরে।

সে সময়ে আমি মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত থাকি ব'লে সারদা আমার বাড়ি না এসে অপর কারো গৃহে উপস্থিত হয়। গৃহকর্তার সঙ্গে দেখা হ'লে হাসি-হাসি কাঁচুমাচু মুখে বলে, কি ভাই, এক দান হবে না-কি? গৃহকর্তা হয়ত বলে, না ভাই, কাজ আছে, এখন সুবিধা হবে না। ব্যস্ত হ'য়ে সারদা বলে, আচ্ছা আচ্ছা, থাক্ থাক্—আর একদিন হবে। কাউকে সে চটাতে চায় না। যে খদ্দের আজ হাতে এল না, আর একদিন আসতে পারে। ঝুনঝুন ঝুনঝুন শব্দ করতে করতে সারদা আর এক গৃহের উদ্দেশ্যে চলতে থাকে।

এই রকমে পাঁচ বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে একজন হয়ত বলে, আচ্ছা, এক দান না-হয় বসাই যাক। মহা খুশি হ'য়ে সারদা রামলালকে ইশারা করে। একটি শৌখিন নবম শতরঞ্জি এনে রামলাল ফরাসের উপর পাতে; তারপর নিয়ে আসে ছক্ দাবা বোড়ে, হাণ্টলি পামারের বিস্কুটের টিনে তামাক টিকে দেশলাই কলকে, এবং তার সঙ্গে কারুকার্যখচিত একটা মোরাদাবাদী ফরসি। অদূরে মেঝের উপর ব'সে রামলাল তামাক সাজতে আরম্ভ করে। একমাত্র সময়টুকু ছাড়া গৃহকর্তার আর কোনো সামগ্রী ব্যবহার ক'রে সারদা কৃতজ্ঞতার ভার বাড়াতে রাজি নয়।

প্রাতঃকালীন খদ্দের দুষ্প্রাপ্য হ'লে সারদা আমার গৃহে এসে হাজির হয়। সেখানে তার এবং রামলালের সারাদিনের বিশ্রাম এবং নিদ্রার ব্যবস্থা। সে-সময়ে দানাপুরে কাদম্বিনীও নিদ্রা দিয়ে রাত্রির নির্যাতন এবং নিদ্রাভাবের জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকে।

রাত্রি নটা পর্যন্ত আমার গৃহে দাবার আড্ডা জমিয়ে সারদা দানাপুরের জন্য উঠে পড়ে। মধ্যে এক জায়গায় সুরা দিয়ে নিজেকে উত্তপ্ত ক'রে নেয়; তারপর ঝুনঝুন ঝুনঝুন শব্দ করতে করতে পুনরায় দানাপুরের পথে অগ্রসর হয়। এক্কার নিক্কণ শুনতে শুনতে মেজাজের মধ্যে সুরার সুর গমক মারতে থাকে। গৃহের সম্মুখে যখন পৌঁছয়, তখন দস্তুরমতো ধ্রুপদের বাঁট-তুন-চৌতুন আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে।

কড়া নাড়তে নাড়তে সারদা কাদম্বিনীকে বাপান্ত করতে থাকে, তারপর গৃহের মধ্যে প্রবেশ ক'রে মহরমের কায়দায় লাঠি ঘোরাতে আরম্ভ করে। মত্ত স্বামীকে বাগ মানিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়াতে কাদম্বিনীর বারোটা বেজে যায়। রাত সাড়ে তিনটায় আবার উঠতে হবে; নইলে রামলালকে দিয়ে দুটো উননে আঁচ তুলিয়ে চারটের সময়ে ডাল-ভাত চড়ানো যাবে না।

আকাশে চন্দ্র-সূর্যের উদয়াস্তের যে নিয়ম, দানাপুরে সারদা হালদারেরও ঠিক তাই। সকাল সাড়ে পাঁচটার সময়ে ঝুনঝুন ঝুনঝুন করতে করতে পূর্বদিকে গমন, আর রাত্রি সাড়ে দশটায় ঝুনঝুন ঝুনঝুন করতে করতে পশ্চিম প্রান্তে প্রত্যাবর্তন। এর শীত নেই, বর্ষা নেই, ব্যত্যয় নেই, ব্যতিক্রম নেই।

কিন্তু মাস ছয়েক পরে হঠাৎ এক সময়ে ব্যতিক্রম দেখা দিলে। উপর্যুপরি তিন দিন সারদার দেখা নেই। এ পর্যন্ত কোনোদিন যে-ব্যক্তি এক ঘণ্টা কামাই করে নি, তার এরূপ আচরণে খেলোয়াড়ের দল চঞ্চল হ'য়ে উঠল, আমি হলাম চিন্তিত। অসুখ-বিসুখ করল না ত তার! পরদিন ছুটি ছিল, ঠিক করলাম সকালে দানাপুর গিয়ে খবর নিয়ে আসব।

৬

পৌষ মাসের প্রখর শীতের রাত্রি তখনও নিঃশেষে শেষ হয় নি, বিকট কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে লেপ ফেলে চকিত হ'য়ে উঠে বসলাম।

"কে?"

বাইরে থেকে উত্তর এল, "কিষ্টোরাম, আমি ভাই সারদা। শীগ্‌গির দোর খোল। সব্বোনাশ হয়েছে!"

তাড়াতাড়ি দোর খুলে বাইরে এসে দেখি, সারদা দাঁড়িয়ে, মুখে উৎকট মদের গন্ধ।

"কি ব্যাপার?"

"আঁটকুড়ীর বেটী রাত বারোটার সময়ে পালিয়ে গেছে কিষ্টো।"

"পালিয়ে গেছে! কোথায় পালিয়ে গেছে?"

"একেবারে পগার পার।—বুঝছিস নে? মিত্যু হয়েছে তার।" ব'লে সারদা আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

বললাম, "বলিস কি সারদা! হঠাৎ কি এমন হ'ল?"

মাটিতে ব'সে প'ড়ে মাথা নাড়তে নাড়তে সারদা বলতে লাগল, "কিছুই হ'ল না রে ভাই, দিন তিনেক সামান্য জ্বর হ'ল, তারপর রাত্রি বারোটার সময়ে দু-চারটে খাবি খেয়ে চোখ বুজলে। তুই গিয়ে সৎকার করিয়ে দে ভাই। আমার হাতে একটিও পয়সা নেই, পরশু সেভিংস্ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তোর দেনা শোধ করব।"

হাতে ধ'রে সারদাকে দাঁড় করিয়ে সহানুভূতির কণ্ঠে বললাম, "বিপদে অধীর হ'তে নেই সারদা, তুই শান্ত হ। তোর কোনো চিন্তা নেই, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

সারদা বললে, "এবার তা হ'লে আমার ব্যবস্থা কর্।"

"তোর আবার কি ব্যবস্থা?"

ডান হাত এগিয়ে দিয়ে সারদা বললে, "গোটা দুয়েক টাকা দে, মথুর শার দোকানে গিয়ে ঠাণ্ডা হই। বাড়ির বোতলে যেটুকু তলানি প'ড়ে ছিল, তাই খেয়ে এসেছি। তাতে কিন্তু হবে না ভাই, এ বেঁজায় শোক।"

বললাম, "আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি; ঠাণ্ডায় থাকিস নে, ভিতরে গিয়ে ব'স্।"

ঘরে প্রবেশ ক'রে আমার দু হাত চেপে ধ'রে কাতর ভাবে সারদা বললে, "একটা কথা কিষ্টো!"

"কি?"

"চিতেয় সের খানেক চন্দন কাঠ ছড়িয়ে দিস। শালীকে সত্যিই ভালবাসতাম ভাই।" ব'লে পুনরায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠল।

বললাম, "তাই হবে, স্থির হ। তোর সঙ্গে গাড়ি আছে?—একা?"

"আছে। আমাকে কিন্তু মোথরোর দোকানে নামিয়ে দিস ভাই।"

এ কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম।

কাদম্বিনীর মৃত্যুর দিন তিনেক পরে সারদা কাশী রওনা হ'ল। সঙ্গে গেল রামলাল। কাশীতে সারদার এক দূরসম্পর্কের মাসী বাস করে, তারই বাসায় উঠে সারদা কাদম্বিনীর পারলৌকিক কার্য সমাপন করবে।

যাবার সময়ে আমাকে ব'লে গেল, "সংসারধর্ম আর কার জন্যে করব বল্? কাশী গিয়ে এবার সাধুসঙ্গ করব স্থির করেছি। দানাপুরের বাড়িটা খদ্দের ঠিক ক'রে বিক্রি করবার ব্যবস্থা তুই করিস। খবর দিলেই আমি দু-তিন দিনের জন্যে এসে কোবলা ক'রে দিয়ে যাব।"

বিদেশে বাল্যবন্ধু লাভ ক'রে আনন্দেই ছিলাম। বিয়োগ-বেদনার সম্ভাবনায় মনটা বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল। কিন্তু কাদম্বিনী যদি নিজের প্রাণ দিয়ে সারদার অধ্যাত্ম সাধনার পথ সুগম ক'রে দিয়ে গিয়ে থাকে, আমি কেন নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে তার মধ্যে ব্যস্ত হই?

৭

দেওকিলাল নামে আমার এক মক্কেল ছিল, তার বাড়ি দানাপুরে। সারদার বাড়ির কথা তাকে একদিন বললাম। ঔৎসুক্যসহকারে সে বললে, তার এক আত্মীয় দানাপুরে বাড়ি কেনবার চেষ্টায় আছে, তাকে সে ও-বাড়ির কথা জানাবে।

বাড়ি দেখে দেওকিলালের আত্মীয়ের পছন্দ হ'ল, দর দিলে বারো শো টাকা। ভালই। সারদা জানিয়ে গেছে হাজার টাকা পেলে বিক্রি করতে রাজি হবে। এ নিজে থেকে দু শো টাকা বেশি বলছে; হয়ত মনে মনে আরও কিছু চেপে রেখেছে, চাপ দিলে বাড়তে পারে। দেওকিলালকে বললাম, "দু-চার দিনের মধ্যে সারদাকে চিঠি দিচ্ছি।"

দিন দুই পরে দেওকিলাল আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাশীতে কি চিঠি লিখেছেন ওকীল সাহেব?"

বললাম, "এখনও লিখি নি, আজকালের মধ্যে লিখব।"

"তা হ'লে আর লিখতে হবে না, হালদারবাবু এসে গেছেন; কাল বৈকালে বাজারে তাঁকে দেখেছি।"

"তুমি তাকে চেনো?"

সহাস্যমুখে দেওকিলাল বললে, "আগে থেকেই চিনি, কিন্তু সাহেব উওকুর পর থেকে দানাপুরে কে না তাঁকে চেনে?" একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "এবার তা হ'লে একটু তাড়াতাড়ি ওঁর সঙ্গে কথাটা পাকা ক'রে নিন। আবার হয়ত কোনদিন কাশী ফিরে যাবেন!"

বললাম, "আচ্ছা।"

* * *

সারদা ফিরে এসেছে অবগত হ'য়ে মনে মনে খুশি হলাম। পরদিনই গেলাম তার সঙ্গে দেখা করতে।

দানাপুর রেল-স্টেশন থেকে সারদার বাড়ি বেশি দূর নয়। তার বাড়ির কাছ-বরাবর পথে দেখা হ'ল রামলালের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি রে রামলাল, কবে এলি তোরা?"

সহাস্যমুখে রামলাল বললে, "পরসোঁ ফজিরে।"

"বাবু বাড়ি আছেন?"

"জী হাঁ, বাবু আছেন। আপনি যান না, দরবাজা খোলাই আছে। আমি পান নিয়ে এখনই আসছি।"

সদর-দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলা দিতে খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ ক'রে উঠান পেরিয়ে বারান্দায় উঠে দেখি, ঘরের ভিতর তক্তপোশের উপর পিছন ফিরে ব'সে সারদা নতমুখে নিবিষ্ট মনে কি দেখছে। অপ্রত্যাশিত উপস্থিতির দ্বারা তাকে বিস্মিত ও পুলকিত ক'রে দেবার লোভে সন্তর্পণে একটু অগ্রসর হ'য়ে নিজেই বিস্মিত হ'য়ে গেলাম। শুধু নতমুখ সারদাই নয়, আধ-খেলা দাবা-বোড়ের ছকের অপর দিকে নতমুখী সুন্দরী তরুণী। মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে গেল, "কি ব্যাপার?"

মুখ তুলে আমাকে দেখে মৃদুস্বরে 'এই!' ব'লে আরক্তমুখে তক্তপোশ

থেকে অবতরণ ক'রে তরুণী কোণের দিকে স'রে গেল। ঘর ছেড়ে পালাবার উপায় নেই, পথ আগলে আমি দাঁড়িয়ে।

পিছন ফিরে আমাকে দেখে সারদা আনন্দে উচ্ছল হ'য়ে উঠল। "আরে কিষ্টোরাম যে! কি ক'রে সন্ধান পেলি?" তারপর সজোরে নিজের পাশে এক থাপ্পড় মেরে বললে, "ব'স্ ভাই, এখানে ব'স্।"

বললাম, "তা না-হয় বসছি, কিন্তু ইনি কে?"

সহাস্যমুখে সারদা বললে, "এত বড় উকিল হ'য়ে এটা আর বুঝলি নে কিষ্টো? এটি মাসীমার দেওর-ঝি হেমাঙ্গিনী, আমার স্ত্রী বটে। কাশী থেকে বিয়ে ক'রে এনেছি।"

বললাম, "তা বেশ করেছিস, কিন্তু কাশীতে ত গেছলি সাধুসঙ্গ করতে! তার কি হ'ল?"

সারদা অট্টহাস্য ক'রে উঠল, "সে কথা আর বলিস নে ভাই; কাশীতে একটিও আসল সাধুর দেখা পেলাম না, সবাই চিৎহাত সাধু। তাই মাসীর বাড়িতে হেমার দেখা পেয়ে সাধ্বী-সঙ্গ লাগিয়ে দিলাম।"

"দাবা শেখাচ্ছিস?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সারদা বললে, "ক্ষেপেছিস! উ আমাকে শিখাতে পারে। মাসীর বাড়িতে দাবা খেলতে খেলতেই ত কিস্তিমাৎ ক'রে গাঁট বাঁধলে।" ব'লে হেসে উঠল। তারপর ব'লে চলল, "গজের খেলা খেলে বেঁজায়! এক দান খেলে দেখ্ না ক্যানে। যেখানেই তুই তোর রাজা থুবি, দেখবি কোণাকুণি শালীর দুই গজ শুঁড় উচিয়ে আছে।"

বললাম, "শুঁড় দিয়ে ওঁর গজ তোর রাজাকে বন্দী করলে আপত্তি নেই, কিন্তু তোকে বন্দী করলে বন্ধুহারা হব।"

সহাস্যমুখে সারদা বললে, "সে ভয় নেই কিষ্টো। আমরা কি মতলব করেছি জানিস?"

"কি মতলব?"

"কাশী যাবার সময়ে ঘোড়াটা বেচে দিয়ে গিয়েছিলাম। এসে অবধি একটা ঘোড়া কেনবার চেষ্টা করছি। ঘোড়া কেনা হ'লেই আবার আগের মতো তোদের পাড়ায় যেতে আরম্ভ করব। তবে এবার আর একা নয়—জোড়ে। আর, ভোরে নয়, বেলা তিনটের সময়ে। হেমাকে তোর বাড়ি

ধুয়ে দু-চার ঘর সেরে আসব। তারপর সন্ধ্যা থেকে তোর বাড়ি আড্ডা জমিয়ে রাত নটার সময়ে রওনা।”

বললাম, “পথে মোথরোর দোকানে গাড়ি থামবে না ত?”

হা-হা ক’রে হেসে উঠে সারদা বললে, “তার আর উপায় নেই রে ভাই। আঁটকুড়ীর বেটী আমাকে দিয়ে বিশ্বেশ্বরকে সুরা উচ্ছৃগ্‌গু করিয়েছে।”

হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। অবগুণ্ঠন কপালের মাঝ-বরাবর। ঈষৎ নত হ’য়ে করজোড়ে আমাকে অভিবাদন ক’রে বললে, “ঠাকুরপো, আপনি যে আমাদের কত আপনার, তা আমার জানতে একটুও বাকি নেই। আপনারা দুজনে খেলতে বসুন,—আমি আপনাদের খাবার ক’রে নিয়ে আসি।”

হেমাঙ্গিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছন থেকে তাকে দেখতে দেখতে মনে হ’ল, হেমাঙ্গিনী নাম বেমানান হয় নি, কিন্তু সৌদামিনী হ’লে সারদার দুই স্ত্রীর নামের অর্থসঙ্গতি আরও অনেক জোরালো হ’ত।

শ্রেষ্ঠ গল্প

ভুল ভাঙা

অনুরূপা দেবী

কতকটা মূলধন না রাখিয়া ব্যবসা করা যায় না, কিন্তু কাব্য উপলব্ধির শক্তি না থাকিলেও বাংলা মাসিকপত্রের সম্পাদকতা করা এতটুকু অসম্ভব নহে। এমন ঘটনা যে নিত্যই ঘটিতে পারে এবং ঘটে, ইহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কোনো জীর্ণ পুঁথি বা পাথরের নুড়ি ঘাঁটিতে হয় না। তবে কথাটা শুনিতে একটু হেঁয়ালির মতোই ঠেকে। মূলধন না রাখিয়া ব্যবসা করিতে গেলে দেখা যায়, উঠ্‌তি মুখেই অনেক সময় ব্যবসাটাকে মাথা হেঁট করিতে হয় এবং মহাজনের দ্বারে লালবাতির রক্তশিখা আপনি জ্বলিয়া উঠে; কিন্তু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠে চড়িয়া মা-লক্ষ্মী আপনার উদারতা-প্রদর্শনে এতটুকুও

শৈথিল্য করেন না। কাব্যরসগ্রহণে অক্ষম সম্পাদকের পরিচালনে পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা ক্রমশঃই বেশ ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে।

অজিতনাথ কিন্তু এ দলের লোক নয়। সে প্রায় বাল্যাবধিই কাব্য-লক্ষ্মীর দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া আছে। লেখক হইবার শক্তি নাই থাক, পরের লেখার ভাবগ্রহণের ক্ষমতার তাহার অভাব ছিল না। স্কুলের পড়া বাঁচাইয়া একখানি ছোটো খাতায় রবিবাবুর ভালো ভালো কবিতাগুলি টুকিয়া লওয়া একটা অবশ্য করণীয় ব্রতের মতোই তাহার জীবন-গ্রন্থির সঙ্গে জোট পাকাইয়া গিয়াছিল। ওই ধরণে কাব্য লিখিয়া অমরত্বলাভের ইচ্ছা বাংলা দেশের কোন্ ছেলেমেয়ের না হয় যে, তাহারও হইবে না? শেষে অনেকগুলি ছোটো বড়ো উমেদারীতেও যখন তাহার এই বলবতী ইচ্ছা অপূর্ণই রহিয়া গেল, কোনো কবিই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির অংশ তাহাকে যে কোনো দাম লইয়া বিক্রয় করিতে পারিলেন না, তখন সে কবিযশঃ-প্রার্থনা ছাড়িয়া আবার পরমোৎসাহে দেশী বিদেশী বড়ো বড়ো কবিদের বিখ্যাত রচনাগুলি খাতায় টুকিয়া মুখস্থ করিয়া কাব্যরস-পিপাসার নিবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইল, একটুও দমিয়া পড়িল না।

আজকাল অজিতনাথ "মলয়া" পত্রিকার সম্পাদক। মোটা-সোটা কাগজখানিকে চিত্রে সাজাইয়া মাসের প্রথম দিনেই সে জনসাধারণের চোখের সামনে বাহির করিয়া দেয়। মেয়েমহলের হাতে হাতে ঘুরিয়া কাগজখানা দুই তিন দিনে ঝর-ঝরে কালি-মাখা তৈল-সিক্ত হইয়া প্রমাণ করিয়া দেয়, ইহার পাঠকসংখ্যা বড়ো অল্প নয়! তবে গ্রাহক কতগুলি, সে খবর আমরা না-ই দিলাম। যে দেশে একজন একখানা বই কিনিলে তাহার প্রতিবেশী এবং তস্য ক্রমে এক ডজন প্রতিবেশীর তাহার উপর দখলী স্বত্ব স্বতঃসিদ্ধ, সেখানে পাঠকের সহিত গ্রাহকের সম্বন্ধ খুব নিকট নাও হইতে পারে, আর তাহাতে বিস্ময়ও কিছু নাই।

"মলয়া"র লেখক-লেখিকাদলের মধ্যে একজনের নাম আজকাল বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সর্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। গদ্যে পদ্যে এমন দখল প্রায় অল্প লেখকেরই দেখা যায়।—বিশেষ করিয়া কবিতায়। সে কি বিস্ময়-পুলকসঞ্চারী

শব্দ-লহরী, বাণীর কোমল মধুর ঝংকার! মৃদঙ্গের মৃদু-গম্ভীরনাদ! এ সব তাহারই নিজস্ব। এমনটি বুঝি আর কখনও আর কোথাও শুনা যায় নাই।

পূজা আসিয়া পড়িল। পূজার সংখ্যাকে ভালো করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া ঘরের ছোটো শিশুটির মতো পূজার বাজারে বেড়াইতে পাঠাইতে হইবে। অজিত রচনা-নির্বাচনে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সংখ্যায় "সাংখ্য কি নিরীশ্বরবাদ?" "বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক দর্শন অথবা আস্তিক দর্শন?" ইত্যাদি এই সব গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ চলিবে না। কবিতায় গল্পে ইহার প্রতি পৃষ্ঠা ভরাইয়া দিতে হইবে। শ্রীমতী কনকপ্রভা বটব্যালের কবিতা এ সংখ্যায় একাধিক ছাপা চাই। তদ্‌ভিন্ন তাঁহার একটি ছোটো গল্প।

কবিতা দুটির নাম দেওয়া হইয়াছে, "আগত" এবং "স্বাগত"—আগমনীরই সেই চিরন্তন সুর, কিন্তু কি এক নূতন অশ্রুতপূর্ব নূতনত্বে ভরা, অভিনব ছন্দে নব কলেবর নবীন রূপ ধরিয়া ইহারা দেখা দিয়াছে। সম্পাদক অজিতনাথ মুগ্ধ চিত্তে পড়িল,—

'রক্তজবা-বিল্বদলে ভক্তি-অর্ঘ্য সজ্জিত, হেম-থালি পরিপূর্ণ, সিক্ত-শেফালিকার গাঁথা মালা হাতে শারদ প্রকৃতি তোমার পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাশাংশুকের চঞ্চল অঞ্চল ঐ মদু-মন্দ পবনে ঈষৎ কম্পিত। শ্যাম শৈবালদামরচিত বসন ঐ রক্তপদ্ম চরণ দুটি চুমিয়া আছে। এসো মা—ঐ উন্মুখ আবাহনের আহ্বান-গীত-রবে অম্বর আজ পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছে। সে গানের তালে তোমার ওই অভয় চরণ ফেলিয়া ভক্ত-হৃদয়পদ্মোপরি অধিষ্ঠিত হইতে এস মা, এস মা! বরাভয়দায়িনী বর ও অভয় দিতে এই হৃতস্বাস্থ্য ভগ্নপ্রাণ বঙ্গবাসীর বঙ্গবাসে এস মা!'—

এমনি কত ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ সেই আগমনীর গান। "স্বাগতে"ও সেই একই বীণার তারে বিভিন্ন মূর্ছনা!

অজিতনাথের চিত্ত-বীণার তারে তারে সেই ঝংকার রণিয়া উঠিতে লাগিল। কাশাংশুকপরিধৃতা শেফালি-মাল্য-ধৃতকরা রক্তোৎপলদলশোভিত-চরণা শারদজ্যোৎস্নাগঠিতা মূর্তি তাহার মানস-নেত্রে উজ্জ্বল চিত্রে ফুটিয়া উঠিল। নবদূর্বাদলে জবার অর্ঘ্য রচিত, দশভুজা সিংহবাহিনীর অভয়বর-বিতরণকারী চরণতলে ভক্তিবিগলিত স্থিরদৃষ্টি সংস্থাপিত—যেন অভয়ার

পার্শ্বচারিণী বীণাপাণি সহসা কি ভাবের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন নাকি?

এ কার মূর্তি! কার এ রূপ! যিনি এ চিত্র মোহনতুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারই নয় কি?

সে দিব্যচক্ষে দেখিতেছে, সেই সৌন্দর্য-প্রতিমা, কুমারী মূর্তি!

কুমারীমূর্তি! হাঁ, তা নয়তো কি? এ মূর্তি কি কুমারী ভিন্ন আর কাহাকেও মানায়? বিশ্বের রাণী বিষ্ণুজায়া হইলেও সেই সিতাব্জাসীনা লেখ্য-পুস্তক-ধারিণী দেবী সরস্বতীকে কেহ কোনো দিন সে সম্পর্কে আনিবার চেষ্টাও করে নাই। কুমারী তরুণী-মূর্তিতেই তাঁহার চির-আরাধনা। কুমারী কনকপ্রভাও তাঁহার শারীরিণী ছায়া,—তবে তিনিই বা কুমারী না হইবেন কেন? নামের প্রথমে শ্রীমতি না লিখিয়া কুমারী লিখিলেই বেশ মানায়; কিন্তু কি জানি, যদি তিনি বিরক্ত হন! তাই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অজিতের সাহস হয় নাই।

অজিতনাথ রচনাগুলি প্রেসে পাঠাইয়া নিশ্চিন্তচিত্তে কতকগুলা তাহারই পুরাতন রচনা লইয়া বসিল। প্রতি সংখ্যাতেই কনকপ্রভার কনকাঙ্গুলির ছাপ সোনার অক্ষরের মতোই কালোকালির ছাপার মধ্য হইতে জ্বল-জ্বল করিত। সে সব রচনার বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে কি মায়া, কি মোহ ছড়ান রহিয়াছে। ষোল রাগ ও চৌষট্টি রাগিণী সেখানে চিরবসন্তবন্দিত নন্দনের অপ্সরাকণ্ঠে চিরধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। অজিতনাথের বুকে পুলকের তড়িৎ খেলিয়া গেল। আহা, সে কত ভাগ্যবান্! এমন একটি হৃদয়ভাণ্ডারের অফুরন্ত রত্নৈশ্বর্যের জমার খাতাখানি তাহারই হাতে! সে মুগ্ধচিত্তে পুনঃ পুনঃ পঠিত সেই সব কবিতা আবার পড়িয়া যাইতে লাগিল। এমন সে কত সময়ই করে। এগুলি তাহার আগাগোড়া প্রায় সবই কণ্ঠস্থ, তথাপি ইহারা কখনও নূতনত্ব হারায় না। শুনা গিয়াছিল, কি একটা ফল খাইলে, মানুষ যে বয়সে ফল খায়, ঠিক সেই বয়সেই থাকিয়া যায়। এই রচনাগুলির মধ্যে বুঝি সেই ফলের অজ্ঞাত শক্তিটা প্রচ্ছন্ন ছিল?

"কনকলতা" কবিতাটি যেন তাঁহারই নিজের ছবিখানি! বিজন অরণ্যের অন্তরালে সলজ্জ শ্রীমণ্ডিতা ক্ষুদ্র বন-লতাটি উদ্যান-লতাকে পরাভব করিয়া তপোবনের শোভা সংবর্ধন করিতেছে। ঋষিতনয়া অপরিস্ফুট যৌবনের প্রথম

উন্মেষে মানসিক বৃত্তিগুলির প্রথম বিকাশের অতি গোপন সংবাদ শুধু এই সখী কাননিকার কানে আভাসে পৌঁছিয়াছে, এ সংবাদ আর কেহ এখনও অবধি পায় নাই। তথাপি পাতায় লতায় আকাশে বাতাসে একটা কানা-কানি, একটু হাসাহাসি বহিয়া চলিয়াছে। ভ্রমর ছুটিয়া আসিয়া এই নূতন খবরটার জন্য বন-লতার কানে কানে অনেক তোষামোদের কথা শুনাইল, শেষে রাগ করিয়া চলিয়া গেল, বুঝি আর আসিবে না, এমনি কঠোর শাসাইয়া গেল, তথাপি সে নিজের সর্বস্ব ছাড়িয়াও সখীর বিশ্বাস ভঙ্গ করিল না। কিন্তু প্রিয়-বিরহিত এ জীবন কি বহা যায়? নির্জন কাননতলে একদিন সে শুকাইয়া ধরালিঙ্গন করিল। কেহই তাহাব জন্য কাঁদিল না, নিষ্ঠুর ভ্রমর আর ফিরিয়াও চাহিল না। শুধু বাতাস একবার হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার পর সব শেষ! আহা, না, না! এমন ধারা হইতেই পারে না। কোথাকার কে কঠিন ভ্রমর, তাহার নির্মম অত্যাচারে স্বর্গের ঐ লতা শুকাইবে? অসম্ভব! সে ইহা সহিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই সে তাহার এই হৃদয়হীনতা হইতে এই কোমল বক্ষখানি অক্ষত রাখিবে।

আবার এক ধারে এ কি উন্মত্ত আবেগময় হৃদয়ের প্রচণ্ড বেগ, ব্যাকুল প্রেমধারা লইয়া "পদ্মার সিন্ধু দর্শনে যাত্রা।" কৌমার-প্রেমমণ্ডিত নারী-হৃদয়ের কি সুন্দর প্রকাশ! ওরে সিন্ধু, আরও স্ফীত হ, আজ কোন্ হৃদয়-ধারা লইয়া তোর ও লবণাক্ত ফেনিল তরঙ্গগুলার উন্মাদ নর্ত্তনকে শান্ত শীতল করিতে ছুটিয়াছে, তুই তার কি বুঝিবি রে, ওরে উন্মাদ! ওরে আত্মহারা! ওরে বাতুল!

৩

অজিত নিজের মধ্যে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল। একটা কিছুকে কেন্দ্র করিয়া যেমন তাহার চারিদিক আবর্তন করিয়া ফেরাই জগতের ধর্ম, তেমনি ঐ কল্পনাময়ী নারীটিকে মাঝখানে রাখিয়া তাহার সহস্রা কল্পনা তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া ঘুরিতেছিল। পদ্মের মধ্যটিতে মধুলোলুপ মৌমাছির মতো তাহার সারা চিত্ত ইহারই রচনার ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন, আবদ্ধ। সে তাহার লেখিকার অমৃতময়ী রচনাকে তার মাসিকের প্রাণরূপে দেখিতে দেখিতে তাহার পরিসর বাড়াইয়া এখন নিজের সঙ্গে এমনি জড়াইয়া

ফেলিয়াছে যে, সহস্র ক্ষতি লোকসান সহিয়াও সে এখন এই কাগজখানাকে উঠাইয়া দিতে একান্তই অক্ষম। এজন্য লাঞ্ছনার ঝড় উঠিয়াছে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃবর্গের অভিশাপের সঙ্গে নিজের মা-বাপের ক্রোধবহ্নিও ধোঁয়াইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু অজিতের হৃদয় তখন কনকপ্রভার অবলম্বন চাহিয়া ব্যাকুল, তখন সেখানে কোন্ অজ্ঞাত গ্রামের কোন্ এক পাইজোর পায়ে, নোলোকপরা ছোটো মেয়ের প্রবেশাধিকার কোথায়? সে এই মানসীর স্বহস্ত-চিত্রিত আলেখ্যগুলি দিয়াই দিব্য নেত্রে তাহাকে দেখিতে পায়। তাহার সহিত তাহার হতাশকবিত্বের সমুদয় অব্যক্ত কল্পনার যোগ করিয়া সে আপনার জীবন-যৌবন আশা-কল্পনা সমস্তই সফল মনে করে। কখনও মনের মধ্যে নিমেষের জন্য চকিতে একটু দর্শনাকাঙ্ক্ষা যে না জাগে, এমনও নয়। আধতন্দ্রাঘোরে সহসা কোনো দিন একটা ক্ষুব্ধ বাসনা প্রচ্ছন্নতা ছাড়াইয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া বলে, "দেখা কি হবে না? ওগো মানসমন্দিরের পুণ্য দেবতা। এ শূন্য সিংহাসনে ও চরণ স্পর্শ কোনো দিন ঘটিবে না কি?"

কিন্তু এ পর্যন্ত সে অবসর ঘটে নাই। ১২।৫ আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটা কোন্ প্রাসাদভবন হইতে বাহির হইয়া একখানা সরকারী লেফাপামধ্যবর্তী একটুখানি পত্রাংশ মধ্যে মধ্যে তাহার হাতের মধ্যে আত্মনিবেদন করিয়া দেয়। লেখাটুকু মুক্তাপংক্তির মতোই সুন্দর, যেন কুঁদিয়া কাটা পাথরেরই মতো সূক্ষ্ম-শিল্প। প্রায় এইটুকুই শুধু লেখা থাকে—

"সবিনয় নিবেদন,
'অমুক' শীর্ষক কবিতাটি পাঠাইলাম। প্রুফটি ভালো করিয়া দেখার বন্দোবস্ত করিবেন।

শ্রীকনকপ্রভা বটব্যাল।"

হায় পাষাণি! ভালো করিয়া প্রুফ দেখার বন্দোবস্ত তুমি বলিলে তবে করা হইবে! সে যে দুই চক্ষু ঠিক্‌রাইয়া চক্ষের মণি বাহিরে আনিবার যোগাড় করিয়া তুলিয়া সমস্ত প্রুফগুলা বরাবর নিজে দেখিয়া আসিতেছে। তবু প্রতিবারেই এই একই অনুরোধ! তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসে।

৪

এবার পূজার ছুটিতে পাঁচ বন্ধু মিলিয়া কোথাও একটা বেড়াইতে যাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর যাওয়া স্থির হইল, হাল ফ্যাসানের নূতন হাওয়া খাওয়ার জায়গা রাঁচি। কিন্তু তাহার পূর্বে একবার পাঁচজনের সঙ্গে দেখা-শুনাটুকু সারিয়া লওয়া চাই। অজিতনাথ হালিসহরে মামার বাড়ি হইতে কলিকাতা ফিরিতেছিল।

শরতের অম্লানোজ্জ্বল সুন্দর প্রভাত। স্বর্ণাভ রৌদ্রে হরিৎ ধান্যশিশুগুলি লঘু নৃত্য করিতেছিল। বর্ষার জমা জলের ধারে কাশের শ্রেণী সারি বাঁধা বকের মতোই শুভ্র অঙ্গ মেলিয়া দিয়াছিল; বিলের মধ্যে মাছরাঙা মাছ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ঝোপেঝাড়ে ফলটা-ফুলটাও ফুটিয়া ফলিয়া আছে। অজিত সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাশাংশুকা সুন্দরীর কনককান্তিটুকু ধ্যান করিতেছিল। আহা, সেই স্থির-সৌদামিনী-প্রভ কুমারীমূর্তি আজ এই শরতপ্রভাতে কোন পূজাগৃহের আগমনী গানের তানের মধ্যে সুরভিচিত্ত ধূপটুকু জ্বলিয়া দিয়াছে! সে কোন্‌খানে?—ওগো সে গো কোন্‌খানে?

গাড়িখানা থামিয়াই আবার চলিতে আরম্ভ করিল। "পলতা" "পলুতা" শব্দটা ট্রেণের বাঁশির একটা উৎকট চিৎকারের মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই প্লাটফর্মের উপর একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। অনেক মোট-মুটরী কুলির মাথায় চাপাইয়া একপাল কাচ্চা বাচ্চা সঙ্গে একদল রেলের যাত্রী,—স্ত্রী পুরুষ লইয়া প্রায় সাত আট জন,—এ ছাড়া দাসী, সরকার, চাকর, গোমস্তা, সেও প্রায় বাড়ির লোকের সম পরিমাণ,—ট্রেণ ধরিবার জন্য হুড়াহুড়ি করিয়া প্লাটফরমে প্রবেশ করিয়াছিল। ট্রেণ এক মিনিট মাত্র থামে। অনেক "লট-বহর"—তাড়াতাড়িতে যে যেখানে পারিল, উঠিয়া পড়িল। দাসীগুলা কচি ছেলে কোলে, কনে বউরা ঘোমটা ফাঁক করিয়া প্রায় ছুটাছুটি করিয়া যে গাড়িতে একদল ডেলি পাসেঞ্জারের সঙ্গে অজিতনাথ বসিয়াছিল, সেইখানেই উঠিয়া পড়িল। বাড়ির কর্তাগোছের একটি স্থূলোদর বাবু মোটা গলায় হুকুম জারি করিতেছিলেন, "ওগো, মেয়েরা এক গাড়িতে ওঠো। গিন্নি, ও গিন্নি—না, না, এইটেতে,—বিন্দি! তো—মাগীর জ্বালায় অস্থির হয়েছি। হাঁ ক'রে দেখছিস্ কি? চট্ ক'রে উঠে পড়্ না।"

একখানি নিকষ-কৃষ্ণ-প্রস্তরের কালীপ্রতিমার ন্যায় বর্ণশালিনী স্থূলাঙ্গী

প্রৌঢ়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাড়ির দরজা কোনোমতে ঠেলিয়া সামনের বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া খুব চিৎকার শব্দে হাঁক-ডাক লাগাইয়া দিলেন, "ওরে নন্দে! ঐ রামফল! ইধার,—ইধার! ওরে আয়-না সব।"

রমণীর কেশ-বিরল মস্তক হইতে গরদের চাদর খসিয়া পড়ায় তৈলরঞ্জিত টাকটুকু সর্বজনগোচর হইয়া পড়ায় সহযাত্রীদের মধ্যে দুই এক জন ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হাসিয়া সরিয়া বসিলেন। স্বেদস্রুতিতে নারীর সর্বশরীরের বসন ভিজিয়া গিয়াছিল। উদ্বেগে, পরিশ্রমে সমস্ত শরীর তাঁহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

কোলাহলের মধ্যে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। দুইটা কাপড়ের মোট, ছেলেদের দুধের বোতল কয়টা ও জলের কুঁজা প্লাটফরমে পড়িয়া রহিল, আর রহিলেন, তদারকপরায়ণ বাবুর সহিত বাড়ির সরকারটি। ছেলেমেয়েরা দাসীগুলার স্বরে স্বর চড়াইয়া মহা হল্লা জুড়িয়া দিল। গৃহিণী হাঁপানি-যুক্ত গর্জনে ভগ্ন-কাংস্যের স্বর মিশাইয়া গাড়ির কামরা স্তম্ভিত করিয়া হাঁকিলেন, "বিন্দি হতভাগীর জ্বালাতেই তো এই হ'ল। সং-মাগী কল্লা ক'রে যে দাঁড়িয়ে রইলি, তোকে ডাকাডাকি করতেই তো গাড়ি ছেড়ে দিলে। বাড়ি গিয়ে তোকে যদি না জবাব দি তো আমার নাম নেই। বউমা! তোমারই বা কেমন বে-আক্কেলে কাণ্ডটি বাছা। কচিছেলের মা, ছেলের দুধের বোতলটির ঝক্কি নিতেও কি পার না! এত নবাবী কেন? এখন খাওয়াও ছেলেকে কি খাওয়াবে। দেখ্ বিষ্ণু! এখুনি পড়ে খুন হবি বলচি, শীগ্‌গির সোরে বস্। মা—মা—মা, এদের জ্বালায় কোথাও গিয়েই সোয়াস্তি নেই। বাড়ি ছেড়ে দুদিন মায়ের কাছে জুড়ুতে গেলুম, তা সঙ্গে চল্‌ল কোটি যদুবংশ। এখন এই সব ঝি-বউ, ছাপ্পান্ন কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে শ্যালদায় গিয়ে ব'সে থাকি গে চল। দুজনের একজনও যে উঠ্‌তে পেলে না। জানি, ও নরে হতভাগাটা যখন সঙ্গে এসেছে, তখন একটা কাণ্ড না হ'য়ে যায় না।—ওকে নিয়ে কখনও কোনো উবগার আছে যে আজ হ'বে?"

রমণী তীব্র তাপযুক্ত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সকলকার উপরেই অগ্নজ্বালা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অজিতের মনে হইতেছিল, এ যেন স্বয়ং মহিষাসুরমর্দিনী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়া পাষণ্ড-দলনে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। একা তিনি ভিন্ন এ ক্ষেত্রে সকল লোকেই কুড়ে অকর্মণ্য ও অনাবশ্যক বোঝা মাত্র!

ইহাদের কার্য করিবার সামর্থ্য কিছুমাত্রও নাই, এবং কার্য পণ্ড করিবার শক্তি অপরিসীম। ইহারা যখন সঙ্গে আসিয়াছে, তখন এইরূপ একটা কিছু বিভ্রাট ঘটিবে, ইহা যেন নিশ্চিত হইয়াই জানা ছিল।

গাড়ির গতির সঙ্গে সঙ্গে সেই রসনার ক্ষুরধারও সমানে বহিয়াছিল। অজিতের ললিত স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পূর্বাহ্নের গোলাপী নেশার আমেজটুকু একেবারেই উবিয়া যায় নাই। এই কু-দর্শনা কালিন্দীর কর্কশ কণ্ঠ সেই কুসুম-কোমলার পাশে সে কি হাস্যরসই ফুটাইয়া তুলিয়াছে! মনে মনে হাসিয়া কাছেরই একটি ছোট্ট ছেলেকে ডাকিয়া লইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে মনোযোগী হইল। ছেলেটির গায়ের রং ময়লা হইলেও মুখশ্রীটুকু বেশ। কথা কওয়া যায়।

"তোমার নাম কি খোকা? ষষ্ঠীপ্রসাদ? বাঃ, বেশ নাম তো। ভালো নাম জ্যোতিরিন্দ্র? ওঃ, বাড়ি কোনখানে?"

ছেলেটি লজেনজেসগুলি মুখে পুরিয়া এ গালে ও গালে লইয়া নাড়িতেছিল। একদিক ভারি করিয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "কল্‌কেতা।"

"কল্‌কেতা? কল্‌কেতার কোন্‌খানে?"

"আমাদের বাড়ি আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে।"

নীল আকাশের বুক চিরিয়া বিনামেঘে বিদ্যুৎ খেলিলে চাতক যেমন ঊর্ধ্বে চাহে, অজিত তেমন করিয়াই চাহিল, "ক-ক-কত নম্বর? তোমাদের নম্বরটি কত? নম্বর কাকে বলে, জান তো?"

"জানি। ১২।৫ নম্বর।"

রামগিরির যক্ষ প্রথম আষাঢ়ের মেঘকে কুটজ-কুসুমের অর্ঘ্য দিয়া স্বাগত জানাইয়াছিলেন। ওরে, দুর্ভাগ্য অজিত! তুই এ কোমলকান্তি শিশু দূতটিকে কি দিবি? পকেটে একখানা পকেটবুক ও একটি মণিব্যাগে দুই চারিটি টাকা!—সর্বশরীরের পুলকরোমাঞ্চ বোধ করিয়া কম্পিত কণ্ঠ মৃদুতর করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে সে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "কুমারী কনকপ্রভা সেই বাড়িতেই থাকেন বুঝি? তিনি মলয়া কাগজে লেখেন না?"

ছেলেটি ঘাড় নাড়িয়া খুব গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, "হ্যাঁ, লেখেনই তো। একটা বইও ছাপা হয়েছে যে।—আপনি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ দেখেছি,—দেখেছি বই কি। তিনি বুঝি বাড়িতে আছেন?

বাড়িতে পুজো হয় বুঝি? তাই তিনি পূজোর আয়োজনে ব্যস্ত আছেন? তোমার দিদি—? না, না, তিনি তোমার দিদি হবেন কি ক'রে?—তবে খুড়তুতো কি না—"

অজিত একটু থামিল। হঠাৎ সে কি বলিয়া ফেলিতেছিল—এই কালো কুচ্‌কুচে ছেলেটির সেই বাণীনিন্দিতা সুন্দরী দিদি?—সেও কি কখন সম্ভব! —সে পাগল না কি?

ছেলেটি ভালো বুঝিল না। সে হাসি হাসি মুখে চোখ তুলিয়া অদূরবর্তিনী রোষক্ষুব্ধা প্রৌঢ়ার দিকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া কহিল, "ওই যে আমার ঠাকু-মা এসেছেন। উনি তো লেখেন—ওঁরই নাম ত কনকপ্রভা।"

এঞ্জিনের সব ধোঁয়াটা কেমন করিয়া কামরার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। অজিতের চোখ কর্ কর্ করিয়া উঠিল। বহুক্ষণ চক্ষু রগড়াইয়া সে যখন আবার চাহিতে পারিল, তখন তাহার মনে হইল, সমস্ত আলোকোজ্জ্বল বাহিরটাই যেন এক নিমেষে কালিমাখা হইয়া গিয়াছে।

অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ

ন ষ্ট নি ধি

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

যোজন বিস্তার সে গ্রাম—তাতে বসতির অন্ত নাই। গ্রামের লোকেরা খায় দায়, গান গায়, ঝগড়া করে, মনের আনন্দে থাকে। তাদের অভাব বেশী নাই, তাই সম্পদের অভাব নাই—মোটের উপর তারা সুখী।

কিন্তু তাদের যত ঘর তত মত। কেউ ভাত খায়, কেউ খায় রুটি, কেউ খায় ছাতু, কেউ খায় মাংস, কেউ উত্তর মুখে খেতে বসে কেউ বসে দক্ষিণ মুখে। কেউ পূজা করে পূর্ব্ব মুখ হ'য়ে, কেউ করে পশ্চিম মুখে। একজনের যেটা অখাদ্য আর একজনের সেটা শ্রেষ্ঠ খাদ্য। একজনের কাছে

যেটা ভাল, আর একজন বলে তাকে মন্দ। তাই তাদের ভিতর সমাজের গাঁথুনী কোনও দিনই শক্ত হ'য়ে ব'সতে পারেনি।

একদিন একদল বিদেশী এসে আশ্রয় ভিক্ষা চাইলে। তারা তফাতে একটা মাঠের ভিতর তাদের জায়গা ক'রে দিলে; কিন্তু ঘেন্নায় তাদের স্পর্শ ক'রলে না—কেন না তারা বিদেশী, তাদের রকমসকম সবই বেজায় বেয়াড়া।

বিদেশী তারা তফাতে থাকে, তাদের আপনা-আপনির মধ্যে সলা পরামর্শ করে—ঘুরেফিরে বেড়ায়। ক্রমে দেখা গেল, এ লোকগুলি হঠাৎ ফেঁপে উঠলো। তারা প্রকাণ্ড বাড়ী-ঘর গড়লো, নানারকম যানবাহনের আমদানী ক'রলো, রাজার হালে চলতে লাগলো।

গ্রামের লোক তখন ছুটে গেল তাদের খবর নিতে; ছুয়ারে বসে দ্বারোয়ান তাদের তাড়া ক'রলে। কিন্তু তাতে এরা হ'টে গেল না; মাথা নিচু ক'রে গড় হ'য়ে সেলাম ক'রতে ক'রতে তারা ঢুকে পড়লো সন্ধান নিতে। বিদেশীরা মাটী খুঁড়ে সন্ধান পেয়েছিল একটা মণির খনির। খনি থেকে তারা বস্তা বোঝাই ক'রে মণি বের ক'রে রাতের অন্ধকারে চালান করতো বিদেশে। তাই তারা ফেঁপে উঠেছিল।

এখন গ্রামের লোকে সন্ধান নিতে এসেছে দেখে তারা বিচলিত হ'য়ে উঠলো। তখন তাদের মধ্যে একজন চালাক লোক বেরিয়ে এসে গ্রামের লোকদের ভারি মিষ্টি কথা বলে একবারে জল ক'রে দিলে।

সে তার স্বদেশীদের বল্লে, "মিছে ভয় পাচ্ছ সবাই, ওদের দিয়ে আমাদের বস্তা বহাবার ভারি সুবিধা হ'বে।"

হ'লও তাই। গ্রামের লোক সব পয়সা পাবার প্রস্তাবে ভারি খুসী হ'য়ে উঠলো। মোট বইবার মজুরী নিয়ে মনের আনন্দে বিদেশীদের মণির বস্তা বহন ক'রতে লাগলো। আর টাকাটা শিকেটা নিয়ে গিয়ে ভারি হাসিমুখে গিন্নিদের দেখাতে লাগলে। মোট বইবার জন্য তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে গেল। বিদেশীদের কাঁড়ি কাঁড়ি মণি তাদের দেশে রপ্তানী হ'তে লাগলো।

বিদেশীরা শুনতে পেলে ওরা সন্ধান পেয়েছে যে, বস্তায় মণি থাকে। তারা আবার বিচলিত হ'য়ে উঠলো। তখন তাদের বুদ্ধিমান লোকটি ফটকের সামনে রেখে দিল ছু'তিন পরাত ভ'রে মেঠাই।

গ্রামের লোক সেদিন একরকম ঠিক ক'রেছিল যে বিদেশীদের কাছ থেকে মণি কেড়ে নেবে। তার ভিতর অনেক 'কিন্তু' ছিল। সবারই মনের তলায় ফন্দী ছিল যে মণিগুলো পাওয়া গেলে আর সবাইকে ঠকিয়ে বা ঠেঙ্গিয়ে সেই সবগুলো কেড়ে নেবে। তবু একরকম ঠিকঠাক ক'রে তারা দল বেঁধে এলো। দেউড়ির সামনে মেঠাইয়ের থালা দেখে যে প্রথম এসেছিল সে সবটা আঁকড়ে ধরলে। তখন তার উপর সবাই তাড়া ক'রে এলো—"ভালরে ভাল এতগুলি মেঠাই তুমি একা নেবে? আমরা কি তবে রথ দেখতে এসেছি?"

তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। গালাগাল থেকে হ'ল হাতাহাতি, হাতাহাতি থেকে লাঠালাঠি; অনেক মাথা ফাটলো, অনেক রক্তস্রাব হ'ল, তখন বিদেশী মহাজন ছুটে এসে তাদের থামিয়ে দিলে আর মেঠাইগুলো তার পছন্দ মত ভাগ ক'রে দিলে। যাদের বেশী ভাগ হ'ল তারা পায় গড়িয়ে পড়ল, যাদের ভাগে কম পড়লো তারা গজরাতে গজরাতে চ'লে গেল।

সেইদিন থেকে রোজ দেউড়িতে পরাতে ক'রে মেঠাই থাকে, রোজ লোক এসে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। দেশময় হৈ হৈ পড়ে গেল। হাটে মাটে ঘাটে এ ছাড়া আর কথা নেই। নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা মেঠাইয়ের ন্যায়সঙ্গত ভাগ সম্বন্ধে অনেকগুলি বই লিখে ফেললেন। লাঠিয়ালেরা বল্লে, আমরা ন্যায় জানি না, লাঠি জানি। গরীব ও দুর্ব্বল যারা তারা কোলাহল ক'রে উঠলো যে যেহেতু আমরা গরীব ও দুর্ব্বল এবং আমাদেরই খাবারের দরকার বেশী, সেইজন্য এর সবটাই আমাদের পাওনা। মোট বইবার মজুরী পেয়ে লোকে ক্ষেত খামারের কাজ ছেড়েই দিয়েছিল। মণি পাবার উৎসাহে তারা মেতে উঠেছিল। এখন সে মণির কথাও ভুলে গেল। মেঠাইয়ের ভাগ নিয়ে ঝগড়া করা ছাডা আর তারা কোনও কথাই কয় না, কোন কাজই করে না।

গ্রামের লোককে আর মোট বইতে পাওয়া যায় না, তখন পাশের গ্রাম থেকে লোক আসতে লাগলো। তারা বেশী বুদ্ধিমান, ধর্ম্মাধর্ম্মের বড় তোয়াক্কা রাখে না। তারা মোটও বইতে লাগলো আর চাকা চাকা মণিও সরাতে লাগলো। তাদের হাত ছাড়ান বিদেশীদের তত সহজ হ'ল না। শেষ পর্য্যন্ত তারা বখরার বন্দোবস্ত ক'রে নিলে।

গ্রামের লোক মেঠাই নিয়েই ঝগড়া ক'রতে লাগলো। শেষে হঠাৎ

একদিন তারা দেখতে পেল যে বিদেশীদের গ্রামের চারিপাশ ঘিরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের দেয়াল উঠে গেছে। তার কোনও দিক দিয়ে প্রবেশের দ্বার খুঁজে পাওয়া গেল না।

দেয়ালটা মণির খনি সুদ্ধ ঘিরে ছিল, আর তার শুধু একটা মুখ ছিল সাগরের দিকে যেখানে জাহাজ বোঝাই হ'য়ে মণি চালান হ'ত বিদেশে।

তখন গ্রামবাসী চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। তখনও মেঠাইয়ের থালা রোজ সাজান থাকতো, কিন্তু তার পরিমাণ বড় কমে গিয়েছিল। তাদের বড্ড রাগ হ'ল বিদেশীদের অন্যায় ব্যবহারে, তারা ছুটে গিয়ে সেই পাথরের প্রাচীরে কিল ঘুসি মারতে লাগলো। পাথরের পাঁচিল সে কিল খেয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। তখন যে যার হাতা বেড়ী খুন্তি, ছুঁচ যা পেলে তাই নিয়ে ছুটলে। সব ভোতা হ'য়ে গেল।

ক্ষেত খামার যখন তাদের চুলোয় গেছে, মোট বইবার মজুরীও আর জোটে না, মেঠাইয়ের থালা কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়েছে, তখন ক্ষিদের চোটে তাদের বুদ্ধি সাফ হ'য়ে গেল।

তখন তারা সবাই মিলে কোদাল নিয়ে সুরঙ্গ খুঁড়তে লাগলো। লক্ষ লোক একজোট হ'য়ে দিন রাত কাজ ক'রতে লাগলো। দেখতে দেখতে সুরঙ্গ শেষ হ'য়ে গেল, তারা হৈ হৈ ক'রে বিদেশীদের ঘরের ভিতর গিয়ে উঠলো।

গিয়ে দেখলে সব শূন্য—কোথাও কেউ নেই। পাগলের মত ছুটে গেল তারা খনির দিকে। সেখানে কেউ নেই, কিছু নেই। মণির খনির শেষ গুঁড়োটুকুও বিদেশীরা নিঃশেষ ক'রে নিয়ে গেছে।

ঘাটের ধারে গিয়ে তারা দেখতে পেলে দূরে বিদেশীদের শেষ জাহাজের একটু ধোঁয়া মাত্র আকাশে ভাসছে।

তাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উজাড় হ'য়ে গেল, তারা টের পাবার আগেই।

একা

প্র ত্যা খ্যা ন

নিরুপমা দেবী

ত্রিতলস্থ গ্যাসালোকিত কক্ষে বসিয়া স্বামীস্ত্রীতে কথোপকথন করিতেছিল। চারিদিকে ঔজ্জ্বল্যের অজস্র সমাবেশ! উজ্জ্বল কক্ষ, বিচিত্র উজ্জ্বল গৃহসজ্জা, দর্পণে দর্পণে আলোকের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব চক্ষু ঝলসিত করিয়া ফেলে। সর্বোপরি দম্পতির উজ্জ্বল সৌন্দর্য, উজ্জ্বল যৌবনে অতুলনীয় শোভা। কিন্তু তাহাদের ললাটে ঘনান্ধকার ছায়া!

সহসা স্ত্রীর ভাবান্তর হইল। সে ললাটের ছায়া যেন সজোরে অপসারিত করিয়া বিশাল নয়নে হাসির ছটা আনিয়া সাদরে স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "আমার দিব্য, আর অমত ক'রো না; কখনও তোমায় কোনও অনুরোধ করিনি, এই প্রথম, এই শেষ, এইটি রাখ।" স্বামী মুখ তুলিলেন। সনিঃশ্বাসে বলিলেন, "এই অনুরোধ কি উচিত প্রফুল্ল?" "কেন উচিত নয়? গুরুজনের মনস্তাপ, এত বড়ো বংশ-লোপ, এতেও কি এ অনুরোধ করা যায় না? আমিই কি এত বড়ো যে আমার জন্য এমন কাজ হবে? বাপ মা চোখের জল ফেল্‌ছেন দেখ্‌ছ, এতেও কি তুমি এ কাজ উচিত মনে কর না?"

"শুধু কি তোমারি জন্য প্রফুল্ল, আমার নিজের অশান্তি কি এতে নেই?" "হ'লই বা, এত কর্তব্যের অনুরোধেও যদি তুমি নিজে এটুকু সহ্য না কর, তো তুমি পুরুষ কিসের?" "কিন্তু আর একটা যুক্তি তো আছে, পোষ্য পুত্র নিতে আপত্তি কেন কর?" "আবার সেই কথা আমি একটি নিজের ছেলে চাই, পরের ছেলে কি তেমন হয়?"

"তবে আর কোনও উপায় নেই প্রফুল্ল?" "উপায় কিসের? বেশ একটি ছোটো বোন আস্‌বে, আমার দোসর হবে, এতে আবার চিন্তা কি?" স্বামী তারাচরণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তারপরে? সতীনকে স্বামীর ভাগ দিতে পারবে তো? তাতে হিংসা হবে না?" "হিংসা হবে! আমার ধনে সে বড়ো মানুষ হবে আমি তার হিংসা করব, আমি কি এমন দরিদ্র?" তারাচরণ স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। "ওতে আর আমি ভুল্‌ছি

না; বল, বিয়ে করবে বল? কালই আমি মাকে বল্‌ব।" "আর দুদিন থাক্ প্রফুল্ল!" "আর একদিনও যেতে দেওয়া নয়।"

২

গৃহিণী কর্তাকে সুসংবাদ দিলেন পুত্রের বিবাহে মত হইয়াছে। আরও বলিলেন, "বৌমা বললেন তাঁর বাপের বাড়ির কাছে একটি গরিবের মেয়ে আছে, বাপ নেই, মেয়েটি নাকি বেশ সুশ্রী শান্ত শিষ্ট; সেই মেয়েটি ঠিক কর।"

প্রফুল্লমুখী হাসিতে হাসিতে স্বামীকে গিয়া সংবাদ দিল। তারাচরণ নীরবে রহিলেন। প্রফুল্ল দুই হাতে স্বামীর মুখ তুলিয়া বলিল, "অত মুখ ভারি কেন? আমাকে সুখী দেখেও কি আনন্দ হচ্চে না?" "এখনো বোঝ প্রফুল্ল, বড়ো ভুল করছ।" "কিসের ভুল, মিছে ব'কো না।"

"দেখ যাকে বিয়ে করব তার ওপরেও তো একটা কর্তব্য আছে, তার ওপরেও একটু মায়া করা উচিত, সে যে নির্দোষী বালিকা!"

"কেন তুমি তাকে আমারি মতো ভালোবাসবে!"

"তুমি পাগল! মানুষ কি কখনো দুদিক সমান রাখ্‌তে পারে?"

"না রাখ্‌তে পার তুমি সেই দিকেই ভার দিও। আমি তাতে রাগ করব না।"

বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। আমোদেব বিবাহ নয়, ধুম ধাম হইবে না। এ বিবাহে কর্তা গৃহিণী হইতে মায় চাকর দাসী পাড়া প্রতিবেশী পর্যন্ত দুঃখিত। ক্রমে বিবাহের দিন নিকট হইল। মাথায় টোপর দিয়া গম্ভীর মুখে ফেটঙে চড়িয়া তারাচরণ বিবাহ করিয়া আসিল।

বর কনে ছানলাতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বরণ করিতে আসিলেন। অগ্রে অগ্রে বারাণসী-পরা আপাদমস্তকমণ্ডিতা হাস্যধারা প্রফুল্লমুখী! সমাগতা আত্মীয়াগণও দেখাদেখি চোখ মুছিতেছিল। প্রফুল্ল অগ্রসর হইয়া প্রথমে নব-বধূর মুখ দেখিল। তার পরে নিজ গাত্র হইতে বহুমূল্য অলংকারগুলি উন্মোচন করিয়া সপত্নীকে সাজাইয়া দিতে লাগিল। চারিদিকে তুমুল ধ্বনি উঠিল, "ওমা একি! এ যে সত্যি কাল! মেয়েমানুষে কি সতীনকে এমন করতে পারে?—" বাধা দিয়া হাস্যমুখে প্রফুল্ল বলিল, "কেন তোমরা বারে বারে সতীন্ সতীন্ বল্‌ছ, কল্যাণী আমার

ছোটো বোন !" গৃহিণী বলিলেন, "ও বাবা তারা, যাস্‌নে, বরণটা করে নিই অলক্ষণ হবে, ও বাবা !"—তারাচরণ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তার পরে বধূ দেখা হইল। সকলে নীরবে রহিল। বধূ যদিও বেশ সুশ্রী কিন্তু, প্রফুল্লের মতো নয়। কেবল গৃহিণী বলিলেন, "বেশ শ্রী, চোখ দুটি বড়ো শান্ত। পাকা চুলে সিঁদুর পর মা! আর যার জন্য তোমায় আনা, সেই আশা আমার পূর্ণ কর মা! আর কিছু চাই না।" সকলেই গৃহিণীর কথায় সহানুভূতি প্রকাশ করিল, "তা বইকি মা, তোমার অমন সতীলক্ষ্মী দুর্গার মতো বউ থাকতে কি সাধ ক'রে এ কাজ করলে? তা যা হবার হয়েছে এখন প্রাতঃ বাক্যে বলি, একটি খোকা হোক্, তাহলেই সৃষ্টি রক্ষা পায়, নইলে বৌয়ে দরকার কি মা? ছেলের জন্যেই তো?"—ইত্যাদি।

পাকস্পর্শাদি হইয়া গেল। তারাচরণ নিজ কক্ষে বসিয়া কি পড়িতেছিলেন। প্রফুল্ল গিয়া বলিল, "মুখটা একবার তোল," তারাচরণ ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া পুস্তকে দ্বিগুণ মনঃসংযোগ করিলেন। "এত ভয়? চেয়েই দেখ না, আমি তোমায় মন্দ জিনিস দিইনি।" তারাচরণ নীরবে রহিলেন। "চাইবে না?" তারাচরণ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলেন, "কাজ আছে, আমি নীচে চল্‌লাম।"—হাত ধরিয়া ফেলিয়া সহাস্য মুখে প্রফুল্ল বলিল, "আর পালিয়ে কাজ নেই, যাকে এত ভয় সেই যাচ্ছে; যাও ত কল্যাণ! অন্ন ঠাকুরঝির কাছে যাও।" বলিতে কল্যাণী চলিয়া গেল। "নাও এখন, ব'স, সব কাজেই কি বাড়াবাড়ি?"

"আমার না তোমার!"

"বটে, বিয়ে করেছ! কথা কবে না?"

"সে তো তোমার সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, তার দায়ী তুমি।" মৃদু হাসিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া প্রফুল্ল বলিল, "কেন আর কাউকে পছন্দ হয় না নাকি?" "না"—বলিয়া তারাচরণ পত্নীর মুখচুম্বন করিলেন।

৩

অন্ন ঠাকুরঝি একজন কুটুম্ব-কন্যা, বিধবা; চিরকাল সে সেইখানেই পালিত; নব-বধূ কল্যাণী দ্বিতলের একটি নিভৃত কক্ষে তাহার নিকটে শয়ন করিত।

অন্নও তাহাকে সকলের অপেক্ষা একটু বেশি মমতা করে, অন্ততঃ কল্যাণীর তাহাই বিশ্বাস।

সুখও নাই, দুঃখও নাই, এমনি ভাবে কল্যাণীর দিনগুলা কাটিয়া যায়। গরীবের মেয়ে, কাজকর্ম করিতে না জানে এমন নয়; প্রভাতে অন্ন ঠাকুরঝির সঙ্গে কুট্‌নো কুটিতে গেলে প্রফুল্ল আসিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। "ছিঃ বোন! তুমি কেন কাজ করবে।" কল্যাণী মৃদু স্বরে বলিল, "তবে কি করবো?" "কি আর করবে? তোমার ঝিকে ডেকে দিই, ব'সে গল্প কর, তাস টাস খেল।"

ঝি ঘর ধুইতেছে, কল্যাণী ঝাঁটা লইতে যাওয়ায় সে হাসিয়া গলিয়া পড়িল! গৃহিণী শুনিয়া বলিলেন, "তোমার ওসব করতে নেই মা, তুমি উপরে থাক গে।" কল্যাণী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রন্ধন গৃহে বামনদিদি রাঁধিতেছেন, কল্যাণী গিয়া নিকটে বসিল। বামনদিদি আস্তে আস্তে তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, "সে কি ছোটো বৌ' ধোঁয়া লেগে অসুখ করবে যে।" অন্ন ঠাকুরঝি সস্নেহ কণ্ঠে বলিল, "এখানে ওসব করে না, তুমি তোমার দিদির কাছে রেশম কি জরি বোনা শেখগে।" কল্যাণী প্রফুল্লের কাছে আবেদন করিলে সে, হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার এসব কষ্ট ক'রে কিছু শিখ্‌তে হবে না বোন! আমি যা জানি তাতেই তোমার হবে; তুমি এখন শুধু একটি খোকা দিতে পারলেই আমাদেব সব কষ্ট দূরে যায়। তোমার আর কিছু করবার বা শিখ্‌বার দরকার নেই বোন্।" কথাগুলা অবশ্য খুব ভালোবাসারই, কিন্তু নির্বোধ কল্যাণী হয়ত তাহা বুঝিতে পারে না, তাই নীবরে ম্লান মুখে নিজের কক্ষের কোণটিতে গিযা বসে।

কাজও নাই, কর্মও নাই, একটু ভুলিয়া থাকিবার কোনো উপায় নাই, তাই কেবল মায়ের সেই স্নেহভরা মুখ মনে জাগিয়া উঠে। স্নেহপ্রার্থী তৃষিত বালিকা-হৃদয় তাই কেবলই হাহাকার করিতে থাকে।

বৈকালে চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে প্রফুল্ল বলিল, "মুখ অত শুক্‌নো কেন, কল্যাণী।" কল্যাণী কি উত্তর দিবে? তাই চুপ করিয়া রহিল। তাহার যে মুখ শুক্‌নো সে ত তা বুঝিতে পারে না। চুল বাঁধা হইলে প্রফুল্ল বলিল, "একটু ব'স তো, আমি আসছি।" প্রফুল্লের প্রস্থানের পর দাসী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ছোটো বউদি! দাদাবাবুর সঙ্গে তোমার ভাব হয়েছে?" কল্যাণী

সলজ্জ ভাবে মস্তক অবনত করিল। "বল না, লজ্জা কি? কি কথা হয়েছে?" কল্যাণী মৃদু স্বরে বলিল, "আমি ঠাকুরঝির কাছে থাকি।" "তা দাদাবাবু তোমায় একদিনও ডেকে কথা কন নি?" "না।" দাসী প্রীতভাবে বলিল, "আহা, তিনি কি সাধে বিয়ে করেছেন? ছেলে না হওয়াতেই তো এমনটা ঘট্‌ল; অমন স্ত্রী থাক্‌তে কি আর কাউকে স্ত্রীর মতো কেউ ভাব্‌তে পারে, না, তাই ভদ্দরের কাজ!" তা ত সত্যই! কল্যাণী নির্বোধ হইলেও তাহা বুঝিতে পারে। সে নীরব নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিল।

৪

রাত্রি দশটার পরে তারাচরণ শয়নকক্ষে গিয়া দেখিলেন, প্রফুল্ল তখনো আসে নাই। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল; বিরক্ত হৃদয়ে তিনি শয্যার দিকে ফিরিয়া সহসা দেখিলেন, দ্বারের নিকটে অবগুণ্ঠনবতী বেপমানা বালিকা! তারাচরণের বুকের মধ্যে অনেকখানি রক্ত চট্ করিয়া যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিল। বুকের মধ্যে কি রকম শব্দ হইতে লাগিল। কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কল্যাণীও রহিল।

কিছুক্ষণ পরে তারাচরণ বলিলেন, "প্রফুল্ল কোথায়?" কল্যাণী উত্তর দিল না। "প্রফুল্ল কোথায়?" অস্ফুট শব্দ হইল, "নীচে!" তারাচরণ কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "তোমায় সেই বুঝি পাঠিয়েছে?" "হ্যাঁ।" "তুমি নীচে যাও গিয়ে তাকে ডেকে দাও গে।" কল্যাণী চলিয়া গেল। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে তখন কি হইতেছিল, কে জানে? তারাচরণও একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমনা ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পার্শ্বের কক্ষ হইতে অল্প হাসি-মুখে অথচ গম্ভীর ভাবে প্রফুল্ল আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল,—"ছিঃ ছিঃ! এ কি অন্যায়; জান ও তোমার স্ত্রী! ওকে আমরা সুখ দেব বলে এনেছি, কষ্ট দিতে নয়, তোমার এমন তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। ছেলেখেলার জন্যে তো আমি এমন কাজ করিনি; তুমি জান কি কর্ত্তব্যের জন্য তুমি বিয়ে করেছ; সেই জন্য আমি আমার সর্বস্ব—তোমার অংশও তাকে ছেড়ে দিয়েছি, আর তুমিও সেই কর্তব্য মনে ক'রে তাকে ভালোবাসবে না? আদর করবে না?" তারাচরণ নির্বাক রহিলেন। তখন স্বামীর গলা ধরিয়া আদরের স্বরে প্রফুল্ল বলিল, "রাগ করেছ?"

"না প্রফুল্ল, সত্যই তুমি আজ আমায় উপদেশ দিলে, আমি তোমার আদর্শে চল্‌ব।" স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রফুল্ল বলিল, "আমার আদর্শ? অমন কথা বলো না। তোমায় সত্য কথা বলি। আমি যতটা দেখাই সত্যই আমি কল্যাণীকে তত ভালোবাসি না। সত্যই আমি তাকে যে আমার পঞ্জরভেদী দীর্ঘশ্বাসের মতো ভাবি না সে শুধু কর্তব্যের জন্য, আমার নিজের জন্য, তোমার জন্য। তোমার ভালোবাসার অটল শিখরে দাঁড়িয়ে আছি বলে তার দিকে আমি একটু দয়া দেখাতে চাই। আমার একটু স্নেহকণায় যদি একটা জীবন উঁচু হয়ে ওঠে তো সেটুকু দেওয়াতে কষ্ট কি? বরং তাতে আনন্দ নয় কি? তুমি তাকে আর তাচ্ছিল্য ক'রো না।"

তারাচরণ পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "যার এমন মন্ত্রী পাশে, তার বুদ্ধির ভাবনা কি? তাই হবে।"

কক্ষান্তর হইতে কল্যাণী তখনো পলাইতে পারে নাই। নীচে যাইতে লজ্জা করিতেছিল। এইবার সে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

পরদিন রাত্রে তারাচরণ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যায় কল্যাণী ঘুমাইতেছে। তারাচরণ দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সন্তর্পণে শয্যার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। বালিকা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। মসৃণ ক্ষুদ্র ললাটে দিবালোকে বিষাদের কুঞ্চন রেখা ফুটিয়া উঠে, এখন তাহা নির্মল সমতল। তারাচরণের মনে পড়িল সেই অতি শান্ত অব্যক্ত বিষাদ মাখা সুন্দর চক্ষু দুইটি; অস্ফুট স্বরে ডাকিলেন, "কল্যাণী!" নিজের কর্ণে নিজের স্বর প্রবেশ করায় তারাচরণ লজ্জিত ক্ষুব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। "ছিঃ ছিঃ! প্রফুল্লের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা!" গৃহের গ্যাসালোকে চাবি টিপিয়া দিলেন, গৃহ অন্ধকার হইল। শয্যার উপরে বসিতে পালঙ্‌ নড়িয়া উঠিল, নিমেষে কল্যাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, ডাকিল, "ঠাকুরঝি!" কোনো উত্তর আসিল না। "ঠাকুরঝি এসেছ! বড়ো অন্ধকার, আলো কি নিবে গেল?" স্বর বড়ো করুণ, ভীতিজনক; বালিকা অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল, নিকটে একজন লোক, অথচ উত্তর দেয় না। "দিদি কি?" উত্তর নাই। সভয়ে বালিকা বলিল, "ও মা—" তারাচরণ ভীতা বালিকার হস্ত স্পর্শ করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "ভয় কি? আমি!" কল্যাণী শিহরিয়া উঠিল। মনে পড়িল প্রফুল্ল তাহাকে এই ঘরে আনিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করে। কল্যাণী শয্যা হইতে

নামিতে চেষ্টা করিল। "অন্ধকারে পড়ে যাবে, শুয়ে থাক।" কল্যাণী দ্বার খুলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারাচরণ পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া বলিলেন, "অনেক রাত্রি হয়েছে, উঠে এসে ঘুমোও।" বহুক্ষণ পরে অগত্যা কল্যাণী গিয়া শয্যাপ্রান্ত গ্রহণ করিল।

তার পরে ধীরে ধীরে বৎসর ঘুরিয়া গেল। এক রকমে সকলেরি দিন কাটিতে লাগিল। প্রফুল্লের প্ররোচনায় কল্যাণী মধ্যে মধ্যে স্বামীর শয্যা-ভাগিনী হইত। তারাচরণেরও তাহাকে ক্রমে সহিয়া গেল।

মহা ধুমধাম। সুবৃহৎ গেটের দুই পার্শ্বে মঙ্গল কলস ও কদলীবৃক্ষ। মধুর রাগিণীতে নহবত বাজিতেছে। দলে দলে কাঙালীরা নববস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া কোলাহল করিতেছে। দুর্গাচরণ বাবুর অদ্য সফল জীবন, তারাচরণের পূর্ণমনস্কাম, সকলের প্রাণে আনন্দের তুফান তুলিয়া অদ্য তাঁহাদের একটি বংশধর জন্মিয়াছে। কল্যাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

প্রসূতির কিন্তু বড়ো সংকটাপন্ন অবস্থা। সন্তানপ্রসবের পরেই দুর্বলতায় সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞানোন্মেষের পরেও তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলে শঙ্কিত হইল। প্রফুল্ল আঁতুড় ঘরে গিয়া নবপ্রসূত সন্তানকে কোলে লইয়া বসিল। নিভৃতে তারাচরণকে ডাকাইয়া পুত্র দেখাইয়া প্রফুল্ল হাসিমুখে বলিল, "কেমন হয়েছে?" তারাচরণও তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ, বড়ো সুন্দর মানাচ্চে।"

"কিসে?"

"তুমি কোলে নিয়ে আছ বলে! মনে হচ্ছে যেন তোমারি হয়েছে—"

"নয় কিসে?" ঈষৎ গম্ভীরমুখে তারাচরণ বলিলেন, "তা'হলে আর দুঃখ কিসের ছিল?" শায়িতা ক্লিষ্টা কল্যাণী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে একবার স্বামীর পানে চাহিতে চে   করিল। প্রফুল্ল হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার বড়ো ছোটো মন!"

ধুমধামে ষষ্ঠীপূজা হইয়া গেল। কল্যাণী অনেক যত্নে কিছু সুস্থ হইল বটে, কিন্তু বড়ো দুর্বল বলিয়া ডাক্তারে ধাত্রী দ্বারা সন্তান পালনের ব্যবস্থা দিল। শাশুড়ী বলিলেন, "কেন আমার বড়ো বৌমা মানুষ করবে। সে কোল ওরই।" প্রফুল্লের ক্রোড়ে নবকুমার কমল-কলিকার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বৈকালে কল্যাণী নিজ কক্ষে শুইয়াছিল। নিকটে বসিয়া অন্ন ঠাকুরঝি ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল। মস্তিষ্ক তাহার সর্বাপেক্ষা দুর্বল—দাঁড়াইতে গেলে মাথা ঘোরে। খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রফুল্ল সে কক্ষে প্রবেশ করিল। পশ্চাতে ব্যজনী হস্তে দাসী। "ছাখ্ কল্যাণী, খোকা কত হাস্‌ছে! ওমা এর মধ্যে এত হাসতেও শিখেছে, ছাখ্ ছাখ্!" কল্যাণী চাহিয়া বলিল, "হুঁ!" "আচ্ছা অন্ন-ঠাকুরঝি, খোকার ঠিক ওঁর মতো মুখ হয়নি?" "অনেকটা হয়েছে বটে।" "এই নিয়ে আমার সঙ্গে রোজ তর্ক হয়—খোকা ঠিক ওঁর মতোই হবে।" দাসী বলিল, "হ্যাঁ তেমনি মুখ, তেমনি ভাগ্যিমানের মতো মস্ত কপাল!"—প্রফুল্ল শিশুকে চুম্বন করিল। অন্ন বলিল, "হ্যাঁ তবে এখন মা-টি ভালো হ'লেই হয়,—হয়ে অবধি মার অসুখ, একদিন মাই খেতে পেলে না।" প্রফুল্ল হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাতে কি ওর কিছু কষ্ট হয়েছে ঠাকুরঝি? ও কি এখন কে মা, কে নয়, তা বুঝেছে?" অন্ন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না না তাকি বলছি, ছোটো বউ'র কি তোমার মতো যত্ন কত্তে সাধ্যি হ'ত, তা নয়—" বাধা দিয়া দাসী বলিল, "পেটে হলে কি হয়, বড়ো বৌদিই তো হ'ল আসল মা, ছেলের জন্যেই তো ছোটো বৌদিদিকে আনা—ও তো খোলস বই নয়! ভগবান না করুন ছোটো বৌদির ভালো মন্দতে কি ওর ভাগ্যি ছোটো হবে?" প্রফুল্ল ঈষৎ রুষ্ট ভাবে বলিল, "কি বলিস্ তার ঠিক নেই, বালাই!" তারপরে কল্যাণীর মস্তকে হস্ত দিয়া বলিল, "আজ কেমন আছ কল্যাণী?" "ভালো আছি।" "ক্রমশঃই ভালো হবে। খোকাকে একটু নেবে কল্যাণী?" "না, আপনার কোলেই থাক।"

৬

তখন সূর্য অস্ত যাইতেছে। বারান্দাটি নির্জন, বড়ো শান্তিপূর্ণ। রেলিং ধরিয়া কল্যাণী নীরবে কত কি ভাবিতেছিল। চারি মাস খোকা হইয়াছে, ইহার মধ্যে সে একবারও স্বামীর মুখ দেখিতে পায় নাই। এতটা যে অসুখ গিয়াছে, তিনি একদিনও দেখিতে আসেন নাই। অসুখের জন্য যদিও এমন কেহ চিন্তিত হয় নাই, তথাপি দেখিতে তো সকলে আসিত। কল্যাণীর মনে হইল, সামান্য একটা দাস দাসীরও ব্যারাম হইলে স্বামী তাহার তত্ত্বাবধান করেন। ধীরে ধীরে তাহার নাসাপথ হইতে একটা মৃদু অথচ দীর্ঘকালবাহী

নিঃশ্বাস বহিয়া গেল। অন্ত মনে কল্যাণী রেলিং ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। সহসা কাহার কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণী গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে চাহিয়া দেখিল, একখানা কৌচের উপর বসিয়া তারাচরণ, তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া প্রফুল্ল অর্ধশায়িতাবস্থায় বসিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া হাসিতেছিল। তারাচরণ প্রেমভরে তাহার মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া মুখের কাছে রাখিয়াছেন। দুই জনে কত কথা হইতেছিল, তাহার ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে ভালোবাসা যেন উছলিয়া উঠিতেছে। লুব্ধ তৃষিতনয়নে কল্যাণী চাহিয়া রহিল। তাহার ক্ষুদ্র বক্ষের মধ্যে রক্তটা তোলপাড় করিয়া তুলিতে লাগিল। নিম্নে উদ্যান হইতে বাহিত মৃদুল সুবাস তখন চারিদিকে দুরাশার স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছিল।

দাসী কক্ষ মধ্যে আসিয়া খোকাকে দিয়া গেল। পতি-পত্নীতে শিশুকে আদর করিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিল, "কল্যাণী আজ ভালো আছে, জ্বরটা হয়নি।" তারাচরণ কিছু বলিলেন না। "আচ্ছা খোকাব কি নাম হবে? ভাতের তো আর বেশি দেরি নেই।"

"তুমি পছন্দ কর না।"

"অমূল্যকুমাব বেশ নাম নয় কি। বেশ অমু অমু বলে ডাকব।"

"বেশ নাম, তাই রেখো। বড্ড তো হাস্‌তে শিখেছে, দ্যাখ, দ্যাখ।" উভয়ে যুগপৎ শিশুকে চুম্বন করিলেন। তার পরে তারাচরণ ফিরিয়া প্রফুল্লকে চুম্বন করিলেন। প্রফুল্ল হাসিয়া উঠিল। কল্যাণী সরিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

প্রফুল্ল বলিল, "এইবাব বোধ হয় কল্যাণী সার্‌বে। মধ্যে মধ্যে যে ভাবনাটা হ'ত।" তারাচরণ একটু থামিয়া বলিলেন, "এমন বেশি ভাবনাব কথা কি? আমাদের যার প্রয়োজন ছিল তাতো পাওয়া গেছে।"

"ছিঃ ছিঃ, এমন কথা কি বল্‌তে আছে?"

কল্যাণী ধীরে ধীরে রেলিং ধবিয়া ধরিয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া গেল। কক্ষ-মধ্যে তখন অন্ধকার। উপুড় হইয়া সে শয্যার উপরে শুইয়া পড়িল, হায় মানবের অভাব! তুমি যে যথার্থ কি, তাহা বুঝিলাম না। প্রফুল্ল যখন ক্রোড়স্থ শিশুকে দোলাইতে দোলাইতে স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া ভাবিতে-ছিল, "কল্যাণী কি ভাগ্যবতী।" তখন অন্ধকার কক্ষে শয্যার উপরে লুটাইয়া কল্যাণী অপরের সৌভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল।

পরদিন প্রফুল্লকে অন্ন বলিল, "রাত্রে ছোটো বৌ'র বড়ো জ্বর হয়েছিল। —এখনো ওঠেনি।"

৭

উপযুক্ত সমারোহের সহিত খোকার অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। নাম হইল অমূল্যকুমার।

কল্যাণী ক্রমশঃ শয্যায় সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার দেখে, ঔষধ খায়, সুনিয়মে চিকিৎসা হয় তথাপি অসুখ সারে না। সকলে ভাবে, "অতি সুখ বুঝি মানুষের সয় না। নইলে যারা ভাগ্যিমানি, তারাই ব্যারামে বেশি ভোগে কেন?"

অন্ন নীচে কার্যান্তরে নিযুক্তা। কল্যাণী নিজ কক্ষে একেলা শুইয়াছিল। জানালা দিয়া বাতাস আসিয়া রোগপাণ্ডুর মুখের উপর ছড়ানো রুক্ষ চুলগুলো লইয়া খেলা করিতেছিল। মুদিত চক্ষে কল্যাণী শুইয়াছিল। সহসা ললাটে কাহার শীতল হস্ত স্পৃষ্ট হইল,—চাহিয়া দেখিল স্বামী!

নিকটে বসিয়া তারাচরণ বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন; তার পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, "কেমন আছ, কল্যাণী?" কল্যাণীর অভ্যস্ত "ভালো আছি"—উত্তর আজ মুখে আসিল না। কল্যাণীর বোধ হইল, স্বরটা বড়ো স্নেহসিক্ত। একবার বিস্ফারিত চক্ষে স্বামীর মুখের পানে চাহিল, চক্ষু নত হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে দর দর ধারে জল গড়াইয়া পড়িল। ব্যথিত প্রশ্ন হইল, "কাঁদ কেন কল্যাণী? ডাক্তার বলেছে শীগ্‌গিরই ভালো হবে।" নিঃশ্বাস ফেলিয়া কল্যাণী বলিল, "আর ভালো হয়ে কি হবে?"

"কেন কল্যাণী—ভালো হবে বই কি!"

"না—না আর নয়, আমার কাজ তো ফুরিয়েছে, আর বেঁচে কি হবে?" তারাচরণ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কল্যাণীর শীর্ণ হস্ত নিজ হস্তে ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ও কি কথা কল্যাণী! ও কথা কেন বল্‌ছ?" কল্যাণী পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শুইল; চোখে বড়ো জল আসিয়াছিল। সাদরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে তারাচরণ বলিলেন, "কল্যাণী, অমন ক'রে রয়েছ কেন? বড়ো কি কষ্ট হচ্চে?" "হ্যাঁ"। "কি কষ্ট হচ্চে?" অতি কষ্টে কল্যাণী বলিল, "মাথাটা বড়ো কেমন কচ্চে।" "এই গন্ধটা শোঁক দেখি,

মুখ ফিরিও না গন্ধটা নাকে যাক্।" মস্তিষ্ক-স্নিগ্ধকর মধুর সুবাসে কল্যাণী অনেকটা প্রকৃতিস্থা হইল। মৃদুস্বরে বলিল, "আর না এখন ভালো হয়েছে।" কল্যাণী হাত দিয়া শিশিটা একটু ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেই তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তারাচরণ স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "সরিয়ে দিও না! আমার এই সামান্য সেবাটুকু আজ নাও তুমি!"—কল্যাণী পূর্ণ চক্ষে স্বামীর পানে চাহিল। নির্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপে একি অজস্র স্নেহধারা নিষেক? মরণোন্মুখ লতায় কেন আর এই শীতল বারি বর্ষণ? কল্যাণী চোখ বুঁজিল। "নাও কল্যাণী, আমার এই প্রথম তোমায় একটু দিতে আসা—নেবে না?" কল্যাণী সজোরে চক্ষু মেলিল। উচ্চ কণ্ঠে বলিল,—"না না—নেব না। তুমি যাও—তুমি যাও, এখন আর কেন তুমি এসেছ? আর তো আমাকে দরকার নেই।" উচ্ছ্বাসের আবেগে শীর্ণদেহা দুর্বল-মস্তিষ্কা কল্যাণী মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

৮

ক্রমশঃ কল্যাণী দিনে দিনে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। আর বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। বেশি কথা কহিতে পারে না। সন্ধ্যার পর মৃদু আলোকে অন্ন বসিয়া কল্যাণীর জন্য গ্লাশে ঔষধ ঢালিতেছিল। কল্যাণী সহসা মোহের ঘোরে বলিয়া উঠিল, "আর এসো না—আমি আর চাই না।" "কি বল্‌ছ কল্যাণী?" "তিনি বুঝি চলে গেলেন ঠাকুরঝি? রাগ করে গেলেন?"

"ওকি বল্‌ছ কল্যাণী—অমন করছ কেন? ওষুধ খাও।"

"ওষুধ? আর পারি না ঠাকুরঝি!" "না খেলে কি অসুখ সারে?" "অসুখ? অসুখ আর সারানো হবে না ঠাকুরঝি!—আমাকে যে আর দরকার নেই বলে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি—আর বাঁচিও না!"

"বালাই তোমার কিসের দুঃখ, তুমি রাজরাণী রাজমাতা।"—কল্যাণী মৃদু হাসিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রে কল্যাণী বড়ো ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। অন্ন সভয়ে গিয়া গৃহিণী ও প্রফুল্লকে ডাকিয়া আনিল।

প্রফুল্ল আসিয়া কল্যাণীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিল। গৃহিণী বাতাস করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর চঞ্চলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

"কেন দিদি অমন করছ ?" কল্যাণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বড়ো কষ্ট।" কর্তাকে ডাকানো হইল। ডাক্তার আনিতে লোক ছুটিল। বাড়িতে একটু গোলমাল পড়িয়া গেল। প্রফুল্ল বলিল, "কল্যাণী অমুকে কোলে নেবে ?" "না দিদি!" গৃহিণী ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "আসুক না ; মা নাও একটু!" কল্যাণী একটু জোরে বলিল, "না দিদি, আমায় একটু শান্তিতে মরতে দাও। তার কথা একটু ভুলতে দাও দিদি ! সে কেন তোমার পেটে হ'ল না ?"

"কল্যাণী, থাম।"

"ছোটো থেকে, যেদিন এ বাড়িতে পা দিয়েছি, শুনে আস্‌ছি তার জন্যেই তোমরা আমায় স্নেহ কর, কেন, আমি কি কেউ নই দিদি ? আমায় তোমরা ভালোবাস না ? আমায় তোমরাই তো এনেছ ? আমি কিসে দোষী দিদি ?" গৃহিণী অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বলিলেন, "ষাট্ বালাই ! তোমায় কে ভালোবাসে না মা ? তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী।"

"না না, আমি কেউ নই, আমি কেউ নই!"—ডাক্তার আসিয়া বলিল, "পূর্ণ বিকার! প্রলাপ হইয়াছে।" গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "অন্ন, তারাচরণকে ডাক্।" অন্ন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। কল্যাণী ক্ষণে ক্ষণে দ্বারের দিকে চাহিতেছিল, জ্ঞান তখন ভালো ছিল না।

"দাদাবাবু এলেন না, জ্যাঠাইমা।—নীচে চলে গেলেন।" গৃহিণী অশ্রু মুছিলেন। দাসী আসিয়া ডাকিল, "বৌদি! খোকা বড়ো কাঁদ্‌ছে থামাতে পাচ্চি না শীগ্‌গির এসো।" প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কল্যাণী প্রলাপ ঘোরে বলিল, "দিদি! দিদি! কই এলেন না ? তিনি যে এসেছিলেন— আমি যেতে বলেছি, তাঁকে ডাকো আর যেতে বলব না।" কেহ আসিল না।

অন্ন মুখের উপর পড়িয়া বলিল, "কল্যাণী কল্যাণ—কি বল্‌ছ ?"

অর্ধস্ফুট স্বরে কল্যাণী বলিল, "এস, আর যেতে বলব না, এস।"

'আলেখ্য'

ঠাকুরঝি

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নীরজা রান্নাঘরে ঝোল সাঁৎলাইতেছিল, শিবপ্রিয়া পা টিপিয়া অলক্ষ্যে আসিয়া তাহার মুখে খানিকটা মোহনভোগ পুরিয়া দিল। নীরজা ঘাড় ফিরাইয়া অনুযোগের স্বরে কহিল, "ও কি ভাই ঠাকুরঝি!"

শিবপ্রিয়া হাসিয়া কহিল, "কিছু মুখে দাও দেখি। নিজে থেকে ত কখনও খাবার ফুরসৎ হতে দেখলুম না!"

নীরজা হাত ধুইয়া ধোয়া জল কড়ায় ঢালিয়া সরিয়া আসিল, কহিল, "এই যে ঝোলটা নাবিয়ে রেখেই খেয়ে নিচ্ছি।"

"বাসি রুটি ত! সে আর তোমায় খেতে দিচ্ছি না। কেন বল ত—আমি খাব লুচি, মোহনভোগ, আর তুমি বাড়ীর বৌ, একটি বৌ, তুমি কতকগুলো বাসি রুটি গিলবে! কেন? মার সঙ্গে এই নিয়ে আজ খুব একচোট হয়ে গেছে, আমার।"

নীরজা ম্লান নেত্রে শিবপ্রিয়ার পানে চাহিল। সে দৃষ্টিতে করুণ মিনতি যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে দৃষ্টির অর্থ, কেন তুমি আমার হইয়া ঝগড়া কর, ভাই? তাল সামলাইতে আমার যে এদিকে প্রাণ বাহির হইয়া যায়! শিবপ্রিয়া তাহা বুঝিত; তাই সে কহিল, "আমি এবার তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। দেখি, মা তোমায় কেমন কিছু বলে!"

নীরজা শিহরিয়া উঠিল, কহিল, "না ভাই, না ঠাকুরঝি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

শিবপ্রিয়া একদৃষ্টে নীরজার পানে চাহিয়া রহিল। নীরজার সুন্দর মুখে ঘামের বিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে; কপালের উপর মুক্ত কেশগুলা সে ঘামে ভিজিয়া বসিয়া গিয়াছে; আগুনের তাপে মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। শিবপ্রিয়া কহিল, "আজ থেকে আর একলা তোমায় রাঁধতে দিচ্ছি না। আমিও রান্নায় যোগ দেব।" বলিয়া শিবপ্রিয়া উনানের দিকে অগ্রসর হইল।

নীরজা বাধা দিয়া কহিল, "না ভাই, তোমার সহ্য হবে না; অসুখ করবে।"

শিবপ্রিয়া সজোরে কহিল, "ওগো, না গো না, আমি মোমের পুতুল নই যে আগুন-তাতে গলে যাব!"

নীরজা কহিল, "তুমি দুদিনের জন্যে এখানে জিরুতে এসেছ—"

শিবপ্রিয়া কোপের ভান করিয়া কহিল, "বটে, আমার বাপের বাড়ী আমি এসেছি কুটুম, না? তাই আমি সিংহাসনে দিবা-রাত্তির বসে থাকব, কুটোটি অবধি নাড়তে পাব না! ইস লো! না, আমার হাতের রান্না খেলে তোমাদের জাত যাবে? ওগো, তোমার ঠাকুরজামাই অখাদ্যি খেলেও সে মোছলমান নয়—বুঝলে?"

নীরজা জানিত, শিবপ্রিয়াকে ঠেকাইয়া রাখা দায়! সে যাহা ধরিবে, তাহা করিবেই। বিশেষ নীরজার কষ্ট এতটুকুও লাঘব করিবার জন্য শিবপ্রিয়া মায়ের উগ্র রোষানল হাসিমুখে মাথায় তুলিয়া লইতে পারে। বড়লোকের ঘরে সে পড়িয়াছে,—বাপের বাড়ী বড় একটা আসিবার সুবিধা তাহার ঘটে না। এক বৎসর পরে কয়দিনের কড়ারে এবার সে বাপের বাড়ী আসিবার অনুমতি পাইয়াছে। মা মেয়েকে পাইয়া কোথায় রাখিবেন, কি পাঁচটা ভাল জিনিস তাহাকে খাওয়াইবেন, তাহা ভাবিয়া অস্থির আকুল হইয়া উঠিয়াছেন! পূর্বে যেখানে শুধু স্নেহ ছিল, এখন সেখানে মন জোগাইবাব পালা পড়িয়াছে। হোক পেটের মেয়ে, তবু সে আজ বড়লোকের বৌ। এই কথাটাই মায়ের মনে সকলের চেয়ে বেশী জাগিতেছিল। তাই মা মেয়ের জন্য অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মেয়ে কিন্তু দেখিতে পাইল, তাহার আদবের ঘটায় বেচারী নীরজার পরিশ্রমেব সীমা নাই। আবার শুধু তাহাই নয়। মুখ টিপিয়া এতখানি যে খাটিয়া সারা হইয়া যাইতেছে, তাহার উপর জুলুমেরই কি অন্ত আছে! আবার শুধুই জুলুম? শিবপ্রিয়া নারী—সে জানে, সংসারের কাজে নারী যতই খাটিয়া সারা হোক না কেন, সে খাটুনি কিছুই তাহার গায়ে লাগে না, যদি এ-সকল খাটুনির পিছনে স্বামীর ভালবাসায় জুড়াইবার একটা আশ্রয় থাকে! কিন্তু এ ক্ষেত্রে নীরজার ভাগ্যে তাহারও অভাব। প্রবল-প্রতাপ ভাই তাহার স্ত্রীর ভালবাসার ধার মোটেই ধারিত না। বৌ যখন গভীর রাত্রে পরিশ্রমান্তে জুড়াইবার জন্য ঘরের কোণে গিয়া আশ্রয় লয়, ভাই শ্রীপতি তখন নীচ ও জঘন্য আমোদ-প্রমোদের চেষ্টায় বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

যার ত সেদিকে শাসন মোটেই নাই, বরং তিনি ছেলেকে এ বিষয়ে একরূপ প্রশ্রয় দিয়াই আসিতেছেন।

বহুদিন পরে ভাইয়ের সংসারে আসিয়া এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া শিবপ্রিয়ার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিল, দূর হোক, এখনই চলিয়া যাই! কিন্তু না, বেচারী নীরজা! নীরজার প্রতি সুগভীর মমতাই তাহাকে এখানে আটকাইয়া রাখিল। সে ভাবিল, নীরজার সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া তবে সে এখান হইতে নড়িবে! এমন লক্ষ্মী বৌ—তাহার এমন দুর্দশা! ঘরের লক্ষ্মী যেখানে কাঁদিয়া দিন কাটায়, সে সংসারের উচ্ছেদ হইতে কতক্ষণ!

তাই বৌয়ের পক্ষ লইয়া মায়েব সহিত সে ঝগডা সুরু করিল। স্বামী-সৌভাগ্যের দুর্জয় বর্ম তাহাকে বিপুল শক্তিশালিনী করিয়া তুলিয়াছিল। মাকে সে স্পষ্টই বলিল, "তোমার আস্কারাতেই ত দাদার এতখানি বাড় হয়েছে।"

মা বলিলেন, "তা যা বল বাপু, শ্রীপতি আমার এ-কালের ছেলেদের মত বেহায়া নয় যে, বৌকে মাথায় তুলে নাচবে!"

শিবপ্রিয়া রাগিয়া বলিল, "নাঃ, বৌকে দু'পায়ে থ্যাঁৎলানোটাই ভারী পৌরুসেব লক্ষণ।"

মা বলিলেন, "বৌ বৌই আছে, খাচ্ছে পরছে—ব্যস। আবার কি! কিসের তার আর অভাব রইল, শুনি। মেমেদের মত সোয়ামীর হাত ধরে গডের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেডাবে না কি! না, পাঁচটা মজলিশে ধেই ধেই করে নাচতে ছুটবে?"

বৌ-সম্বন্ধে মাতাব এই আশ্চর্য ধারণার কথা শুনিয়া শিবপ্রিয়া অবাক হইয়া গেল, কিন্তু দমিল না। সে ভাবিল, কিছুতেই ছাডা হইবে না—এ গাঙ্গে তরী যখন ভাসাইয়াছে, তখন শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া কূলে সে পৌছিবেই! ভাইকেও একদিন কাছে পাইয়া সে বেশ চড়া রকমের দশটা কথা শুনাইয়া দিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে, শ্রীপতি পূর্বে দুই বেলা দুই মুঠা ভোজন করিবার জন্যও অন্দরে আসিতেছিল, এখন ভগ্নীর কড়া কথা শুনার পর হইতে সে পুরে সে একান্তই দুর্লভ হইয়া উঠিল।

এই ঘটনায় মায়ের যত রাগ পড়িল নীরজার উপর। সে-ই ত এ

ব্যাপারের মূল! তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ত শিবপ্রিয়া কঠিন বচনের চাকা-খানা ঘুরাইয়া দিয়াছে! আর সেই চাকা তাঁহাকে ও শ্রীপতিকে মাড়াইয়া পিষিয়া সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কতদিন পরে মেয়ে আসিল—কোথায় দুই দণ্ড তাহাকে কাছে রাখিয়া সুখ-দুঃখের দুইটা কথা কহিবেন, তাহার অবকাশ-মাত্র না দিয়া মেয়েটা বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পাঁচটা বাজে ছুতা খুঁজিয়া মার সঙ্গে কোঁদল বাধাইতেছে! মুখ টিপিয়া থাকিলে কি হয়, বৌয়ের হাড়ে ভেল্কি খেলে! তাই বৌয়ের উপর তাঁহার আক্রোশ সীমা ছাপাইয়া উঠিল। বৌকে অন্তরালে পাইলেই মনের জ্বালার বেশ দুই-চারিটা তীব্র ছিটা তিনি তাহার উপর নিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না।

নীরজা চোখের জল মুছিয়া ভাবিল, হায়, ঠাকুরঝি এ করিল কি! মধু পাইবার প্রত্যাশায় মধু-চক্রে খোঁচা দিয়া মধু ত পাওয়া গেলই না, এখন হুলের বিষে তাহার যে প্রাণ যাইবার জো হইয়াছে। মনে সুখ ত তাহার ছিলই না; স্বস্তি একটু ছিল। সে স্বস্তিটুকুও ঠাকুরঝি আজ দূর করিয়া দিতেছে! হায়, সে দুই দিনের লোক, দুই দিন পরেই দূরে চলিয়া যাইবে, কিন্তু সে বুঝিতেছে না, এ দুই দিনে সংসারটায় যে দারুণ ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়া যাইতেছে, সে ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়িয়া নীরজার পক্ষে টিঁকিয়া থাকা কতখানি কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে!

২

রান্নাঘরে মেয়ের গলার সাড়া পাইয়া মা পা টিপিয়া তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৌয়ের পানে রক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "ননদের সঙ্গে গানে-গল্পে ঝোল্‌টা শেষে পুড়িয়ে ফেলো না যেন! ও কোথায় দু দিনের জন্য এল বাপের বাড়ীতে জিরুতে, না, দিবা-রাত্তির ওকে ধরে ফুস্‌লোনো হচ্ছে! শেষে রান্নাঘরে এই উনুনের পাশে আগুন-তাতে অবধি ওকে টেনে আনা হয়েছে!"

নীরজা মাটির পানে চাহিয়া রহিল। শিবপ্রিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল, "ও কেন ডাকতে যাবে? আমি নিজে এসেছি। সকাল থেকে মানুষটা কিছু না খেয়ে রেঁধে সারা হচ্ছে,—কি খেলে না খেলে, সেদিকে কারও নজরই নেই—তাই ওর মুখে জোর করে একটু মোহনভোগ পুরে দিলুম।"

মা বলিলেন, "বড়লোকের মেয়ের মুখে বুঝি রুটি আর রোচে না!"

শিবপ্রিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা—!" সে স্বরে মা চমকিয়া থামিয়া গেলেন। শিবপ্রিয়া বলিল, "তুমি ওকে যা খুসী বক্‌তে পারো, কেন না ও তোমার বৌ, এখন ওকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছ। কিন্তু তাই বলে ওর বাপের নামে খোঁটা দিয়ো না বলছি, খবর্দার! ও ভাল মানুষ, তাই চুপ করে সহ্য করছে! আমায় যদি কেউ এমনি করে আমার মরা বাপের নামে খোঁটা দিত, তাহলে আমি কি করতুম, জানো? নখে করে তাকে ছিঁড়ে ফেলতুম—তা সে আমার যত-বড় গুরুজনই হোক না কেন! স্বামী হলেও রেহাই দিতুম না।"

মেয়ের কথায় মা ভড়কাইয়া গেলেন। শিবপ্রিয়ার চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছিল—রাগে সর্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মা বলিলেন, "এখন আয় বাপু—রান্নাঘর থেকে চলে আয়—তোর মাথা গরম হয়ে উঠেছে। এখনই আবার ফিট্-টিট হয়ে পড়বে! কত করে ত ফিট বন্ধ হয়েছে—আয়, চলে আয়।" মা মেয়ের হাত ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিলেন।

শিবপ্রিয়া কহিল, "না, আমি যাব না। ছাড়ো আমায়। আমি আজ রাঁধব—বৌকে রাঁধতে দেব না। তুমি যাও। আমায় রাগিয়ো না, বলছি, —তাহলে অনর্থ বাধবে!"

মা ভয়ে সরিয়া গেলেন। যাইবার সময় বৌয়ের পানে যে দৃষ্টি হানিয়া গেলেন, তাহাতে যেন আগুন ঠিকরিয়া বাহির হইতেছিল।

নীরজা কাঠের পুতুলের মতই নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যেন চেতনা ছিল না। চোখের সামনে এই যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, ইহা কি সত্য! যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দেখে, শিবপ্রিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া কানি দিয়া কড়ার আংটা ধরিয়া উনান হইতে ঝোলের কড়া নামাইতেছে। সে ছুটিয়া গিয়া ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

শিবপ্রিয়া তখন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সহজভাবেই সে বলিল, "দে ত ভাই ঐ কাঁশিখানা—ঝোলটা ঢেলে রাখি। কেমন, এই হয়েছে ত? দেখ, আর থাকলে ঝোলটা মরে একেবারে কাই হয়ে যাবে, না?"

যন্ত্র-চালিতের মত নীরজা কাঁশি আগাইয়া দিল। শিবপ্রিয়া কাঁশিতে ঝোল ঢালিয়া রাখিয়া খুন্তি দিয়া কড়া চাঁচিয়া ফেলিল; পরে কড়ায় জল

ব্যাপারের মূল! তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ত শিবপ্রিয়া কঠিন বচনের চাকাখানা ঘুরাইয়া দিয়াছে! আর সেই চাকা তাঁহাকে ও শ্রীপতিকে মাড়াইয়া পিষিয়া সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কতদিন পরে মেয়ে আসিল—কোথায় দুই দণ্ড তাহাকে কাছে রাখিয়া সুখ-দুঃখের দুইটা কথা কহিবেন, তাহার অবকাশমাত্র না দিয়া মেয়েটা বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পাঁচটা বাজে ছুতা খুঁজিয়া মার সঙ্গে কোঁদল বাধাইতেছে! মুখ টিপিয়া থাকিলে কি হয়, বৌয়ের হাড়ে ভেল্কি খেলে! তাই বৌয়ের উপর তাঁহার আক্রোশ সীমা ছাপাইয়া উঠিল। বৌকে অন্তরালে পাইলেই মনের জ্বালার বেশ দুই-চারিটা তীব্র ছিটা তিনি তাহার উপর নিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না।

নীরজা চোখের জল মুছিয়া ভাবিল, হায়, ঠাকুরঝি এ করিল কি! মধু পাইবার প্রত্যাশায় মধু-চক্রে খোঁচা দিয়া মধু ত পাওয়া গেলই না, এখন হুলের বিষে তাহার যে প্রাণ যাইবার জো হইয়াছে। মনে সুখ ত তাহার ছিলই না; স্বস্তি একটু ছিল! সে স্বস্তিটুকুও ঠাকুরঝি আজ দূর করিয়া দিতেছে! হায়, সে দুই দিনের লোক, দুই দিন পরেই দূরে চলিয়া যাইবে; কিন্তু সে বুঝিতেছে না, এ দুই দিনে সংসারটায় যে দারুণ ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়া যাইতেছে, সে ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়িয়া নীরজার পক্ষে টিঁকিয়া থাকা কতখানি কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে!

২

রান্নাঘরে মেয়ের গলার সাড়া পাইয়া মা পা টিপিয়া তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৌয়ের পানে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "ননদের সঙ্গে গানে-গল্পে ঝোল্‌টা শেষে পুড়িয়ে ফেলো না যেন! ও কোথায় দু দিনের জন্য এল বাপের বাড়ীতে জিরুতে, না, দিবা-রাত্তির ওকে ধরে ফুস্‌লোনো হচ্ছে! শেষে রান্নাঘরে এই উনুনের পাশে আগুন-তাতে অবধি ওকে টেনে আনা হয়েছে!"

নীরজা মাটির পানে চাহিয়া রহিল। শিবপ্রিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল, "ও কেন ডাকতে যাবে? আমি নিজে এসেছি। সকাল থেকে মানুষটা কিছু না খেয়ে রেঁধে সারা হচ্ছে,—কি খেলে না খেলে, সেদিকে কারও নজরই নেই—তাই ওর মুখে জোর করে একটু মোহনভোগ পুরে দিলুম।"

মা বলিলেন, "বড়লোকের মেয়ের মুখে বুঝি রুটি আর রোচে না!"

শিবপ্রিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা—!" সে স্বরে মা চমকিয়া থামিয়া গেলেন। শিবপ্রিয়া বলিল, "তুমি ওকে যা খুসী বকৃতে পারো, কেন না ও তোমার বৌ, এখন ওকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছ। কিন্তু তাই বলে ওর বাপের নামে খোঁটা দিয়ো না বলছি, খবর্দার! ও ভাল মানুষ, তাই চুপ করে সহ্য করছে! আমায় যদি কেউ এমনি করে আমার মরা বাপের নামে খোঁটা দিত, তাহলে আমি কি করতুম, জানো? নখে করে তাকে ছিঁড়ে ফেলতুম—তা সে আমার যত-বড় গুরুজনই হোক না কেন! স্বামী হলেও রেহাই দিতুম না।"

মেয়ের কথায় মা ভড়কাইয়া গেলেন। শিবপ্রিয়ার চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছিল—রাগে সর্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মা বলিলেন, "এখন আয় বাপু—রান্নাঘর থেকে চলে আয়—তোর মাথা গরম হয়ে উঠেছে। এখনই আবার ফিট্-টিট হয়ে পড়বে! কত করে ত ফিট বন্ধ হয়েছে—আয়, চলে আয়।" মা মেয়ের হাত ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিলেন।

শিবপ্রিয়া কহিল, "না, আমি যাব না। ছাড়ো আমায়। আমি আজ রাঁধব—বৌকে রাঁধতে দেব না। তুমি যাও। আমায় রাগিয়ো না, বলছি, —তাহলে অনর্থ বাধবে!"

মা ভয়ে সরিয়া গেলেন। যাইবার সময় বৌয়ের পানে যে দৃষ্টি হানিয়া গেলেন, তাহাতে যেন আগুন ঠিকরিয়া বাহির হইতেছিল।

নীরজা কাঠের পুতুলের মতই নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যেন চেতনা ছিল না। চোখের সামনে এই যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, ইহা কি সত্য! যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দেখে, শিবপ্রিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া কানি দিয়া কড়ার আংটা ধরিয়া উনান হইতে ঝোলের কড়া নামাইতেছে। সে ছুটিয়া গিয়া ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

শিবপ্রিয়া তখন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সহজভাবেই সে বলিল, "দে ত ভাই ঐ কাঁশিখানা—ঝোলটা ঢেলে রাখি। কেমন, এই হয়েছে ত? দেখ, আর থাকলে ঝোলটা মরে একেবারে কাই হয়ে যাবে, না?"

যন্ত্র-চালিতের মত নীরজা কাঁশি আগাইয়া দিল। শিবপ্রিয়া কাঁশিতে ঝোল ঢালিয়া রাখিয়া খুন্তি দিয়া কড়া চাঁচিয়া ফেলিল; পরে কড়ায় জল

ঢালিয়া ভিজা ন্যাতা দিয়া কড়ার গা রগড়াইয়া জলটা বাহিরে নর্দমার ধারে ঢালিয়া আসিয়া কহিল, "এই কড়াতেই অম্বলটা চড়িয়ে দি, তাহলে—কেমন? তুই ভাই মশলাটা ঠিক করে দে। আমি ততক্ষণে চাল্‌তা কটা ছেঁচে নি।"

৩

কড়ারের তখনও কয়দিন বাকী ছিল, শিবপ্রিয়ার শাশুড়ী লিখিয়া পাঠাইলেন, হঠাৎ তাঁহার গৃহে তাহার এক দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপস্থিত; বীরেন যাইয়া কাল শিবপ্রিয়াকে লইয়া আসিবে। শিবপ্রিয়ার মনটা অস্থির হইয়া উঠিল। সে নীরজার পানে চাহিল। নীরজার মুখে-চোখে করুণ বেদনার একটা ছায়া পড়িয়াছিল। ঠাকুরঝি চলিয়া যাইবে! হায়, স্নেহের দেওয়াল তুলিয়া এই যে কঠিন বাক্য ও মিথ্যা তিরস্কারের হাত হইতে এতদিন তাহাকে সে আগুলিয়া রাখিয়াছিল—সে দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ঠাকুরঝি চলিয়া গেলে বাহিরের রুদ্র গর্জন নিমেষে যে তাহাকে দ্বিগুণ প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিবে। এখন সেগুলার আক্রোশ যে ভীষণতর হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না! হায়, কেন সে আসিল—কেন সে এমনভাবে ঘাঁটাইয়া শাশুড়ীর চিত্তের আগুনটাকে এতখানি গাঢ় তীব্র করিয়া দিল! এখন তাহার উপায়!

শিবপ্রিয়াও ঠিক এই কথাটা ভাবিতেছিল। সে ভাবিল, রুদ্র ভাব ধরিয়া সে ভাল করে নাই; শান্তভাবে কথাগুলা পাড়িয়া গৃহে শান্তি আনিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় কিছু ফল হইত। তাহার অনুপস্থিতিতে নীরজার অসহায় ভাব কল্পনা করিয়া সে ব্যথিত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, দাদাকে একবার পাইলে হয়, নরম কথায় তাহাকে একবার সে বুঝাইয়া দেখিবে! কিন্তু শ্রীপতি আজ কয়দিন আর বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াইবারও অবকাশ পায় নাই!

কাল সকালে বীরেন আসিয়া শিবপ্রিয়াকে লইয়া যাইবে। মেয়ে চলিয়া যাইবে, মা তাই পূর্বরাত্রে তাহার ভোজনের জন্য একটু বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। অনেক রাত্রে সংসারের লেঠা চুকাইয়া নীরজা যখন শুইতে আসিল, তখন তাহার মাথাটা খুবই ধরিয়া উঠিয়াছে। শিবপ্রিয়া আসিয়া কহিল, "আজ আমি তোর কাছে শোব, ভাই—" শিবপ্রিয়া বিছানায় পড়িয়া

নীরজাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। সে চমকিয়া উঠিল। এ কি, গা যে তাহার পুড়িয়া যাইতেছে! শিবপ্রিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া কহিল, "তোর যে জ্বর হয়েছে, বৌ!" পরে তাহার কপালে হাত দিয়া কহিল, "না—বেশ জ্বর! গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে! আর এই জ্বরে আগুন-তাতে সারাক্ষণ বসে সব তুই করলি কর্মালি! তাই বুঝি আমাকে আজ ওধারে আর ঘেঁসতেও দিলিনি? বললি, না ভাই, কাল তুমি চলে যাবে, মার কাছে আজ থাকোগে! আমিও যেমন নেকী, কিছু বুঝলুম না!"

শিবপ্রিয়া উঠিয়া মার ঘরে গেল, ডাকিল, "মা—"

মা তখন মনে মনে জ্বলিতেছিলেন। আহারের এতখানি আয়োজন করা গেল, তা শ্রীপতি তাহার কিছুই মুখে দিল না! সাধে কি শিবপ্রিয়া এত কথা শুনাইয়া দেয়! কেন বাপু, তুই ঘরের ছেলে, তোর এমন রাগ করিয়া বাহিরে পড়িয়া থাকা কেন! যুক্তি-তর্কের পর রাগটা পড়িল, বৌয়ের উপর! সেই সর্বনাশীই ত যত নষ্টের মূল! এমন বৌকে বিদায় করিলেই না হাড়ে বাতাস লাগে।

মেয়ের ডাক শুনিয়া মা কহিলেন, "আয়, শুবি আয়।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "শোবার কথা হচ্ছে না। বৌয়েব খুব জ্বর হয়েছে! এখনই কাউকে একজন ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।"

আবার সেই বৌয়ের হইয়া ওকালতি! মা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "হাঁ, দেউড়ীতে আমার পাঁচটা পাইক-বরকন্দাজ বসে আছে—এই যে এতেলা পাঠাই।"

শিবপ্রিয়া মুহূর্তে কঠিন হইয়া উঠিল। এই সে একটু পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কঠিন হইবে না। কিন্তু উপায় নাই! সে কহিল, "আর তোমার ছেলের কি মেয়ের যদি অসুখ করত আজ?"

সে কথার জবাব না দিয়া মা পাশ ফিরিয়া শুইলেন, কহিলেন, "যা তোর খুসী হয়, কর্‌গে না, বাছা। সারাদিন পরে ঘুমিয়ে যে একটু আরাম পাব, তারও জো নেই!"

শিবপ্রিয়া নিরাশ নিরুপায় চিত্তে নীরজার ঘরে ফিরিয়া আসিল; বাক্স হইতে অডিকলোনের শিশি বাহির করিয়া তাহাতে রুমাল ভিজাইয়া নীরজার কপালে পটি আঁটিয়া দিল। সারারাত্রি জাগিয়া বসিয়া সে নীরজার শুশ্রূষা

কম্বিল। নীরজা কতবার কহিল, "ও কি ভাই ঠাকুরঝি, অত কেন? আমি ত বেশ আছি, তুমি ঘুমোও—"

ভোরের দিকে নীরজা জ্বরের ঘোরে কেমন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। শিবপ্রিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। এ বাড়ীর কাহারও কাছে কোন সাহায্য পাইবে না সে। বীরেন আসিলে যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবে ভাবিয়া বীরেনের আশাপথ চাহিয়াই সে নীরজার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

সকালে মা আসিয়া ঘরের দ্বারে উঁকি পাড়িলেন। মা হাঁকিলেন, "এখনও নবাব-পুত্রীর ঘুম ভাঙ্‌ল না! আজ বীরেন আসছে, খাবার-দাবারের একটু উদ্‌যোগ-সুদ্‌যোগ করতে হবে, তা হুঁসই নেই।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "তোমার ভয় নেই মা। এ বাড়ীতে সে জলগ্রহণও করবে না—তার ব্যবস্থাও আমি করব'খন। তোমার কোন ভাবনা নেই, তুমি ঘুমোওগে যাও।"

মেয়ের মুখের কাছে মা দাঁড়াইতে পারিতেন না। অগত্যা তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

৪

যথাসময়ে বীরেন আসিয়া বাহিরে হাঁকিল, "দাদা—"

শিবপ্রিয়া ঝিকে কহিল, "তোর জামাইবাবু এসেছে রে। এইখানে ডেকে নিয়ে আয় ত—"

বীরেন আসিলে শিবপ্রিয়া কহিল, "তোমার গাড়ী আছে, এখনই একজন ডাক্তার ডেকে আনো। বৌয়ের কাল রাত্তির থেকে খুব জ্বর!"

বীরেন আসিয়াই এ ভাব দেখিয়া কেমন ভড়কাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল।

ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "বড় সুবিধে মনে হচ্ছে না। টাইফয়েড হতে পারে বলেই আশঙ্কা হচ্ছে। আজ তিন-চারদিন থেকে বোধ হয় জ্বরটা হয়েছে?" ডাক্তার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বীরেনের পানে চাহিল।

শিবপ্রিয়ার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। ঘোমটার অন্তরাল হইতে মৃদু স্বরে সে কহিল, "কাল রাত্রে আমরা জ্বর জানতে পেরেছি।"

প্রেসক্রপ্সন লিখিয়া ভিজিটের টাকা পকেটে পুরিয়া ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলে শিবপ্রিয়া কহিল, "আমায় নিতে এসেছ বুঝি ?"

বীরেন কহিল, "হঁ্যা। সরোর ছেলের ভাত হবে কাল। মা কিছু লেখেন নি ?"

শিবপ্রিয়া কহিল, "লিখেছেন, কিন্তু কি করে যাই, বল! আমি গেলে বৌটা বিনা চিকিৎসাতেই মারা যাবে। যা ওর যত্ন-আত্তি! এসব জানলে এ বাড়ীতে আমি এবার পা দিতুমই না মোটে।"

বীরেন কহিল, "তোমার দাদা কোথায় ?"

শিবপ্রিয়া কিছু বলিতে পারিল না। বলিতে লজ্জা হইল যে, দাদার গুণের সীমা নাই! স্বামী-সৌভাগ্য পূর্ণ মাত্রায় যে লাভ করিয়াছে, সে-ই জানে, এ কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও কতখানি বাধে! অনুমানে বীরেন ব্যাপার কতক বুঝিল। সে কহিল, "বাড়ীতে সে ফিরবে কখন ?"

শিবপ্রিয়া কহিল, "সে-ই জানে। আজ ক'দিন ত চুলের টিকিও দেখতে পাচ্ছি না। তা যাক, তুমি ত সব দেখলে। গিয়ে মাকে বলো, এ অবস্থায় কেমন করে আমি যাই! ঠাকুরঝিকেও দুঃখ করতে বারণ করো। দেখে ত যাচ্ছ! বলো, নেহাৎ নিরুপায়!"

বীরেন কহিল, "তা ত দেখছিই। এ অবস্থায় কেমন করেই বা তোমায় নিয়ে যাই! মোদ্দা ডাক্তার ডাকা, হাঙ্গাম পোহানো, তুমি এ সব পারবে কি ? রোগটাও ত সহজ নয়, বিশেষ তোমার শরীরে যদি না সহ্য হয়—"

শিবপ্রিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল, "সে ভাবনা তোমার নেই! তোমায় আবার ফিরে লগ্ন দেখতে হবে না।"

বীরেন কহিল, "তা বুঝি। কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। তুমি মেয়েমানুষ, সামলাতে পারবে কেন ? তার চেয়ে আমি গিয়ে বরং সনাতনকে পাঠিয়ে দি।"

শিবপ্রিয়া আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "তাহলে ত ভালই হয়। তবে এ রোগের বাড়ীতে তার খাওয়া-দাওয়া দেখবার সুবিধে হবে না কিন্তু!"

বীরেন কহিল, "সে তার ব্যবস্থা করে নেবে'খন। সে ত আঁর এখানে কুটুম্বিতে করতে আসছে না। আমি তার ব্যবস্থাও করে দেব।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "তাহলে তুমি যাও। গিয়ে যা দেখলে, মাকে বলো।"

বীরেন কহিল, "মার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "দেখা করতে চাও, দেখা করগে। আমায় আর বকিয়ো না।"

বীরেন গিয়া শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শাশুড়ী আনন্দে সারা হইয়া উঠিলেন। বড়মানুষ জামাই "মা" বলিয়া ডাকিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট! তাহার উপর আবার প্রণাম! শাশুড়ী কহিলেন, "রান্না এখনই চাপিয়ে দিচ্ছি। দুটি খেয়ে যাও, বাবা।"

বীরেন কহিল, "না মা, তার জন্য ভাববেন না। বৌদি সারুক, এসে ওরই হাতে একদিন তখন খেয়ে যাব। আমার এখন ঢের কাজ, দাঁড়াবার সময় নেই।"

বীরেন চলিয়া গেল। শাশুড়ী বুঝিলেন, এ শিবপ্রিয়ারই কাজ! সে-ই জামাতাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছে যে,—এখানে আহার করিয়ো না! নিশ্চয়! কিন্তু কেন এ নিষেধ! ইহারও মূলে ঐ বৌ! তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। এমন সর্বনাশীকেও তিনি ঘরে আনিয়াছিলেন যে, মুহূর্ত শান্তি নাই! ইহারই জন্য ছেলে তাঁহার ঘর ছাড়িয়া গেল, মেয়ের মুখ সদাই অপ্রসন্ন! শুধু অপ্রসন্ন! মার উপর মেয়ের মন একেবারে তাতিয়া রহিয়াছে। তিনি ফুঁসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, বৌয়ের যদি এখন ঘটনাক্রমে একটা ভাল-মন্দ কিছু ঘটিয়া যায়, তবেই মঙ্গল! নিজের ছেলে ও মেয়েকে আবার তিনি ফিরাইয়া পাইবেন! আহা, তেমন দিন কি হইবে!

বিশ্বের ভগবান বুঝি এ প্রার্থনা শুনিয়া সে দিন শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন!

৫

চারদিন জ্বর-ভোগের পর সেদিন দুপুর বেলায় নীরজা চোখ মেলিয়া ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

তাহার হাত দুইটা শিবপ্রিয়ার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল। সনাতন আসিয়া ঘরের বাহিরে ডাকিল, "বৌমা—"

শিবপ্রিয়া কহিল, "কেন বাবা?"

"হোয়েটুকু এনেছি মা। খাওয়াতে পারবে?"

শিবপ্রিয়া উঠিয়া গিয়া ক্যাপ্ লইয়া আসিল, নীরজাকে ডাকিল, "বৌ—"

নীরজা ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল, "কেন ভাই ?"

"এইটুকু খেয়ে নাও—"

"আর কেন ঠাকুরঝি ?" নীরজার চোখের কোলে জল গড়াইয়া পড়িল।

শিবপ্রিয়া আঁচল দিয়া সে অশ্রু মুছিয়া লইল। পরে হোয়ের ক্যাপ্ নীরজার মুখে ধরিয়া কহিল, "এটুকু খাও, ভাই।"

নীরজা আপত্তি না করিয়া পান করিল; কহিল, "ঠাকুরঝি, তোমার ভাই বড় কষ্ট হচ্ছে।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "এখন সে কষ্টটুকু সার্থক কর দেখি—"

নীরজা কিছু বলিল না, উদাস ম্লান নেত্রে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। শিবপ্রিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছিল। দৃষ্টি তাহার নীরজার মুখের পানে। যে মুখ এত দুঃখেও সর্বক্ষণ সে হাসি-ভরা দেখিত, সে মুখ আজ বাসি ফুলের মতই শুষ্ক মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার কপালের উপর দুই-চারিগাছি কেশের গুচ্ছ উড়িয়া পড়িয়াছিল। রেশমের মতই কোমল কেশ! সেগুলা হাত দিয়া সরাইয়া নীরজার মুখের কাছে মুখ আনিয়া শিবপ্রিয়া কহিল, "কি ভাবছ ?"

নীরজার চোখ জলে ভরিয়া ছিল; বাহিরের এই করুণ সমবেদনা-মাখা প্রশ্নের ঘা খাইয়া মুহূর্তে তাহা ঝরিয়া পড়িল। নীরজা বালিশে চোখ মুছিয়া ডাকিল, "ঠাকুরঝি—" তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

শিবপ্রিয়া কহিল, "কি ভাবছ, বল।"

একটা তীব্র নিশ্বাস ফেলিয়া নীরজা কহিল, "আজও বাড়ী আসেননি ? আমার জন্যে শেষ বাড়ী আসা ছেড়ে দিলেন ?"

শিবপ্রিয়ার বুকের ভিতরে একটা ভীষণ বেদনা ঠেলিয়া উঠিল। সে কহিল, "দাঁড়া, তোর বুঝি ভাগ্যি ফিরেছে। একটু আগে যেন দাদার গলার সাড়া পেলুম।"

নীরজাও সেই সাড়া পাইয়াছিল—তাই সে চোখ খুলিয়াছে!

শিবপ্রিয়া বাহিরে গেল। দালানে বসিয়া শ্রীপতি তেল মাখিতেছিল। মা নিকটে দাঁড়াইয়া। শিবপ্রিয়া গিয়া সহজ স্বরে ডাকিল, "দাদা—"

শ্রীপতি ভগ্নীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু গলার স্বরে আশ্বস্ত হইল। সে কহিল, "কি বলছিস্, শিবু ?"

শিবপ্রিয়া কহিল, "তোমার চান হয়ে গেলে একবার এ ঘরে এসো। বৌয়ের বড় অসুখ—"

মা কহিলেন, "অসুখ, তা ও গিয়ে কি করবে? ও কি ডাক্তার?"

শিবপ্রিয়া সে কথা কানে না তুলিয়াই কহিল, "তোমায় একবারটি সে দেখতে চায়। মেয়েমানুষের মন, বোঝে না, কি করবে বল! তবে ভয় নেই, তোমাদের হাড়ে বাতাস লাগবে শীগ্‌গির—তারই সে বন্দোবস্ত করেছে এবার!"

মা বলিলেন, "তোর আস্কারাতেই ত ওর এত বাড় হয়েছে! নাহলে অসুখের ভান করে এতখানি ঘটা বাধাতে পারত!"

শিবপ্রিয়া কোন কথা বলিল না। তাহার মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছিল, ইচ্ছা থাকিলে সে আগুনে এখনই সে সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে ইচ্ছাও আজ ছিল না। তাই সে আবার শ্রীপতিকে কহিল, "চান করে এসো একবার, দাদা, লক্ষ্মীটি! নাহলে একটা মানুষকে চিরদিনের মনস্তাপ নিয়ে চলে যেতে হয়। তুমিও মানুষ ত, এটুকু মনে রেখো!"

শিবপ্রিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কথার যে প্রচ্ছন্ন হুলটুকু সে শ্রীপতির মনে ফুটাইয়া দিয়া গেল, বহুক্ষণ ধরিয়াই তাহা শ্রীপতির মনে খচ্‌-খচ্‌ করিতে লাগিল। স্নান সারিয়া সে আহারে বসিল। মা সম্মুখে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। মা কহিলেন, "এবার শিবুকে পেয়ে এমন সোহাগ হয়েছে যে, দেখে আর বাঁচি না। মেয়েটাকে একেবারেই পর করে দিলে। আমার কাছে ঘেঁস দিতেই চায় না মেয়ে! ছেলের শোধ মেয়ের উপর দিয়ে নিলে। কি অশুভ ক্ষণেই যে শিবু আমার এবার শ্বশুরবাড়ী থেকে পা বাড়িয়েছিল!"

আহার করিতে করিতে শ্রীপতি ভাবিল, আহার সারিয়া একবার সে নীরজাকে দেখিয়া আসিবে। তবে দেখা হইলে কি বলিবে, ইহাই মহা ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বিধাতা তাহাকে সে দায় হইতে খুব রক্ষা করিলেন। আহার সারিয়া সে মুখ ধুইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, যতীশবাবু গাড়ী লইয়া হাজির—তাঁহার বাগানে আজ ভারী ধুম! কাজেই আর বসা বা নীরজার সহিত দেখা করা ঘটিয়া উঠিল না। ডিবা-ভরা পান পকেটে ফেলিয়া সাজিয়া-গুজিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

দাদার কাণ্ড দেখিয়া শিবপ্রিয়া ঘরের মধ্যে গর্জাইতেছিল। এই ভাইয়ের বোন্ সে! ধিক তাহাকে!

মা আসিয়া ডাকিলেন, "শিবু, খাবি আয়।"

শিবপ্রিয়া বর্তাইয়া গেল। মনের ঝাল কতকটা এবার সে মিটাইতে পাইবে! মার উপর তর্জন করিয়া সে কহিল, "আমার ভাত একধারে ঠেলে রেখে তুমি ক্ষুধা-নিবৃত্তি কর গে। আমার জন্য এ-বাড়ীর কাকেও ভাবতে হবে না।"

"পরের বৌকে ঘরে এনে এ কি দায়ে পড়লুম গা—" বলিতে বলিতে মা চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, বৌটাকে ধরিয়া দুই হাতে যদি তাহাকে একবার পিটিতে পারিতেন, তবেই বুঝি এ প্রাণের জ্বালা কতক জুড়াইত!

শাশুড়ী ও ননদের কথা নীরজা সকলই শুনিল। শাশুড়ী চলিয়া গেলে শিবপ্রিয়াকে সে কহিল, "তুমি যাও ঠাকুরঝি, খেয়ে নাওগে। আমি ত বেশ আছি, এখন যাও ভাই।"

শিবপ্রিয়া কিছু বলিল না! রাগে সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। নীরজা আবার কহিল, "যাও না ভাই, খেয়ে এসোগে—"

নীরজার মাথায় আইস্‌ব্যাগ চাপিয়া শিবপ্রিয়া কহিল, "এ বাড়ীতে জলগ্রহণ করতে বল তুমি—?"

নীরজা এ কথায় বড় আরাম বোধ করিল না। সে কহিল, "যে কটা দিন আর আছি ভাই, একটু শান্তিতে কাটতে দাও! আমাকে নিয়ে এ খেচাখেচি—"

শিবপ্রিয়া বুঝিল, নীরজার প্রাণের কোন্‌খান্‌টায় কি ব্যথা বাজিতেছে। সে কহিল, "তুই সেরে ওঠ্ ভাই, প্রাতর্বাক্যে কামনা করছি, তুই সেরে ওঠ্! তারপর আমি তোকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। দেখি, কে তাতে বাধা দেয়! যদি আজ তোর মা বেঁচে থাকতেন ত যেমন করে পারতুম, তোকে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম—"

"তাই দাও ভাই—আমার মার হাতেই আমাকে তুলে দাও। আমারও আর সহ্য হয় না।"

শিবপ্রিয়া দেখিল, এ কথাগুলা তোলা ঠিক হয় নাই। রোগীর উত্তেজনা ইহাতে বাড়িতে পারে। তাই সে কহিল, "তুমি তা হলে চুপ করে শুয়ে

থাকো। বরফের ব্যাগ মাথায় চাপানো থাক্—আমি চট্ করে মুখে কিছু দিয়ে আসি, কেমন ?"

"হাঁ, তুমি যাও। ভয় নেই। এর মধ্যে আমি মরে যাব না।" বলিয়া নীরজা হাসিল। শিবপ্রিয়া চোখ চাহিয়া সে হাসি দেখিল। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এ হাসি,—সেই দীপ নিবিবার পূর্বে যেমন একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনই যে! মনে মনে মা-কালীকে ডাকিয়া নীরজার রোগ-পাণ্ডু মুখে সে একবার হাত বুলাইল। এ স্পর্শে সব গ্লানি তার মুছিয়া যাক্! তারপর বাক্স হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া নীরজার মাথায় ছোঁয়াইয়া সেটিকে আঁচলে বাঁধিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

সেদিন শেষরাত্রে নীরজা কেমন অস্থির হইয়া পড়িল। চোখের চাহনিও কেমন এলোমেলো। বিছানায় পড়িয়া সে ছটফট করিতেছিল। ভিতর হইতে কেমন একটা জালা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে।

শিবপ্রিয়া তাহারই বালিশে মাথা রাখিয়া সবে-মাত্র একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কাতর কণ্ঠে নীরজা ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

শিবপ্রিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। ঘরের কোণে বাতিটা জ্বলিয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে। সে ক্ষীণ আলোকে শিবপ্রিয়া চাহিয়া দেখে, নীরজার মুখে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। বুঝি এ মৃত্যুর করাল ছায়া! তাড়াতাড়ি আর একটা বাতি জ্বালিয়া সে ঘরের বাহিরে আসিল, ডাকিল, "সনাতন—"

সনাতন বাহিরের দালানে পড়িয়া একটু গড়াইয়া লইতেছিল; কহিল, "কেন মা ?"

"শীগ্গির একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাও, তাঁকে ডেকে আনো, বাবা—অবস্থা আমি ভাল বুঝছি না!" সনাতন উঠিয়া ডাক্তারের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

শিবপ্রিয়া আসিয়া মালিশ, পথ্য প্রভৃতির নানা আয়োজন বাধাইয়া তুলিল। কিন্তু হায়, নিবানো দীপে তৈল দিয়া আর কি ফল! ভিতর হইতে পুড়িয়া জীবন তাহার পূর্ব হইতেই যে ছাই হইয়া গিয়াছে, বাহিরের

কাঠামোটা কোনমতে খাড়া আছে বৈ ত না! আজ এ রোগের প্রবল ধাক্কায় বুঝি সে কাঠামোখানাকেও আর বজায় রাখা যায় না! শিবপ্রিয়া কাঁদিয়া ফেলিল অসহায় দুর্বল নারী সে,—তাহার এমন কি সাধ্য আছে যে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এই অবহেলিতা উপেক্ষিতা প্রাণীটিকে তাহার গ্রাস হইতে সে ছিনাইয়া লয়।

সহসা রোগীর ঠোঁট নড়িল—ভিতর হইতে মিনতির সে যেন এক করুণ অস্ফুট আবেদন! নীরজার শুষ্ক ওষ্ঠে শিবপ্রিয়া এক চামচ বেদানার রস ঢালিয়া দিল—নীরজা সাগ্রহে তাহা পান করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে অতি ধীরে সে চোখের পাতা মেলিল; দুই হাতে হাতড়াইয়া কিসের যেন সন্ধান করিল! হায় রে, পাথেয় যে তাহার বহুকাল হারাইয়া গিয়াছে! কি সম্বল লইয়া এখন এ দীর্ঘ পথে সে যাত্রা করে!

শিবপ্রিয়া ঔষধ ঢালিয়া নীরজাকে পান করাইল। নীরজা কহিল, "আঃ—" পরে শিবপ্রিয়ার পানে স্থির দৃষ্টিতে সে চাহিল। শিবপ্রিয়া আদর করিয়া দুই হাতে তাহার মুখখানি ধরিয়া চুম্বন করিল, কহিল, "কি চাচ্ছ, ভাই, বল?"

নীরজা কোন কথা বলিতে পারিল না—তাহার দুই চোখ বহিয়া শুধু ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সারা জীবনের উপেক্ষার বেদনা আজ এ কাতর অশ্রুর মধ্য দিয়া অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িয়াছে! শিবপ্রিয়া ভাবিল, হায় বোন, এতদিন যদি নীরবে সব সহিয়া আসিলি,—আপনার তেজে এ উপেক্ষা গ্রাহ্যও করিলি না, তবে এ নিদান-সময়ে কিসের জন্য এ দুবলতা! সে দুর্বলতা আর কেনই বা দেখাস দিদি! তোর পানে কেহই যখন চাহিয়া দেখিল না, তখন তুইই বা কাহার জন্য আজ এতখানি কাতর হইতেছিস্!

ডাক্তার আসিয়া ইঞ্জেকসন দিলেন। কিছুক্ষণ পরে রোগী যেন একটু শক্তি পাইল। ডাক্তার বাহিরে বসিয়া রহিলেন—শিবপ্রিয়া তাঁহার দুই পা জড়াইয়া কাঁদিয়া কহিল, "আপনি আজ দয়া করে থাকুন—যত টাকা চান, দেব—" তারপর সে সনাতনকে কহিল, "তোমার বাবুকে একবার শীগগির ডেকে নিয়ে এসো, সনাতন। গাড়ী করে ছুটে যাও। বলগে, বড় বিপদ এখানে!" সনাতন বীরেনের উদ্দেশে ছুটিল।

নীরজা আর একবার কথা কহিল, "ঠাকুরঝি—"

শিবপ্রিয়া বর্তাইয়া গেল। তবে এ ধাক্কা কাটিল বুঝি! সে কহিল, "বল্, তোর যা কিছু বলবার আছে, সব খুলে বল্। আমি এই তোকে আগ্‌লে বসে রইলুম। দেখি, আমার কাছ থেকে কে আজ তোকে ছিনিয়ে নেয়!"

সতীর মুখে তেজের একটা দৃপ্ত রেখা ফুটিয়া উঠিল। একবার সে কোন্ যুগে সতীর মুখে এমনই তেজ দেখিয়া যমের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল! আজও এ-যেন রাজেন্দ্রাণী জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে আর এক সতী নীরজাকে রক্ষা করিবার জন্য বুক দিয়া দাঁড়াইয়াছে! দুর্জয় তেজে প্রাণ তাহার বলীয়ান হইয়া উঠিল।

নীরজা অতি-কষ্টে থামিয়া থামিয়া কহিল, "সতী-লক্ষ্মী তুমি, আশীর্বাদ কর, ফিরে জন্মে যেন তোমার মত বরাত নিয়ে পৃথিবীতে আসি—এ বড় কষ্ট ভাই, সওয়া যায় না।"

হায়রে, তবু সে সকলই সহিয়া আসিয়াছে! আর কাহারও প্রাণ হইলে কবে বুঝি ভাঙ্গিয়া যাইত—কিন্তু এ যে নারীর প্রাণ, বড কঠিন! সব সয়, ভাঙ্গিতে জানে না!

কিন্তু তবু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। নীরজার প্রাণ সে সীমার একেবারে কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকেও আর ধরিয়া রাখা গেল না। সেদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে ঘরে যখন মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, ঠিক সেই সময় তাহার সকল অকল্যাণ হইতে নীরজা মুক্তি লাভ করিল। সংসার তাহাকে বিদায় দিয়া আঁধারে ভরিয়া গেল।

৭

শাশুড়ী জামাতার কাছে মিনতি জানাইয়া শিবপ্রিয়াকে আরও কয়দিন আপনার গৃহে ধরিয়া রাখিল; কিন্তু মা ও মেয়ের মধ্যে কথা ছিল না। শত সাধ্য সাধনা করিয়াও মেয়ের মুখে মা একটু জল অবধি দেওয়াইতে পারিলেন না। তাঁহার তখন আশঙ্কা হইল, পরের মেয়ের প্রতি যে পাপ করিয়াছেন, তাহার ফলে বুঝি আজ নিজের মেয়েটিকে হারাইতে হয়! তাই তিনি সনাতনকে কহিলেন, "তুমি ভাই বীরেনকে খবর দাও—সে এসে ওকে নিয়ে যাক্। না হলে দেখছ ত, এখানে রাখলে ওকে বাঁচানো যাবে না!"

সনাতন অগত্যা বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল।

বহুদিন পরে শ্রীপতিও আজ ঘরে ফিরিয়াছিল। বাড়ীতে পা দিয়াই সে বুঝিল, সেখানে মস্ত একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। সারা বাড়ীটা যেন আজ তাহাকে গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে! নীরজার প্রতি তাহার একটা আন্তরিক টান না থাকিলেও বাড়ীটা আজ তাহার কাছে নিতান্তই শূন্য বোধ হইতে লাগিল। সব থাকিলেও যেন আজ কিছু নাই, এমনই ভাবখানা বাড়ীটার প্রত্যেক ইষ্টক-খণ্ডে, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটাতে অবধি লাগিয়া রহিয়াছে। বাড়ীতে যেন এক মুহূর্ত তিষ্ঠানো যায় না!

যা যাক্, বাড়ীর প্রতি কোন দিনই তাহার মায়া ছিল না—আজও নূতন করিয়া মায়া পড়িল না। তবে আজ মার কাছে প্রয়োজন ছিল; গোটাকয়েক টাকা চাই—বাগানের আমোদে এ-দফায় তাহারই উপর খরচের ভার পড়িয়াছে। না দিলে মান থাকে না। সেই টাকা কয়টা লইয়া কোনমতে এখন সরিয়া পড়িতে পারিলেই সে বাঁচিয়া যায়।

ভিতরে পা দিতেই মা ছেলেকে দেখিয়া শোকে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ছেলে আসিয়া মার কাছে বসিল—মা তখন সপ্তমে সুর চড়াইলেন! শিবপ্রিয়া ব্যাপার বুঝিবার জন্য সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে আজ কোন কথা নাই, দৃষ্টি স্থির, মূর্তি রুক্ষ! কে যেন পাথরে খোদা প্রাণহীন একটা পুতুলকে আনিয়া সেখানে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে! উপেক্ষিতা নীরজার স্মৃতির মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তপশ্চারিণী সর্বত্যাগিনীর মতই একটা ভাব তাহার মুখে-চোখে আঁটিয়া গিয়াছে!

কাঁদিতে কাঁদিতে ইনাইয়া বিনাইয়া মা কহিলেন, শূন্য গৃহ পাষাণের মতই তাঁহার বুকে বসিতেছে! পুত্রের এ লক্ষ্মীছাড়া দীন বেশও তিনি আর চক্ষে দেখিতে পারেন না! ও পাড়ার পার্বতী একটি মেয়ের কথা বলিতেছিল—পুত্রের কোন আপত্তিই তিনি কানে তুলিবেন না!

শিবপ্রিয়ার সারা অঙ্গ বহিয়া বিদ্যুতের একটা তীব্র দাহ ছুটিল। তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তবু ঝড় আসন্ন দেখিয়াও জীর্ণ গৃহের অধিবাসী যেমন আকাশের পানে হতবুদ্ধিভাবে চাহিয়া থাকে, তেমনই ভাবে মা ও ভাইয়ের পানে সে চাহিয়া রহিল—চোখ পলকহীন, অচঞ্চল!

শ্রীপতি বুঝিল, টাকা-আদায়ের চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে। নত

মুখে গাঢ়স্বরে সে কহিল, "তোমার কথা আমি কবে ঠেলেছি মা, বল—"

দুইখানা চঞ্চল মেঘে ঠোকাঠুকি হইলে অশনি যেমন গর্জিয়া উঠে, শিবপ্রিয়া ঠিক তেমনই ভাবে গর্জিয়া উঠিল। সে ডাকিল, "সনাতন—"

কয়দিনের রুদ্ধ বাণী নিমেষে যেন এক প্রলয়-হুঙ্কারে মুক্ত হইয়া গেল। মাতা-পুত্র উভয়েই সে স্বরে শিহরিয়া শিবপ্রিয়ার পানে চাহিলেন।

সে স্বরে চমকিয়া প্রভু-গৃহ-গমনোদ্যত সনাতন আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল—চাহিয়া দেখিল, মার কি এ করালিনী মূর্তি! চোখে যেন প্রলয়ের আগুন জ্বলিতেছে!

শিবপ্রিয়া কহিল, "সনাতন, এখনই গাড়ী নিয়ে এসো। আমি চলে যাব, এখনই চলে যাব। এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্তও থাকব না। এ বাড়ীতে যদি আর কখনও জলগ্রহণ করি ত আমি বাপের বেটী নই!"

কথাটা বলিয়া বিদ্যুতের মতই সেখান হইতে সে সরিয়া গেল। মা ও শ্রীপতি বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

প্রবাসী : ১৩২০

বেলোয়ারী টোপ

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

ঢেঁকির উপর বসিয়া চা খাইতেছিলাম।

চা জিনিসটা অপবিত্র, ম্লেচ্ছের খাদ্য, খাওয়াটা ম্লেচ্ছাচরণ এবং তৈরী চা অস্পৃশ্য জিনিস এই হৃদয়বিদারক নিদারুণ মিথ্যা অপবাদ দিয়া পিসিমা তাহাকে বাড়ী হইতে একেবারে বাহির করিয়া দিতে প্রাণপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার শ্লেষ্মা বৃদ্ধির ভয়ে নিতান্তই সে অসাধ্য সাধন করিতে না পারিয়া তাহাকে সরঞ্জাম সহ পঞ্চাশ হাত দূরবর্তী ঢেঁকিশালায় নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন। উপকরণ—চা, চিনি, দুধ, জল স্বতন্ত্র ভাবে যেখানে সেখানে

রাখো, তাহাতে পিসিমার আপত্তি নাই, কিন্তু ঐ দ্রব্যগুলি মিশাইয়া সজল ও উষ্ণ করিয়া তুলিলেই সেটা 'খৃষ্টানী কাণ্ড'। নেহাৎ লাথি সহ্য করিতে হয় বলিয়াই বোধ করি পিসিমার হিন্দু ঢেঁকি আমার এই খৃষ্টানী কাণ্ডটা নীরবে সহ্য করিত; সে ক্রুদ্ধ হইয়া লেজ তুলিয়া গা-ঝাড়া দিলেই আমি আস্তাকুঁড়ে যাইয়া পড়িতাম।

যাই হোক, চা খাইতেছিলাম। সম্মুখের উঠানে বসিয়া পিরুদাস একদৃষ্টে বাছুরের ঘাস খাওয়া দেখিতেছিল। আমি তাহাকে সকৌতুকে প্রশ্ন করিলাম,—আচ্ছা, পিরু, আমাদের এই গ্রামের নাম পোড়াবৌ হ'ল কেন? এমন সব ভাল ভাল নাম থাক্‌তে কিনা পোড়াবৌ!—কাঞ্চনপুর, স্বর্ণগ্রাম, রতনপুর, রামচন্দ্রপুর, হরিহরনগর কেমন প্রাণভরা চমৎকার সব নাম; ভোরবেলা উঠে গ্রামের নাম করলেই কত পুণ্যি! সব থাকতে কিনা পোড়াবৌ; আর লোকে গ্রামের নাম করে না, বলে—হাঁড়ি ফাটে। বলিয়া হাসিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, পিরুদাস আমার দিকে খানিকটা সরিয়া আসিয়া যেন থ হইয়া বসিয়া আছে।

পিরু বলিল,—এ গাঁয়ের নাম পূর্ব্বে পোড়াবৌ ছিল না, বাবু; কেন হ'ল তা যদি শোনেন ত' নিবেদন করি।

আমি চায়ের পেয়ালায় তিন-চারটা ঘন ঘন চুমুক দিয়া বলিলাম,—বল পিরু, শুনি।

পিরু নতচক্ষে খানিক নিঃশব্দ থাকিয়া আমার দিকে চোখ তুলিয়া বলিতে লাগিল,—মানষের মনের দিশে পেলাম না বাবু, এত বয়েস হ'ল। মানুষ যে কি চায় আর কি না চায় তা' আজও আমার ঠাহর হ'ল না—বলিয়া পিরু ম্লানচক্ষে বাছুরটির দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি শ্রোতা হিসাবে খুবই সহিষ্ণু; পিরুর কথায় একটা হুঁ দিয়া পেয়ালা নামাইয়া বিড়ি দিয়াশলাই বাহির করিলাম।

পিরু বলিতে লাগিল,—এই যে বাছুরটা চর্‌ছে দেখ্‌ছেন, পেট ভরানো ছাড়া এর আর কোনো কাজ কি আছে? নাই; পেট ভরলেই এ নিশ্চিন্দি, কিন্তুক বাবু, মানুষের খাই-খাই আর মেটে না; ভরা পেটেও যেমন তার খাই-খাই, খালি পেটেও তেম্‌নি; একদণ্ড সে নিশ্চিন্দি না; কত যে খাবে, তার কত যে ক্ষিদে তা' যেন সে নিজেই জানে না; সে জ্ঞাতির সর্ব্বস্ব খায়,

নিজের মাথা খায়, পরের পরকাল খায়, তবু তার আশ মেটে না। বলুন বাবু, হঁ্যা কি না?

আমি সংশয়ের সঙ্গে বলিলাম,—হঁ্যা।

কিন্তক আর একটা কথা ভাবুন বাবু, পেটের ক্ষিদেয় মানুষ যত পাগল না হয়, চোখের ক্ষিদেয় আর মনের ক্ষিদেয় হয় তার চতুগ্যাণ। মান্‌ষের এই মন নিয়েই ত' যত মারামারি, কাটাকাটি, পাপের কায্য। আবার এ কথাটাও ভাবুন বাবু, ভগমান চোখ আর মন দিয়েছেন—তাতে দিয়েছেন, ক্ষিদে; তেমনি আবার বুদ্ধি দিয়েছেন, বিবেচনা দিয়েছেন যে, মানুষ যেন র'য়ে স'য়ে কাজ করে। কিন্তু ক'জনে তা' করে বাবু?

আমি বলিলাম,—খুব কম লোকেই তা করে।

—তাই। তা' হলে দেখুন, মানুষ উঠ্‌তে বস্‌তে ভগমানকে একরকম অপমানই করে; ভগমান তাতে নাবাজ হয়ে যান, মান্‌ষের তাতে ভাল হয় না। বলুন বাবু, হঁ্যা কি না?

—হঁ্যা।

পিরু বলিল,—ভাল যে হয় না তারই প্রমাণ এই পোড়াবৌ গাঁ। বলিয়াই পিরু চম্‌কিয়া উঠিল; কর্কশ জিহ্বা বাহির করিয়া বাছুরটা তার পিঠের ঘাম চাটিতে সুরু করিতেছিল।

বাছুরটিকে ঠেলিয়া দিয়া পিরু বলিতে লাগিল, মান্‌ষের কথা আবারও বলি বাবু। আট আনা মণ ধান দেখেছি, তখনো মানুষ যেমন ছিল, ছয় টাকা মণ এখন, এখনো মানুষ ঠিক তেম্‌নি আছে, তখনো লোকের হাহাকার ছিল, এখনো আছে। তখনকার দর আর এখনকার টাকা হ'লে তবেই হ'ত সুখ; তখন জিনিস ছিল বেশী, টাকা ছিল কম; তাই তখনো দেশে আকাল হ'ত, এখনো হয়। বলুন বাবু, হঁ্যা কি না?

—হঁ্যা। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠে যা পড়েছি, তা' যদি সত্যি হয় তবে সে-ও বড় কঠিন দিনই ছিল।

—ছিল বৈকি, কঠিনই ছিল; তখনো এমন লোক ছিল যে, খেতে পেত না। আমি বলছি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা—এ গাঁয়ের নাম তখন ছিল লক্ষ্মীদিয়া। এ গাঁয়ের লোক তখনো ক্ষিদেয় দুঃখু পেয়েছে। কিন্তক একটা কথা আমি ভুল বলেছি বাবু, মাপ করবেন। তখন মান্‌ষের কষ্ট ছিল

সত্যি, কিন্তুক সে কষ্ট সকলের না, আর রোজকার না ; এখন যেন সকলেরই রোজই নাই-নাই। আর তখনকার দিনে গণ্ডগাঁয়ের কেমন একটা ছিরি ছিল, এখন তা' দেখ্‌তে পাইনে। তখনকার কেউ যদি আজ এ গাঁয়ে আসে তবে গাঁয়ের চেহারা দেখে, চিন্‌তেই পারবে না যে এই সেই লক্ষ্মীদিয়া কি পোড়াবৌ, যা-ই বলুন। সে ছিরি আর নাই। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না ?

পূর্ব্বের সঙ্গে তুলনায় এ গ্রামের শ্রী ঋদ্ধি কিরূপ পরিবর্ত্তিত বা অবনত অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা তখনকার লোকেই এখন বলিতে পারে। আমি মাত্র তেইশ বছর আগেকার মানুষ, তাই গ্রামের ষাট বছর আগেকার রূপটা ধ্যান করিয়া লইয়া আন্দাজের উপরেই বলিলাম,—হ্যাঁ, কই আর তেমন শ্রী ! মাঠের, মানুষের আর গরুর চেহারা ঠিক এক রকম দাঁড়িয়েছে, সবই যেন পোড়া-পোড়া।

—পোড়া-পোড়া বৈ কি, সে চেহারা আর নাই। তখনকার দিনে মানুষের উঠোনে দূব্ব গজাত না বাবু, ধান মাড়াইয়ের চোটে ; এখন সব উঠানেই জঙ্গল। যাক্ সে কথা। আমি যখনকার কথা বল্‌ছি, তখন গাঁয়ের মানুষ বিদেশে বেরুতে কেবল লেগেছে। এখন যেমন সবাই বিদেশে, আর বিদেশ এসেছে কাছে, তখন ত এমন ছিল না ; তখন বিদেশ ছিল দূর, আর বেরুত লোক কমই—একটা দুটো ক্বচিৎ ভবিষ্যৎ। তখন ত' রেল ছিল না যে হু হু শব্দে তিন দিনের পথ তিন দণ্ডে নিয়ে ফেলবে একেবারে নিভ্‌ভয়ে। তখন নদী থাকৃত বারমাস বওতা, খাল-বিলেও বারমাসই জল থাক্‌ত, যাওয়া-আসা সবই চল্‌ত নৌকয় করে, আর ভয়ে প্রাণটা হাতে করে ;—ঝড় তুফোন আর ডাকাত, এরাই ছিল নৌকর যম। ডাকাতের ভয়ে নৌক সব বহর বেঁধে চল্‌ত, দলছাড়া একলা নৌক পেলেই ডাকাতে তাকে মারত। তা যা হোক বাবু, এ কথা মিছে না যে মানুষের পয়সা তখন ছিল কম। এখনকার মত লোকে রোজই ভাতে না মলেও কাঁচা পয়সার মুখটা তেমন দেখ্‌তে পেত না। ঐ কাঁচা পয়সার লোভেই তখন মানুষে বিদেশে বেরুতে লেগেছে—দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি ঐ সব উত্তর অঞ্চলে। আমাদের এই লক্ষ্মীদিয়ার হরিশ ঠাকুর কাঁচা পয়সার লোভেই হঠাৎ নেচে উঠে একদিন বৌ ছেলে নিয়ে যাত্রা ক'রে নৌকয় উঠ্‌ল ; তখন বর্ষাকাল এই নদী দেখ্‌ছেন ময়না, সেউলি আর ঘাসে ভরা, ছোঁড়ারা লাফ্ দিয়ে দিয়ে এপার ওপার

করে—তখন ময়নার এমন হাড়চাটা চেহারা ছিল না। আপনাদের ঐ চরের জমির মোট্‌টাই ময়নার পয়স্তি; ওপারের ঠিক্‌ অতখানি; নদী তাহ'লে কত চ্যাওড়া ছিল তা একবার ভেবে দেখুন। বর্ষাকালে তার জলের ডাকে কান পাতা যেত না, এমনি হুহু শব্দ। যা হোক্‌ কাঁচা পয়সার টানে হরিশ ঠাকুর বৌ-ছেলে নিয়ে নৌকয় উঠ্‌ল, বাড়ীতে রেখে গেল বিধবা মেয়ে যোগেশ্বরীকে, যোগেশ্বরীর বছর তিনেকের একটা মেয়ে মিন্নই, আর তার বছর দেড়েকের একটা ছেলেকে।

হরিশ ঠাকুরের যাওয়ার সময় যোগেশ্বরী কেঁদে বল্‌ল,—বাবা আমাদের কি উপায় হবে?

হরিশ বল্‌ল,—তোমাদের উপায়? তোমাদের উপায় রেখে গেলাম ঐ গোলাবন্দী করে, আর ঐ ঢেঁকি থাক্‌ল, ধান ভান্‌বে আর খাবে। বলে সে মেয়েকে পায়ের ধূলো দিয়ে নিষ্কাতরে যেয়ে নৌকয় উঠ্‌ল। কিন্তুক হরিশ ঠাকুরের মত মানুষ বোঝে না বাবু, যে যাবার সময় মানুষকে অমন করে গোলা দেখিয়ে যাওয়া তাকে অপমান করা। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—তা-ই। বিশেষ যখন কেবল যাচ্ছ বলেই কষ্টে আর একজনের বুক কাট্‌ছে।······এদিকে মা আর মেয়ের কান্না আর শেষ হয় না। নৌক খোল্‌বার সময় বয়ে যায়, দাঁড়ি বেটা কাছি খুলে ফেলেছে, কিন্তুক মেয়ে মাকে আর ছাড়ে না,—হরিশ নৌকর উপর থেকে দাত খিচিয়ে তজ্জন ক'রতে লাগল। মেয়েটা হালে বিধবা হয়েছিল। বাপ তাকে ফেলে রেখে বিদেশ যাচ্ছে দেখে তার সোয়ামীর শোকটাই উথ্‌লে উঠ্‌ল বেশী করে;—সোয়ামী যদি বেঁচে থাক্‌ত তবে ত এমন করে চ'খে আঁধার দেখ্‌তে হ'ত না। হরিশ ঠাকুর কেমন যেন একটা তুম্মুখ চোয়াড় ধরণের লোক ছিল; চিরদিন একটা মিষ্টি কথা ভুলেও সে মেয়েকে বলে নাই, যাবার সময়ও তুখিনী মেয়েটাকে একটা মনবুঝান কথাও বলে গেল না। কাজটা কি তার উচিত হয়েছিল? বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—না, তার উচিত হয়নি।

—তা যাই হোক্‌, হরিশের বাস্তনী মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখে ছেলে ভারতকে নিয়ে নৌকয় উঠ্‌ল। নৌক ছেড়ে দিল, হরিশ ঠাকুর চেঁচিয়ে

চেঁচিয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গা করতে লাগল, জলের টানে নৌক তীরের মত ছুটে চল্‌ল; যোগেশ্বরী চোখের জল মুছে ছেলেটাকে কাঁখে করে মেয়েটার হাত ধরে ফিরে এল। কিন্তুক আমরা সেখানে দাঁড়িয়েই থাক্‌লাম সেই চলন্ত নৌকর দিকে চেয়ে; মনটা কেমন খালি হ'য়ে গেল। চলে যাওয়ার একটা দুঃখু আছে, বাবু, যা নিতান্ত নিপ্পরেরও বাজে। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ, তা ত বাজেই।

—বাজে বৈকি। তার পর বর্ষার ঐ ভরা নদী। আমরা যেন বুঝ্‌তে পারলাম বাবু, নদীতে যেমন জল ধরছে না, বিধবা এই মেয়েটির বুকের চার পাশ তেম্‌নি ভরা-জলের ধাক্কায় ভাঙছে। নদীর বাঁক ঘুরে নৌক চলে গেল, যখন আর একেবারেই দেখা গেল না তখন আমরা ফিরে এলাম, খানিক এসেই একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখ্‌লাম, নদীর ঘাট যেন খা-খা কর্‌ছে।

হরিশ বিদেশ গেল কি করতে তা' সে-ই জানে। মেয়েটা কিন্তুক ভাত-কাপড়ের দুঃখু কোনদিন পায় নাই। তখনকার দিনে মানুষে মানুষে আপন আপন একটা ভাব ছিল। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ, ছিল বলেই মনে হয়।

—ছিল বৈকি, কিন্তুক এখন তা নাই। নিজেরই মন দিয়েই বুঝতে পারি বাবু, তেমন আপন আপন যেন আর কাউকে লাগে না। যাই-হোক, যোগেশ্বরী ছেলে-মেয়েকে মানুষ করতে লাগল; গাঁয়ের দশজনই তাকে নিজের মা-বোনের মত চ'খে চ'খে রাখে, পাহারা দেয়, খোঁজ তল্লাস করে, বাজার-হাট ক'রে দেয়, দরকার হ'লে বদ্যি ডেকে আনে, ক্ষেতের আফর ঘরে তুলে দেয়; এম্‌নি ক'রে গাঁয়ের লোকই তাকে আগলে রাখে।......হরিশ ঠাকুর বর্ষার দিনে আসে, আবার বর্ষা থাক্‌তে থাক্‌তেই চলে যায়। আমরা হরিশের মুখে শুনি দেশ-বিদেশের গল্প, কবে কার নৌক কেমন ক'রে ডাকাতে মেরেছিল তারই কথা, বিদেশী লোকের রীত-বেরীতের কথা, আর লোকের মুখে শুনি হরিশের টাকার কথা—হরিশের টাকার নাকি অন্ত নেই, শুন্‌লাম, হরিশ সেই বিদেশেই উত্তরেই পাকা ঘর-বাড়ী করেছে, সেইখানেই সে থাকবে, এমনও নাকি হরিশ বলেছে শুন্‌লাম যে, মেয়েব ছেলেটা যদি মানুষ হ'য়ে দেশের বাড়ী রাখ্‌তে পারে বাড়ী থাক্‌বে, না পারে বাড়ী যাবে। শুনে আমার মনে বড় কষ্টই পেলাম। বাপ-ঠাকুদ্দার বাস্তব মায়া কাটিয়ে হরিশ সেই মুলুকে

থাকতে চায় কোন্ প্রাণে ; কিন্তুক অবশেষ কালে হলও তাই।—প্রথম প্রথম সে বছর বছর আস্‌ত, তার পর দু' তিন বছর পর পর, তার পর একেবারেই আসা ছেড়ে দিল। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, হরিশ বলেই এমন কাজটা পার্‌ল, আর কেউ পার্‌ত না। কিন্তুক্ এখন দেখ্‌ছি বাবু, সবাই তা' পারে। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ। এখন ত বিদেশেই ঘর-বাড়ী করে আছে অধিকাংশ।

—আছে বৈকি বাবু, আছে ; তা' না থাক্‌লে আর গাঁয়ের এমন অরাজক হা-দশা হবে কেন! তা' যাক্, এখন হরিশের কথাই শেষ করি। হরিশ আর গাঁয়ে আসে না, এম্‌নি করেই দিন যায় ; হঠাৎ একদিন একপহর বেলা আছে, এমন সময় যোগেশ্বরীরই গলার মড়া কান্না শুনে আমরা দশে-বিশে দৌড়ে এলাম—বলি ব্যাপারটা কি! এসে শুন্‌লাম, হরিশ ঠাকুর মারা গেছে ; সে যেদিন মারা গেছে তার একদিন পরেই তার বাস্তনীও মারা গেছে—দু জনেই ঐ এক কলেরাতেই ; ছেলে ভারত ভালই আছে। তখন গাঁয়ে গাঁয়ে ডাকের আপিস্ ছিল না, এ গাঁয়েও ছিল না ; উ-ই নিধিরামপুর থেকে, আড়াই কোশ্ দূর থেকে, হরকরা এসে, মঙ্গলবারে মঙ্গলবারে ডাকের চিঠি দিয়ে যেত। আমরা চিঠি পড়ে হিসেব করে দেখ্‌লাম, হরিশ ঠাকুর মারা গেছে আজ দশ দিন।......

যা' হোক্, সেদিকে যা' হবার তা' হল।

কিন্তুক এর মধ্যে আর দুটো ঘটনা ঘটে গেছে—মিন্নই আর ভারতের বিয়ে। তখনকার দিনে, বাবু, বিয়ের ছেলে ছিল সস্তা, মেয়ে ছিল আক্রা ; টাকা দিয়ে মেয়ে নিতে হ'ত। এই টাকা চাওয়া আর দেওয়া নিয়ে কথা-কাটাকাটি চল্‌তে চল্‌তে মিন্নইর বয়েস দশ উৎরে এগার হয়ে গেল। এখন ঘরে ঘরে সতর আঠার বছরের আইবুড়ো মেয়েরা বেশ স্বস্‌ছন্দে আছে ; বড় হয়েছে বলে তাদের বাপ মার কি তাদের নিজের কোনো ভাবনাই যেন নেই। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ তা ত আছেই।

—আছে বৈকি। কিন্তুক তখন দশ উৎরে এগারোয় পড়লে মানুষের হাত মাথায় উঠে যেত। আর তার গঞ্জনা ছিল কি কম! গঞ্জনার জ্বালায় লোকে গলায় দড়ি দিতে দৌড়ত। যোগেশ্বরী ছিল, বোকাসোকা আর

বেজায় ঢিলে মানুষ। বিধবা আর একা হলেও যে কাজটা সে পারত তা-ও যেন তার ভুল হয়ে যেত। ছেলের ঘর বাছ্‌তে বাছ্‌তে, মেয়ের দর কষ্‌তে কষ্‌তে, হবে হচ্ছে, এটা নয় ওটা করতে করতে মিন্নই এগারোয় পড়ল; তখন লেগে গেল হুড়োহুড়ি তাড়াতাড়ি। লোকের গঞ্জনায় যেন পাগল হয়ে যোগেশ্বরী মিন্নইর বিয়ে দিয়ে দিল এক তেকেলে বুড়োর সঙ্গে। তাতে দেশের লোকের মাথার পোকা মরল, কিন্তুক দেশের লোকের আশীর্ব্বাদ পেয়েও বুড়ো বেশি দিন টিক্‌ল না; মিন্নই বিধবা হ'য়ে মায়ের কাছে এল—তখন সে বারো উৎরে মাত্তর তেরোয় পড়েছে। আর একটা কথা, বাবু; তখনকার দিনে বিধবা হওয়াটা কেমন ধাত-সওয়া মত ছিল, কিন্তুক আজকাল সেটা যেন কারুরই ধাতে সয় না। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

পূর্ব্বে বৈধব্য সকলেরই ধাতে সহ্য হইত, এবং এখনও পূর্ব্ববৎ সহ্য হয় কিনা তাহা সহসা অনুমান করিতে না পারিয়া পিরুর প্রশ্নের উত্তরে কিছুক্ষণ নিরুত্তরই রহিলাম। খানিক ভাবিয়া বলিলাম,—তা' হবে।

পিরু বলিল,—তা-ই। বুড়ো বুড়ো বিধবারও এখন বিয়ে হয় শুনি; কিন্তুক তখনকার দিনে আঁতুড়ে মেয়ে বিধবা হলেও তার আবার বিয়ের কথা লোকে মনে আন্‌তেও পার্‌ত না।

হিন্দুর সনাতন শাস্ত্র এবং সনাতন প্রথার প্রতি আমার মনের টান নাই, তাদের বিরুদ্ধে আমার আক্রোশও নাই; বাহিরের জিনিস বলিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে ঐগুলিকে বাহিরেই রাখিয়া দিয়াছি। শাস্ত্রে প্রথার গরমিল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে পদে পদে গরমিল, কাজে কথায় গরমিল—চারিদিককার অসংখ্য সেই গরমিলের গোলোকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিবার অনিচ্ছাতেই আরও দশজনের মত আমিও হিন্দুর, এমন কি মানুষেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম আচার বিচার বিষয়ে একেবারে নিঃস্পৃহ। ধর্ম্ম মনে, আর যাহাতে মানুষের দুঃখের হ্রাস হয়, তাহাই কর্ত্তব্য—এই শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া আমি বসিয়া আছি। পিরুর কথার উত্তরে অনেক কথাই বলিবার ছিল—বৈধব্য কেহ সহিতেছে না তারও হেতুর মর্ম্মের কথাটা বলিতে পারিতাম; কিন্তু পথে চলিতে চলিতে গুরুভার অথচ অনাবশ্যক যে বস্তুটিকে অক্লেশে এড়ান যায় তাহাকে ধাক্কা দিয়া দিয়া সঙ্গের সাথী করিয়া লওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা।

বলিলাম,—তারপর মৃন্ময়ীদের কি হ'ল?

পিরু কাঁধের গামছাখানা ডান দিক হইতে বাঁ দিকে আনিয়া বলিতে লাগিল,—তারপর অনেক দিন যোগেশ্বরী মন খুব খারাপ ক'রে থাকল, মেয়ের মুখের দিকে চাইলেই তার চোখ ছল্ ছল্ করে। কেঁদে কেটে ভারতকে সে চিঠি লিখ্‌ল—বৌটিকে নিয়ে একবার আয় ভাই; তাকে আমি দেখি নাই; যদি তোদের মুখ দেখেও আমার বুকের আগুন নেবে।...বৌ নিয়ে ভারত দেশের বাড়ীতে এল। এসেই বল্‌ল, মাস ছয়েক থাক্‌ব—বেশিদিন থাকবার যো নেই; সেখানে কাজ বিস্তর, জোত্, জমা, তেজারতি, কত কি! দেখ্‌লাম ছেলেটি বেশ সুপুরুষ, তার বাপের মত কাটখোট্টা হ্যাঙ্গামে নয়; বৌটাও চমৎকার লক্ষ্মী। বাড়ীতে শুনলাম, বৌটার সন্তান হবে, এই তিন মাস। যোগেশ্বরী ভাই আর ভাজ পেয়ে যেন হাতে স্বগ্‌গ পেল, মিন্নুইও তাই; মায়ে ঝিয়ে একেবারে অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল, তাদের কি খাওয়াবে, কেমন করে তুষ্ট করবে। রক্তের টান ত ছিলই, তার উপর তারা গরীবের বৌ ঝি, ওরা বড়লোক, ওদের অন্নেই মিন্নুইর মা মানুষ; দয়া ক'রে ওরা এসেছে যদি, কষ্ট পেয়ে না যায়।

ভারত সময়-মত খায়-দায় আর বৌটিকে নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে।

ভারতের ছ'মাসের ত্ব'টি মাস এমনি করেই কাট্‌ল, কিন্তুক তারপরই এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল, যার ত্বঃখু এখনো আমার যায় নাই, বাবু। কাণ্ডটা ঘট্‌ল সত্যিই, কিন্তুক না ঘট্‌লেও তা কারু কিছু হানি হ'ত না। যদি বলেন, ঘটালেন ভগমান—কিন্তুক সেটা বড় শক্ত কথা, বাবু; সে-কথার ফয়শালা আমরা কল্পতে পারিনে!......

পিরু খানিক চোখের পলক ফেলা বন্ধ রাখিয়া নিঃশব্দ থাকিয়া বলিতে লাগিল,—যেদিন ঘটনাটা ঘট্‌ল, বাবু, সে দিন বড় বিষ্টি; সন্ধ্যে রাত, অন্ধকার, আর তেম্‌নি গলদ্‌ধারে বিষ্টি। যোগেশ্বরী তার হবিষ্যি ঘরে বসে জপ করছিল, তার ছেলেটি একধারে বসে ইস্কুলের পড়া করছিল। ভারতের বৌ গিরিবালা রান্নাঘরে মাছভাত রাঁধছিল; হঠাৎ কি দরকারে সে ভারতের শোবার ঘরে উঠে চৌকাঠে পা দিয়েই দেখ্‌ল—

পিরু থামিল। আমি সোৎসুকে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম; এবং পিরু আর কথা কহে না দেখিয়া উপরন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভারতের বৌ কি দেখ্‌লে?

উত্তরে পিরু অত্যন্ত বিষণ্ণ সুরে বলিল,—বাবু, আপনি আমার মনিব। আপনি ছেলেমানুষ, কিন্তুক গোখ্‌রোর বাচ্চা গোখ্‌রোই। মনিবের মুখের সামনে কথাটা উৎচারণ করব কি না তাই ভাব্‌ছি।

আমি মুরুব্বির মত সদয় কণ্ঠে অভয় দিয়া বলিলাম,—বল।

পিরু সাবধানে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া গলা খুব খাটো করিয়া বলিল,—দেখ্‌ল ভারত মিন্মইর মুখখানা তুলে ধরে' হেসে হেসে—

আমার কল্পনা ছুটিতেছিল ; লাফাইয়া উঠিলাম,—বল কি ?

পিরু কথা কহিল না।

বহুক্ষণ নতমুখে নিস্তব্ধ থাকিয়া যখন সে কথা কহিল, তখন তার কণ্ঠস্বর ক্লেশে যেন ভাঙা ভাঙা। বলিল,—মান্‌ষের মন কি যে চায় আজও তার দিশে পেলাম না, তা আগেই বলেছি। ভগমান ধম্ম দিয়েছেন, অধম্মও দিয়েছেন, আর মন দিয়েছেন বুঝে নেবার। কিন্তুক মানুষ তা' বুঝ্‌ল না, বাবু। সব ডুবিয়ে দিয়ে, সব ভাসিয়ে দিয়ে মানুষ ঐ কাজটিকে কেন বড় করে' তুলেছে তা' অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারি নাই, বাবু। জিনিসটা আছে সত্যি, আব সে ছুটবেই, কিন্তুক তার ওজন নাই কেন তা' জানিনে। মানুষ ইচ্ছা কল্লেই জিনিসটাকে বশে আন্‌তে পারে—দুনিয়ার সব যদি মিছে হয় এ-কথা মিছে নয়, বাবু, এ আপনাকে আমি বল্‌ছি। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না ?

—হ্যাঁ।

—আপনারা ত' তা' বলবেনই, ভদ্দরলোক, লেখাপড়া শিখেছেন ; আমরা চাষামানুষ, আমরাও তাই বলি।

—তার পর কি হ'ল ?

—বৌটি তাই দেখে যেমন গিয়েছিল তেম্‌নি শব্দটি না করে চুপ্‌চাপ্‌ ফিরে এল। কিছুক্ষণ পরেই ও-ঘরের বারান্দা থেকে যোগেশ্বরী ডেকে বল্‌ল,—ভাত পুড়ে যে ছাই হয়ে গেল বৌ, ঘুমুলি নাকি ? অনেকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে যোগেশ্বরী ভারতকে ডেকে রান্নাঘরে তদারকে পাঠিয়ে দিল ; ভারত এসে দেখ্‌ল, বৌ খালি খুঁটি ঠেস দিয়ে ঠায় বসে আছে, উনুনের উপর হাড়ি চাপান।......

মান্‌ষের মনের ভাব আমরা ভাল বুঝিনে বাবু, বৌটার তখন মনের কি

ভাব হ'ল তাও জানিনে; আর কি ক'রে যে ওদের অভিযোগ ঘট্‌ল তাও জানিনে। মিন্নই সোমত্ত মেয়ে; মামীর সুখ দেখে তার সুখের লোভ হ'তে পারে না এমন নয়। কিন্তুক ভারত তাকে গায়ে পড়ে টেনেছিল, এ নিশ্চয়। ছোঁয়া দিয়ে, ছুঁয়ে, চাউনি দিয়ে, হাসি কেড়ে সোমত্ত মেয়েকে পাগল ক'রে তোলা কিছু কঠিন ত' না। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—আমার মনে হয় কি জানেন বাবু? তাই-ই ঘটেছিল। আপ্‌না-আপ্‌নির মধ্যে গা ঘেঁষাঘেঁষিতে যাদের ধম্মজ্ঞান নেই আর আপন-পর হুঁস নাই তারা ত' ঐ কাজ করবেই—ইচ্ছে করেই ঘেঁষে আসবে। যোগেশ্বরী বুঝ্‌-সুঝের তালসামালী লোক ছিল না; সে এম্‌নিধারা আল্‌গা মানুষ ছিল যে, যা চোখে দেখ্‌ত তাও যেন তার মনের নাগাল পেত না; বাইরের হাবভাব লক্ষণ দেখে ভিতরের খবর পাওয়া ত' তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।......

বৌয়ের ভাবগতিক দেখে ভারতের কেমন সন্দেহ হ'ল; সে সাবধান হ'ল, কিন্তুক সকল দিকে সাবধান হ'লে তবেই সব দিক বাঁচত।—মিন্নই হঠাৎ একদিন মামাকে মামা ব'লে ডাকা ছেড়ে দিল; তা' ত' দিলই, এমন কি সে ভারতের সাম্‌নে যেন আসতেই চায় না এমনি লজ্জা। তাই দেখেরই যোগেশ্বরী রেগে রুখে উঠে বল্‌ল,—মেনি, তোর হ'ল কি লো? মামাবাবু। সাম্‌নে বেরুস্‌নে যে?

যোগেশ্বরীর ভয় হ'ল, মিন্নই এই হঠাৎ গুটিয়ে আসাতে অনাদর মনে ক'রে ভারত রাগ না করে। কিন্তুক একেবারে ভুল বাবু, সব একেবারে ভুল। মিন্নইর এ লজ্জা যে কিসের লজ্জা তা' বোঝবার সাধ্যি যোগেশ্বরীর ছিল না। এ লজ্জা তার পুরুষের কাছে প্রথম লজ্জাত্যাগের লজ্জা। এর পর মিন্নইর মুখে মামা ডাক্‌টা আর তেমন ক'রে ফুট্‌লই না। যোগেশ্বরী তাকে বক্‌তে লাগ্‌ল; বক্‌তে বক্‌তে হঠাৎ একদিন যোগেশ্বরীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়্‌ল, যার আগুনে তার ভিতর বা'র পুড়ে' একেবারে ছার হয়ে গেল। পাপ আর পারা বেরুবেই বাবু। মাস চার-পাঁচ পরে যোগেশ্বরী ধরে ফেল্‌ল যে—কথাটা স্পষ্ট ক'রে না-ই বল্‌লাম বাবু। লোকে বলে মরার বাড়া বিপদ নাই; কিন্তুক এ বিপদ যে মরার বাড়া ও কত বড় বিপদ তা' যেন আমার শত্তুরকেও কখন না জান্‌তে হয় বাবু। যোগেশ্বরী কোণায়

কোণায় কেঁদে বেড়াতে লাগ্‌ল, খাওয়া-দাওয়া একেবারে ছেড়ে দিল। নিজের মনেই ভেবে দেখুন বাবু, এই পাপ আর এই লজ্জা গোপন করতে কত বড় একটা পাপকার্য্যের দরকার। যোগেশ্বরী একেবারে পাগলের মত বেঠিক হ'য়ে উঠ্‌ল।

বাবু, কথাটা ভাবতেও যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।......সর্ব্বনাশ যে এতদূর এগিয়ে গেছে বৌটা তখনই তা' জানতে পারে নাই; তবে খুব বেশিদিন অজানাও তার থাক্‌ল না।

ভারত ফাঁকে ফাঁকে বেড়ায়—ছিপ্‌ ফেলে' মাছ ধরে, পাড়ায় পাড়ায় দাবা, পাশা খেলে—যেন সে কিছুর মধ্যেই নেই। মেয়ের মুখে সব জানতে পেরেও যোগেশ্বরী ভাইকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। কিন্তুক ভাবুন বাবু, এইটে যদি ঠিক্‌ উল্টো হয়ে ঘট্‌ত? খুন হোক্‌ না হোক্‌, ভারত তার বৌকে ত্যাগ করত কি না? বলুন বাবু, ত্যাগ কর্‌ত কি না?

—করতই ত'। বলিয়া আমি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলাম। জোয়ান পুরুষ আমি এবং সেই হিসাবে ভারতেরই সমধর্ম্মী; ইহারই অকারণ একটি লজ্জা যেন জোর করিয়া আমার মুখ ঠেলিয়া অন্য দিকে ফিরাইয়া দিল—পিরুর কণ্ঠস্বরে এমনি একটা ক্ষমাহীন আক্রোশের তেজ ছিল।

পিরু বলিতে লাগিল,—সোয়ামী এত বড় দাগাটা তাকে দিল, এমন অবিশ্বাসের ইতর কাজটা সোয়ামী করল; বৌটা শুধু কেঁদে কেঁদে চক্ষু দুটি অন্ধ ক'রে ফেল্‌ল, একটি কথা সে বল্‌ল না যে তুমি এ কাজ করলে কেন, কি আর কিছু।

তারপর যে ব্যাপার ঘট্‌ল তা' আমি বল্‌ব আপনাকে, কিন্তুক তার আগে সেই সতীর উদ্দেশে দণ্ডবৎ ক'রে নেব। বলিয়া পিরু উপুড় হইয়া পড়িয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সতীর পায়ে গভীর শ্রদ্ধার একটা প্রণাম নিবেদন করিল।

যখন সে মুখ তুলিল তখন তার চোখ ভিতরকার জলের ঝাপটায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। রক্তবর্ণ চক্ষে সোজা আমার দিকে চাহিয়া পিরু বলিতে লাগিল,—দু'তিন দিন চুপ করে' থেকে চোখের জল ফেলে' ফেলে' আটমাস পোয়াতী বৌটা একদিন দরজায় খিল এঁটে দিয়ে নিজেরই কাপড়ে আগুন লাগিয়ে দিল। তখনই কারো নজরে পড়ে নাই, আগুন কিছুক্ষণ জলবার

পর হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে ধোঁয়া আর ধোঁয়ার সঙ্গে মানুষ পোড়ার দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে দেখে, কি হ'ল, কি হ'ল, দেখ্, দেখ্, করতে করতে এসে যখন দরজা ভেঙে লোকজন ঘরে ঢুক্‌ল তখন পোড়া শেষ—বৌটা খাবি খাচ্ছে।…… সেই থেকে এ গাঁয়ের নাম পোড়াবৌ। বলিয়া পিরু নিশ্বাস ছাড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; গামছা দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিতে বলিতে গেল,—বেশ করে—লোকে এ গাঁয়ের নাম করে না।……

'উত্তরা'

মুক্তি

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আমি একটি সামান্য জীবনের ছেঁড়া-একটুকরা ইতিহাস বলিতে বসিয়াছি। হয়তো গল্পের আসর ইহাতে জমিবে না।

মুক্তি গৃহস্থ-ঘরের বৌ হইয়া যেদিন কলিকাতা সহরের সদর-রাস্তায় পানের খিলি বেচিতে বসিল, সেদিন তার সঙ্কোচ ততটা হয় নাই যতটা সে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। বারো বৎসর বয়সে বিবাহিত হইয়া আসিয়া স্বামীর সহিত মুক্তি কলিকাতার একটা সাঁৎসেতে গলির মধ্যে সেই-যে প্রবেশ করিয়াছিল, তারপর ছয় বৎসরের মধ্যে একটিবারও আর বাহির হইতে পায় নাই। সেই ছোট্ট অন্ধকার ঝুপ্‌সী ঘরটির মধ্যে দিনরাত আবদ্ধ থাকিয়া তার এম্‌নি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, জগতের কোথাও যে আলো আছে, বাতাস আছে, তা তার মনেই পড়িত না। আজ হঠাৎ একেবারে এতটা আলোর মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সে যেন দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল;—তার অন্ধকার-অভ্যস্ত চোখ আলোর পানে সে ভালো করিয়া মেলিতেই পারিতেছিল না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, গৃহস্থ-ঘরের অন্তঃপুরিকা হইয়া মুক্তির পক্ষে বাজারের পানওয়ালি হওয়া কেমন করিয়া সম্ভব হইল? অনেকে কথাটাকে হয়ত আজগুবি মনে করিবেন, কিন্তু তা নয়। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়,

আমি সাক্ষী ডাকিতে রাজি আছি ;—মুক্তিকে কলিকাতা সহরের অনেকেই পান বেচিতে দেখিয়াছে।

অত্যন্ত অনাদরে ও অবহেলায় মুক্তি মানুষ হইয়াছিল। এক গরিবের ঘরের মেয়ে, তার উপরে সে যখন খুব কচি, তখন তার মা মারা যায়—কাজেই আদর তার ভাগ্যে জোটে নাই।

কচি মেয়ের দোহাই দিয়া মুক্তির বাপ আবার বিবাহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু মেয়ের তাতে বিশেষ কিছু সুবিধা হয় নাই। কারণ সতীনের মেয়েকে ভালোবাসিতে পারে এতটা উদারতা মুক্তির সৎমায়ের ছিল না।

মুক্তি ভয়ে-ভয়েই দিন কাটাইত,—যতদূর সম্ভব আপনাকে গোপন করিয়া চলিত—কারণ যেখানে যতটুকু সে সৎমায়ের চোখে পড়িত, সেইখানেই তার শাসন ছিল,—আদর ছিল না। নিজেকে এই গোপন করিয়া চলাটা মুক্তির এমন স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল যে স্বামীর কাছে সে নিজের হৃদয়টিকে মেলিয়া ধরিতে পারে নাই, স্বামীও তাহাকে পাইবার জন্য কোনোদিন তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সে-জিনিসটা তার ধাতেই ছিল না।

মুক্তির স্বামী কলিকাতায় কোন অপিসে অল্প-মাহিনায় সামান্য চাকরি করিত। সে এ সংসারে বেশি-কিছু চাহিত না, অল্পতেই খুসি ছিল এবং সেই অল্পটুকুও না পাইলে বিরক্ত হইয়া উঠিবার মতো তেজ তাহার ভিতরে ছিল না। সে ছিল নিরীহ ভালোমানুষ। তার এই নিরীহতা এতটা বিরাট ছিল যে কোনোরূপ উত্তেজনাই তাহাকে আদপেই চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারিত না। তার উপরে সে ছিল নকলচাঁদ বাবাজীর শিষ্য, এমন গুরুভক্ত শিষ্য কলিকালে দুর্লভ। সে চিত্ত স্থির করিবার জন্য গুরুর উপদেশে প্রতিদিন ঘন-ঘন গঞ্জিকা সেবন করিত। তার গাঁজার মাত্রা ক্রমেই এমন বাড়িয়া উঠিতেছিল যে লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, কোন্ দিন বা চিত্ত-স্থির-রাখা বিষয়ে অতবড় মহাত্মা নকলচাঁদ বাবাজীকেই সে ছাড়াইয়া উঠে।

নকলচাঁদ বাবাজী চক্ষু মুদিয়া উপদেশ দিতেন—কামিনী-কাঞ্চনের মোহ বড় ভয়ঙ্কর! মাছ যেমন জালে আটকায় এবং তাহাতেই মরে, মানুষ তেমনি এই কামিনী-কাঞ্চনের মায়াজালে পড়িয়া নরকে ডুবিয়া মরিতেছে!

মুক্তির স্বামী গুরুর এই অমূল্য উপদেশ গদগদচিত্তে জোড়হাত করিয়া

বসিয়া শুনিত এবং তাহা পালন করিবার বিধিমত চেষ্টা করিত। কাঞ্চন-সম্বন্ধে সে একরূপ নিশ্চিন্ত ছিল,—তার দায় বড় ছিল না, কারণ সে-জিনিসটা আসিবার পথেই অন্তর্দ্ধান করিত এবং অধিকাংশ সময়েই তার আসিবার বালাইও ছিল না। কিন্তু কামিনী তো তেমন নয়—সে যে দিনরাত্রি চোখের সামনে জাজ্জল্যমান হইয়া আছে। সেই মুক্তির স্বামী যতক্ষণ বাড়িতে থাকিত চিত্ত স্থির-রাখিবার মহৌষধ ভক্তিভরে সেবন করিত। সে মনে-মনে তারিফ করিত—কি আশ্চর্য্য দ্রব্যগুণ! মানুষের এত বড় শত্রু যে কামিনী, তাও এই দ্রব্যগুণে একমুহূর্ত্তে চোখের সাম্‌নে হইতে সাফ্ পরিষ্কার হইয়া যায়,—তার চিহ্নমাত্রও থাকে না! এমন সুলভ জিনিস থাকিতে মানুষ কেন যে সংসারের পাঁকে ডুবিয়া মরে সে ভাবিয়া পাইত না। এ কি সামান্য কথা! যোগ-সাধনের চরম অবস্থা যে সমাধি তাহাই এই দ্রব্যগুণে মুহূর্ত্তের মধ্যে করায়ত্ত হয়। কোনো সাড়া নাই, শব্দ নাই—এত বড় জগৎখানাই কোথায় তলাইয়া যায়। ভাগ্যে সে নকলচাদ বাবাজীকে পাইয়াছিল, তাই তো এ-যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল; নয় ত তার কি দুর্দ্দশাই হইত; সে ভাবিত মানুষগুলো কী বোকা! এমন সাধু মহাত্মা জল্‌জ্যান্ত থাকিতে লোকে কিনা হা-অন্ন হা-বস্ত্র করিয়া কাঁদিয়া মরে! নকলচাঁদ বাবাজীর পায়ে আসিয়া পড়িলেই তো সব গোল চুকিয়া যায়।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তার মন যখন বিশ্বসংসারের মানব-জাতির দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া উঠিত, সে তখন দূর-হোক্-গে ছাই বলিয়া বেশী করিয়া চিত্তস্থির করিবার আয়োজনে বসিয়া যাইত।

এমনিতর ছায়ার মানুষ লইয়া মুক্তিকে ঘর করিতে হইত। স্বামীর যে একটা অস্তিত্ব আছে তাহা সে অনুভব করিবারই সুযোগ পাইত না। স্বামীর আদর তো ছিলই না, অত্যাচারটাও যদি থাকিত, তা হইলেও না-হয় সেই অত্যাচারের আঘাতে স্বামীর একটা ছাপ তার উপরে পড়িবার অবসর পাইত। কিন্তু যেখানে কেবল অবহেলা, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো সম্বন্ধই জমিয়া উঠিতে পায় না। তা ছাড়া, মুক্তি ছিল একলা ঘরের একলা মানুষ। আর পাঁচজনকে লইয়া যে তার হৃদয়ের ছন্দ উঠিবে পড়িবে তারও জো ছিল না। কাজেই সে আপনার মধ্যে আপনি এতটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া থাকিত যে তার সেই দুঃখী-ঘরের আসবাবহীন ফাঁকা জায়গাও সে বেশি করিয়া

জুড়িতে পারিত না। দিনের পর দিন কাটিয়া যাইত, প্রতিদিনের কর্ত্তব্য-গুলি সে একটির পর একটি করিয়া সারিয়া রাখিত, তাহাতে তার আনন্দও ছিল না, দুঃখও ছিল না। সে যেন কলের পুতুলের মতন চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইত।

হঠাৎ একদিন একটি সামান্য মানুষের হৃদয় তার লাভ হইয়া গেল। সে বামার মা। সে ছিল ঠিকা-দাসী। যে দুঃখী-পাড়ায় মুক্তিরা থাকিত, এই বামার মা ছিল সেই পাড়ার একমাত্র দাসী। সে সকাল-বিকাল দু-বেলা সদর রাস্তার ধারে বসিয়া পান বেচিত, দুপুর-বেলা ঝড়ের মতো পাড়ার মধ্যে আসিয়া ঘরে ঘরে নির্দ্দিষ্ট মতো কাজ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত; কেউ যদি একটুখানি অতিরিক্ত ফরমাস করিত তো অমনি গর্জ্জন করিয়া উঠিত। তার সেই মারমূর্ত্তি দেখিয়া কেউ আর দ্বিরুক্তি করিবার সাহস পাইত না।

বামার মার সঙ্গে পাড়ার কারুরই আর-কোনো সম্পর্ক ছিল না, এক কাজের সম্পর্ক ছাড়া। কাজ সারা হইলেই সে ছুটিয়া পলাইত, কাহারো পানে ফিরিয়া তাকাইত না—দুদণ্ড দাঁড়াইয়া কথা কহিবার অবসর পর্য্যন্ত তার ছিল না। কাজেই বহুদিন ধরিয়া মুক্তির নিঃসঙ্গ জীবনের উপর বামার মাও নিজের ছায়াটুকু পর্য্যন্ত ফেলিতে পারে নাই। কিন্তু একদিন সে ধরা পড়িয়া গেল।

মুক্তির জ্বর হইয়াছিল। সে একলাটি পড়িয়া ছিল। সেদিন তার স্বামীর ছুটির দিন; কিন্তু গুরুজীর আড্ডায় ভারি এক মোচ্ছব, কাজেই সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছিল, মুক্তির দিকে ফিরিয়া তাকাইবার সময় হয় নাই। তার পর দুইদিন একেবারে অদৃশ্য। উৎসবের উল্লাসে বাবাজীর শিষ্যেরা এতটা চিত্ত স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহা দেখিয়া আশপাশের লোকেদের চক্ষুস্থির হইবার উপক্রম হইয়াছিল;—দুদিন মাটি ছাড়িয়া উঠিবার সামর্থ্য কাহারো ছিল না।

মুক্তি অন্ধকার ঘরের মধ্যে মলিন বিছানায় একা চুপটি করিয়া পড়িয়া ছিল। তৃষ্ণায় তার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু উঠিয়া জল খাইবে এমন শক্তি ছিল না। সে নীরবে, শুষ্ক কণ্ঠ ও শুষ্ক আঁখি-পল্লব তুলিয়া উপর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া ছিল।

বামার মা কাজ করিতে আসিয়া অনেক ডাকাডাকির পর যখন কোনো সাড়া পাইল না, তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মুক্তি তাহাকে দেখিল,

কিন্তু জল দিবার ফরমাসটুকু করিতে সাহস করিল না। নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কাহারো নিকট কিছু চাহিবার অধিকার যে আছে এমন কথাও সে ভাবিতে পারিত না। সে হয়ত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জল না চাহিয়া চুপ করিয়া থাকিত; কিন্তু বামার মার একটি ব্যবহারে সে একটু সাহস পাইল।

বামার মা মুক্তির শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল,—"ও-মা, অসুখ করেছে বুঝি!" বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি নিজের ভিজে হাতখানা খপ্ করিয়া আঁচলে মুছিয়া মুক্তির কপালের উপর পাতিয়া দিল।

মুক্তির বোধ হইল সেই স্পর্শটিতে তার সমস্ত দেহটি যেন জুড়াইয়া গেল। কী স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ! মুক্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া চোখ বুজিয়া রহিল। তার মনে হইতে লাগিল, এই স্পর্শের মধ্য দিয়া সে এমন একটি জিনিস পাইল, যাহার স্বাদ সে জীবনে কখনো পায় নাই। বামার মা হাত তুলিয়া লইবার পরও অনেকক্ষণ মুক্তির কপালের উপর সেই স্নিগ্ধ স্পর্শটুকু লেপিয়া রহিল।

মুক্তি এতক্ষণে বামার মার কাছে জল চাহিল; কিন্তু কণ্ঠ এত শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল যে কথা বাহির হইল না,—শুধু ঠোঁটের একটি আকুল কম্পন সেই শীর্ণ মুখখানির উপর দিয়া খেলিয়া গেল।

বামার মা বুঝিতে পারিল; বলিল—"জল খাবে বাছা?"

মুক্তি একটু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বামার মা তাড়াতাড়ি জল গড়াইয়া আনিল। তার হাত হইতে ঘটি লইবার যেন তর সহিতেছে না—এমনিভাবে মুক্তি উঠিয়া বসিল; এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটা খাইয়া শুইয়া পড়িল। বামার মা একটা জোর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—"বাছারে আমার! মুখে একটু জল দেবারও কেউ নেই গা!"

সেইদিন হইতে আর বামার মা মুক্তির বাড়ির কাজ সারা হইলেই ছুটিয়া পালাইতে পারিত না; কাজের পর দু-দণ্ড সময়ের বৃথা অপব্যয় তার নিত্যই ঘটিতে লাগিল।

বামার সঙ্গে মুক্তির চেহারার কোনোই সাদৃশ্য ছিল না, কিন্তু তবুও বামার মার কেমন মনে হইতে লাগিল যেন মুক্তি ঠিক বামারই মতন। ভারি আশ্চর্য্য মিল! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কথা,—সেই সব! বামা আজ কতকাল হইল তাহাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেছে, তার চেহারা এখন ভালো

করিয়া মনেই পড়ে না। মুক্তিকে সে কতদিন ধরিয়া দেখিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য, এতদিন তো এটা চোখে পড়ে নাই যে মুক্তি তার বামারই মতন! হঠাৎ সেই অসুখের দিন হইতে এইটে তার কাছে কেমন করিয়া এমন স্পষ্ট হইয়া উঠিল কে জানে! প্রথম প্রথম পরস্পরের চেহারার মধ্যে যে একটু-আধটু অনৈক্যের রেখা দেখা দিত, তাহাও ক্রমে মুছিয়া যাইতে লাগিল। মুক্তিকে যতই দেখে বামার মার ততই মনে হয়—বামা তো আমার এত বড়টাই গো! এমনিই ত! এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বামা যে তার নাই একথা বামার মা ভুলিয়া যাইতে বসিল।

বামার মাকে পাইয়া মুক্তির হৃদয়-কুঁড়িটি একটু-একটু করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তারই সৌরভ তার অন্তরের অলিগলির ভিতর ঘুরিয়া-ঘুরিয়া তার সমস্তটাকে জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। বামার মার কাছে মুক্তির এখন আর কোনো সঙ্কোচ নাই—সে যা-খুসি তাই আবদার করে, কাজের সময় বহিয়া গেলেও তার আঁচল টানিয়া বসাইয়া রাখে, দেরী করিয়া আসিলে রাগ করে, এবং চলিয়া যাইতে চাহিলে অভিমান করে।

বামার মাও মুক্তির কাছে একেবারে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিল। সে যে মুক্তিকে লইয়া কি করিবে খুঁজিয়া পাইত না। তার কেবলই ইচ্ছা হইত মুক্তিকে তার বুকের ভিতরে করিয়া রাখে। তার নিজের সেই সামান্য সমস্তটুকু উপুড় করিয়া দিয়াও তার তৃপ্তি হইতেছিল না। সে আরও দিতে চাহিত, আরও দিতে চাহিত। যে কথাটি কানে শুনিত, মুক্তিকে না বলিলে তার প্রাণ ঠাণ্ডা হইত না; যে জিনিসটি চোখে লাগিত, সেটি মুক্তির জন্য না আনিতে পারিলে ভারি দুঃখ থাকিয়া যাইত।

হারানো ধন ফিরিয়া পাইলে তার যত্ন বাড়ে। বামার জন্য যতটা না করিতে পারিয়াছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি সে মুক্তির জন্য করিতে লাগিল। এমন কি, মুক্তির কাছে বেশিক্ষণ থাকিতে পায় না বলিয়া সে দু-এক ঘরের কাজ ছাড়িয়া দিল এবং যে কয়েক ঘরের কাজ বজায় রহিল তাহাতেও শৈথিল্য পড়িয়া গেল। কারণ মুক্তির উপরই তার মন পড়িয়া থাকিত। যখনই সময় পাইত একবার মুক্তিকে না দেখিয়া গেলে তাহার চলিত না, এবং যাই যাই করিয়া উঠিতে উঠিতে এতটা কাজের সময় বহিয়া যাইত যে তার জন্য তাহাকে ঘরে ঘরে তিরস্কার সহিতে হইত। বিকাল বেলার দিকটায় তার

অনেক কাজ ছিল, তবু সে যেমন করিয়া পারে একটু সময় করিয়া মুক্তির চুলটা বাঁধিয়া দিয়া যাইত। এবং তার পানের দোকানে যখন খরিদ্দার থাকিত না, তখন পায়ের বুড়া আঙুলে একটা দড়ি বাঁধিয়া মুক্তির জন্য চুলের গুছি তৈরি করিত;—তাহাতে সময় সময় এমন তন্ময় হইয়া থাকিত যে খরিদ্দার হাঁকাহাঁকি করিলে তবে চমক ভাঙিত।

মুক্তির উপর বামার মার ভালোবাসার অত্যাচারও ছিল। সে চুল বাঁধিবার সময় মুক্তির মাথা এতটা তেল-জ্যাব্‌জেবে করিয়া দিত, এতটা নীচে অবধি পেটো পাড়িয়া দিত, চুলের গোড়া এতটা শক্ত করিয়া বাঁধিত যে ইহার কোনটাই সুখের ছিল না। কিন্তু এইগুলাই মুক্তির বিশেষ করিয়া ভালো লাগিত। চুল ভালো থাকিবে বলিয়া বামার মা যখন চুলের গোড়া কড়্‌কড়ে করিয়া বাঁধিয়া দিত, তখন মুক্তির সমস্ত মাথাটা টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইটাতেই সে আনন্দ বোধ করিত। এবং এইরূপ আনন্দের প্রতি একটা লোভ মুক্তির মনে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল।

সন্ধ্যাবেলাটি ভারি চমৎকার কাটিত। বামার মা অনেক রূপকথা জানে; মুক্তি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তার কাছে বসিয়া সেই সকল কথা শুনিত। স্বপ্নপুরীর সেই সব কাহিনী সন্ধ্যার আবছায়ার উপরে একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিত। সেখানকার ভয়-ভাবনা, আশা-ভালোবাসা মুক্তির হৃদয়টাকে লইয়া দোলের পর দোল খাওয়াইতে থাকিত। নানা বিপদের পর পক্ষিরাজ ঘোড়ায় করিয়া তরুণ রাজকুমার তার প্রিয়তমা রাজকুমারীকে লইয়া পলাইতেছে—পক্ষিরাজের উদ্দাম গতিতে ভীত রাজকুমারী দুই বাহু দিয়া রাজপুত্রের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে—এই সব কথা যখন শুনিত তখন মুক্তি তাহাতে এমনি ডুবিয়া যাইত যে তার মনে হইত যেন সে নিজেই সেই রাজকুমারী। তার কল্পনার রাজকুমারের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতে গিয়া তার বুক দুর্‌দুর্‌ করিতে থাকিত। আবার রাজকুমারী যখন রাজকুমারের বিরহে বনে বনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে, তখন সেই রাজকুমারীর কান্না মুক্তির বুকের ভিতর হইতে আপনি গুমরিয়া উঠিত। তার পর সব শেষে, মিলনের দিনে রাজপুত্র রথে করিয়া আসিয়া যখন বলিত—রাজকুমারী এস। তখন মুক্তির হৃদয় আগেভাগে সেই রাজপুত্রের রথের উপরে উঠিয়া বসিয়া থাকিত। মুক্তি যখন একলাটি থাকিত, এই সমস্ত কাহিনী মনের পৃষ্ঠা

হইতে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বার বার করিয়া পড়িত—এর নূতনত্ব কিছুতেই ঘুচিত না।

এমনি করিয়া সুখে দুঃখে মুক্তির দিন একরকম কাটিতেছিল ; কিন্তু হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে সব ওলটপালট হইয়া গেল।

গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না—এই প্রবাদটা যখন নকলচাঁদ বাবাজীকেও বাদ দিল না, তখন বাবাজীর বড় বিপদ হইল। প্রতিদিন তার আয় কমিতেছিল। শেষে এমন হইল যে যে-সব ভক্তেরা রোজ কেবল প্রসাদটুকু পাইয়া কৃতার্থ হইবার জন্য আসিত, তাদেরও গাঁজার বরাদ্দের উপর টান পড়িল। চিত্ত আর তেমন স্থির হইতেছে না, ভজন-সাধনের ব্যাঘাত হইতেছে—এই বলিয়া ভক্তেরা দলে দলে অন্য মহাপুরুষের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। নূতন খরিদ্দারও জোটে না, পুরাতন খরিদ্দারও ভাঙিয়া যাইতেছে—এমন কবিয়া আর ক'দিন চলে? কাজেই নকলচাঁদ বাবাজী জাল গুটাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মুক্তির স্বামী কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছিল,—সে বাবাজীর পা কিছুতেই ছাড়ে নাই। চিত্তস্থির হইবার ব্যাঘাত ঘটিতেছে বলিয়া তারও মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিত বটে কিন্তু বাবাজীকে ছাড়িয়া যাইতে মন সরিত না। ইহকাল তো কিছুই নয়—পরকালের জন্যই তো ভাবনা! সেইজন্য এই পরকালের গতি-সম্বন্ধে তার ভারি একটা লোভ ছিল। সে ভাবিত, বাবাজীর কৃপায় যখন স্বর্গের অর্দ্ধেক পথ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছি তখন শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে ;—বাবাজীকে ছাড়া নয়।

বাবাজীরও তাহাকে না হইলে চলিত না। সে বাজার হইতে ঘি আটা আনিয়া দেয়, ধুনীর আগুন জ্বালে, ফাইফরমাসটা খাটে, সকাল সন্ধ্যা পদ-সেবাটাও বেশ করে। এই সব আরাম বাবাজী অনেক দিন হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছে, চট্ করিয়া তাহা ত্যাগ করা তার পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই এই চেলাটি যাহাতে হাত ছাড়া না হয় সেদিকে তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সে একদিন এই ভক্তটির কাঁধের উপর বার দুই তিন থাপ্পড় দিয়া বলিল—"বাচ্ছা, আমি দেখচি তোরই ভিতর খাঁটি চিজ আছে ; ভণ্ড যারা, তারা সব ভেগেছে। এখন চল্, তোর উপায় করে দি।"

মুক্তির স্বামী গুরুজীর এই কথায় একেবারে গদগদ হইয়া গেল। সে

তো আগে হইতেই জানিত যে মহাপুরুষেরা কঠোর পরীক্ষার পর তবে স্বর্গে যাইবার গুপ্ত পথের সন্ধানটি ফাঁস করেন; সেই জন্যই তো সে এমন করিয়া এতদিন বাবাজীর পা-ধরিয়া পড়িয়াছিল। এখন এই মহা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে মনে করিয়া তার গর্ব্ব হইতেছিল। গুরুজীর কৃপা হইয়াছে—এই আনন্দে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া দুই হাত দিয়া গুরুজীর পা জড়াইয়া রহিল।

তার পর একদিন গা-ময় ভস্ম মাখিয়া গুরুদেবের তল্পিতল্পা ঘাড়ে করিয়া, সে গুরুজীর পিছন পিছন কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মুক্তির কথাটা হঠাৎ একবার মনে হইয়াছিল; কিন্তু সে যে তার ধর্ম্মপথের প্রতিবন্ধক—মুক্তিলাভের অন্তরায়! এই জন্য তার কথাটা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টায় তৎক্ষণাৎ গাঁজার কলিকায় কষিয়া একটা দম দিতে বসিয়া গেল। যাইবার খবর মুক্তির কাছে নিজে দিতে গেলে পাছে কোনো ফ্যাসাদে জড়াইয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে যাইবার সময় মুক্তির সহিত দেখা করিতে গেল না,—একটা উড়ো লোক দিয়া খবরটা পাঠাইয়া দিল।

মুক্তির স্বামী আছে, বামার মা শুধু এইটুকুই জানিত; এ-পর্য্যন্ত তার সহিত কোনো পরিচয় হয় নাই। সে যখন মুক্তির কাছে আসিত তখন প্রায়ই তার স্বামী বাড়ি থা'কিত না; দৈবাৎ কখনো দেখা হইলে পাশ কাটাইয়া চ'লিয়া যাইত। কাজেই মুক্তির স্বামী যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে এ সন্দেহটি পর্য্যন্ত বামার মার মনে আসিতে পারে নাই।

মুক্তিও কিছু বলে নাই—বলিবার কোনো তাগিদও তার মন হইতে উঠে নাই। তার মনটি ছিল এমনি ভীরু যে সকল রকম অবস্থাকে নিঃশব্দে মানিয়া লওয়াই তার ধর্ম্ম ছিল। কোনো দুঃখ যখন তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, সে জড়সড় হইয়া তার পানে কেবল চাহিয়া থাকিত;—তার পর সেটা যখন তার মাথার ঝুঁটি ধরিয়া নাড়া দিতে থাকিত তখনও সে এমনি ভয়ে-ভয়ে থাকিত যে একটা আর্ত্তনাদও করিতে পারিত না। সমস্ত দুঃখকে বুকের মধ্যে চাপিয়া সে কাঠ হইয়া থা'কিত।

স্বামী যে তার একটা সহায় এমনভাবে স্বামীকে দেখিবার অবকাশ মুক্তির কখনো হয় নাই, কাজেই স্বামী যখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন সে নিজেকে যে খুব নিঃসহায় মনে করিল তা নয়;—বামার

মার সঙ্গে তার যেমন দিন কাটিতেছিল তেমনি কাটিতে লাগিল। কিন্তু এক জায়গায় একটু বাধিল। স্বামী চলিয়া যাইবার দিন দুই-চার পরে বামার মা বাজারের পয়সা চাহিলে মুক্তি বলিল—"বাজার করবার দরকার নেই।"

বামার মা অবাক্ হইয়া মুক্তির পানে চাহিয়া রহিল।

মুক্তি আর কথাটি কহিল না। তার বলিবার কথা সমস্ত যেন ঐখানেই শেষ হইয়া গেছে। পয়সা নাই তাই বাজার হইবে না—এর আগে কিম্বা এর পরে যে কোনো কথা আছে তাহা তার মন ভাবিতেই ছিল না।

বামার মা কিন্তু এত সহজে ব্যাপারটা উড়াইয়া দিতে পারিল না—সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া আসল কথাটা জানিয়া লইল।

কিন্তু বামার মার মনে কেমন খট্কা লাগিতেছিল—খাম্কা একটা মানুষ নিজের স্ত্রীকে এমন করিয়া ফেলিয়া পালায় কেন? তাই সে বারবার মুক্তিকে প্রশ্ন করিতে লাগিল—"বল না, কিছু ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে বুঝি?"

মুক্তি যতই বলে "না", বামার মা কিছুতেই সে কথা কানে তুলিতে চাহে না। সে চাহিতেছিল, মুক্তি বলুক—"হাঁ।" নইলে সে যে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না।

তারপর দিনের পর দিন চলিয়া গেলে বামার মার আপনা হইতেই যখন দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, মানুষ ঝগড়া করিয়া কখনো এতদিন ঘর ছাড়িয়া থাকে না, তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুক্তির পাশে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সে সময়ে তার নিজের জীবনের কথাই মনে পড়িতেছিল। সে যে ভুক্তভোগী, তার বামাকে বুকে ধরিয়া সে যেদিন একা নিঃসহায় অবস্থায় পথে আসিয়া দাড়াইয়াছিল, সেদিনকার কথা তার মনে পড়িতে লাগিল;—সে কী ভীষণ অসহায়তা!—কোনো দিকে যেন কূল নাই! আজ যে মুক্তিরও সেই অবস্থা; -এই কথা মনে করিয়া তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। একটা মিথ্যা সন্দেহে তার স্বামী যখন তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল, তখন স্বামীর উপর সে তেমন করিয়া রাগ করিতে পারে নাই—হাজার হউক স্বামী তো বটে! সে-দিন সে স্বামীকে ধিক্কার দেয় নাই, নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়াছিল। কিন্তু আজ মুক্তির এই অবস্থা দেখিয়া সে পৃথিবীর সমস্ত স্বামীর উপরে হাড়ে চটিয়া গেল এবং তাহাদের সকলকার মুখাগ্নির ব্যবস্থা করিল।

বিবাহ হইয়া গেলে মুক্তির বাপের বাড়ি হইতে কেউ আর তার কোনো

খবর লয় নাই। মুক্তির সংমা নূতন সংসার বেশ করিয়া জমাইয়া বসিয়াছিল। নিজের ছেলেমেয়েদের লইয়া সে সমস্ত-সংসারটা এমন করিয়া জুড়িয়া বসিয়াছিল যে মুক্তির জন্য এতটুকু স্থান পড়িয়া থাকে নাই। তার উপরে অনটনের সংসার! যাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া রাখা যায়, এমন লোককে ডাকিয়া নিজের ভাতের ভাগ দেবার মতো উদারতা সাধু-সমাজেই দুর্লভ—মুক্তির সংমা তো কোন্ ছার

বাপের বাড়ির দিকে মুক্তির কোনো টান ছিল না। সেখানে তার এমন-কিছুই ছিল না যাহাকে সে আপনার বলিতে পারে। সেই জন্য বামার মা যখন সেখানকার কথা তুলিল তখন মুক্তি অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলিল—"সেখানে আমার কেউ নেই বামার মা।"

বাপের বাড়ির কথা উঠিতেই মুক্তির ব্যাকুল হাতখানা বামার মার আঁচলটা জোরমুঠিতে আঁকড়াইয়া ধরিল।

মুক্তির ঘরে সঞ্চয় ছিল না, গায়ে অলঙ্কারও ছিল না,—এয়োতি-নাম রক্ষা করিবার জন্য হাতে দুগাছি পিতলের চুড়ি ছিল মাত্র। বামার মারও যে আয় ছিল তাতে তার একলার পেটটি কষ্টে চলিত। তার উপর ইদানীং মুক্তির জন্য তাহাকে আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে হইয়াছিল। কাজেই তার একার উপর নির্ভর করিয়া দুজনের দিন চলা ভার হইয়া উঠিল। বামার মা মনে-মনে বলিত, আমি তো অনেক উপবাস করিয়াছি—উপবাস আমার খুব গা-সহা। এই বলিয়া সে মাঝে মাঝে উপবাস দিতে লাগিল। মুক্তি জিজ্ঞাসা করিলে বলিত—"আজ যে মা অন্ন খেতে নেই।" তার পর হঠাৎ একদিন মুক্তি আবিষ্কার করিল যে, পাঁজিতে যেদিন উপবাসের বিধান নাই সে-দিনও বামার মা উপোস করিয়াছে। তখন সে ভারি আপত্তি করিতে লাগিল। সে বলিল—"তুমি যদি অমন করে উপোস কর তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে উপোস করব।"

বামার মা জিব কাটিয়া বলিল—"ওমা সেকি হয়! তুমি হলে এয়োস্ত্রী। আমার যে উপোস করা দরকার মা। তাতে শরীর ভালো থাকে। বুড়োমানুষ বেশী খেলে গতর মাটি হবে।"

বামার মার অন্ন খাইতে হইতেছে বলিয়া পাছে মুক্তি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় সেই জন্য বামার মা মুক্তিকে শুনাইয়া রাখিত যে, সে যাহা দিতেছে

তাহা ধার বলিয়াই দিতেছে—জামাই যখন ফিরিয়া আসিবে তখন সুদসুদ্ধ আদায় করিয়া তবে ছাড়িবে।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই সঙিন্ হইয়া উঠিতে লাগিল। শুধু পেটের অন্ন লইয়া যদি কথা হইত তাহা হইলে না হয় এক-রকম-করিয়া চলিয়া যাইত—কিন্তু তা তো নয়, অভাব যে চারিদিকে। মুক্তির পরণের কাপড় সেলাই করিয়া, তালি দিয়া নানা-রকমে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া ছেঁড়া-বাঁচাইয়া কোনো রকমে লজ্জা নিবারণ হইতেছিল, শেষে তাও আর চলে না; ঘরের ভাড়ার জন্য তাগাদার পর তাগাদা আসিতেছে; স্বামীর হাত চিঠায় মুদির দোকানে যে দেনা আছে তার জন্য মুদি আসিয়া মুক্তিকে যাচ্ছেতাই শোনাইয়া যায়; কলের জল অশুচি বলিয়া তার স্বামী গঙ্গাজল খাইত, তার ধার আছে বলিয়া একদিন একটা উড়ে ভারী ঘর হইতে জলের ঘড়াটা জোর করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। এমনিতর কতদিকে যে কত উৎপাত তার ঠিক নাই;—নিরুপায় বলিয়া কেহ তাহাকে ক্ষমা করিত না। মুক্তি মুখটি বুজিয়া সমস্ত সহ্য করিত।

শেষে আর উপায় না দেখিয়া বামার মা একদিন মুক্তিকে বলিল—"মা, এক কাজ করবি, আমার সঙ্গে পান বেচতে যাবি?"

সকালে অপিসের সময় বামার মার পানের দোকানে ভারি ভিড় হইত। সে একলা সকলকে পান জোগাইয়া উঠিতে পারিত না। তাড়াতাড়ির সময়,—বাবুরা যে দুদণ্ড দাঁড়াইয়া পান লইবে তা হইত না, কাজেই অনেক খরিদ্দার ফিরিয়া যাইত। সেই জন্য বামার মার মনে হইতেছিল যদি এই সময়ে মুক্তি আসিয়া একটু সাহায্য করে তো অনেকটা সুসার হয়।

যে লোক ডুবিতেছে সে যেমন করিয়া কুটাকে আশ্রয় করে, মুক্তি পান বেচিবার প্রস্তাবটি তেমনি করিয়া গ্রহণ করিল।

বড় রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ির গায়ে ছোট্ট একটু রক—তারই এক কোণে ছিল বামার মার পানের দোকান। দোকানের সরঞ্জাম বিশেষ কিছু ছিল না;—একটি দড়ি দিয়া বাঁধা ভাঙা টিনের বাক্স এবং তার ভিতরে কয়েকটি গোল-গোল টিনের কৌটা। বামার মার পাশে একটুখানি জায়গা করিয়া মুক্তি সেই দোকানে আসিয়া বসিল। মুক্তির ছিন্ন মলিন বস্ত্র, কপাল অবধি ঘোমটাটুকু টানা। তার সেই শুষ্ক করুণ মুখখানির উপরে টানা-টানা দুইটি চোখ স্থির হইয়া ভাসিতেছে—শুধু এইটুকুই দেখা যাইতেছিল।

মুক্তি স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তার মনটা চারিদিককার নূতন জিনিস দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তার অনভ্যস্ত চোখ মনের সেই ঔৎসুক্যকে নিজের মধ্যে কিছুতেই জাগাইয়া তুলিতে পারিতেছিল না;—তার চোখ যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল; এবং তার অলস দৃষ্টির সেই নীরব করুণ নীরবতার উপরে তার বোবা হৃদয়টির আভাস থাকিয়া-থাকিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল।

মুক্তি এমন জড়সড় হইয়া ছোট্টটি হইয়া বসিয়া ছিল যে রাজপথের চারিদিকের ব্যস্ততা ও বিশালতার মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া দায়। কিন্তু তাহাতেই আশেপাশে চারিদিকে একটা চঞ্চলতার ঢেউ বহিয়া গেল। অনেকের উৎসুক দৃষ্টি তার উপরে বারে বারে পড়িতে লাগিল। আপিসের বাবুরা দোকানের ধারে এমন ভিড় করিয়া দাঁড়াইল যে, সেই ভিড় দেখিবার জন্যই লোকের ভিড় জমিয়া গেল। মুক্তির হাত হইতে পান লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। সেদিন বাবুদের আপিস যাইবার তাড়াতেও একটু শৈথিল্য দেখা গেল। পান না লইয়া কেহ নড়িল না, এবং পান হাতে লইয়াও বন্ধুর জন্য অপেক্ষার অছিলায় অনেকে দাড়াইয়া রহিল। এমনও হইল যে অপেক্ষা করিতে করিতে হাতের পান ফুরাইয়া গেলে আবার পান লইতে হইল। তাহাতে সময়ের এবং অর্থের যে অপব্যয় হইল তার জন্য তাহাদের এতটুকু ক্ষোভ প্রকাশ করিতে দেখা গেল না।

মুক্তি এত জনসমাগমে একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই যে তারই জন্য এই কাণ্ড;—সে ভাবিতেছিল বুঝি এমনি ধারাই রোজ হয়।

দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া খরিদ্দাররা নানারূপ জল্পনা করিতেছিল, মুক্তির কানে তার গুঞ্জনধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল। সে মুখ নীচু করিয়া পান সাজিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটা উচ্চকণ্ঠের হাসি বা কথার শব্দে সে চমকিয়া উঠিয়া তার সেই টানাটানা অস্ফুট চোখ তুলিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিতেছিল। তার সেই দৃষ্টিটুকুকে সকলে এমনিভাবে গ্রহণ করিতেছিল যেন সেটি তাদের পরম আরাধনার ধন!

তারপর মুক্তির হাতে যখন কাজ রহিল না, সে অলস দৃষ্টিতে রাস্তার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটি মানুষের সঙ্গ ধরিয়া যতদূর পারে সে তার

দৃষ্টিটিকে বহিয়া লইয়া যাইতেছিল, তারপর সে-মানুষটি অদৃশ্য হইয়া গেলে আবার নূতন মানুষের সঙ্গে দৃষ্টিকে বাঁধিয়া দিতেছিল। এমনি করিয়া সে মানুষের পর কেবল মানুষই দেখিয়া যাইতেছিল। তারপর সে-রাত্রে সে যখন নিদ্রা গেল তখন তার মাথার ভিতরে কেবল মানুষের মুখ বিজ্‌বিজ করিতেছে।

পথের লোক যে তার পানে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া যায় এটা অল্পদিনের মধ্যেই মুক্তির নিকট ধরা পড়িল। যেদিন এই খবরটি একটি মানুষের চোখ দিয়া তার মনের মধ্যে প্রথম পৌঁছিল সেইদিন হইতে দেখিল তার দিকে লোকের চাহিবার যেন আর অন্ত নাই! সে অবাক হইয়া গেল।

কিন্তু যে-লোকটির দ্বারা এই খবর সে প্রথম পাইল, স্মরণ-পথে সে অক্ষয় হইয়া রহিল।

তার সঙ্গে মুক্তির যখন প্রথম চোখের মিলন হয় তখন ঠিক্-দুপুর বেলা। রাস্তার গোলমাল প্রায় থামিয়া আসিয়াছে, দু-একটিমাত্র লোক চলাচল করিতেছে। মনে হইতেছিল যেন একটা প্রকাণ্ড অলসতা রাস্তার এধার-ওধার জুড়িয়া গা-মেলিবার আয়োজন করিতেছে। মুক্তির মনের ভিতরেও এতটা অলসতা ধোঁয়ার আকারে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সে আপনার মনে বসিয়া ধীরে ধীরে পান সাজিতেছিল। হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া দেখে দূরে একটি অনিমেষ দৃষ্টি তার মুখের উপরে পড়িয়া আছে। মুক্তি প্রথমে কোনো খেয়াল করিল না, সে চোখ নামাইয়া লইল। খানিকক্ষণ পরে তার চোখ যখন অন্যমনস্কভাবে আবার সেই দিকে গিয়া পড়িল তখনও দেখিল সেই দৃষ্টি সেই এক-ভাবেই রহিয়াছে। তার মনে হইতে লাগিল যেন এই দৃষ্টিটি কতদূর হইতে কতদিন ধরিয়া তারই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া আজ এইমাত্র তার হৃদয়ের তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আপিসের বাবুরা যখন পানের দোকানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইত তখন মুক্তি চোখ তুলিবার বড় অবসর পাইত না;—যেটুকু উপর দিকে চাহিত তাহাতে শুধু ভিড়টাই নজরে পড়িত—আলাদা করিয়া মানুষ চোখে পড়িত না। কিন্তু দুপুরবেলাকার সমস্ত অলসতা ও নির্জ্জনতার উপরে সেই যে একটিমাত্র দৃষ্টি জাগিয়া থাকিত তাহাই মুক্তির কাছে তখন বিশ্বের মাঝে একমাত্র দৃষ্টি বলিয়া মনে হইত। রাস্তায় সে এত লোক দেখিত যে কাহাকেও মনে রাখা সম্ভব নয়—কিন্তু এই-যে একটি লোক সমস্ত মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রতিদিন

একলা আসিয়া দাঁড়াইত তাহাকে ভুলিবার অবসর কোথায়? আর-সমস্তকে ছাড়াইয়া সে মুক্তির নির্জ্জন মনের উপরে দিন দিন চাপিয়া বসিতে লাগিল।

মুক্তির দুবেলা দু-মুঠা জুটিতেছে, পরণের কাপড় মিলিয়াছে, ইহাতে বামার মা খুসী ছিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মুক্তিকে দেখিয়া তার ভাবনা হইত—এমনি করিয়াই কি মেয়েটা ঘরছাড়া ছন্নছাড়া হইয়া থাকিবে। এক-এক সময় তার মনে ভারি ক্ষোভ হইত—হয়ত বা তারই অদৃষ্টে মেয়েটার এমন দশা হইল। সে হতভাগিনী যেখানে গিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মুক্তির কথা ভাবিয়া তার চোখে জল আসিত।

বামার মা চুপ করিয়া থাকিতে পারে নাই। সে গোপনে মুক্তির স্বামীর সন্ধান করিতেছিল। নকলচাঁদ বাবাজীর যে-সব শিষ্য ছিল তাহাদের বাড়ি হাঁটাহাটি করিয়া অনেকবার বিফল মনোরথের পর সে নকলচাঁদ বাবাজীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াছিল; তার পর আধা-লেখা-পড়া-জানা একটা লোককে ধরিয়া অনেক খোসামোদের পর মুক্তির স্বামীকে একখানা চিঠি লেখাইয়া সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। এখন সে উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে।

মুক্তির সেই মনের মানুষটি মনের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছিল। সে যে কোনো দিন আসিয়া মুক্তির সামনে দাঁড়াইয়া কথা কহিবে তাহা মুক্তি কল্পনাও করিতে পারে নাই।

একদিন দুপুরবেলা বামার মা বাজারে পান কিনিতে না কি-করিতে গিয়াছিল—মুক্তি একলাটি বসিয়া ছিল, সে হঠাৎ আসিয়া বলিল—"মুক্তি এস!"

মুক্তি মুখ তুলিয়া চাহিল।

তার মনে হইল "মুক্তি এস!"—এই কথাটি সে যেন স্বপ্নে শুনিল—একটি সহজ সরল পরিচিত ডাকের মতন। স্বপ্নে মানুষ যেমন অসহায় হইয়া যায়,—ঘটনাস্রোত কোথায় লইয়া চলিয়াছে তার যেমন হিসাব থাকে না, মুক্তির ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছিল। কোথায় যাইতে হইবে—কেন যাইতে হইবে—এই সকল প্রশ্নের সংশয় তার সেই স্বপ্নাবিষ্ট কাঁচা মনের জড়তার উপরে কোনো আঘাত দিতে পারিল না। তার কানে গেল শুধু সেই আহ্বানের সুর; সে-সুরের নেশা তার মনে গিয়া লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল এই ডাক যেন বামার মার মুখে শোনা সেই রূপকথার রাজপুত্রের ডাকের

মতন—"রাজকুমারী এস!" অনেক দিনের বিরহের পর, অনেক দুঃখের পর, রাজপুত্র তো এমনি করিয়া আসিয়া অভাগিনী রাজকন্যাকে ডাক দিয়াছিল! মুক্তির চোখের সামনে জল্‌জল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল সেই রাজপুত্র—সেই রাজপুত্রের রথ! তার মন আর বিলম্ব সহিতে পারিল না; তার দুরুদুরু হৃদয় রাজপুত্রের রথের উপরে গিয়া বসিল—মুক্তি দোকান ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল।

তার পর বৈকালে যখন চৌ-রাস্তার মাথায় একলা দাঁড়াইয়া চারিদিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিল, তখন কোথায় তার সেই রাজপুত্র, কোথায় বা তার রথ! তার চোখের উপরে পৃথিবীর আলো ম্লান হইয়া আসিতেছিল। রাজপুত্রের রূপ ধরিয়া এ কোন্ মায়াবী রাক্ষস তাহাকে ভুলাইয়া গেল। তার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল।

তার পর যখন বামার মার দোকানে আসিয়া পৌঁছিল তখন যেন বাণবিদ্ধ পাখীর মতো সে লুটাইতেছে।

বামার মা একলাটি দোকানে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। আজ সে মুক্তির স্বামীর চিঠি পাইয়াছে; সে লিখিয়াছে—তীর্থধর্ম্ম-করা তার আর পোষাইতেছে না, বাড়ি ফিরিবার মন আছে, কিন্তু হাতে পয়সা নাই, ভিক্ষা করিয়া-করিয়া পথ-খরচের জোগাড় করিতেছে, টিকিটের দামটা জমিলেই সে বাড়ি ফিরিয়া আসিবে। বামার মা ভাবিতেছিল টিকিটের দামটা কত? এবং কষ্টেস্থষ্টে কোনোরকমে সেটা এখান হইতে পাঠানো যায় কি না। এমন সময় মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। বামার মা তার দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় গিয়েছিলি মা?"

মুক্তি তার সেই বড়-বড় চোখ দুটো হইতে আগুন ঠিকরাইয়া বলিয়া উঠিল—"যমের বাড়ি।"

বামার মা হতভম্ব হইয়া মুক্তির সেই জ্বলন্ত চোখের পানে চাহিয়া রহিল। মুক্তির স্বামীর চিঠি তার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল।

এমন সময় একজন খরিদ্দার জোর গলায় হাঁকিল—"এক পয়সার পান।"

জীবন-সুধা

দীনেশরঞ্জন দাশ

দুই মাসের ভাড়া দিতে পারি নাই বলিয়া, বাড়ীওয়ালা বাড়ী ছাড়িয়া দিতে জুলুম করিতেছে। বাড়ীওয়ালা জানে, ভাড়া দিতে না পারাতে আমার কোনও হাত ছিল না। মাসকাবারে টাকা পাইয়াই আমি বাড়ীভাড়ার টাকা আলাদা করিয়া একটি কাগজে মোড়ক করিয়া রাখিয়া দিতাম। কিন্তু সে-মাসে ছোট ছেলেটির ঠাণ্ডা লাগিয়া সামান্য কাশী-সর্দ্দি হয়, তখনও ভাবিয়াছিলাম, ভাড়ার টাকা দিতে পারিব। কিন্তু খোকার জর বাড়িল, গলায় ঘড়-ঘড় শব্দ আরম্ভ হইল, বুকে-পিঠে ব্যথা, ডাক্তার ডাকিতে হইল। নিরুপায়—ডাক্তারের দর্শনী ও ঔষধ-পথ্যে দিন পনেরর ভিতরই বাড়ীভাড়ার টাকা উবিয়া গেল। কাজেই সে মাসের টাকা বাকী পড়িল। মাসখানেক পর খোকা ভাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পথ্য জোগাইতে আমার ক্ষুদ্র সংসারের প্রতিদিনের খরচের হিসাবের বাহিরে খরচ হইতে লাগিল। খোকার জন্য সুপথ্য চাই। পুঁইশাক, চিংড়ির ছানা বা কড়াইর ডাল তাহার পক্ষে তখন বিষতুল্য। তাহাকে মুগের ডালের যুশ্, মাগুর মাছের ঝোল ও ছাগলের দুধ, বেদানার রস প্রভৃতি দিতে হইত। তাহাতে দিনে একটি করিয়া টাকা চোখের পলকে খরচ হইয়া যাইত। বাড়ীওয়ালা তাগাদা সুরু করিল। অতিষ্ঠ হইয়া এক একদিন মনে হইত, খোকা আমার ছেলে না হইয়া যদি বাড়ীওয়ালার ছেলে হইত! দ্বিতীয় মাসেও এই সব কারণে বাড়ীভাড়ার টাকা বাকী পড়িল। বাড়ীওয়ালা তাগাদা, গালমন্দ, সবই করিল, কিন্তু আমার শত চেষ্টাতেও কেহ ঐ সামান্য কয়টি টাকা ধার দিল না। কি দেখিয়া দিবে?

বড়লোক আত্মীয়ের কাছে কখনও কোনও দিন সাহায্য চাই নাই; যারা গরীব তাদের অভিমান বড় বেশী। সদাই তাদের মনে হয়, বুঝি তাহাকে গরীব জানিয়াই সকলে অপমান তাচ্ছিল্য করে। এ ভাবটা আমার মনেও ছিল। তাই বড় লোক জানা-শোনা বা আত্মীয়ের কাছে বড় একটা ঘেঁষিতাম না।

এবারে নেহাৎ বিপদে পড়িয়াই এক ধনী আত্মীয়ের কাছে টাকা চাহিলাম। তিনি একখানি নূতন মোটর কিনিয়াছেন—প্রতি মাসে তাহার টাকা শোধ করিতেই সব খরচ হইয়া যায় এই কথা বলিয়া আমাকে তাঁহারই মোটরে চড়াইয়া আমায় বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন।

বাড়ীওয়ালা যথেচ্ছা গালাগাল করিয়া তিন দিনের ভিতর বাড়ী ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিল। তিন দিন পথে, গলিতে ঘুঁজিতে হাঁটিয়া সহরের এক প্রান্তে একখানি বাড়ী ভাড়া পাইলাম। ভাড়া মাসে পনর টাকা। দুইখানি ঘর ও বারান্দায় একটি রান্না করিবার জায়গা—দরমা দিয়ে ঘেরা। তাহাই স্বীকার হইলাম।

চাকরী আমার পাকা। দৈনিক পত্রিকার আফিসে কাজ করি। প্রথমে ঢুকিয়াছিলাম এক মাসে পনেরো টাকায়, এখন ক্রমান্বয়ে বাড়িতে বাড়িতে পঁয়ত্রিশ টাকা হইয়াছে। তাহা ভিন্ন গল্প লেখায়ও আমার একটু-আধটু হাত আছে। নিতান্ত কষ্টে-সৃষ্টে গল্প লিখি, মাসিক পত্রিকার আফিসে দেই, মনোনীত হইলে পাঁচ দশ টাকা পাইয়া থাকি। তাহাও গড়পড়তায় দু মাসে হয়ত একটি গল্প লেখা চলে বা মনোনীত হয়। কিন্তু তাহাতেও সসম্মানেই এতদিন চালাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু এবারে বড় বিপদ জুটিল।

আর একদিন মাত্র বাকী। বাড়ী ছাড়িতে হইবে। বাংলামাসের শেষ। পাওনাদার মুদী, বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবার সময় আমার দিকে এমন করিয়া তাকায় যে ইচ্ছা করে তখনি তাহার টুঁটিটা চাপিয়া ধরি। কিন্তু টাকা কই যে তাহার পাওনাগণ্ডা তাহার নাকের উপর ছুড়িয়া দেই। মাথা নীচু করিয়া চলিয়া যাই।

সেদিন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি, কোথাও হইতে গোটা পাঁচেক টাকা জোগাড় করিতে পারি কি না তাহারই চেষ্টায়। বাড়ী উঠিতেও ত কিছু খরচ আছে! ভাবিতে ভাবিতে কিছুদূর চলিয়া আসিয়াছি, সম্মুখেই ডাকপিয়ন বলিল, বাবু আপনার দুখানা চিঠি। আমি চিঠি হাতে করিয়া আগাইয়া যাইব, লোকটা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। আমি কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছু বলবে ?

সে মাথাটা একটু নীচু করিয়া সবিনয়ে বলিল, হুজুর, আগে আগে সব

পূজাতেই কিছু পেতাম, এবারে হোলিতে পেলাম না, দুর্গাপূজায়ও পাইনি, আমাদের—

তাহার কথা আর সে শেষ করিল না। আমি মিনিট দুই ভাবিলাম, তাহাকে কি বলিব ? বাড়ী ছাড়িব শুনিলে সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িবে।

অনেক ভাবিয়া বলিলাম, বাড়ীর সামনের ঐ মুদির কাছে তোমাদের এ 'বিটে'র তিন জনের বক্‌শিস্ রাখিয়া দিব, তাহার কাছে চাহিলেই পাইবে। আমি ত সর্ব্বদা বাড়ীতে থাকি না। আমার সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে।

এই কথাগুলির মধ্যে বাড়ী যে ছাড়িয়া চলিয়াছি, এই কথাটাই মাত্র গোপন করিয়াছিলাম, কিন্তু সত্য সত্যই ভাবিয়াছিলাম মুদীর টাকা মিটাইবার সময় পিয়নদের তিন জনের পার্ব্বণী-বাবদ চার আনা হিসাবে বার আনা পয়সাও তাহার কাছে রাখিয়া যাইব।

আমি চলিতে চলিতে চিঠি দুইখানি খুলিয়া একবার করিয়া চোখ বুলাইয়া লইলাম। দেখিতে না পাইয়া পথের একটা গ্যাশপোষ্টের সঙ্গে মাথাটা ঠুকিয়া গেল। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল, চোখে সব ঘোর হইয়া আসিল। শুনিলাম আশেপাশে লোকেরা বলাবলি করিতেছে, বাবুর এত কাজের তাড়া যে পথে-ঘাটে চিঠি না পড়লে চলে না, মাথা তো ঠুক্‌বেই। গরুর গাড়ীর তলায় পড়েন নি তাই ভাগ্য।

মন জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, মাথাটা ফাটিয়া ফুটিয়া চৌচির হইয়া যাইত! প্রাণপণ চেষ্টায় আবার চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর গিয়া যখন চোখের আব্‌ছা ভাবটা কাটিয়া গেল, তখন দেখি আমার গায়ের চাদর ও জামা রক্তের দাগে ভরিয়া গিয়াছে !চাদরটিকে ঘুরাইয়া বেশ করিয়া দাগগুলি চাপা দিলাম।

দুইখানি চিঠির একখানি আসিয়াছিল এক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের নিকট হইতে। লিখিয়াছেন, দিন পাঁচেকের মধ্যে একটি ছোট গল্প লিখিয়া দিতে পারিলে আমার উপযুক্ত পারিশ্রমিক তখনই পাইব। মনে ভাবিলাম, পারিশ্রমিক! আমাদের এত কষ্টের লেখার দাম মাত্র পাঁচ দশ টাকা! কিন্তু ও সব ভাবিবার আর সময় নয়। লেখা চাহিয়াছে এই যথেষ্ট। এ সময়ে ঐ কয়টি টাকা পাইলেই আমার পক্ষে লাখ্ টাকা। গল্প যেমন করিয়া হউক লিখিয়া দিতেই হইবে। টাকা কয়টা পাওয়া যাইবে ত!

ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি কি লইয়া গল্প লিখিব, এমন সময় পথে আমার এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বহুকাল পরে তুজনের দেখা। সে এখন বড় একটি কলেজের প্রফেসার। ছেলেবেলায় রোগা ছিল, এখন দিব্যি নাতুস্নুতুস্ চেহারা হইয়াছে।

দেখা হইতেই সে খুব আন্তরিক প্রীতির ভাবেই বলিল, কি হে সাহিত্যিক, আজকাল ত তোমার নাম শুনে শুনে কানে তালা ধরে গেল। গল্প লেখায় ত তোমার পোয়াবারো! তার পর বেশ হচ্ছে-টচ্ছে ত?

আমাকে বাধ্য হইয়া হাসিমুখে বলিতে হইল, হঁ্যা একরকম চলে যাচ্ছে। তার পর কবে এলে, কোথায় আছ, ক'দিন থাক্‌বে?

সে সব কথাগুলিব উত্তর দিয়া মাঝখানে বলিল, উঠেছি—ভাই, এক হোটেলে। গুচ্ছের পয়সা নেয় কিন্তু খাবার-দাবার মুখে ওঠে না। তোমার ঠিকানাটা জানা থাক্‌লে তোমার বাড়ীতেই উঠ্‌তাম। তোমার বাড়ীটা কোথায় বল ত?

বন্ধু খুব আনন্দের সহিতই এ প্রস্তাবটি করিলেন, কিন্তু চট্‌ করিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারিলাম না।

বন্ধু বলিল, চল তোমার বাড়ীটা দেখে আসি।

আমি আর বলিতে পারিলাম না টাকার খোঁজে বাহির হইয়াছি।

হঠাৎ বন্ধুটি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিল,—তোমার কপাল যে কেটে গেছে। কি করে লাগ্‌ল বলত?

তাহার এই কথাটি শুনিয়া আমার মাথাটা যেন ঘুবিয়া গেল। বন্ধুরই কাঁধের উপর হাত দিয়া ভর করিয়া বলিলাম—ও কিছু না, মৃগী।

বন্ধু সস্নেহে বলিল,—মৃগী? মৃগী কি? তোমায় কি ঐ ব্যায়রামে ধরেছে নাকি?

আবার মিথ্যা বলিলাম। এবার আর মুখে না, শুধু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলাম।

সব ভাবনা আবার মাথায় আগুনের হল্‌কার মত একবার চকিতে ছড়াইয়া পড়িল, চোখে অন্ধকার দেখিলাম, বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিয়া অতিকষ্টে বলিলাম,—আমাকে কোথাও বসিয়ে দাও।

যখন জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম তখন আমি আমারই বাড়ীতে শুইয়া আছি।

আমার মাথার কাছে আমার স্ত্রী, খোকা বুকের কাছে বসিয়া আছে। চারিদিক তাকাইয়া বন্ধুকে দেখিতে পাইলাম না। তাহার বুকের উপরই যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা মনে ছিল।

স্ত্রী আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, সেই ভদ্রলোকটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুতেই ভেতরে বস্‌লেন না।

নিজের উপর অত্যন্ত ধিক্কার আসিল। এত অক্ষম আমি! স্ত্রীকে আস্তে আস্তে বলিলাম, ঘরে যা আছে, তাই দিয়ে এ বেলার খাবারের বন্দোবস্ত কর। ও আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু অমৃত।

খোকাকে পাঠাইয়া দিলাম, কাকাবাবুকে ডেকে নিয়ে এস।

অমৃত এল। তার মুখে চিন্তার চিহ্ন, আমার কাছে ধীরে ধীরে আসিয়া বসিল।

আমিও উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু বড় দুর্ব্বল লাগিতেছিল।

বন্ধু বলিল, শরীরটা ত তোমার বড় খারাপ হয়ে গেছে। কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকবে চল।

আমার হাসি পাইল। যাবার কি আমার পথ আছে। পাওনাদার গিস্‌গিস্ করিতেছে, বাড়ীভাড়া বাকী। খবরের কাগজের আপিসের চাকরী—একদিন ছুটি নেই।

যাহোক্ করিয়া সে বেলার মত বন্ধুর সেবা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। অমৃতও প্রকৃত বন্ধুর মত পরম সমাদরে আমার গৃহের সামান্য দুটি অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ করিল। আহার করিতে করিতেই ভাবিতেছিলাম তাহার পর কি হইবে। বেলা ত পড়িয়া আসিল। এ বেলার মধ্যেই বাড়ী ছাড়িতে হইবে।

আহারের পর অমৃতকে সে কথা বলিলাম। সে আগ্রহের সহিত বলিল, বেশ ত, তোমার কিছু করে দরকার নেই। আমিই মুটে ডেকে সব ব্যবস্থা করছি। তুমি একটুও নড়বে না। বৌদি আর আমি সব বন্দোবস্ত করতে পারব।

সবই ত বন্দোবস্ত হইতে পারে কিন্তু টাকার ব্যবস্থা কেমন করিয়া হয়।

এমন সময় বাহির হইতে মুদী ডাকিল, বাবু বাড়ী আছেন?

সে বাড়ীর ভিতরেও আসিত। পাছে সে ভিতরে আসিয়া পড়ে এই

ভাবিয়া আমার স্ত্রী খোকাকে সঙ্গে লইয়া চোখের পলকে সদর দরজায় চলিয়া গেলেন।

এর পরিণাম কি আমার বুঝিতে বাকী রহিল না। কিছুক্ষণ পরেই শুনিলাম, মুদীটা আমার সম্বন্ধে চীৎকার করিয়া অতিশয় অপমানজনক কথা বলিতেছে।

আমি নিষেধ করিবার পূর্ব্বেই অমৃত উঠিয়া গেল।

আমার স্ত্রী ও খোকা ভিতরে চলিয়া আসিলেন।

একটু পরেই শুনিলাম মুদীটা বলিতেছে, আমি কি আর জানি বাবুর অসুখ। আমি জানি, বাবুর টাকা যাবে কোথায়? কোনোদিন বাকী রাখেন না, ধারে খান্ না। এবার না হয় পেতে দেরী হয়েছে। তাই ত আমি ভাব্‌ছিলাম।

বুঝিতে পারিলাম, মুদী টাকা পাইয়া চলিয়া গেল। অমৃত তবুও ভিতরে আসিল না। ভাবিতেছিলাম সে গেল কোথায়? এ ঋণ তাহার কেমন করিয়া শুধিব?

কয়টা মুটে বকর বকর করিতে করিতে অমৃতের সঙ্গে আসিল। অমৃত আমাকে একটি কথা বলিবার অবসর দিল না। বাঁধা ছাঁধা যাহা ছিল সে একে একে মুটের মাথায় চাপাইতে আরম্ভ করিল। মোট চাপান হইয়া গেলে সে আমার নিকট হইতে নূতন বাড়ীর ঠিকানাটা লিখিয়া মুটে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল।

আমার স্ত্রী বারান্দার পিল্‌পেটা ধরিয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। খোকা তাহার খেল্‌না পাতি গুছাইতে ব্যস্ত! বাড়ীতে বহুকাল হইতে একটা বিড়াল ছিল, বিড়ালটা একবার ঘর, একবার বাহির করিতে লাগিল।

বৃথা ভাবিয়া কি করিব, উঠিয়া পড়িলাম। কাগজ খাতা পত্র যতদূর সম্ভব গুছাইয়া লইলাম। বিছানাটা জড় করিয়া বাঁধিতে বসিলাম। হাতে আর যেন শক্তি নাই! একদিকে আমার স্ত্রী, একদিকে আমি। টানাটানি করিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলাম না। হঠাৎ দুজনের চোখে চোখ পড়িল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম, আমার স্ত্রীও হাসিয়া উঠিলেন।

যাহা হউক, অমৃতের সাহায্যে বাড়ী বদল করা হইল। নূতন বাড়ীটিতে

দুইখানি ঘর। বাড়ীর পিছনদিকে একটি জলবিরল ডোবা। ডোবার ওধারে একঘর গয়লার বাস। তাহার পরেই দিগদিগন্তবিস্তৃত শস্যহীন শুষ্ক মাঠ।

কিছুদিন থাকিয়া অমৃত তাহার কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল।

সপ্তাহখানেক পরেই আমাদের কাগজের সম্পাদক রোগে পড়িয়া শয্যা লইলেন। তাঁহার কার্য্যাদি তখন আমাকেই সম্পন্ন করিতে হইত। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে প্রায় প্রতিদিনই একবার করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতাম। বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী ও একটি বিধবা কন্যা। কন্যাটির বয়স অতিশয় অল্প। অনেক খরচ করিয়া একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসর দুই পরেই কন্যাটি বিধবা হইল।

সম্পাদক মহাশয়ের রোগ বাড়িল। প্রায় মাসখানেক রোগভোগ করিয়া তিনি দেহমুক্ত হইলেন।

লোকজন জোগাড় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেলাম। শ্মশানটি একটি নদীর তীরেই। মৃতদেহ চিতার উপর দাহ হইতেছে। আমি একটু সরিয়া গিয়া নদীর ধারটিতে বসিয়া আনমনে কি ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ কোথায় কাছেই একটি কোকিল ডাকিয়া উঠিল। এস্থানে কোকিলের ডাক বিশ্বাস হইল না। প্রথম কয়েকবার ডাক শুনিয়া মনে হইয়াছিল, কোনও বালক হয়ত আমোদ করিয়া কোকিলের ডাকের অনুকরণ করিতেছে। আবার যখন ডাক শুনিলাম, তখন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, শ্মশানের একধারে একটি দেবমন্দির, দরজা তালা দিয়া বন্ধ, মন্দিরের বাহিরটা ইট সাজাইয়া মাটি লেপিয়া বেশ সুন্দর একটু বসিবার স্থান করা হইয়াছে। মন্দিরের এক কোণ দিয়া ভিত্তিগাত্র ভেদ করিয়া একটি ছোট অশ্বত্থ গাছ মাথা গলাইয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়াছে। সেই অশ্বত্থ গাছেরই ডালে ছোট খাঁচায় একটি কোকিল ডাকিয়া মরিতেছে।

শবদাহ শেষ হইল। সকলে বাড়ী ফিরিলাম। আমি বরাবর সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ীতেই গেলাম। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাটি তখনও মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন।

রাত্রিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের কিছু খাওয়াইতে পারিলাম না।

কি বলিয়া বাড়ী ফিরিব তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময় সম্পাদক

মহাশয়ের স্ত্রী নিজেই বলিলেন, আমাদের জন্য বসে থেকে আর কি করবেন। সারা-জীবনই ত এখন এভাবেই সহায়হীন হ'য়ে কাটাতে হবে। আপনি বাড়ী যান। যদি পারেন কাল একবার দেখা ক'রে যাবেন।

বাড়ীতেও আমার স্ত্রী এবং খোকা একলা। যাহা-হউক আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিলাম তাঁহাদেরই দূর আত্মীয় একটি ছেলে সে রাত্রির মত তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিল।

রোজকার মত সকালে উঠিয়া বাজার করিয়া আনিলাম, স্নান করিলাম, আহার করিলাম। মনের ভিতর এই অসহায় পরিবারের কথা ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছিল। মানুষ বোধ হয় এত দেখিয়া বুঝিয়াও এমনি না ভাবিয়া পারে না।

আপিসে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের বাড়ী গেলাম। তখন বেলা দুপুর। বাড়ীর জানালা দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। বুঝিলাম, মানুষের ক্ষুধা তাহাকে তাহার আহার সংগ্রহের ব্যবস্থায় নিয়োজিত করিতেছে।

অতি সন্তর্পণে বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। ঘর দুয়ার বেশ করিয়া ধোয়ান হইয়াছে। আমরা নূতন বাড়ীতে আসিয়া যেমন করিয়া আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ঘর দ্বার ধোয়াইয়া নূতন সংসার পাতিয়া বসিয়াছিলাম, এও প্রায় তেমনি। সেই সংসারই প্রয়োজন মতে নূতন করিয়া যেন পাতান হইল।

সম্পাদক মহাশয়ের বিধবা কন্যাটি আসিয়া আমার সম্মুখে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি কাহাকেও কখনও সান্ত্বনা দিতে জানি না। তাই কোনও কথা বলিয়া তাঁহাদের এই প্রত্যক্ষ ক্ষতি ও শোককে ভুলাইতে চেষ্টা করিলাম না।

সম্পাদক মহাশয়ের স্ত্রীকে এই প্রথম বিধবার বেশে দেখিলাম।

তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া আবার সন্ধ্যার সময় আসিব বলিয়া আমার আপিসে গেলাম। আপিসে বসিয়া সম্পাদক মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধেই কল্পনা ও বাস্তব লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম, বেয়ারা খবর দিল বড়বাবু ডাকিতেছেন।

বড়বাবু আমাদের এই পত্রিকা চালান, তাঁহারই অর্থে এই পত্রিকার মূলধন। তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। মনে একটু ভয় হইল। যাহারা অভাবে দুঃখে কাটায়, তাহাদের শঙ্কা অকারণেও আসে। বড়বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইতে

তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, কালকের কাগজে সম্পাদকের নামের স্থানে আপনার নাম ছাপা হইবে। আপনার মাহিনা ষাট টাকা হইল।

একটু দাঁড়াইয়াছিলাম, কিছু বলিবার ছিল না, বড়বাবু কাজ করিতেছিলেন। আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু বল্‌বার আছে।

কি বলিব, আমার আর কি বলিবার থাকিতে পারে। সম্মুখেই কর্ত্তার মাথার উপরে দেয়ালে টাঙান দেবমূর্ত্তির ছবির দিকে চোখ পড়িল। কিছু না বলিয়া নিতান্ত অভিভূতের মতই কর্ত্তার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

আপিসের সকলেই একে একে আমার ঘরে জড় হইল। সবাই উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, কিছু কি ব্যবস্থা হোল ?

আমি সরল ভাবেই নূতন ব্যবস্থার কথা বলিলাম। সকলে খুসী হইয়া আমাকে তাহাদের শুভকামনা জানাইল।

সন্ধ্যা হইয়া গেলে রাখালবাবুর বাড়ীর দিকে চলিতে মন কেমন করিতেছিল। আশ্চর্য্য মনের এই সময়কার অবস্থা!

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রাখালবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ভবিষ্যতের বিলি-ব্যবস্থার সম্বন্ধে কথা হইল। সেদিনও কিছু বিশেষ ঠিক হইল না। কিন্তু এতক্ষণ থাকিয়াও আমার পদোন্নতির সংবাদটি তাঁহাদের নিজমুখে বলিতে পারিলাম না।

বাড়ী ফিরিয়াও স্ত্রীকে এ কথা বলিতে পারিলাম না। অন্য ব্যাপারে এরূপ সুদিন আসিলে হয়ত ছুটিয়া আসিয়া প্রথমে তাঁহাকে বলিতাম। কিন্তু আজ তাহা পারিলাম না।

রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া অমৃতের ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য খরচ-পত্রের হিসাব করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

বৎসর কাটিয়া গেল। রাখালবাবুর স্ত্রী পিত্রালয়ে কন্যাসহ চলিয়া গিয়াছেন। পিত্রালয়েও সহায় সম্বল বড় কেহ নাই। তাঁহার মাও বিধবা। একটি মাতৃ-পিতৃহীন ভাগিনেয় আছে, সে-ই বাড়ীতে পাহারা। ছেলেটি কাজকর্ম্ম কিছু করে না, পাড়ায় আড্ডা ও আখ্‌ড়া লইয়া কাটায়। কিন্তু তবুও পুরুষ মানুষ সম্বল ত ?

আমার স্ত্রী প্রথম যেদিন আমার এই পদোন্নতির কথা শুনিতে পান,

সেদিন তাঁহাকে দেখিয়াও যেন একটু আশ্চর্য্য মনে হইল। এমন সংবাদ শুনিয়া তাঁহার খুব খুসী হইবারই কথা, কিন্তু তিনি এমন মুখ করিয়া রহিলেন, তাহাতে আমার মনে হইল, আমি যেন কাহারও সম্পত্তি অপহরণ করিয়া আনিয়াছি আর সে ধন তিনি ভোগ করিতে উৎসুক নন্।

নিদারুণ অভাবে পড়িয়া স্ত্রীর যে কয়েকখানা গহনা ছিল তাহা একে একে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল, তাহা পুনরায় গড়াইয়া দিবার উপায় ছিল না। একদিন আফিস হইতে পথে এক মাসিক কাগজের আফিসে আমার একটি গল্প মনোনীত হইয়াছে কি না নিতান্ত উদাসীন ভাবেই খোঁজ করিতে গেলাম। সম্পাদক দেরাজ খুলিয়া পনেরটি টাকা আমাকে দিয়া বলিলেন, গল্পটি বেশ সুন্দর হইয়াছে, এবং আগামী মাসেও আর একটি গল্প পাইলে তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন।

এবার খুসীতে সত্যই মন ভরিয়া গেল। টাকাগুলি পকেটে লইয়া ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিতেছি, দেখিলাম, পথের ধারেই একজন লোক একটি কাঁচের বাক্স পাতিয়া নানাপ্রকারের আংটি, কানের দুল, ব্রোচ্ প্রভৃতি বিক্রী করিতেছে। বেশী কিছু না ভাবিয়াই বাছিয়া বাছিয়া একজোড়া পাথর বসান কানের দুল্ এক টাকা চারি আনা দিয়া কিনিয়া ফেলিলাম।

বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে দিলাম। তিনি সানন্দে তাহা গ্রহণ করিলেন। চোখের দৃষ্টিতে তাঁহার যে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইল তাহারই আলোকচ্ছটা যেন দুল-জোড়ার পাথরের উপর চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। তিনি কেবল মাত্র বলিলেন, এখুনি এত দাম দিয়ে দুল না কিনিলেও চলিত।

নিত্যকারের মত আমি পরদিন আপিসে গেলাম। কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখি আমার স্ত্রী চুপটি করিয়া বিছানায় শুইয়া আছেন। অন্য দিনের মত আমি ঘরে আসিলেও উঠিয়া বসিলেন না।

কাছে যাইয়া অসুখ করিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম, কোনও উত্তর পাইলাম না। কি হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়া মনটা একটু অস্থির হইল।

খোকা ঘুমাইয়াছিল, আমার কথাবার্ত্তায় জাগিয়া উঠিয়াই বলিল, বাবা, তুমি মাকে ঠকিয়েছ! গয়লা-বউ বল্‌লে, ও আসল সোনার দুল নয়, গিল্টী করা। কত তারা হাস্‌লে, মাকে কত ঠাট্টা করলে। বললে, এর দাম বড় জোর বার আনা হতে পারে।

দুলের কথা আমার মনেই ছিল না; এবার সব কথা এক সঙ্গে মনে পড়িল। কিন্তু আমার মনের কথা কেমন করিয়া বুঝাইব। কতদিন যে আমার স্ত্রীকে কিছু গহনা দিতে পারি নাই, তাহা ভাবিয়া মনে কত কষ্ট পাইয়াছি। তিনি কখনও আমার কাছে কিছু চাহেন নাই, তবুও তাঁহার দুই হাতে দু'গাছি শাখা দেখিয়া আমার মন দুর্ভাগ্যের ইতিহাস স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিত। ভাবিয়াছিলাম, দুল জোড়া এখন এ রকমই দিই, তাহার পরে আর কিছু টাকা হইলেই, তাঁহার হাতের এক জোড়া বালা গড়াইয়া দিব।

খোকার কথা শুনিয়া মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিছু আর বলিতে পারিলাম না।

আমার স্ত্রী খোকাকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, রাজু, এবার ঘুমোও বাবা। আমি বাবাকে খেতে দিই।

খোকা ঘুমাইয়া পড়িল। আমি মুখ হাত ধুইয়া ভাবিতেছিলাম, স্ত্রী ধীরে ধীরে আসিয়া নিতান্ত অপরাধিনীর মত বলিলেন, খাবার দিয়েছি।

তাঁহার মুখে চোখে একটা দারুণ ক্ষোভের চিহ্ন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া আমি আর কোনও কথা তুলিতে পারিলাম না।

পরদিন আপিসে যাইবার সময় দুল-জোড়া চাহিয়া সঙ্গে লইয়া গেলাম। তাহা দিয়া কি করিব তাহা কিছুই ভাবিয়া ঠিক করি নাই।

এক মাসের ভিতরেই খোকার আবার জ্বর সুরু হইল। পাড়ার ডাক্তার দেখাইলাম। তিনি বলিলেন ম্যালেরিয়া। মকরধ্বজ খাওয়ান্। সঙ্গে কুইনাইন্ চলিল।

দিন কয়েক কাটিয়া গেল। মকরধ্বজ কিনিবার পয়সা জুটিল না। মাসকাবারে মাহিনা পাইয়া পথেই এক কবিরাজের দোকানে উপস্থিত হইলাম।

আমি দোকানে ঢুকিতেই কবিরাজ মহাশয় তাঁহার সম্মুখে স্থিত কাঠের হাত-বাক্সটি একটু সরাইয়া রাখিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাই আপনার ?

এরূপ অপ্রত্যাশিত সম্ভাষণ শুনিয়া আমি একটু স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমি যত আস্তে কথা বলি তিনি তত তারস্বরে চেঁচাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সকল তথ্য জানিয়া লইয়া আর একটি লোককে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, ওঁর কাছে যান্।

তাঁর কাছে যাইতে তিনি ফরাস্‌-বিছান চৌকীতে বসিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাও চেঁচাইয়া। ব্যাপার কি আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এক কোণে একটি লোক উবু হইয়া বসিয়া একটি পাথরের বাটিতে বড়ি পাকাইয়া পাকাইয়া রাখিতেছিল, তাহার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিলাম। যদি একটু সহানুভূতি পাই। তিনি বোধ হয় মনে করিলেন, এতক্ষণ যে সকল কথা-বার্ত্তা হইয়াছে আমি তাহা ভাল করিয়া কিছুই শুনিতে পাই নাই, তিনি তাই অনুগ্রহ করিয়া আরও উচ্চস্বরে বলিলেন, একটু বসুন, মাত্রা ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে।

আমি কথা বলা বন্ধ করিয়া হাত নাড়িয়া বুঝাইলাম, আমি বুঝিয়াছি। ফল যাহা হইল, তাহাতে এবার হাসি পাইল।

যিনি বড়ি পাকাইতেছিলেন, তিনি কবিরাজ মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ভদ্রলোক একেবারে বদ্ধ কালা।

শুনিয়া ত আমি অবাক্‌। আমি বোকার মত তাহাদের দিকে তাকাইতে তাঁহারা যেন আরও বিপন্ন বোধ করিলেন। যিনি ঔষধ মাপিতেছিলেন, তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়া নাড়িয়া ঝাঁকুনি দিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিলেন যে আর মিনিট দুয়েকেব মধ্যেই আমি ঔষধ পাইব। তাহাব পর কয়েকটি পুরিয়া মোড়ক বাঁধিয়া আমার হাতে দিলেন। এক টুক্‌রা কাগজ টানিয়া লইয়া পেন্‌সিল দিয়া খস্‌-খস্‌ করিয়া লিখিলেন,—"মূল্য ৮ মাত্রা এক টাকা।"

আমি কথাবার্ত্তা না বলিয়া পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া বিরক্তির সহিত ফেলিয়া দিলাম।

উঠিয়া যখন দরজা দিয়া বাহিব হইতেছি—তখনও শুনিলাম, কবিরাজ মহাশয় বলিতেছেন, আমি লোকটির চাহনি দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ভদ্রলোক কানে অত্যন্ত কম শোনেন। নাড়ী পরীক্ষা ভিন্নও বাহ্যিক অবয়ব দ্বারা—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমি পথে পড়িয়াছিলাম। নিজের মনেই খুব হাসিয়া উঠিলাম। খেয়াল ছিল না, একটি লোকের গায়ে সামান্য একটু ধাক্কা লাগিয়া গেল। সে অমনি বাগিয়া চেচাইয়া উঠিল, আচ্ছা পাগল ত, লোকের গায়ে ধাক্কা মেরে পথ চলা এ কোন্‌ দেশী পাগলামী বাবা ?

সেই সন্ধ্যার অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া আমার আরও হাসি পাইল। এ যেন

হাসির তোড় আসিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও বিরত হইতে পারিলাম না। এক নিমেষে যেন এক আবদ্ধ হাসির স্রোত আমার বক্ষ ভাঙিয়া অবিশ্রান্ত ধারায় বাহির হইয়া আসিল।

হাসিতে হাসিতেই বাড়ী চলিলাম। যে দেখে সেই চুপি চুপি বলে, লোকটা পাগল। আমি শুনি, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কোন চেষ্টাই করিলাম না।

হাসিতে পারিলে বোধ হয় লোকের চেহারা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। খুব সম্ভব আমার মুখও কিছু উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। আমার স্ত্রী আমাকে দেখিয়া প্রীতিভরে উপহাস করিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার? ঘোড়া যে দানা দেখেই হেসে মল।

আমি তাঁহার আচরণে সুখী হইলাম। তুল্ কেনার অপরাধ জনিত বিরক্তি আর তাঁহার মুখে নাই। মনটা সত্যই একটু সুস্থ হইল।

কাপড় ছাড়িয়া বসিয়াছি, তিনি হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন। আমার চমক ভাঙিল। আমি ভাবিলাম এ আবার কি? আবার কিছু নূতন নাকি। আজ সন্ধ্যে বেলাটা যে ভাবে কাটিয়াছে!

স্ত্রী হাসিতে হাসিতে আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, আজ তোমাকে লোকের কাছে একেবারে নির্ব্বোধ বানিয়ে ছেড়েছি।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ওরা সব আজকে আবার তাই নিয়ে ঠাট্টা করতে এসেছিল, আমি তা' শুন্‌ব কেন? গরীব যে আমরা, তা' আর আমাদের ত অন্যকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। ওরা যেমন কথা তুল্‌ল, অমনি আমি মুখখানি ভারি ক'রে বল্‌লাম, ওঁর কথা আর বলো না ভাই! কেবল লেখা—আর পড়া। এই করেই ত মাথাটা একেবারে গেছে। কত লোক যে ঠকিয়ে গেল! সংসারের কিছু কি খবর রাখেন? তুল্-জোড়া কোন্ হতভাগা নিশ্চয় আসল ব'লে ওঁর কাছে বিক্রী করেছে! কথা ক'টি বেশ কাজে লাগ্‌ল। সবাই অমনি বল্‌তে লাগ্‌ল, আহা তাইত, তাইত, এতগুলি টাকা জলে গেল।

তাদের মুখ দেখেই আমি বুঝ্‌লাম, তারা 'কাৎ'। সময় আর অবস্থা বুঝে বল্‌লাম, তা' গেছে গেছে, যে সব জোচ্চোরের পাল্লা, চুরির দায়ে যে পড়তে হয়নি এই ঢের!

আমি স্ত্রীর মুখে সকল কথা শুনিয়া আরও লজ্জায় পড়িলাম। তিনি ছুটিয়া গিয়া একখানা চিঠি আনিয়া আমার হাতে দিলেন।

চিঠিখানি না পড়িয়াই আমি বলিলাম, কেন ওরকম করে বল্‌তে গেলে?

স্ত্রী অমনি একটু বিদ্রূপ করেই বল্‌লেন, যেমন তোমরা সমাজের কর্ত্তা, তেমনি তোমাদের সমাজ! আমরা যদি অক্ষম ব'লে ঝুটো গয়নাই পরি, তাতে লোকের কি যায় আসে বাপু। ঝুটো গয়না পরেই যদি আমরা সুখ পাই!

বহুকাল স্ত্রীকে আদর করিয়া কথা বলিবার অবকাশ পাই নাই। দীর্ঘকাল দারিদ্র্য ও ব্যাধির সহিত লড়িয়া লড়িয়া মনটা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, আজ আমার স্ত্রীর এই কথাগুলি শুনিয়া মনে হইল, এমনি করিয়া একজন আর একজনের বোঝা হাসিয়া মাথায় করিয়া লয় বলিয়াই পৃথিবীর এই দুঃখ-সংঘাতের মধ্যে সরসতা সৃষ্টির ধারাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

চিঠিখানি পড়িয়া দেখিলাম, রাখালবাবুর স্ত্রী ও কন্যার অত্যন্ত দুরবস্থা। রাখালবাবুর শাশুড়ীও মারা গিয়াছেন। এখন তাঁহারা অভাবে, বান্ধবহীন অবস্থায় নিরতিশয় কষ্টে কাল কাটাইতেছেন।

স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক করিলাম, সামনের শনিবারে তাঁহাদের আমি গিয়া এখানে লইয়া আসিব। ভগবানের ইচ্ছায় যদি সম্ভব হয়, তাঁহারা আমাদের সঙ্গেই চিরকাল বাস করিবেন।

অমৃত টাকা পাইয়া চিঠি লিখিয়াছিল, ঋণ পরিশোধ হয় নাই, আমি যেমন করিয়া তোমাদের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তোমাদের সে ঋণ আমি কেমন করিয়া শোধ করিব? এত দুঃখের দিনেও তোমরা যেমন করিয়া আমাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে সে ঋণ শুধিবার নয়। তাই লিখিতেছি, তোমরা আমার অর্থের ঋণ পরিশোধ করিয়াছ, কিন্তু আমি তোমাদের আত্মীয়তার ঋণ পবিশোধ করিতে চেষ্টা করিব না।

খোকা আমাকে হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়া বলিল, বাবা, বাবা, দেখ, ঐ আমগাছের ঝোপের আড়ালে বসে একটা কোকিল ডাকৃছে।

শ্মশানের সেই কোকিলের ডাক আমার মনে পড়িল।

'উত্তরা' : চৈত্র ১৩৩২

কবির মেয়ে

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

বৎসর দুই-একের মধ্যে আমাদের দলের তিন-চারিজন আড্ডাধারী যখন সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেল, তখন আমরা দস্তুরমত শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম গেরুয়া না পরিলেও ত্যাগে আমরা গেরুয়াধারী অপেক্ষা কম ছিলাম না। আর এই পার্থিব জগতে আড্ডা দেওয়া হইতে যে অপার্থিব সুখ আর নাই, এ কথার ব্যবহারিক পরিচয় দিয়া অনেক গৃহবিমুখ সন্ন্যাসীকেও আমরা আড্ডামুখী করিয়া তুলিয়াছি। এ-হেন আড্ডা ছাড়িয়া লোক কি সুখে সন্ন্যাসী হইতে চাহে, এ সমস্যার মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া আমরা সকলেই মন-মরা হইয়া দিন কাটাইতেছিলাম, এমন সময় একদিন সংবাদ পাওয়া গেল যে, আরও একটি বড় স্তম্ভ খসিয়া গিয়াছে ; অর্থাৎ কিনা আমাদের দীনবন্ধু হঠাৎ সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে।

ভাঙা আড্ডা কোনরূপে চলিতে লাগিল। বছর দুই-তিন আশায় আশায় থাকিয়া পলাতক আড্ডাধারীদের ঘরে ফেরা সম্বন্ধে যখন আমরা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময় একদিন দীনবন্ধু হৈ-হৈ করিয়া আড্ডায় উপস্থিত।

সংবাদ কি ?

কোথায় ছিলি এতদিন ?

গেরুয়া গেল কোথায় ?

ওয়ারেন্ট বেরিয়েছিল বুঝি ?

চারিদিক হইতে তাহার উপরে সহস্র প্রশ্নের বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

দীনবন্ধু বলিল, সন্ন্যাসী হয়েছিলুম ভাই।

সুরেশ বলিল, সে তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু সন্ন্যাসীই যদি হলি তবে ফিরলি কেন ?

দীনবন্ধু বলিল, ওরে বাবা! সংসারীর চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার ফ্যাসাদ বেশি।

মহেন্দ্র-দাদা বলিল, সেইজন্যেই তো পৃথিবীতে সংসারী লোক বেশি, আর সন্ন্যাসী কম। এই কথাটা বোঝবার জন্যে অত কষ্ট করলে কেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো এর উত্তর পেতে।

দীনবন্ধু বলিল, মহেনদা, উত্তরের অভাব হ'লে নিশ্চয়ই তোমার কাছে যেতুম, কিন্তু তখন আমার যা প্রয়োজন হয়েছিল, তা উত্তরের একেবারে বিপরীত। আর সে জিনিস অন্তত তোমার কাছে পাওয়া যেত না।

মহেন্দ্র বলিল, কি হয়েছিল, বল তো?

দীনবন্ধু বলিল, পৈতৃক বাড়িখানা বাঁধ পড়েছিল, জান তো? পাওনাদাররা নালিশ ক'রে বাড়িখানা বিক্রি ক'রে নিলে। এর পরে আর সংসারে টান থাকে? তুমিই বল?

মহেন্দ্রদা বলিল, সংসার-সমুদ্রে অর্থই হ'ল সব থেকে বড় নোঙর, তারই শেকল যখন ছিঁড়ে গেল, তখন কিসে আর ধ'রে রাখবে, বল কিন্তু আবার ফিরে এলে কিসের টানে, বল দেখি? ছোট ছোট নোঙর কোথাও ফেলবার চেষ্টায় আছ নাকি?

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিল, না দাদা, আর নোঙরে কাজ নেই। এই রকম ভেসে ভেসেই বেড়াব।

সুরেশ বলিল, আচ্ছা, বেরিয়েই বা গেলে কেন, আর ফিরেই বা এলে কেন?

দীনবন্ধু বলিল, বেরিয়ে যাবার কারণ তো বলেছি। অবিশ্যি ফিরে আসবারও কারণ একটা আছে।

দীনবন্ধুকে সকলে চাপিয়া ধরিলাম, কারণ বলিতেই হইবে। তাহারও বিশেষ আপত্তি ছিল না। সে আরম্ভ করিল—

তোমাদের তো আগেই বলেছি, পৈতৃক আর স্বোপার্জ্জিত পাওনাদাররা মিলে ভিটেখানা বিক্রি করালে। তখন আমার হাতে আছে মোট তিপ্পান্ন টাকা আর কয়েক আনা পয়সা সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ব'সে ব'সে ভাবলুম, কি করা যায়! যেমন বাজার, তাতে চাকরি-বাকরির সুবিধে কোথাও হবে না। ওদিকে তিপ্পান্ন টাকা ফুরোবার আগে যে উদরযন্ত্রের দাবিও ফুরিয়ে যাবে, এমন কোনও আশা নেই। এই সব নানা দিক ভেবে ঠিক ক'রে ফেললুম, সন্ন্যাসীই হওয়া যাক। যাহাতক মনে হওয়া, অমনই

আনা-দুয়েকের লাল মাটি কিনে এনে দুখানা ধুতি গেরুয়া রঙে ছেপে ফেলা গেল। তার পরদিন দুপুরবেলায় হরিদ্বারের গাড়িতে সন্ন্যাস-যাত্রা।

হরিদ্বারে গিয়ে তো পৌছলুম, কিন্তু গুরু আর খুঁজে পাই না। অনেকে পরামর্শ দিলে যে, হিমালয়ে অনেক ভাল ভাল সন্ন্যাসী আছেন, সেখানে গিয়ে কারুর কাছ থেকে দীক্ষা নাও।

হিমালয়ের দিকেই যাত্রা করা গেল। সমস্ত দিন চলি আর রাত্রে কোন চটিতে আশ্রয় নিই। পথে লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা করি, ভাল সন্ন্যাসী কোথায় আছে? তাদের নির্দ্দেশমত কোনও মঠে গিয়ে উঠি। কোথাও বা যাওয়ামাত্র তাড়িয়ে দেয়, কোথাও বা দু দিন বাদে ব'লে দেয়, তোমাকে দীক্ষা দেব না। সেখান থেকে বেরিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করি।

এই রকম প্রায় মাসখানেক পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে একদিন এক সন্ন্যাসীব আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। এঁর নাম জীবানন্দ। হরিদ্বারে থাকতেই খুব উচ্চদরের সাধক ব'লে এঁর নাম শুনেছিলুম। ছোট্ট একটি উপত্যকাব মধ্যে এঁর মঠ। তিন-চাবখানি ঘর, তাতে গুটি দুয়েক শিষ্যকে নিয়ে তখন বাস করছিলেন।

সন্ন্যাসীকে গিয়ে প্রণাম ক'রে বললুম, বাবা, আমার মনে বড় অশান্তি, তাই আপনার আশ্রয়ে এসেছি

সন্ন্যাসী স্মিত হাস্যে বললেন, বেশ করেছ, এখানে থাক। শান্তিময় এই স্থান, শান্তি পাবে।

সেখানে দু-তিন দিন থাকার পর একদিন বিকেলবেলা তাঁকে একলা পেয়ে আমি ব'লে ফেললুম, বাবা, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আপনি আমায় দীক্ষা দিন।

আমার কথা শুনে সন্ন্যাসীর চোখ দুটো হঠাৎ লাল টকটকে হয়ে উঠল। আমি তাঁর পদসেবা করছিলুম, তিনি পা গুটিয়ে নিয়ে উঠে ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললে?

স্বামীজীকে হঠাৎ অমন উত্তেজিত হতে দেখে আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলুম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি, কি বললে?

এবার আমি সাহস সঞ্চয় ক'রে ব'লে ফেললুম, আপনার কাছে আমি দীক্ষা নিতে এসেছি। আমি সংসার ত্যাগ—

স্বামীজী সেই স্বরেই বললেন, কে তোমাকে সংসার ত্যাগ করতে বলেছে? আমার কাছে আসতেই বা কে বলেছে?

কোনও জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী আবার বললেন, আমি মনে করেছিলুম, তুমি এখানে বেড়াতে এসেছ, কিছুদিন থেকে মনটা ভাল হ'লে ফিরে যাবে। এই ভেবেই তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলুম।

জানই তো, এ রকম ধরনের কথা কোন দিনই সহ্য করা আমার অভ্যেস নেই। তবুও, সন্ন্যাসী লোক, তাকে কিছু বলব না মনে ক'রে এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিলুম। কিন্তু আর সহ্য করা সম্ভব হ'ল না। ব'লে ফেললুম, আশ্রয়ের আমার এমন অভাব হয় নি যে, সেজন্যে এই পাহাড়-পর্ব্বত ভেঙে আপনার কাছে আসতে হবে।

আরও একটু কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু স্বামীজী তার আগেই একটি প্রকাণ্ড ধমক ছেড়ে বললেন, তবে ওঠ। এই মুহূর্ত্তেই এখান থেকে দূর হয়ে যা।

চীৎকার শুনে শিষ্য দুজন ছুটে এল। স্বামীজী তাদের বললেন, এখুনি একে মঠের চৌহদ্দি পার ক'রে দিয়ে এস।

আমি তখনই উঠে পড়লুম। শিষ্য দুজন আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে একটা রাস্তা দেখিয়ে বললে, এই পথ ধ'রে যাও, কেদারে পৌঁছবে। রাস্তা দুর্গম, একটু সাবধানে যেও। পথে যাত্রী দেখলে তাদের সঙ্গ নিও, অসুবিধে হবে না।

শিষ্যরা চ'লে গেলে আমি সেই পথ ধ'রে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। অনেকক্ষণ চলবার পর বিপরীত দিক থেকে একজন লোক আসছে দেখে, তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, চটি কত দূরে?

সে বললে, এখানে চটি কোথায়? দশ মাইল দূরে একটা চটি আছে বোধ হয়।

লোকটার কথা শুনে আমি একেবারে ব'সে পড়লুম। একে তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, অন্ধকারে পথও চিনতে পারি না; মঠে যাবার পথ চিনি বটে, কিন্তু সেখানে ফেরবার পথ নিজেই নষ্ট ক'রে এসেছি। এই রাত্রিতে দশ মাইল পাহাড়ে-পথ অতিক্রম ক'রে চটিতে পৌঁছবার আশা বিড়ম্বনামাত্র।

বাইরের অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। অন্তরের আশার শিখাও স্তিমিত। একমাত্র ভরসা আমার দুর্জ্জয় সাহস। সেই সাহসে ভর ক'রে আমি অগ্রসর হতে লাগলুম।

রাত্রি এক প্রহর কেটে যাবার পর আকাশে একটু চাঁদের আলো দেখা দিলে। ক মাইল পথ চ'লে এসেছি, তা ঠিক করতে পারলুম না, তবে যতদূর মনে পড়ে, একটা ছোট আর একটা বড় উপত্যকা পার হয়ে হাঁপিয়ে পড়েছিলুম। স্থির করলুম যে, এক জায়গায় ব'সে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চলতে শুরু করব।

একটা গাছের তলায় ব'সে বিশ্রাম করছিলুম, কখন যে সুষুপ্তির কোলে ঢ'লে পড়েছি, তা জানতেই পারি নি, হঠাৎ খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস আমায় ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলে।

জেগে দেখি, চাদের আলোতে চারিদিক ভেসে গেছে। আমার চারিদিকে ছোট থেকে বড—একটার পর একটা পাহাড থাকে থাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে, সবার পেছনে একটা পাহাড় আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে নীল আকাশ ভেদ ক'রে উঠেছে। বাতাস অতি মৃদুভাবে তাব গায়ে মেঘের চামব বুলিয়ে দিচ্ছে। কি স্থির আর কি শান্তভাবে তারা কাল-সমুদ্রের বুকে অনন্তের নোঙর পেতে প'ড়ে আছে।

আমার মনে হতে লাগল, পাহাড়গুলো যেন এই শব্দহীন, অন্তহীন নীল চাঁদোয়ার নীচে ব'সে মহাপ্রলয়ের দিন কে কি কাজের ভার নেবে, তারই পরামর্শ করছে। সেই বিরাট মহান প্রকৃতির সামনে মাথা আপনি নুয়ে পড়ল।

মাথা তুলতে না তুলতে শুনতে পেলুম, চল, এত রাতে আর এখানে ব'সে থাকে না।

পেছনে ফিরে দেখি, স্বামীজী তাঁর দুই শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ফিরতেই তিনি বললেন, তুই তো ভারী অভিমানী ছেলে। চ'লে যেতে বললুম ব'লেই কি চ'লে যেতে হয়?

স্বামীজীকে প্রণাম ক'রে বললুম, প্রভু, আপনি তাড়িয়ে না দিলে এ দৃশ্য আমি দেখতে পেতুম না। চ'লে যেতে ব'লে ভালই করেছিলেন।

স্বামীজী আমার একখানি হাত ধ'রে বললেন, চল, ফিরে চল। রাগ করিস নি।

সেই রাত্রিতে আবার মঠে ফিরে এলুম। বোধ হয়, চার দিন পরে স্বামীজী আমায় দীক্ষা দিলেন। আমার সংসারী নাম ঘুচে গিয়ে নাম হ'ল —অরূপচৈতন্য।

মঠে বেশ আনন্দেই দিন কাটতে লাগল। সকালে স্বামীজী আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। দূরে দু-তিনখানা গ্রাম ছিল, তারই বাসিন্দারা আমাদের আহার্য্য যোগাত, মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর ধনী শিষ্যরা ভেট পাঠাত। শক্ত কাজের মধ্যে ছিল ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসা। জ্যোৎস্না-রাত্রি হ'লেই আমি পাহাড়ে বেরিয়ে পড়তুম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মঠে এসে শুয়ে পড়তুম।

বাইরের যে পৃথিবীটার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে চ'লে এসেছিলুম, মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্ত্তে তার আহ্বান আমার হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ে আমাকে আকুল ক'রে তুলত। কিন্তু নির্জ্জনতার মধ্যেও একটা মাদকতা আছে। তার নেশা ধরতে দেরি লাগে বটে, কিন্তু সে মৌতাত একবার অভ্যেস হয়ে গেলে আর ছাড়া মুশকিল। আস্তে আস্তে এই একলা থাকার মৌতাতে আমি মশগুল হয়ে উঠছিলুম, এমন সময় কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে স্বামীজীকে বোম্বাইয়ের দিকে চ'লে যেতে হ'ল।

মঠে তখন আমরা তিনজনমাত্র শিষ্য ছিলুম। স্বামীজী একজনকে সঙ্গে নিলেন, একজনকে পাঠিয়ে দিলেন প্রয়াগ-অঞ্চলে, আর আমায় বললেন, তুই নিজের দেশে যা। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর একবার দেশে যেতে হয়।

মঠ ছেড়ে কোথাও যেতে আর আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু গুরুর আগ্রহে আমায় বেরুতে হ'ল। তিনি আমাদের দু'জনকে ব'লে দিলেন, দু বছর পরে আমি এইখানে ফিরব।

বেরিয়ে পড়তে হ'ল। বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছিলুম, তখন হাতে আর কিছু না থাক, রেলভাড়াটা ছিল, এখন একেবারে রিক্ত। বিনা টিকিটেই রেলে উঠে পড়া গেল। টিকিট নেই শুনে কেউ বা সন্ন্যাসী দেখে ছেড়ে দেয়, আর কেউ বা ঘাড় ধ'রে নামিয়ে দেয়। তখনকার মত নেমে পড়ি, পরদিন আবার ট্রেনে উঠে চলতে থাকি।

এই রকম ক'রে অগ্রসর হতে হতে একদিন মধুপুর রেল-স্টেশনে একজন কর্ম্মচারী আমার টিকিট নেই দেখে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলে। আমি মনে

করেছিলুম, আমাকে নামিয়ে দিয়েই সে নিশ্চিন্ত হবে, আমিও আবার অন্য গাড়িতে চড়ব। কিন্তু তা হ'ল না, স্টেশন থেকে গাড়িখানা চ'লে যাবার পর সে ব্যক্তি আমাকে একেবারে রেল-পুলিসের জিম্মায় সমর্পণ করলে। এরকম ফ্যাসাদে এর আগে আর কখনও পড়ি নি। প্রায় আট-দশ দিন টানা-প'ড়েন থানা-পুলিস হতে হতে ব্যাপারটা আদালত অবধি গড়াল। আমি আন্দাজ করেছিলুম, এই সুযোগে জেলে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা বোধ হয় হয়ে যাবে। কিন্তু অবোধ হাকিম কোম্পানির সমস্ত কথা শুনে আমায় বললে, যাও, এমন কাজ আর ক'রো না।

সন্ন্যাসীর নামে মামলা হওয়ায় সেখানে হৈ-চৈ প'ড়ে গিয়েছিল। আমি মুক্তি পেতেই শহরের একজন ধনী আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। কলকাতায় যাব শুনে তারা রেলের টিকিট কিনে দিতে চাইলে। কিন্তু রেলে উঠতে আমার আর প্রবৃত্তি হ'ল না। আমি সেখান থেকে হেঁটেই রওনা হলুম।

মধুপুর থেকে কলকাতা অবধি বেশ ভাল হাঁটা-পথ আছে। সেই রাস্তা ধ'রে কলকাতার দিকে এগিয়ে চলেছি। তখন বর্ষাকাল, মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে কষ্ট দেয়, আর পাহাড়ে নদীগুলো ভ'রে ওঠায় কোন কোন জায়গায় পারের জন্যে একটু মুশকিলে পড়তে হয়। তা না হ'লে সন্ন্যাসীর পক্ষে পথ চলায় কোনও কষ্ট নেই।

মাসখানেক পথ চ'লে বাংলায় এসে পৌঁছলুম। বৃষ্টি তখনও থামে নি, বরং আরও বেড়েছে। মাঠ-ঘাট সব জলে ভর্তি, রাস্তাও আর তেমন শুকনো নয়, মধ্যে মধ্যে ভারী কাদা।

একদিন—সেদিন আর কোন গ্রামের মধ্যে ঢুকি নি। রাস্তা বেয়ে তাড়াতাড়ি চলেছি; কোনও রকমে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়। কতবার বৃষ্টি এল, আর কতবার যে ভিজে কাপড় গায়েই শুকিয়ে গেল, তার ঠিকানা নেই। সমস্ত দিন চ'লে চ'লে সন্ধ্যের সময় একটা গাছতলায় আশ্রয় নিলুম। পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, তার ওপরে জলে ভিজে ভিজে কদিন থেকেই শরীরটা জ্বর-জ্বর করছিল।

সন্ধ্যের কিছু পরেই আবার বৃষ্টি শুরু হ'ল। মনে করেছিলুম, রাত্রিটা এখানে কোনও রকমে কাটিয়ে সকালে আবার চলা শুরু করব। কিন্তু

কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আকাশ যেন ভেঙে পড়ল, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল।

আমি যে গাছের নীচে আস্তানা করেছিলুম, তার একটু দূরেই একটা রাস্তা গ্রামের দিকে চ'লে গিয়েছে। এই দুর্যোগে কোনও রকমে কোনও গৃহস্থের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারলে নিশ্চয় রাত্রির মত একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে—এই ভরসায় গাছের তলা থেকে দৌড় দিলুম।

দৌড়—দৌড়—দৌড়। কিছুক্ষণ দৌড়ুই, আবার কিছুক্ষণ হাঁটি। এই রকম ক'রে চলতে চলতে দূরে একটা আলো দেখতে পেলুম। ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেটা একটা মুদীর দোকান; ছোট্ট একটি চালাঘর। মুদী সেখানে আশ্রয় দিলে না, তবে সে দয়া ক'রে গ্রামের রাস্তাটা আমায় দেখিয়ে দিয়ে বললে, গাঁয়ের ভেতরে যাও, সেখানে আশ্রয় পেতে পার।

গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলুম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তার ওপরে কালো মেঘের ছায়া ধরণীর যা কিছু সব যেন নিকিয়ে নিয়েছে। চোখে কিছুই দেখতে পাই না। অন্ধকার, কাঁটা আর কাদায় মিলে সে একটা বীভৎস ব্যাপার হয়ে রয়েছে। তার ওপব দিয়ে এক রকম গড়াতে গড়াতে চলতে লাগলুম।

গ্রাম একেবারে নিষুতি। একে এই দুর্যোগ, তার ওপরে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, গ্রামবাসীরা যে যার শুয়ে পড়েছে। মানুষ তো ছার, একটা কুকুরের ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। এরই ভেতর দিয়ে আমি পিছলে পিছলে টলতে টলতে চলেছি। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে, তবুও চলেছি। এমন সময় অনেক দূরে একটা ক্ষীণ আলো দেখা গেল।

প্রায় আধঘণ্টা সেই আলো লক্ষ্য ক'রে গিয়ে আমি একটা একতলা জীর্ণ বাড়ির সামনে উপস্থিত হলুম। একটা খোলা জানালা দিয়ে ক্ষীণ একটু আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছিল। একটু ঘুরে বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজা ভেজানো ছিল, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল বটে, কিন্তু কেউ নেই সেখানে। আমি ডাক দিলুম, বাড়িতে কে আছেন? বাড়ির ভেতরে রমণীকণ্ঠ শোনা গেল, ওরে, দেখ, বোধ হয় ডাক্তারবাবু এলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই একটি কিশোরী একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে

এল। কিশোরী প্রথমে আমাকে দেখতে পায় নি। সে লণ্ঠনটা তুলে 'কে ?' ব'লে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমাকে সেই অবস্থায় দেখে তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে লণ্ঠনটা ঠক ক'রে নামিয়ে রেখে সে ভেতরে চ'লে গেল।

একটু পরেই একজন বিধবা রমণী 'কে ?' ব'লে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে গুটি দুই-তিন ছেলেমেয়ে।

আমি একটু এগিয়ে এসে বললুম, আমি অতিথি। এই দুর্য্যোগে বড় বিপদে পড়েছি ; রাত্রির মত একটু আশ্রয় চাই।

রমণী স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তোমার বাড়ি কোথায় বাবা ?

বললুম, সন্ন্যাসীর আবার বাড়ি কোথায় মা !

ও, তুমি সন্ন্যাসী। তা গেরুয়া দেখেই মনে হয়েছিল। এস বাবা, ভেতরে এস। ভগবান তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে কাপড়খানা নিংড়ে পরলুম। শরীর একেবারে ভেঙে আসছিল ; শোবার জন্যে জায়গা খুঁজছি, এমন সময়ে সেই বিধবা আমায় বললে, বাবা, আমাদের বড বিপদ। তাই দেখেই বোধ হয় ভগবান এত রাত্রে তোমাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঘুম-টুম সব ছুটে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম, কি বিপদ বলুন ? আমার যদি সাধ্য থাকে—

তিনি বললেন, আমার বড় মেয়েটি আজ ছ মাস ধ'রে জ্বরে ভুগছে। আজ সন্ধ্যেবেলায় কাসতে কাসতে কি রকম অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছে, এখনও ভাল ক'রে জ্ঞান হয় নি। এ গ্রামে কোনও ডাক্তার নেই ; ভিন গাঁয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হয়েছে। তা এই দুর্য্যোগে সে বোধ হয় আর এল না।

চলুন, তাকে দেখে আসি।

এই ব'লে উঠলুম। বিধবা আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের এক দেওয়ালের গায়ে লাগা এক খাটে রোগিণী শুয়ে আছে। এই ঘরেরই খোলা জানালা দিয়ে যে ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছিল, তাই লক্ষ্য ক'রে আমি এসেছি। রোগিণীর বয়স বোধ হয় কুড়ির কাছাকাছি। দেখতে হয়তো সুন্দরীই ছিল, কিন্তু নির্ম্মম রোগ তার সমস্ত সৌন্দর্য্যই গ্রাস করেছে।

অনেকক্ষণ বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে মুখ দেখলুম। চোখ বুজে সে প'ড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, এর নাম কি ?

ললিতা।

রোগিণীর তপ্ত ললাটে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলুম, ললিতা!

ডাকামাত্র তার নিমীলিত চোখ দুটো খুলে গেল। সে আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুল।

রোগিণীর মা বললে, সন্ধ্যের আগে একবার বমি ক'রে সেই যে চোখ বুজেছিল, আর এই খুলল। তোমাকে কি বলব বাবা—

আমি বললুম, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আর কোন ভয় নেই। কাল ডাক্তার এলে যা হয় ব্যবস্থা হবে।

রোগিণীর ঘরের বাইরে একটা চওড়া দাওয়া। তারই এক কোণে আমার শোবার ব্যবস্থা হ'ল।

পাশের একটা ঘরে ছেলেমেয়েদের মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল, ললিতার মা আমাকে শুইয়ে সেই ঘরে ঢুকে গেলেন।

তখনও বৃষ্টি থামে নি। বৃষ্টির সেই অখণ্ড ঘুম-পাড়ানিয়া গানে গ্রামের সমস্ত প্রাণীই নিদ্রিত। আমার চোখ থেকে কিন্তু ঘুম ছুটে গিয়েছিল। চোখ বুজলেই পাশের ঘরের সেই রুগ্না মেয়েটির জীর্ণ মুখ চোখের সামনে ভাসতে থাকে। তার কথা ভাবতে ভাবতে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আমাকে তার দিকে টানতে লাগল।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, বাতিটা তখনও মিটমিট করছে। কোণে এক বৃদ্ধা ঝি প'ড়ে অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছে। খাটের দিকে চেয়ে দেখলুম, ললিতা আবার চিত হয়ে শুয়েছে। সেই স্তিমিত আলোতে তার মুখ ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছিল না, আমি খাটের ধারে গিয়ে ঝুঁকে তার মুখখানা দেখতে লাগলুম।

একদৃষ্টে তাকে দেখছি। নিশ্বাস এত ক্ষীণ যে, তা পড়ছে কি না, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তার একখানা হাত তুলে নাড়ী দেখতে লাগলুম। জীবন-প্রবাহ অতি ক্ষীণ, যে কোনও মুহূর্ত্তে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ রুগ্নার চোখ দুটো খুলে গেল। আমাকে দেখেই সে ব'লে উঠল, কে ? কে তুমি ?

আমি তাড়াতাড়ি তার হাতখানা নামিয়ে রেখে বললুম, কোনও ভয় নেই। আমি সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী! ও, তুমিই বুঝি রোজ ঐ জানালার ধারে ব'সে থাক? আজ এত কাছে এসেছ যে?

আমি বললুম, তুমি ঘুমোও। বেশি কথা বললে অসুখ বাড়বে।

কিন্তু তুমি এত কাছে এসেছ কেন? আমাকে বুঝি নিয়ে যাবে? না না, আমি যাব না, তুমি যাও।

স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে, বিকারের ঘোরে সে ভুল বকছে। আমি তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, তুমি চোখ বোজ, ঘুমোও।

মেয়েটি আর একবার দৃষ্টিহীন চাউনিতে আমার দিকে চেয়ে চোখ বুজল।

একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার সেই শীর্ণ মুখ আর অসহায় অবস্থা দেখে তাব প্রতি করুণায় আমার মনটা আর্দ্র হয়ে উঠতে লাগল। আমি ব'সে ব'সে ললিতাকে পাখার বাতাস করতে লাগলুম। গুরুদেবের শিক্ষা একেবারে বিফলে যায় নি। তোমাদের সত্যি বলছি, সেখানে ব'সে ব'সে আমার মনে হতে লাগল যে, এর মধ্যে ভগবানের নিশ্চয় কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। তা না হ'লে কোথাকার লোক আমি, আর আজ এই শেষরাতে কোথায় ব'সে কাকে বাতাস করছি! আশ্চর্য্য দৈবেব খেলা!

সূর্য্যের রথখানা তখনও উদয়াচলের শিখরে এসে পৌছে নি। অন্ধকার একটু ফ্যাকাশে হয়েছে মাত্র, এমন সময় ললিতার মা ঘরে ঢুকে আমাকে ঐ অবস্থায় ব'সে থাকতে দেখে বললেন, সারারাত্রি এইখানে ব'সে আছ বাবা? তুমি আর-জন্মে নিশ্চয়ই আমাদের কেউ ছিলে। তা না হ'লে—

তাঁকে বাধা দিয়ে বললুম, আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। সেবাই আমাদের ধর্ম্ম।

আমাদের কথা শুনে ললিতার ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ চেয়ে অবাক হয়ে আমার দিকে চাইতে লাগল। তার মা কাল রাত্রির সমস্ত কথা ব'লে আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে শুয়ে শুয়েই হাতজোড় ক'রে আমাকে নমস্কার করলে।

সকালবেলা ক্রমে ক্রমে ললিতাদের বাড়ির অবস্থা জানতে পারলুম। ললিতার বাবা ছিলেন একজন কবি, কাজেই দরিদ্র। চাকরি-বাকরির চেষ্টা

চার-পাঁচ বার করেছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি কোথাও বনিবনা হয় নি। অতি সামান্য আয় আছে, তাতে কষ্টে দুবেলা খাওয়া চলে। জাতে তাঁরা ব্রাহ্মণ। বছরখানেক আগে ললিতার বাবা তিন দিনের জ্বরে মারা গেছেন। ললিতা ছাড়া আরও একটি মেয়ে আছে, তার নাম অমিতা। দুটি ছেলে, তারা মেয়েদের চেয়ে ছোট। মেয়েদের কারও বিয়ে হয় নি। ললিতার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছিল, এমন সময় তার বাবা মারা গেলেন। তারপরে আজ ছ মাস সে জ্বরে জ্বরেই সারা হচ্ছে। কাল বিকেলে সে রক্তবমি ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ভিন গাঁয়ে ডাক্তার থাকে, রাতে লোক পাঠানো হয়েছিল, লোকও ফেরে নি, ডাক্তারও আসে নি।

ললিতার মার বয়সও বেশি নয়, চল্লিশের কাছাকাছি হবে। সংসারের কাহিনী বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, ললিতা বাঁচবে তো? কর্ত্তার বড় আদরের মেয়ে ও।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম। বললুম, না বাঁচবার তো কোন কারণ দেখছি না, ও সেরে উঠবে।

তিনি বললেন, তুমি কটা দিন এখানে থাক বাবা, তোমায় দেখে আমার ভরসা হচ্ছে।

মাসখানেক ধ'রে হেঁটে হেঁটে আমিও ক্লান্ত হয়েছিলুম, বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল। তাঁর কথা শুনে বললুম, বেশ, আমি আছি।

ললিতার মা সংসারের কাজে ব্যাপৃত হলেন, আমি আবার ললিতার বিছানার পাশে গিয়ে বসলুম। তার মনটা একটু প্রফুল্ল করবার জন্যে বললুম, ললিতা, গল্প শুনবে?

সে উৎসাহিত হয়ে বললে, হ্যাঁ, বলুন, শুনব।

একটা গল্প বললুম। সে শুনে বললে, এ গল্প আমি জানি। আর একটা বললুম, সে বললে, এও আমি জানি।

সকালবেলা গল্প ক'রে কাটল। দুপুরবেলা ডাক্তার এলেন। হাতুড়ে ডাক্তার, কলকাতার কোন এক স্বদেশী ডাক্তারী কলেজে বছর ছয়েক প'ড়ে পাঁচটি অক্ষর উপাধি পেয়েছিল। কিন্তু ললিতার যে রোগ, তা ধরবা জন্যে দিগ্‌গজ ডাক্তার না এলেও চলে। ডাক্তার রোগী পরীক্ষা ক' দুটি টাকা নিয়ে আমায় আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, রাজ্যঃ

হয়েছে, দুটো ফুসফুসেই আর কিছু নেই, যে কোন মুহূর্তেই মৃত্যু হতে পারে।

বিকেলবেলায় ললিতার খাটের পাশে ব'সে আছি। অস্তোন্মুখ রবির এক টুকরো ম্লান রশ্মি খোলা জানালা দিয়ে বিছানার ধারে এসে পড়েছিল। ললিতা অনেকক্ষণ সেই আলোটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, সন্ন্যাসী, ডাক্তার কি ব'লে গেল, আমি আর বাঁচব না?

আমি বললুম, সে কি! কে বললে তোমাকে? ডাক্তার বললে, তুমি শিগগির সেরে উঠবে। ওসব কথা ভাবে না, লক্ষ্মীটি।

আমার কথা শুনে ললিতার শীর্ণ মুখ খুশিতে ভ'রে উঠল। সে বললে, না না সন্ন্যাসী, আমি তো সে কথা ভাবি না। আমি দিনরাত বাঁচবার কথাই ভাবি। শুধু ভাবি, কবে ভাল হয়ে উঠব। এখন আমি মরতে চাই না। আমার এই উনিশ বছর বয়েস, এই বয়েসে কি মরতে ইচ্ছে হয়? আমার অনেক আশা আছে, অনেক—অ—নে—ক—

এই অবধি ব'লে সে ভয়ানক হাঁপাতে লাগল। পাছে আবার সেই প্রসঙ্গ ওঠে, এই ভয়ে তাকে বললুম, ললিতা, গল্প শুনবে?

ললিতা একটু হেসে বললে, না, গল্প নয়। ঐ তাকের ওপর কবিতার বই আছে, নিয়ে এসে আমায় শোনাও না।

তাকের ওপরে সারি সারি ইংরেজী, বাংলা কবিতার বই সাজানো ছিল। ৭কখানা বাংলা বই নিয়ে এসে বললুম, কোন্‌টা পড়ব?

ললিতা বললে, যেটা ইচ্ছে পড়।

আমি পড়তে লাগলুম, আর ললিতা চোখ বুজে রইল। একটার পর টা প'ড়ে যাই, তার আর ক্লান্তি নেই। ঝি এসে আলো দিয়ে গেল, মা কাছে বসলেন, অমিতা এসে খাইয়ে গেল, মা অন্য কাজে গেলেন, পড়ার বিরাম নেই। একবার সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে ক'রে আমি পড়া বন্ধ ।, কিন্তু তখনই সে চোখ চেয়ে বললে, কই, পড়ছ না?

াবার পড়তে শুরু করা গেল। একবার ললিতার দিকে চেয়ে দেখলুম, ই চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

'র সেই অবস্থায় মনের ওপর কোন চাপ পড়া উচিত নয় ভেবে পড়া লুম। ললিতা তখনই চেয়ে বললে, থামলে যে?

আমি বললুম, আজ এই অবধি থাক, আবার কাল হবে। কি বল?

ললিতা বললে, আচ্ছা।

তাকে বইখানা রেখে এসে তার কাছে বসামাত্র সে বললে, সন্ন্যাসী, তুমি বড় ভাল। বড় সুন্দর পড়তে পার তুমি। আমার বাবাও খুব সুন্দর পড়তে পারতেন। আমাতে আর বাবাতে বই হাতে ক'রে কখনও চ'লে যেতুম সেই নদীর ধারে, কখনও বা ঐ বড় মাঠটা পেরিয়ে সেই প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে, সমস্ত দিন আমরা সেখানে ব'সে ব'সে কবিতা পড়তুম। এই ভাদ্র মাসে আমরা ভাই-বোনে মিলে মাঠে-ঘাটে কত খেলাই করেছি! আজ প্রায় ছ মাস হ'ল বাড়ি থেকে বেরুই নি। প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে উঠছে। কতদিনে আমি ভাল হয়ে উঠব, বলতে পার, সন্ন্যাসী?

ললিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, তুমি শিগগির সেরে উঠবে। সেরে উঠলে আবার আমরা তেমনই ক'রে খেলতে যাব। তোমার শরীরটা একটু ভাল হোক।

আমার কথা শুনে সে সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম, তুমি ঘুমোও, লক্ষ্মীটি, তা না হ'লে আবার অসুখ বাড়বে।

ললিতা আর কিছু না ব'লে চোখ বুজে ফেললে।

সে রাত্রিতে ললিতার অসুখ ভয়ানক বেড়ে উঠল। রাত্রি বারোটা কি একটার সময় সে কাসতে আরম্ভ করলে। কিছু পরেই তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল। আমি ছুটে গিয়ে তার মাকে খবর দিলুম। ললিতার মা আর তার বোন অমিতা এসে আর্ত্তের পাশে দাঁড়াল। যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল। বাতাস করতে করতে একটু যদি যন্ত্রণা কমে তো অমনই কাসি শুরু হয়, তারপরেই দু ঝলক লাল টকটকে রক্ত। একটুখানি নিশ্বাস নেবার জন্যে সে কি চেষ্টা! শতচ্ছিদ্র ফুসফুসের সে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা, তা যক্ষ্মা-রুগীকে যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। আমার মনে হতে লাগল, আজ রাত্রিতে বোধ হয় শেষ। কিন্তু মানুষের প্রাণ পৃথিবীর সমস্ত পাওনা চুকিয়ে না দিয়ে তো মুক্তি পায় না। সারারাত্রি সেই যন্ত্রণা সহ্য ক'রে শেষ রাত্রির দিকে ললিতা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। আমরা তিনজনে সারারাত তার বিছানার পাশে ব'সে ব'সে কাটালুম।

ললিতাদের গ্রামের ধার দিয়েই গঙ্গা ব'য়ে গিয়েছে। আমি রোজ নদীতে গিয়ে স্নান করতুম। সকালবেলা একটুখানি ঘুমিয়ে স্নান সেরে এসে দেখি, ললিতা জেগেছে আর বেশ প্রফুল্লভাবেই তার ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে গল্প করছে। একটি ভাই আদর ক'রে তার দিদির পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকতেই ললিতা আমায় জিজ্ঞাসা করলে, সন্ন্যাসী, তুমি স্নান করতে গিয়েছিলে বুঝি ?

হ্যাঁ।

এখন গঙ্গার দু কূল ভ'রে উঠেছে, না ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা সন্ন্যাসী, গঙ্গার ধারে সেই যে বড় বটগাছটা, সেটা দেখেছ ?

হ্যাঁ।

তারই একটি মোটা শেকড় মাটি থেকে ধনুকের মত হয়ে উঠে আবার মাটির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, সেটা দেখেছ ?

কই, তা তো দেখি নি !

তা হ'লে সেটা জলে ডুবে গিয়েছে। আর কতদিনে যে গঙ্গার সে রূপ আবার দেখতে পাব।

ললিতা তার ক্লান্ত চোখ দুটো বন্ধ করলে। কিছুক্ষণ পরে ললিতার মা, অমিতা ও তার ছোট ভাই দুটিকে খাবার জন্যে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ভাই-বোনেরা চ'লে যাবার পর ললিতা চোখ মেলে আমায় বললে, সন্ন্যাসী, এই সময় মাঠে খুব কাঁশফুল হয়। আমার জন্যে কাল এক গোছা তুলে আনবে ?

আমি বললুম, কাল কেন, আজই বিকেলে তোমার জন্যে কাশ নিয়ে আসব। মাঠে অনেক কাশ দেখেছি।

ললিতা এতক্ষণ বেশ হাসিখুশিই করছিল, হঠাৎ তার চক্ষু দুটি সজল হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বললে, সন্ন্যাসী, আমার যেন মনে হচ্ছে, মাঠ-ভরা কাশের সেই শোভা, বর্ষার গঙ্গার সেই আপন-ভোলা উদ্দাম স্রোত, শরতের সকালে সেই মিষ্টি রোদ—এই শেষ—সব শেষ। আর দেখতে পাব না।

ললিতার কণ্ঠে এমন একটা অসহায় ও উদাস সুর বাজতে লাগল যে,

চোখের জল সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসীর অভিমান আমার যায় নি। নিজের মনকে ধমক দিতে লাগলুম, ছি, এত কোমল তুমি!

ললিতাকে বললুম, ললিতা, ওসব কথা ভেবে নিজের অসুখ বাড়িয়ে কেন আমাদের দুঃখ দিচ্ছ? তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর।

ললিতা আবার আমার মুখের দিকে তাকালে। সেই সজল দৃষ্টি। এবার সে বললে, সন্ন্যাসী, আমার জন্যে তোমার দুঃখ হয়? আমি যদি ম'রে যাই, আমার কথা কি তোমার মনে থাকবে? আমি ম'রে গেলে তুমিও তো এখান থেকে চ'লে যাবে। তারপর তুমি কত দেশে দেশে ঘুরবে, কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে, তারই মধ্যে সজনে কি নির্জ্জনে পাড়াগাঁয়ের এই ললিতার কথা, যার সঙ্গে দুদিনের জন্যে তোমার ভাব হয়েছিল, তার কথা কি মনে থাকবে?

আমার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছিল। কোনও রকমে গলাটি পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললুম, থাকবে ললিতা। তোমাকে কখনও ভুলব না।

ললিতা যেন একটা আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলে বললে, আ সন্ন্যাসী, তুমি বড় ভাল।

ললিতাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তার মাকে নির্জ্জনে ডেকে বললুম ললিতার অবস্থা ভাল নয়, বোধ হয় দু-একদিনের বেশি বাঁচবে না।

কথাটা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। সন্তানের মৃত্যু-সম্ভাবনার সংবাদে মায়ের সে চমকানি, তার বর্ণনা করবার ভাষা আমি জানি না। তিনি কোন কথা না ব'লে নীরবে কাঁদতে লাগলেন। সদ্যোবিধবা সেই নারীকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা আমার যোগাল না। ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলুম, মৃত্যু এ সংসারে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু ধরণীর এই অতি-পুরাতন অতিথি প্রতি গৃহে প্রতি বারেই দেখা দেয়। সকলেই জানে, এর কোন প্রতিকার নেই, তবুও তারা শোকে কাতর হয়। সকলেই জানে, সান্ত্বনার কোন মূল্য নেই, তবুও সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে মরে। ললিতার মার অশ্রু দেখে আমিও দু-চারটে সান্ত্বনার বাঁধা গৎ আওড়াতে লাগলুম। কিন্তু ছেলেরা সেখানে এসে পড়ায় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে গেলুম।

বিকেলবেলা অমিতা ও তার ভাই দুটিকে নিয়ে মাঠ থেকে কয়েক গোছা

কাশফুল তুলে নিয়ে এলুম। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা কি রকম বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। ফুলগুলো দেখে তার মুখে আবার ম্লান হাসি ফুটে উঠল। সে একটি গোছা ফুল নিয়ে নিজের মুখের ওপর বুলোতে আরম্ভ করলে।

সেদিন সন্ধ্যের দিকে ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙল একেবারে রাত্রি বারোটা কি একটায়। এর মধ্যে তাকে একবার জাগিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল। আমি তার পাশে ব'সে ছিলুম, সে আমার একখানা হাত ধ'রে বললে, সন্ন্যাসী, ঠিক ক'রে বল তো আমি বাঁচব কি না? দেখো, আমার কাছে গোপন ক'রো না। যদি আমি আর না বাঁচি, তা হ'লে তোমায় একটা কথা ব'লে যাব। সে কথা তোমাকে বলবার আগে আমি ম'রে গেলে আমার ক্ষোভের আর সীমা থাকবে না। সে দুঃখ তুমি বুঝতে পারবে না। বল বল, আমি কি আর বাঁচব না?

ললিতার সে অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। ব'লে ফেললুম, তোমার অবস্থা খুবই খারাপ, যে কোনও মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে।

আমার কথা শুনে সে একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলে বললে, বড় উপকার করলে তুমি আমার। এ কথাটা তোমায় না বললে ম'রেও আমি শান্তি পেতুম না। শুনবে সে কথা?

বল, শুনি।

আমি তোমায় ভালবাসি।

অ্যাঁ! আমার সন্দেহ হ'ল যে, বিকারের ঝোঁকে সে বুঝি ভুল বকছে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, ললিতা, ঘুমোও তুমি। বেশি কথা কইলে—

ললিতা আমার কথা গ্রাহ্য না ক'রে ব'লে যেতে লাগল, দেখ সন্ন্যাসী, জীবনে আমার সব সাধই মিটেছে, কিন্তু আমি কখনও কারুকে ভালবাসি নি। আমার বুকে ভালবাসার যে সম্পুটখানি আছে, ধনী যেমন যত্ন ক'রে নিজের বুকের মধ্যে মহামূল্য রত্নকে আগলে রাখে, আমিও তেমনই আমার কুমারী-ধর্ম্ম দিয়ে আমার সেই ভালবাসাটিকে আগলে রেখেছিলুম, আমার স্বামীর হাতে অক্ষুণ্ণ সেই পাত্রটিকে তুলে দেবার জন্যে। আজ আর সময় নেই, আমি তোমার হাতে আজ সেই রত্ন তুলে দিচ্ছি। সন্ন্যাসী, শোন, আমি তোমায় ভালবাসি।

আমার মনের অবস্থাটা একবার তোমরা কল্পনা ক'রে দেখ। বাক্‌পটুতার

জন্মে তোমাদের কাছে কত প্রশংসাই না পেয়েছি! কিন্তু সেই মুমূর্ষু দু দিনের পরিচিতার প্রেম গ্রহণ করবার মত ভাষা আমি খুঁজে পেলুম না। স্তম্ভিত হয়ে তার পাশে ব'সে রইলুম।

ললিতা আবার বলতে আরম্ভ করলে, সন্ন্যাসী, এদিকে ফেরো, আমার দিকে চাও।

আমি তার দিকে চাইলুম। সে বললে, তুমি? তুমি আমায় ভালবাস?

আমি কি বলব! তাকে ভালবাসার কোনও কল্পনা তখনও পর্য্যন্ত স্বপ্নেও আমার মনের মধ্যে উঁকি দেয় নি। কিন্তু তাব জীবন-মরণের মাঝে সেই ক্ষীণ ব্যবধানটুকু প্রত্যাখ্যানের লজ্জা আর দুঃখে ভরিয়ে দেবার মত সত্যনিষ্ঠা আমার নেই। ব'লে ফেললুম, বাসি ললিতা, বাসি। তুমি কি বুঝতে পাব না?

ব'লেই মনে হ'ল, মিথ্যা কথা বলতে শেখা আমার সার্থক হয়েছে। মিথ্যার অতখানি সদ্ব্যবহার করবার অবসর বোধ হয় জীবনে আর পাব না।

ললিতা আমার কথা শুনে বললে, বুঝতে পারি। সেইজন্যেই তো তোমাকে ভালবেসেছি।

আমি বললুম, ললিতা, গতজন্মে তোমার সঙ্গে নিশ্চয় আমার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেবার বোধ হয়, আমি তোমাকে এমনই ক'রে ফাঁকি দিয়েছিলুম, এ জন্মে তুমি আমায় ফাঁকি দিলে।

ললিতা একটু হেসে বললে, শোধবোধ হয়ে গেল। এবার যখন মিলব, তখন আর ছাড়াছাড়ি হবে না। যাবার আগে—

ললিতা আর বলতে পারলে না। আমি নীচু হয়ে তার জরতপ্ত অধরে তার কুমারী-জীবনের প্রথম প্রেমের চুম্বন এঁকে দিলুম।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নাম কি সন্ন্যাসী?

আশ্চর্য্য! এতদিন সে আমার নাম পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নি। আমাকে সন্ন্যাসী ব'লেই ডাকত। অমি বললুম, আমার নাম দীনবন্ধু।

সে বললে, না না, ও নাম ভাল নয়। ও আবার কি নাম!

বললুম, তা হ'লে তুমি আমার একটা নাম দাও।

ললিতা আবার সেই ম্লান হাসি হেসে বললে, সেই বেশ। তোমার নাম তরুণ। কেমন?

আমার হাসি পেল। বললুম, তোমার যে নাম ইচ্ছে, সেই নাম ধ'রেই আমায় ডেকো।

সে বললে, দূর, তোমার নাম বুঝি আমায় ধরতে আছে?

একটু চুপ ক'রে সে আবার বললে, ওগো, তোমার পায়ের ধূলো আমার মাথায় একটু দাও না।

আমি তাই দিলুম। একটু হাঁপিয়ে গিয়ে সে বললে, আর একবার, ওগো, আর একবার।

আবার তার তৃষিত অধর চুম্বনে ভরিয়ে দিতে হ'ল। চুমুতে তার যেন সাধ আর মিটছিল না। সে আমার একখানা হাত চেপে ধ'রে রইল। সেই অবস্থাতে আমাদের প্রথম প্রেমের বাসর-রাত্রি অবসান হ'ল।

পরদিন সন্ধ্যের সময় ললিতা ইহলোক থেকে বিদায় নিলে।

দীনবন্ধুর কাহিনী শুনিয়া আমরা নীরব রহিলাম। মহেন্দ্র-দাদা জিজ্ঞাসা করিল, গেরুয়া ছাড়লে কোথায়?

দীনবন্ধু বলিল, শ্মশানঘাটে স্নান ক'রে নতুন কাপড় পরবার সময় গঙ্গার জলে গেরুয়া ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি।

স্বর্গের চাবি

ক্ষেমী

কিরণশঙ্কর রায়

ক্ষেমী ছিল আমার পিস্‌তুত ননদ। আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স ছিল বারো, তার বয়স পাঁচ। একে তো বয়সে ছোটো, তারপর শাসন ও শিক্ষার গুণে তার দেহ-মন বয়সের চেয়েও ছোটো মনে হ'ত। আমার পিস্‌শাশুড়ী প্রায় সমস্ত জীবনই বাপের বাড়িতেই কাটালেন—ক্ষেমীরও জন্ম হয়েছিল আমার শ্বশুরবাড়িতে এবং এখানেই সে মানুষ

হয়েছিল। ক্ষেমীর না ছিল রূপ, না ছিল কোনো গুণ। রং কালো, মাথায় চিরুণী বড়ো একটা পড়তই না—হাতের নখগুলো যেমনি বড়ো তেমনি ধারালো এবং ময়লায় পরিপূর্ণ—কাপড় নোংরা, হাতে দু'গাছা কাচের চুড়ি—এই ত রূপ। গুণেরও সীমা ছিল না। দুবেলা খাবার সময়ে ছাড়া তাকে বাড়িতে দেখা যেত না। কোথায় যে সে ঘুরত—কোন আমবাগানে, কাদের কুলগাছের তলায়, কোন অজাত-কুজাতের ঘরে, তা আমরা জানতাম না এবং জিজ্ঞেস করলেও সে তার কোনো জবাব দিত না, তবে মাঝে মাঝে আমটা জামটা সঞ্চয় ক'রে বাড়ি ফিরত। বাড়িতেও তার দুরন্তপনার অন্ত ছিল না। শুনতাম ক্ষেমী নাকি ঠাকুরঝিদের পুতুল খেলনা চুরি করত—রোদে দেওয়া কাপড় ছিঁড়ে দিত। শাশুড়ী বলতেন—ও মেয়ে ভারি বজ্জাত। ওর পেটে কেবল শয়তানি বুদ্ধি, ও আমার স্বরো-নিরোর (ঠাকুরঝিদের) ভালো কাপড় ভালো জামা দেখলে হিংসেতে জ্বলে। মনে আছে আমের দিনে ঠাকুরঝিরা আম খেতে বসেছে—আমি জল থালা এগিয়ে দিচ্ছি, শাশুড়ী আম টুকরো টুকরো ক'রে ঠাকুরঝিদের থালায় দিচ্ছেন। ক্ষেমী পাড়া বেড়িয়ে এসে চুপচাপ ক'রে পাশে বসল, তারপর যখন দেখল তার আম পাবার কোনো আশু সম্ভাবনা নেই তখন নিজের আঁচল থেকে কাঁচা অর্ধেক খাওয়া একটা আম বের ক'রে তাই খেতে লাগল এবং মাঝে মাঝে আড় চোখে ঠাকুরঝিদের আম খাওয়া দেখতে লাগল। ওপাড়া থেকে বোসেদের বড়োবৌ এসেছিলেন, তাঁর মেজ জা'র সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে সেই কথা বলতে। তিনি বললেন,—হ্যাঁলো, কাকেও কিছু খেতে দেখলে অমন ক'রে তাকিয়ে থাকিস কেন ? অমন করতে নেই। বড়ো জা বল্লেন—ওর স্বভাবই ঐ। যে যখন খাবে ওর ব'সে ব'সে দৃষ্টি দেওয়া চাই, যেন ওকে কেউ কিছু খেতে দেয় না। ক্ষেমী উঠে বাগানের দিকে চল্ল। শাশুড়ী ডাকলেন—ক্ষেমী আয়, আয়, এই আমটা নিয়ে যা। ক্ষেমী সেদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে ধীর পদবিক্ষেপে অন্দরের বাগানের দিকে চলে গেল। শাশুড়ী বললেন—ভয়ানক জেদী মেয়ে—একগুঁয়ের হদ্দ। পারিবারিক বিগ্রহের সমস্ত কাজই পিসিমা করতেন এবং দিনের সমস্ত সময়ই তিনি ভোগের দালানেই কাটাতেন—শাশুড়ী সেদিকে কটাক্ষ ক'রে বললেন—এই নিয়ে একটা কান্নাকাটির ধুম পড়বে এখন।

চারিদিককার শাসনে ক্ষেমীর মনে সদাই একটা সন্দেহের ও বিদ্রোহের

ভাব জেগে থাকত। এমন অনেকদিন হয়েছে যে তাকে কিছু খেতে দিতে গেলে সে হাত থেকে খাবার ছিনিয়ে নিয়ে গেছে অথবা নিয়েই আঁচলে লুকিয়েছে—পাছে শেষ পর্যন্ত তাকে জিনিসটা দেওয়া হয় না এই ভয়ে। আবার এমনও হয়েছে যে যেটা তাকে খেতে দেওয়া হয়েছে সেটা তখন না খেয়ে পরে লুকিয়ে ঢেঁকিশালায় বা বাগানে ব'সে চেখে চেখে সেটাকে খেয়েছে—এজন্যে অনেকদিন চুরির অপবাদ তার ঘাড়ে পড়েছে—তবু তার অভ্যাস বদলায়নি। মাঝে মাঝে তার সেই চাপা বিদ্রোহ হিংস্র আকারে ফেটে বেরিয়ে পড়ত এবং সেদিন তার আর রক্ষা থাকত না। আমার ছোটো ননদ নিরুপমা ক্ষেমীর চেয়ে বছর খানেকের বড়ো। একদিন সে কি নিয়ে ক্ষেমীকে খুব গালাগালি দিল এবং দু একটা কিল-চড়ও দিল। আগে আগে ক্ষেমী পিসিমার কাছে নালিশ করত। তিনি বলতেন—আচ্ছা তুমি যাও, বাইরে যাও, ওদের সঙ্গে ঝগড়া কোরো না। ক্ষেমী বুঝেছিল সেদিকে কোনো প্রতিকারের আশা নেই। সেই থেকে বাড়ির কেউ সামনে না থাকলে সেও ঠাকুরঝিদের দু'চার ঘা দিতে ছাড়ত না। সেদিনও সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে থেকে হঠাৎ নিরুর চুল ধ'রে তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিল। নিরু চীৎকার ক'রে উঠল আর অমনি বাড়ির সমস্ত লোক হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এল—ওমা এমন দস্যি মেয়ে—আর একটু হলে নিরু বারান্দা থেকে নিচে পড়ে যেত, তাহ'লে কি আর ও মেয়ে রক্ষা পেত। নিরু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ক্ষেমী সেই যে লোক সমাগমে নিরুকে ছেড়ে দিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল, সেইখানেই অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একটা কথা ব'লেও নিজের দোষ ক্ষালন করবার চেষ্টা করল না। পিসিমা এসে তাকে মারলেন, বললেন—পাজি মেয়ে, আমায় একদণ্ডও শান্তিতে থাকতে দিবি না—রাতদিন তোর জন্যে আমার অশান্তি, মরেও না হতভাগী। পিসিমার দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। একমাত্র আমি সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছিলাম। আমি জানতাম ঠাকুরঝিই প্রথম মেরেছে। সে কথা প্রকাশ করতেই সবাই বল্লেন—তুমি বৌ মানুষ, তোমার সব কথায় কথা বলবার দরকার কি? আর না-হয় দুটো কিলই দিয়েছে, তাই বলে অমন ক'রে চুল ধ'রে মাটিতে শুইয়ে দেবে? একটা কিলের বদলে যে ঠিক কি করা উচিত ছিল সেটা ধার্য না হ'লেও সবাই ঠিক জানলেন যে ক্ষেমী একদিন কাউকে না কাউকে খুন করবে। ক্ষেমী কিন্তু সমস্ত চেঁচামেচি

গালাগালি অগ্রাহ্য ক'রে যেমন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। তখন শাশুড়ী বললেন—দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি—একবার ডাক ত সুরেনকে। সুরেন আমার দেওর, এ বাড়িতে সর্বপ্রকার শাসন কার্য তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হ'ত, তিনি এই দ্বিতীয়বার এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে বসেছিলেন। ঠাকুরপো এসে ক্ষেমীকে জিজ্ঞেস করলেন—কিরে, নিরুকে মেরেছিস্ কেন? ক্ষেমী কোনো জবাব দিল না—নিস্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইল। অনেক কিল চড় খেল—তবু একটা কথা বললে না—কেবল তার চোখ-দুটো জলে ভরে এল আর ঠোঁট দুটো ফুলে ফুলে কাঁপতে লাগল। ঠাকুরপো বলতে লাগলেন—বল্ আর কখনও মারবি? আর কখনও করবি? পিসিমা কাতর হয়ে বললেন—আর করবে না সুরেন, ও আর করবে না, এখন ওকে ছেড়ে দে। ঠাকুরপো বললেন—না পিসিমা, অমনি করেই তো তুমি ওর মাথা খেয়েছ। তারই আঁচল দিয়ে তার হাত বেঁধে ঠাকুরপো তাকে বাইরে নিয়ে গেলেন—যেন শিক্ষাকার্যে কোনো বাধা না পড়ে। সেদিন এক মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি বাড়ির বৌ, আমার মনে হয়েছিল—আমি যদি পুরুষ হতাম তবে—থাক, সে আক্ষেপ ক'রে আজ কোনো লাভ নেই—তবু আজ সেই সব কথা মনে প'ড়ে কেবলি চোখে জল আসে—কেবলি মনে হয় যদি এমন না হয়ে অমন হ'ত তবু তো একটা সান্ত্বনা পাওয়া যেত।

বাড়িতে ক্ষেমীর ভাব ছিল দাসদাসীদের সঙ্গে। গুরুজনেরা বলতেন—যেমন স্বভাব তেমনি সঙ্গী। তার ভাব ছিল আমার সঙ্গে। আমার বিয়ের কথা মনে পড়ে। বিয়ের আনন্দ কোলাহল ও বাড়ির জনতা কমে এল। যাঁরা বিয়ে দেখতে এসে অসুখে পড়েছিলেন, তাঁরা আরাম হয়ে দেশে ফিরে গেলেন—আমার শাশুড়ীর মাস্‌তুত বোনের মেয়ে নিস্তারিণী ঠাকুরঝির সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছিল—তাঁর একটি ছেলে হয়ে আঁতুড়েই মারা গেল—এমনি ক'রে যখন সকল হাঙ্গাম চুকল, ছুটির শেষে স্বামী কলকাতার মেসে ফিরে গেলেন এবং আমার কাজ শিক্ষার সময় এল, তখন এই ভাসুর দেওর জা' ও নানারকম ননদে ঠাসা বাড়িটাতে এক একদিন হাঁপিয়ে উঠতাম। কার সঙ্গে কথা বলতে হবে, কার সামনেই বা বের হওয়া নিষেধ, বৌ মানুষের দ্রুত চলা উচিত কিনা, হাসা উচিত কিনা, পিতার অভাবে মাতার অত্যধিক আদরে আমার চরিত্রে কি কি দোষ ঘটেছে—এসব কথা শুনতে শুনতে এক-

একদিন মন একেবারে উদ্ধত হয়ে উঠত। বাস্তবিকই মিত্তিরদের বাড়ির বৌ হবার যোগ্যতা আমার ছিল না। তবে একথা স্বীকার করতেই হ'বে যে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। মিত্তিরদের সরিক-বাড়ির একটি নতুন বৌ গান গাইতে জানত ব'লে শাশুড়ী আমার স্বামীর জন্য গান-জানা মেয়ে খুঁজেছিলেন। আমি একটু আধটু গান গাইতে পারতাম—আমার পুরোনো হারমোনিয়ামটা আমার সঙ্গে এসেছিল—কিন্তু গান গাওয়া দূরে থাকুক, হারমোনিয়াম বাজান আমার পক্ষে নিষেধ ছিল। একদিন ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে গোপনে হারমোনিয়ামটা আস্তে আস্তে একটু বাজিয়েছিলাম। তার পরদিন থেকে হারমোনিয়ামের চাবি শাশুড়ী নিজের কাছে রেখে দিলেন। স্বামীর কাছে ঘন ঘন পত্র লেখা নিষেধ, মায়ের কাছে পোষ্টকার্ড ভিন্ন লেখা নিষেধ ;—এ সবই হয়েছিল এবং ফল যে কিছুই হয়নি একথা বলতে পারি না। শাসন বল, উপদেশ বল, শিক্ষা বল, প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি, কিন্তু স্বামী ছাড়া আর কারো কাছে না পেয়েছি ক্ষমা, না পেয়েছি একটু আদর, অথচ বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির অপরিচিত লোকের মধ্যে একটুখানি আদর পাবার জন্য মনটা উন্মুখ হয়ে থাকত। মনটা যখন বেশি উগ্র হয়ে উঠ্‌ত—কিছুতেই বিরক্তি দূর করতে পারতাম না—তখন পিসিমার কথা ভাবতাম—তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলা নিষেধ ছিল। আমিও তাকে এড়িয়েই চলতাম, তাঁর কাছে গেলে তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, পাছে আমরা তার কোনো জিনিসপত্তর ছুঁয়ে দি,—কারণ, তিনি জানতেন যে, একান্ত বিশুদ্ধতার জন্যে দিনের মধ্যে যতবার স্নান করা, অন্তত কাপড় ছাড়া, অবশ্য কর্তব্য, আমার সে-সব হয়ে উঠত না ; কিন্তু পরে দেখেছি পিসিমা এসব প্রশ্ন একেবারেই তুলতেন না। পিসিমা একদিন হঠাৎ আমার স্বামীর নাম করে বললেন, বৌ, তাকে আমি নিজ হাতে মানুষ করেছি। তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো—আমায় দেখে অত লজ্জা করবার দরকার নেই—আমি আবার একটা মানুষ! সেইদিন বুঝলাম পিসিমা কত বড়ো একটা ব্যথা নীরবে বহন করছেন। যখনই ছোটোখাটো অত্যাচারে অধীর হয়ে পড়তাম তখনই তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম। দুপুরবেলা বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, কার্ণিশের উপর থেকে পায়রার ডাক শোনা যাচ্ছে। পিসিমা ভোগের দালানে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ ক'রে দিয়ে মেজেতে আঁচল বিছিয়ে শুতেন। আমি একখানা খবরের

কাগজের উপর সুপুরি কেটে জমা করতাম। পিসিমা হেসে বলতেন, পাগলী, আমরা যে মেয়েমানুষ—আমাদের কি সহ্য না ক'রে উপায় আছে? ঐ ত—ঐ কথাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না। মেয়েমানুষ হয়েছি বলেই কি ন্যায় হোক অন্যায় হোক সব মাথা পেতে নিতে হবে? পিসিমা বলতেন—পূর্বজন্মে পাপ না করলে স্ত্রীজন্ম হয় না। আবার এক একদিন পিসিমা তাঁর শ্বশুরবাড়ির গল্প করতেন—তাঁদের টিনের ঘর, তাঁদের মস্ত পুকুর, পিসেমশায় ঘন দুধ খেতে ভালোবাসতেন, একবার তিনি বাজি রেখে একটা কাঁঠাল একাই খেয়েছিলেন,—এই সব বলতে বলতে পিসিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটু চুপ করতেন, তারপর দেখতাম তাঁর হাতের হাতপাখাখানা টলে মেজেতে প'ড়ে যেত, তাঁর নাক একটু একটু ডাকতে শুরু করত। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতাম। মনে হ'ত সূর্যের প্রচণ্ড তাপে গ্রামটা যেন মূর্ছিতের মতো পড়ে রয়েছে—দূরে গ্রামের পথ দিয়ে ক্বচিৎ একটি দুটি লোক অবেলায় স্নান সেরে ভিজে গামছা মাথায় দিয়ে চলেছে, অন্দরের পুকুরে সবুজ-সর-পড়া জল একেবারে স্থির, পুকুরের ধারে একটা নারিকেল গাছের উপর একটা শঙ্খচিল মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠছে। রান্নাঘরের উঠানে এঁটো বাসনের সামনে দু' তিনটে কুকুর ভাত খেতে খেতে মাঝে মাঝে পরস্পরকে তাড়া করছে। কাছে পাঁচিলের উপর এক সার কাক ব'সে আছে—মাঝে মাঝে এক একটা কাক এসে এঁটো ভাত নিয়ে উড়ে পালাচ্ছে। তারপর দেখতাম ক্ষেমী বাগানে গাছতলায় কি কুড়ুচ্ছে। আমিও নেমে বাগানে যেতাম। সেখানে গাছের ছায়ায় ব'সে ক্ষেমীর সঞ্চিত নুন দিয়ে কাঁচা আম খেতে খেতে খবর পেতাম—দত্তদের বাড়ি তাদের নতুন গরুর একটা বাছুর হয়েছে, বাগদীরা একটা মস্ত শুয়োর মেরেছে—আরও কত কি! আমি বলতাম—তুই যে অমন ক'রে যেখানে সেখানে যাস, একদিন বাগ্‌দীরা তোকে ধ'রে নিয়ে যাবে। ক্ষেমী বলত ইস!

এক একদিন উত্তেজিত হ'য়ে স্বামীকে বলতাম। স্বামী বলতেন—তুমি ওসব গোলমালের মধ্যে যেও না। জানতাম স্বামীকে ব'লে লাভ নেই। তিনি কলেজে পড়েন, কোনো অত্যাচার দমন করা তাঁর সাধ্য ছিল না এবং অত্যাচার নিবারণ করবার চেষ্টা করলে অত্যাচার কমা দূরে থাক বাড়বারই সম্ভাবনা ছিল। এক-এক সময় ভাবি, যদি স্বামী আমার পক্ষ

অবলম্বন ক'রে কিছু বলতেন, তবে না জানি মিত্তির পরিবারে কি বিপ্লবই উপস্থিত হ'ত। অপরিচিত নয়, অন্য নয়, নিজের স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা —মিত্তির পরিবারে যা কখনও হয়নি আজ নাকি তাই হ'ল—এমন মেয়েও ঘরে এনেছিলাম!—এমন ধরণের কথা নিশ্চয়ই উঠত। গল্পে শুনেছি কিছুদিন পূর্বে এই মিত্তির বাড়িতেই কার যেন ছেলের কলেরা হয়েছিল। কিন্তু ছেলের বাপ তো নিজে ছেলের চিকিৎসা করাতে পারবে না—বিশেষত নিজের বাপ বর্তমানে, অথবা সে কথা নির্লজ্জের মতো তাঁকে বলতেও পারেন না। এই সব গোলে ডাক্তার যখন এল তখন ডাক্তার না আনলেও ক্ষতি ছিল না। আমার শ্বশুর ছিলেন বাড়ির কর্তা। দু'বেলা খাওয়া ও রাত্রে শোওয়া ছাড়া বাড়ির ভিতরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। জমিদারি দেখা ও পূজা-আচ্চা নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। তিনি অত্যন্ত মনভোলা বেখেয়ালী মানুষ ছিলেন। কিন্তু বাড়ির যিনি কর্তা তিনি বেখেয়ালী হ'লে চলে না। এই যে পিসিমার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার উপেক্ষা হ'ত সে সবের প্রতিকার করা কি তাঁর উচিত ছিল না? যারা ছোটো—কর্তব্য কর্মে ভুল হওয়ামাত্র যারা শাস্তি পেত—তাদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে ঢের লোক ছিল, কিন্তু যাঁরা কর্তব্য পালন না করলে সংসারে শত অশান্তির সৃষ্টি হ'ত তাঁরা কর্তব্য স্মরণ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করতেন। পিসিমার কথাই ভাবি। তাঁর যখন বিয়ে হয়েছিল তখন ছেলে দেখবার আবশ্যকতা কেউ বোধ করেনি। যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা না থাক বংশের উচ্চতা ছিল। বাড়ির পুরোনো চাকর মাধু ছেলে দেখতে গিয়েছিল। সে বললে এমন ছেলে হয় না, যেন সাক্ষাৎ কার্ত্তিক, তাদের তিন-চারখানা টিনের ঘর, পুকুরে মাছ, দেশে দুধ ঘি সস্তা, কিন্তু তা কেনবার কড়ি ছিল না। পিসেমশায় পিসিমার চেয়ে বছর কুড়ি বড়ো ছিলেন। অবশ্য তাতে কোনো আপত্তি হবার কারণ ছিল না। বিয়ের কিছুদিন পরেই তাঁরা এসে আমার শ্বশুরের আশ্রয়ে এই বাড়িতেই বাস করতে লাগলেন। ভায়ের অন্নে প্রতিপালিত হতে পিসিমার লজ্জা হ'ত এবং মাঝে মাঝে তিনি শ্বশুরবাড়ি যাবার প্রস্তাব করতেন, কিন্তু এখানকার দুধ তামাক কাঁঠাল প্রভৃতি ছেড়ে যেতে পিসেমশায় কোনো মতেই রাজি ছিলেন না। বস্তুত খাওয়া ও দেবদ্বিজে ভক্তি ছাড়া অন্য

কোনো বিষয়ে তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল না। চার পাঁচটি ছেলেপিলে হয়েছিল, কিন্তু একটিও বাঁচল না—এক ক্ষেমী ছাড়া। তারপর পিসেমশায়ের মৃত্যু হ'ল। ক্ষেমীকে কোলে নিয়ে পিসিমা যখন বিধবা হ'লেন তাঁর বয়স ত্রিশের নীচে। তারপর থেকে কত অপমান আর ক্ষুদ্র অবহেলার মধ্য দিয়ে ক্ষেমীকে মানুষ করেছিলেন। বিধবা হয়ে পরের বাড়িতে থাকতে যে কি অসাধারণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার দরকার হয় তা পিসিমাকে দেখলে বোঝা যেত, কিন্তু পিসিমা এ সবকে নিতান্ত সাধারণ ভাবেই নিতেন, বলতেন অদৃষ্ট। যেন শেষ মীমাংসা হয়ে গেল—অদৃষ্ট যখন, তখন আর কি, দাঁতে দাঁতে চেপে নীরবে সহ্য কর।

ক্ষেমীর সঙ্গে ভাব হ'তে আমার বেশি সময় লাগেনি। ঠাকুরঝিরা আমার চিঠি খুলে আমার নামে নালিশ ক'রে অস্থির ক'রে তুলত। পরীক্ষার বছর স্বামীর কাছে চিঠি লেখা নিষেধ ছিল। হয়ত দরজা বন্ধ ক'রে গোপনে তাঁর কাছে চিঠি লিখছি, ফস্ ক'রে খড়খড়ি খুলে ঠাকুরঝি বল্‌লে—ফের বৌদি, মেজদার কাছে চিঠি লেখা হচ্ছে বুঝি? মাকে ব'লে দেবো কিন্তু। নানারকম ঘুষ দিয়েও তাদের মুখ বন্ধ করতে পারতাম না। চিঠি ডাকে দেবার, টিকিট কেনবার পক্ষে ক্ষেমীই ছিল আমার সহায়। দুপুর বেলা হয়ত বাক্স খুলে এটা ওটা গোছাচ্ছি ক্ষেমী পেছন থেকে হঠাৎ ঝুপ ক'রে আমার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল—আঃ ক্ষেমী, লাগে, ছাড়। সে ছেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে বাক্সর কাছে বসল, তারপর ফের এটা ওটা টেনে বের ক'রে অস্থির ক'রে তুলল। আমি বলতাম—যা, আমি তোর সঙ্গে কথা বলব না। অমনি সে অনুতপ্ত হয়ে উঠত। আমার সঙ্গে এই ছিল তার ব্যবহার; মাঝে মাঝে তার চুল বেঁধে কপালে টিপ পরিয়ে দিতাম, তার মলিন কাপড়ে একটু এসেন্স মাখিয়ে দিতাম। এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত উভয়েই গঞ্জনা পেতাম। প্রথমত ক্ষেমীকে চোর সাব্যস্ত করা হ'ত; তারপর আমি যখন বলতাম যে আমি দিয়েছি, তখন শাশুড়ী বলতেন—নিজের ননদের সঙ্গে ঝগড়া আর পরের সঙ্গে ভাব!

ক্রমে ক্ষেমীর বয়স বাড়ল। তার বিদ্রোহের ভাব কখন যে অলক্ষ্যে দূর হয়ে গেল তা বোঝাই গেল না। আর সে পাড়া বেড়াতে যায় না। মাঠের ধারের জামগাছ আর রায়েদের কুলগাছের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচে গেল। তার মুখে কোমলতা আর চোখে লজ্জার আভাষ দেখা গেল। কুশ্রী ক্ষেমীকে

সহসা সুশ্রী বলেই মনে হ'ত। তার বয়স চোদ্দ হ'ল, অথচ বিয়ের খোঁজ নেই —এ অবস্থায় পিসিমার গলা দিয়ে কি ক'রে যে ভাত গলে তা গ্রামের লোকেরা বুঝতেই পারত না। বাড়ির সমস্ত গিন্নি বৌরাও বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন। শাশুড়ী একদিন খাবার সময়ে আমার ভাসুরকে বললেন—আচ্ছা উপেন, ঐ যে যদু দত্ত আমাদের কি কাজ করে, তার একটি ছেলে আছে, তার সঙ্গে ক্ষেমীর সম্বন্ধ হয় না? ভাসুর দুধটুকু নিঃশেষ ক'রে খেয়ে দুধের বাটিটাতে খানিকটা জল ঢেলে সেটাও পান ক'রে বললেন—রাম রাম, সে ছোঁড়া আট টাকা মাইনেতে মুহুরিগিরি করছে। তার উপর গাঁজাটা-আশটাও চলে। তার সঙ্গে কি ক্ষেমীর বিয়ে হয়! শাশুড়ী বললেন—তা তোরা একটা উপায় করে দিস। বিয়ে হ'লে ক্ষেমীকে, ক্ষেমীর স্বামীকে তোরা তো ফেলে দিতে পারবি নে। পিসিমার আপত্তিতে কথাটা কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারল না। আর যদি কখনও বিয়ের কথা উঠত শাশুড়ী বলতেন—আমি তার কিছু জানি না বাপু, যাঁর মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস কর। অবশেষে রাজপুর থেকে সম্বন্ধ এল। রাজপুর আমাদের গাঁ থেকে মাইল পোনেরো দূরে। তাঁরা মেয়ে দেখা নিয়ে বেশি গোলমাল করলেন না, তবে হাজার দুই টাকা চাইলেন। শেষটা পোনেরো শ' টাকায় কথা পাকা হ'ল। ইতিপূর্বেই আমার স্বামী ডেপুটি হয়েছিলেন এবং আমিও পূর্বের মতো কনে-বউটি ছিলাম না। অতএব একরকম করে টাকাটা উঠল। বিয়ে হয়ে গেল। জামাই দেখে পিসিমা খুশি হলেন। জামাইটির বয়স অল্প, বি-এ পড়ছে, দেখতেও ভালো, বেশ নম্র শান্ত। শুনেছিলাম—অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, একেবারে কিছু নেই বললেই হয়। তা হোক, জামাই দেখে ভাবলাম অভাগী ক্ষেমীর এবার বুঝি কপাল ফিরল। জামায়ের নাম দীনেশ। খবর পেলাম—সে যে কেবল নিঃস্ব তা নয়, তার বাপ মা ভাই বোন আপনার বলতে কেউ ছিল না। রাজপুরে রামনিধিবাবু পাটের ব্যবসা ক'রে অনেক টাকা উপার্জন করতেন, তাঁরাই দীনেশকে মানুষ করেছিলেন। রামনিধিবাবুর ছেলেরা কলকাতায় কলেজে পড়ত, দীনেশও সেইখানে থাকত, রামনিধিবাবু ও তাঁর সমস্ত পরিবার রাজপুরে থাকতেন। ক্ষেমীকে তাঁরা সেইখানে নিয়ে গেলেন। এক কাঙালের ভার আর এক কাঙালের উপর পড়ল—এই ভেবে বিয়ের সময়েই মনটা একটু খারাপ হয়েছিল; তবু এই আশা করেছিলাম যে ক্ষেমী

অনেক কষ্ট পেয়েছে, ভগবান তাকে আর কষ্ট দেবেন না। বিয়ের কিছুদিন পরে সে যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছুদিনের জন্যে ফিরে এল তখন তার আশ্চর্য পরিবর্তন দেখলাম। অনেক ফর্‌সা হয়েছে, শরীরটাও আগের চেয়ে অনেক ভালো। সিঁথির সিঁদুরে কাপড়-চোপড়ে তাকে বেশ দেখাচ্ছিল। স্বামীর প্রেম তার সমস্ত দেহে যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিল। সেই দুষ্টু পাগলী মেয়েকে একেবারে অপূর্ব লক্ষ্মী-শ্রী-মণ্ডিত ব'লে মনে হচ্ছিল। সে আর সেই দুর্দান্ত ক্ষেমী নয়, সে স্বামীর প্রণয়িনী, গৃহের গৃহলক্ষ্মী। রাজপুর থেকে সে যেদিন এল তার পরদিনই তার কাছে একখানা চিঠি এল। রঙিন খামের উপর লেখা—শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি লো ক্ষেমী, আবার জ্যোৎস্না হলি কবে? সে জবাব দিল না, মুখ নীচু ক'রে একটু একটু হাসতে লাগল। আজও যেন ছবির মতন সেই সব দিনকার ঘটনা আমার চোখের সামনে ভাসছে। এতটুকু বয়েস থেকে যাকে দেখলাম সেই মেয়ে বড়ো হয়ে একদিন ঘরের কল্যাণী গৃহিণী হ'ল, আজ সে নাই একথা হঠাৎ কেমন অসম্ভব ব'লে মনে হয়। হ্যাঁ—তারপর বছরখানেক তার সঙ্গে দেখা হয়নি, কারণ আমি স্বামীর সঙ্গে বাংলা দেশের জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সেও আর শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসে নি। তবে মাঝে মাঝে তার চিঠি পেতাম। এই-রকম চার পাঁচ মাস চলল তারপর চিঠিও বন্ধ হ'ল।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি স্বামীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়া হ'ল। পিসিমার কাছে শুনলাম তিনিও অনেক দিন হ'ল ক্ষেমীর চিঠি পান নি। রামনিধিবাবুর স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে কোনো জবাব পেলাম না। এমন সময়ে দীনেশের এক চিঠি পেলাম, তাতে লেখা ছিল—ক্ষেমীর খুব অসুখ এবং চিঠির ভাবে বুঝলাম সেখানে চিকিৎসা যত্ন কিছুই হচ্ছে না। দীনেশের ইচ্ছা আমরা তাকে নিয়ে আসি। লোক পাঠালাম তাকে আনতে—তাঁরা বললেন এমন বিশেষ কিছু নয়, ঠাণ্ডা লেগে একটু কাশি হয়েছে। কিন্তু ছাড়লাম না। শাশুড়ী একটু আপত্তি করেছিলেন। বললেন—তাঁদের বৌ, তাঁরা যদি উচিত বিবেচনা না করেন।—শ্বশুরকে বললাম—তিনি নিষেধও করলেন না, উৎসাহও দিলেন না। স্বামীর ডেপুটিত্বে পরিবারের মধ্যে আমার প্রতিপত্তি কিছু বেশি ছিল,—সেই জোরে নিজেই জোগাড় ক'রে তাকে

আনালাম। পালকী এসে যখন অন্দরের উঠানে নামল—দেখলাম ক্ষেমীর ওঠবার সামর্থ্য নেই। পাংশু শীর্ণ মুখের মধ্যে কেবল চোখ ছুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। ডাক্তার বললে—যক্ষ্মা। মনে জানতাম বাঁচবে না—তবু—হায়রে, মানুষের মনের এই তবু! সংসারের শত উপেক্ষার মধ্যে যে মানুষ হয়েছিল, আজ যেমনি সে জীবনোৎসবের দ্বারে এসে দাঁড়াল অমনি কি মৃত্যু তাকে স্মরণ করল! রোগের যে ইতিহাস পাওয়া গেল সে হচ্ছে এই—রামনিধিবাবুর একটি মেয়ে কিছুদিন হ'ল ঐ রোগে মারা যায়, তার অসুখের সময়ে ডাক্তারে রোগীর পরিচর্যা সম্বন্ধে শুশ্রূষাকারীদের বিশেষ সাবধান ক'রে দিয়েছিল। অতএব রামনিধিবাবুর স্ত্রী ক্ষেমীকে দিয়ে তার শুশ্রূষা করিয়েছিলেন। যদি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হ'ত তবে হয়ত এমন সর্বনাশ হ'ত না। আবার ভাবি, অদৃষ্ট—বারেবারেই সেই অদৃষ্ট। একদিন যেমন মানুষের আচরণ বুঝতাম না ব'লে অদৃষ্ট ব'লে চুপ ক'রে থাকতাম—আজও তেমনি চুপ ক'রে রইলাম। শুনতে পেলাম ক্ষেমী সাবধান হবার চেষ্টা করলে রামনিধিবাবুর স্ত্রী বিরক্ত হতেন। দীনেশ জানত—কিন্তু সে যে তাঁদের খেয়েই মানুষ।

ক্ষেমী আমাদের এখানে এসে মাসখানেক ছিল। ডাক্তারি কবরেজি মুষ্টিযোগ কিছুতেই কিছু হ'ল না। অনেক রাতে সমস্ত বাড়ি নিদ্রায় মগ্ন—ঘরের সমস্ত জানলা খোলা—ক্ষেমী বিছানায় বিলীন হ'য়ে থাকত। মাঝে মাঝে একটু কাশি, তাও আস্তে। ঘরের নিস্তব্ধতা ঘড়িটার শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। বারান্দায় লণ্ঠনটা জ্বলছিল। আমি একটু একটু বাতাস দিচ্ছিলাম। পিসিমা মেঝেতে শুয়ে ছিলেন, হঠাৎ ধড়মড় ক'রে উঠে বললেন—কি? কি বৌ, কি? আমি বললাম—কই পিসিমা, কিছু নয়ত। আপনি ঘুমোন, আমি আছি। সে রাত্রে তার বুকের ব্যথাটা একটু বেড়েছিল।

ক্ষেমী বললে—বৌদি।

কি ক্ষেমী?

আমি বাঁচব না, না?

আমি বললাম—কে বললে তুমি বাঁচবে না? তবু ভালো হবে, তবে একটু দেরি হবে।

না বৌদি, আমি বুঝতে পারছি আমি বাঁচব না।

আমি বললাম—লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোও।

ঘুম যে পাচ্ছে না, বৌদি।

একটু চেষ্টা ক'রে দেখ।

সে বললে—না, ঘুম পাচ্ছে না। তার চেয়ে তুমি একটু কথা বল। দেখ বৌদি, এই রাত্তিরগুলো যেন যেতেই চায় না। রাত্তির আমার ভালো লাগে না। কী চুপচাপ, একটা শব্দ পর্যন্ত নেই।

চুলগুলো কাটতে দেয়নি ব'লে বেণী বেঁধে দিয়েছিলাম। মনে হ'ত সে যেন সেই ছোট্ট মেয়েটি রয়েছে, আমার উপর তেমনি নির্ভর, আমার কথার উপর তেমনি বিশ্বাস। জীবনের শেষ কয়েকটা দিন বুদ্ধিহীনা ক্ষেমীর বুদ্ধি যেন অকস্মাৎ উজ্জল হয়ে উঠেছিল। প্রায়ই সে মৃত্যুর কথা বলত। মৃত্যুকে যে সে ভয় করত এমন মনে হয় না, তবে মাঝে মাঝে দেখেছি চোখের পাতা জলে ভিজে। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলত না, চিরকালই তার ঐ রকম চাপা স্বভাব। মনে হত—ওপারের সে এত কাছাকাছি পৌচেছে যে সেখানকার অনেক রহস্য সে যেন বুঝতে পারত। একদিন সে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা বৌদি, মরলে কি লোকে পৃথিবীর কথা ভুলে যায়? আমি কি বলব, আমি সামান্য মেয়েমানুষ, আমি সে সব কথার কি জানি! একদিন রাত্রে সে বেশি অস্থির হয়ে পড়ল। পিসিমাকে বলল,—মা, আমায় একটু কোলে নে। পিসিমা দুইহাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। স্বামীকে ডেকে নিয়ে এলাম। ক্ষেমী বললে—মেজদা, আমি আর বাঁচব না, সবাইকে ডাক, একবার সবাইকে দেখি। স্বামী বললেন—ক্ষেমী, একটু স্থির হয়ে শোও তো। সে বিছানায় স্থির হয়ে শুল। বললে,—মেজদা, ভয় করছে। স্বামী কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে বললেন—ভয় কি? এই ত আমি আছি। আমি তোর কাছে বসছি, নে, তুই আমার হাত ধ'রে থাক। সে ছোটো মেয়েটির মতো তাঁর হাত ধ'রে কোলের কাছে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম। আকাশের দিকে তাকালাম, চাঁদ তখন অস্ত গিয়েছে, পাথরের মতো কঠিন কালো আকাশে তারাগুলো জ্বল জ্বল করছিল। বাইরে বাগানের গাছগুলো শুব্ধ কালো। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ, অন্ধকারে সেই প্রকাণ্ড বাড়িটা কেমন যেন রহস্যপূর্ণ। তারি মাঝখানে

ক্ষেমী—আমাদের সেই ছোট্ট ক্ষেমী—এ কোন্ অন্ধকারের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—আকাশে, গাছগুলোয়, এই বাড়িটার মধ্যে কি যেন ইঙ্গিত খেলে গেল। তারা যেন এই ঘরটার পানে চেয়ে কিসের প্রতীক্ষা করছে। কেবল মানুষের সেদিকে খেয়াল নেই। তারা খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিচ্ছে। একবার মনে হ'ল চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকি—ওগো তোমরা ওঠ ওঠ, একটা প্রাণ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

যেদিন তার মৃত্যু হ'ল, সেদিন সকাল বেলা সে ভালোই ছিল। আমায় ডেকে বললে—বৌদি, তাকে একটা টেলিগ্রাম কর। দীনেশ তার আগের দিনই ফিরে গেছল। তার কলেজ খোলা, তাই তাকে আর টেলিগ্রাম করা হ'ল না। চিঠি লিখে দেওয়া হ'ল। সেদিন দুপুর বেলা সে একটু ঘুমোল। বাইরে বারান্দায় রোদের তাপ নিবারণ করবার জন্যে চিক ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আমি কাছে বসে ছিলাম। তার ঘুমের মধ্যে যে নিশ্বাস প্রশ্বাসটুকু চলত সে এত আস্তে যে মনে হ'ত এই বুঝি বন্ধ হয়ে গেল।

একটা মাছি উড়ে উড়ে ক্রমাগত তার মুখে চোখে বসছিল, আমি আঁচল দিয়ে সেটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম। বাড়ির পুরুষেরা জুতো খুলে পা টিপে টিপে এসে এক একবার দেখে যাচ্ছিলেন। বাইরে বাড়ির কোলাহল যথাসম্ভব সংযত রাখা হয়েছিল, তবু মাঝে মাঝে শুনতে পেলাম—বামন-ঠাকুর, খোকাবাবুকে আর একটু ঝোল দাও, কর্তার ভাত ফুটছে নাকি? ভাসুর তাদের শাসন করে গেলেন—আস্তে, আস্তে চেঁচিও না। বাইরে জীবনের স্রোত তেমনি চলছিল।

সেই দিনই বিকেলে তার মৃত্যু হ'ল। তাকে নিয়ে গেল রাঙা শাড়ি পরিয়ে, কপালে সিঁদুর দিয়ে। পিসিমা উঠানের উপর উপুড় হয়ে পড়ে চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগলেন। আমরা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা করলাম না। দুই হাতে কান বন্ধ ক'রে বসে ছিলাম। তবু শুনতে পেলাম দূরে বহুদূরে হরিবোল হরিবোল। ঝি চাকরেরা বড়ো জায়ের তত্ত্বাবধানে গোবর জল ছিটিয়ে ঘর-বারান্দা ধুয়ে ধুয়ে বাড়ি থেকে মৃত্যুর অশুচি স্পর্শ দূর ক'রে দিচ্ছিল। সন্ধ্যা হয়ে এল। তার শূন্য ঘরের দরজা-জানালাগুলো খোলা পড়ে রইল। সে রাত্তিরটা আমার বেশ মনে আছে—ফুটফুটে জ্যোৎস্না, বসন্তের বাতাস মাঝে মাঝে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠছিল। চৈত্র

সংক্রান্তি তখন আসন্ন। বহুদূরে একটা ঢাক বাজছিল, বাগানের কোন্ গাছে একটা কুক পাখি ক্রমাগত ডাকছিল। শাশুড়ী বললেন—রামা, পাখিটাকে তাড়িয়ে দে ত। পিসিমার কান্নাও কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে এসেছিল। খোলা বারান্দায় ব'সে ব'সে হঠাৎ আমার স্বামীর জন্যে কি একটা আশঙ্কায় মনটা হু হু করে উঠল, চাকরকে ডেকে বললাম—একবার তাঁকে এখানে শুনে যেতে বলগে।

পরদিন সকাল থেকে মিত্তির-বাড়ির প্রকাণ্ড রথ আবার সেই বাঁধা রাস্তায় মন্থরগতিতে চলল। আবার সেই সকালে উঠে দুপুরের খাওয়ার আয়োজন—বিকেলে রাত্তিরের খাওয়ার ব্যবস্থা। সেই কারও জন্যে আতপ চাল, কারও জন্যে মোটা চাল। কেবল ভোগের দালানের কঠিন ভিজে মেঝের উপর পড়ে পিসিমার চোখের জলের আর শেষ ছিল না। ক্ষেমীর কথা যে আর উঠত না, তা নয়—সবাই বলত—সিঁথির সিঁদুর নিয়ে গেল, এমন ভাগ্যি কি সকলের হয়!

'সপ্তপর্ণ'

এ গ জা ম্প্ ল

বিজয়রত্ন মজুমদার

পৃথিবীতে যাহারা চক্ষু মেলিয়া দেখে ও কান পাতিয়া শোনে, তাহাদের কাছে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব কিছু থাকিতে পারে না।

সরসী কলেজে আসিত। তাহার শাড়ীর নিত্য নূতন বর্ণ, নিতুই নব শব্দ; জুতার বৈচিত্র্য অনন্ত; যে সুগন্ধিটুকু সে ব্যবহার করিত, তাহার গন্ধ চিরদিন অম্লান।

সহপাঠিনীদের সঙ্গে সরসীর ভাবও ছিল না, ভাবের অভাবও ছিল না; সহপাঠিদের কাহাকেও যে উপেক্ষা করিত, তাও নয়, কাহারও সহিত আলাপও যে করিত, তাও নয়। শিক্ষকগণ আসিতেন, বক্তৃতা দিতেন,

চলিয়া যাইতেন। সরসী বোধ হয় সব শুনিত, সব বুঝিত, কিন্তু কখনও কথা বলিত না, কোনো প্রশ্ন করিত না এবং কদাচিৎ প্রশ্নের উত্তর দিত। তবে সে যে ক্লাসে ঘুমাইত না, সেটা সবাই দেখিত।

কলেজের ষ্টীমার-পার্টির চাঁদার খাতায় সব শেষ ও সব চেয়ে মোটা অঙ্ক সহি করিত সরসী। কিন্তু যথাসময়ে জেটি পরিত্যাগ করিবার পূর্বে ষ্টীমার বংশীধ্বনি করিয়া গলা ধরাইয়া ফেলিল, সবাই আসিল, সরসী আসিল না। পর দিন, সহপাঠিনীরা সহপাঠিগণের প্ররোচনায় কৈফিয়ৎ চাহিলে, সরসী মৃদু হাসিল, কথা কহিয়া জবাব সে দেয় না।

শেক্সপীয়ার প্লে—ছাত্র-ছাত্রীরা অভিনয় করিবে, ইংরেজ শিক্ষক রিহার্সাল দিতেছেন, বিরাট সমারোহ, লাট ও লাটপত্নী উপস্থিত থাকিবেন, সাজসজ্জার মহা আয়োজন চলিতেছে। চাঁদার খাতা সরসীর কাছে গেল, এবার যুবকগণই চাঁদা সাধিতে বাহির হইয়াছেন। সরসী সর্বপ্রথমেই সহি করিল এবং এমন একটা স্থূল অঙ্ক বসাইয়া দিল যে, যে লিখিল ও যে দেখিল, দুজনেই বুঝিল যে সে অঙ্কের কাছেও কেহ পৌঁছিবে না। ভাবে ও ভঙ্গিমায় অপার সন্তোষ প্রকাশ করিয়া মধুপের দল গুঞ্জন করিল, আসতে হবে কিন্তু; ষ্টীমার পার্টির মতো ফাঁকি দিলে চলবে না।

সরসী বাক্যে নয়, শুদ্ধ মৃদু হাস্যে জবাব দিল। পুনরায় সনির্বন্ধ অনুরোধ, বলুন আসবেন?

হাসির যদি অর্থবোধ সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইহারা নিশ্চিত বুঝিল, সরসী আসিবে।

অর্থ ভুল, কারণ সে আসিল না। ছাত্র এবং ছাত্রীমহলে তাহার না আসা লইয়া দীর্ঘ আলোচনা, বহু মন্তব্য, অনেক প্রিয় ও অপ্রিয় কথা হইল; এবং শেষে রেজোলিউসন হইল, কেহ তাহাকে কোনো প্রশ্ন করিবে না। সে যে আসে নাই, ইহারা যেন তাহা লক্ষ্যই করে নাই, এই ভাবটা ফুটাইতে হইবে।

বড়ো কঠিন। মেয়েরা যদিবা পারিল, ছেলেরা পারিল না। চিন্ময় অভিনয় রজনীতে সরসীর জন্য একখানি ও তাহার পাশে আর একখানি চেয়ার অতি কষ্টে রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিল; সরসী যে গন্ধ ব্যবহার করে, সেই গন্ধ দিয়া সে রুমাল, শার্ট, গেঞ্জি সিক্ত করিয়া আসিয়াছিল; হগ

মার্কেটে অর্ডার দিয়া একটি বিশেষ রূপের ও আয়তনের বোকে তৈয়ার করাইয়া আনিয়াছিল, একখানি প্রোগ্রামে আতর মাখাইয়া রাখিয়াছিল। বেচারার অনেকগুলি টাকা এইসব কাজে কর্জ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দুঃখ ছিল না; কিন্তু ব্যর্থতার দুঃখ অন্তরে অস্বীকার করা যায় না। পূর্ববর্ণিত রেজোলিউসন তাহার অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু পেন্‌সিল কাটিতে কাটিতে যে সময়ে সরসী ক্লাসের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, পানের পিচ্ না ফেলিলে চলে না বলিয়া চিন্ময়ও সেই সময় বারান্দায় আসিয়া পড়িল।

উভয়ের মধ্যে ব্যবধান এক হাত, আস্তে কথা বলিলে শোনা যায়। চিন্ময় বলিল, কাল প্লেতে এলেন না যে!

পেন্‌সিলের শিষটা যাহাতে সূচের মতো হয়, আবার ভাঙিয়াও না যায়, সেই জন্য সরসীকে বিশেষ যত্ন লইতে হইতেছিল, কথা কহিবার অবকাশ ছিল না, মৃদু হাসিল।

—আমরা কিন্তু বড্ড ডিসাপয়েন্টেড্ হয়েছি।

অন্যের ডিসাপয়েন্টমেন্টে দুঃখ প্রকাশ করা নিয়ম, সরসী সকল নিয়মের বহির্ভূত, ঈষৎ হাস্য করিল।

ক্লাস হইতে অনেকেই বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, চিন্ময় থামের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া ছিল, তাহাকে দেখা যায় না, কিন্তু সরসীর মুখের মৃদু হাসি দেখিয়া দর্শকগণ বুঝিয়া লইতেছিল যে, কেহ-না-কেহ সেখানে আছে এবং প্রশ্ন করিতেছে। সেই কেহ কে হইতে পারে ভাবিতে গিয়া অনেকেই শিক্ষকের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইল এবং লেকচার তাহাদের কানে শব্দহীন হইয়া পড়িল।

পেন্সিলের শিষ সরু হইল এবং ভাঙিল না, সরসী ক্লাসের মধ্যে স্বস্থানে আসিয়া বসিল। চিন্ময় রুমাল দিয়া ঠোঁটের পানের দাগ উঠাইতে উঠাইতে ক্লাসে ঢুকিল। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে চোখের ভাষায় বলিল, হ্যাংলা! ছেলেরা ভাবিল, ক্লাস কি আজ অফুরন্ত পরমায়ু লইয়া আসিয়াছে!

কিন্তু পরমায়ু অফুরন্ত নয়। ঘণ্টা পড়িয়া গেল। ছেলেরা মেয়েরা না দেখিতে পায় ও না বুঝিতে পারে, এমন ভাবে চিন্ময়কে ঘিরিয়া বসিল ও দাঁড়াইল। সমবেত প্রশ্ন, কেন আসেনি, কি বললে?

উত্তর, কথা বললে না, শুধু হাসলে। সেই পেটেণ্ট হাসি।

অনেকক্ষণ পরে প্রশ্নকারীদের মনে হইল, চিন্ময় রেজোলিউশন-বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছে। তাহাকে ধমক দেওয়া হইল। ধমকে উগ্রতা ছিল না, তাই চিন্ময়ও উগ্র হইল না; নতুবা সে উগ্র হইত। সে অপমান সহিয়াছে, আঘাত সহিবার ক্ষমতা ছিল না।

ক্লাস বসিবার পূর্বে একটি তরুণী অভিমানভরে বলিয়া গেল, কথা রাখতে পারলেন না ত!

ক্লাস তখন ভাঙিয়া গেল, তখন সেই মেয়েটি আবার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে বলিল, ঐ ক'রেই ত ওঁর দেমাক আপনারা বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

লজ্জাড়ষ্ট মুখ তুলিবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিবার জন্য মুখ তুলিতে হইল এবং দেখা গেল যে, সরসী ছাড়া সব ক'টি তরুণীই তাহার পানে গম্ভীর মুখভাব ও সুগম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। জবাব দেওয়া হইল না।

প্রিন্সিপ্যালের বিদায়-সম্বর্ধনা। থার্ড ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহই বেশি। কার্যকরী সমিতি গঠনের পরই প্রস্তাব হইল, সরসীর নিকট হইতে চাঁদা লইয়া আত্মসম্মানের গণ্ডে পাদুকাঘাত করা হইবে না। পরের প্রস্তাবে, চিন্ময়কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল।

খাতা সকলের কাছে গেল। সরসীর কাছে গেল না। সরসী দেখিল, বুঝিল এবং একটু হাসিল। এই হাসিটা অধরে ফুটিল না, ঠোঁটে ফুটিয়া ঠোঁটেই মিলাইল।

চিন্ময় অতিরিক্ত একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া গোপনে সরসীর মোটর-চালকের হাতে দিয়া আসিল।

বিদায় সম্বর্ধনা সভা বসিয়াছে, বক্তৃতার দামোদরবন্যা ছুটিয়াছে, প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের প্রশংসার কুতুবমিনার আকাশ স্পর্শ করিতেছে, একটি লোক রৌপ্য-আধারে সজ্জিত স্বর্ণাঙ্কিতকলেবর পুস্তকরাশি আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া দিল। আধারের গায়ে একটি টিকিট ঝুলিতেছিল, হাজার দুগুণে দু'হাজার চোখের দৃষ্টি সেইদিকে ছুটিল। খুব ছোটো অক্ষরে ছোটো একটি নাম তাহাতে লেখা ছিল, সরসী দে, থার্ড ইয়ার ক্লাস, আর্টস্।

বিশ্বাসঘাতক কোনো সময়েই বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারে না। চিন্ময়

এক ফাঁকে সরসীকে বলিল, কত প্রেজেন্ট্‌ই তো এসেছিল, আপনার শেক্সপীয়ার সেট্‌ সকলের উপরে গেছে।

যে হাসিতে শব্দ নাই, বোধ হয় কোনো বিশেষ ভাবও প্রকাশ করে না এবং যাহার অর্থ হয় না, সেইরূপ একটুখানি হাসি সরসী হাসিল।

—নিজে এসে দিলে ডক্টর আলেকজেণ্ডার খুব খুশি হতেন কিন্তু।

আবার অর্থহীন সেই হাসি।

—আমি কিন্তু আশা করেছিলুম—

—থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি ইন্‌ভিটেশন।

পরীক্ষা হইয়া গেল। সরসী পাস করিল, ফোর্থ ইয়ারে উঠিল, কিন্তু কলেজে আসিল না।

মেয়েরা বলাবলি করিল, এক-আধটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস কেহ বা চাপিয়াও ফেলিল, কেহ অন্তরে খুশি হইল, বুঝিল, সরসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে বা বিবাহ আশু হইয়াছে।

চিন্ময় চিন্তিত হইল; অন্য ছেলেরা চিন্তিত হইল না বটে, তবে গবেষণা করিতে লাগিল।

চিন্ময় যত পান খাইত, তাহার অর্ধেক খাইত দোক্তা। কলেজের আফিস-ঘরে একজন কেরাণী খুব পান খাইতেন, হঠাৎ চিন্ময় তাঁহাকে মুঠা মুঠা পান উপহার দিতে লাগিল এবং অল্প দিনেই দোক্তাতেও পোক্ত করিয়া আনিল।

ইহার প্রয়োজন ছিল। সরসীর ঠিকানাটা কেহ জানিত না। সে কাহাকেও বলে নাই, প্রশ্ন করিয়াও নিরর্থক হাসি ছাড়া কোনো জবাব কেহ পায় নাই। তাহার মোটরগাড়িগুলির নম্বর দেখিয়া মোটর-ডাইরেক্টরী খুঁজিলে পাত্তা পাওয়া সম্ভব হইত বটে, কিন্তু কেন জাগে নাই তা জানি না, তবে তরুণদের মাথায় বুদ্ধিটা জাগে নাই।

চিন্ময় ঠিকানাটা পাইল। পাইল, কিন্তু কাহাকেও বলিল না।

গেটে দারোয়ান কহিল, দিদিবাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না। দারোয়ানগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোক, কথায় নড়চড় করিল না, এক দিনেও না, এক মাসেও না। মাসাধিককাল হাঁটাহাঁটি করিয়া চিন্ময় যাহা দেখিল, শুনিল এবং জানিল, তাহা এই :—

এই বাড়িতে কর্তা বা গৃহিণী নাই, অর্থাৎ দিদিবাবুই সর্বেসর্বা। বাড়িটি সুপ্রকাণ্ড, আধুনিক কালের রাজপ্রাসাদ বলা চলে। দিদিবাবুর বিবাহ হয় নাই, হইবেও না; কারণ তিনি বিবাহ করিবেন না। এই প্রাসাদাভ্যন্তরে কোনো পুরুষ মানুষের গতিবিধি নাই। বাড়ির মধ্যে চাকর-বাকর নাই, চাকরাণী ও বাকরাণী আছে, এবং অনেকগুলিই আছে। তিনখানি—বড়ো, মাঝারি ও ছোটো—মোটরগাড়ি আছে।

এই রহস্যাচ্ছাদিত বাড়িটার রহস্যভেদে অসমর্থ হইয়া চিন্ময় আবার কলেজ ও পাঠ্যপুস্তকাদিতে মনোনিবেশ করিয়াছে। যেদিন কলেজ থাকে না ও পাঠ্যপুস্তকে অরুচি হয়, সেদিন এবং যে-রাত্রে ঘুম হয় না এবং গরম বোধ হয় সে-রাত্রে চিন্তা করে। সকালে উঠিয়া গরম গরম সিঙাড়া ও চা খায় এবং খবরের কাগজের ওয়ান্টেড্ পাঠ করে। কোন্ চাকরিটা তাহাকে দিলে যোগ্যতার সহিত করিতে পারে, তাহারও বিচার-বিতর্ক করে। একদিন ওয়ান্টেডের পার্শ্বে দেখিল, সরসী দে নাম্নী এক ভদ্রমহিলা একখানি মোটরলঞ্চ কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ-সহ সাক্ষাৎ করিতে বলা হইয়াছে। ঠিকানা, সেই বটে!

চিন্ময় পাঠ্যপুস্তকগুলাকে ঠেলিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দারোয়ান এবার ফটক পার হইতে দিল এবং একটি সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল।

একটু পরে সরসী ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

চিন্ময় চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে বসিতে বলিল। চিন্ময় বসিলে, বলিল, কই, কি পারটিকিউলার্স এনেছেন দেখি?

চিন্ময় বলিল, কিসের পার্টিকিউলার্স?

—মোটর লঞ্চের।

—ওঃ সেটা আনা হয় নি।

—তবে?

—আপনাকে দেখতে এলুম। আপনি কলেজ ছেড়ে দিলেন?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—ভালো লাগল না।

—আমিও ছেড়ে দোব।

—কেন ?

—ভালো লাগছে না। আপনার পাষ্ট টেন্স, আর আমার প্রেজেণ্ট পারফেক্ট। আসলে আমরা এক।

সরসী বসিতে উদ্যত হইয়াছিল, চেয়ার ঠেলিয়া দিল।

চিন্ময় বলিল, আমি বলছি কি, আমরা এক মত পোষণ করি।

সরসী প্রস্থানোদ্যত হইয়া, হাত তুলিয়া নমস্কার করিতে যাইতেছিল, চিন্ময় বলিল, কাল কি সব পার্টিকিউলারস্ নিয়ে আসব ?

—থ্যাঙ্কস্, আনবেন। নমস্কার।—সরসী পর্দা ঠেলিয়া চলিয়া গেল।

সমস্ত দুপুর ঘুরিয়া মোটর-লঞ্চের সন্ধান ও বিস্তারিত বিবরণ লইয়া চিন্ময় বাসায় ফিরিল। বাসাটা মেসের, কেহ কৈফিয়ৎ চায় না। মাসিক খরচ বাকি না পড়িলে ও অসুখে শয্যাশ্রয় না করিলে কে কা'র খোঁজ করে ?

অনেকগুলি মোটর-লঞ্চের অনেকগুলি ছবি, মূল্যের তালিকা, কলকব্জার বিবরণ, এক-কথায় যাহাকে ফুল পার্টিকিউলার্স বলে, তাহা লইয়া চিন্ময় সরসীর সম্মুখীন হইল।

কাগজপত্রগুলা দেখিয়া সরসী কহিল, আপনি বিজ্ঞাপনটা বুঝতে পারেন নি ব'লে মনে হচ্ছে।

—ইংরেজিতে লেখা বিজ্ঞাপন, বুঝতে পারব না এ রকম মন হওয়াটা কি ঠিক ?

—ইংরেজি ভুলেও যেতে পারেন ত!—সরসী মুখ নীচু করিয়া একটু হাসিল, বলিল, নতুন লঞ্চ ত আমি কিনতে চাই নি।

চিন্ময় হাসিয়া বলিল, ওঃ, এই কথা। সেটা আমার সংস্কার। মহিলারা, অন্ততঃ আমাদের দেশের মেয়েরা, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিস ব্যবহার করেন না এই হচ্ছে আমার সংস্কার।

—কেন, তা'তে দোষ কি ? সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কি ভালো জিনিস পাওয়া যায় না ?

—হয়ত যায়, নয়ত যায় না; কিন্তু কথা তা নয়। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ডে তাঁদের অরুচি, এই আমি দেখে এসেছি। দোজবরে বর যতই ভালো হোক, মেয়েরা বিয়ে করতে চায় কি ?

সরসী মুখটা ফিরাইয়া হাস্যগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

চিন্ময় কহিল, আপনি রাজি থাকলে সেকেণ্ড, থার্ড, ফোর্থ, মেনি হ্যাণ্ড দেখাতে পারি।—সেও মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল।

সরসী অন্যমনস্কের মতো কাগজপত্রগুলা পুনরায় টানিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, কত দাম পড়বে বলছেন ?

চিন্ময় অঙ্ক দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐ যে! আটাশ হাজার টাকা।

—বড্ড বেশি।

চিন্ময় বলিল, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড নিলে অনেক কমে হয় কিন্তু।

সরসী সে কথাটা যেন শুনে নাই, কহিল, নূতন অথচ কিছু সস্তা ক'রে দেয় না ?

চিন্ময় ঢোক গিলিয়া কহিল, দেয় ; কিন্তু গরিবের কমিশনটা মারা যায়। তা আপনি যদি বলেন—

—আমি এমন অন্যায়ই বা বলব কেন! আপনি এত কষ্ট করছেন—

—কষ্ট! কষ্টটা কি করলুম!

—এই আনাগোনা—

—সে ত দু-মাস ধরে করেছি, আপনার দারোয়ানদের জিজ্ঞেস করুন না।

—দু-মাস ধরে ? মোটর-লঞ্চের বিজ্ঞাপন ত এই চার দিন হ'ল বেরিয়েছে।

—তা ঠিক।

—তবে ? আপনি দু-মাস—

—সে আমার অন্য দরকার ছিল।

—কি দরকার ?

—বলতেই হবে ?

—না বলবেন কেন ?

—না বলবার কোনো কারণ নেই। অভয় দিলেই বলতে পারি।

সরসী অভয়বাণী উচ্চারণ করিল না। তাহার নীরবতাকে অভয় মনে করিয়া চিন্ময় কহিল, হঠাৎ কলেজ ছেড়ে দিলেন। কলেজে যেতেন, আর কিছু না হোক, চোখের দেখাও ত দেখতে পেতুম—

সরসী বাধা দিয়া বলিল, তিন নম্বরের মডেলটা আমার পছন্দ। দামটা একটু বেশি বটে—

চিন্ময় কহিল, ঐ মডেলেরই সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড একখানি লক্ষ আছে—

—তা বেশি হ'ক, আমি ঐটেই নোব।

—তা আমি জানি। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড আপনাদের জন্যে নয়। নেহাৎ যাদের জোটে না, এই যেমন, যারা মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বর তারাই খোঁজে।

—কবে ডেলিভারি পাওয়া যাবে ?

—যবে চাইবেন।

—যত শীঘ্র হয়।

—বেশ, তাই হবে।

—আপনাদের লোক এসে ট্রায়াল দিয়ে যাবে ত ?

—নইলে দাম দেবেন কেন ?

—সই টই করতে হবে ?

—করলে ভালো হয়।

দিন-আষ্টেক পরের কথা। চিন্ময় আসিয়া বসিয়া আছে। সরসীর দাসী খবর দিয়াছে, মেম-সাব স্নান করিতেছেন। সুতরাং অপেক্ষা করিতেই হইবে। ইত্যবসরে চা, চুরুট আসিয়াছে, চিন্ময় চা খাইয়া ফেলিয়া অন্য বস্তুটির ঘন ঘন সদ্ব্যবহার করিতেছে।

গুড্ মর্ণিং, এই নিন্ চেক্।—সরসী চেক্ হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল।

চিন্ময় চেক্ লইতে ভুলিয়া গেল। স্নানের পর মেয়েদের বড়ো ভালো দেখায়—অবশ্য স্নানের অঙ্গ হিসাবে স্নানের পরে যে মেয়েরা প্রসাধন করিতে জানে।

সরসী বলিল, আপনার কমিশন পেয়েছেন ?

চিন্ময় কহিল, চেক জমা দিলে পাব।

—কত পাবেন ?

—দশ পারসেণ্ট, তা শ-আড়াই টাকা হবে। বারো পারসেণ্টের চেষ্টা করব।

—মন্দ কি !

চিন্ময় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, মন্দ আবার! আপনি যদি মাঝে মাঝে এমনই সব জিনিস কেনেন, দরখাস্ত বগলে ক'রে আপিস আদালত চষে বেড়াতে হয় না।

—আপনার কাছে আর কিছু কিনতে ইচ্ছে নেই।

—আমার অপরাধ?

—"কালবোশেখী" দেখেছেন?

—অনেক। ছেলেবেলায় পাড়াগাঁয়ে থাকতাম, কালবোশেখী দেখি নি আবার!

—সে কালবোশেখী নয়, ঐ নামের কাগজ!

—কাগজ? না, দেখি নি। নেটিভ্ কাগজ আমি পড়ি নে।

—যা-তা লিখেছে?

চিন্ময় চটিয়া লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, কি লিখেছে? আমি চুরি করেছি? দাম বেশি নিয়েছি? তা আর বলতে হয় না। মার্শাল কোম্পানী, ইউরোপীয়ান ফার্ম, তারা ছেঁচড়ামি করে না। দাঁড়ান-না আপনি, ঐ সব যদি লিখে থাকে, মার্শাল কোম্পানী কালই দশ লাখ টাকার ড্যামেজ চেয়ে হাইকোর্টে মামলা রুজু করবে, বাছাধনরা তখন মজা বুঝবেন। ভালোই হ'ল, আপনি বলেছেন, আমি যাবার সময় এ্যাস্প্ল্যানেডের মোড় থেকে একখানা, কি নামটা বললেন, কালবোশেখী না?—কালবোশেখী নিয়ে যাচ্ছি, আজই লায়ন সাহেবকে ট্র্যান্স্লেট্ ক'রে দেব। কালই দেখবেন, কেস্ ফাইল হয়ে গেছে।—ইউরোপীয়ান ফার্ম, ওরা বাপকেও রেয়াদ করে না। অন্ততঃ খুব কম হ'লেও দশ লাখ।

—না, না, সে সব লেখেনি।

—তবে? তবে কি লিখতে পারে? খারাপ লঞ্চ, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ডকে নিউ ব'লে বেচা হয়েছে, সে ত একই কথা! সেম্ ড্যামেজ!

—না, না, তাও নয়। তারা কোম্পানীর বিরুদ্ধে কিছু লেখেনি।

—আমার বিরুদ্ধে? কি লিখেছে শুনি? আমি জোচ্চুরি করিছি। বেশি কমিশনের লোভে—

—তাও না।

—তবে?

—আপনাকে কাগজটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি পড়ে দেখুন। সরসী চলিয়া গেল, যাইবার সময় তাহার পাতলা ঠোঁটে হাল্কা একটু হাসি ঝিলিক মারিয়াছিল।

কাগজ আসিল, পড়া হইল, রাগে চিন্ময়ের মাথামুড় খুঁড়িতে ইচ্ছা হইল না বরং সে যেন লেখাটা উপভোগ করিল। অনেকবার খবর পাঠাইতে সরসী আসিলে, চিন্ময় বলিল, এই! আমি ভেবেছিলুম না-জানি কি গালাগাল মন্দ করলে!

—এ ত গালাগালেরও বেশি।

চিন্ময় অবাক হইয়া কহিল, গালাগালির বেশি! কি বলছেন আপনি!

—সে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারব না।

—তা সত্যি! আপনারই লজ্জা হচ্ছে।—বলিয়া চিন্ময় লজ্জায় জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সবিনয় নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে মার্শাল কোম্পানীর এক চিঠি চিন্ময়ের কাছে গেল, তাহাতে লেখা, যে-মহিলাটি মোটর-লঞ্চ কিনিয়াছেন তিনি সেলিং এজেন্টকে ডাকিয়াছেন। কোম্পানী লিখিয়াছে—কোম্পানীর পণ্য বহুবিধ। আর কিছু অর্ডার আনিলে এজেন্টকে শতকরা কুড়ি পারসেন্ট কমিশন দিলেও কোম্পানীর আনন্দের সীমা থাকিবে না।

চিন্ময় গেল এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, আমাকে সোজা চিঠি লিখলে আমি ধন্য হতুম।

—আপনার ঠিকানা কোথা পাব? আপনি ত ঠিকানা রেখে যান নি।

—সেটা আমার দোষ বটে। কিন্তু ঠিকানা দিই কোন্ সাহসে বলুন, আপনার দরোয়ানরা আমায় বুঝিয়েছিল, পুরুষ মানুষের লেখা বইও আপনি বাড়িতে ঢুকতে দেন না।

—না, না, ওসব বাজে কথা।

—আর একখানা লঞ্চ কিনবেন? থার্ড হ্যাণ্ড, অর্থাৎ তেজবরে বটে কিন্তু ইন্ একসেলেন্ট্ কণ্ডিসান্।

—তার জন্যে ডাকি নি।

চিন্ময় দুঃখিত ভাবে বলিল, আমি ভাবলুম, গরিবের ভাগ্যে আবার কিছু কমিশন প্রাপ্তিযোগ আছে।

—কালবোশেখী বড়ো জ্বালাচ্ছে।

—আবার লিখেছে?

—হ্যাঁ।

—তাদের নামে কেস্ ক'রে দিন।

—করতে হলে আপনাকে করতে হয়।

—আমার গ্রাউণ্ড কি ?

—সে আপনি জানেন।

—উহুঁ আমি ভেবে দেখেছি, আমার কোনো গ্রাউণ্ড নেই, কেননা যা লিখেছে, তা সত্যি হ'লে আমি বেঁচে যাই।

—তার মানে ?

আপনার সঙ্গে আমার—আপনি আমাকে—যদি আপনি—ঠিক বলতে পাচ্ছিনে বটে, কিন্তু আপনি বুঝতে পাচ্ছেন ত, আমি যা বলতে চাইছি।

—আমি বিয়ে করব না, তা জানেন ?

—শুনিছি।

—কার কাছে ?

—আপনার দরোয়ানদের কাছে।

—তাদের সঙ্গে আপনার খুব ভাব বুঝি !

—গরজে গয়লা চেলা বয় ! আপনার দরোয়ান, তাই তারা আমার প্রিয়।

—দেখুন, আমি বিয়ে করব না, ঠিক।—আমাদের একটা কি দোষ ছিল, তাই আমি আর আমার বাবা সমাজ-টমাজ ছেড়ে, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বরাবর একলা থাকি। বাবা মারা গেলেন, তবুও একলা রইলুম এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাই থাকব। বিয়ে আমি করব না। অধীনতা স্বীকার—

—ঠিক বলেছেন, বঙ্কিমবাবুর কবিতাতেও আছে—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায় ?

—ওটা বঙ্কিমবাবুর কবিতা নয়, হেমবাবুর কিংবা রঙ্গলালের। ঠিক মনে নেই।

—ও একই কথা, কবিতা কবিতা, বঙ্কিমবাবুরও যা রবিবাবুরও তাই, হেমবাবুরও তাই, রঙ্গলালেরও তাই। হ্যাঁ যা বলছিলুম, আজকাল মেয়েরাও চান্ না স্বামীর অধীন হ'তে, পুরুষরাও চায় না, হেন্‌পেকড্ হতে। পুরুষরা

ঐ কথাটাকে ডিক্স্‌নারি থেকে তুলে দেবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে, তা বোধ হয় জানেন। এখন ইকোয়াল ষ্ট্যাটাস্‌। বিয়ে হ'লেও উভয় পক্ষ থেকে সেটা মেনটেন্‌ করা যায়।

—কি ক'রে ?

—বলছি। আপনার দাসীকে একটু চা দিতে বলবেন? থ্যাঙ্কস্‌। ধরুন, সমাজ বলছে বিয়ে কর—বেশ করলুম। কাল বলছে, কেউ কারও বশ্যতা স্বীকার ক'রো না। বেশ, আলাদা থাকলুম। তবে যদি বলেন, বিয়ে করা তা হ'লে কেন ? তার উত্তরে আমি বলব, সংস্কার একটা চলে আসছে, মাত্র সেইটের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ।

—সংস্কার ত অন্য অনেক কথাও বলে।

—কি ? ঘর-সংসার করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। বলুক, সব মানা যায় না। যেমন দেখুন, আপনাদের শাস্তর বলে আট-ন-বছরে মেয়েদের গৌরীদান কর। কে তা মানে বলুন ? নীতিকথায় আছে, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। পরের জিনিস ঢিল পাটকেল মনে ক'রে ফেলে দিন বা পকেটে পুরে ফেলুন দেখি, তখনই হাতে হাতকড়ি।

—আপনি ওরকম বিয়ে করতে পারেন ?

—বাই জোভ্‌! ওরকম পাইনি বলেই এতদিন করি নি। যেদিন পাব, সেইদিনই মালা-বদল।

—তারপর ?

—তারপর আমি কলেজ যাব—না, কলেজ আর যাব না, এজেন্সি করব, আর তিনি তাঁর যা ইচ্ছে, করুন, আই কেয়ার এ ফিগ্‌। আসল কথা কি জানেন ? আমি যদি বেবাক্‌ বিয়ে না করি, লোকের কাছে গুণে' হাজার-লক্ষ কোটি কৈফিয়ৎ দিতে হবে, আর হাজার জন হাজার রকম ভাববে, বলবে, চাই কি কাগজেও লিখবে। আর, বিয়ে ক'রে যদি বাস না করি, লক্ষ কোটি লোকেরও লক্ষ কোটি রকম ভাববার উপায় নেই। পরের জন্য মাথা না ঘামিয়ে যারা কিছুতেই থাকতে পারে না, তা'দেরও ভাবতে হ'লে একটি কথাই ভাবতে হ'বে যে, এদের বনিবনাও হয় না, তাই আলাদা থাকে। তা ছাড়া ভাববার আর কিছুই কেউ পাবে না। ওঃ, বড্ড চিনি দিয়ে ফেলেছে চা'টায়। আপনি বুঝি একটু বেশি চিনি খান্‌! না, না, বদলাতে হবে না।

কি আর হয়েছে এতে, আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! কখনো কখনো চা'য়ে আমি বেশি চিনি খেয়ে থাকি।

—যাক্, দেখা গেল যে বাংলা দেশে এমন একজন লোক অন্ততঃ আছেন, যিনি ট্র্যাডিসান ভাংবার জন্যে প্রস্তুত।

—হাঁ, আমি সেই কালাপাহাড়ই বটে!

সরসী হঠাৎ বাহিরে রৌদ্রালোকিত বাগানের পানে চাহিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, ওঃ অনেক বেলা হয়ে গেল দেখছি।

—হাঁ। আচ্ছা, নমস্কার। যদি কিছু দরকার হয় খবর দেবেন, এই আমার ঠিকানা। নমস্কার।

কালবোশেখীর ঝড় বড়ো ভয় দেখায়।

পরের সপ্তাহে চিন্ময় চিঠি পাইল, একবার আসিবেন।

আসিল।

সরসী বলিল, আপনার জন্যে একটি কনে ঠিক করেছি। কণ্ডিসনাল ম্যারেজ। আপনার মত বদলায়নি ত?

—না। আমার গায়ের রং আর মত, দুইই অপরিবর্তনীয়।

—বিয়ের পরেই আপনি কনেকে ছেড়ে চ'লে যাবেন ত?

—পরদিন কালরাত্রি, সে দিনটা যাব না, ফুলশয্যার পরদিন যাব, আর আসব না।

—তা হ'লেই হবে।

—ক'নে কোথায়?

—আছে, তার জন্যে ব্যস্ত কেন? কত টাকা চাই বলুন দেখি?

—শ খানেক হলেই হ'বে। একটা সিল্কের কাপড়, সিল্কের জামা ও চাদর আর দু-চার ছড়া মালা বা গোড়ে।

—অত কমে রাজি হবেন না। আমি বলছি মেয়েটির কিছু টাকাকড়ি আছে।

—আমার সেটার অভাব। কিন্তু টাকার জন্যে বিয়ে করা আমি কাপুরুষের কাজ ব'লে মনে করি।

—ডাওরী—

—আমি ষ্টুডেন্টস্ এ্যান্টি-ডাওরী লীগের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট।

—তবেই ত মুশ্‌কিলে ফেললেন।

—ঠিক মুশ্‌কিল।

—মেয়ের মত হচ্ছে, কিছু টাকাকড়ি না দিলে তার এক রাতের স্বামীর ওপর সুবিচার করা হবে না।

—ঐ ত নিচ্ছি এক-শ টাকা।

—বড্ড কম।

—আচ্ছা পাঁচ-শ। রাজি?

—আচ্ছা, তা এক রকম হ'তে পারে। মেয়েটির সম্বন্ধে কিছু জানতে চান? তাঁকে দেখতে চান?

—তাড়াতাড়ি কি! চারি চক্ষুর মিলন ত হবেই। আর জানবার বাকীই বা কি রইল?

—কি জানলেন? কিছুই ত বলিনি।

—যা বলেছেন তাই যথেষ্ট। মেয়েটি বিয়ে করতে রাজি, ঘর করতে অরাজি; আমিও বিয়ে করব, ঘর করব না, বেশ মিলেছে।

—মেয়ে এস্‌টাব্‌লিশ করতে চায় যে, স্ত্রীলোক হ'লেই যে জীবন-যাত্রায় পুরুষের গললগ্ন হ'তে হবে তার কোনো মানে নেই।

—একজ্যাক্টলি! পুরুষও দেখাতে চায় যে স্ত্রীলোক ছাড়াও জীবন যাপন করা যায়।

সরসী বলিল, শুনুন তা হ'লে সত্যি কথাটা বলি আপনাকে। পুরুষ জাতটার বড়ো দম্ভ, তাদের বাদ দিয়ে নারীর জীবনযাত্রা নাকি অচল! এ পর্যন্ত, দেখাও তাই গেছে বটে। আমি নতুন একটা এগ্‌জাম্পল সেট্ করতে চাই যে—না, তা নয়। ভগবান স্ত্রী ও পুরুষকে যেমন আলাদা ক'রে সৃষ্টি করেছেন, তারা আলাদা থাকতেও পারে। আমার কেউ নেই, আমি একা, কাজেই সমাজের ভয় দেখাবার বা জাতে ঠেলবার লোকও নেই। বাবার রেখে যাওয়া কিঞ্চিৎ আছে, তাই নেড়েচেড়ে বেশ থাকব। সেই জন্যেই কিছুদিন কলেজে পড়েছিলুম, ইংরেজি নভেল-টভেলগুলো বুঝতে পারি, ব্যাঙ্কের হিসাব কষতে পারি, সেইটুকুই আমার যথেষ্ট! কলেজে কারও সঙ্গে কথা কয়েছি কোনোদিন?

চিন্ময় বলিল, সেই ত করেছিলেন মুশ্‌কিল! কথা কইতেন না বলেই ত

কথা কইবার জন্যে সবাই ছটফট করত। দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের দিকেই লোক বেশি আকৃষ্ট হয়, তা জানেন ত! সে কথা যাক! আপনি যেমন আপনার কথা বললেন, আমিও তেমনি আমার কথাটা বলি। বিয়ে করবার ইচ্ছে আমারও নেই। দশ-পনের বছর আগে বিয়ে করার দরকার লোকের হ'ত; এখন সে দরকারই কমে গেছে। যে রকম স্ত্রী-স্বাধীনতার হাওয়া বইছে—

সরসী ছি ছি করিয়া উঠিল।

চিন্ময় বলিল, আমার কথাটা আগে শেষ করি, তারপর ছিছি করবেন, যা খুশি করবেন। আমি বলছি, আগেকার কালে মেয়েরা ছিলেন পুরুষদের কাছে রূপকথার রাজকন্যের মতো। তাঁদের মেঘবরণ চুল, আর কুঁচবরণ রঙের কথাই শোনা যেত, চোখে দেখা যেত না। তাই তাঁদের একটিকে পাবার জন্যে লোকের আগ্রহের সীমা থাকত না। এখন পথে ঘাটে ট্রামে বাসে দেখে দেখে অভিনবত্ব আর কিছু নেই। তাই আকর্ষণও কমে গিয়েছে। আপনি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন না, না? আর একটু খুলে বলি, তা হ'লে?

বলিয়া সে একটি সিগারেট ধরাইল; ধরাইয়া গোটা কতক টান্ মারিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিল, একটা দৃষ্টান্ত দিই, শুনুন। সেকালে নিয়ম ছিল, স্বামী-স্ত্রীতে দিনের বেলা দেখাই হ'ত না। গভীর রাত্রে দেখাশুনো হ'ত। সমস্ত দিন পরস্পরের মন পরস্পরের দিকে টানত, অহরহ দেখা না-হওয়ায় টানটা গভীর এবং আন্তরিক থাকত। রাত্রের মিলনটা সুখের হ'ত। এখন দিনে রাতে উঠ্তে বসতে খেতে শুতে এ ওর সঙ্গে লেপ্‌টে থাকেন, ফলে স্ত্রীর মধ্যে যে আকর্ষণের বস্তু, তা ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এরই ফলে পুরুষরা নারীর অভিনবত্ব ভুলে যাচ্ছে, তার খোঁজই পাচ্ছে না। তাই মেয়েরা হয়ে পড়েছে খেলার বস্তু, আর পুরুষরাও মেয়েদের কাছে সাধারণ ঘর-করণার জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইটেই আমার ভালো লাগে না। আর সেই জন্যেই আমি বিয়ে করব না ঠিক করেছি। কোনো কমনপ্লেস্ কাজ—যা সবাই করে, তা করতে আমার ভালো লাগে না। সে ত আপনি কলেজেও দেখেছেন, কোনো ছেলেই সাহস ক'রে আপনার সঙ্গে কথা কইতে আসতো না, আর আমি—

সরসী বলিল, অনেক বেলা হয়ে গেল। এক কাজ করুন, আপনি আমার এখানেই দুটি—

চিন্ময় ব্যস্ত হইয়া কহিল, না, না। সেটা বড্ড কমনপ্লেস্ কাজ! আমার ভালো লাগে না।

ফুলশয্যার রাত্রি। বর ও ক'নে 'পেসেন্স' খেলিয়া কাটাইয়া দিল। দু-একবার 'ডামি' রাখিয়া ব্রীজ খেলাও হইয়াছিল, রাত্রি প্রভাত হইল বলিয়া এ-খেলাটা জমিল না। চা আসিল ও খাওয়া হইয়া গেল।

চিন্ময় বলিল, তুমি আমার জীবনের আদর্শটাকে রূপ দিয়েছ, তোমায় কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব!

সরসী কহিল, কিছু না বল্‌লেই আমি ভালো বুঝতে পারব। আপনাকে না পেলে আমিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতুম।

দু-জনে একমত হইয়া বলিল, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা বুঝিবে যে জগতে স্ত্রী পুরুষের এবং পুরুষ স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল না হইলেও জগৎ অচল হয় না।

—আপনি এখন কোথায় যাবেন?

—মেসে।

—কি করবেন?

—স্নান করব, খাব, তার পর এপ্লিকেশন লিখে আপিসে আপিসে ঘুরব।

—শেষেরটা না করলে হয় না?

—দিনকতক নিশ্চয়ই হতে পাবে, পাঁচশ টাকার ব্যালেন্স কিছু আছে।

—মাঝে মাঝে আসবেন?

—তা—

—সকালের দিকে আসবেন।

—না-হয় দুপুরের দিকে।

—সকালটাই ভালো।

—বেশ।

আট দিন পরে। বেলা সাতটা। সরসী বিছানায় আড়মোড়া ভাঙিতেছিল। দাসী চিন্ময়ের আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিল। সেইখানেই ডাক পড়িল।

—খবর ভালো ?

—হ্যাঁ, কাল রাত্রে ঘুম হয় নি। আজ সেই জন্য এখনও বিছানায় পড়ে আছি।

—ঘুমের অত্যন্ত অন্যায় না হওয়া। তা হ'ল না কেন ?

—কে জানে! রাজ্যের স্বপ্ন সারারাত জ্বালাতন করেছে। চা খাবেন ?

হাতঘড়িটা দেখিয়া চিন্ময় বলিল, হুকুম কর, চোঁ ক'রে এক চুমুকে টেনে নিই। আটটায় স্নান করি, সাড়ে আটটায় নাকে মুখে গুঁজে ছুটতে হয়।

—কোথায় ?

—আপিসে।

—চাকরি হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—কত টাকা মাইনে ?

—ত্রিশ।

কথা বহুক্ষণ নিস্তব্ধ।

—কি করতে হয় ?

—রেকর্ড-কীপার। বাংলা বা ফার্সী ভাষায় দফ্‌তরী।

ঘরে সূচিপতনের শব্দও শুনা যায়।

—ঐ যা, আটটা বেজে গেল, উঠলুম।

—একটু বসুন।

—সাহেবটা বড়ো পাজি, ট্যাঁস কি না।

—চাকরি ছেড়ে দিন।

—হাতের লক্ষ্মী।

—আমি দু-শ টাকা করে দোব।

—স্ত্রীদত্ত অর্থ নোব না, প্রতিজ্ঞা। চল্‌লুম। সরসী একটু বিমর্ষ।

—আবার কবে আসবেন ?

—দেখি। তুমি আর খানিক ঘুমাবে বোধ হয়।

—না উঠি। শীঘ্র একদিন আসবেন।

—আচ্ছা।

—আজ ত রবিবার। আজ এত ওঠবার তাড়া কেন ?

—আমার আবার রবিবার! পেয়াদার যেমন শ্বশুরবাড়ি! গেরণের দিন, মেসে হাঁড়ি ফেলছিল, রান্না হয় নি ব'লে একটু দেরিতে গেছলুম, টেঁশ্শু সাহেবটা দু-দিনের মাইনে ফাইন করলে। আবার গাল দিতে এসেছিল, আমি বললাম, মাইনে যত খুশি কাটো, নো গালাগাল। বেটা চটে আছে, কোন্ দিন হয় ত বলে বসবে, ইওর সার্ভিস নো লংগার রিকোয়ার্ড।

—ও চাকরি ছেড়ে দিলেই ত হয়।

—আর একটা না পেলে—

—বিদেশে, জমিদারী এষ্টেটে কাজ করবেন ?

—কি কাজ ?

—ম্যানেজারী! রুক্মিণীব কাছে আমার একটি জমিদারী আছে, ম্যানেজার মারা গেছে, লোক নিতে হ'বে।

—কত মাইনে ?

সরসী হাসিল। বলিল, কত হ'লে আপনার চলে ? দু-শ টাকা।

চিন্ময় গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, আগের ম্যানেজার কত পেত ?

—তিন-শ। গ্রেড্ হচ্ছে দু-শ থেকে তিন-শ। ভয় নেই, আপনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কিছু করছি নে।

—তা না করলেই আমি খুশি হব। কবে যেতে হবে ?

—কালই যেতে পাবেন। আমি নায়েবকে চিঠি পাঠিয়ে দিই। আপনাকে লেটার অফ্ এ্যাপয়ন্ট্মেন্ট্ দিতে হবে কি ?

—হ্যাঁ, তা দিতে হবে বই কি।

—বেশ ; কাল সকালেই—আচ্ছা, আমি আপনার মেসে যেতে পারি ?

—পার ; কিন্তু কেন ?

—চিঠিটা দিয়ে আসব। আপত্তি নেই ত ?

—না।

—এই ঘরে মানুষ থাকে ?

—একুশ টাকা আট আনা মাইনে যে পায়, সে থাকতে পারে।

—কিন্তু আমার ত একটা—

চিন্ময় হাসিয়া বলিল, এর ভেতর তুমি কে ?

সরসী সে কথার উত্তর না দিয়া, হাত-ব্যাগ হইতে লেটার অফ্ এ্যাপয়েণ্ট্মেণ্ট বাহির করিয়া চিন্ময়ের হাতে দিল।

—থ্যাঙ্কস্।

—পৌঁছে চিঠি দেবেন ত?

—ম্যানেজার দেবে, না-হয় নায়েব ত দেবেই।

সরসী একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহির হইয়া গিয়া মোটরে উঠিল।

মেসের অনেকে জিজ্ঞাসা করিল, কে গো?

চিন্ময় দুর্ভেদ্য রহস্যাচ্ছন্ন হাসি হাসিয়া, যে যাহা ভাবিতে চায়, তাহারই সুযোগ দিয়া দিল।

নায়েবের চিঠিখানি দরকারী ও পড়িবার মতো। সবটায় আমাদের দরকার নাই; কতকটা এই :—

পৌষ কিস্তিতে আমাদের আদায় হয় চার হাজার টাকার উপর। নতুন ম্যানেজারের দয়া দাক্ষিণ্যের চোটে এ-বছর চার-শত টাকাও আদায় হয় নাই। যে কাঁদুনি গায়, সেই রেহাই পায়। এমন করিলে জমিদারী রাখা যায় না। নতুন ম্যানেজারকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া মহালশাসনের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না, বিষয়-আসয় নিলামে চড়িবে।

নায়েব যে জবাব পাইল, তাহা এই :—

আমি শীঘ্রই মহাঁল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি।

নায়েবের বড়ো আনন্দ। অনেক দিন, প্রায় ছয় মাস নিরানন্দের পর আনন্দের সূচনা। ভরা শ্রাবণের শেষাশেষি কড়া রৌদ্র।

ম্যানেজার গেল না, নায়েব প্রভুকে ষ্টেশনে রিসিভ্ করিতে গিয়া ম্যানেজারের বিরুদ্ধে দশখান করিয়া লাগাইল। প্রজারা কুকুরজাতীয় জীব, আস্কারা পাইলে মাথায় উঠিতে অভ্যস্ত। ম্যানেজার মহালের সর্বনাশ করিয়াছে। পৌষ কিস্তির এখনও আট দিন সময় আছে—উহাকে আজই ডিস্মিস্ করিলে, নায়েব কিস্তির পূরা টাকা আদায় করিয়া দিবার ভরসা দিল। ডিস্মিস্ করিতে বিলম্ব করিলে আদায়ের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ম্যানেজারের তলব পড়িল। নায়েব পায়ে রবার-সোল জুতা পরিয়া ডিঙি মারিতে মারিতে পাশের ঘরের আলমারির পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

'জমিদার' বলিল, আপনি আমার জমিদারীর সর্বনাশ করেছেন। চার-শ টাকা আদায় হয়নি, চার হাজার টাকা রেভেনিউ।

—তিন বৎসর অজন্মা, প্রজারা খেতেই পাচ্ছে না, তা টাকা দেবে কোথা থেকে?

—জমিদারের খাজনা চলে কি ক'রে?

—জমিদারের রিজার্ভ ফণ্ড থাকা উচিত। যারা রিজার্ভ রাখে না, সব নিজেদের বিলাসে খরচ করে, তাদের জমিদারী না থাকাই সঙ্গত। প্রজার রক্ত শোষণ করবার জন্যে রাজা নয়, প্রজানুরঞ্জনের জন্য রাজা। তোমার খাজনা আদায় হয়নি বটে, কিন্তু তোমার প্রজারা তোমাকে দয়াময়ী রাণী বলে আশীর্বাদ করছে।

'তোমার' শব্দটা আলমারির পার্শ্বে লুক্কায়িত নায়েবের গায়ে জ্বালা ধরাইয়া দিল। সে জমিদার হইলে এই স্পর্ধার উচিত সাজা দিত।

—আপনার দ্বারা জমিদারী শাসন চলবে না।

—প্রজাদের মারতে হ'বে?

—আমার নায়েব টাকা আদায় ক'রে দেবে।

—প্রজাবিদ্রোহ হবে। খেতে না পেয়ে তারা শুকনো খড় হয়ে আছে, অত্যাচারের স্ফুলিঙ্গ পড়লেই জ্বলে উঠবে।

—আমার কলিয়ারীর ম্যানেজারীর পোষ্ট খালি হয়েছে, আপনাকে সেখানে যেতে হবে।

পাশের ঘরে নায়েব নৃত্য করিল। জুতার হিল রবারের, তাই নিঃশব্দ।

বাহিরে অনেক লোক জমায়েত হইয়া বড়ো গণ্ডগোল করিতেছিল। ম্যানেজার মুখ বাড়াইয়া জনতা দেখিয়া লইয়া বলিল, তোমার হাজার হাজার প্রজা তোমাকে দেখতে আর প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করতে এসেছে।

সরসী দৃশ্যটা দেখিয়া আসিল। বসিয়া বলিল, কিন্তু আপনার এখানে থাকা হবে না।

—আমার অপরাধ? তুমি ওদের দেখ, ওদের চেহারা, কাপড়-চোপড় দেখ, ওদের কথা শোন। তার পর—

দেখি বলিয়া সরসী বারান্দায় বাহির হইল। সেখানে যে কোলাহল উত্থিত হইল, তাহা প্রচণ্ড ও ভীষণ, কিন্তু তাহার ভিতরে অসীম মাধুর্য ছিল। প্রজাদের মোদ্দা কথা এই যে, রাণীমার দয়ায় তাহারা বাঁচিয়া আছে; নতুবা তাহারা বাচ্চা-কাচ্চা লইয়া প্রাণে মারা পড়িত। দলের মধ্যে যাহারা বর্ষীয়ান্ তাহাদের আশীর্ব্বাদ শুনিতে শুনিতে সরসীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

ঘরে আসিয়া বসিতে ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল, কি গো! আমি অন্যায় করেছি ব'লে মনে হচ্ছে আর? আমায় ট্রান্সফার করবে?

সরসী হাসিয়া বলিল, সে কথা পরে হবে। এসে পর্যন্ত একখানা চিঠিও ত লেখ নি।

—কেন, রিপোর্ট সব পাঠিয়েছি ত।

—রিপোর্ট আর চিঠি কি এক?

প্রজারা রাণীমার জয়ধ্বনিতে আকাশ, বাতাস, প্রান্তর মুখরিত করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। অল্পবয়সের নারীর কর্ণে তাহা মধুবর্ষণ করিতে লাগিল।

সরসী বলিল, অন্য সময় কথা হবে।

—বেশ; কখন আসব? কাল সকালে?

—কেন? আজ রাত্রে?

চিন্ময় বলিল, রাত্রে! উঁহু! সকালেই ভালো।

সরসী অভিমানভরে কহিল, কিসের ভালো! রাত্রে এস!

—রাত্রে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাত্রে! কতবার বলব আর?

—কিন্তু কন্‌ট্রাক্ট্ ছিল কি?

—আমি কন্‌ট্রাক্‌টার নই, অত খবর জানি নে।

—আমি জানিয়ে দিচ্ছি। কন্‌ট্রাক্ট ছিল যে, তুমি এবং আমি চিরদিন পৃথক এবং একা একা থাকব।

—সে কন্‌ট্রাক্ট কে ভাঙছে?

—আর কন্‌ট্রাক্ট ছিল আমরা সকাল ছাড়া অন্য সময়ে মিট্ করব না।

—কিন্তু তখন চাকরি করতে না। এখন যখন আমার এষ্টেটে চাকরি করা হচ্ছে, যখন আসতে বলব, তখন আসতে হবে। যা কঁরতে বলব—

—তা ত আমি করি নে দেখেছ। তুমি প্রজা ঠেঙাতে বলেছ, আমি তাদের মাফ্ করিছি।

—খুব করেছ, আমার ব্যাঙ্কের টাকা ভেঙে রেভেনিউ দিতে হবে। সে যাক্, রাত্রে আসছ ত ?

—হুকুম লঙ্ঘন করব কেমন করে, যতক্ষণ চাকরি আছে।

—এইখানে খাবে।

—এও কি চাকরির অঙ্গ ?

—হ্যাঁ।

—তার পর ?

—সরসী উঠিয়া আসিয়া চিন্ময়ের কাঁধের উপর একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, দেখ যে এগজাম্পল সেট্ করব ভেবেছিলুম, তা করা বড়ো শক্ত। তুমি কি বলো ?

—আমারও ঐ মত। এগ্‌জাম্পল ভালো, তবে সেট্ করা শক্ত। লাফিয়ে সাগর লঙ্ঘন করা বীরত্বের কাজ, সেকালে হয়ত সম্ভব ছিল, কিন্তু একালে কেউ পারে না।

প্রবাসী : চৈত্র, ১৩৪২

প থ বা সি নী

শান্তা দেবী

বর্ষার দিনে হঠাৎ জ্বরে পড়িলাম। সারাদিন বিছানায় একটানা শুইয়া থাকিতে হয়। দক্ষিণ দিকের জানালাটা দিয়া বাহিরের পৃথিবীর হরিৎরূপ অনেকখানি চোখে পড়ে তাই রক্ষা, না হইলে সারাদিন কড়িকাঠ গোনা ছাড়া উপায় ছিল না।

বালিশে মাথা দিয়াই দেখিতে পাই ঘনমেঘভারানত আকাশের নিচে বর্ষাস্নাত তাল ও নারিকেল গাছের কণ্টকিত মাথাগুলি হাওয়ায় কেবলই দুলিতেছে। পথের ধারের সারি সারি কৃষ্ণচূড়ায় বসন্তে যে অগ্নিবরণ আবীর ছড়াইয়াছিল আজ তাহা বর্ষার স্নানে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, গাছগুলির পত্রবহুল শ্যামশ্রীর স্নিগ্ধতা চোখ জুড়াইয়া দিতেছে। পাড়াটা নূতন, কাজেই জনাকীর্ণ ঘরবাড়ির চেঁয়ে পোড়ো জমিই এখানে বেশি। মাথাটা তুলিয়া মাঝে মাঝে দেখিতাম, পোড়ো জমির চুণ সুরকী, আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা সবই নব তৃণদলের স্বর্ণাভ সবুজ আস্তরণে ঢাকা পড়িয়া যেন কয়দিনে হঠাৎ নন্দন-কানন হইয়া উঠিয়াছে। এখানে-ওখানে ঘন কচুবন, মসৃণ কচুপাতার উপর বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা নিটোল মুক্তার মতো টল্‌টল করে। একটু হাওয়ার দোলায় ভাঙিয়া বীঁজ মুক্তার মতো গড়াইয়া পড়িয়া যায় দেখিয়া মনে হইত কবিরা পদ্মপত্রের জল দেখিয়া এত কবিতা লিখিলেন, কিন্তু ঘরের পাশে ছাই গাদার উপর কচুর পাতায় পাতায় এমন শত শত মুক্তারত্ন কাহারও চোগে পড়িল না কেন ?

ঘরে একলা শুইয়া শুইয়া পথের ধারের মানুষগুলার সঙ্গেও পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। সকাল হইলেই টাকপড়া বুড়ো রহমান তার নাতিটিকে কোলে করিয়া ফুটপাথে টাটকা মাছের খোজ করিতে আসে। তখন ভালো মাছের ঝাঁকাটা দেখিয়া পড়শীরা সব কিনিয়া লইবে এই ভয়। যতই কেন-না সে পুরনো খরিদ্‌দার হউক মেছুনিরা তাহার জন্য এক পোয়া ভালো মাছ কখনই আলাদা করিয়া সরাঁইয়া রাখিবে না।

দুপুরে গাছতলায় সেই আমাদের সুকৃষ্ণবরণা ভীমকায়া ফেরিওয়ালী রক্ত-বস্ত্র পরিয়া আমের ঝোড়া লইয়া বিশ্রাম করিতে বসিত। সকালে যা বিক্রি হইয়াছে তাহার পর আর খুব বিক্রির আশা নাই ; এদিকে পেটের ক্ষুধার আগুন জ্বলিয়াছে। কাজেই ঝুড়ির যতগুলা সম্ভব আম সে একলাই খাইয়া শেষ করিত। পাড়ার ছেলেমেয়েদের দেখিলে দুই-একটা দিতে তাহার কখনও ভুল হইত না। বিশেষ ওই যে ছেলেটা চৌখুপি লুঙ্গি পরিয়া ডোবা হইতে হাঁসের পাল তাড়াইয়া রোজ এই পথে বাড়ি ফিরিত, উহার ভাগ্যে রোজ দুটা আম লেখাই ছিল।

বিকালে বুড়া স্কট সাহেব তাহার লম্বা গলার ডগায় বসানো দুর্বল মাথাটি

নাড়িতে নাড়িতে ছোটো চামড়ার ব্যাগ হাতে ঠিক চারটায় আপিস হইতে বাড়ি ফিরিত। একটু পরেই ছোকরা হড্‌সন সাহেব তাহার চারিটা অতিকায় গ্রে-হাউণ্ড কুকুর লইয়া হাত-কাটা সাদা কুর্তা পরিয়া বাহির হইত হাওয়া খাইতে। সন্ধ্যায় দেখিতাম তরুণী এমির সহিত পালা করিয়া তাহার দুই যুবকবন্ধুর প্রেমলীলা।

সেদিন সকালে দেখিলাম আমাদের আমওয়ালীর বিশ্রামকুঞ্জে ভোর হইতেই নূতন কে আস্তানা গাড়িয়াছে। ওই কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় মাঝে মাঝে ফুলুরিওয়ালারা লোহার উনান কড়া খুন্তি লইয়া দোকান খুলিয়া বসে বটে। তাই হয়ত হইবে। বিছানা হইতে মাথাটা তুলিয়া দেখিলাম পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। তিনখানা ইট পাতিয়া মাটির হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়াছে। কাগজ খড় শুক্‌না পাতা এইসব তাহার উনানের ইন্ধন। ফুটপাথের কলে গোটা দুই এনামেলের থালা, একটা কাচের গেলাস, একটা এলুমিনিয়মের বাটি, একটা ছোটো গামলা মাজিয়া ধুইয়া জল ভরিয়া সে উনানের পাশে আনিয়া রাখিল। ভাত নামিল, তারপর ডাল চড়িল। বিস্কুটের টিনের ভিতর হইতে মাল-মশলা বাহির করিয়া পানও সাজিল। সঙ্গে একটা গামছা-বাঁধা পুটুলীতে খান-চারেক কাপড়, দু'খানা কাঁথা—খুলিয়া মাঠের উপরেই রৌদ্রে শুকাইতে দিল। এ যে রীতিমতো সংসার! কিন্তু মানুষটা একেবারেই একা। নিঃসঙ্গ আসিয়া পথে ঘরকন্না সাজাইয়া বসিল এ কে? কোথাও দূরপথে যাইতেছে বোধ হয়। কিন্তু কলিকাতায় ট্রাম আর মোটর বাসের রাজ্যে এমন চাল চিঁড়া বাঁধিয়া গ্রাম্য চালে মানুষ ত পথ চলে না।

দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়া যখন উঠিয়া বার্লির জল খাইতে বসিয়াছি, দেখি মেয়েটি গাছতলায় পা ছড়াইয়া দীর্ঘ চুলে বিলি দিয়া চুল শুকাইতেছে। এই গাছতলার ঘরকন্না ছাড়িয়া এখনই চট করিয়া সে কোথাও রওনা হইবে বলিয়া ত মনে হইল না। বেশ শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব, যেন গৃহকর্ত্রী সারাদিনের কর্মশেষে অপরাহ্নে অন্দরের ছাদের শেষ রোদটুকু একটু উপভোগ করিয়া লইতেছেন। পথচারীরা একটু কৌতূহলের সহিত তাহার দিকে দেখিয়া গেল, কিন্তু কেহ দাঁড়াইল না। সেও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিল না। চুলগুলা হাতে জড়াইয়া শক্ত করিয়া একটা খোঁপা বাঁধিয়া কপাল পর্যন্ত ঘোমটা নামাইয়া মাঠে বিছানো কাপড় কাঁথাগুলা

এক এক করিয়া তুলিয়া পাট করিতে লাগিল। কাপড় পাট হইলে ভাতের ও ডালের হাঁড়ি দুইটা উনানের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া বাসন কয়খানা একটা গামছায় বাঁধিল। আঁচলের সামান্য পয়সা ক'টা কোমরের কসিতে বাঁধিয়া গাছতলার চারিপাশটা ভালো করিয়া দেখিয়া মোটা কাঁথা দুইখানা দিয়া পশ্চিম দিকে একটা বিছানা পাতিয়া শিয়রে কাপড় ক'খানা রাখিল। আমি ত তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক্। এই বর্ষার রাত্রে একটা পোড়ো মাঠের গাছতলায় এই সঙ্গীহীনা স্ত্রীলোক সারারাত শুইয়া থাকিবে? কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। ইহাকে ত পথের ভিখারী মনে হইতেছে না। যেন চিরকাল রান্নাবাড়া ঘরকন্নায় এমন অভ্যস্ত যে গাছতলায়ও কোনো আয়োজন অনুষ্ঠানের ক্রুটি রাখে না।

ঘর হইতে অনেক ডাকাডাকি করার পর আমার ভৃত্য আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওখানকার ও মানুষটা কে রে? রাত্রে কি এই গাছ-তলাতেই থাকবে? একবার খোঁজ ক'রে দেখ দিকি।

ভৃত্য ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "সে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। ডাকলে জবাব দেয় না। বেশি কথা কেউ জানে না। যা দু-চার জনকে জিজ্ঞেস্ করলাম তারা বলে ও আপন মনেই কাজ করছিল, এখানে থাকবে তা কি করে জানব? কারুর সঙ্গে ত একটা কথা কয়নি। এখন দেখছি হঠাৎ শুয়ে পড়ল।"

বয়স নিতান্ত কম নয় কিন্তু খুব বেশিও নয়। গাছতলায় সারারাত শুইয়া থাকাটা চোখে বড়োই বিসদৃশ লাগে। রাত্রে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, একলা খোলা আকাশের নীচে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। সকালে আমার ঘুম ভাঙিবার আগেই দেখি সে তাহার কাজকর্ম শুরু করিয়া দিয়াছে। পথের ধারের কলতলায় বাসনমাজা জলভরা স্নান কাপড়-কাচা একে একে সবই সারা হইল। কে বলিবে ইহা তাহার বাড়ির উঠানের কূয়াতলা নয়? আর পাঁচজন কলের জল লইতে আসিলে মনে হইতেছিল সে যেন নিতান্ত দয়া করিয়া একটু সরিয়া গিয়া জল দিতেছে। আসলে কলটা তাহারই সংসারের সারাদিনের ব্যবহারের জন্য। উনান ধরানো চাল ডাল ধোওয়া রান্না-খাওয়া পানসাজা সবই যথাক্রমে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কোনো তাড়াহুড়া ব্যস্ততা নাই, কোনো ভাবনা

চিন্তা নাই, যেন গাছতলায় পাতা এই নূতন সংসারটির তদারকই তাহার বহুদিনের একমাত্র কর্তব্য। তাহার রান্নাবাড়া হইলে এখনই বাড়ির পাঁচজন আসিয়া খাইতে বসিবে। ছেলে বুড়ো কেহ বাদ যাইবে না।

তাহার উনানের হাত-দুই দূরে টেকো বুড়া রহমান তাহার নাতিটিকে কোলে লইয়া আসিয়া বসিল। খানিক বাদে দুই চারিটা প্রশ্নও শুরু করিল। উত্তর পাইল কি-না বোঝা গেল না। একটু পরে আসিল আবু কোচম্যান, যতক্ষণ ভাড়াটে না মিলে একটু গল্পগাছা করিয়া ইহার সঙ্গে ভাব জমাইবার ইচ্ছা। সে কিন্তু কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানিয়া আপন মনে পিছন ফিরিয়া রান্না করিতে লাগিল। যাহা হউক মানুষগুলার অধ্যবসায় কমিল না।

আকাশের মেঘ কালো কালো দীর্ঘ জটার মতো ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ জোরে বৃষ্টি নামিল। রহমান নাতির মাথায় হাত চাপা দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল, আবু সেখ চট্ করিয়া পাল্‌কি-গাড়িটার ভিতর ঢুকিয়া বসিল। সে কিন্তু এক ইঞ্চি নড়িল না, ঠিক সেইখানে বসিয়া উনানের আগুন উস্কাইতে থাকিল। পুঁটুলিসুদ্ধ কাপড় কাঁথা সব ভিজিয়া গেল, কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই।

ভৃত্য আসিয়া আমার ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া গেল, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বৃষ্টিটা থামিয়া যাইতে জানালা খুলিয়া দেখি—পুকুর হইতে উঠিয়া বড়ো বড়ো সাদা রাজহাঁসগুলা লম্বা গলা ঘুরাইয়া ঠোঁট দিয়া পালকের জল ঝাড়িতেছে, আর আমাদের পথবাসিনী পুঁটুলি খুলিয়া কাপড়গুলা নিংড়াইয়া মাঠের ঘাসের উপর মেলিয়া দিতেছে। কাকগুলা তাহার রান্নাঘরের সন্ধান পাইয়া নাচিয়া নাচিয়া ভাতের হাঁড়ির ঠোক্কর দিতে আসিতেই কাপড় ফেলিয়া কঞ্চি হাতে সে কাক তাড়াইতে ছুটিতেছে।

সারা দিনই এমনি রৌদ্র ও বৃষ্টির খেলা চলিল। বার বার সে ভিজা কাপড় শুকায় আবার শুকনা কাপড় ভিজিয়া যায়। বর্ষার মাতামাতিতে আমার জ্বর বাড়িয়া গেল,—দুই তিন দিন মাথার যন্ত্রণায় পড়িয়া তাহার কোনো খোঁজই লইতে পারিলাম না। তাহার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

জ্বরটা ছাড়িলে মেঘছায়াচ্ছন্ন নারিকেল-কুঞ্জের কথা মনে করিয়া জানালাটা খুলিলাম। দেখি জানালার কাছেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় বেশ সভা বসিয়া গিয়াছে। পথবাসিনীর সংসার ঘিরিয়া আবু সেখ্ রহমান, ছিদাম, পানু—

পাড়ার যত হিন্দু মুসলমান জুটিয়া গিয়াছে। সকলেরই বেশ উৎসুক ভাব; বোধ হয় গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। সারাদিনই ফুটপাথের উপর দুটা একটা মানুষ পালা করিয়া উবু হইয়া বসিয়া আছে। কাজের মধ্যেই নানা গল্প চলিতেছে। উহারই মধ্যে দোকানীর কাছে চালটা ডালটা চাহিয়া আনা, গাছতলা হইতে কাঠকুটা কুড়াইয়া আনার ফাঁক করিয়া লইতে হইতেছে। তাহার ডাগর চক্ষের নির্ভীক চাহনি একটু ভীরু হইয়া আসিয়াছে, নিশ্চিন্ত চলাফেরায় কিসের ব্যাকুলতা ও ক্ষিপ্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বাড়ির ঝি-চাকরেরা দেখিতেছি এই কয়দিনেই তাহার নাড়ী-নক্ষত্র জানিয়া ফেলিয়াছে, বোধ হয় গাছতলার সভায় তাহারাও যোগ দেয়। বুড়ি ঝি বিকালে আমাকে ফল দুধ দিতে আসিয়া বলিল, "মা গো, মানুষটার বড়ো মন্দ কপাল। কায়েতের ঘরের বৌ, শেষ কালে পথেই দাঁড়াবে নাকি কে জানে? এমন বেহিসেবীও মানুষ হয়?" জিজ্ঞাসা করিলাম, "বউ কি রকম? ওর কি স্বামী আছে?" সে বলিল, "হ্যাঁ মা, আছে বই কি! চার চারটে ছেলে মেয়ে, মেদিনীপুরে খোড়ো বাড়ি, সব আছে। তার কি-না এই দশা।"—"তবে এখানে গাছতলায় পড়ে মরতে এল কেন? ট্রেন ভাড়া ক'রে বর্ষাকালে কলকাতার গাছতলায় মানুষ থাকতে আসে নাকি?"

ঝি বলিল,"—বলে ত—যে অনেক দিন ধরে পেটের গোলমালে ভুগ্‌ছিল, সেখানে চিকিচ্ছে কিছুই হ'ত না, বল্‌লে কেউ গা-ও করত না। এবার স্বামী হঠাৎ রাজি হয়ে গিয়ে একেবারে কল্‌কাতার হাসপাতালে নিয়ে এল।"

হাসিয়া বলিলাম—"ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা! একেবারে আকাশের নীচে জল হাওয়া বৃষ্টি রোদ, সবই প্রচুর পাচ্ছে। একেবারে নির্মল হয়ে সেরে যাবে।"

ঝি কিছু না বুঝিয়াই বলিল,—"হাসপাতালে ভরতি ক'রে দিয়ে সে বাড়ি গেল। এদিকে ডাক্তার বল্‌লে—অম্বলের অসুখে আবার হাসপাতালে কে রাখে? রোজ এসে ওষুধ নিয়ে যেও। স্বামীর বুদ্ধিটা দেখ্‌লে? দু' দিন থেকে দেখে যেতে নেই?" সে কথার জবাব না দিয়া বলিলাম, "ভরতি করে আবার কখনও বার ক'রে দেয় নাকি?" ঝি বলিল, "কি জানি মা, ভদ্দরলোকের কাণ্ডকারখানা, গরীবের মরণে তাদের কি?"

আমি রাগিয়া বলিলাম, "তা বেশ তো ভদ্দরলোক যদি হাসপাতালে নাই রাখে, নিজের গরীব স্বামীর কাছে গেলেই হয়। তা ত কেউ বারণ করেনি! নিতে আসে না কেন লোকটা?" ঝি বলিল, "আসবে মা, মেদিনীপুর থেকে এসে নিয়ে যাবে। কাছে ত নয়। এখন বৌটা পান্থদের দোকানের দালানে রাত্রে শুতে যায়। সেখানটা দিনে বিড়িওয়ালারা বসে তাই রাতটুকুন পায় খালি। এই ক'টা দিন কেটে গেলেই হবে।" বলিলাম "যে ভালো স্বামী তাতে আসবার আশা না করাই ভালো! হাসপাতালে বোধ হয় দরজায় বসিয়েই টিকিট কেটে বাড়ি চলে গেছে। একটা খোঁজ-খবরও ত মানুষ করে, হলই না হয় গরীব। ট্রেন ভাড়া জুটেছিল আর পোষ্টকার্ডের পয়সা জোটে না?" ঝি বলিল, "জানিনে মা, অত কথা। আমায় যা বলেছে তাই বলছি। ওর স্বামী ওই জানে।"

হঠাৎ বাহিরে উন্মত্ত বাদল প্রলয় নাচন শুরু করিয়া দিল। নারিকেল গাছগুলি বা ভাঙিয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে মাঠের সবুজ গালিচা জলে সরোবর হইয়া উঠিল, ডোবার হাঁসগুলা কচি ছেলের মতো টলিতে টলিতে আসিয়া সেই নূতন জলে খেলা শুরু করিল। পথবাসিনী তাহার হাঁড়িকুড়ি গাছতলায় উপুড় করিয়া রাখিয়া পুঁটুলিটা লইয়া আমাদের সিঁড়ির তলায় দাঁড়াইল। জল ও বাতাসের যুগল নৃত্যে তাহার গাছতলায় আর টেকা যায় না। কৃষ্ণচূড়ার শাখা-প্রশাখায় ঝড়ের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে।

বুড়া ঝি আসিয়া বলিল, "মা, বউটা সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়েছে, একবার দেখবে এস।"

সেদিন ভালোই ছিলাম, বাড়িতেও শাসন করিবার মতো কেহ উপস্থিত ছিল না। কাজেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া একেবারে সিঁড়ির কাছে গিয়া হাজির হইলাম। মেয়েটা দেখিতে মন্দ নয়। ডাগর দুটি ভয়লেশহীন চোখ, মাথায় রুক্ষ চুলের মস্ত একটা খোঁপা, হাসিলে এখনও গালে টোল খায়। কিন্তু বয়সে তরুণীর চপলতা নাই, মাতৃত্বের গাম্ভীর্য আসিয়া পড়িয়াছে। সিঁড়ির দরজা পার হইয়া ভিতরেই আসিয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ গা বাছা, ঝড়ে জলে পথে পড়ে আছ কেন? তোমার কি কেউ নেই?"

সে জিভ কাটিয়া বলিল, "সে কি কথা মা, আমার সাজন্ত ঘর, সব আছে।

রোগের জ্বালায় বিদেশে এসে এমন বিপদে পড়েছি। নইলে মা, ঘরের বাইরে কোনোদিন পা দিইনি।" বলিলাম, "তোমার স্বামীকে একটা চিঠি দিলেই ত নিয়ে যায়।"

সে বলিল, "লিখতে ত জানি না মা, এই লোকগুলাকে দিয়ে লিখিয়েছিলাম। পেল কি-না তাই বা কে জানে, আর যদি জবাব দিয়ে থাকে হয়ত কার-না-কার হাতে পড়ে খোয়া গেছে। হয়ত ইচ্ছে ক'রে ভুল ঠিকানা লিখেছে; কার পেটের কথা কে জানে?"

বলিলাম, "আমাদের ঐ চালাটায় দু-চারদিন থাক, আমি তোমার চিঠি লিখে দেব, এখান থেকে এসে নিয়ে যাবে।"

কায়েত-বউ, তাহার ডাগর চোখ তুলিয়া বলিল, "আপনারা কি জাত মা? আমি কায়েতের মেয়ে, যার তার ঘরে ত থাকতে পারি না।"

বড়ো রাগ হইল, চাল নাই, চুলা নাই, থাক্‌তে জায়গা দিলাম তা আবার জাতের খোঁজ। বলিলাম, "জাতে আমরা মুচি। তোমায় ত রেঁধে খাওয়াব না, অত ভয় কিসের? থাকতে দিচ্ছি ভাগ্যি মান, তা না জাতকুলের খবর নিতে বসলে।"

সে বলিল, "হাড়ি মুচির ঘরে রাত কাটালে সোয়ামী কি আর ঘরে নেবে, মা! তার চেয়ে এই ভালো। চিরকালের ঘর খোয়ানোর চেয়ে দু-দিন পথে থাকাই ভালো।"

বলিলাম, "পথের ধারে ঐ যে গাড়োয়ানগুলোর হাসিতামাশা শোন বসে বসে ওতে কি স্বামী খুব খুশি হবে?"

সে বলিল, "কি করব মা? আমি ত তাদের হাসতে ডাকিনি। ঘরে নিজের স্বামী আজ দশ বছর হেসে কথা কয় নি, এখানে সবাই হাসির কথা শোনাতে আসে, তা কি আমার দোষ। আমরা গরীব লোক ও সব রং তামাশা জানি না। কিন্তু এসে বসলে সবই সইতে হয়।"

হাসিয়া বলিলাম, "আমরা মুচি নয় গো, ওই চালায় দিনকতক থাকলে তোমার জাত যাবে না।"

সে একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না, মা, তোমার অনেক চাকর বাকর, পাঁচজনের সঙ্গে ওখানে আমার সুবিধা হ'বে না। এই দোকানীর বারান্দাই ভালো, ভিতর থেকে বন্ধ করে একলা থাকি।"

বেশিক্ষণ তাহার সহিত তর্কের খেলা করিবার জোর ছিল না। "যা ভালো বোঝ কর বাছা," বলিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

তিন দিন পরে দেখি, কায়েত-বউয়ের সংসারে আসবাব বাড়িয়াছে। গাছতলায় নিকানো গণ্ডির ভিতর ঘুন্‌সি-পরা একটি উলঙ্গ শিশু হামা দিয়া চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৃহিণী আজ সন্ত্রস্ত; এই জলের গেলাস, উপুড় হইল, এই ডালের ঠোঙায় থাবা পড়িল, এই উনানের কাঠে টান। বউ তিন-চারিটা মুড়ির দানা তাহার বিরলদন্ত মুখে দিয়া তাহাকে এক জায়গায় স্থির করিয়া বসাইবার চেষ্টা যতবার করিল, ততবারই সে ঠোঁট দুইটা টিপিয়া বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া হামা দিয়া আসিয়া জলের বাসনগুলায় দুই হাত ডুবাইতে লাগিল। যত হায়রাণি বাড়ে বৌ ততই শিশুকে সহবত শিখাইতে ব্যস্ত, দুইজনে হাসিয়া অস্থির। আবু সেখ, পান্নু, ছিদাম আসিয়া হাসির কণা যতটুকু পারিল সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেল। পরিবর্তে কেহ কিছু চাল, কেহ চারখানা কাঠ, কেহ একটু গুড় দিয়া দাতা নাম কিনিল।

বুড়ি ঝি জানালা দিয়া দেখিয়া বলিল, "আ-মরণ, উনি আবার ভালো-মানুষের ঝি! নিজের ছেলে ঘরে প'ড়ে কাঁদছে, আর এখানে পরের ছেলে কোলে সোহাগ করা হচ্ছে। ওটা ওই ছিদ্‌মে লক্ষ্মীছাড়ার ছেলে।" জানালা দিয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিলাম। ছেলে কোলে করিয়া সে নিচে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, "ও ছেলেটা জোটালে কোত্থেকে?"

বলিল, "ছিদামের বাড়ি গিয়েছিলাম, তার বউ আমাকে মা বলেছে, তাই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। বিদেশে বিভুঁইয়ে মেয়েছেলের সঙ্গে ভাব রাখা ভালো। নইলে একটা বদনাম উঠ্‌লে আর কি ঘরে ঠাঁই দেবে? তা ছাড়া জানই ত মা, মায়ের জাত কি ছেলে নইলে বাঁচে?"

আমি বলিলাম, "এমনিতেও ত ঘরে ঠাঁই দেবার কোনো লক্ষণ দেখছি না। ও তোকে ফেলেই হয়ত পালিয়েছে। নইলে কি একটা দিন থেকে ভালো ক'রে ব্যবস্থা করে যেতে পারতো না?"

সে বলিল, "না মা, পুরুষ মানুষ—মারে ধরে বলেই কি আর পথে বার ক'রে দিয়ে যাবে? ভাবছে মনে হাসপাতালে ত আছে, দশদিন পরে এসে খোঁজ করলেই হবে। ছেলেপিলে ফেলে তখন তাড়াতাড়িতে চলে গেছে।" একখানা পোষ্টকার্ড জোগাড় করিয়া তাহার স্বামীর নামে চিঠি লিখিয়া

দিলাম, বলিলাম, "ডাকে ফেলে দে, যদি মানুষ হয় ত নিশ্চয় নিয়ে যাবে।"

পাঁচদিন কাটিয়া গেল, ঝড়ে বৃষ্টিতে রৌদ্রে এই অনাবৃত পথে আর কত কাল বাস করা চলে? কিন্তু চিঠিও আসিল না, স্বামীরও দেখা মিলিল না। সব চুপচাপ।

বলিলাম, "কারুর বাড়িতে আশ্রয় নে না বাছা! এমন ক'রে কি মানুষ বাঁচে?"

সে বলিল, "এ খৃষ্টান মুসলমান পাড়ায় কোথায় কার ঘরে থাক্‌ব, মা, আমি হিন্দুর বউ।" বলিলাম, "তবে যা না বাপু, কোথায় হিঁদু পাড়া আছে। এখানে পড়ে মরতে হবে না।" সে ভীতচক্ষে বলিল, "বড়ো ভয় করে মা, জাতজন্ম খোয়ালে আর কি গেরস্তর ঘরে কেউ মুখ দেখবে? এ তবু চেনা শুনো হয়ে এসেছে, এক রকম চলছে। এ দেশে কোথায় কি পাড়া আমি কি কিছু চিনি? কারুর সঙ্গে যেতেও ভরসা হয় না, কোথায় নিয়ে যাবে কি জানি? বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার দিন কাটে, মা।" বলিলাম, "তবে অত ডাঁক না দেখিয়ে এইখানেই থাক্ না যে ক'দিন দরকার। হলামই বা খৃষ্টান।" কি ভাবিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা কাল আস্‌ব। ঘরটা আজ দেখে যাই।" চালা ঘরটা দেখাইলাম। একদিকে কেরোসিনের বাক্সে বাড়ির যত ভাঙা কাঁসার বাসন, আর এক দিকে কোদাল টাঙি, খুপি ইত্যাদি লোহার সরঞ্জাম ও গোটা-পনের চটের বস্তা পড়িয়া আছে; মাঝখানে একটা ভাঙা তক্তপোষ। বউ ঘর দেখিয়া বলিল, "ভালো করে বন্ধ হয় না।" তারপর চলিয়া গেল।

ধূলিকণার মতো গুঁড়া বৃষ্টির ভিতর কায়েত-বউ সকাল বেলাই রান্না চড়াইয়াছিল। জানালা দিয়া তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখিতে পাইতে-ছিলাম না, বৃষ্টি যেন পাতলা একটা উড়ন্ত মসলিনের পরদার মতো আমাদের দু জনের মাঝখানে দুলিতেছিল। একবার মনে হইল মুখের উপরের বৃষ্টির জল সে আঁচল দিয়া মুছিতেছে, আবার মনে হইল বৃষ্টির জল নয় চোখের জল। এত দুঃখে কোনো দিন তাহাকে কাঁদিতে দেখি নাই, আজ কি সে তবে সকল আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। হাঁটু দুইটার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া সে তাহার কান্না সাম্‌লাইতে লাগিল। এমন সময় একটা

ছাতা হাতে পান্থ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম ছাতাটা লইবার জন্ত বউকে অনেক ঝুলোঝুলি করিতেছে, আজ কিন্তু সে দান লইতে বড়োই কুণ্ঠিত। তবু পান্থ ছাতা রাখিয়া চলিয়া গেল।

এক গালে হাসি ও পান লইয়া কে একটা গাড়ি হাঁকাইয়া গাছতলায় আনিয়া দাঁড় করাইল। কায়েত-বউ একটু ভীতদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া তারপর চোখের জলের ভিতর দিয়া মৃদু একটুখানি হাসিল। গাড়ির ভিতর চারটা ছোটো বাঁশ ও একটা পুরানো তেরপল ছিল। বাঁশ চারিটা চারিকোণে পুঁতিয়া উপরে তেরপলটা চাপা দিয়া আবু অনাবৃত রান্নাঘরের একটা ছাউনি করিতে লাগিয়া গেল। বুড়া রহমান নাতি কোলে যাইতে যাইতে সেদিকে তাকাইয়া বলিল, "বাহাবা তোফা।" মানুষগুলো শুধুই আড্ডা জমাইতে না আসিয়া আজ বেচারীর দুর্গতির একটু প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে, দেখিয়া তাহাদের উপর আমার মনটাও প্রসন্ন হইল।

বুড়ি ঝি খাবার লইয়া আসিয়াছিল, এই সব দেখিয়া বলিল, "বাছা আমার বাঁচলে বাঁচি, ঘোলে রুচি দুধে অরুচি।" জাতের দেমাকে তোমার ঘরে থাকল না, মা, এত জাত কুল সব ধুয়ে খাচ্ছেন।" আমি বলিলাম, "চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়ি, লোকের নামে কথা রটাতে পেলে কিছু চাস্ না। মানুষের চামড়া গায়ে থাক্‌লে পরের দুঃখ কষ্টে মানুষ অমন করেই থাকে।"

সে বলিল, "হ্যাঁ দুঃখু কষ্ট না ত আর কিছু। ঐ গাড়োয়ানটা আমাকে নিজে বলেছে ও ওকে গাড়ি করে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায়; আবার পান্থর সঙ্গে তাই নিয়ে ওর ঝগড়া কত! বলে—যাক্ না পান্থর চাল চিঁড়ে খেতে, একদিন হাড় ক'খানা ভেঙে রেখে দেব। লজ্জা সরম সব ধুয়ে খেয়েছে মা, নইলে এমন ঢলাঢলি গেরস্তর বউ করে।"

আমি বল্‌লাম, "ও-সব লোকটার দুষ্টুমি, বানিয়ে বলেছে ওর নাম খারাপ করবার জন্তে। তুই যত রাস্তার লোকের সঙ্গে বাজে গল্প করতে যাস কেন বল দেখি! অমন করলে তোকে দিয়ে আমার চলবে না।"

বুড়ি তাড়াতাড়ি আমার পায়ে হাত দিয়া বলিল, "তোমার দিব্যি মা, বাজে গল্প করতে যাই না। ঘুঁটে কিন্‌তে গিয়েছিলাম, ওরা এসে সাত কথা তুল্‌লে। বউটার ভালোর জন্তে তাকে বল্‌তে গেলুম যে—যার তার সঙ্গে

অমন হাওয়া খেতে যাস্‌নে মরবি, তা এমন গ্যাকা সাজল মা, যেন ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানে না, যেন হাওয়া খাওয়ার নামও কোনো দিন শোনেনি। ছোটোলোকদের কাণ্ড জান না, মা, ওরা ভর সন্ধ্যে বেলা সেদিন একটা মেয়েকে মোটরগাড়ি করে নিয়ে পালাচ্ছিল! সে যাই মেম, তাই রক্ষে! সে পুলিশ ফরেদ কত কি করলে, আর কাঙালের মেয়ে কি বাঁচবে ওদের হাতে পড়লে?"

বুড়ির যত গুণ্ডার গল্প শুনিবার মতো মস্তিষ্কের অবস্থা ছিল না। শুইয়া পড়িয়া বলিলাম, "যা বাপু, তোর গল্প শুনে আমার মাথা ঘোরে। আমায় একটু ঘুমোতে দে।"

বিকেল বেলায় গাছতলার সভা খুব জাঁকাল হইয়া উঠিয়াছিল। আগে ত এত লোক দেখিতাম না। আরও পাঁচ-সাতটা দুষমনের মতো মানুষ, কেহ ঝুড়ি কেহ কোদাল, কেহ দড়ি কাঠ ও বস্তা হাতে করিয়া ময়লা কাপড় জামা পরিয়া যেন দিনমজুরির কাজ হইতে ফিরিতেছে, এমনি ভাবে এক হাঁটু কাদাধুলা মাখিয়া সেখানে বসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা খুব হাসিগল্প করিতেছে, দেখিয়া মেয়েটার উপর আমার বড়োই বিরক্তি হইল। ভালোই হইয়াছে, আমার বাড়িতে আনি নাই। বিরক্তিতে এ বেলা আর তাহার মুখের দিকেও তাকাই নাই। তা ছাড়া চারিধারে মানুষ গোল হইয়া বসাতে তাহাকে বিশেষ দেখাও যাইতেছিল না।

পরদিনও নূতন নূতন মানুষ আবির্ভূত হইতে লাগিল, এবং মাঝে মাঝে অভদ্র ঝগড়া ও খণ্ড যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সেইখানে বসিয়াই কায়েত-বউ তাহার নিত্যকর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিল, সুতরাং জিনিসটার ওজন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সংসারের শ্রী বাড়িয়াছে, মাথার উপর একটু ঢাকা, বসিবার একখানা পিঁড়া, ছোটো একটা বঁটি। কিন্তু তাহার সে আত্মস্থ ভাব কাটিয়া গিয়াছে। ঘরকন্নার আগ্রহ আছে মনে হয় না, ইহাদের এই আনাগোনা ও কোলাহল যেন তাহার চারিপাশে কিসের একটা ঘূর্ণি নাচাইয়া তুলিয়াছে। তাহার সরল মনের স্থৈর্য ঘুচিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যায় আজ সে একবার আমার সিঁড়ির তলায় আসিয়াছিল, তখনও তার গাছতলায় লোক বসিয়া। ঝি বলিল, "তোমার সঙ্গে কথা কইতে চায়, মা।" বিরক্ত ভাবেই গিয়া বলিলাম, "কি চাই, তোমার?" সে হাত জোড়

করিয়া বলিল, "মা, তোমার ওই ঘরটায় আজ আমাকে থাকতে দিও। কিন্তু একটা হুড়কো চাই, মা।"

বলিলাম, "দু'বার ত সাধলাম, এলি কই? এখন এক রাজ্যি লোক জুটিয়ে আবার আমার ঘরের উপর টান কেন?"

ডাগর দুই চক্ষে মিনতি ভরিয়া সে শুধু হাতজোড় করিল, কোনো কথা বলিল না। যেন পিছনে তাহার কথা শুনিবার জন্য কে আড়ি পাতিয়াছে। "আচ্ছা, আসিস" বলিয়া ঘরে চলিয়া গেলাম। লোকগুলা তখনও তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। উহাদের আরও অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলিল। একটা উত্তেজিত গলার স্বর কানে আসিতেছিল।

ভোরেই ঘুম ভাঙিল। অনেক দিন পরে সকাল হইতেই উজ্জ্বল নীল আকাশে পরিষ্কার রোদ উঠিয়াছে। সমুদ্রের ফেনার মতো সাদা সাদা ফাঁপা মেঘ মাথার উপরে ছড়াইয়া আছে, যেন শরৎকাল। গাছতলায় দুইটা খোট্টা বুড়ি হল্‌দে তালি-দেওয়া গোলাপী কাপড় পরিয়া পেয়ারাফুলি আমের ঝুড়ি লইয়া বসিয়াছে। কায়েত-বউ ত আসে নাই। রাত্রে আমাদের এখানে শুইতে আসিবে বলিয়াছিল তাহাও ত দেখিলাম না। তাহার ঘরসংসারের তিনটা পোড়া ইট ও দুইটা পোড়া হাঁড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই। আজ এমন সুন্দর দিনে তাহার এত আলস্য অথচ বাদ্‌লা দিনে ত দেখি ভোর না-হইতেই জিনিসপত্র সব লইয়া আসিয়া কাজে মাতিয়াছে। হয়ত আমার এখানে থাকিবে বলিয়াও আসে নাই, তাই লজ্জাতে অন্য কোনো দিকে নূতন করিয়া সংসার সাজাইয়াছে। কিছু আশ্চর্য নয়।

আরও বেলা হইল। তাহাকে কোনো দিকে দেখিলাম না। বুড়ি ঝিটা সকাল-বেলাই তাহার মেয়ের বাড়ি গিয়াছে, বিশ্বের গল্প শুনাইবার লোকই বা কোথায় যে পথের মানুষের খবর পাইব?

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় বুড়ি বাড়ি ঢুকিয়াই ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মাগো এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিছু শোন নি?"

বলিলাম, "কেন রে, কি হল?"

সে বলিল, "পরশু রাতে ছিদামের দোকান ঘরে চুরি ক'রে বউটা পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। পানুটা ওর ভাবের লোক, দালানে শুতে জায়গা দিয়েছিল, তাই চুরি করলে গিয়ে ছিদেমের ঘরে। এত মনোহারী

জিনিস, একটা বস্তা ভর্‌তি। এদিকে ছিদেমের বউ নাকি ওকে মা বলে। মা হয়ে ছেলের গলা কাটা! ছিদেম ত রেগে আগুন, বলে ওকে এক বচ্ছরের জেল খাটাব। পান্থরা বলেছে, গরীব দুঃখী লোক, টাকার লোভে চুরি করেছে, ওরা ওকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। কিন্তু ছিদ্‌মে কি সহজে ছাড়বে? মা সেজে শয়তানি কে সয় বল দিকি মা?”

কুড়ি-বাইশ দিন দোকান ঘরে কাটাইয়া দিয়া আজ হঠাৎ চুরি করিল, কথাটা বিশ্বাস হইল না। হয়ত এই দুষ্ট লোকগুলা শিখাইয়া-পড়াইয়া উহাকে চোর তৈয়ারি করিয়াছে, এমন হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। তাই হয়ত উহাদের ছাড়াইয়া আনিবার এত দরদ।

বিচার হইয়াছে, খবর পাইয়াছি। পান্থরা ছিদামকে অনেক বুঝাইয়া বউটাকে ছাড়াইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু বউ ছাড়া চায় না, তাই আদালতে নিজে বলিয়াছে যে, জানিয়া শুনিয়াই জেলে যাইবার জন্য সে তাহার একমাত্র হিতৈষী ছিদামের ঘরে চুরি করিয়াছিল। এখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলে পৃথিবীতে তাহার আর কোনো আশ্রয় নাই। স্বামীর অন্নের আশা তাহার ঘুচিয়াছে, পরের অন্নের দাম সে দিতে পারিবে না। “পান্থর ঘরে চুরি করতে ত আমি পারতুম, কিন্তু ও লক্ষ্মীছাড়া আমায় জেলে দেবে না জেনেই আমি ছিদামের ঘরে চুরি করেছি। আমায় ওদের হাতে আর সঁপে দিও না, বাবা” বলিয়া সে কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে।

কায়েত-বউ হাজতেই আছে, যাহারা তাহার ত্রাণকর্তা হইতে চাহিয়াছিল, এখন তাহাদের নামে গ্রেফ্‌তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে।

প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩৩৯

বার-এট্-ল

গোকুলচন্দ্র নাগ

নূতন বারিষ্টার মহলে চারু দত্তের পসার খুব বেশি। তাই অনেকেই তাকে বেশ একটু হিংসার চোখেই দেখে আর তার অসাক্ষাতে কানাকানি করে,—"আশ্চর্য! ছোঁড়াটা বিয়ে করে যেন ফেঁপে উঠল। কে জানত বুড়ো ঘোষ সাহেবের অত টাকা ছিল? ছোকরা দিব্যি শাঁসে জলে বাগিয়েছে হে।"

একজন পাইপটা ঠোঁটের বাঁদিকে চেপে, তাতে আগুন ধরাতে ধরাতে বল্‌ল—"শাঁসে জলে আর বোলটে, ডুটি লক্ষ বেঙ্গল বেঙ্কে নগত।"

দু'বছরের মধ্যে খুব কষ্ট করে চারু দশটি ক্লাবের সেক্রেটারী, সাতটি ক্লাবের মেম্বর, আরও ঐ রকম কত কি হয়েছে, কিন্তু তার মন আর কিছুতেই ওঠে না। মাঝে মাঝে কোন বন্ধুকে বলে, "সত্যি বলছি ভাই, আমাদের এই দেশী ক্লাবগুলো একেবারে ওয়ার্থলেস্।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা চারু, তার জন দুইচার বিলাত-ফেরত বন্ধুকে নিয়ে চা খাচ্ছে। মিসেস্ ডাট্ সকলকে আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করছেন। "জারমানরা আবার অফেন্‌সিভ্ নিয়েছে, ওদিকে রাশিয়াও নিজেদের মধ্যেই কাটাকাটি মারামারি আরম্ভ করে দিয়েছে, তবে আমেরিকা এলাইদের পক্ষ নিয়ে নাবছে, এই যা ভরসা" ইত্যাদি, আলোচনার মধ্যখানে হঠাৎ চারু বলে উঠল—"আচ্ছা মিঃ বোনার্জি, আপনি ত লজ-এর মেম্বর?" মিঃ বোনার্জি বললেন—"হঁা সে আর নতুন কথা কি, আজ প্রায় পাঁচবছর ত ওখানে যাতায়াত করছি।" কথা কয়টি বলে বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে তিনি সকলের মুখের দিকে একবার তাকালেন।

চারু বল্‌ল—"তা আমাকে ত ওখানে যাবার জন্যে একবারও বলেন না। যত রাজ্যের নরক ঘেঁটে আমার দিন যায়।"

বোনার্জি বললেন,—তা ভাই একজনকে ত ঘাঁটতেই হবে। নইলে পরিষ্কার হবে কেন? এই দেখনা তুমি এসে পর্যন্ত আমি একটু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। অস্থির হয়ে উঠেছিলাম হে। কোথায় কোন্ সাহেব বাঙালীদের লক্ষ্য করে কি কথা বলেছে, এক ক্লাব থেকে হুকুম হল—দাও তার জবাব।

আজ ছাত্রদের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে লেক্‌চার দাও। কাল টি পার্টি দাও। বলতে কি ভাই শুধু পাগল হতে বাকি ছিল। আশীর্বাদ করি আমার মাথার চুলের মতো তোমার পরমায়ু হোক। তুমি আমার প্রাণদাতা সেভিয়র।

চারু হেসে বল্‌ল—"আপনার ওসব বাজে বকুনি রেখে লজ-এ ঢুকবার একটা উপায় করে দিন।"

বোনার্জি সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়া গলাটা উঁচু করে আকাশের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লেন—তা এক কাজ কর না, তুমি একটি এপলিকেশন করে দাও, আমি সেটা সব্‌মিট করব। আসল কথাটা কি জান, রোম্যান ক্যাথলিক মিশনারিদের মতো ভজিয়ে ভজিয়ে মেশন করবার নিয়ম নেই। যার ইচ্ছা হবে তাকে নিজে দরখাস্ত করতে হয়। বুঝলে?

মিসেস ডাট সেইখানে বসে পড়ে বল্‌লেন—সত্যি কিন্তু ঐ সব লক্ষ্মীছাড়া বাঙালী ক্লাবে গিয়ে অবধি ওঁর শরীর আধখানা হয়ে গেছে। মিঃ বোনার্জি আপনি একটু চেষ্টা করে ওঁকে আপনাদের লজ্‌-এ নিন।

রাত্রি ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। সকলে যাবার জন্য ব্যস্ত হতে, শুভরাত্রি ইচ্ছা ক'রে, এই টি-তে সকলকে আহ্বান করে মিসেস্ ডাট তাঁদের অত্যন্ত বাধিত করেছেন, এবং তাঁরা তাঁর স্নুরুচিপূর্ণ ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছেন ইত্যাদি কথার পর চলে গেলেন।

সকলকে বিদায় দিয়ে মিসেস্ ডাট্ বললেন,—আচ্ছা খুব ভালো হবে না? আমার ত খুব ভালো লাগ্‌ছে—বেশ হবে কিন্তু। কি কতগুলো বাজে ক্লাবে গিয়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে লজ-এ গেলে ঢের উপকার হবে। তাছাড়া সেখানে কত বড়ো বড়ো লোক যায়। মোটের ওপর সোসাইটিটা খুব হেল্‌দি না?

সপ্তাহ দুই পরে কোর্ট থেকে ফিরেই সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে চারু বলে উঠ্‌ল,—জান মীরা,—শুনেছ?

বারাণ্ডায় রেলিংএ ভর দিয়ে মীরা বল্‌ল—"খুব জানি। আগে ওপরে ত উঠে এস।" চারুর ঘর্মাক্ত এবং আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌ল,—"ওরা ত আমায় নিয়েছে বুঝলে। সাড়ে পাঁচটা ত বেজে গিয়েছে আর একঘণ্টা মাত্র সময় আছে। তুমি শিগ্‌গির আমার ড্রেস স্নুটটা বার করে

দাও। আজ আমার লজ-এ—আঃ দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শুনতে পাচ্ছ না?"

মীরা হেসে বল্‌ল,—"আগে যেটা পরে আছ সেটা ত ছাড়। জলটল কিছু খেতে হবে না কি?"

ভ্রূদুটি বাঁকিয়ে চারু বল্‌ল—তোমাকে যা বল্‌ছি তাই কর না। আমার জামা আমি ছাড়ি না ছাড়ি তোমার তাতে দরকার কি? বো—ই। নেপথ্যে শব্দ এল—"হুজুর।"

মীরা একখানা ভিজে তোয়ালে দিয়ে চারুর মুখের ঘাম মুছিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "মনে থাকে যেন।" ড্রেসিংরুমে ঢুকে চারু বল্‌ল—"কি?" মীরা বল্‌ল, "আমাকে লজ্ সম্বন্ধে সব কথা বলতে হবে। আমি এন্‌সাইক্লোপিডিয়াতে ফ্রি মেসন্‌রি সম্বন্ধে যত কিছু একাউণ্ট ছিল সবই পড়েছি, কিন্তু ওদের আসল উদ্দেশ্যটা যে কি তা ঠিক ধরতে পারি নি। আজ রাত্রে ওখান থেকে ফিরেই আমাকে সব বলতে হবে কিন্তু।"

চারু বল্‌ল,—"বাঃ সে কি করে হবে? তুমি কি জান না মেসনদের যা সিক্রেট তা যারা মেসন্ নয় তাদের কাছে বল্‌তে নেই?"

মীরা বল্‌ল, "আমি না তোমার স্ত্রী!"

"হলেই বা স্ত্রী, আমি যখন লজের মেম্বর, তখন আমার কাছে দোকানের মুদি এবং আমার স্ত্রী দুই সমান। তার কাছে যেমন বলতে পারি না, তেমনি তোমার কাছেও নয়।"

ধপধপে শাদা দাঁত দয়ে মীরা ঠোঁটটিকে একটু কামড়ে, কাপড়ের আঁচলটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বল্‌ল,—"ওঃ বেশ! দোকানের মুদী মিন্‌সে আর তোমার স্ত্রী তোমার কাছে এক? বেশ তাই হোক।" বলে ঝমাস করে চাবির গোছাটি পিঠের ওপর ফেলে, বেশ মন্থর গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কোনো প্রকারে পোষাক পরা শেষ করে চারু মীরার ঘরে এসে দেখল সে বিছানায় শুয়ে আছে। মুখটি দুটি বালিশের মাঝে ঢাকা। আদর করে তার পিঠে হাত বুলিয়ে চারু বল্‌ল—"লক্ষ্মীটি মীরা, রাগ করো না, ওঠো। আচ্ছা, একবার দেখলেও না, আমায় ড্রেসস্যুটে কেমন মানায়? আচ্ছা বেশ।"

এবার মীরার সর্বশরীর একটু যেন আন্দোলিত হয়ে উঠল। তারপর

দুটি ভিজে চোখ আর একটি হাসিমুখ বালিশের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল। চারু মাথার হ্যাটটা ডানহাতে করে তুলে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বিলাতী কায়দায় মীরাকে অভিবাদন করল। মীরা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল—"ঠিক যেন হোটেলের ওয়েটার।"

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে চারু বল্‌ল "অল্ রাইট।" আর কোনো কথা না বলে সে চলে যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মীরা ছুটে এসে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বল্‌ল "আর বলব না।" চারু বিরক্ত হয়ে বলল, "আঃ কি কর। সরে যাও আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

"আর অত রাগ করতে হবে না গো মশাই। এই নাও মাপ চাচ্ছি।" বলে মীরা চারুর পায়ের কাছে বসে পড়তে গেল। তাকে তুলে কপালে একটি টোকা দিয়ে চারু বল্‌ল,—"ইউ নটি গার্‌ল্। আচ্ছা শোধবোধ কেমন?"

মীরা বল্‌ল, "আচ্ছা; কিন্তু……।" ঘড়িতে ৬টা বাজ্‌ল। চারু চম্‌কে উঠে বলল "ঐ দেখ তোমার সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।—টিল্ উই মিট্ এগেন্ ডার্লিং।" চারু যখন শেষ সিঁড়িতে নেবে এসেছে ওপর থেকে মীরা বলে উঠল, "বলতে হবে কিন্তু।"

রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। চারুর পায়ের শব্দ পেয়ে মীরা তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেবে, চারুর সামনে এসে বল্‌ল—"কি হল বল।"

মেসনদের সম্বন্ধে সমস্ত কথা জান্‌বার জন্যে তার মন ছট্‌ফট্ করছিল। বই-এর পাতায় সে ঐ বিষয়ের অনেক কথাই পড়েছে, কিন্তু সেগুলো সব সত্যি কিনা জান্‌বার জন্যে তার মন আকুল হয়ে উঠেছিল। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা করে সে সমস্ত সন্ধ্যাটি কাটিয়েছে। তাই চারু ঘরে ঢুকতেই তার যেন আর দেরি সহ্য হল না।

চারুর কিন্তু সে রকম কোনোই ভাব দেখা গেল না। সে দিব্য গদাই লস্করী চালে কোটটি পাট করে একটা চেয়ারের উপর ফেলে, বেশ ভালো করে ধুতিখানি পরে বল্‌ল—"চল শুতে যাই, রাত ত বড়ো কম হয় নি।"

এই অল্প সময়টুকু মীরার যে কি করে কেটেছে, তা ভগবানই জানেন। তার ধারণা ছিল কাপড় ছাড়া হলেই চারু সব বলবে। এত বড়ো একটি ব্যাপার তার কাছ থেকে কি লুকিয়ে রাখতে পারে?

মীরা এবার প্রায় কেঁদে উঠেই বল্‌ল—"তাহলে বলবে না আমায়?"

চারু বিরক্ত হয়ে বল্‌ল,—"কি জ্বালা! আমি কি তোমার কাছে হলপ্‌ করেছিলাম বলব? আর বল্‌বই বা কি! লজ-এর কথা কাকেও বলতে নেই এ ত তোমায় হাজারবার বলেছি। সে যে সিক্রেট।"

"কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু লুকোচুরি থাকা উচিত নয় তুমি ত একদিন বলেছিলে 'আমার যা কিছু গোপনীয় বিষয় তার ওপর তোমার অধিকার রইল, আর তুমিও আমায় সব বোলো।' আমি ত তোমায় সবই বলেছি। এখন তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখ।"

চারু একটা হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে বল্‌ল,—"নাঃ আজ আর ঘুমোতে দেবে না দেখ্‌ছি।" তারপর পাঁচমিনিটের মধ্যেই নাকডাকার শব্দে স্ত্রীর কান্নাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হল।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে কিন্তু কোথায় যেন একটু গরমিল ঠেকছিল, সেটা চারু ঠিক্‌ ধরতে পারছিল না। তাদের সামনে টোষ্ট, ডিম, কেক্‌, চা সবই ঠিক রয়েছে, তুজনেই খাচ্ছে, কিন্তু খাওয়াটা যেন সব দিনের মতো হচ্ছে না। মীরার মাথাটা চায়ের পেয়ালা থেকে আর ওঠে না। যদিও বা ওঠেও অন্য সব দিকে ফেরে শুধু চারুর দিক্‌ ছাড়া। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু বুঝতে না পেরে, কিংবা একটু বুঝে চারু বল্‌ল—"দেখ পেলিটি থেকে আর কেক্‌ আনিও না কেস্‌ল্‌এজো থেকেই আনিও।" মীরা ছোট্ট একটি ঘাড় নাড়ল, তারপরই সব চুপ। চারু বল্‌ল—"উঃ চা-টা কি ষ্ট্রং হয়েছে।" মীরা চায়ের পেয়ালায় খানিক তুধ ঢেলে দিয়ে নিজের মনে খেয়ে যেতে লাগ্‌ল।

চা খাওয়া শেষ হলেই মীরা নিজেই চায়ের পাতা দিয়ে টি সেট্‌টা পরিষ্কার করতে বসে গেল। চারু বল্‌ল, "চল কাগজ পড়িগে।" এই সময়টা তুজনে একটু পড়াশুনা করে। মীরা কোনোই উত্তর দিল না, নিজের মনে বাটি ঘস্‌তে লাগ্‌ল। চারু আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটু বিরক্ত হয়ে বল্‌ল—"ওগো শুন্‌ছ?" ওগো যে কিছু শুন্‌ছে তা মনে হল না, অন্ততঃ তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না।

এইভাবে সকালটা কাট্‌ল। কোর্টে যাবার পূর্বে চারুর খাবার সময় মীরা নিয়মমতো টেবিলের কাছে এসে বস্‌ল। মোটে তুখানা চপ্‌ দিয়েছে বলে বয়কে ধম্‌কানও হল, কিন্তু চারু কোনো কথা জিজ্ঞেস্‌ করে সাড়া পেল না।

কোর্ট থেকে ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে চারু দেখ্‌ল মীরা একখানা থালায় ফল সাজিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। খুসী হয়ে সে বল্‌ল, "ওগো চল না আজ দুজনে একটু বেড়িয়ে আসি?" মীরা তেমনি তার নীরবতার ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে স্বামী বেচারাকে বেশ একটু কাহিল করে কোনো কাজে চলে গেল। চারু আপনার মনে বল্‌ল, "নাঃ মজালে দেখ্‌ছি।" সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করেও মীরার সঙ্গে সন্ধির কোনো উপায়ই সে খুঁজে পেল না। রাত্রে শোবার সময়ও ঐ রকম ব্যবহার পেয়ে তার নাসিকাধ্বনির অনেকখানিই হ্রাস হয়ে গেল। তারপর আরও চারদিন ঐ একই অবস্থা, বরং একটু খারাপ।

পাঁচদিনের দিন প্রায় মরিয়া হয়েই চারু মীরার হাত চেপে ধরে বল্‌ল—"দোহাই তোমার, একটা কথা বলো। যদি কিছু অন্যায় করে থাকি ত ক্ষমা কর।"

"উঃ লাগে, হাত ছাড়" বলে মীরা পালাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

যাক্‌ কথা বলেছে। আরামের নিশ্বাস ফেলে চারু মীরার চুলের মধ্যে ঝিলি কেটে দিয়ে আদর করে ডাক্‌ল, "মীরি মীরণ।" মীরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌ল—"ঢের হয়েছে আর অত সোহাগ দেখাতে হবে না।"

চারু বল্‌ল, "মীরা আজ এক সপ্তাহ আমার যে কি করে কেটেছে তা যদি জানতে যদি বুঝতে······"

মীরা বল্‌ল, "আর আমার বুঝি বড়ো সুখে কেটেছে?"

চারু তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌ল, "দেখ ত মিছিমিছি আমরা কত কষ্ট পাচ্ছি।"

মীরা চারুর গলা জড়িয়ে বল্‌ল, "বলবে বলো।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চারু বল্‌ল,—"দি ওল্ড ষ্টোরি। ও যে হতে পারে·না মীরা।"

"কেন হতে পারে না? তুমি ত প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমার কাছ থেকে কোনো কথা লুকিয়ে রাখবে না। আর আমিও ত কিছু লুকোই নি। এই যে সেদিন মিস্‌ লাহিড়ী ও মিঃ বোনার্জির ছোটো ভাই লুকিয়ে এনগেজমেণ্ট করল, আমি ছাড়া আর কেউ জান্‌ত না; কিন্তু তোমাকে ত সেইরাত্রেই বলেছি। তারা আমায় কত মানা করেছিল। আমি ভাবলাম তোমাকে বলব তাতে আর দোষ কি?"

চারু একখানা ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়ে বল্‌ল, "তা সত্যি। কিন্তু মীরা, যদি বাইরের লোক ঘুণাক্ষরেও টের পায় আমি তোমায় বলেছি তাহলে কিন্তু.........."

মীরা বল্‌ল "আমি কি এমনি বোকা?"

চারু সোজা হয়ে বসে বল্‌ল—"আচ্ছা শোন তবে—প্রথমে একটা হল পার হয়েই যে ঘরটায় আমি এলাম, সেখানে সাঁইত্রিশ জন লোক। তাদের 'ভাই' বলে। ধপ্‌ধপে সাদা সাটিনের ইজার আর টক্‌টকে লাল জামা পরে ঘরের দুধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আমায় অভ্যর্থনা করল। আর ঐ সাঁইত্রিশ জন ভাই-এর কপালে.........। মীরা ক্ষমা কর, আমি আর পারব না।"

মীরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল, "তা আগে বললেই হত। আমায় আশা দিয়ে নিরাশ করবার দরকার কি ছিল?"

চারু তার হাত দুটি ধরে বলল, "রাগ করো না মীরা, কি জান, একটা মস্ত বড়ো প্রতিজ্ঞা করে ভাঙছি বলে মনটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।"

মীরা বল্‌ল "আমার কাছে যদি কোনো লুকান কথা বল তাহলে সেটা মোটেই দোষের হয় না। তুমি আর আমি কি এক নই?"

চারু এবার অনেকটা সংযত হয়ে বলতে লাগ্‌ল, "সেই সাঁইত্রিশ জন ভাইয়ের কপালের বাঁদিকে একটা করে রূপোর তারা ঝুলছে—আর—।" চারুর কথা শেষ হবার পূর্বেই মীরা বলে উঠল,—"তুমি কি বলতে চাও মিঃ বোনার্জি তাঁর কালো পিপেটির মতো বপুখানি সাদা আর লাল সাটিনে ঢেকে কপালে তারা ঝুলিয়ে.........?" বলেই সে চীৎকার করে হেসে উঠ্‌ল।

চারু খুব গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—"মীরা তুমি এত বড়ো একটা গুরুতর কথা নিয়ে হাস্‌ছ দেখে আমার যে কি মনে হচ্ছে তা তোমায় বোঝাতে পারি না। লজ-এর সাংকেতিক কথা নিয়ে এমন করে হাসাটা অন্ততঃ তোমার পক্ষে শোভা পায় না।"

"না, না, আর হাস্‌ব না। তুমি বল।—কিন্তু বোনার্জির গায়ে লাল জামা!" বলে মুখে কাপড় গুঁজে মীরা হাসি থামাতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

"তারপর সকলে একসঙ্গে ডানহাতের একটা আঙুল ওপরকার ঠোঁটের ওপর রাখল।" মীরা বল্‌ল, "ওঃ ওটা তোমাদের মেসনিক সাইন্; আমি কিন্তু বাবার সঙ্গে মিঃ গ্রিমস্বর বাড়ি টিপার্টিতে গিয়ে দু-একজন সাহেবকে

ওরকম করতে দেখেছি। তখন মনে করেছিলাম হয়ত ওদের গোঁপ কামাতে গিয়ে কেটে গেছে, তাই হাত বুলাচ্ছে।"

চারু বল্‌ল—"পাগল কোথাকার, তা নয়! ওর মানে একজন মেসন্‌ আর একজন মেসন্‌কে লুকিয়ে নমস্কার করছে, বুঝলে; তারপর আমাকে লজ-এর সেই বিশেষ ঘরটিতে নিয়ে গেল। মীরা……।"

"লক্ষ্মীটি তোমার দুটি পায়ে পড়ি যা বল্‌ছিলে তা বলে ফেল।—বল্‌বে না? লক্ষ্মীটি।"

"সেই ঘরের দেওয়ালের ওপর সৌরমণ্ডল আঁকা ছিল। তার চারধারে অতি সূক্ষ্ম একটি আলোক-রেখা-বেষ্টনীও আঁকা ছিল। এই রেখা-বেষ্টনী ধরেই সৌরমণ্ডল বছরের পর বছর নিজেদের গন্তব্য পথে চল্‌তে থাকে। সেই বেষ্টনীটিকে দেখতে পাবার একটি সহজ উপায় তাঁরা আমায় বলে দিলেন। ঘরের ভিতর বিনা আলোয় সেটিকে দেখ্‌তে পেলে তবে সাঁইত্রিশ মাসের পর শুধু চোখে আকাশের গায়ের রেখাটিও দেখ্‌তে পাব। অন্য বিষয়ের উপদেশ পরের সপ্তায় পাব। আর কিছু জানতে পারিনি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে।"—

মীরা চারুর মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্‌ল, "থাক প্রতিজ্ঞার কথা আর বল্‌তে হবে না, অনেক রাত হয়েছে শোবে চল।"

"কিন্তু মীরা প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না বলে আমার বুকের ভিতরটা যা করছে।"

মীরা মনে মনে বল্‌ল "মিসেস্‌ বোনার্জি, চাটার্জি, মজুমদার, এরা কেউ জানে না! শুধু আমি জানি! ওঃ আমার বুকের ভিতরটা যা করছে।"

সকাল বেলাই মিসেস্‌ মজুমদার চিঠি পেলেন,—মীরা লিখেছে:—"ভাই প্রতিমা, তুমি আজ অতি অবিশ্যি দুপুরে আমার বাড়ি এসো। বড়ো গোপনীয়, বড়ো দরকারী কথা আছে। নিশ্চয় নিশ্চয় এসো।"

ঠিক বেলা সাড়ে বারোটার সময় মিসেস্‌ মজুমদারের গাড়ি চারুদের ফটকে ঢুক্‌ল। মীরা একরকম ছুটে গিয়েই প্রতিমার ঘাড়ে পড়ে বল্‌ল—"জান ভাই প্রতিমা?" তারপর দশ মিনিটের মধ্যেই মীরার গোপনীয় কথা প্রতিমাকে সব বলা হয়ে গেল। দুজনেই একমত হয়ে রায় দিল,—"কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, ও লজটজের সিক্রেটের কোনো ভ্যালুই নেই।—কিন্তু বোনার্জির গায়ে লাল

জামা, আর কপালে তারা, ভারি ইণ্টারেষ্টিং।” দুজনেই খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল। প্রতিমা বল্‌ল, “তাহলে আসি ভাই, কাজ আছে।” মীরা তাকে বিদায় দিয়ে বল্‌ল, “দেখ ভাই কাকেও বলো না যেন, তাহলে ওঁর বড়ো অপমান হবে।” জিভ কেটে প্রতিমা বল্‌ল—“তাও কি হয়?”

গাড়িতে উঠেই প্রতিমা কোচ্‌ম্যান্‌কে বল্‌ল,—“চ্যাটার্জি সাবকা কোঠি।” বেশি নয়—ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে কতকগুলি বিখ্যাত বঙ্গনারী মেসনিক্ লজ্ সম্বন্ধে বিনা আয়াসেই অনেক কথা জেনে ফেল্‌লেন।

একদিন চারু কোর্ট থেকে ফিরে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্‌ল,—“মীরা!” ঐ মীরা কথাটা এমন ভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, যেন ঐ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার সুখ দুঃখ আশা ভরসা সমস্তই শেষ হয়ে গেল।

ভয় পেয়ে মীরা বল্‌ল, “কি হয়েছে? অমন করছ কেন?” চারু তেমনি ভাবেই বল্‌ল, “মীরা তুমি আমার স্ত্রী?” তারপর নির্জীবের মতো একটা চেয়ারে বসে পড়ে দুই হাতে মাথা টিপে ধরল। মীরা কাতর হয়ে বল্‌ল, “কি হয়েছে বল্‌বে না?” চারু খুব জোরে নিশ্বাস টেনে সেটা ছাড়তে ছাড়তে বল্‌ল,—“বলবার আর কিছুই নেই মীরা।”

“ওগো দোহাই তোমার, সব খুলে বল। কি হয়েছে?”

“একটু একলা থাক্‌তে চাই মীরা। আহা আজকের এই রাত্রি যদি অনন্ত রাত্রি হয়, দিনের আলো যদি আর না ফোটে, তাহলে আমার এই কালো মুখ এই অন্ধকারের মধ্যে রেখে হয়ত একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি। কিন্তু তা হবে কি? ওঃ! ঠিক কাল ৬টার সময় আবার সূর্য উঠ্‌বে, আমার মুখের ওপর দিনের আলো পড়বে। আর লক্ষ লক্ষ লোক আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌বে—ঐ সেই বিশ্বাসঘাতক। ওঃ মীরা!”

স্বামীর মুখের ওপর মুখ রেখে মীরা বল্‌ল, “তোমার পায়ে পড়ি, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।”

চারু তাকে দুই হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে হঠাৎ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌ল—“কি হয়েছে? জান না কিছু? কতশত বছর ধরে মানুষ যে কথাটি প্রাণপণে নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই কথাটি সেই পবিত্র কথাটি, আজ এই বিংশ শতাব্দীর একজন নব্য বাঙালী ব্যারিষ্টারের মুখ দিয়ে রাষ্ট্র হয়ে গেল! তার আর স্ত্রী............!”

"কিন্তু আমি ত কেবল প্রতিমাকে বলেছিলাম।"

"প্রতিমাকে বলেছিলে? তুমি নিজে যে কথা মনে চেপে রাখ্‌তে পার না, কি ক'রে আশা কর অন্যে সেই কথাটা চেপে রাখ্‌বে মীরা?" মীরা চারুর পা দুটি জড়িয়ে ধরে বল্‌ল, "চল আমাকে তোমাদের লজ-এ নিয়ে। আমি সবাইর সাম্‌নে আমার দোষ স্বীকার করে নেব।"

"এবং তোমার স্বামীর মুখে চুণকালি আর একটু বেশি করে মাখিয়ে দেবে। মীরা, তোমার স্বামীর গোপনকথার ওপর তোমার অধিকার আছে একদিন বলেছিলে, কিন্তু স্বামীর মান ইজ্জৎ তোমারও মান ইজ্জৎ তা কি একবারও ভেবেছিলে?"

মীরা আকুল হয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। চারু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "কেঁদে কোনো লাভ নেই মীরা! অবশ্য এ কথাটা লজ-এর মেম্বররা সকলেই অস্বীকার করবে। তবে.........।"

"আমাকে শাস্তি দাও। ওগো আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমায় মেরে ফেল।"

কেঁদে কেঁদে মীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। চারু আস্তে আস্তে ড্রেসিং রুমে ঢুকে আলো জ্বেলে আরসিতে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে কুটিপাটি হতে লাগল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বল্‌ল—"ওয়েল প্লেড ওল্ড বয়। আমার দেখ্‌ছি ব্যারিষ্টার না হয়ে এ্যাকটর হওয়াই উচিত ছিল।" তারপর অনেক-দিন পরে দিব্য আরামে আর একবার নাক ডাকার শব্দে ঘরটিকে কাঁপিয়ে তুল্‌ল।

সকালে চা খাওয়ার পর চারু বল্‌ল, "মীরা, তুমি একটু বোস। আমি লজ্‌-এর গ্রাণ্ড মাষ্টারের কাছে ফোন করে আমার দোষ স্বীকার করি।" আফিস রুমে ঢুকে রিসিভারটা কানে তুলে নিয়ে হাঁক দিল—"নাইন্‌ নট্‌ নট্‌ নাইন্‌ প্লিজ।" তারপরই "হ্যালো ডাট" "হ্যালো মজুমদার" বলে দুজনে সম্ভাষণ করার পর মজুমদার হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল—"বলি ব্যাপারটা কি হে? তোমার স্ত্রীকে কি সব ছাইভস্ম বলেছ? তিনি আবার তাই আমার স্ত্রীকে বলেছেন। সে ত আজ দুদিন খাওয়া দাওয়া ছেড়ে কেবল এর তার বাড়ি করে বেড়াচ্ছে। কাল দুপুরে তাকে গাড়ি দিইনি বলে একখানা ঘড়্‌ঘড়ে ছেকড়া গাড়ি করে এই রোদে বেরিয়ে পড়্‌ল। তোমার কথা জনকতক

সাহেব মেসন্‌কে বলেছিলাম, তারাও তোমার খুব প্রশংসা করলে। বলে, এত সহজে মিঃ ভাট্ নিষ্কৃতি পেলেন। আমাদের হিংসে হচ্ছে। আমাদের আজও ভুগ্‌তে হচ্ছে।"

চারু বল্‌ল,—"কি করি বল ভাই। নাচার হয়েই ওটা করতে হয়েছে। যা চুপ মন্ত্র ছেড়েছিল! বাপ! আমার ত দম বন্ধ হবার জোগাড়। শেষে এই মত্‌লব মাথায় আসে। তাকে জানিয়েছি আমার দ্বারা যে লজ্-এর সিক্রেট্ ফাঁস হয়ে গেছে তা সকলেই জান্‌তে পেরেছে। শুনে ভয়ে ত বেচারী আধমরা। খুব এক চোট্ চান্‌কে নিয়েছি। ইন্‌কুইজিটিভনেস ডিজিজের এ্যান্‌টিডোট্‌টা ধরেছে ভালো।"

মীরাকে এসে চারু বল্‌ল, "ওরা আমার দোষ ক্ষমা করতে রাজি হয়েছে। তবে কিছু পেনালটি দিতে হবে এই যা। তা তুমি কিছু ভেবো না মীরা।"

মীরা তার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর মুখখানা একবার ভালো করে দেখে নিল।

"বঙ্গবাণী" : ভাদ্র ১৩৩৩

কিন্নরদল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাড়াটায় ছ'সাত ঘর ব্রাহ্মণের বাস মোট। সকলের অবস্থাই খারাপ। পরস্পরের কাছে পরস্পরের ধারধোর করে এরা দিন গুজরান করে। অবিশ্যি কেউ কাউকে ঠকাতে পারে না, কারণ সবাই বেশ হুঁসিয়ার। গরীব বলেই এরা বেশী কুচুটে ও হিংসুক, কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না, বা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না!

পূর্বেই বলেছি, সকলের অবস্থা খারাপ, এবং খানিকটা তার দরুণ, খানিকটা অন্য কারণে সকলের চেহারাও খারাপ। কিশোরী মেয়েদেরও তেমন লালিত্য নেই মুখে, ছোট ছোট ছেলেরা এমন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন

"কিন্তু আমি ত কেবল প্রতিমাকে বলেছিলাম।"

"প্রতিমাকে বলেছিলে? তুমি নিজে যে কথা মনে চেপে রাখ্‌তে পার না, কি ক'রে আশা কর অন্যে সেই কথাটা চেপে রাখ্‌বে মীরা?" মীরা চারুর পা দুটি জড়িয়ে ধরে বল্‌ল, "চল আমাকে তোমাদের লজ-এ নিয়ে। আমি সবাইর সাম্‌নে আমার দোষ স্বীকার করে নেব।"

"এবং তোমার স্বামীর মুখে চুণকালি আর একটু বেশি করে মাখিয়ে দেবে। মীরা, তোমার স্বামীর গোপনকথার ওপর তোমার অধিকার আছে একদিন বলেছিলে, কিন্তু স্বামীর মান ইজ্জৎ তোমারও মান ইজ্জৎ তা কি একবারও ভেবেছিলে?"

মীরা আকুল হয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। চারু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "কেঁদে কোনো লাভ নেই মীরা! অবশ্য এ কথাটা লজ-এর মেম্বররা সকলেই অস্বীকার করবে। তবে.........।"

"আমাকে শাস্তি দাও। ওগো আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমায় মেরে ফেল।"

কেঁদে কেঁদে মীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। চারু আস্তে আস্তে ড্রেসিং রুমে ঢুকে আলো জেলে আরসিতে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে কুটিপাটি হতে লাগল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বল্‌ল—"ওয়েল প্লেড ওল্ড বয়। আমার দেখ্‌ছি ব্যারিষ্টার না হয়ে এ্যাকটর হওয়াই উচিত ছিল।" তারপর অনেক-দিন পরে দিব্য আরামে আর একবার নাক ডাকার শব্দে ঘরটিকে কাঁপিয়ে তুল্‌ল।

সকালে চা খাওয়ার পর চারু বল্‌ল, "মীরা, তুমি একটু বোস। আমি লজ্‌-এর গ্রাণ্ড মাষ্টারের কাছে ফোন করে আমার দোষ স্বীকার করি।" আফিস রুমে ঢুকে রিসিভারটা কানে তুলে নিয়ে হাঁক দিল—"নাইন্‌ নট্‌ নট্‌ নাইন্‌ প্লিজ।" তারপরই "হ্যালো ডাট" "হ্যালো মজুমদার" বলে দুজনে সম্ভাষণ করার পর মজুমদার হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল—"বলি ব্যাপারটা কি হে? তোমার স্ত্রীকে কি সব ছাইভস্ম বলেছ? তিনি আবার তাই আমার স্ত্রীকে বলেছেন। সে ত আজ দুদিন খাওয়া দাওয়া ছেড়ে কেবল এর তার বাড়ি করে বেড়াচ্ছে। কাল দুপুরে তাকে গাড়ি দিইনি বলে একখানা ঘড়্‌ঘড়ে ছেকড়া গাড়ি করে এই রোদে বেরিয়ে পড়্‌ল। তোমার কথা জনকতক

সাহেব মেসন্‌কে বলেছিলাম, তারাও তোমার খুব প্রশংসা করলে। বলে, এত সহজে মিঃ ভাট্ নিষ্কৃতি পেলেন। আমাদের হিংসে হচ্ছে। আমাদের আজও ভুগ্‌তে হচ্ছে।"

চারু বল্‌ল,—"কি করি বল ভাই। নাচার হয়েই ওটা করতে হয়েছে। যা চুপ মন্ত্র ছেড়েছিল! বাপ! আমার ত দম বন্ধ হবার জোগাড়। শেষে এই মত্‌লব মাথায় আসে। তাকে জানিয়েছি আমার দ্বারা যে লজ্-এর সিক্রেট্ ফাঁস হয়ে গেছে তা সকলেই জান্‌তে পেরেছে। শুনে ভয়ে ত বেচারী আধমরা। খুব এক চোট্ চান্‌কে নিয়েছি। ইন্‌কুইজিটিভনেস ডিজিজের এ্যান্‌টিডোট্‌টা ধরেছে ভালো।"

মীরাকে এসে চারু বল্‌ল, "ওরা আমার দোষ ক্ষমা করতে রাজি হয়েছে। তবে কিছু পেনালটি দিতে হবে এই যা। তা তুমি কিছু ভেবো না মীরা।"

মীরা তার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর মুখখানা একবার ভালো করে দেখে নিল।

"বঙ্গবাণী" : ভাদ্র ১৩৩৩

কি ন্ন র দ ল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাড়াটায় ছ'সাত ঘর ব্রাহ্মণের বাস মোট। সকলের অবস্থাই খারাপ। পরস্পরের কাছে পরস্পরের ধারধোর করে এরা দিন গুজরান করে। অবিশ্যি কেউ কাউকে ঠকাতে পারে না, কারণ সবাই বেশ হুঁসিয়ার। গরীব বলেই এরা বেশী কুচুটে ও হিংসুক, কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না, বা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না!

পূর্বেই বলেছি, সকলের অবস্থা খারাপ, এবং খানিকটা তার দরুণ, খানিকটা অন্য কারণে সকলের চেহারাও খারাপ। কিশোরী মেয়েদেরও তেমন লালিত্য নেই মুখে, ছোট ছোট ছেলেরা এমন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন

থাকে এবং এমন পাকা পাকা কথা বলে যে তাদের আর শিশু বা বালক বলে মনে হয় না। কাব্যে বা উপন্যাসে যে শৈশবকালের কতই প্রশস্তি পাঠ করা যায়, মনে হয় সে সব এদের জন্যে নয়, এরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একেবারে প্রবীণত্বে পা দিয়েছে।

পাড়ায় একঘর গৃহস্থ আছে, তারা এখানে থাকে না, তাদের কোঠাবাড়িটা চাবি-দেওয়া পড়ে আছে আজ দশ-বারো বছর। এদের মস্ত বড় সংসার ছিল, এখন প্রায় সবই মরে-হেজে গিয়ে প্রায় পাঁচটি প্রাণীতে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির বড় ছেলে পশ্চিমে চাকুরি করে, মেজ ছেলে কলেজে পড়ে কলকাতায়, ছোট ছেলেটি জন্মাবধি কালা ও বোবা—পিশিমার কাছে থেকে অন্ধ-বধির বিদ্যালয়ে পড়ে। বড় ছেলে বিবাহ করেনি, যদিও তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হয়েছে ; সে নাকি বিবাহের বিরোধী, শোনা যাচ্ছে যে এমনিভাবেই জীবন কাটাবে।

পাড়ার মধ্যে এরাই শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থার মানুষ। সেজন্যে এদের কেউ ভালো চোখে দেখে না, মনে মনে সকলেই এদের হিংসে করে এবং বড় ছেলে যে বিয়ে করবে না বলছে, সে সংবাদে পাড়ার সবাই পরম সন্তুষ্ট। যখন সবাই ছোট ও গরীব, তখন একঘর লোক কেন এত বাড় বাড়বে? বড় ছেলে বিয়ে করলেই ছেলেমেয়ে হয়ে জাজ্বল্যমান সংসার হবে দুদিন পরে, সে কেউ সহ্য করতে পারবে না। মেজ ছেলে মোটে কলেজে পড়ছে, এখন সাপ হয় কি ব্যাঙ হয় তার কিছু ঠিক নেই, তার বিষয়ে দুশ্চিন্তার এখনও কারণ ঘটেনি, তার বয়েসও বেশী নয়।

মজুমদার-বাড়িতে ভাঙা রোয়াকে দুপুরে পাড়ার মেয়েদের মেয়ে-গজালি হয়। তাতে রায়-গিন্নী, মুখুজ্জে-গিন্নী, বোস-গিন্নী, চক্কত্তি-গিন্নী প্রভৃতি তো থাকেনই, পাড়ার অল্পবয়সী বৌয়েরা ও মেয়েরাও থাকে। সাধারণত যে সব ধরনের চর্চা এ মজলিসে হয়ে থাকে, তা শুনলে নারীজাতি সম্বন্ধে লিখিত নানা সরস প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনার সত্যতার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ যাঁর উপস্থিত না হবে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন খুব বড় ধরনের অপ্‌টিমিস্ট।

আজ দুপুরে যে বৈঠক বসেছে, তাতে আলোচিত বিষয়গুলি থেকে মোটামুটি প্রতিদিনের আলোচনা ও বিতর্কের প্রকৃতি অনুমান করা যেতে পারে।

বোস-গিন্নী বলছিলেন : আর বাপু, দিচ্ছি তো রোজই, আমার গাছের

কাঁঠাল খেয়েই তো মানুষ। আমাদের কাঁঠাল যখন পাড়ানো হয়, ছেলে-মেয়েগুলো হ্যাংলার মতো তলায় দাঁড়িয়ে থাকে—ঘেয়ো কি ভুয়ো এক-আধখানা যদি থাকে তো বলি, যা নিয়ে যা। তোদের নেই, যা খেগে যা। তা কি পোড়ার মুখে কোনোদিন সুবাক্যি আছে? ওমা, আজ আমার মেয়ে দুটো নেবু তুলতে গিয়েছে ডোবার ধারের গাছের, তো বলে কি না রোজ রোজ নেবু তুলতে আসে, যেন সরকারী গাছ পড়ে রয়েছে আর কি—চব্বিশ ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দিলে মণ্টুর মা। আচ্ছা বল তো তোমরাই—

মণ্টুর মা—যাঁকে উদ্দেশ করে একথা বলা হচ্ছিল, তিনি এদের এই মজলিসে কেবল আজই অনুপস্থিত আছেন, নইলে রোজই এসে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে সবাই তাঁর চালচলন, ধরনধারণ, রীতিনীতির নানারূপ সমালোচনা করলে।

প্রিয় মুখুজ্জের মেয়ে শান্তি—ষোল-সতেরো বছরের কুমারী—তার মায়ের বয়সী মণ্টুর মা-র সম্বন্ধে অমনি বলে বসল, ওঃ, সে কথা আর বোলো না খুড়িমা, কি ব্যাপক মেয়েমানুষ ঐ মণ্টুর মা। ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখেছি, অমন লঙ্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি। ক্ষুরে নমস্কার, বাবা-বাবা!

ছোট মেয়ের ঐ জ্যাঠামি কথার জন্যে তাকে কেউ বকলে না বা শাসন করলে না, বরং কথাটা সকলেই উপভোগ করলে।

তারপর কথাটার স্রোত আরও কতদূর গড়াত বলা যায় না এমন সময় রায়বাড়ির বড়বৌ হঠাৎ মনে-পড়ার ভঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ, একটা মজার কথা শোননি বুঝি। শ্রীপতি যে বিয়ে করেছে! বট্‌ঠাকুরের কাছে চিঠি এসেছে, শ্রীপতির মামা লিখেছে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, শ্রীপতি বিয়ে করেছে!

তারপর সকলেই একসঙ্গে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগল।

—কোথায়, কোথায়?

—কবে চিঠি এল?

—তবে যে শুনলাম শ্রীপতি বিয়ে করবে না বলেছে!

শ্রীপতির বিয়ের খবরে অনেকেই যেন একটু দমে গেল। খবরটা তেমন শুভ নয়। কারো উন্নতির সংবাদ এদের পক্ষে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা

অসম্ভব। তাদের যখন উন্নতি হল না তখন অপরের উন্নতি হবে কেন? কিন্তু এর পরেই রায়-বৌ মুখ টিপে হেসে আস্তে আস্তে বললেন, বৌটি নাকি বামুনের মেয়ে নয়।—সকলে খাড়া হয়ে সটান উঠে বসল, তাদের মনমরা ভাবটা এক মুহূর্তে গেল কেটে। একটা বেশ সরস ও মুখরোচক পরনিন্দা ও ঘোঁটের আভাস এরা পেলে রায়বৌয়ের চাপা ঠোঁটের হাসি থেকে।

শান্তি উৎসুক চোখে চেয়ে হাসিমুখে বললে, ভেতরে তাহলে অনেকখানি কথা আছে!

বোস-গিন্নী বললেন, তাই বল! নইলে এমনি কোথা কিছু নয় শ্রীপতি বিয়ে করলে এ কি কখনো হয়! কি জাত মেয়েটা? হিঁদু তো?

অর্থাৎ তা হলে ঝগড়টা আরও জমে।

রায়-বৌ বল্লেন, হিঁদুই—মেয়েটা বদ্দির বামুন।

এদেশে বৈদ্যকে বলে থাকে 'বদ্দির বামুন'—এ অঞ্চলের ত্রিসীমানায় বৈদ্যের বাস না থাকায় বৈদ্যজাতির সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারো বিশ্বাস ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্যের সামাজিক স্থান, তারা এক প্রকারের নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ, তার চেয়ে নিচু নয়—আবার কারো বিশ্বাস তাদের স্থান সমাজের নিম্নতর ধাপের দিকে।

শান্তি বললে, বৌয়ের বয়েস কত?

—ওঃ, তা অনেক। শুনেছি চব্বিশ-পঁচিশ—

সকলে সমস্বরে আবার একটা বিস্ময়ের রোল তুললে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত মেয়ে আইবুড়ো থাকে ঘরে! এ আবার কোথাকার ছোট জাত! রামো, ছিঃ—

শান্তির মা বললেন, তা হলে মেয়ে আর নয়, মাগী বল! পাঁড় শসা—বাপ-মা বুঝি ঘরে বীজ রেখেছিল!

কে একজন মুখ টিপে হেসে বললেন, বিধবা না তো?

চকত্তি-গিন্নী বললেন, আগের পক্ষের ছেলে-মেয়ে কিছু আছে নাকি মাগীর!

একথায় শান্তিই আগে মুখে আঁচল দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল—তারপর বাকি সকলে তার সঙ্গে যোগ দিলে। হ্যাঁ, এটা একটা নতুন ও ভারী মজার খবর বটে। মেয়ে-গজালির কিছুদিনের মতো খোরাক সংগ্রহ হল। আমচুরি-কাঁঠালচুরির গল্প একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল।

ঠিক পরের দিনই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল। শ্রীপতির মেজো ভাই উমাপতি গাঁয়ে এসে বাড়ির চাবি খুলে লোক লাগিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করতে লাগল। তার দাদা বৌদিদিকে নিয়ে শিগগির আসবে এবং কিছুদিন নাকি গাঁয়েই বাস করবে। বৌদিদি পাড়াগাঁ কখনো দেখেন নি—গ্রামে আসবার তাঁর খুব আগ্রহ। তার দাদাও কলকাতায় বদলি হবার চেষ্টা করছে।

মেয়ে-মজলিসে সবাই তো অবাক। শ্রীপতি কোন মুখে অজাতের বউ নিয়ে গাঁয়ে এসে উঠবে! মানুষের একটা লজ্জা-সরমও তো থাকে, করেই ফেলেছিস না হয় একটা অকাজ! এ সব কি খিরিষ্টানি কাণ্ডকারখানা, কালে কালে হল কি! আর সে খিঙ্গি মাগীটারই বা কি ভরসা! যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-পাড়ায় বিয়ের বৌ সেজে সে কোন সাহসেই বা আসবে!

শ্রীপতি অবিশ্যি বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়িতে আসার বিষয়ে এঁদের মত জিজ্ঞাসা করে নি। একদিন একখানা নৌকা এসে গ্রামের ঘাটে দুপুরের সময় লাগল এবং নৌকা থেকে নামলে শ্রীপতি, তার নব বিবাহিতা বধূ, একটি ছোকরা চাকর ও দুটি ট্রাঙ্ক ও একটা বড় বিছানার মোট, একটা ঝুড়ি-বোঝাই টুকিটাকি জিনিস। ঘাটে দু-একজন যারা অত বেলায় স্নান করছিল তারা তখুনি পাড়ার মধ্যে গিয়ে খবরটা সবাইকে বললে। তখন কিন্তু কেউ এল না, অত বেলায় এখন শ্রীপতিদের বাড়ি গেলে তাদের খেতে বলতে হয়। অসময়ে এখন এসে তারা রান্নাবান্না চড়িয়ে খাবে, সেটা প্রতিবেশী হয়ে হতে দেওয়া কর্তব্য নয় কিন্তু সে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করবার চেয়ে এখন না যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

কিন্তু রাসু চক্কত্তি আর প্রিয় মুখুজ্যের বাড়ির মেয়েরা অত সহজে রেহাই পেলেন না। শ্রীপতি নিজে গিয়ে একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে ঢুকে বললে, ও-পিশিমা, ও-বৌদি, আপনারা আপনাদের বৌকে হাত ধরে ঘরে না তুললে কে আর তুলবে? আসুন সবাই।

বাধ্য হয়ে কাছাকাছির দু'তিন বাড়ির মেয়েরা শাঁক হাতে, জলের ঘটি হাতে নতুন বৌকে ঘরে তুলতে এলেন—খানিকটা চক্ষুলজ্জায়, খানিকটা কৌতূহলে। মজা দেখবার প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই আছে। ছোটবড় ছেলে-মেয়েও এল অনেকে, শান্তি এল, কমলা এল, সরলা এল।

শ্রীপতিদের বাড়ির উঠোনে লিচুতলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূর থেকে মেয়েটির ধপধপে ফর্সা গায়ের রঙ ও পরনের দামী সিল্কের শাড়ি দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। সামনে এসে আরও বিস্মিত হবার কারণ ওদের ঘটল মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখে। কি ডাগর-ডাগর চোখ! কি সুকুমার লাবণ্য সারা অঙ্গে! সর্বোপরি মুখশ্রী—অমন ধরনের সুন্দর মুখ এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনো দেখেনি।

সকলে আশা করেছিল গিয়ে দেখবে কালোকোলো একটা মোটামতো মাগী আধ-ঘোমটা দিয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখলে এক নম্রমুখী সুন্দরী তরুণী মূর্তি…। মুখখানি এত সুকুমার যে মনে হয় ষোল-সতেরো বছরের বালিকা।

বিকেলে ওপাড়ার নিতাই মুখুজ্জের বৌ ঘাটের পথে চক্কত্তি-গিন্নীকে জিগ্যেস করলেন:

কি দিদি, শ্রীপতির বৌ দেখলে নাকি? কেমন দেখতে?

চক্কত্তি-গিন্নী বললেন, না, দেখতে বেশ ভালোই—

চক্কত্তি গিন্নীর সঙ্গে শান্তি ছিল, সে হাজার হোক ছেলেমানুষ, ভালো লাগলে পরের প্রশংসার বেলায় সে এখনও কার্পণ্য করতে শেখেনি, সে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল, চমৎকার, খুড়িমা একবার গিয়ে দেখে আসবেন, সত্যিই অদ্ভুত ধরনের ভালো।

নিতাই মুখুয্যের বৌ পরের এতখানি প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না—বুঝতে পারলেন না শান্তি কথাটা ব্যঙ্গের স্বরে বলছে, না, সত্যিই বলছে। বললেন, কি রকম ভালো?

এবার চক্কত্তি-গিন্নী নিজেই বললেন, না বৌ, যা ভেবেছিলাম, তা নয়। বৌটি সত্যিই দেখতে ভালো। আর কেনই বা হবে না বল, শহরের মেয়ে, দিনরাত সাবান ঘসছে, পাউডার ঘসছে, তোমার আমার মতো রাঁধতে হত বাসন মাজতে হত তো দেখতাম চেহারার কত জলুস বজায় থাকে।

এই বয়সে তো দূরের কথা, তাঁর বিগত-যৌবন দিনেও অজস্র পাউডার ও সাবান ঘসলে যে কখনো তিনি শ্রীপতির বৌয়ের পায়ের নখের কাছেও দাঁড়াতে পারতেন না—চক্কত্তি-গিন্নী সম্বন্ধে শান্তির এ কথা মনে হল। কিন্তু চুপ করে রইল সে।

বিকেলে এপাড়ার ওপাড়ার মেয়েরা দলে দলে বৌ দেখতে এল। অনেকেই বললে, এমন রূপসী মেয়ে তারা কখনো দেখেনি। কেবল হরিচরণ রায়ের স্ত্রী বললেন, আর-বছর তারকেশ্বরে যাবার সময় ব্যাণ্ডেল স্টেশনে তিনি একটি বৌ দেখেছিলেন, সেটি এর চেয়েও রূপসী।

মেয়ে-মজলিসে পরদিন আলোচনার একমাত্র বিষয় দাঁড়াল, শ্রীপতির বৌ। দেখা গেল, তার রূপ সম্বন্ধে দুমত নেই সভ্যাদের মধ্যে, কিন্তু তার চরিত্র সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য অবাধে চলছে।

—ধরনধারণ যেন কেমন কেমন—অত সাজগোজ কেন রে বাপু?

—ভালো ঘরের মেয়ে নয়। দেখলেই বোঝা যায়—

—বাসন মাজতে হলে ও-হাত আর বেশীদিন অত সাদাও থাকবে না, নরমও থাকবে না—ঠ্যালা বুঝবেন পাড়াগাঁয়ের। গলায় নেকলেস ঝুলুতে আমরাও জানি—

—বেশ একটু ঠ্যাকারে। পাড়াগাঁয়ের মাটিতে যেন গুমরে পা পড়ছে না, এমনি ভাব। বামুনের ঘরে বিয়ে হয়ে ভাবছে যেন কি—

—তা তো হবেই, বদ্দির বামুনের মেয়ে, বামুনের ঘরে এয়েছে, ওর সাত পুরুষের সৌভাগ্যি না?

নববধূর স্বপক্ষে বললে কেবল শান্তি ও কমলা। শান্তি ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, তোমরা কারো ভালো দেখতে পার না বাপু। কেন ওসব বলবে একজন ভদ্দরলোকের মেয়ের সম্বন্ধে? কাল বিকেলে আমি গিয়ে কতক্ষণ ছিলাম নতুন বৌয়ের কাছে। কোনো ঠ্যাকার নেই, অংখার নেই, চমৎকার মেয়ে!

কমলা বললে, আমাদের উঠতে দেয় না কিছুতেই—কত গল্প করলে, খাবার খেতে দিলে, চা করলে—আর খুব সাজগোজ কি করে? সাদা-সিদে শাড়ি-সেমিজ পরে তো ছিল। তবে খুব ফর্সা কাপড়-চোপড়—ময়লা একেবারে দু-চোখে দেখতে পারে না—

শান্তি বললে, ঘরগুলো এরই মধ্যে কি চমৎকার সাজিয়েছে! আয়না, পিকচার, দোপাটিফুলের তোড়া বেঁধে ফুলদানিতে রেখে দিয়েছে—শ্রীপতিদার বাপের জন্মে কখনো অমন সাজানো ঘরদোরে বাস করেনি—ভারি কিটফাট গোছালো বৌটি—

দিন দুই পরে ডোবার ঘাটে নববধূকে একরাশ বাসন নিয়ে নামতে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। চারিদিকে বনে-ঘেরা ঝুপসি আধ-অন্ধকার ডোবাটা যেন মেয়েটির স্নিগ্ধ রূপের প্রভায় এক মুহূর্তে আলো হয়ে ওঠে, একথা যারা তখন ডোবার অন্যান্য ঘাটে ছিল, সবাই মনে মনে স্বীকার করলে। দৃশ্যটাও যেন অভিনব ঠেকল সকলের কাছে। এমন একটা পচা এঁদো জঙ্গলে-ভরা পাড়াগেঁয়ে ডোবার ঘাটে সাধারণত কালোকোলো, আধ-ময়লা শাড়িপরা শ্রীহীনা ঝি-বৌ বা ত্রিকালোত্তীর্ণা প্রৌঢ়া বিধবাদের গামছা-পরিহিত মূর্তিই দেখা যায় বা দেখার আশা করা যায়—সেখানে এমন একটি আধুনিক ছাঁদে খোঁপা-বাঁধা, ফর্সা শাড়ি-ব্লাউজ-পরা, রূপকথার রাজকুমারীর মতো রূপসী, নব-যৌবনা বধূ সজনেতলার ঘাটে বসে ছাই দিয়ে নিটোল সুগৌর হাতে বাসন মাজছে, এ দৃশ্যটা খাপ খায় না। সকলের কাছে এটা খাপছাড়া বলে মনে হল। প্রৌঢ়ারাও ভেবে দেখলেন গত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি এই ক্ষুদ্র ডোবাটার ইতিহাসে।

রায়-পাড়ার একটি প্রৌঢ়া বললেন, আহা, বৌ তো নয়, যেন পিরতিমে—কিন্তু অত রূপ নিয়ে কি এই ডোবায় নামে বাসন মাজতে! না ও-হাতে কখনো ছাই দিয়ে বাসন মাজা অভ্যেস আছে! হাত দেখেই বুঝছি।

তারপর থেকে দেখা গেল ঘর-সংসারের যা কিছু শ্রীপতির বৌ সব নিজের হাতে করছে। ইতিমধ্যে শ্রীপতির কলকাতায় বদলি হবার খবর আসাতে সে চলে গেল বাড়ি থেকে।

পাড়ার মেয়েদের মধ্যে শান্তি ও কমলা শ্রীপতির বৌয়ের বড় ন্যাওটা হয়ে পড়ল। সকাল নেই বিকেল নেই, সব সময়েই দেখা যায় শান্তি ও কমলা বসে আছে ওখানে।

পাড়াগাঁয়ের গরীব-ঘরের মেয়ে, অমন আদর করে কেউ কখনো রোজ রোজ ওদের লুচি-হালুয়া খেতে দেয়নি।

একদিন কমলা বললে, বৌদিদি, তোমার ঘরে কাপড়মোড়া ওটা কি?

শ্রীপতির বৌ বললে, ওটা এসরাজ—

—বাজাতে জান, বৌদি?

—একটুখানি অমনি জানি ভাই, কিন্তু এ্যাদ্দিন ওকে বার পর্যন্ত করিনি কেন জান, গাঁয়ে-ঘরে কে কি হয়তো মনে করবে।

শান্তি বললে, নিজের বাড়ি বসে বাজাবে, কে কি মনে করবে? একটু বাজিয়ে শোনাও না, বৌদি?

একটু পরে রায়-গিন্নী ঘাটে যাবার পথে শুনতে পেলেন শ্রীপতির বাড়ির মধ্যে কে বেহালা না কি বাজাচ্ছে, চমৎকার মিষ্টি! কোনো ভিখিরী গান গাচ্ছে বুঝি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুনে তিনি ঘাটে চলে গেলেন।

ঘাটে গিয়ে তিনি মজুমদার-বৌকে বললেন কথাটা।

—ওই শ্রীপতির বাড়ি কে একজন বোষ্টম এসে বেহালা বাজাচ্ছে শুনে এলাম। কি চমৎকার বাজাচ্ছে দিদি, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে।

দুপুরের মেয়ে-মজলিসে শান্তির মা বললেন, শ্রীপতির বৌ চমৎকার বাজাতে পারে এসরাজ না কি বলে, একরকম বেহালার মতো। শান্তিদের ওবেলা বাজিয়ে শুনিয়েছিল—

রায়-বৌ বললেন, ও! তাই ওবেলা নাইতে যাবার সময় শুনলাম বটে! সে যে ভারী চমৎকার বাজনা গো, আমি বলি, বুঝি কোনো ফকির-বোষ্টম ভিক্ষে করতে এসে বাজাচ্ছে!

এমন সময় শান্তি আসতেই তার মা বললেন, ওই জিজ্ঞেস কর না শান্তিকে।

শান্তি বললে, উঃ, সে আর তোমায় কি বলব খুড়িমা, বৌদিদি যা বাজালে জীবনে অমন কখনো শুনিনি—শুনবে তোমরা? তা হলে এখন বলি বাজাতে—বললেই বাজাবে।

শান্তি শ্রীপতিদের বাড়ি চলে যাবার অল্প পরেই শোনা গেল শ্রীপতির বৌয়ের এস্রাজ বাজনা। অনেকক্ষণ কারো মুখে কথা রইল না।

চক্কত্তি-গিন্নী বললেন, আহা, বড় চমৎকার বাজায় তো!

সকলেই স্বীকার করলে শ্রীপতির বৌকে আগে যা ভাবা গিয়েছিল, সেরকম নয়, বেশ মেয়েটি!

এস্রাজ বাজনার মধ্যে দিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে শ্রীপতির বৌয়ের সহজভাবে আলাপ-পরিচয় জমে উঠল। দুপুরে, সন্ধ্যায় প্রায়ই সবাই যায় শ্রীপতিদের বাড়ি বাজনা শুনতে।

তারপর গান শুনল সবাই একদিন। পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নাভরা ভেতর-বাড়ির রোয়াকে বসে বৌ এস্রাজ বাজাচ্ছিল, পাড়ার সব মেয়েই এসে জুটেছে। শ্রীপতি বাড়ি নেই।

কমলা বললে, আজ বৌদি একটা গান গাইতেই হবে—তুমি গাইতেও জান ঠিক—শোনাও আজকে—

বৌটি হেসে বললে, কে বলেছে ঠাকুরঝি যে আমি গাইতে জানি ?

—না ওসব রাখ—গাও একটা—

সকলেই অনুরোধ করলে। বললে, গাও বৌমা, এ পাড়ায় মানুষ নেই, আস্তে আস্তে গাও, কেউ শুনবে না—

শ্রীপতির বৌ একখানা মীরার ভজন গাইলে :

রাণাজি, ম্যয় গিরিধর-কে ঘর যাঁউ
গিরিধর মহারা সাচে প্রিতম দেখত রূপ লুভাঁউ

গায়িকার চোখে-মুখে কি ভক্তিপূর্ণ তন্ময়তার শোভা ফুটে উঠল গানখানা গাইতে গাইতে—শান্তি একটা গন্ধরাজ আর টগরের মালা গেঁথে এনেছিল বৌদিদিকেই পরাবে বলে—গান গাইবার সময়ে সে আবার সেটা বৌয়ের গলায় আলগোছে পরিয়ে দিলে—সেই জ্যোৎস্নায় সাদা সুগন্ধি ফুলের মালা-গলায় রূপসী বৌয়ের মুখে ভজন শুনতে শুনতে মণ্টুর মা-র মনে হল এই মেয়েটিই সেই মীরাবাঈ, অনেককাল পরে পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে, আবার সবাইকে ভক্তির গান গাইয়ে শোনাচ্ছে।

মণ্টুর মা একটু-একটু বাইরের খবর রাখতেন, যাত্রায় একবার মীরাবাঈ-পালা দেখেছিলেন তাঁর বাপের বাড়ির দেশে।

তারপর আর-একখানা হিন্দী গান গাইলে শ্রীপতির বৌ। এঁরা অবিশ্যি কিছু বুঝলেন না। তবে তন্ময় হয়ে শুনলেন বটে।

তারপর একখানা বেহাগ। বাঙলা গান এবার। সকলে শুয়ে পড়ল—শান্তির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। অনেকে দেখলে বৌয়েরও চোখ দিয়ে জল পড়ছে গান গাইতে গাইতে—রূপসী গায়িকা একেবারে যেন বাহ্য-জ্ঞান ভুলে গিয়েছে।

সেদিন থেকেই সকলে শ্রীপতির বৌকে অন্য চোখে দেখলে।

ওর সম্বন্ধে ক্রমে উচ্চধারণা করতে সকলে বাধ্য হল আরও নানা ঘটনায়। পাড়াগাঁয়ে সকলেই বেশ হুঁসিয়ার, একথা আগেই বলেছি। ধার দিয়ে—সে যদি এক খুঁচি চাল কি দু-পলা তেলও হয়—তার জন্যে দশবার তাগাদা করতে এদের বাধে না। কিন্তু দেখা গেল শ্রীপতির বৌ সম্পূর্ণ দিলদরিয়া মেজাজের

মেয়ে। দেবার বেলায় সে কখনও 'না' বলে কাউকে ফেরায় না, যদি জিনিসটা তার কাছে থাকে। একেবারে মুক্তহস্ত সে বিষয়ে। কিন্তু আদায় করতে জানে না, তাগাদা করতে জানে না, মুখে তার রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হাসিমুখ ছাড়া তার কেউ কখনো দেখে নি।

শ্রীপতির বৌয়ের আপন-পর জ্ঞান নেই, এটাও সবাই দেখলে। পাশের বাড়িতে চক্কত্তি-গিন্নি বিধবা, একাদশীর দিন দুপুরে তিনি নিজের ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে আছেন, শ্রীপতির বৌ একবাটি তেল নিয়ে এসে তাঁর গায়ে মালিশ করতে বসে গেল। যেন ও তাঁর নিজের ছেলের বৌ।

চক্কত্তি-গিন্নী একটু অবাক হলেন প্রথমটা। পাড়াগাঁয়ে এরকম কেউ করে না, নিজের ছেলের বৌয়েই করে না তো অপরের বৌ!

—এস, এস মা আমার, এস। থাক, তেল-মালিশ আবার কেন মা? তোমায় ওসব করতে হবে না, পাগলী মেয়ে—

এই পাগলী মেয়েটি কিন্তু শুনলে না। সে জোর করে বসে গেল তেল-মালিশ করতে। মাথার চুল এসে অগোছালো ভাবে উড়ে পড়েছে মুখে, সুগৌর মুখে অতিরিক্ত গরমে ও শ্রমে কিছু কিছু ঘাম দেখা দিয়েছে—চক্কত্তি-গিন্নী এই সুন্দরী বৌটির মুখ থেকে চোখ যেন অন্যদিকে ফেরাতে পারলেন না। বড় স্নেহ হল এই আপন-পর জ্ঞান-হারা মেয়েটার ওপর।

ইতিমধ্যে কমলার বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে সে শ্রীপতির বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে, বৌদিদি, তোমায় কি করে ছেড়ে থাকব ভাই? মাকে ছেড়ে যেতে যত কষ্ট না হচ্ছে, তত হচ্ছে তোমায় ছেড়ে যেতে।

এই এক ব্যাপার থেকেই বোঝা যাবে শ্রীপতির বৌ এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে গ্রামের তরুণ মনেব ওপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পুজোর সময় এসে পড়েছে। আশ্বিনের প্রথম। শরতের নীল আকাশে অনেকদিন পরে সোনালি রোদের মেলা, বনসিমের ফুল ফুটেছে ঝোপে ঝোপে, নদীর চরে কাশফুলের শোভা। পাশের গ্রাম সত্রাজিৎপুরে বাঁড়ুজ্জে-বাড়ি পুজো হয় প্রতি বছর, এবারও শোনা যাচ্ছে মহানবমীর দিন তাদের বাড়ি আর-বছরের মতো যাত্রা হবে কাঁচড়াপাড়ার দলের।

শ্রীপতির বৌ গান-পাগলা মেয়ে, এ কথাটা এতদিনে এ গাঁয়ের সবাই

জেনেছে। তার দিন নেই, রাত নেই, গান লেগে আছে, দুপুরে রাত্রে রোজ এস্রাজ বাজায়। গান সম্বন্ধে কথা সর্বদা তার মুখে। শান্তির এখনও বিয়ে হয়নি, যদিও সে কমলার বয়সী। সে শ্রীপতির বৌয়ের কাছে আজকাল দিনরাত লেগে থাকে গান শিখবার জন্য।

একদিন শ্রীপতির বৌ তাকে বললে, ভাই শান্তি, এক কাজ করবি, সত্রাজিৎপুরে তো যাত্রা হবে বলে সবাই নেচেছে। আমাদের পাড়ার মেয়েরা তো আর তা দেখতে পাবে না? তারা কি আর অপর গাঁয়ে যাবে যাত্রা শুনতে? অথচ এরা কখনো কিছু শোনে না—আহা! এদের জন্যে যদি আমরা পাড়াতেই থিয়েটার করি?

শান্তি তো অবাক! থিয়েটার! তাদের এই গাঁয়ে? থিয়েটার জিনিসটার নাম শুনেছে বটে সে কিন্তু কখনো দেখেনি। বললে, কি করে করবে বৌদি, কি যে তুমি বল! তুমি একটা পাগল!

শ্রীপতির বৌ হেসে বললে, সে সব বন্দোবস্ত আমি করব এখন। তোকে ভেবে মরতে হবে না—ভাখ না কি করি।

সপ্তাহখানেক পরে শ্রীপতি যেমন শনিবারের দিন বাড়ি আসে তেমনি এল। সঙ্গে তিনটি বড় মেয়ে ও দুটি ছোট মেয়ে ও চার-পাঁচটি ছেলে। বড় মেয়ে তিনটির ষোল-সতেরো এমনি বয়েস, সকলেই ভারী সুন্দরী, ছোট মেয়ে দুটির মধ্যে যেটির বয়েস বছর তেরো, সেটি তত দেখতে সুবিধের নয় কিন্তু যেটির বয়েস আন্দাজ দশ—তাকে দেখে রক্ত-মাংসের জীব বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন মোমের পুতুল। ছেলেদের বয়েস পনেরোর বেশী নয় কারো। সকলেই সুবেশ, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

শান্তি, শান্তির মা এবং চক্কত্তি-গিন্নী তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপতির বৌ ওদের দেখে ছুটে গেল রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে। উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে বললে, এই যে রমা, পিণ্টু, তারা, এই যে শিবু আয়, আয়. সব কেমন আছিস? ওঃ, কতদিন দেখিনি তোদের—

রমা বলে ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী মেয়েটি ওর গলা জড়িয়ে ধরলে, সকলেই ওকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে।

—দিদি কেমন আছিস ভাই—

—একটু রোগা হয়ে গেছিস দিদি—

—ওঃ, কতদিন যে তোকে দেখিনি—

—দাদাবাবু যখন বললেন তোর এখানে আসতে হবে আমার তো—

—আহিরীটোলাতে 'মিউজিক কম্পিটিশন' ছিল, নাম দিয়েছিলাম—ছেড়ে চলে এলাম—

মেয়েগুলির মুখ, রঙ ও গড়ন শ্রীপতির বৌয়ের মতো। রমা তো একেবারে হুবহু ওর মতো দেখতে, কেবল যা কিছু বয়েসের তফাত। জানা গেল মেয়ে দুটির মধ্যে রমা ও তার ছোট সতী এবং ছেলেদের মধ্যে বারো বছরের ফুটফুটে ছেলে শিবু শ্রীপতির বৌয়ের আপন ভাই-বোন, বাকি সবাই কেউ খুড়তুতো, কেউ জ্যাঠতুতো ভাই-বোন।

ক্রমে আরও জানা গেল শ্রীপতির বৌ এদের চিঠি লিখিয়ে আনিয়েছে থিয়েটার করানোর জন্যে।

পাড়ার সবাই এদের রূপ দেখে অবাক। এসব পাড়াগাঁয়ে অমন চেহারার ছেলেমেয়ে কল্পনাই করতে পারে না। দশ বছরের সেই ছেলেটার নাম পিণ্টু, সে শান্তির বড় ন্যাওটা হয়ে গেল। সে আবার একটা সাঁতার দেবার নীল রঙের পোশাক এনেছে। সিক্ত নীল পোশাক, সুগৌর দেহে যখন সে নদীর ঘাটে স্নান করে উঠে দাঁড়ায়—তখন ঘাটসুদ্ধ মেয়েরা—বোস-গিন্নী, মণ্টুর মা, শান্তির মা, মজুমদার-গিন্নী ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। রূপ আছে বটে ছেলেটির! শান্তি দস্তুরমতো গর্ব অনুভব করে, যখন পিণ্টু অনুযোগ করে বলে, আঃ শান্তিদি, আসুন না উঠে, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? আসুন বাড়ি যাই।

পুজো এসে পড়ল। এ-গাঁয়ে কোনো উৎসবই নেই পুজোয়, গরীবদের গাঁয়ে পুজো কে করবে? দূর থেকে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির ঢাক শুনেই গাঁয়ের মেয়েরা সন্তুষ্ট হয়। ভিন্‌গাঁয়ে গিয়ে মেয়েদের পুজো দেখবার রীতি না থাকায় অনেকে দশ-পনেরো কি বিশ বছর দুর্গা প্রতিমা পর্যন্ত দেখেনি। মেয়েদের জীবনে কোনো উৎসব-আমোদ নেই এখানে।

শ্রীপতির বৌ তাই একদিন শান্তিকে বলেছিল, সত্যি কি করে যে তোরা থাকিস ঠাকুরঝি—একটু গান নেই, বাজনা নেই, বই-পড়া নেই, মানুষে যে কেমন করে থাকে এমন করে!

বোধহয় সেই জন্যেই এত উৎসাহের সঙ্গে ও লেগেছিল থিয়েটারের ব্যাপারে।

শ্রীপতিদের বাড়ির লম্বা বারান্দার একধারে তক্তপোষ বসিয়ে দড়ি টাঙিয়ে হলদে শাড়ি ঝুলিয়ে স্টেজ করা হয়েছে।

শ্রীপতির বৌ ভাইবোনদের নিয়ে সকাল থেকে খাটছে।

শান্তি বললে, তুমি এত জানলে কি করে বৌদি?

রমা বললে, তুমি জান না দিদিকে শান্তিদি। দিদি 'অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে'—

শ্রীপতির বৌ ধমক দিয়ে বোনকে থামিয়ে দিয়ে বললে, নে, নে—যা, অনেক কাজ বাকি, এখন তোর অত বক্তৃতা করতে হবে না দাঁড়িয়ে—

রমা না থেমে বললে, আর খুব ভাল পার্ট করার জন্যেও সোনার মেডেল পেয়েছে—যতবার পয়লা বোশেখের দিন আমাদের বাড়িতে থিয়েটার হয় দিদিই তো তার পাণ্ডা—জান আমাদের কি নাম দিয়েছেন জ্যাঠামশায়?

শ্রীপতির বৌ বললে, আবার?

রমা হেসে থেমে গেল।

মহাষ্টমীর দিন আজ। শুধু মেয়েদের আর ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে থিয়েটার দেখবে শুধু মেয়েরাই—সমস্ত পাড়া কুড়িয়ে সব মেয়ে এসে জুটেছে থিয়েটার দেখতে।

ছোট্ট নাটকটি শ্রীপতির বৌয়ের জ্যাঠামশাইয়ের নাকি লেখা। রাজকুমারকে ভালোবেসেছিল তাঁরই প্রাসাদের একজন পরিচারিকার মেয়ে। ছেলেবেলায় দুজনে খেলা করেছে। বড় হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরুলেন রাজপুত্র, অন্য দেশের রাজকুমারী ভদ্রাকে বিবাহ করে ফিরলেন। পরিচারিকার মেয়ে অনুরাধা তখন নবযৌবনা কিশোরী, বিকসিত মল্লিকা-পুষ্পের মতো শুভ্র, পবিত্র। খুব ভাল নাচতে গাইতে শিখেছিল সে ইতিমধ্যে। রাজধানীর সবাই তাকে চেনে জানে—নৃত্যের অমন রূপ দিতে কেউ পারে না। এ দিকে ভদ্রাকে রাজ্যে এনে রাজকুমার এক উৎসব করলেন। সে সভায় অনুরাধাকে নাচতে গাইতে হল রাজপুত্রের সামনে ভাড়া-করা নর্তকী হিসেবে। তার বুক ফেটে যাচ্ছে, অথচ সে একটা কথাও বললে না। নৃত্যের মধ্যে দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জীবনের ব্যর্থ প্রেমের বেদনা সে নিবেদন করলে প্রিয়ের উদ্দেশ্যে। তারপরে কাউকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে পরদিন একা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

শ্রীপতির বৌ—অনুরাধা। রমা—ভদ্রা। ওর অন্য সব ভাই-বোনেরাও অভিনয় করলে। শ্রীপতির বৌ বেশভূষায়, রূপে, গলায় দোদুল্যমান জুঁইফুলের মালায় যেন প্রাচীন যুগের রূপকথার রাজকুমারী। রমাও তাই। গানে গানে অনুরাধা তো স্টেজ ভরিয়ে দিলে, আর কি অপূর্ব নৃত্যভঙ্গি! সতী, রমা, পিণ্টুও কি চমৎকার অভিনয় করলে, আর কি চমৎকার মানিয়েছিল ওদের!

তারপর বহুকাল পরে পথের ধারে মুমূর্ষু অনুরাধার সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা। সে বড় মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য! অনুরাধার গানের করুণ সুরপুঞ্জে ঘরের বাতাস ভরে গেল। চারিদিকে শুধু শোনা যাচ্ছিল কান্নার শব্দ, শান্তি তো ফুলে ফুলে কেঁদে সারা।

অভিনয় শেষ হল, তখন রাত প্রায় এগারোটা। গ্রামের মেয়েরা কেউ বাড়ি চলে গেল না। তারা শ্রীপতির বৌকে ও রমাকে অভিনয়ের পর আবার দেখতে চায়। শ্রীপতির বৌ ও তার ভাইবোনদের রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে চক্কত্তি-গিন্নি ও শান্তির মা ও মণ্টুর মা খেতে বসিয়ে দিলেন আর ওদের চারিধার দিয়ে পাড়ার যত মেয়ে।

ও-পাড়ার রাম গাঙুলির বৌ বললেন, বৌমা যে আমাদের এমন তা তো জানিনে। কি চমৎকার করলে বৌমা! ওমা, এমন জীবনে তো কখনো দেখিনি—

মণ্টুর মা বললেন, আর ভাইবোনগুলিও কি সব হীরের টুকরো! যেমন সব চেহারা তেমনি গান—

শান্তি তো তার বৌদিদির পিছু পিছু ঘুরছে, তার চোখ থেকে অভিনয়ের ঘোর এখনও কাটেনি, সেই যুঁইফুলের মালাটি বৌদিদির গলা থেকে সে এখনও খুলতে দেয়নি। ওর দিক থেকে অন্যদিকে সে চোখ ফেরাতে পারছে না যেন।

চক্কত্তি-গিন্নী বললেন, আর কি গলা আমাদের বৌমার আর রমার! পিণ্টু অতটুকু ছেলে, কি চমৎকার করলে!···

শান্তির মা বললেন, পিণ্টু খাচ্ছে না, দেখ সেজ-বৌ। আর একটু দুধ দি, ভাত কটা মেখে নাও বাবা, চেঁচিয়ে তো খিদে পেয়ে গিয়েছে।······ কি চমৎকার মানিয়েছিল পিণ্টুকে না সেজ-বৌ—একে ফুটফুটে সুন্দর ছেলে···

শ্রীপতির বৌ হাজার হোক ছেলেমানুষ, সকলের প্রশংসায় সে এমন খুশি হয়ে উঠল যে খাওয়াই হল না তার। সলজ্জ হেসে বললে, জ্যাঠামশায় আমাদের বলেন 'কিন্নরদল'—এখনও ওই নামে আমাদের—

রমা হেসে ঘাড় দুলিয়ে বললে, নিজে যে বললে দিদি, আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমায় তবে ধমক দিলে কেন তখন?

তারা বললে, নামটি বেশ, কিন্নরদল, না? আমাদের শ্যামবাজারের পাড়ায় কিন্নরদল বলতে সবাই চেনে।

রমা বললে কৃত্রিম গর্বের সঙ্গে, প্রায় এক ডাকে চেনে—হুঁ হুঁ—

তারপর এই রূপবান বালক-বালিকার দল সকলে একযোগে হঠাৎ খিল-খিল করে মিষ্টি হাসি হেসে উঠল।

সতী হাসতে হাসতে বললে, বেশ নামটি, কিন্নরদল, না?

এমন একদল সুশ্রী চেহারায় ছেলেমেয়ে, তার ওপর তাদের এমন অভিনয় করার ক্ষমতা, এমন গানের গলা, এমনি হাসিখুশি মিষ্টি স্বভাব সকলেরই মনোহরণ করবে তার আশ্চর্য কি?

মণ্টুর মা ভাবলেন, কিন্নরদলই বটে!···

ওদের খেতে খেতে হাসিগল্প করতে মহাষ্টমীর নিশি প্রায় ভোর হয়ে এল।

শ্রীপতির বৌ বললে, আসুন, বাকি রাতটুকু আর সব বাড়ি যাবেন কেন? গল্প করে কাটানো যাক।

শ্রীপতি বাড়ি নেই। সে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়েছে, আজ রাত্রে যাত্রা দেখে সকালে ফিরবে। সেইজন্যে সকলেই বললে, তা ভালো, কিন্তু বৌমা তোমাকে গান গাইতে হবে।

শান্তি বললে, বৌদি, অনুরাধার সেই গানটা গাও আর একবার। আহা, চোখে জল রাখা যায় না শুনলে।

শ্রীপতির বৌ গাইলে, রমা এস্রাজ বাজালে। তারপর রমা ও তারা একসঙ্গে গাইলে।

একটি মাত্র তেড়োপাখি বাঁশগাছের মগ্‌ডালে কোথায় ডাকতে আরম্ভ করেছে। রাত ফর্সা হল।

সেই মহাষ্টমীর রাত্রি থেকে গ্রামের সবাই জানলে শ্রীপতির বৌ কি ধরনের মেয়ে।

কেবল তারা জানলে না যে শ্রীপতির বৌ প্রতিভাশালিনী গায়িকা, সত্যিকার আর্টিস্ট। সে ভালোবেসে শ্রীপতিকে বিয়ে করে এই পাড়াগাঁয়ের বনবাস মাথায় করে নিয়ে, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়েছে, যশের আশা, অর্থের আশা, আর্টের চর্চা ত্যাগ করেছে। তবু গানের ঝোঁক, বাজনার ঝোঁক ওকে ছাড়ে না—ভূতে-পাওয়ার মতো পেয়ে বসে—দিনরাত তাই ওর মুখে গান লেগেই আছে। তাই আজ মহাষ্টমীর দিন সেই নেশার টানেই এই অভিনয়ের আয়োজন করেছে।

শান্তি কিছুতেই ছাড়তে চায় না ওকে। বলে, তুমি কোথাও যেও না বৌদি, আমি মরে যাব, এখানে তিষ্ঠুতে পারব না। শান্তি আজকাল শ্রীপতির বৌয়ের কাছে গান শেখে, গলা মন্দ নয় এবং এদিকে খানিকটা গুণ থাকায় সে এরই মধ্যে বেশ শিখে ফেলেছে। কিছু কিছু বাজাতেও শিখছে। গানবাজনায় আজকাল তার ভারী উৎসাহ। শ্রীপতির বৌ তো গানবাজনা যদি পেয়েছে, আর বড় একটা কিছু চায় না, শান্তির সঙ্গীত-শিক্ষা নিয়েই সে সব সময় মহাব্যস্ত।

অগ্রহায়ণ মাসের দিকে বৌয়ের বাড়ি থেকে চিঠি এল, রমার কি হওয়ায় হঠাৎ সে মারা গিয়েছে। শ্রীপতি কলকাতা থেকে সংবাদ নিয়ে এল। শ্রীপতির বৌ খুব কান্নাকাটি করলে। পাড়াসুদ্ধ সবাই চোখের জল ফেললে ওকে সান্ত্বনা দিতে এসে।

শান্তি সব সময় বৌদিদির কাছে কাছে থাকে আজকাল। তাকে একদিন শ্রীপতির বৌ বললে, জানিস শান্তি, আমাদের কিন্নরের দল ভাঙতে শুরু করেছে, রমাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, আমার মন যেন বলছে···

শান্তির বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল। ধমক দিয়ে বললে, থাক ওসব, কি যে বল বৌদি!

কিন্তু শ্রীপতির বৌয়ের কথাই খাটল।

সে ঠিকই বলেছিল, শান্তি ঠাকুরঝি, কিন্নরের দলে ভাঙন ধরেছে।

রমার পরে ফাল্গুন মাসের দিকে গেল পিণ্টু, বসন্ত রোগে। তার আগেই শ্রীপতির বৌ মাঘ মাসে বাপের বাড়ি গিয়েছিল, শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রসব করতে গিয়ে সেও গেল।

এই সংবাদ গ্রামে যখন এল, শান্তি তখন সেখানে ছিল না, সেই বোশেখ মাসে তার বিবাহ হওয়াতে সে তখন ছিল মেটিরি-বানপুর, ওর শ্বশুর-বাড়িতে। গ্রামের অন্য অন্য সবাই শুনলে, অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে খাঁটি অকৃত্রিম শোক এ রকম এর আগে কখনো এ গাঁয়ে করতে দেখা যায়নি। রায়-গিন্নী, চক্কত্তি-গিন্নী, শান্তির মা, মণ্টুর মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। ঐ মেয়েটি কোথা থেকে দুদিনের জন্যে এসে তার গানের সুরের প্রভাবে সকলের অকরুণ, কুটিল স্বভাবে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, সে পরিবর্তন যে কতখানি, এই সময়ে গ্রামের মেয়েদের দেখলে বোঝা যেত। ওদের চক্কত্তিবাড়ির দুপুর-বেলার আড্ডায়, স্নানের ঘাটে শ্রীপতির বৌয়ের কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না।

চক্কত্তি-গিন্নী শোক পেয়েছিলেন সকলের চেয়ে বেশী। শ্রীপতির বৌয়ের কথা উঠলেই তিনি চোখের জল সামলাতে পারতেন না। বলতেন, দুদিনের জন্যে এসে মা আমার কি মায়াই দেখিয়ে গেল! আমার পেটের মেয়ে অমন কক্‌খনো করেনি,······আহা! আমার কপাল পোড়া, সে কখনো এ কপালে টেঁকে!

মণ্টুর মা বলতেন, সে কি আর মানুষ! দেবী-অংশে ওসব মেয়ে জন্মায়। নিজের মুখেই বলত হেসে হেসে, আমরা কিন্নরের দল, খুড়িমা। শাপভ্রষ্ট কিন্নরীই তো ছিল।· ····যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, তেমনি গান·· ওকি আর মানুষ মা?

কথা বলতে বলতে মণ্টুর মাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ত।

এ সবের মধ্যে কেবল কথা বলত না শান্তি। তার বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয়নি, ভেবেছিল বাপের বাড়ি এসে বৌদিদির সঙ্গে অনেকখানি জ্বালা জুড়োবে। পুজোর পরে কাতিক মাসের প্রথমে বাপের বাড়ি এসে সে সব শুনেছিল। বৌদিদি যে তার জীবন থেকে কতখানি হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, তা এরা কেউ, কেউ জানে না। মুখে সেসব পাঁচজনের সামনে ভ্যাজভ্যাজ করে বলে লাভ কি? কি বুঝবে লোকে?

বছর দুই পরে একদিনের কথা। গাঁয়ের মধ্যে শ্রীপতির বৌয়ের কথা অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছে। শ্রীপতিও অনেকদিন পর আবার গ্রামের বাড়িতে যাওয়া-আসা করছে শনিবারে কিংবা ছুটিছাটাতে।

শ্রীপতিদের বাড়ি থেকে শান্তিদের বাড়ি বেশী দূর নয়, দুখানা বাড়ি পরেই। শান্তি তখন এখানেই ছিল। অনেক রাত্রে সে শুনলে শ্রীপতি-দাদাদের বাড়ি কে গান গাইছে। ঘুমের মধ্যে গানের সুর কানে যেতে সে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল—

বিরহিণী মীরা জাগে তব অনুরাগে, গিরিধর নাগর—

এ কার গলা? ওর গা শিউরে উঠল ঘুমের ঘোর এক মুহূর্তে ছুটে গেল। কখনো ভুলব জীবনে এ গান, এ গলা? সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে ওদের রোয়াকে জ্যোৎস্না-রাত্রে বসে এই গানখানাই বৌদিদি প্রথম গেয়েছিল! সেই অপূর্ব করুণ সুব, গানের সুরের প্রতি মোচড়ে যেন একটি বিষণ্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রাণঢালা আত্মনিবেদন। এ কি আর কারো গলার— ওর কুমারী-জীবনের আনন্দভরা দিনগুলির কত অবসরপ্রহর যে এ কণ্ঠের সুরে মধুময়!

ও পাগলের মতে ছুটে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

রাত অনেক। কৃষ্ণা-তৃতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর পৌঁছেছে। ফুটফুটে শরতের জ্যোৎস্নায় বাঁশবনের তলা পর্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে।

ঠিক যেন তিন বছর আগেকার সেই মহাষ্টমীর রাত্রির মতো। শান্তির মা ইতিমধ্যে জেগে উঠে বললেন, ও কে গান করছে রে শান্তি! তারপর তিনিও তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন। শ্রীপতিদের বাড়ি তো কেউ থাকে না, গান গাইবে কে? ওদিকে মণ্টর মা, মনি, বাদল সবাই জেগেছে দেখা গেল।

প্রথমটা এরা সবাই ভয়ে-বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। শ্রীপতি কখন রাতের ট্রেনে বাড়ি এসেছিল, কেউ লক্ষ্য করেনি। সে কলের গান বাজাচ্ছে। ওদের সাড়া পেয়ে সে বাহিরে এসে বললে, আমার এক বন্ধুর কল, কলকাতা থেকে আজ চেয়ে আনলুম। ওর গানখানা। মরবার ক'মাস আগে রেকর্ডে গেয়েছিল।

সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শান্তি প্রথমে সে নীরবতা ভঙ্গ করে আস্তে আস্তে বললে, ছিরুদা, রেকর্ডখানা আর একবার দেবে?

পরক্ষণেই একটি অতি সুপরিচিত, পরমপ্রিয়, সুললিত কণ্ঠের দরদভরা সুরপুঞ্জে পাড়ার আকাশ-বাতাস, স্তব্ধ জ্যোৎস্না-রাত্রিটা ছেয়ে গেল।

মানুষের মনের কি ভুলই যে হয়! অল্পক্ষণের জন্য শান্তির মনে হল তার কুমারী-জীবনের সুখের দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে, যেন বৌদিদি মরেনি, কিন্নরের দল ভেঙে যায়নি, সব বজায় আছে। এই তো সামনে আসছে পুজো, আবার মহাষ্টমীতে তাদের থিয়েটার হবে, বৌদিদি গান গাইবে। গান থামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখে বৌদিদি বলবে, কেমন শান্তি-ঠাকুরঝি, কেমন লাগল!

পরিচয় : কার্তিক ১৩৪৪

একদা তুমি প্রিয়ে

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ছোটো নদীর ধার, অ্যামিকাটের ফাটক খোলা হয়েছে ব'লে জলের ওপর একটা প্রশস্ত কাদার পাড় পড়েছে। সেই কাদার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। নদী-কিনারের সরকারি রাস্তার একধারে ঝাউগাছের সার, অন্যধারে জলরেখার কিছু ওপরে কাশের বন। দীর্ঘ ঝাউগাছের গথিক্ উচ্চাভিলাষ, কাশগুচ্ছের সাদিক্রীড়ারত অশ্বারোহীর শিরস্ত্রাণের পক্ষকম্পন, এবং গোধূলির মন্দির অভ্যন্তরস্থ অস্পষ্টতা মনকে যেমন কল্পলোকের দিকে নিয়ে যায়, তেমনি পেট্রলের ও কাদার গন্ধ, মোটরের হুঙ্কার ও ধূলাকেতুর পুচ্ছ সম্মার্জন বর্তমান সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনকে নিষ্ঠুরভাবে সচেতন ক'রে তোলে। এ বেষ্টনীতে প্রেমের গল্প বলতে হ'লে ভ্রমণরত বন্ধু-যুগলকে কোনো গাছের তলায় বসতে হয়। সে রকম উপযুক্ত স্থানও পাওয়া যায় না যে তা নয়। ঝাউগাছের শ্রেণী যেখানে বন্যার কৃপায় হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে, তারই হাত কয়েক দূরে তিনটি দেওদার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, মধ্যবিত্তের নিমন্ত্রণ-বাড়িতে বড়োলোক কুটুম্বিনীর মতন। বন্ধুযুগল দেওদার-তলায় বসে পড়লেন। একজন বল্‌লেন—"এ যেন সেই ছবির 'তিন বোন'—এঁরা তিনজনে এক হয়ে আছেন। গল্প করতে ইচ্ছা হচ্ছে। শোন।"

অন্য বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "না শোনবার কোনো প্রেরণা পাচ্ছি না, বরঞ্চ আমি গান গাই, তুমি শোন। প্রেমের গল্প চলবে না।"

"বেশ তাই গাও। আমি সমালোচনা করব।"

গান শুরু হল। গানটি রবীন্দ্রনাথের—

"একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে,
বসেছ ফুলসাজে,……
সে কথা কি গেছ ভুলে ?"

গায়কের কণ্ঠে মাধুর্য ছিল, কিন্তু সংগীত রচনার বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ পৃথক ও স্বাধীন সত্তার প্রতি গায়কের কোনো শ্রদ্ধার নিদর্শন ছিল না ব'লে গানটি বোধহয় জম্‌ল না। গায়কও অন্তরার প্রথম চরণটি শেষ করলেন না। 'সেথা যে বহে নদী, নিরবধি, সে ভোলে নি……ইত্যাদি, ইত্যাদি' এই ব'লে উঠ্‌তে চাইলেন।

বন্ধু খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন, "তোমার রবি ঠাকুরের গান হয় না। সে যাক্‌গে, আমি বলি রবি ঠাকুরের গান ভালো, তুমি বল খারাপ, এই নিয়ে এস তর্ক করি। সময় কাটাতে হবে ত' ?"

"তার চেয়ে, আমি বলি ভালো, তুমি বল খারাপ।"

"ভালোই হোক, আর খারাপই হোক এ কথা সুনিশ্চিত, তোমার মুখে এই গানটি খাপ্‌ খায় না।"

"কেন ?"

"এ গানটার মধ্যে এমন একটা অভিমান ও আফ্‌শোষের সুর রয়েছে যেটা তোমার কণ্ঠে ধরা পড়বে না। ঐ গানটিতে ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছে একটা আদর্শবাদ ও সংযম, যাকে কর্তব্যজ্ঞানের দাম্ভিকতা বলতে পার। আফশোষ, অভিমান, ও কর্তব্যজ্ঞান মিলে একটা মিশ্রসুর তৈরি হয়েছে। তুমি কি সেই মিশ্রসুরের প্রতি ন্যায়-বিচার করতে পার ?"

"কেন, পারি না ? আমি কি এতই দুর্বল ?"

"না, তোমার প্রকৃতি ভিন্ন-ধরণের। তোমার প্রিয়া যদি তোমার কাছে ঐ রকমভাবে আত্মনিবেদন করতেন, তা হলে সে আত্মনিবেদনের স্মৃতি কেবল নৈসর্গিক-দৃশ্যের মধ্যে জাগরূক দেখে তুমি সান্ত্বনা পেতে না নিশ্চয়ই। তোমাকে অপমান করছি না। তোমার পুরুষকারকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।"

"আর সে কাজ বুঝি তুমি পারতে ?"

"আমাকে অত খেলো পাওনি যে নিজের স্বভাব কিংবা নিজের কাহিনী তোমার কাছে বলব! জোর, যার মুখে ঐ গানটি শোভা পায় তার স্বভাব আমি বর্ণনা করতে পারি। মানুষটা কাল্পনিক, ঘটনাগুলিও কাল্পনিক ভাবতে হবে, নচেৎ গানের তাৎপর্যটি ধরতে পারবে না। একটা গল্প তৈরি করি? শোন তা হলে মন দিয়ে। একটু কল্পনাশক্তিকে খাটাতে হবে।"

"আমাকে ত' জানই! ছেলেবয়সে, মহাষ্টমীর দিন পর্যন্ত রঙিন-জামা পরেছি মনে হয় না। বাবার ধারণা ছিল, ইংরেজ জাতটা অত বড়ো হয়েছে তার একমাত্র কারণ তাদের পোশাকের বর্ণহীনতা; এবং তাদের পতনও অবশ্যম্ভাবী, কারণ, তাদের মেয়েদের পোশাকে বর্ণ সম্বন্ধে দুর্বল উচ্ছৃঙ্খলতা। প্রমাণস্বরূপ পশুপক্ষী ও সাঁওতালদের বর্ণপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করতেন। বাবার এই শিক্ষা আমাব মনে গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছে। কল্পনা আমার ধাতে আসে না। রবি ঠাকুরের গান গাই, অন্যান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা যে কারণে গেয়ে থাকেন, হিন্দুস্থানী-গান জানি না ব'লে, এবং খানিকটা ফ্যাশানের জন্য। খানিকটা ভালোও লাগে, কি রকম গা-টা শুড়শুড়ি দিয়ে ওঠে। তুমি আমাকে কল্পনার সাহায্য নিতে বোলো না। বাস্তব, অর্থাৎ বোধগম্য উপায়ে গানটির উপযুক্ত গায়কের চরিত্র বর্ণনা কর।"

"ফটোগ্রাফ্ তুলে তার ওপর রং লাগাতে বলছ! ও কাজটা অনেকেই করেন জানি। কিন্তু রবি ঠাকুর ও কাজ করেন না, তাই ত' তাঁর কবিতা, বিশেষ ক'রে তাঁর ছবি অত উদ্ভটজনক। বেশ, সহজে বুঝতে চাও ত' তোমাকে আমাকে নিয়েই গল্প ফাঁদি? শেষে আপত্তি কোরো না যেন!"

"যতক্ষণ না কল্পনাকে খাটাতে বলছ, ততক্ষণ সব করতে রাজি। আরম্ভ কর।"

"ধর, তোমার বিবাহ হয়েছে একজন অর্ধশিক্ষিতা ও বড়োলোকের মেয়ের সঙ্গে, এবং আমি অবিবাহিত। আমরা দুজনে অন্তরঙ্গ।

"দেখতে কেমন ?"

"কি লোভী!"

"বড়োলোকের মেয়ের সঙ্গে তা হলে বিবাহ দিও না।"

"দিতে হবে অনেক কারণে। অন্যতম কারণ, গল্পের গূঢ় অভিসন্ধি।

বড়োলোকের মেয়ে না হলে কোনো বাঙালী মহিলার মানসিক অবস্থা প্রেমে পড়বার উপযুক্ত হয় না। ভালো করে ঘি-দুধ খেয়ে দেহটাকে শ্রীঘৃতের ছবির মতন ক'রে তোলা চাই; অবসর উপভোগ ক'রে ক'রে সংসার-সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হওয়া চাই, তবেই প্রেম নামক সৌখীন-নেশাটা জমে। যাঁকে হাঁড়ি ঠেলতে হয়, পাঁচটা কাচ্ছাবাচ্ছার ধকল্ সইতে হয়, তিনি যদি কোনো দুর্লভ অবসরে 'মহুয়ার' পাতাও ওল্‌টান্, তবুও তাঁর মন কারুর প্রতি দুর্বল হয় না। জোর তাঁর মনে 'অপরাজিত'-এর অপর্ণার মতন স্বামীভক্তিই ফুটে উঠতে পারে। আর বিংশ শতাব্দীতে স্বামীর সঙ্গে প্রেম নিয়ে গল্প, মা'র ছবির ওপর কবিতা লেখার মতনই অচল, অতএব অসম্ভব। আমি তোমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গে প্রেমে পড়াতে চাই।"

"এমন উপযুক্ত লোক কোথায় তিনি পাবেন, আমিই বা কোথায় পাব! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, করুণাময় স্বামীর বন্ধু!"

"কি করে প্রেমে পড়েছেন জানতে এখন চেয়ো না। আগে তোমার স্ত্রীকে চেন। তোমার স্ত্রীর শ্রেণী যখন ঠিক করে দিয়েছি তখন তাঁর চেহারা ও চরিত্রের অনেকটা বলা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর জীবনে বিদ্যাসাগরের ভাষায় প্রলোভন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভূমার সন্ধান, তরুণের ভাষায় বড়ো'র আহ্বান কিছুই আসে নি, এবং সেইজন্যেই তিনি তোমার ও তোমাদের সমাজের চক্ষে সতী সাধ্বী। অর্থাৎ, তিনি, তাঁরই পিতৃদত্ত মোটরে তোমার সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে যান, এসেই, বাড়ি ঢুকেই, অসহ্য গরমে তোমারই কষ্ট নিবারণের জন্য, পাখাটা পুরোপুরি খুলে দেন; খাবার সময় একসঙ্গে না খেলেও—শ্বেত পাথরের মেজেতে থাবড়ি খেয়ে ব'সে বাপের বাড়ির বুড়ো ঝির অদ্ভুত বড়ি দেবার ক্ষমতার ইতিহাস বলেন, তারপর পান জরদা খেতে খেতে, পান খেলে তোমার 'পাওরিয়া' হবে বলে তোমাকে মানা করেন। রাতে দাঁড়া-আয়নার সামনে চুল বাঁধতে বাঁধতে তোমার মুখ থেকে, একবার মাত্র নিজের সৌন্দর্যের প্রশংসা প্রত্যাশা করেন। যুৎসই ক'রে সুখ্যাতি না করতে পারলে সারারাত মান-অভিমান, সাধাসাধির পালা। সকালে উঠ্‌লেই মাথা ঘোরে ব'লে বিছানায় পারসী বেড়ালের মতন শুয়ে থাকা, আটটার সময়, প্রসাধনান্তে, লুচি-হালুয়া ও ঠাণ্ডা চা, দশটার সময় তোমার খাবার কাছে বসা, বেলা বারোটায় যৎসামান্য জলযোগের পর মাসিকপত্রের

গল্প পাঠ করতে করতে নিদ্রা, নিদ্রাভঙ্গের পর—উঃ, সেই সময়টায় ভারি কষ্ট, ক্লান্তি, অবসাদ, অতটা ঘুমের পর খানিকটা বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার শ্বশুরের ইটের কল থেকে মোটরে না ফিরছে। এই সময়টাই দিবাস্বপ্ন দেখতে হয়, এই গল্পটার, ঐ নভেলটার নায়িকার অবস্থায় নিজেকে নিয়ে যেতে হয়, নচেৎ কি করবেন তুমিই বল ? কল থেকে একটু আগেই না হয় ফিরলে ? তোমার কাজের মুখে ছাই পড়ুক। যার জন্য তোমার কাজ তাকে ভোলো কোন হিসেবে ? যা হোক, দেরি ক'রে যখন এসেইছ তখন সতীকে নিয়ে একবার বায়স্কোপ যাও। অনুগ্রহ ক'রে বায়স্কোপ দেখতে দেখতে, কিংবা টকি শুনতে শুনতে যদি কেউ কাউকে চুমু খায় তা হলে হেঁসে ফেল না, কিংবা তাঁর ক'ড়ে আঙুলে চিমটি কেটো না, তোমার চরিত্র সম্বন্ধে তিনি সন্দিগ্ধা হবেন। তোমার মনের ভিতরকার ভাবটা ধরে ফেলবেন, আর লোকলজ্জায়, অর্থাৎ তাঁরই ভয়ে তুমি যে ভদ্র হয়ে চল একথা শুনতে হবে এই হল তোমার স্ত্রীর চরিত্র বর্ণনা। বুদ্ধি থাকলে বুঝবে।"

"সোজা ক'রে বল।"

"এইবার তোমার বন্ধুর চরিত্র আঁকছি। তোমার স্ত্রীটি বড়ো ভালো। অর্থাৎ তিনি ভালোও হতে পারেন মন্দও হতে পারেন। তুমি যেমন তাঁর অবস্থার ক্রীতদাস, তেমনি তিনিও তাঁর বাপের অবস্থার ক্রীতদাসী। এ হেন স্ত্রীর স্বামীর একজন বন্ধু আছেন। তিনি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্যের অভাবে এই শ্রেণীর মধ্যে খানিকটা বৈচিত্র্য আশা করা যায়। কিন্তু যতটুকু পাওয়া উচিত, ততটুকু পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলের মনে অল্পবয়স থেকেই, গোটা কয়েক কুসংস্কার গেঁথে দেওয়া হয়, যেমন loyalty—কিনা বন্ধুবাৎসল্য, honour, যার বাংলা প্রতিশব্দ নেই কর্তব্যজ্ঞান বলতে পার, ও আদর্শবাদ অর্থাৎ idealism প্রভৃতি। এই সব সংস্কারগুলি তোমার বন্ধুর চরিত্রকে একেবারে বৈচিত্র্যহীন ক'রে তুলেছিল। সেজন্য তাকে নেহাৎ গোবেচারি মনে হত। আদর্শবাদই তার চরিত্রের মূলসূত্র। গোটা কয়েক উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে। তার বিশ্বাস ছিল যে নারীজাতি পুরুষের দ্বারা চিরকাল ধর্ষিত হয়ে এসেছে। অতএব নারীজাগরণের জন্য সে রাবণের উপায় গ্রহণ করতেও দ্বিধা করত না,

'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'জয়শ্রী'তে তার বেনামী প্রবন্ধগুলোর মধ্যে একটা ঢাকঢোলের আওয়াজ পাওয়া যেত। সে বিশ্বাস করেছিল যে ১৯২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই আমরা স্বরাজ পাব, যখন পেলাম না তখন কারণ দেখিয়েছিল মহাত্মাজীর প্রতি আমাদের অনাস্থা। সে আমেরিকান ম্যাগাজিন পড়ত ; গ্যারিবল্ডির জীবনী, সোশিলিজমের ইতিহাস, রুষের বিপ্লবকাহিনী, ম্যাকস্থইনীর ও স্থনইয়েৎ সেনের জীবন-কথা তার কণ্ঠস্থ ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক আশ্রমকে অর্থসাহায্য করবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তার সামর্থ্য ছিল না বলে প্রায় সব সভাতেই তাকে যোগ দিতে হত। আর যেদিন হাতে কাজ থাকত না, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তোমার বাড়িতে বসে গ্রামোফোন ও রেডিওতে শ্রীআঙুরবালার গান শুনত। কিন্তু তাই ব'লে দু-চারখানা রবি ঠাকুরের, দশ-বিশটা অতুলপ্রসাদের, এবং বিশ-ত্রিশটা কাজি নজরুলের গান শোনবার ক্ষমতা তার ছিল না একথা ভেবো না। সে তোমার স্ত্রীকে ঐ গানগুলোই শিখিয়েছিল।

এবার তার কর্তব্য-জ্ঞানের উদাহরণ শোন। প্রত্যেকদিন সকালে উঠে খবরের কাগজ মারফৎ পৃথিবীর যাবতীয় খবর জানা। তারপর সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সাহায্যে সর্বদেশের চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হওয়া। বিকেলে মোহনবাগানের খেলা দেখা, ফেরবার পথে শ্রমিকসঙ্ঘের পথিক-সভায় কিংবা নৈশবিদ্যালয়ের মাসিক ভোজে যোগদান, প্রায় রোজই তোমাদের বাড়িতে এসে তোমার স্ত্রীকে গান শেখান, চীন-জাপানের যুদ্ধ-কথা, তরুণ-সাহিত্য, তরুণ চিত্রকলা ও নাট্যকলা, তরুণের অভিযান, স্ত্রী-জাগরণের বিবরণ শোনান—এ সব কাজ সে কর্তব্যবোধেই করত। সেইজন্য তার মতামতে একটা একাগ্রতা, মননে একটা উচ্ছ্বাস, ও বচনে একটা উন্মাদনা ছিল। এ গুণগুলির অস্তিত্ব তোমার স্ত্রী ভালো করে না হোক আব্ছা গোছের সন্দেহ করেছিলেন ভাবা যেতে পারে। অন্ততঃ এ ধারণাটুকু তাঁর ছিল যে কোথায় যেন তাঁর স্বামীর ও সেই স্বামীর বন্ধুর মধ্যে একটা পার্থক্য রয়ে গেছে। তাঁর পার্থক্য-অনুভূতির খবরও বন্ধুটি জানত। তুমি জানতে কিংবা জানতে না, হয়ত জানাতে চাইতে না। সেইজন্য, তুমি যখন টাকার তাগিদ দিতে বিদেশ যেতে, তখন তোমার বন্ধুর চার্জে তোমার স্ত্রীকে রেখে যাওয়াটা তাঁর বাপের বাড়ি পাঠানোর চেয়ে সমীচীন ভাবতে। বন্ধুর প্রতি

তোমার প্রগাঢ় বিশ্বাস এইটাই হ'ল তার কর্তব্যবোধের সবচেয়ে বড়ো প্রশংসাপত্র। বন্ধুবাৎসল্য, গোটাকয়েক সনাতন বিশ্বাসে অল্পআস্থা—এ সব সদ্‌গুণ তার চরিত্রে কত পরিমাণে ছিল গল্পের মধ্যেই পাবে।"

"এবার গল্প শুরু হোক্।"

"গল্পের প্রয়োজন নেই। এই তিনটি চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতেই গল্প তৈরি হবে। গল্পের অন্য অস্তিত্ব আছে না কি? গল্প এক রকম হ'য়েই গেছে। অর্থাৎ এখন থেকে যে ঘটনা বিবৃত করব, সেগুলি এই তিনটি চরিত্রের সম্পর্কে হতে বাধ্য। আচ্ছা, আরও একটু বিশদ ক'রে বলি। তোমার বন্ধুর প্রতি তোমার স্ত্রীর মনোভাবটা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকের প্রতি বড়োলোকের মেয়ের অনুকম্পা এবং কর্মবীরের স্ত্রীর বাক্যবীরের প্রতি মোহ, এই দু'এর এক দৈব সংমিশ্রণ। তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার বন্ধুর মনোভাবটা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মোহ ও হিংসার; হিংসাটা তুলে রাখা হয়েছিল খানিকটা তোমার জন্য, খানিকটা ধনী সম্প্রদায়ের জন্য। হিংসাটা ভালো ক'রে প্রকাশ পেত শ্রমিকসঙ্ঘের পাক্ষিক সভার বক্তৃতায়। এই মোহ, ধনী সম্প্রদায়ের ওপর এই রাগ ও তার এক অনুপযুক্ত প্রতিনিধির ওপর অভিমান চমৎকার মিশে গিয়েছিল তার আদর্শবাদের সঙ্গে। সে ভাবত, তোমার স্ত্রীর গহনা-গাঁটি মোটর রেডিও থাকা সত্ত্বেও সে ভারি গরীব, একাকিনী, বন্ধুহীনা, নির্জন পথের যাত্রী। কিন্তু তোমার চরিত্রের প্রশংসায় সে ছিল শতমুখ। এই সব কারণে তোমার স্ত্রী ও তোমার বন্ধুর মধ্যে একটা আদর্শ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। তোমার স্ত্রী যদি পুরুষ হতেন, তা হলে সে সম্বন্ধকে প্লেটনিক্ বলা চল্‌ত। বিধাতার ইচ্ছা যখন বিপরীত, তখন তাকে মধ্যযুগীয় বলতে বাধ্য।"

"আর আমি! আমি কোথায় রইলাম?"

"আরে তোমাকে বাদ দিয়ে কি গল্প হয়! তুমিই ত গল্পের নায়ক। তবে এমন নায়ক নও যে সর্বদাই রঙ্গমঞ্চের সবখানি জুড়ে আছ। তুমিই সব, তবে গোপনে, অলক্ষ্যে। চক্রের যেমন কেন্দ্র, এ বিশ্বের যেমন ব্রহ্ম, জুলিয়াস সীজার নাটকের শেষ অঙ্কগুলিতেও যেমন সীজার, ঘরে-বাইরের যেমন মাষ্টারমশাই, সুরের যেমন বাদী স্বর, রেমব্রাণ্টের ছবির কোণ থেকে

যেমন আলোর একটি রেখাপাত, তেমনি তুমি আমার গল্পের। লোকে ভাবছে তুমি নিক্রিয় অনাবশ্যকীয়, অনুবাদী ইত্যাদি, তা নয়। তুমি ব্যাকরণের অব্যয়। অভিমান কোরো না।"

"ওটা আমার ধাতে নেই।"

"সেইজন্যই ত ঐ গানটা তোমার মুখে শোভা পায় না বল্‌ছি। আচ্ছা ধরাই যাক্, তোমার মনোভাব বলে কিছু নেই। ও সব বালাই নেই তোমার। খাঁটি বৈজ্ঞানিক তুমি, মন তোমার সুস্থ। এবার গল্প শোন। প্রথম ঘটনাটি ঘটে তোমারই সামনে। হয়ত তোমার মনে নেই। রেডিও বন্ধ ক'রে তোমার স্ত্রীকে 'সেই' গানটি গাইতে ব'ল্‌লে। তৃতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ তোমার বন্ধুর সামনে স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধজনোচিত গোপন ইঙ্গিতটা তিনি পছন্দ না ক'রে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন যে গানটি গাইলেন সেটি তোমার বন্ধুর কাছেই শেখা। কাজী নজরুলের বিখ্যাত গান—'কেন কাঁদে পরাণ, কি বেদনা কারে কহি?' প্রথম লাইনটা শুনেই তুমি ঠাট্টা করলে, 'কাঁদবার প্রয়োজন নেই, আমার কান্না ভালোও লাগে না। বেদনাটা কি আমাকে যদি না বল, ত' এঁকেই বল না।' তোমার বন্ধু তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, 'না, না, আমাকে বলবার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার কান্না ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু ওঁর যে বেদনা থাকতে পারে তোমার বোঝা উচিত। প্রত্যেক মানুষের, বিশেষত, প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যে একটা সৃজনী-শক্তি লুপ্ত থাকেই থাকে, তাকে জাগ্রত, তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে কোনো কর্মে নিয়োজিত না করতে পারলে বেদন বোধ করতেই হবে। অন্য বেদনার কথা বলছি না। তুমি লেডী ডাক্তারের কথা তুলে একটা বদরসিকতা করাতে সেদিনের সভা ভঙ্গ হয়। পরের দিন সকালেই তুমি বাইরে চলে যাও। বন্ধু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তোমার বৈঠকখানায় এসে অনেক ক'রে তোমার স্ত্রীর—তিনি তখন তোমার স্ত্রী নন্, সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতিভূ—মনোরঞ্জন করতে প্রয়াসী হলেন। তাঁর চেষ্টা সফল হ'ল না। লাভের মধ্যে, বন্ধুকে গোটা কয়েক কটু কথা শুনতে হ'ল—এই যেমন, 'আমাকে আর গান শেখাবেন না, আমি গাইতে জানি না, আমার গলা খারাপ, তাল আমার হয় না।' বন্ধু খুব জোরেই প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মনে আত্মবিশ্বাস আনতে পারলেন না। শেষে লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞাসা করে ফেল্‌লেন—'বেদনাটা

কি ?' 'বেদনা, বেদনা ত' কিছু নেই ! আমি খুব সুখী, আমার মতো সুখী কেউ নেই।' 'এ জগতে সুখ কারুর নেই, যতদিন পর্যন্ত একটি প্রাণী কষ্ট পাচ্ছে ততদিন কারুর সুখের অধিকার পর্যন্ত নেই'।"

'পরের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে না।'

'আমি জানি কাঁদে, খুবই কাঁদে। যদি নাও কাঁদে, নিজের জন্যও তো কাঁদে ? বাস্তবিক, তাই হওয়া চাই। যার নিজের জন্য প্রাণ কাঁদে না, তার পরের জন্য কি সহানুভূতি হতে পারে ? আমি জানি আপনার হৃদয় কত কোমল। বেশি কোমল বলেই ত আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে সুখ পাই। দেখুন, আমারও আপনার অবস্থা, তবে আমার হাতে নাকি বিস্তর কাজ, তাই কাজের মধ্যে ডুবে থাকি, নিজেকে ভুলে থাকি। কিন্তু, যখন একলা থাকি তখন এমন একটা নিষ্ফলতা আমাকে আচ্ছন্ন করে যে আমার দমবন্ধ হয়ে যায়, মনে হয় কোথাও চলে যাই।'

'ও সব ভাববেন না, আমার মতন হয়ে যাবেন। কেন এখানে আসেন না ? কিই বা দিতে পারি, তাও নয়।'

'একমাত্র এখানেই আসতে ইচ্ছে করে। আপনি কি দিতে পারেন ? সে যাক্। কিন্তু আসা উচিত নয়।'

'লোকে কি ভাববে ? আপনাকে ত' সকলেই চেনে।'

'আচ্ছা এবার থেকে সময় পেলেই আসব।'

'আসবেন নিশ্চয়। কিন্তু আমাকে গান শেখাবেন না।'

'কেন ? গান গাইতে পারি না হয়ত, কিন্তু হয়ত শেখাতে পারি কিছু কিছু।'

'খুব পারেন আমার বিশ্বাস, তবু শেখাবেন না।'

'তবে কেন শেখাব না বলতেই হবে।'

'গান সকলে ভালোবাসেন না।'

'ওঃ বুঝেছি।'

"আদর্শবাদ, কর্তব্যজ্ঞান, সংযম, বন্ধুবাৎসল্য প্রভৃতি কুসংস্কারগুলো কেমন তোমার বন্ধুর মনকে আচ্ছন্ন করেছে বুঝলে ? ঐ ছোট্ট 'ওঃ বুঝেছি' কথাটা বড়ো গভীর।"

"সবই বুঝলাম। আমার মনে হয় দুজনই একে ছাঁচে ঢালা, অবস্থা ভিন্ন হলে কি হয় ? দুজনেই কল্পনা ও ভাববিলাসী, দুজনেই silly sentimental।"

"এই সাংসারিক বুদ্ধির জন্যই তোমাকে খাতির করি। আজ যদি সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে রস-জ্ঞান না থেকে সামান্য সাংসারিক বুদ্ধিটুকুও থাকত, তাহলে সমালোচনা অত জোলো হত না। এবার অন্য একটা ঘটনা বলি শোন। এ ঘটনা ঘটে তোমার অনুপস্থিতিতে। তুমি ডিহিরীতে না কোথায় ধর চুণ আনতে যাচ্ছিলে, যাবার মুখে, যখন তোমার স্ত্রী গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ধর তুমি ঠাট্টা করে বলেছিলে, 'যাত্রার পূর্বে বন্ধ্যার মুখ দেখলে অমঙ্গল হয়'।"

"আমি এ ধরণের ঠাট্টা করতেই পারি না।"

"আলবাৎ করতে পার। এইটাই ত' ঘরজামাইএর প্রতিশোধ। শোন। তুমি ত' ভাই চলে গেলে, তারপর তোমার স্ত্রীর সামনে দুটি পথ খোলা রইল। একটি গোঁসা ঘরের দিকে, অন্যটি নিরুদ্দেশে, তোমার বন্ধুর সঙ্গে ভেসে পড়া। কোন পথে পাঠাই ঠিক্ করতে পারছি না।

"গোঁসা ঘরেই পাঠাও হে।"

'ভালোই বলেছ। রাস্তায় দাঁড়ানটা মুখরোচক হলেও তোমার বন্ধুর চরিত্রের সঙ্গে অন্তত খাপ খায় না। তার কর্তব্যজ্ঞানে ও অন্যান্য কুসংস্কারে বাধে।"

"গোঁসা-ঘরে কি হল ?"

"বিষ-ভক্ষণ। বন্ধু খবর পেয়েই ছুটে এলেন। ব্যাপার বেশি কিছু নয়, গোটা আষ্টেক জেনাস্‌পেরিণের বড়ি খেয়েছেন, বুক ধড়ফড় ক'রে অজ্ঞান হয়েছেন। খানিক পরে জ্ঞান হল। সারাদিন তোমার বাড়িতে তোমাব বন্ধু রইলেন, সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। রাত্রে পাশের ঘরে শোবার বন্দোবস্ত হল। অনেক রাত পর্যন্ত, কারুর ঘুম আসে না, দুজনে চুপ করে সামনাসামনি বৈঠকখানায় বসে রইলেন। শুতে যাবার সময় বন্ধু তোমার স্ত্রীকে বল্‌লেন, 'প্রতিজ্ঞা করুন, এ ভীষণ কাজ আর করবেন না। যদি প্রতিজ্ঞা করেন, শপথ ক'রে বলেন করবেন না, তবেই আমি শোব, তবেই আমি ওকে বলব না, তবেই আমি আপনাদের বাড়ি আসব, নচেৎ আমিও প্রতিজ্ঞা করলুম—আর কখ্‌খন আসব না'।"

"আচ্ছা বলছি, চেষ্টা করব, খুব চেষ্টা করব, কিন্তু কতদূর পারব ব'লতে পারি না। আপনি না এলে আমি—'

'না এলে আপনি কি…… ?'

'আমার ভালো লাগবে না, আমি বাঁচব না। ও আমাকে যা অপমান করেছে, আপনিই শুধু……, আপনার জন্যই শুধু……' এর পর তোমার বন্ধুর কি অবস্থা হল বুঝতেই পার।"

"কি আবার হল! ও কথা শুনলে আমি স্থির থাকতে পারতাম না।"

"তোমার বন্ধুও স্থির থাকতে পারলেন যে তা নয়। তবে তিনি তোমার মত কর্মবীর নন, তাই রাতে ঘুম হল না—এই চাঞ্চল্যটুকু তাঁর হল। বন্ধু পরিষ্কার বুঝলেন যে তোমার স্ত্রী, তাঁকে ভালোবাসেন। যেই বোঝা, অমনি তাঁহার মনেও প্রেম উপজিল। প্রতিদানের কর্তব্যবোধটা, অতি শীঘ্রই, সমগ্র নারীজাতির প্রতি অনুকম্পার সঙ্গে মিশে একটা খুব উঁচু ধরণের প্রেমে পরিণত হল। সাধারণতঃ এ রকম উন্নত প্রেমের বিবরণ পাওয়াই যায় না, কিন্তু বাংলাদেশে এর চল্‌তি ও কাট্‌তি দুইই খুব স্বাভাবিক। কোনো স্ত্রীলোককে এই ভাবে দেখার সুবিধা কত ভাব! এর মধ্যে আমাদেব মজ্জাগত আদর্শবাদের ক্রীড়া চলতে পারে, স্ত্রীজাতিকে নির্যাতনের বিষয়বস্তু ভেবে দেহের ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে—ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু এই অ-বাস্তব ও অ-পার্থিব, অর্থাৎ স্বর্গীয় প্রেমের মধ্যে নভেল নাটকের মূল তথ্য কিনা দ্বন্দ্ব রইল না ভেবো না। দ্বন্দ্ব তুল্‌লে কর্তব্যবোধ ও বন্ধুবাৎসল্য। যদিও তুমি লোকটি সুবিধের নও, তবুও তোমাকে বন্ধু বলে একবার যখন গ্রহণ করা হয়েছে, তখন তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কেলেঙ্কারি ক'রে কিছু তোমার সেবার ত্রুটি ঘটান যায় না। তা হলে, logically, তোমার বন্ধুর সামনে মাত্র দুটি উপায় খোলা রয়েছে। (১) নিজেকে সরিয়ে নেওয়া—সেটা কি করে সম্ভব বল? বন্ধুর ভাগ্যে প্রেম কখনও হয়নি, একবার ভগবানের কৃপায় যদি বা সিকে ছিঁড়ল, তখন অত বড়ো অভিজ্ঞতাকে কি ক'রে পায়ে ঠেলে দেয় তুমিই বল। হিন্দু সমাজেব মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে জন্মে ঐ ধরণের আদিরসাত্মক অভিজ্ঞতার ওপর একটা ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক। তা ছাড়া, জীবনের আহ্বান। তুমি বলবে, অন্যায়, আমিও তাই বলি। কিন্তু তোমার বন্ধুর বেলা সেই অন্যায় প্রবৃত্তি সংযত হল, যা হওয়া উচিত। হিন্দুসমাজের বন্ধন শিথিল হলেও তোমার বন্ধুর মনে সামাজিক কর্তব্য-জ্ঞান তখনও লুপ্ত হয়নি। সেই জন্য logically

(২) দ্বিতীয় উপায় রইল তোমার স্ত্রীর মনকে সরিয়ে নিতে তাঁকেই শিক্ষা দেওয়া, তাঁকেই সংযত হতে অনুরোধ করা।"

"আচ্ছা এইটা শেখাতে খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল বন্ধুকে ?"

"বন্ধুর স্বরূপই হল সংযম জানি। স্বরূপ প্রকাশে আর্টিষ্টের হয়ত কষ্ট হয় না। তাও বোধ হয়, হয়। তোমার বন্ধুটি আর্টিষ্ট না হলেও আর্টিষ্টিক ছিলেন ত' বটে। না হে না, গম্ভীর হয়ে বলছি, খুবই কষ্ট পেতে হয়েছিল। সে কষ্টের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তোমাকে শোনাব। দেখ, স্ত্রীলোকদের, মস্তিষ্কটা অনেকটা অধ্যাপকদের মতন। সেখানে সহজে কোনো আইডিয়া প্রবেশ করে না, কিন্তু 'ত্যজ আশা প্রবেশি এ দ্বারে', একবার প্রবেশ করলে আর তাড়ান যায় না। অনেকটা প্যারিসের শান্তি-সভায় লয়েড জর্জ-উইলসনের সম্বাদের মতন ঘটল। তোমার প্রতি কর্তব্য ও বাৎসল্যের তাগিদে বন্ধু এক চাল চাললে। সে তোমার মাহাত্ম্য-কীর্তন সুরু করল। সকাল সন্ধ্যে সেই এক ধুয়ো তোমার স্ত্রীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে লাগল—'তোমার মতন দৃঢ়চেতা কর্মবীর এ জগতে দুর্লভ, তোমার চরিত্র হয়ত মার্জিত নয়, তাঁর পছন্দ-সই নয়, নিশ্চয়ই নয়, হতে পারেই না, কিন্তু তোমার চরিত্র এই বস্তু-তান্ত্রিক সভ্যতার নিতান্ত উপযুক্ত। একজন জার্মাণ পণ্ডিত বলেছেন—সভ্যতা সম্বন্ধে জার্মাণদের মতই সবচেয়ে সারবান—এ জগতের নায়ক ও আদর্শ পুরুষ হল মোটরচালক, অর্থাৎ সোফেয়ারের মতনই কর্মতৎপর। যেকালে তিনি বিংশ শতাব্দীরই মেয়ে, তখন এই যুগের নায়ককেই তাঁকে স্বীকার করতে হবে।' এ যুক্তিতে কিছু কাজ হল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ হল না। তখন তোমার স্ত্রীকে তোমার বন্ধু নিবেদন করলেন, 'এই যান্ত্রিক-সভ্যতাকে যদি আপনি প্রাণবন্ত না করেন, কে করবে? এ যুগের একমাত্র আশা আপনারা। আপনাদেরই স্নেহ, মমতা, করুণা, প্রেম, নিঃস্বার্থপরতাই এ ধ্বংসোন্মুখী সভ্যতাকে বাঁচাবে। আপনাকে কল্পনা করেই রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী লেখেন। আপনিই নন্দিনী।' এই তুলনামূলক যুক্তি পূবের যুক্তির অপেক্ষা প্রাণস্পর্শী হলেও তাঁর হৃদয়াবেগকে রহিত করতে পারলে না। নন্দিনী নামটি শুনে যখন চোখে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল তখনই তোমার বন্ধু উপলব্ধি করলে যে যখন ঘোড়া উদ্দাম গতিতে ছুটতে চাইছে, তখন লাগাম ঢিল দেওয়াই ভালো। তাই দৈবদুর্বিপাকে সে বাধ্য হল স্বীকার করতে যে সেও

ভালোবাসে। এই স্বীকারোক্তিতে আশু ফল লাভ হল। খবরটি শুনে তোমার স্ত্রী গম্ভীর হয়ে ব'সে রইলেন। চোখের জল আর পড়ে না। বন্ধু তখন ব'লে যেতে লাগলেন—'সে অনেক কথা, যে সব নভেল পড় তাইতে অনেক পাবে'।"

'কিন্তু'

'তবে কিন্তু কেন ?'

'কিন্তু এই জন্য যে আমাদের দুজনকেই সংযত হতে হবে। আমি চিরকাল ভালোবাসব, আপনিও ভালোবাসবেন, এই রবে চিরকাল! দুটো পাখি পাশাপাশি দুটো খাঁচার মধ্যে থেকে সার্থক হতে পারে না কি ?'

'না আপনিই বনের পাখি, আমিই সোনার খাঁচায় থাকি। বেশ, তাই হোক্, আপনি মুক্ত। আমার কপালে যা লেখা আছে, তাই হোক, আপনি মুক্ত। আপনি আর আসবেন না।'

'না আসব, তবু। সেইজন্যই ত' আপনাকে দেবী মনে করে পূজো করি। আপনি মানুষ নন্, আপনি দেবী।'

"সমগ্র জাতির প্রতিনিধি হয়ে, বিশ্বসভ্যতার উন্নতির ভার স্কন্ধে নিয়ে, দেবীত্বের দায়িত্বে তোমার স্ত্রী ঠিক্ সপ্তম দিনের মাথায় খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন।"

"আমার স্ত্রীকে না ভালোবেসে থাকতে পারছিনে যে হে! মোটে সাতদিনে ঠিক হয়ে গেলেন।"

"হাঁ মোটে সাত দিন। ধন্য আর্য ঋষিরা!"

"কিন্তু, সীতা, সাবিত্রীর আদর্শ সামনে ধরলে না ত' ?"

"আজকাল ও ব্রহ্মাস্ত্র একটু ভোঁতা হয়ে পড়েছে।"

"সে যাক্‌গে। সেরে ত' গেলেন, তারপর কি হল বল ?"

"সে তুমিই জান।"

"আমি কিছুই জানি না। সবই তোমার সৃষ্টি তুমিই বল।"

"তারপর, তোমার স্ত্রী তোমাকেই পূজা করতে আরম্ভ করলেন। সেবা আরম্ভ হল। আলমারি থেকে গরদের লালপেড়ে সাড়ি বেরোল। ফলে পনের দিনেই তোমার ওজন-বৃদ্ধি। তুমি প্রথমে একটু হতভম্ব হয়ে গেলে। স্ত্রীজাতির চরিত্র একটু খামখেয়ালী ধরণের জানা থাকলেও তুমি অতিষ্ঠ হয়ে

উঠলে। ঠিক সন্ধ্যার সময় তুমি আর বাড়ি আস না, তোমার আসতে রাত হতে লাগল। হাতের কাছে নিশ্চিতের সন্ধান পেলে এক তোমার বন্ধু ছাড়া অতি বড়ো সাধুও বিগড়ে যায়। আচ্ছা, তোমাকে একটু দুশ্চরিত্র করব? গল্পটা জমে।"

"না, না, তা কোরো না। কি জানি, তুমি যদি ছাপিয়ে দাও। ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে হয়, কনট্র্যাক্‌ট পাব না।"

"সে ভয় নেই। বেশ, পূজা পেয়ে পেয়ে তোমার হৃদয় পূজারিণীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠ্‌ল। সেইজন্যই হয়ত ডিহিরি কি কাটনীতে চূণের পাহাড় দেখাতে নিয়ে গেলে। সেখান থেকে তোমাদের দুজনেরই স্বাস্থ্যের উন্নতি হল।

"যেদিন ফিরে এলে সেইদিন সন্ধ্যাবেলা তোমার বন্ধু তোমার বাড়িতে হাজরে দিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তুমি অফিস থেকে ফিরলে। তোমার স্ত্রী বৈঠকখানায় এলেন। তোমার বন্ধুর সঙ্গে তাঁকে গল্প করতে ব'লে তুমি ভেতরে গেলে। এ-ক'টা মিনিট কি awkwardly কাট্‌ল তা ভগবানই জানেন। সোন নদ কতটা চওড়া, চূণ কি করে পোড়ান হয়, ও অঞ্চলে কি কি খাবার জিনিস পাওয়া যায় না, যেগুলি যায় তার দাম কত বেশি, রাতে বাঘ এসে গ্রামের গরু বাছুর নিয়ে যায়—এ সব কথা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চলে, কিন্তু একবার যাদের মধ্যে প্রাণের কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছে তাদের মধ্যে একেবারেই অচল। তুমি যখন ঘরে এলে, তখন তোমার বন্ধু, একটু, অনুযোগের স্বরে বল্‌লেন, 'বনে জঙ্গলে কেমন রইলে একবার খবর দিতে পারতে ত'? ও অঞ্চলটা কখনও দেখিনি, শুনছি খুবই চমৎকার।' তুমি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌লে, 'আমারও ইচ্ছা হত, সময় পাইনি, ওঁরও সময় ছিল না, উনিও সারাদিন আমার সঙ্গে বেড়াতেন'।"

'ও সেইজন্যই বুঝি স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে!'

'তা ছাড়া—হ্যাঁ গা, যাবার সময় আমাকে কি স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলে তুমি, বলি?' তোমার স্ত্রী উঠে গেলেন। এমন সাহস হল না যে তোমাকে মুখের ওপর রাগ প্রকাশ করেন। তিনি চলে যাবার পর বন্ধুর পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে একটু নীচু স্বরে তুমি বল্‌লে—

'ওঁর ভাই আমাকে নিয়ে একটু বাই হয়েছে। যাবার সময় একটা খাম

টিকিট চিঠির কাগজ পর্যন্ত নিয়ে গেল না হে, ওখানে কিছুই পাওয়া যায় না। এত ক'রে বল্‌লাম। উত্তর দিলে, আমরা দু'জন আলাদা থাকব, কেবল তুমি আর আমি, আমিও কাউকে লিখব না, তুমিও লিখবে না। আর, কাউকে আসতে বলে হাঙ্গামা বাধিও না, ওখানে খাবার-দাবার পাওয়া যায় না। আদত ব্যাপার, আমি যেন কাউকে চিঠি না লিখি, ওঁরই কাছে কাছে থাকি। একেবারে জোঁক হে, জোঁক হয়ে উঠেছে। কতদিন এ খেয়াল থাকে দেখি। তবে সেখানে যেটা মন্দ ঠেকেনি, এখানে তা ঠেক্‌বে না নিশ্চয়। এটা কাজের জগৎ। তুমি ভাই মাঝে মাঝে আগের মতনই এস। আমায় ত' খেটে খেতে হবে।'

"আচ্ছা এখন তোমার বন্ধুর মনে কি হল বল ত' ?"

"সে আমি কি জানি ? চল রাত হয়েছে !"

"তোমার বন্ধুর মনে যে ভাব হল তারই আভাস পাবে রবিঠাকুরের গানটিতে—'একদা তুমি প্রিয়ে।' চল, সংগীত-সমালোচনা শেষ হল !"

আ স্মা

সীতা দেবী

বছর দুই তিন রেঙ্গুনে থাকিয়া বিনোদিনী যেদিন স্বামীর মুখে শুনিলেন যে, এখান হইতে বাস হয়ত বা তাঁহাদের উঠাইতে হইবে, তখন তাঁর মুখে যে ভাবটা ফুটিয়া উঠিল, তাহাকে বিয়োগ বলিয়া কিছুতেই বর্ণনা করা যায় না। স্বামী নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিন থাকলে, একটু কষ্ট হচ্ছে না, দেশটা ছেড়ে যেতে ?"

বিনোদিনী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বিন্দুমাত্র না। এখানে এমন কি আছে শুনি যেটা ছাড়তে দুঃখ করব ? এক যা ভাবনা খোকাকে নিয়ে।"

নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকাকে নিয়ে আবার কি ভাবনা হল ? সে তো তোমার সঙ্গেই যাচ্ছে।"

বিনোদিনী বলিলেন, "সে ত যাচ্ছে, কিন্তু তার 'আম্মা' সঙ্গে না থাকলে যে আহার নিদ্রা কিছুই হয় না। দুদিনে আমাকে যমের বাড়ির দিকে বেশ খানিক এগিয়ে দেবে ছেলে। বড়োও হয়েছে, সহজে ভুলবেও না। অন্য ঝি চাকর রাখলে তাদের কাছে যাবেও না।"

নৃপেশ এবং বিনোদিনীর একমাত্র সন্তান খোকার আর কোনো নবাবী থাক্ বা না থাক্, একটি খাশ পরিচারিকা ছিল। তাহাকে ঘরের সকলে ডাকিত 'আয়া' কেবল খোকা কেন জানি না, তাহার নামকরণ করিয়াছিল 'আম্মা'। আয়া জাতিতে মাদ্রাজী, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, রং ঘোর কালো এবং মেজাজটা, ভদ্রভাষায় বলিতে গেলে, অতিরিক্ত তেজালো। নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে নাম তাহার নিশ্চয়ই একটা কিছু ছিল, কিন্তু এ বাড়ির কেহ সে নামের কোনো খোঁজ কখনও পায় নাই। 'আয়া' এবং 'আম্মা' এই ছিল তাহার এখানকার পরিচয়। খোকা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে এ বাড়িতে আসে, এবং কখনও যে সে এখান হইতে যাইবে এমন ভাবনা তাহার বা তাহার মনিবদের, কাহারও মনেই আসে নাই।

কিন্তু বর্মা ছাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনাতেই ষোলো আনা গোলমাল বাধিল। আয়া দেশ ছাড়িবে না, এবং খোকা আয়াকে ছাড়িবে না। এ অবস্থায় করা যায় কি?

নৃপেশ বলিলেন, "কি আর করা যাবে? দিনকতক ছেলের চিৎকার শোনবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাক। যতই কেননা খোকাকে ভালোবাসুক, তাই বলে নিজের দেশ, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে আয়া কখনই যেতে রাজি হবে না।"

বিনোদিনী বলিলেন, "আচ্ছা বলেই দেখি না। বলতে দোষ কি? হাজার হোক, মেয়েমানুষের জাত ত? ভালোবাসার খাতিরে দেশ, আত্মীয়স্বজন ছাড়া তাদের অভ্যাসই আছে।"

নৃপেশ বলিলেন, "তোমার খুশি।"

খোকা এবং খোকার আয়া এই সময় বেড়াইয়া ফিরিল। বিনোদিনী অনেক ইতস্ততঃ করিয়া কথাটা পাড়িয়াই ফেলিলেন।

আয়া বেশ খানিকক্ষণ ভাবিয়া লইল। মনে মনে ব্যাপারটা ভালো করিয়া তৌল দাঁড়িতে ওজন করিয়া লইল বোধ হয়। তাহার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যায়েগা আম্মা।"

বিনোদিনী অবাক হইয়া গেলেন। এত সহজে যে আয়া রাজি হইবে তাহা তিনি মোটেই ভাবেন নাই। বলিলেন, "তুম্‌কো জাস্তি তলব দেগা।"

আয়া বলিলেন, "নেহি মাংতা মা। তলবকো ওয়াস্তে নেহি যাতা হাম্। বিশ রুপিয়াই তুম দেও।" বলিয়া খোকাকে লইয়া সে আর একপালা বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, যদিও রোদ তখন বেশ কড়া হইয়া উঠিয়াছিল। বিনোদিনী বারণ করিলেন না। আয়া যাইতে রাজি হওয়ায় তাঁহার মাথা হইতে যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল। ছেলে যা দুরন্ত, কারো সাধ্যি নাই যে, তাহাকে আঁটিয়া উঠে। দিনের বেলার উৎপাত না হয় কোনোক্রমে সহিয়া থাকা গেল, কিন্তু রাত্রেও কাহাকেও নিষ্কৃতি দেওয়া খোকার কুষ্ঠিতে লেখা ছিল না। এক এক রাত্রে সে সমানে আট দশ ঘণ্টা অপ্রতিহত বিক্রমে চিৎকার করিয়া যাইত। বকুনি মার কিছুকেই গ্রাহ্য করিত না। তার আব্‌দার যে সে কোলে চলিয়া বেড়াইবে। রাত্রিটা যে ঠিক এমন আব্‌দার করিবার সময় নয়, এ জ্ঞান তাহার মোটেই ছিল না। বিরক্তিতে দিশাহারা হইয়া নৃপেশ এক রাত্রে ছেলের গালে বেশ বিরাশী শিক্কা ওজনের একটি চড লাগাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য খোকার চেঁচানি তাহাতে একটুও থামিল না এবং তাহার সঙ্গে বিনোদিনীর বকুনি জুটিয়া ঘুমকে সম্পূর্ণ-রূপে দেশছাডা করিয়া দিল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া নৃপেশ দেখিলেন যে, বকুনির পালা রাত্রে মোটেই শেষ হয় নাই। সেটা উপক্রমণিকা মাত্র। আয়া সকালে আসিয়া যখন শুনিল যে, খোকাবাবু রাত্রে কাঁদার জন্য মার খাইয়াছে, তখন সে স্থান কাল পাত্র সব ভুলিয়া গিয়া বকুনি জুড়িয়া দিল। এই জিনিসটিতে খোকার আম্মার জুড়িদার পাওয়া রেঙ্গুন সহরেও সম্ভব ছিল না। কাজেই নৃপেশ চা খাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ির বাহিরে প্রস্থান করিলেন, এবং বিনোদিনী বহুদিনের তুলিয়া রাখা একটা শেলাই পাড়িয়া লইয়া গভীর মনোযোগ সহকারে শেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল চাকর হরনাথ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ছোটো-লোককে লাই দেওয়া বিষয়ে গুটিকয়েক মন্তব্য প্রকাশ করিল।

সেদিনও সন্ধ্যা সাতটা বাজিতে-না-বাজিতে বিনোদিনী হরনাথকে খোকার এবং নিজের খাওয়ার জন্য যথারীতি তাড়া দিতে লাগিলেন। আয়া সাড়ে সাতটায় চলিয়া যায়, তার আগে খাওয়া না সারিলে ছেলের উৎপাতে

বিনোদিনীর খাওয়াই হয় না। খোকার মাগুর মাছের ঝোল ভাত আয়াই খাওয়াইয়া দিল, তাহার পর তাহাকে ঘুম পাড়াইতে লইয়া গেল।

ছেলে ঘুমাইলেই আয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু বিনোদিনী খাইয়া আসিয়া দেখিলেন, সেদিন আয়া যায় নাই। খোকার খাটের পাশে ছেঁড়া মাদুর বিছাইয়া মহা আনন্দে নিদ্রা দিতেছে। তিনি খানিকক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর আয়াকে ঠেলা দিয়া উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘর নেহি যায়েগা ?"

আয়া হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, সে রাত্রে থাকিবে, খোকাবাবুকে মার খাইতে দিতে সে পারিবে না। আম্মা বাবু ঘুমান, সে খোকাকে লইয়া বেড়াইবে। আম্মার কাছে চারটা পয়সা থাকিলে যেন তাহাকে দেওয়া হয়, সে রুটি কিনিয়া খাইবে।

রাত্রে নির্বিঘ্নে ঘুমাইতে পাইবার আশায় বিনোদিনী খুশি হইয়া তাহাকে চার আনা পয়সা দিয়া ফেলিলেন।

এই ব্যবস্থাটাই কায়েমী হইয়া গেল। নৃপেশ এবং বিনোদিনীর ছুটি মিলিয়া গেল। রাত্রের চৌকিদারিতে ভর্তি হইল আয়া। সারারাত খোকাকে কোলে করিয়া টহল দিয়াও তাহার যে কিছু মাত্র ক্লান্তি হইয়াছে তাহা মনে হইত না। দিনেও সে সমান উদ্যমেই কাজ করিয়া যাইত। মাহিনা বাড়াইবার প্রস্তাব বিনোদিনী একবার করিলেন, কিন্তু আয়া রাজি হইল না। দুনিয়ায় তাহার কেহই নাই, বেশি টাকা লইয়া সে কি করিবে ?

এইভাবে কিছু দিন চলিয়া গেল, তাহার পর আসিল এই কলিকাতা যাওয়ার প্রস্তাব। ইহাতেও আয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল না দেখিয়া বিনোদিনী অবাক হইয়া গেলেন। নৃপেশ বাড়ি আসিলে বলিলেন, "ওগো, খোকা যে ওকে 'আম্মা' ডাকে সেটা কিছু মিছে নয়। আর জন্মে ঐ ওর মা ছিল, তা না হলে এতখানি স্বার্থত্যাগ কেউ পরের ছেলের জন্যে করে না।"

নৃপেশ একটা সময়োচিত রসিকতা করিয়া কথার স্রোতটা অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলেন।

কলিকাতা যাত্রার দিন দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। রাশ রাশ জিনিস-পত্র গুছাইয়া বাক্সে ভরিয়া, বিছানা বাঁধিয়া, টিফিন বাস্‌কেট সাজাইয়া বিনোদিনী অনেক কষ্টে কাজ শেষ করিলেন। আয়ার জিনিসের মধ্যে ছোটো

একটা বেতের বাক্স, তাহার জিনিস গুছাইতে বেশি সময় লাগিল না। ক্রমাগত খোকাকে কোলে লইয়া সে গলির এ মোড় হইতে ও মোড় ঘুরিতে লাগিল। এই মাটির সঙ্গে তার আজন্মের পরিচয়। ইহাকে আজ সে ছাড়িয়া চলিল। কোনোকালে ইহার কোলে আবার ফিরিয়া আসিবে কি না ভগবানই জানেন।

ষ্টিমারে উঠিয়া আবার অস্বস্তির সীমা রহিল না। জীবনে সে কখনও জলযাত্রা করে নাই, এই প্রথম। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আনুষঙ্গিক উপসর্গও দেখা দিল। কিন্তু খোকা ছাড়িবার পাত্র নয়। "আম্মা-আ" করিয়া সে যথারীতি চিৎকার জুড়িয়া দিল। বিনোদিনী তাহাকে কোলে করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, বিস্কুট, কমলালেবু প্রভৃতি ঘুষ দিলেন, কিন্তু খোকার সুর থামিল না। নৃপেশ আসিয়া ছেলের হাত ধরিয়া এক হ্যাঁচ্‌কা টান দিতেই আয়া উঠিয়া বসিল। বাবুর হাত হইতে খোকাকে টানিয়া লইয়া সে টলিতে টলিতে ডেকে চলিল বেড়াইতে।

এই ভাবে ষ্টিমারের তিনটা দিন কাটিয়া গেল। কলিকাতায় নামিয়া বিনোদিনী যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। নৃপেশও আবার পুরাতন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে দেখিবার আশায় খুশিই হইলেন। কেবল মুখ ভার করিয়া রহিল খোকা এবং তাহার আম্মা।

কিন্তু মানুষের সব অবস্থাই সহিয়া যায়। ক্রমে কলিকাতার রাস্তা-ঘাট চেনা হইয়া গেল, কোথায় কিসের দোকান, কোথায় জিনিস সস্তা, কোথায় বেশি দাম, সব আয়ার জানা হইয়া গেল। পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাবসাবও অল্প অল্প হইল, বাংলা কথাও ভাঙা ভাঙা দু চারটা বাহির হইতে লাগিল। বোঝা গেল এখানে থাকাটা বিধির বিধান বলিয়া সে স্বীকারই করিয়া লইয়াছে, তাহাকে লইয়া আর সংসারে গোলমাল বাধিবে না।

কিন্তু সাজানো সংসার ভাঙিবার কর্তা যিনি, তিনি আড়ালে বসিয়া নিজের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতেছিলেন। হঠাৎ চারদিনের অসুখে, স্বামী, শিশুপুত্র, সাজানো সংসার, সব কিছুর মায়া কাটাইয়া বিনোদিনী বিদায় হইয়া গেলেন। নৃপেশের বুকে এমন একটা ঘা লাগিল যে তিনি জগৎ সংসারে কোনো কিছুর দিকে কয়েক দিন তাকাইতেই পারিলেন না।

তাঁহার ছিল যন্ত্রপাতির কারবার। স্ত্রী মারা যাইবার পর মাস খানেক

তিনি সেদিকে বিন্দুমাত্রও মন দিতে পারিলেন না। ফলে যা ঘটিবার তাহা ঘটিল। বিস্তর ঋণের বোঝা তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া কারবারটি ফেল হইয়া গেল।

কিন্তু বুকে শোকের শেল যত কঠিন হইয়াই বাজুক, মানুষকে পেটের অন্নের সন্ধানে বাহির হইতেই হয়। যে একলা, তাহার তবু দু'দিন বসিয়া কাঁদিবার ছুটি আছে। যার ঘরে শিশুসন্তান বা আশ্রিত আছে, তাহার সে ছুটিও নাই। পত্নীর জন্য অশ্রুপাত করিবার ছুটি নৃপেশও পাইলেন না। খোকার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে রোজগারের চেষ্টায় বাহির হইতে হইল। কলিকাতার বাজারে চাকরি যে কেমন সুলভ তাহা চাকরির উমেদারদের বেশ ভালো করিয়াই জানা আছে। যাহা হউক, নৃপেশকে ক'দিন আগেই আপনার অনুগ্রহের বড়ো একটা পরিচয় দিয়া নিয়তি দেবী কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার আর ঐ হতভাগ্যের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ ছিল না। সুতরাং খুব ভালো না হইলেও কাজ চালানো গোছের চাকরি একটা নৃপেশের জুটিয়াই গেল। সমব্যবসায়ী এক সাহেবের নিকট সামান্য কমিশনে দালালির কাজ জুটাইয়া, নৃপেশ, পুরাতন বাড়ি ছাড়িয়া এক এঁদো গলিতে, ছোটো এক বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন।

মুস্কিল হইল ঝি-চাকর লইয়া। সামান্য আয়ে দুটিই রাখা চলে না। অথচ একজনের দ্বারা সব কাজ হওয়াও শক্ত। বিনোদিনী বাঁচিয়া থাকিতেই যখন দু'জন না হইলে চলিত না, তখন এখন যে চলিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আয়ের কথাও ভাবিতে হয়।

নৃপেশ ঠিক করিলেন, হরনাথকেই বিদায় দিবেন, তিনজনের রান্না আয়াই কোনোমতে চালাইয়া লইবে। না হয় খাওয়ার কিছু অসুবিধাই হইবে। কিন্তু আয়াকে বিদায় দেওয়াই প্রথমত শক্ত, তাহাকে স্বদেশ আত্মীয়স্বজন সব কিছু হইতে ছাড়াইয়া আনা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, খোকাকে সামলানো একেবারে অসম্ভব হইবে। তাহার মা তাহাকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়াছে, ইহার পর আম্মাও যদি ছাড়ে, তাহা হইলে খোকাকে বাঁচাইয়া রাখাই হইবে দায়।

অতএব হরনাথই বিদায় হইল। অন্য এক বন্ধুর বাড়ি তাহার কাজ জুটাইয়া দিয়া, নৃপেশ মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

আয়া খোকাকে কোলে করিয়াই রান্না করিতে চলিল। লঙ্কা এবং তেঁতুল প্রচুর পরিমাণে খরচ করিয়া সে যে অপূর্ব সুখাদ্য প্রস্তুত করিল, তাহার একগ্রাস মুখে লইয়াই নৃপেশের দম আটকাইবার জোগাড় হইল। আয়া পাছে বুঝিতে পারিয়া মনে আঘাত পায় এই ভয়ে তিনি কিছু না বলিয়া খাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আয়ার বুদ্ধির অভাব কিছুমাত্র ছিল না, সে বুঝিতেই পারিল, এবং তাহারই চোখে জল আসিল সবার আগে।

পরদিন নৃপেশ গিয়া হরনাথকে ডাকিয়া আনিলেন। আয়া এবার জোর করিয়াই বিদায় হইয়া গেল। বাবুর দুই চাকর রাখিবার মতো অবস্থা নয়, তাহা সে ভালো করিয়াই জানিত। তাহার দ্বারা যখন সব কাজ চলিল না, তখন তাহার যাওয়াই ভালো। খোকাকে লুকাইয়া সে পলাইয়া গেল। নৃপেশ জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে নিকটেই তাহার মুলুকওয়ালী এক স্ত্রীলোক আছে, সেখানে গিয়া সে প্রথমে উঠিবে, তাহার পর অন্য কাজ দেখিয়া লইবে। নৃপেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ঝাল তরকারি খাইয়াও দিন চলিত, কিন্তু খোকাকে সমস্ত দিন ঘাড়ে করিয়া তিনি কাজই বা কেমন করিয়া করিবেন, আহার নিদ্রাই বা কেমন করিয়া সম্পন্ন করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

খাওয়াটা সেদিন ভালোই হইল। কিন্তু ঘুম আর তাহার পর জমিল না। রাত বারোটা অবধি নৃপেশের কাজ সারিতেই গেল। হরনাথ ততক্ষণ চিৎকার-পরায়ণ খোকাকে ঘাড়ে করিয়া বারান্দাময় দৌড়িয়া বেড়াইল। রোজকার অভ্যাস মতো সকাল ছ'টার জন্য ঘড়িতে 'এলার্ম' দিয়া নৃপেশ শুইতে গেলেন। চাকর আসিয়া খোকাকে তাঁহার পাশে শোয়াইয়া দিয়া, হাঁফ্ ছাড়িয়া নিজে খাইতে শুইতে গেল। খোকা অনেকক্ষণ চেঁচামেচি করিয়া শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই তাহার বাবার মনে একটা ক্ষীণ আশার উদয় হইল যে, রাতটা হয়ত বা ভালোয় ভালোয় কাটিয়া যাইবে।

কিন্তু খোকাবাবুর এলার্ম বাজিয়া উঠিল—সকাল হইবার ঢের আগেই। হরনাথ এবার একেবারেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। তাহাকে বারকয়েক ডাকাডাকি করিয়া নৃপেশ দেখিলেন, তাহার ঘুম আজ আর ভাঙিবে না। বিরক্তচিত্তে নিজেই সারারাত পুত্রকে বহন করিয়া বেড়াইলেন। মৃত পত্নীর মুখ স্মরণ

করিয়া ছেলের গায়ে হাত তুলিতেও পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, এই রেটে চলিলে খোকাকে পিতৃহীন হইতেও বেশি দেরি হইবে না। আয়ার উপর বিরক্তিতে তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠিল। এত বেশি আত্মসম্মানের ঘটা না দেখাইলেই কি চলিত না? তিনি ত তা'কে যাইতে বলেন নাই?

সেদিন আফিসে গিয়া অনেকের কাছেই নিজের দুঃখের কথা গল্প করিলেন। মনটা পড়িয়া রহিল বাড়িতে। ছেলেটা না জানি কি করিতেছে। হরনাথের উপর বিশ্বাস এবং ভক্তি তাঁহার অনেকটাই চটিয়া গিয়াছিল। নিজের অসুবিধা করিয়া সে যে খোকার তত্ত্বাবধান ভালো করিয়া করিবে, তাহা ভাবিতে আর তাঁহার ভরসা হইল না।

বন্ধুবান্ধব অনেকে সময়োচিত উপদেশ দিলেন।—'এ রকম গৃহশূন্য হ'য়ে আর কতদিন থাকবে? বেশ বড়ো সড়ো দেখে একটি ঘরে আন, ছেলেও দেখবে, তোমাকেও দেখবে। ওসব ঝি চাকর দিয়ে কি আর ছেলে মানুষ হয়? নৃপেশ ঘৃণায় আর ক্ষোভে তাহাদের দিকে আর ভিড়িলেন না।

বাড়িতে আসিয়া নৃপেশ হরনাথের কাছে খোকার অপকর্মের মস্ত বড়ো এক তালিকা পাইলেন। এ সমস্যার কি যে সমাধান কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। হরনাথ খাইতে ডাকিলে, রাত্রে খাইবেন না, বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। শোবার ঘরে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন, খোকা আর্তনাদ করিতে করিতে খাওয়া শেষ করিতেছে। গেলাস বাটিতে লাথি মারিয়া, চাকরকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া সে যে আসর জমাইয়া তুলিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিলেন।

নিজের কাজ শেষ করিতে বসিয়া নৃপেশ চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, "খোকাকে শীগ্‌গির করে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যা।"

হরনাথের আপত্তি ছিল না। খোকাকে ঘাড়ে করিয়া, ছুটাছুটি করিয়া, তাহাকে দোলাইয়া, নাচাইয়া, ভাঙা গলায় গান গাহিয়া, সে কোনোরকমে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিল। নৃপেশ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন রাত সাড়ে নয়টা। নানা কারণে শরীর মন বড়োই শ্রান্ত ছিল, বারোটা অবধি কাজ করিতে আর ইচ্ছা হইল না। ঘড়িতে এলার্ম না দিয়াই ছেলের পাশে তিনি শুইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন এক আধ ঘণ্টা যাহাই হউক ঘুমাইয়া লওয়া যাক্। খোকাবাবু কতক্ষণই বা নিষ্কৃতি দিবেন?

নৃপেশের ঘুম যখন ভাঙিল, তখন রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। অবাক্ হইয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন ন'টা বাজিতে পনেরো মিনিট। পাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, খোকার স্থান শূন্য। চিৎকার করিয়া চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা কোথায়?"

হরনাথ হাঁড়ির মতো মুখ করিয়া আসিয়াছিল। মনিবের প্রশ্নে মুখের ভাব কিছু পরিবর্তন না করিয়াই বলিল, "তার আম্মার সঙ্গে বেড়াতে গেছে।"

নৃপেশের নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আম্মার সঙ্গে? সে কখন এল?"

হরনাথ বলিল, "সন্ধ্যে রাত থেকে এসেই ঐ ছোটো ঘরটায় বসেছিল। আমি তখন দেখিনি। আপনারা ঘুমিয়ে যাবার পর যেই খোকা উঠে কাঁদতে শুরু করল, তখনই বেরিয়ে এল। সাড়ে পাঁচটা অবধি খোকাকে নিয়ে বেড়িয়েছে, তারপর এই আধঘণ্টা খানিক আগে, ঘুম থেকে উঠে তাকে নিয়ে বেড়াতে গেল।"

নৃপেশ হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। না খাইলেও তাঁহার তত আপত্তি ছিল না, যত ছিল রাত্রিদিন পুত্রের চেঁচানি শোনায়। তাহা ছাড়া খোকার অযত্ন হইতেছিল অতিরিক্ত রকমের। আয়াকে বিদায় দিয়া খরচ কমানো তাঁহার চলিবে না, তাহা তিনি খুব ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। হয় আয় বাড়াইতে হইবে, নয় খরচ অন্যদিকে কমাইতে হইবে।

হরনাথ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাবুর মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। নৃপেশ চুপ করিয়াই আছেন দেখিয়া বলিল, "তাহলে আমাকেই জবাব দিন, বাবু।"

নৃপেশ বলিলেন, "রান্না করবে কে, তুই গেলে?"

হরনাথ উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আয়াই যাবে?"

নৃপেশ বলিলেন, "খোকাকে দেখবে কে?"

হরনাথ বলিল, "দুজনকে রাখবেন না বলেছিলেন যে?"

নৃপেশ বলিলেন, "সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না; তুই যা, নিজের কাজ কর গে।" হরনাথ অপ্রসন্নমুখে চলিয়া গেল।

ঠিক সেই সময় আয়া তাহার ক্ষুদ্র মনিবটিকে লইয়া বেড়াইয়া ফিরিল।

নৃপেশকে দেখিয়া অতি সংক্ষেপে বলিল, "সেলাম বাবু", বলিয়া খোকাকে লইয়া ভিতরে চলিল। নৃপেশ তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন।

আয়া আন্দাজ করিল তলব দেওয়া লইয়া একটা আলোচনা হইবে সম্ভবতঃ। সুতরাং নৃপেশ কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে বলিয়া গেল, যে, খোকাবাবুকে ছাড়িয়া সে যাইবে না, নিজের দেশ আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া সে আসিয়াছে এই ছেলের জন্যে। এখন তাহাকে যাইতে বলিলে চলিবে কিরূপে? বাবুর টাকা পয়সার টানাটানি সে বুঝিতে পারে, তা না হয় এখন সে তলব না লইল? খোকাবাবু বড়ো হইয়া রোজগার করিতে শিখিলে সে সুদে আসলে সব আদায় করিয়া লইবে। তাহাকে খাইতে দিলে এবং বছরে খান দুই কাপড় দিলেই চলিবে। খোকার মা মারা যাইবার সময় খোকাকে তাহার কাছে দিয়া গিয়াছিলেন, কখনও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে বারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বাবু তাড়াইয়া দিলেও সে যাইবে না।

ব্যাপারটা তখনকার মতো ঐখানেই চুকিয়া গেল। নৃপেশ একরকম নিশ্চিন্ত হইলেন। চাকর এবং আয়ার ঝগড়া ছাড়া আর কোনো গোলমাল সংসারে রহিল না। কিন্তু এ জিনিসটাও যে নিতান্ত তুচ্ছ নয়, তাহা নৃপেশ কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন। হরনাথ পুরানো চাকর, আয়া স্ত্রীলোক, কাহার পক্ষে যে তিনি দাঁড়াইবেন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কোনো রকমে ব্যাপারটাকে কেবলি মুলতুবী রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। ফল কিছু ভালো হইল না। চেঁচামেচি করিয়া যেটা একেবারে চুকিয়া যাইত, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সেটা কেবল ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে লাগিল। আয়া এবং চাকর পরস্পরের চিরশত্রু হইয়া দাঁড়াইল। সুবিধা পাইলেই দু'জনেই যে খুব বড়ো রকম শোধ তুলিবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ রহিল না।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত দিক হইতে আর-এক মস্ত বড়ো উৎপাত আসিয়া জুটিল। গলির মোড়ে এক ঘর সোনার বেণের বাস। আর কিছু তাহাদের থাক বা নাই থাক, টাকা ছিল এক রাশ। তাহাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের পোষাকে এবং খেলনায়, কথাবার্তায়, টাকার পরিচয় খুবই পাওয়া যাইত।

একদিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল, তাহাদের বাড়ির দেড় বছরের এক খোকা, মস্ত বড়ো এক ট্রাইসাইক্লে চড়িয়া গলির এ মোড় হইতে ও মোড় পর্যন্ত চষিয়া বেড়াইতেছে। তাহার ছোটো ছোটো পা দুখানার এখনও চাকা

চালাইবার মতো দৈর্ঘ্য হয় নাই, কিন্তু বড়ো মানুষের ছেলে ট্রাইসাইক্লে চড়ে এ ধারণাটা কোনো কারণে তাহার পিতা বা মাতার মাথায় ঢুকিয়া থাকিবে। সুতরাং ট্রাইসাইক্ল আসিয়াছে এবং ছেলেকে তাহার উপর চড়াইয়া এক উড়ে বেহারা টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে।

যাঁহাতক দেখা, খোকা আয়ার কোল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দৌড় দিল। আয়া তাহাকে খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কিধর যাতা ?"

খোকা হাত পা ছুঁড়িয়া চিৎকার করিয়া যাহা বলিতে লাগিল, তাহার মর্ম এই যে, সে আর আম্মার কোলে চড়িবে না, তাহারও একটা তিন-চাকা-ওয়ালা গাড়ি চাই।

উড়ে চাকরটা নিজের মনিবের আর্থিক স্বচ্ছলতায় এবং আম্মার মনিবের দীনতায় বিশেষ প্রীত হইয়া পানরসরঞ্জিত দুই পাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া ফেলিল। আয়া তাহার উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষকে মানবের পদবী হইতে খারিজ করিয়া চতুষ্পদ অস্পৃশ্য জীবের দলে ভর্তি করিয়া উচ্চকণ্ঠে গালি দিতে দিতে খোকাকে কোলে করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। হরনাথ তাহার চিৎকার শুনিয়া রান্নাঘর হইতে উঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে।

উত্তরে আয়া উড়িয়া জাতি সম্বন্ধে অনেক এমন কথা বলিয়া গেল, যাহা তাহারা শুনিলে বিন্দুমাত্রও খুশি হইত না। খোকার চিৎকার তখন পর্যন্ত সমান ভাবেই চলিতেছিল।

এমন সময় নৃপেশ কোথা হইতে বেড়াইয়া ফিরিয়া হরনাথকে ডাক দিলেন, "শীগ্গির করে ভাত বাড়', অফিসের বেলা হল।"

খোকা এক ছুটে গিয়া বাপের জামার আস্তিন ধরিয়া টান দিল। নৃপেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কি খোকাবাবু ?"

খোকা বলিল, "বাবা, আমায় একটা ট্রাইসিক্ল কিনে দেবে ?"

নৃপেশের স্বভাবে পারিব না বা দিব না বলার ক্ষমতাই ছিল না। কিছু না ভাবিয়াই ছেলের কথার উত্তরে বলিলেন, "দেব এখন, ছাড় অফিস যাই, তা না হলে সাহেব মারবে।"

খোকার মনে তখন ট্রাইসিক্লের প্রীতি আর সব জিনিস ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কাজেই "দেব এখন" শুনিয়া সে কিছুমাত্র খুশি হইল না। জিজ্ঞাসা করিল, "কখন ? ও বেলা দেবে ?"

নৃপেশ তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বলিলেন, "কাল সকালে দেব। যাও এখন আম্মার কাছে।" সুনির্দিষ্ট সময়ের একটা উল্লেখ করাতে খোকা খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

ট্রাইসিক্লের কথা নৃপেশ বেশ নিশ্চিন্ত মনে ভুলিয়া গেলেন; কিন্তু খোকা ভুলিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না। সকালে উঠিয়া নৃপেশ দেখিলেন মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছে। খোকা মুখ ধুইবে না, দুধ খাইবে না, বেড়াইতে যাইবে না। বাবা তাহাকে সকালে ট্রাইসিক্ল দিবেন বলিয়াছেন, সে তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

নৃপেশের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। ট্রাইসিক্ল দিবার ক্ষমতা তাঁহার কোথায়? এই দীন-হীন ভাবে সংসার চালাইতেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। কেনই বা তিনি মূর্খের মতো ছেলেকে ও কথা বলিতে গেলেন? টাকা ধার পাইলেও না হয় কিনিয়া দিতেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর দল বুদ্ধিমান জীব, টাকা ধার নিতে তাহারা সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু ধার দেওয়াটাকে তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে এড়াইয়া চলে।

কিন্তু মাতৃহীন একমাত্র সন্তান, তাহাকে না থামাইলেও নয়। একটা ভুলকে আর একটা ভুল করিয়া তিনি চাপা দিলেন। বলিলেন, "এখন যাও বাবা, খেলা করগে, কালকে নিশ্চয় দেব।" খোকার জেদ্ ভাঙিল। সে দুধ খাইয়া বেড়াইতে গেল।

অফিসের কাজ সারিয়া নৃপেশ সারা বিকাল চেষ্টা করিয়া বেড়াইলেন, যদি কোথাও ধারে বা মাসে মাসে টাকা দেওয়ার কড়ারে ট্রাইসিক্ল পাওয়া যায়। তাঁহাকে ধার দিতে কেহ রাজি নয়। টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিলেন, কোথাও পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা বেলায় অবসন্ন দেহমন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। চাকর ডাকাডাকি করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে পারিল না।

পরদিন সকালে তাঁহার আর উঠিতে ইচ্ছা করিল না। ছেলের কাছে তিনি মুখ দেখাইবেন কেমন করিয়া? মাথা পর্যন্ত কাপড় মুড়ি দিয়া তিনি শুইয়াই রহিলেন। কিন্তু খোকা অত সহজে ভুলিবার পাত্র নয়। সে আসিয়া তাঁহার মুখের কাপড় ধরিয়া টানাটানি শুরু করিল। "বাবা, ও বাবা, শীগ্‌গির ওঠ। আমার গাড়ি নিয়ে আসবে না?"

নৃপেশের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। হায় রে, অক্ষম পিতৃস্নেহ। এতটুকু সাধ্য নাই যে, ছেলের সামান্য একটা আবদার রক্ষা করিতে পারে? খোকাকে কি বলিবেন তিনি?

খোকা টানাটানি করিয়া তাঁহার মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ট্রাইসিক্ল কোথায়? কখন যাবে, সেটা আনতে?"

নৃপেশ মরিয়া হইয়া ছেলেকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "তুমি বড়ো বাঁদর হয়েছ, সারাক্ষণ কেবল বিরক্ত কর। যাও এখন।"

এতখানি রূঢ় ব্যবহার তাহার ক্ষুদ্র জীবনে সে কখনও কাহারও কাছে পায় নাই। মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে কাঁদিয়া বাড়ি ফাটাইয়া ফেলিবার জোগাড় করিল।

আয়া পাশের ঘরে বসিয়া খোকার জামায় বোতাম লাগাইতেছিল। কান্না শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। বাবুকে বেশ নরম গরম কিছু শুনাইবে ভাবিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখিল, তিনি খাটের উপর বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আছেন। আঙুলের ফাঁকে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

খোকাকে একটানে মেঝে হইতে কোলে উঠাইয়া আয়া বাহিরে চলিয়া আসিল। একেবারে দুই আনার লজেন্স কিনিয়া তাহার হাতে দিয়া খানিক-ক্ষণের মতো তাহাকে চুপ করাইল। তাহার পর বলিল, "খোকাবাবু তুম বদমাস্ হ্যয়, বাবাকো মারা?"

খোকা অবাক হইয়া বলিল, সে মোটেই বাবাকে মারে নাই, বরং বাবাই তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছে। আয়া বলিল, বাবার কাছে খোকা যেন আর গাড়ি না চায়, তাহা হইলে খোকাকে সে খুব ভালো জিনিস দিবে। বাবার কাছে গাড়ি চাহিলে বাবা আবার কাঁদিবে, লক্ষ্মী ছেলেরা বাপকে কাঁদায় না।

এত বড়ো ত্যাগ স্বীকার করা খোকার পক্ষে বড়োই কঠিন ছিল। কিন্তু বাবাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহারও শিশুমনে বিষম একটা ধাক্কা লাগিয়াছিল। ভয়ে বিস্ময়ে সে এক রকম আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কাজেই বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আয়ার মুখের দিকে চাহিয়া সে স্বীকার করিয়া লইল যে, সে আর বাবার কাছে ট্রাইসিক্ল চাহিবে না।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া আয়া দেখিল, বাবু তখনও বাহির হন নাই, চাও খান নাই। সেই একই জায়গায় অভিভূতের মতো বসিয়া আছেন। সে আস্তে আস্তে খোকাকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। খোকা বাবার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "বাবা, আমার ট্রাইসিক্ল চাই না, তুমি চা খাও।"

নৃপেশ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। খোকা আয়ার দিকে চাহিয়া দেখিল তাহারও চোখে জল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া সেও কাঁদিয়া ফেলিল। গাড়ির নামে সবাই মিলিয়া কেন যে কান্না-কাটি শুরু করিয়াছে, বেচারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। আয়া তাহাকে কোলে করিয়া অনেক কষ্টে শান্ত করিল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া, আয়া বাহিরে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। হরনাথের সঙ্গে সে পারতপক্ষে কথা বলিত না। আজ তাহাকে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় বলিল, যে, বিশেষ দরকারে সে বাহিরে যাইতেছে। খোকা জাগিলে হরনাথ যেন তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া দেয়, এবং একটু দেখে। চারিটার মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিবে।

হরনাথের আয়ার কাজ করিয়া দিবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে রাজি না হইয়া পারিল না।

খোকা যথাকালে জাগিয়া উঠিয়া আয়াকে না দেখিয়া মহা চিৎকার জুড়িয়া দিল। হরনাথ দুধ খাওয়াইতে গেলে তাহাকে লাথি মারিয়া হাত হইতে দুধ ফেলিয়া দিল। সৌভাগ্যক্রমে আয়া আধ ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা না হইলে খোকার এবং হরনাথের ভাগ্যে কি যে ঘটিত তাহা বলা শক্ত।

আয়াকে দেখিয়া ক্রোধে অভিমানে আটখানা হইয়া খোকা যখন আবার চেঁচানি শুরু করিবার জোগাড় করিতেছে, তখন আয়া তাহাকে টপ্ করিয়া তুলিয়া শোবার ঘরের ভিতর লইয়া গেল। নূতন একটা ট্রাইসিক্লের উপর তাহাকে বসাইয়া এ ধার ও ধার টানিয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। আনন্দ যেন খোকার চোখ মুখ দিয়া উপছিয়া পড়িতে লাগিল। হরনাথ ছুটিয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বিরক্তিতে গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

হরনাথ বেতন লইয়া কাজ করে, এবং আয়া কাজ করে বিনা মাহিনায়, ইহাতে হরনাথ নিজেকে একটু হীন মনে করিত। তাহার উপর মাদ্রাজিনী আজ আবার কোথা হইতে এক ট্রাইসিক্ল জোগাড় করিয়া আনিল। ইহাতে বাবুর নজরে সে যে চাকরের চেয়ে আরো ঢের ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাইবে, সে-বিষয়ে হরনাথের সন্দেহ মাত্র রহিল না। কিন্তু মাগী এত টাকা পাইল কোথায়? নৃপেশ বাড়ি আসিতেই হরনাথ ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে খবরটা দিল। নৃপেশ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া আয়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে এত টাকা পাইল কোথায়? আয়া উত্তর দিল, খোকার মা মারা যাইবার সময় তাহার কাছে কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন খুব বেশি প্রয়োজন হইলে খোকার জন্য উহা খরচ করিতে।

কথাটা একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া নৃপেশের মনে হইল না। হইতেও পারে। কিন্তু বিনোদিনীর প্রতি একটু অভিমানও তাঁহার মনের কোণে উঁকি মারিতে লাগিল। তিনি কি ছেলের পর? তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন তিনিই দিতেন, তাহার জন্য টাকা রাখিয়া যাওয়ার কিছু দরকার ছিল কি? তাহাও বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া যান নাই, অন্য মানুষের কাছে দিয়া গিয়াছেন। তিনি কি ছেলের টাকা চুরি করিয়া লইতেন?

পরক্ষণেই লজ্জা আসিয়া অভিমানকে চাপা দিয়া দিল। বাস্তবিক অভিমান করিবার অধিকার তাঁহার কোথায়? ছেলের সব প্রয়োজন পূর্ণ করিবার যোগ্যতা তাঁহার আছে কই? সামান্য ব্যাপারেও ত নিজের অক্ষমতাই প্রকাশ পাইতেছে। বিনোদিনী তাঁহাকে ভালো করিয়া চিনিতেন বলিয়াই হয়ত এ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

খোকার আহারনিদ্রা প্রায় ঘুচিয়া যাইবার জোগাড় হইল, সে ট্রাইসিক্ল হইতে নামিতেই চায় না। হরনাথ ট্রাইসিক্ল টানিয়া বেশি জোরে দৌড়িতে পারে বলিয়া আয়াকে ছাড়িয়া খোকা ক্রমাগত তাহারই খোঁজ করে। সকালে দেখা গেল, আয়া উঠিবার আগেই তাহারা দু'জন গাড়ি লইয়া গলিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মোড়ের বাড়ির উড়ে চাকর পর্যন্ত তাহাদের সোল্লাস চিৎকারে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

আয়ার দুই চোখের দৃষ্টি হিংস্র হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া গিয়া ডাকিল, "খোকাবাবু আও, দুধ পিয়েগা।"

খোকা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "নেহি যায়েগা, দুধ নেহি পিয়েগা। হরনাথদা, আর একটু জোরে।"

আয়া খপ্ করিয়া খোকাকে গাড়ি হইতে উঠাইয়া লইল। হরনাথকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, যে সব চাকর মাহিনা লইতে ওস্তাদ্, কাজ ফাঁকি দিবার ওস্তাদও তাহারাই। এখনও উনানে আগুন পড়ে নাই, বাবুর অফিসের ভাত কি শূন্য চুলায় সিদ্ধ হইবে? খোকাকে লইয়া খেলিতে তাহাকে ডাকিয়াছে কে? খোকাকে দেখিবার, তাহার কাজ করিবার লোকের অভাব এখনও হয় নাই।

ট্রাইসিক্ল হইতে এমন হঠাৎ তুলিয়া লওয়ায় খোকা প্রাণপণে আপত্তি করিতে লাগিল। সে আয়াকে মারিয়া, কামড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া অস্থির করিয়া তুলিল। আয়া তবু তাহাকে ছাড়িল না। উপরে আনিয়া রুটি, ডিম, দুধ সব খাওয়াইয়া তবে নিষ্কৃতি দিল। ছাড়া পাইবামাত্র খোকা আবার এক দৌড়ে গিয়া হাজির হইল রান্নাঘরে। ডাকিয়া বলিল, "এস হরনাথদা, আবার ঘোড়দৌড় করি।"

আয়াকে আড়ালে যতই গাল দিক এবং মনিবের কাছে তাহার নামে যতই নালিশ করুক, সামনাসামনি তাহার সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করিতে হরনাথের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সে বেশ জানিত, বাগযুদ্ধে আয়ার সহিত আঁটিয়া উঠিবার তাহার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। পাঁচ মিনিটেই তাহাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইবে, এবং বাবুর কাছে নালিশ করিয়াও কোনো প্রতিকার হইবে না। সুতরাং খোকার আহ্বান সে অগ্রাহ্য করিয়াই গেল। দুই হাতে উনানে কয়লা ঠাসিতে ঠাসিতে কহিল, "যাও, দাদাবাবু, তোমার আয়ার সঙ্গে। আমি গেলে আমায় এখনি আস্ত গিলে খাবে। কাজ কি আমার পরের কাজে হাত দেবার? আমার নিজের কি কাজের কিছু অভাব?"

খোকা অগত্যা আম্মার কাছেই ফিরিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে কোলে লইয়া আয়ার যেন বুক আর তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না। খোকা আর সে খোকা নাই। যে নিজের মাকেও ছাড়িয়া আম্মার কাছে ঝাঁপাইয়া পড়িত, এ যেন সে নয়। হরনাথের মত বিষম লক্ষ্মীছাড়াও ইহাকে ভাঙাইয়া লইতে পারে। খোকাকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, সবই সে করিয়া গেল, কিন্তু এই সব অভ্যস্ত কর্মের মধ্যেও ঠিক আগেকার সেই সুরটি

যেন লাগিল না। কোনোরকমে দুপুরটা কাটাইয়া দিয়া, বিকালের দিকে সে খোকাকে লইয়া বেড়াইতে যাইবার জোগাড় করিতে লাগিল।

কাপড় চোপড় পরিয়া নিচে নামিবামাত্রই খোকা জেদ্ ধরিল সে ট্রাইসিক্ল চড়িবে। আয়া বিরক্ত হইয়া বলিল দিনরাত কেবল ট্রাইসিক্ল চড়িতে চাহিলে সে গাড়ি লইয়া নদীতে ফেলিয়া দিবে। খোকা এত দুষ্টামি করিবে জানিলে সে মোটেই তাহার জন্য গাড়ি আনিয়া দিত না।

খোকা হাত পা ছুঁড়িয়া কোনোরকমে তাহার কোল হইতে নামিয়া গেল। হামাগুড়ি দিয়া সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে ডাকিল, "হরনাথদা, নিচে এস, আমি তোমার সঙ্গে খেলব। আম্মা দুষ্টু, পাজি, তার কাছে আব যাব না।"

হরনাথ সিঁড়ির দরজার কাছে মাথা বাহির করিয়া বলিল, "না, খোকাবাবু, তোমার আম্মার কাছেই থাক, এই নিয়ে আমি এখন খেয়োখেয়ি কবতে পারব না।"

তাহার শ্লেষমিশ্রিত চিবানো কথার সুরে আয়ার আরো হাড়জ্বালা করিতে লাগিল। কিন্তু খোকা পাছে সিঁড়ি দিয়া পড়িয়া যায়, সে ভয়ও ছিল। কাজেই উঠিয়া গিয়া সে আবার খোকাকে নামাইয়া আনিল।

খোকাব জেদ সে গাড়ি চড়িবেই। আয়ার নিজের গালে নিজে চড়াইতে ইচ্ছা হইতেছিল। কেন মরিতে সে ট্রাইসিক্ল আনিতে গিয়াছিল? মাঝ হইতে খোকাটা তাহার পর হইয়া গেল। তখনকার মতো অনেক লোভ দেখাইয়া সে খোকাকে ট্রাইসিক্ল ছাড়াইয়া বেড়াইতে লইয়া গেল। তাহারা ট্রামে চড়িয়া চিড়িয়াখানায় যাইবে, সেখানে খোকা বাঘ, ভালুক, হাতি কত কি দেখিবে, ইত্যাদি। কিন্তু ঘণ্টাখানেক এধার ওধার ঘুরিয়া, যখন সে ট্রামেও চড়িল না, চিড়িয়াখানাও গেল না, তখন খোকা আম্মার উপর আরও চটিয়া গেল। বাড়িতে আসিয়া বাপের কাছে নালিশ করিল. হরনাথের কাছে নালিশ করিল, আয়া খাওয়াইতে আসিলে তাহার হাতে বেশ জোরে কামড়াইয়া দিল।

আয়া বিরক্ত হইয়া তাহার পিঠে ছোটো একটা চড় মারিয়া বলিল, "বহুৎ পাজি হুয়া রে। একদম খুন নিকাল দিয়া।"

খোকা ভ্যাঁ করিয়া উঠিতেই হরনাথ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে

তুলিয়া লইল। পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিল, "মায়ের চেয়ে যে ভালোবাসে তার নাম ডান। বাবুর সামনে তো সোহাগের শেষ নেই, এদিকে পিছন ফিরলেই ছেলের পিঠে ঠ্যাঙা পড়ে। কেই বা বলতে যাবে? ওরা হল গিয়ে কত পেয়ারের চাকর।"

আয়া বাংলা ভালো না বুঝিলেও, হরনাথের কথার গতিটা যে কোনদিকে তাহা বুঝিতেই পারিল। অন্য সময় হইলে প্রলয়-কাণ্ড বাধিয়া যাইত, হরনাথকে জ্যান্ত গিলিয়া খাইবার জোগাড়ই সে করিত বোধ হয়। কিন্তু খোকার বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার মন বড়ো ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে চুপ করিয়াই রহিল, কেবল চোখ দুইটা তাহার হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মতো ভীষণ হইযা উঠিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া ট্রাইসিক্লটা আর দেখা গেল না। মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। খোকা কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইতে লাগিল। নৃপেশ হরনাথকে রাতদিন সদর দরজা খুলিয়া রাখার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। হরনাথ বাবুর কথার উত্তরে লম্বা বক্তৃতা করিয়া চলিল, বাড়িতেই যে চোর থাকিতে পারে, সে ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িল না। চুপ কবিয়া রহিল কেবল আয়া।

ঘণ্টাখানিক বকাবকির পর বাড়িটা একটু শান্ত হইল। হরনাথ বাজারে গেল, নৃপেশ কাগজ-পত্র লইয়া কাজ করিতে বসিলেন। খোকা একটি বাটি দুধেব আধটা খাইয়া আধটা ফেলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল। আয়ার কোনোও কাজে সেদিন মন লাগিতেছিল না, সে বারান্দায় চুপচাপ বসিয়া বহিল।

হঠাৎ হরনাথ ভীষণ উত্তেজিত ভাবে ছুটিয়া আসিযা ঘরে ঢুকিয়া সোজা নৃপেশের কাছে গিয়া বলিল, "বাবু, গাড়িব তো খোঁজ মিলেছে।"

আয়া নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় খোঁজ মিলল?"

হরনাথ বলিল, "বড়ো বাস্তার ঐ কোণটাতে এক মাদ্রাজীর সাইকেল মেরামতের দোকান আছে না? সেখানে ভোরবেলা গিয়ে আয়া গাড়িখানা রেখে এসেছে। বিক্রি করতেও বলে দিয়েছে।"

নৃপেশ আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। আয়া এমন কাজ করিবে? সে আধটা

পয়সার জিনিস কোনোদিন সরায় নাই। যতদিন মাহিনা পাইয়াছে, বেশির ভাগ টাকা খরচ করিয়াছে খোকার পিছনেই। এখন ত মাহিনা লয়ই না, তবু মাতার অধিক যত্নে খোকাকে সে পালন করিতেছে। সে কেন এমন কাজ করিতে গেল? অথচ হরনাথ যে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহাও মনে হয় না। আয়ার বাগ্মিতার খ্যাতি যেরূপ তাহাতে ভালো করিয়া না জানিয়া, তাহার নামে চৌর্যের অপবাদ দিবে, এত বড়ো সাহসী পুরুষ এ পর্যন্ত নৃপেশ দেখেন নাই। কি যে তাঁহার করা উচিত, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

হরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক জানিস না, বাজে কথা বলছিস?"

হরনাথ বলিল, "এত বড়ো কথা ঠিক না জেনে বলব বাবু, এত বড়ো বুকের পাটা আমার নেই। ওর সঙ্গে আমার শত্রুতাও নেই কিছু, এত কাল এক বাড়িতে কাজ করছি।"

নৃপেশ আয়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে ধীরে ধীরে আসিয়া ঘরের ভিতর দাঁড়াইল। নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ট্রাইসিক্ল লইয়াছে কিনা। আয়া স্বীকার করিল, সে লইয়াছে।

নৃপেশ আরও বিপদে পড়িলেন। ইহাকে লইয়া কি করা যায়? পুলিশে দেওয়ার কথা ত মনেও করা যায় না। সে যতদিন বিনা মাহিনার কাজ করিয়াছে তাহাতে একটা ছাড়িয়া চারটা ট্রাইসিক্ল কেনা চলে। হয়ত কোনো অভাবে পড়িয়াই করিয়াছে, নৃপেশ ত তাহাকে কিছুই দিতে পারেন নাই। সে যে চুরি করিতে বাধ্য হইয়াছে, এ ত তাঁহারই লজ্জা। আয়াকে ছাড়ানোর ইচ্ছাও তাঁহার মোটেই হইল না, খোকার তাহা হইলে হইবে কি? কিন্তু ইহাকে কিছু একেবারে না বলিলে অন্য চাকর বাকরে আস্কারা পাইয়া যাইবে।

আয়াকে কোনোদিন কেহ বকে নাই। সে যে মাহিনাকরা ঝি তাহা সকলেই অনেক কাল ভুলিয়া গিয়াছিল, আত্মীয়ার মতোই সে বাড়িতে ছিল। কি বলিয়া যে তাহাকে বকা যায়, তাহাও নৃপেশ চট্ করিয়া ভাবিয়া পাইলেন না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "এয়সা আউর মৎ করো। রুপিয়াকো কাম হোনে সে হম্‌কো বোলো।"

আয়াকে কি বলা হয় তাহা শুনিবার আশায় হরনাথ এতক্ষণ বাজারের টুক্‌রি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। বাবুর বকুনি শুনিয়া তাহারও হাড় জ্বলিয়া গেল। ইহার চেয়ে মাগীকে দশটাকা বক্‌শিশ ধরিয়া দিলেই হইত। বড়ো চমৎকার কাজ করিয়াছে কিনা? গজ গজ করিতে করিতে সে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

হরনাথ বাহির হইয়া যাইতেই আয়া বলিল, "হম্‌ কাম্‌ নেহি করেগা বাবু। হম্‌ যাতা। গাড়ি ভেজ দেগা।" হতভম্ব নৃপেশকে কথা বলিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া তাহার স্নেহের দুলাল খোকার দিকে একবারও না তাকাইয়া সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বাবুর আদেশে হরনাথ যখন বক্‌ বক্‌ করিতে করিতে তাহাকে ফিরাইবার জন্য নামিল, তখন আর গলির মধ্যে তাহাকে দেখা গেল না।

মনিবে ভৃত্যে মিলিয়া কোনোরকমে খোকাকে সাম্‌লাইয়া রাখিল। নৃপেশ সেদিনকার মতো আফিসে যাওয়ার আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ ট্রাইসিক্লটার পুনরাবির্ভাব হওয়ায়, তাঁহার ছুটি মিলিয়া গেল। একটা উনিশ-কুড়ি বৎসরের মাদ্রাজী ছোকরা সেটা ঘাড়ে করিয়া আসিয়া রাখিয়া গেল। তাহার কাছে বিশেষ কিছু খবর মিলিল না। সে কেবল বলিল, এই বাড়িতে যে আম্মা কাজ করিত, সে গাড়িটা তাহাদের দোকানে রাখিয়া আসিয়াছিল, আজ আবার এই বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিতে বলিয়া গিয়াছে। আয়া কোথায় গিয়াছে সে কিছুই জানে না, তাহার সঙ্গে ইহার বিশেষ আলাপ পরিচয় নাই। যাইতে আসিতে পথে দু'চার-বার কথা বলিয়াছে মাত্র।

দিন কাটিয়া চলিল একটার পর একটা। খোকাকে লইয়া তাহার বাবার কষ্টের সীমা ছিল না, তবু দিন কাটিয়াই চলিল, আয়ার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। হরনাথ একলা সব দিক সাম্‌লাইতে পারে না, কাজেই একটা ঠিকা ঝিও আসিয়া জুটিল। ফলে কাজের সুবিধা হোক্‌ বা না হোক্‌, কলহ কিচ্‌কিচিতে বাড়ি মুখর হইয়া উঠিল।

দিন কুড়ি পঁচিশ এমনি করিয়া পার হইয়া গেল। সকাল বেলা, ছেলেকে কোলে বসাইয়া নৃপেশ কাজ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন। হরনাথ আসিয়া খবর দিল একজন লোক বাহিরে বাবুকে ডাকিতেছে।

নৃপেশ তাহাকে ভিতরে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। হরনাথের পিছন পিছন একটা চীনা আসিয়া ঢুকিল।

নৃপেশ অত্যন্ত অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই জাতীয় জীবের সঙ্গে তাঁহার কোনোই কারবার ছিল না। হঠাৎ কি কারণে এ ব্যক্তি তাঁহার কাছে উপস্থিত হইল, তিনি কিছু ভাবিয়াই পাইলেন না।

জিজ্ঞাসা করায় সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলিল যে, নিকটেই তাহার এক জিনিস বন্ধক লইয়া টাকা ধার দেওয়ার দোকান আছে। এই বাড়ির ঠিকানা দিয়া একটি মাদ্রাজী স্ত্রীলোক তাহার কাছে গলার কণ্ঠী বাঁধা দিয়া টাকা লইয়াছিল। কিন্তু চীনাকে হঠাৎ দেশে যাইতে হইতেছে, তাই সে সকলকে খবর দিতেছে। দিন কুড়ির ভিতর টাকা দিলে, জিনিস ফেরত দিয়া সে যাইবে, না হইলে বাধ্য হইয়া তাহাকে বন্ধকী মাল বিক্রী করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। সুদ সে চায় না, কেবল যে টাকাটা দিয়াছিল,—সেটা পাইলেই হইবে।

নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ তারিখে স্ত্রীলোকটি টাকা ধার লইয়াছে? চীনা যে তারিখ বলিল, তাহাতে সবই তিনি বুঝিলেন। ট্রাইসিক্ল কেনার রহস্য এতদিনে পরিষ্কার হইয়া গেল। খোকার মৃতা জননী নয়, জীবিতা মাতৃস্বরূপিণীই আপনার শেষ সম্বলটুকু দিয়া তাহার আব্দার রক্ষা করিয়াছিল। এই সোনার কণ্ঠীটির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। বিনোদিনী বাঁচিয়া থাকিতে আয়া শখ করিয়া অনেকদিন উহা তাঁহার শুভ্র কণ্ঠে পরাইয়া দিত। খোকার বউকে জিনিসটি উপহার দিবে বলিয়া নাকি সে ঠিক করিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি আর এখানে কাজ করে না বলিয়া তিনি চীনাটাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

দিন আবার কাটিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের ভিতরের নিরানন্দ ক্রমে যেন জমাট বাঁধিয়া পাষাণভারের মতো হইয়া উঠিল। এ গৃহের স্নেহের নির্ঝর চিরদিনের মতো শুকাইয়া গিয়াছিল। লক্ষ্মীস্বরূপিণী বিনোদিনীকে বিধাতা সরাইয়া লইয়াছিলেন। আর একটি মানুষ, বাহিরটা যাহার কুৎসিত ছিল, কিন্তু ভিতরটা প্রেমের জ্যোতিতে উজ্জ্বল, তাহাকে

নিয়তি নিজের রহস্যময় অঞ্চলের আড়ালে কোথায় লুকাইয়া ফেলিল, নৃপেশ কোনোদিন জানিতে পারিলেন না।

প্রবাসী : বৈশাখ ১৩৩৫

জ ল পা নি

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

একটা অতি সহজ গুণ অঙ্ক বার বার ভুল করিতেছে দেখিয়া রামহরিবাবু পুত্র প্রাণহরির পৃষ্ঠে গুম করিয়া একটা কীল বসাইয়া দিয়া কহিলেন,—"হতভাগা! গোল্লায় গিয়েছ একবারে। এবার যদি জলপানি না পাও তা' হ'লে নিতাই মুদির দোকানে কাজে লাগিয়ে দেব। বোঝা টানতে আর পারব না।"

প্রাণহরি মুখ নীচু করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। বেদনায় পিঠের ঠিক মাঝখানটা টন্‌টন্ করিতেছিল, পিতার ভয়ে সেখানে হাত দিতেও সাহসে কুলাইল না। এই সময় গোলপাতার নীচু ছাউনীর মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া প্রাণহরির মা কহিল, "অমন করে ছেলেকে কেউ মারে সকালবেলা?"

রামহরি দাঁত খিঁচাইয়া কহিয়া উঠিলেন, "নাঃ মারে না! যে গুণের ছেলে তোমার! আজ বাদে কাল পরীক্ষা—একটা আঁক কষ্‌তে পারে না! বলে দিচ্ছি তোমাকে পরাণের মা, এবার যদি ছেলে তোমার জলপানি না পায়, তবে নিতাই মুদীর দোকানে লাগিয়ে দেব! কুপুষ্যি আর পুষতে পারব না! হ্যাঃ?" বলিয়া রামহরিবাবু চাদরখানা ঘাড়ের উপর ফেলিয়া হন্‌হন্ করিয়া একেবারে ষ্টেসনের দিকে চলিয়া গেলেন।

মাতঙ্গিনী অর্থাৎ পরাণের মা ঘাড় উঁচু করিয়া নলের বেড়ার উপর দিয়া একবার পথের দিকে চাহিয়াই কহিলেন, "ঐ রে! না খেয়েই চলে গেলেন বুঝি! ডাক্ পরাণ, তোর বাবাকে! বল ভাত নেমেছে।" প্রাণহরি উঠিল না, মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। মাতঙ্গিনীর রাগ হইল,—

তাড়াতাড়ি আসিয়া প্রাণহরির ঝাঁকড়া চুল মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিলেন, "হতভাগা ছেলে! বাপ না খেয়ে চলে গেল তবু ওঁর অভিমান গেল না! কাজ নেই পড়াশুনা করে,—যা, বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে।"

প্রাণহরি শ্লেটখানি উলটাইয়া রাখিয়া বিনাবাক্যে উঠিয়া পড়িল। তাহার পর বাঁ হাতের তালুতে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

পুত্র প্রাণহরির প্রতি রামহরিবাবুর এ অকারণ ক্রোধের হেতু ছিল। গ্রামের রামকৃষ্ণ মাইনর স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণবাবু প্রত্যেক ক্লাশের প্রথম ছাত্রের জন্য দুই টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম ভাগ শিক্ষার ক্লাশ হইতে গত বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ তিন বৎসর প্রাণহরি বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু গত বৎসর অকস্মাৎ রামকৃষ্ণবাবুর পৌত্র প্রাণকৃষ্ণ প্রথম হইয়া বৃত্তিটি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ফলে রামহরিবাবুর মাসিক কুড়ি টাকা আঠারো টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এবার যাহাতে পুত্র বৃত্তি পাইতে পারে তাহার জন্য রামহরিবাবু এক প্রহর বেলায় শয্যা ত্যাগের অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। আজকাল ভোরে উঠিয়াই প্রাণহরিকে পড়াইতে বসিতেন; কিন্তু অনেক করিয়াও তাহাকে অঙ্কে পাকা করিতে পারিলেন না। কাজেই প্রহার করিয়া পুত্রকে অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শী করিবার সহজ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রহারে প্রাণহরিরও কোন আপত্তি ছিল না। সে অঙ্গে বেদনা বোধ করিত বটে, কিন্তু অভিমান কোনও দিন করে নাই। মাতঙ্গিনী ভুল বুঝিয়াছিলেন—আজও প্রাণহরি অভিমান করে নাই—তাহার হইয়াছিল ভয়। বৃত্তি না পাইলে নিতাই মুদীর দোকানে কাজে লাগিতে হইবে পিতার এই কথা শুনিয়াই সে বিভীষিকা দেখিল। স্পষ্ট চোখে পড়িল নিতাই মুদীর রক্তচক্ষু, দোকানের ছোকরা চাকর মধুর প্রাত্যহিক নির্যাতন, ঝোলা গুড়ের হাঁড়ির চারিপাশে তাহার আবাল্যের ভীতির হেতু ভীমরুলের ঝাঁক। সে বারবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল এবং মায়ের আদেশে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাজারের পথের কুলগাছে অজস্র টোপাকুল দেখিয়াও নিতাই মুদীর দোকানের কথা ভুলিতে পারিল না। মনে হইল বৃত্তি সে পাইবে না, যেহেতু, রামকৃষ্ণবাবু সহর হইতে ইংরাজী স্কুলের মাষ্টার আনাইয়া দুইবেলা তাহাদের ক্লাশের প্রাণকৃষ্ণকে পড়াইতেছেন; সে আজকাল মোটা ইংরাজী বই হইতে অঙ্ক কষিতেছে। কাজেই আর উপায়

নাই। তিন মাসের মধ্যেই তাহাকে নিতাই মুদীর দোকানের ভীমরুলের ঝাঁকের মধ্যে গিয়া বসিয়া মিছরী ওজন করিতে হইবে এবং পয়সা গুনিতে ভুল হইলে মধুর মত দুইবেলা কানমলা খাইতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে প্রাণহরির মাথায় এক বুদ্ধি খেলিল—তখন হইতে নিতাইয়ের তামাক সাজিয়া ফরমাস খাটিয়া যদি তাহাকে কিঞ্চিৎ নরম করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে হয়তো নিতাই তাহাকে মুদীখানার দোকানে না রাখিয়া, আড়তের ফরাসের চাদর ঝাড়িবার কাজে লাগাইতে পারে। সে কাজ ভাল—আড়তে ভীমরুল অথবা বোলতার উপদ্রব নাই। ভাবিতে ভাবিতে প্রাণহরি দুটি টোপাকুল কুড়াইয়া লইয়া চিবাইতে চিবাইতে অন্যমনস্কভাবে বাজারের দিকে চলিয়া গেল।

২

নিতাই ময়রাকে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া তাহার অনুমতিক্রমে প্রাণহরি ডাল চালের ঝাঁকার সম্মুখে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে মধুর নিকট হইতে ওজন দেওয়া শিক্ষা করিতেছিল। বাঁ হাতের বুড়া আঙুল কায়দা মাফিক পাল্লাতে ছোঁয়াইতে পারিলে কেমন করিয়া সেরকে এক ছটাক মাল কম দেওয়া যায় মধু তাহাকে তাহাই শিখাইতেছিল। কিন্তু প্রাণহরি কৌশলটি আয়ত্ত করিতে পারিতেছিল না। শেষে বিব্রত হইয়া প্রাণহরি প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, কম না দিলে কি হয় মধুদা ?"

নিতাই সদ্য বঙ্ক মোহান্তের আখড়া হইতে গাঁজা টানিয়া আসিয়াছে, দাঁত খিঁচাইয়া কহিয়া উঠিল, "হয় তোর বাপের মুণ্ডু! কি হয় দে তো মোধো ওর কান ধরে বুঝিয়ে! দোকানদারী শিখতে এসেছে—যা গরু চরাগে যা।" প্রাণহরি ভয়ে মধুর নিকট হইতে দুই হাত সরিয়া বসিল। কিন্তু উঠিল না।

প্রাণহরি ভবিষ্যতের কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময় কে ডাকিল, "তুই সকালবেলা দোকানে বসে কেন মিতে ?"

প্রাণহরি মুখ তুলিয়া দেখিল প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণহরি কথা বলিবার পূর্বেই প্রাণকৃষ্ণ পকেট হইতে কাগজে মোড়া একটি পদার্থ বাহির করিয়া কহিল, "আয় পাটালী খাবি। মা দিয়েছে।" প্রাণহরি ধীরে ধীরে মাচান হইতে নামিয়া আসিয়া প্রাণকৃষ্ণের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। পাটালীখানা ঠিক

সমান দুই ভাগে ভাঙ্গিয়া একভাগ প্রাণহরির হাতে দিয়া প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "খা! খুব ভাল পাটালী, কাল আমাদের জমিদারী থেকে এসেছে!" প্রাণহরি পাটালী হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, খাইল না। প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "খাচ্ছিসনে যে মিতে! কি হয়েছে তোর আজ?"

উত্তরের জন্য প্রাণকৃষ্ণ প্রাণহরির মুখের দিকে চাহিয়াই দেখিল প্রাণহরির চোখ ছল ছল করিতেছে। প্রাণকৃষ্ণ নিজের ভাগের পাটালীখানা মুখের কাছ হইতে নামাইয়া পকেটে পুরিয়া প্রাণহরির দুই হাত ধরিয়া কহিল, "বল মিতে কি হয়েছে? নিতাই গেঁজেলটা মেরেছে বুঝি? কেন এলি ওর দোকানে?"

এত প্রশ্নের জবাব প্রাণহরি দিল না, কহিল, "দোকানদারী শিখছিলাম।"

প্রাণকৃষ্ণ আশ্চর্য হইয়া কহিল, "দোকানদারী! আজ বাদে কাল পরীক্ষা, এখন দোকানদারী কি রে? পড়বি নে আর?"

প্রাণহরি বলিল, "বাবা আর পড়াবে না বলেছে!

প্রাণকৃষ্ণ প্রশ্ন করিল, "কেন?"

প্রাণহরি বন্ধুর কাছে প্রাতঃকালের ঘটনা বিন্দুবিসর্গও গোপন করিল না। অকপটে সমস্তই কহিয়া গেল।

শুনিয়া প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "তুই বৃত্তি পাবি মিতে! সত্যি বলছি।"

প্রাণহরি কহিল, "কেমন করে? আমি যে তোর মত অঙ্ক জানিনে।"

"না জানলিই বা। আমি ফাস্ আর তুই সেকেন হবি।" প্রাণকৃষ্ণ কহিল।

প্রাণহরি হতাশ হইয়া কহিল, "তাতে তো আর জলপানি পাব না।"

প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "সেকেন হলেই পাবি। আমি দাদাবাবুকে বলব যে এবার থেকে ফাস আর সেকেন দু'টো বৃত্তি দিতে হবে।"

প্রাণহরির মুখ উজ্জ্বল হইল, হাসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "পারবি?"

প্রাণকৃষ্ণ বাঁ হাতে প্রাণহরির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বাঃ রে! পার্ব না আবার! আমার দাদাবাবু আমার কথা শুনবে না মিতে?"

প্রাণকৃষ্ণের কথা শুনিয়া প্রাণহরি হাসিয়া ফেলিল। তাহার পরই উভয় বন্ধু গলা জড়াজড়ি করিয়া পূর্বোক্ত টোপা কুলের গাছের দিকে প্রস্থান করিল।

৩

তাহাদের ক্লাশে দুইটি বৃত্তিদানের প্রস্তাব শুনিয়া রামকৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন, "কেন যাদু, ভয় হয়েছে, ফাষ্ট হতে পারবে না বুঝি? তা হবে না কিন্তু, ফাষ্ট হওয়া চাই।"

প্রাণকৃষ্ণের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিল। ভয় নহে, বন্ধুর উপকারের জন্যই সে প্রস্তাব করিয়াছে, সে কথাটি সদম্ভে বলিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু সাহস হইল না, কেননা বলিতে গেলেই প্রাণহরির কথা বলিতে হইবে। এদিকে প্রজার ছেলে প্রাণহরির সহিত মিতালি করিতে জননী এবং পিতামহ উভয়েরই নিষেধ ছিল। কাজেই উভয়সঙ্কটে পড়িয়া দাদামহাশয়ের শ্লেষটি বিনা বাক্যে প্রাণকৃষ্ণ স্বীকার করিয়া লইল এবং খানিক্ষণ ধরিয়া রামকৃষ্ণবাবুর মহাভারতখানা নাড়াচাড়া করিয়া প্রস্থান করিল।

রাত্রি ন'টায় প্যাসেঞ্জার গাড়ী হুস্‌হুস্ করিয়া চলিয়া গেল, তবু আজ প্রাণকৃষ্ণের ঘুম আসিল না। বারবার প্রাণহরির কথাই মনে পড়িতে লাগিল। বৃত্তি যদি সে না পায়, তাহা হইলে গাঁজাখোর নিতাই ময়রার দোকানে সে বাতাসা ওজন করিবে, আর প্রাণকৃষ্ণ তাহারই সম্মুখ দিয়া স্কুলে যাতায়াত করিবে, তাহা কেমন করিয়া সম্ভব? ভাবিতে ভাবিতে প্রাণকৃষ্ণ উঠিয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরে চাহিল। বাজারের সেই অশ্বত্থ গাছটা আবছায়া দেখা যাইতেছে। গত বৎসর কালীপূজার রাত্রিতে বারোয়ারীতলায় "দুই বন্ধু" নাটকের অভিনয় হইতেছিল। প্রাণকৃষ্ণ ও প্রাণহরি পাশাপাশি বসিয়া যাত্রা শুনিতেছিল। শেষের দিকে ভাবাবিষ্ট হইয়া দুইজনেই কাঁদিয়া ফেলিল। প্রাণকৃষ্ণ বুঝিল, জগতে যার বন্ধু নাই তাহার কেহ নাই। প্রাণহরি কি বুঝিল তাহা সে জানে না; কিন্তু দুজনেই এক সঙ্গে ফিরিবার পথে ওই অশ্বত্থতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাণহরি ভয় পাইয়া কহিল, "এইখানটায় এলেই গা ছম্‌ছম্ করে।" প্রাণকৃষ্ণ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ভয় কি ভাই? আমরা দু'জনেই তো 'প্রাণ' আয়, দু'জনা বন্ধু হই।" প্রাণহরি তৎক্ষণাৎ রাজী হইল এবং দু'জনেই যাত্রার পালার বন্ধুদ্বয়ের বক্তৃতার যতগুলি কথা মনে ছিল উচ্চারণ করিয়া বন্ধু হইল। কেবল রাত্রিকালে এবং অমাবস্যা বলিয়া আকাশের সূর্য-চন্দ্রকে সাক্ষী করিতে পারিল না। অতএব বুড়া অশ্বত্থ গাছটাকে সাক্ষী রাখিল।

সমস্ত কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে অতি স্পষ্ট করিয়াই প্রাণকৃষ্ণের মনে হইল। তাহার চোখে জল আসিল।

* * *

পরদিন প্রাতঃকালে ভাগ অঙ্কের প্রণালী ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য কেবল রামহরিবাবু প্রাণহরির পৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া মুষ্টি উদ্যত করিয়াছেন এমন সময় আঙ্গিনায় প্রাণকৃষ্ণ প্রবেশ করিল। রামহরিবাবু উদ্যত মুষ্টি সম্বরণ করিলেন, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা প্রাণকৃষ্ণ দেখিয়া লইল। সহসা প্রভাতের সূর্যালোক তাহার কাছে অত্যন্ত ম্লান বলিয়া বোধ হইল। সে একবার অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে অঙ্কের খাতায় বদ্ধদৃষ্টি প্রাণহরির দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল এবং মার্বেলের থলিতে লুকাইয়া প্রাণহরির মাতার জন্য যে নূতন আলু আনিয়াছিল, সেগুলি চৌমাথার ডোবার জলে ঢালিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিল।

স্কুলে পৌছিয়াই প্রাণহরি দেখিল বেঞ্চের এক কোণে প্রাণকৃষ্ণ চুপ করিয়া বসিয়া ভূগোল পড়িতেছে। প্রাণহরি কহিল, "আজ আমাদের বাড়ী সকাল-বেলা তুই গেছলি মিতে?"

প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "হ্যাঁ।"

প্রাণহরি প্রশ্ন করিল, "কেন?"

দাদামহাশয়ের সহিত গত সন্ধ্যায় যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহাই বন্ধুকে জানাইয়া, বন্ধুর বৃত্তিলাভের একটি সুবিধাজনক উপায় উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিবে, এই অভিপ্রায়েই প্রাণকৃষ্ণ বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছিল। কিন্তু প্রাতঃকালে বন্ধুর যে নির্যাতন সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহার পর আর এ নিদারুণ সংবাদ সে প্রাণহরিকে দিতে পারিল না, সংক্ষেপে কহিল, "তোকে দেখতে।"

প্রাণহরি কহিল, "আর সকালবেলা যাসনি মিতে। তোদের গণশা চাকর খেজুর রস পাড়তে আমাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখছিল, তোর দাদুকে বলে দেবে।"

প্রাণকৃষ্ণ শুধু কহিল, "ব'য়ে গেল।" এই সময় মাষ্টার আসিয়া পড়িলেন, কথাবার্তা আর অগ্রসর হইল না।

ছুটির পর অকস্মাৎ প্রাণকৃষ্ণ প্রাণহরিকে বারান্দার এককোণে ডাকিয়া নিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "তোর বাবা তোকে মারে মিতে ?"

প্রাণহরি কহিল, "হুঁ ।"

প্রাণকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

প্রাণহরি কহিল, "বৃত্তি পাইনি তাই ।"

প্রাণকৃষ্ণ বলিল, "বলিস তোর বাবাকে আর তোকে মারে না যেন ! বাবা জমিদারী থেকে ফিরলে তাকে বলে তোকে জলপানি দেওয়াব !"

কাল দাদামহাশয়কে বলিয়া বৃত্তিদানের প্রস্তাব ছিল আজ আবার বাবার জন্য প্রতীক্ষা করিবার কি প্রয়োজন আছে, সে প্রশ্ন আর প্রাণহরির মনে উঠিল না। সে খুশী হইয়া কহিল, "বলব ।" সপ্তাহ পরে যখন প্রাণকৃষ্ণের পিতার চিঠি আসিল যে তিনি দুই মাসের মধ্যে ফিরিতে পারিবেন না, তখন প্রাণকৃষ্ণ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। বন্ধুকে বৃত্তিদানের আর কোনও উপায় সে চিন্তা করিয়া উঠিতে পারিল না। এদিকে পরীক্ষারও আর দিন সাতেক মাত্র বাকী আছে। এক রাত্রে অঙ্ক যদি সমস্ত ভুলিয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলে বেশ হইত। কিন্তু তাহাতেও বিপদ আছে। প্রাণহরির নীচে হইলে বাড়ীর মাষ্টার গোপালবাবু তাহার কান টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। পর্দার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার মাতাও বিধু ঝির মারফতে গোপাল মাষ্টারের এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছেন। এখন যদি জ্বর হইয়া পড়ে তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হয়। কিন্তু জ্বর হয় কি করিয়া ? অনেক ভাবিয়া স্থির করিল এখন দেবতা ছাড়া আর উপায় নাই। কলুপাড়ার মা মঙ্গলচণ্ডী জাগ্রত দেবতা। মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম ও সেই সঙ্গে পাঁচ সিকা প্রণামী মানসিক করিয়া সাত দিনের জন্য অসুখের প্রার্থনা জানাইয়া প্রাণকৃষ্ণ সেদিন কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করিল। রাত্রে মনে হইল শীত যেন একটু বেশী বোধ হইতেছে। জ্বরের পূর্বলক্ষণ ভাবিয়া সে দু'টি করতল কপালে ঠেকাইয়া মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করিল। কিন্তু সকালে কপালে হাত দিয়া দেখিল কপাল ঠাণ্ডা। বুঝিল সে বন্ধুর অদৃষ্ট মন্দ, মঙ্গলচণ্ডীর তাহার উপর দয়া নাই। তখন মঙ্গলচণ্ডী ছাড়িয়া সে বাজারের বুড়াশিবের উদ্দেশে যথেষ্ট পরিমাণ সিদ্ধি

এবং কাঁচা দুধ মানৎ করিল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। হতভাগ্য প্রাণহরির প্রতি কোনও দেবতাই প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণের আর চিন্তার অবধি রহিল না। সমস্ত দিন প্রাণহরির শুষ্কমুখ, রামহরিবাবুর বদ্ধ মুষ্টি, নিতাই ময়রার রক্তচক্ষু পর্যায়ক্রমে প্রাণকৃষ্ণের মনে পড়িতে লাগিল। পরশু পরীক্ষা, প্রাণহরি নিশ্চয়ই তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছে। বৃত্তিলাভের কোনও ভরসা নাই, একথা শুনিলে বন্ধুর কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিতেও প্রাণকৃষ্ণের গা কাঁটা দিয়া উঠিল।

সন্ধ্যায় নিতান্ত অস্থির হইয়া প্রাণকৃষ্ণ লেভেল ক্রশিংএর রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় দেখিল, তাহাদের বাড়ীর গরুর রাখাল বাগদীদের ছেলে গুপী রেল লাইনের ধারে বসিয়া বাঁশের আড়বাঁশী বাজাইতেছে। গুপীকে দেখিয়াই প্রাণকৃষ্ণের মনে আশু বিপন্মুক্তির একটু ক্ষীণ আশা জাগিয়া উঠিল। গুপী জ্বরের অছিলায় মাসে আট দশ দিন কাজ কামাই করে,—জ্বর হইবার উপায় তাহার জানা সম্ভব। প্রাণকৃষ্ণ ডাকিল, "গুপী ?"

গুপী মুখ ফিরাইয়া প্রাণকৃষ্ণকে দেখিল। তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কি দাদাবাবু ?"

প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "কাউকে বলবিনে বল্ ? মা কালীর দিব্যি !"

গুপী তৎক্ষণাৎ শপথ করিল। প্রাণকৃষ্ণ প্রশ্ন করিল, "তুই জ্বর করিস্ কি ক'রে ?"

গুপী ভয় পাইল। পাছে দাদাবাবু কর্তাবাবুকে বলিয়া দেয় সেই ভয়ে কহিল, "জ্বর এমনি হয়।"

প্রাণকৃষ্ণ রাগিয়া উঠিল, "এমনি জ্বর কক্ষনো হয় না। সত্যি কথা বল। কাউকে বলব না আমি।"

গুপী আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "মুন্সীদের এঁদো পুকুরে গুণে গণ্ডা আষ্টেক ডুব দিলেই জ্বর আসে দাদাবাবু। দু' বগলে পেঁয়াজ রাখলেও গা তাতে, কিন্তু পহর খানেকের বেশী থাকে না।"

প্রাণকৃষ্ণ "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল।

* * *

সতর্ক দৃষ্টিতে চারি দিক দেখিয়া মুন্সীদের এঁদো পুকুরের বাঁশঝাড়ের মধ্য হইতে যখন প্রাণকৃষ্ণ বাহির হইল তখন সূর্য ডুবিয়াছে। পথে আসিয়া তাহার মনে হইল যে গুপী সত্য কথাই কহিয়াছে,—সর্বাঙ্গে অত্যন্ত শীত বোধ হইতেছে ও মাথাও টন্‌টন্‌ করিতেছে। প্রভাতে গুপীকে একটা সিকি বখশিস দিবে স্থির করিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাড়ী ফিরিল।

*　　　*　　　*

দুই দিন প্রাণকৃষ্ণের সঙ্গে প্রাণহরির সাক্ষাৎ হয় নাই। পরীক্ষার দিন আসিয়া প্রাণহরি তাহার বন্ধুর সন্ধান করিয়া শুনিল যে সে পরীক্ষা দিবে না। কারণ কেহ কিছু বলিতে পারিল না। স্কুল হইতে ফিরিবার পথে প্রাণকৃষ্ণের পড়িবার নীচের ঘরখানির রুদ্ধ জানালায় মুখ লাগাইয়া সে সতর্ক মৃদুস্বরে ডাকিল, "মিতে ?" প্রথম আহ্বানের কোনও জবাব আসিল না। দ্বিতীয়বার ডাকিতেই পাশের একটি জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বিধু ঝি কহিল, "তেনার অসুখ গো, অসুখ! বের হবেক্ নি!"

প্রাণহরির মুখখানি ছোট হইয়া গেল। শঙ্কিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "খুব অসুখ ঝি মাসী ?"

বিধু ঝি কহিল, "খুব বলে খুব! আকাশ পাতাল জ্বর!"

বন্ধুকে একবার দেখিবার প্রার্থনা জানাইবার পূর্বেই বিধু ঝি জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

অঙ্কের পরীক্ষার দিন স্কুলের পথে প্রাণহরি সংবাদ পাইল যে প্রাণকৃষ্ণ জ্বরের ঘোরে 'জলপানি' 'জলপানি' বলিয়া চেঁচাইতেছে। সংবাদ শুনিয়াই সে বন্ধুর বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীর সদর দরজার রাস্তায় সারি সারি মোটরকার দেখিয়া ভয়ে আর বাড়ীতে ঢুকিতে তাহার সাহসে কুলাইল না।

*　　　*　　　*

পরের কাহিনী অত্যন্ত সাধারণ। মাস খানেক পর একদিন প্রাতঃকালে স্কুলের নোটিশ বোর্ডে পরীক্ষার ফল টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। প্রাণহরি প্রথম হইয়া জলপানি পাইয়াছে। প্রাণহরি সংবাদটি দেখিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও হাসিতে পারিল না। স্কুলের দরজার গায়ে লাগানো পুরাতন ছিন্নপ্রায় নোটিশটির দিকে বার বার চাহিতে চাহিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

নোটিশে লেখা ছিল,—"অত্র স্কুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র শ্রীমান প্রাণকৃষ্ণ তালুকদারের জ্বরবিকার রোগে পরলোকগমন উপলক্ষে অত্র স্কুল অদ্য তারিখ হইতে সাত দিন বন্ধ রহিল।"

পরাজয়

ঘৃত-তত্ত্ব

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এর মধ্যে গদাধরের দোষ কতটুকু আপনারাই বিচার করিবেন, আমি কাহিনীটুকু বিবৃত করিয়াই খালাস।

গদাধরের বাপ নিরুপম পাল একজন পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন। একেবারে গোড়ায় একটা আড়তে খাতা লিখিতেন, আর বাজাইয়া বাজাইয়া টাকা গুণিতেন। টাকা চেনা থেকে একটু একটু করিয়া বাজার চিনিতে লাগিলেন, তাহার পর অল্পে অল্পে নিজের ফলাও ব্যবসা ফাঁদিয়া বিষয়সম্পত্তি যাহা করিবার সবই করিলেন। কিন্তু একটা দুঃখ রহিয়া গেল, গদাধরকে টাকার মতো করিয়াই কয়েকবার গভীর অভিনিবেশের সহিত বাজাইয়া বাজাইয়া বুঝিলেন, তেজারতের বাজারে এ-ছেলে অচল। বুদ্ধিটা বেশ একটু মোটা।

তবে ধর্মের দিকে মতিগতি আছে, টাকা উড়াইবে এমন ভয় নাই। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নিরুপম ব্যবসা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে গুটাইয়া লইলেন এবং টাকা যাহা হইল সেটা গোটা দুই ব্যাঙ্কে জমা দিয়া দিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ব্যবসার দিকে তুমি হঠাৎ যেতে চেও না বাবা, ব্যাঙ্ক থেকে মোটা সুদ পাবে, তার যতটুকু দরকার হয় ততটুকু নিয়ে বাকিটা আবার জমা দিয়ে যাবে মাসে মাসে। পুকুর, বাগান, ধান-জমি সব রইল, অভাব হবে না। বাড়িতে বিগ্রহ রয়েছেন, তাঁর সেবাতেই কাটিয়ে দিও, তিনিই রক্ষা করবেন যা-সব রেখে গেলাম।'

একটু থামিয়া বলিলেন, 'তোমার ছেলের মধ্যে যদি আসে তার ঠাকুরদার

বুদ্ধি—এমন হয় তো অনেক সময়—সে তখন আবার ফেঁদে নেবে নিজের কাজ।'

শেষের এই কথাগুলির মধ্যে বেশ একটু খোঁচা ছিল, কতকটা সেই অভিমানেও, কতকটা প্রকৃত অপটুতা আর আলস্যের জন্যও গদাধর গেল না ব্যবসার দিকে। রাধারমণের সেবাতেই নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়া দিল, ফলে, জাতব্যবসায়ী হিসাবে মস্তিষ্কের কোনখানে যদি হয়তো কোথাও ছিল একটু বুদ্ধি, সেটুকুও অপসৃত হইয়া সমস্ত দেহ মন নিটোলভাবে ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সংসাবটি ছোট ; স্ত্রী সরোজিনী, দুটি কন্যা—সরযূ আর যমুনা, আর একটি ছেলে, কেশব। ছোট হইলেও কিন্তু দুর্বহ গদাধরের পক্ষে। সরোজিনীকে ঘরে আনিবার সময় তাঁহাব রাশিচক্রের খোঁজ লওয়া হইয়াছিল কিন্তু মেজাজের খোঁজ লওয়া হয় নাই , অত্যন্ত মুখরা, নিত্যই কলহ হইবার কথা, শুধু গদাধর নির্বিবাদে সব কথা মানিয়া লইয়া রাধারমণের কাছে ধরণা দিয়া পড়ে বলিয়া বিনা গোলযোগে কাটিয়া যাইতেছে। বড মেয়ে সরযূটি একেবারেই বোবা : বিবাহ হইবে না। রাধাবমণের পায়ে সমর্পণ করিয়া যতটা সম্ভব মনের বোঝা হালকা করিয়াছে গদাধর। ছোট মেয়েটি তেমনি বাচাল, এককালে মাকে ছাড়াইয়া যাইবে। আপাতত বিবাহ দেওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। এক কথায় পাঁচ কথা বলিয়া জবাব দেয়। তিনবার তিন জায়গা হইতে দেখিতে আসিয়াছে, ফিরিয়া গিয়া আর উচ্চবাচ্য করে নাই। এ মেয়েটিকেও রাধারমণের পায়ে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার ইচ্ছা ছিল, স্বপ্ন পেলে তিনি জটিলা-কুটিলাকে লইয়া হিমসিম খাইতেছেন, আর ভেজাল বাড়াইবার উৎসাহ বা অভিরুচি নাই। বাকি থাকে কেশব। ছেলেটি ছোটদিদির মতো কথা কহিতে কহিতে এক এক সময় বড়দিদির মতো হঠাৎ মৌন আর গম্ভীর হইয়া যায়। ফলে তাহাকে অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া মনে হয় ; ও যেন বাপের মূঢতার জন্য ঠাকুরদাদার বিশেষ আশীর্বাদ লইয়া তাঁহার ব্যবসা আবার ফলাও করিয়া ফাঁদিবার উদ্দেশ্যে জন্ম লইয়াছে ; কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয় গদাধরের। বড় মনোকষ্টে কাটিতেছে এবং সেইজন্য সমস্ত মনটাকে রাধারমণের পায়ে ঢালিয়া কোনমতে কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

অর্ধেক জীবন প্রায় কাটিয়াও আসিয়াছে এমন সময় লড়াই আসিয়া পড়িল এবং মিলিটারিতে কতকগুলা কাঁচামাল সরবরাহ করিবার ঠিকা লইয়া, বৈঁচির কাশীনাথ একজন ভালো মূলধনীর সন্ধানে বাহির হইয়া বেহালায় আমাদের গদাধরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লোকটার মানুষ পটাইবার অসাধারণ ক্ষমতা। মন্দির থেকে টানিয়া গদাধরকে বাহির করিতে যা-একটু বেগ পাইতে হইল, তাহার পর কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে ভিজাইয়া ফেলিল। গদাধরের কোথায় কে আছে সব জানে, টাকা না খাটাইবার কারণও অবগত আছে, আসিয়াছেও একটা সম্পর্ক দাঁড় করাইয়া। বলিল, 'আপনি আমায় বলবেন কি? আমি আপনাকে টাকা বের করতে মানা করতাম, নিরুপম কাকা কি যা-তা লোক ছিলেন একটা, যে মিছিমিছি বারণ করে যাবেন? আর ব্যবসাতে কি ছিল শুনি? টাকায় আধ পয়সাও টানতে পারছিল না। আপনি দেখতেন না, ওদিকে খেয়াল ছিল না; কিন্তু এতবড় একটা আড়তদারের ছেলে এটুকু ওয়াকিবহাল তো ছিলেনই? "না" বললে শুনব কেন, মশাই? লোক দেখে তার নজর কতদূর যায় তা টের পাব না?'

এ ধরনের তারিফ গদাধরের কানে এই প্রথম গেল, অল্প একটু হাসিয়া বলিল, 'দেখতাম না তো সেইজন্যই, মশাই। ফলটা কি দেখে বলুন?'

'ঐ দেখুন, আমি বলব কি, নিজের মুখেই প্রকাশ করতে হ'ল আপনাকে। টাকায় যখন আধলাও অর্জন করতে পারছে না তখন সে টাকা বাজারে ছড়িয়ে লাভ কি মশায়? না-হক হায়রানি বইত নয়!'

গদাধরের আত্মপ্রসাদ জমিয়া উঠিয়াছে, একটু ব্যঙ্গহাসির সহিত বলিল, 'তাই গুটিয়েও নিতে হ'ল শেষ পর্যন্ত বাবাকে।'

কাশীনাথও একটু মৃদু হাসিয়া মুখটা নিচু করিল। তাহার পর বলিল, 'আপনিও তো ঐ একই কারণে বের করেননি টাকাটা? তাহলে তাঁতে আপনাতে তফাতটা হ'ল কোথায়? যাক্, ধরে নিচ্ছি তিনি বারণ করে গেছেন বলেই খাটান্‌নি টাকাটা এতদিন, এযুগে বাপের কথাই বা রাখছে ক'টা লোক, মশাই? যেদিক দিয়ে যান, যশটা গদাধর পালেরই। আমিও আসতাম কি?—আসতাম না, যদি আমি যে-ব্যাপার নিয়ে এসেছি সেটাকে ব্যবসা বলা যেত।'

গদাধর একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিতে বলিল, 'না, একে ব্যবসা বলব না,—টাকায় এক আনা—ত্ব'আনা—চার আনা—আট আনা, এমন কি, টাকায় টাকা হ'লেও তাকে ব্যবসাই বলব না আমি।'

শুনিতে শুনিতে গদাধরের মুখটা হাঁ হইয়া গিয়াছিল, দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া সেইভাবেই চাহিয়া রহিল। কাশীনাথ একটু অপাঙ্গে চাহিয়া লইয়া বলিল, 'কিন্তু যখন দেখছি টাকায় ত্ব'টাকা লাভ—একটা টাকা সঙ্গে সঙ্গে তিন টাকা হয়ে যাচ্ছে…'

গদাধরের হাঁ-টা একেবারে দ্বিগুণ হইয়া গেল, চক্ষু ত্বইটাও যেন ঠেলিয়া আসিল, কাশীনাথ একটু হাসিয়া বলিল, 'আপনি এইতেই চমকালেন! আরও যে-সব রহস্য আছে তা শুনলে তো তাক লেগে যাবে আপনার। লড়াইয়ের বাজার যে মশাই, সেকথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? একে তিন, এ তো হেসে খেলে আসবে মশাই, যাকে বলে জুতো মেরে। এক হাজার ঢালুন—সঙ্গে সঙ্গে তিন হাজার, তিন হাজার ঢালুন—ন'হাজার, ন'হাজার ঢালুন একেবারে তিন-ন'য় সাতাশ। এর জন্যে কারুর কাছে খোসামোদ করতে হবে নাকি? তারপর—অ্যাডভান্স।…'

কথাটা বলিয়া একটু আড়চোখে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল; গদাধর প্রশ্ন করিল, 'সেটা কিরকম?'

কাশীনাথ ভ্রূ কুঁচকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, 'বাঃ, তোমরা প্রকাণ্ড এক লড়াই ফেঁদে বসেছ সাহেব, তোমাদের এখন লাখ লাখ টাকার মাল চাই, আমি গরীব কনট্রাকটার, অত টাকা হঠাৎ বের করি কোথা থেকে? হদ্দ কুড়িয়ে বাড়িয়ে হাজার কতক হতে পারে বাড়ি বাঁধা দিয়ে, বৌয়ের গহনা বেচে।… হুকুম হল—বেশ লেগে যাও…। একবার আরম্ভ করে দিলেন, তারপর বিশ্বাস যেই জমে গেল, আগাম টেনে যাননা কত টানতে পারেন, দশ হাজার টাকা যদি বের করতে পারলেন, আপনি লাখখানেকের লেন-দেন লাগিয়ে দিন না। কে মানা করছে? তবে সে কি আর যার-তার কর্ম? আমি একেবারে গোড়ার তিন বেটাকে হাত করেছি কি-না!'

গদাধর প্রশ্ন করিল, 'কত টাকার কাজ ধরেছেন?'

'সব বলছি আপনাকে। ধরা যেত অনেক, কিন্তু অত লোভ করলাম না একেবারে। ত্ব'হাজার টিন ঘিয়ের দরকার ওদের, আমি ধরলাম পাঁচশো টিন।

প্রতি টিনে গড়ে আঠারো সের, দাম বত্রিশ, এই ষোল হাজার টাকা বের করতে হচ্ছে আমায়। পাচ্ছি প্রতি টিনে একশো, মোট পঞ্চাশ হাজার। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে যদি ত্রিশ হাজারও না হাতে আসে তো এমন ঠিকে নিতে যাই কেন মশাই এই লড়াইয়ের বাজারে? বুঝুন। দেখতে দেখতে এই যে লাল হয়ে যাচ্ছে—আপনি আমি একটুকরো লোহা দেখতে পাই না চোখে, আর সব চারতলা পাঁচতলা বাড়ি হাঁকাচ্ছে, সে কি এমনি?···মাড়োয়ারীরা তো গোরাদের সামনে এগুতে পারে না, টাকা নিয়ে ঝুলোঝুলি, মনে মনে বললাম, রোসো, আগে দেখি, স্বজাতি কেউ রাজী না হয়, তখন তোমরা।··· তারপর হঠাৎ আপনার নামটা মনে পড়ে গেল।'

গদাধর যতটা লুব্ধ এবং বিস্মিত হইল, ততটা তাড়াতাড়ি কিন্তু রাজী হইল না; ক্রমাগতই সুদের টাকা জমা দিয়া আসল না ভাঙিবার একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে, বলিল—ভাবিয়া দেখিবে। কাশীনাথ লাভের সবচেয়ে বড় রহস্যটা ভাবিয়াছিল নিজের হাতে রাখিবে, দুই দিন চেষ্টা করিয়াও যখন দেখিল মন ভরিয়া আসিলেও টাকাটা বাহির করিতে চাহিতেছেন না, তখন সেটাও প্রকাশ করিয়া দিল। বলিল, 'এখনও কিন্তু আপনাকে আসল কথাটা বলিনি। অবিশ্যি না বলবার হেতু সাহেব-বেটাকে বাগাতে পারছিলাম না এতদিন, কাল ঠিক করেছি, সে শুনলে এক টাকায় দু'টাকা লাভ নেহাত ছেলেখেলা বলে মনে হবে। সে কথা কিন্তু···'

গদাধর একটু সরিয়া আসিয়া বসিলে, আরও কাছে ঘেঁষিয়া, গলা আরও খাটো করিয়া বলিল, 'কিন্তু ঘি বেটাদের দিচ্ছে কে, মশাই? ও প্রায় যা পাচ্ছেন তার সমস্তটাই লাভ।'

নিত্য নূতন ধরনের কথা শুনিয়া গদাধর একেবারে অভিভূত হইয়া আসিতেছিল, সেসবের উপর আরও কিছু যে থাকিতে পারে যেন ধারণা করিতেই পারিতেছে না; প্রশ্ন করিল, 'তার মানে?'

'তার মানে টিনে মুখের কাছটায় ইঞ্চি দুয়েক করে ঘি, খুরজার এক নম্বর, বাকি সব···আরও স্পষ্ট করে বলতে হবে নাকি? ভি-ই-জি-ই-টি-এ-বি-এল্-ই !!'

ঠোঁটের কোণটা কামড়াইয়া একটা চোখ বুজিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।

২

কিন্তু এ কাহিনীটা ব্যবসা-সম্পর্কীয় নয়, বিবাহের। এইবার সেই কথাতেই আসা যাক।

তৃতীয় দিনের কথা। টাকা গদাধর বাহির করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। কথাটা একবার স্ত্রী সরোজিনীর নিকট পাড়িতে হইবে, মেজাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অবসর খুঁজিতেছে, এমন সময় সন্ধ্যা ঠিক উতরাইয়া যাইবার পর হঠাৎ বিধু ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইল; বলিল, 'দাদা, মেয়েটার বিয়ে দেবে তো বলো, ভালো সম্বন্ধ হাতে এসেছে একটা। নিজে হতে সেধে এসেছে, লেগে যেতে পারে।'

গদাধর প্রশ্ন করিল, 'লোকটা কে?'

'চেনা লোক আপনার। বৈঁচিতে বাড়ি, নাম কাশীনাথ কুণ্ডু; আপনার কাছে নাকি কি-একটা কাজ নিয়ে যাওয়া-আসাও করছে শুনছি। বললে— বিয়ের কথাটা আপনিই পাড়ুন ঘটকঠাকুর, উনি রাজী হন তখন আবার আমাদের দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ কথাবার্তা হবে। আপনি মুখপাতটা ধরিয়ে দিন।'

'তা রাজী হব না কেন? এ তো ওঁর দয়া। ছেলেটি?'

'ছেলেটি খুবই বাঞ্ছনীয়, যেমন উনি বললেন। ডাক্তারি পাস করেছে এবছর মেডিক্যাল কলেজ থেকে, আপাতত গ্রামেই বসবে, তারপর লড়াই শেষ হলেই বিলেত পাঠাবেন। দেখতে-শুনতে ভালো—বাপের চেহারা দেখছেনই আপনি। বিলেত পাঠাবার কথাটা না হয় বাদই দেওয়া যায় আপাতত; বাকি তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। নিজেরও ভালো রকমই সম্পত্তি আছে বলে মনে হ'ল, কলকাতাতে একখানা বাড়ি তুলছেন বললেন, সেও খোঁজ নিলেই টের পাওয়া যাবে…'

'খাঁই?—দিয়েছেন কিছু আন্দাজ?'

'খাঁই আছে। সেটা এ-বাজারে এমন কিছু বেশিও নয় যে তোমার দিতে কষ্ট হবে, তবে…'

'তবে?'

'তবে যেভাবে চাইছেন উনি, সেভাবে দিতে তুমি রাজী হবে কি না তুমিই জানো, যদিও আমি তো ক্ষতি দেখি না। উনি চাইছেন সতের হাজার টাকা

—তা দেওয়া যায়, ছেলে যেমন বলছেন যদি সেইরকম হয়—তবে উনি সবটা নগদ চান ; বলছেন গয়নাগাঁটি যা গড়াবার উনি নিজেই গড়িয়ে দেবেন।… …তা তোমার কী আপত্তি থাকতে পারে ? ওসব হ্যাঙ্গাম যত পরের ঘাড় দিয়ে যায় ততোই ভালো নয় কি ?…সোনার খাদ বেশি—প্যাটার্ন তেমন পছন্দসই নয়…কাজ কি বাবা ?—তোমাদেরই জিনিস তোমরাই দেখেশুনে গড়িয়ে নাও।…আমি যা বুঝি।'

ঘটক আরও যা-যা বোঝে বোঝাইয়া দিয়া বিদায় লইল। বলিল, পরদিন আবার আসিবে।

বিবাহের কথাটা স্ত্রীর কাছে পাড়িতে গদাধরের তত ভাবিতে হইল না, বাপের চেয়ে মায়েই এ বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন থাকে। ঘটকের কথাগুলা বেশ গুছাইয়া লইয়া প্রায় তখনি সরোজিনীকে গিয়া সব জানাইল। সরোজিনী মুখটা গম্ভীর করিয়া বলিল, 'আমি অমন চসমখোর মানুষের বাড়িতে মেয়ে দোব না।'

'কেন ?'

সরোজিনী রাগটা হদ্দ একবার কোনরকমে সামলাইয়া রাখিতে পারে, বেশ জোর গলাতেই একটু হাত নাড়িয়া বলিল, 'সে বোঝবার ক্ষমতা যদি তোমার থাকত তাহলে দু-দুটো ধুমড়ো মেয়ে এরকম আইবুড়ো হয়ে ঘরে পড়ে থাকত না। মেয়েকে আমার গয়না দিয়ে কাজ নেই, সব টাকা ওর ছিচরণে ঢালি, উনি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে ওড়ান। গয়নাই হ'ল মেয়ের স্ত্রীধন, নিজের বলতে যা-কিছু! ‥মিনসেকে একবার আমার সামনে এনে হাজির করতে পার ?'

গতিক দেখিয়া গদাধর নিজেই সামনে থেকে সরিয়া পড়িত, কিন্তু সম্বন্ধটা কেমন বড় পছন্দ হইয়া গেছে, একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, 'স্ত্রীধন নিয়ে যা বললে তুমি, সেটা ঠিকই, তবে লোকটা যে পায়ের ওপর পা দিয়ে টাকা ওড়াবার মানুষ নয় এটা আমি জানি।'

'কি করে জানলে ?'

গদাধর কাশীনাথের ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রস্তাবটা বলিল, শুধু টিনে ঘি ভরতি করিবার রহস্যটা বাদ দিয়া।

সরোজিনী একেবারে নির্বাক হইয়া খানিকক্ষণ এমনভাবে মুখের পানে

চাহিয়া রহিল যে, গদাধরেরও প্রায় বাক্‌রোধ হইবার মতো অবস্থা হইয়া পড়িল। সরোজিনী কোমরে তুইটা হাত দিয়া ঘাড়টা সামনে একটু আগাইয়া প্রশ্ন করিল, 'টাকা বের করে দিয়েছ তুমি? তোমায় না বাবা পইপই করে মানা ক'রে গেছেন? লোকটা যে জোচ্চোর নয়, কি করে জানলে?'

গদাধরের সব গোলমাল হইয়া গেল, বলিল, 'টাকা কখনও বের করে দিই? আর তা হলে তোমায় জিগ্যেস করতাম না? ব্যবসার কথাতে তো ভাগিয়েই দিয়েছিলাম। এটা ভাবলাম বিয়ের কথা বলছে—বিয়ে তো আর ব্যবসা নয়, তাই...'

'এর মধ্যে কত বড় ব্যবসাদারী মতলব আছে, সেটা ঢুকেছে তোমার মাথায়? অবশ্য নেহাত উড়িয়ে না দিয়ে যদি খাটায়ই ব্যবসাতে।'

গদাধর বিহ্বলভাবে মুখের পানে চাহিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

'তা হলে আমার কাছে শোন; আমি কেন, রাস্তার মুটেটাকেও ডেকে জিগ্যেস করলে সে বলে দেবে, তুমি টাকা দিলে মুনাফার অর্ধেক বখরা দিতে হবে তো তোমায়?—দিত কচু, তবু আইনের একটা ভয় থাকত তো?—কথাবার্তায় দেখেছে দিব্যি গোবরগণেশ লোকটা, ছেলের বিয়ে দিয়ে সমস্ত টাকাটা বের করে নিয়ে খাটাই—তখন মুনাফার ষোল আনাই আমার—কেউ আর চাইবার থাকবে না। দেখতে পাচ্ছ না? যত ক'টি টাকা ওদিকে চেয়েছিল ঠিক তত ক'টি টাকা চাইছে বিয়েতে। জোচ্চোরের কি একটা করে ল্যাজ হয়?'

গদাধর ঘামিয়া উঠিতেছিল, তবু ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে যে টিনে ঘি ভরতির কথাটা বলিয়া ফেলে নাই। এমন কী ছুতা করিয়া এখান থেকে সরিয়া পড়া যায় ভাবিতেছিল, স্ত্রী বলিল, 'ওসব লোকের কি ওষুধ জান?'

'কি?'

'কি তা তোমায় বলে কোনও ফল আছে?—তোমার মতন মেনিমুখো পুরুষকে?—আমি হলে জপিয়ে জাপিয়ে ওর কাছ থেকেই সমস্ত আঁতঘাত বুঝে নিয়ে ওকে বিল্বিপত্র শুঁকিয়ে দিতাম। তারপর নিজের কারবার নিজে ফাঁদতাম—ওসব লোকের ওই ব্যবস্থা। আমি আমার গাঁটের টাকা বের করে দোব, অন্যে তার মুনাফা তুলবে! কি বলে বলতে এলে তুমি কথাটা আমার কাছে? লোভ কি হয় না মানুষের? হয়, লড়াইয়ের বাজার ধুলোমুঠো

ধরতে সোনামুঠো ধরছে লোকে—বসে বসে দেখছি তো ? লোভ হয় বইকি, লোভ হয়ে আর কি অন্যায় হয়েছে—কিন্তু…'

গদাধরেরও একটা প্রবল লোভ হইতেছিল, একটু বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত হইবার, জীবনে অন্তত একবার ; বলিল, 'তা আমিই কি বসে আছি নাকি ? কিন্তু টাকা বের করতে গেলেই তুমি তো হৈ-হৈ লাগিয়ে দেবে। সব বুদ্ধির গোড়াতেই তো টাকা। হদিস জেনে নিয়েছি অনেক—এক একটা শুনলে তাক লেগে যাবে। কিন্তু টাকার বেলায়ই যে ঠুঁটো হয়ে বসে থাকতে হয়েছে, বাবা করে গেলেন বারণ, এদিকে তুমি…'

সরোজিনী ঘাড়টা একটু ফিরাইয়া শুনিতেছিল, বলিল, 'বলে যাও।… বারণ করে লোকে সাধ করে ? মাথায় যে ওদিকে……বেশ, কি কি হদিস আদায় করেছ, দুটো শোনাও দিকিন।'

'কেন, এই ধরো, আগামের কথাটা, যদি দশ হাজারের কাজ করি, এক লাখ…বেশ, এক লাখ না হোক, বিশ হাজারও তো…'

সরোজিনী ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, 'মস্ত বড় হদিস আদায় করে নিয়েছ তো ! ওগো, এও তোমার অপরের কাছে জেনে নিতে হ'ল ? পাটের চাষীও তো দাদন পায়—বিচি না ছড়াবার আগে !…মরিঃ ! মনে করলাম না জানি কি এক হদিস শিখে এলেন মদ্দ আমার !…যাও, ঘরে গিয়ে বোসো তো !' অবজ্ঞাভরে চলিয়া যাইতে যাইতে ঘুরিয়া বলিল, 'হদিস বরং ঐ সাহেবদের গিয়ে ধরা, তা পারবে ? যাও না কেন, পারা তো উচিত, পেটে বিদ্যে তো রয়েছে, মাথায় বুদ্ধি না থাক।'

গদাধরের মনের ভিতরটা তোলপাড় করিতেছিল,—আর নিজেকে চাপিতে পারিল না। টিনের রহস্যটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া না পড়ায় এতক্ষণ নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়াই মনে হইতেছিল, এবার স্ত্রীর বিদ্রূপ আর নিজের লোভের মাঝে পড়িয়া—সেটা নিজে হইতেই প্রকাশ করিয়া দিল,—একবার বুঝুক ব্যবসার রহস্য কাহাকে বলে !—কত গভীর তত্ত্বই না টানিয়া বাহির করিতে পারে সে !

সরোজিনী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, আরও দুই পা আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'কী ! টিনের সমস্তটায় ভেজিটেবল দিয়ে ভ'রে মুখে দু'ইঞ্চি খুরজার এক নম্বর ঘি দিয়ে—ব্যবসা করবে ? এই বুদ্ধি দিয়েছে, আর সেই বুদ্ধি

নিয়ে তুমি লাফালাফি করছ ?—রাধারমণের মন্দির আর ভালো লাগছে না, না ?—জেলে গিয়ে উঠবার জন্যে পা চুলকুচ্ছে।···কি জোচ্চোর রে বাবা !—কখন আসবে সে-মিনসে বলো দিকিন আমায়।···ভেতরে সবটা মেকী, বাইরে একেবারে এক নম্বর !···এই মানুষের সঙ্গে ব্যবসা করবে !—শুধু তাই নয়, এই মানুষের ঘরে মেয়ে দেবে···নিজের মেয়ে দেবে—বোঝ একবার !—যে লোক সলা দিচ্ছে যে শুধু বাইরের চেহারাটা দেখিয়ে, ভেতরে ভূষিমাল···'

কথাগুলা বলিতে বলিতে সরোজিনী আবার ফিরিয়া যাইতেছিল, ঘরের চৌকাঠের ভিতর একটা পা দিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল, একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ফিরিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, দেখে তাহার পিছন ফেরার সুযোগে স্বামী ইতিমধ্যেই অন্তর্ধান হইয়াছে।

গিয়া বারান্দায় একটা থাম ধরিয়া সামনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল, অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। বেশ খানিকক্ষণ গেল।

এত গুরুতর ব্যাপার সরোজিনীর কাছে এত শীঘ্র শেষ হয় না। গদাধর রাধারমণেরই শরণ লইতে যাইতেছিল, একেবারে এরকম নিস্তব্ধতা দেখিয়া খুব পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে আসিতেই একেবারে সামনে পড়িয়া গেল।

সরোজিনী বলিল, 'তোমায়ই খুঁজছিলাম।'

গদাধর বলিল, 'মনে হ'ল যেন ডাকছ, তাই মন্দিরের দিক থেকে ফিরে এলাম। কি ?'

'দোব মেয়ের বিয়ে আমি, ঠিক করো।'

গদাধর আগাইয়া আসিতেছিল, বিমূঢ়ভাবে উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল, 'কোথায় ?'

'বৈঁচিতে। যেখান থেকে সম্বন্ধ এনেছ।'

গদাধর নিজের চক্ষুকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, আমতা-আমতা করিয়া প্রশ্ন করিল, 'খাঁই মিটোবে ?'

'মিটোব।'

'যেমন ভাবে চাইছে—গয়নার টাকা-সুদ্ধ নগদে মিলিয়ে সতের হাজার ?'

'এর ওপরও যদি গয়নার জন্যে আলাদা চায় তো দোব।'

কিছুক্ষণ বাক্‌স্ফূর্তি হইল না গদাধরের, তাহার পর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, 'তোমার মাথা-খারাপ হয়েছে ?

'এত পরিষ্কার মাথা আমার কোন দিনই ছিল না, তা না হলে এমন পরিষ্কার মাথাওয়ালা বেহাই চাইছি ?—লোকে সমান-সমানই চায় তো ? ...অবশ্য তোমার মাথাটা নিশ্চয়ই এতটা খারাপ হবে না যে, গয়নার কথাটা গিয়ে তুলবে। তবে, ঐ নগদের ওপর কিছু গয়না দোব আমি মেয়েকে।... ওপর ঘরে চলো, সব কথা এখানে হয় না।'

৩

পরামর্শটাই আসল ; স্বামী-স্ত্রীর প্রায় সমস্ত রাতই অনিদ্রায় কাটিল—বিবাহের ব্যবস্থাটা কি হইবে, দেওয়া-থোওয়া গয়না-গাঁটি—ভোজ—তাহার পর মেয়ে পাঠানো—তাহার পর—তাহার পর...

সময়ও তো হাতে নাই একেবারে।

আসল বিবাহের মধ্যে আর নূতন কথা কি থাকিবে যে আলাদা করিয়া বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন তাহার ?—সেই মেয়ে-দেখা, সেই আসর, সেই ভোজ, সেই বাসর, সেই বিদায়

যমুনা মেয়েটি বড় বেশি সপ্রতিভ, যাহা জিজ্ঞাসা করা হয় দুই-তিন বার প্রশ্নের পর মাথাটি নিচু করিয়া যেমন বলা উচিত সেভাবে তো বলেই না, বরং একটু বাগ্‌বিস্তার করিয়া বসে।...'অ্যাঁ নাম আমার ? আমার নাম শ্রীমতী যমুনা দাসী...মা বলেন। স্কুলে দিদিমণি বলেন, দাসী না লিখে পাল লিখো...'

এই করিয়া তিনটি সম্বন্ধ নষ্ট করিয়াছে। সরোজিনী সামনে ঝিকে রাখিয়া দোরের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিলেন। দেখিতে আসিয়াছেন মাত্র বরকর্তা, ঘটককে সঙ্গে লইয়া,—দেখা শেষ হইলে ঝিয়ের মধ্যস্থতায় পর্দা-রক্ষা করিয়া বলিলেন, 'ঝি, বল্, বাড়িতে দুটো বেশি কথা বলে ব'লে উনি না মনে করেন, মেয়ে আমার বাচাল। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখবেন, সাত চড়েও কথা কইবে না, বিশ্বাস না হয় বরং লিখিয়ে নিন আমার কাছে।'

আর সব দিক দিয়া দিব্যি মেয়ে, সর্বোপরি নগদ সতের হাজার টাকা, আর তত্ত্ব-তাবাসে দোহন করিবার এত বড় সম্ভাবনা। মনের আনন্দে

কাশীনাথ একটু রহস্যই আরম্ভ করিয়া দিল ; একটু হাসিয়া বলিল, 'বেয়ানকে অবিশ্বাস ক'রে কি পাপের ভাগী হব ?'

হইতে হইল না পাপের ভাগী।

নগদ সতের হাজার টাকার উপর এক-গা গয়না লইয়া বৌ পালকি হইতে নামিল। বৈঁচিতে বেশ সাড়াই পড়িয়া গেল।

সত্যই কিন্তু 'সাত-চড়েও' কথা কয় না।

সরোজিনী উপরে দু'ইঞ্চি খুরজার একনম্বর ঘি দেখাইয়া টিন-ভরতি ভেজিটেবল গছাইয়া দিয়াছে।

মেয়েটি যমুনা নয়, বড় মেয়ে সরযূ।

স্বনির্বাচিত গল্প

অ ম ল

রাখালচন্দ্র সেন

দ্বিপ্রহরে অমলকে ঘুম পাড়ানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। অথচ সমস্ত দিনরাতের মধ্যে অমলের মায়ের এই সময়টিতেই সবচেয়ে নিদ্রাকর্ষণ হইত। সেদিন দুপুরে শীতলপাটী বিছাইয়া অমলকে লইয়া তিনি শুইয়াছিলেন। একটা খোলা জানালা দিয়া মাঝে মাঝে গ্রীষ্মের উষ্ণ হাওয়া বাহিরের রৌদ্রের প্রতাপ জানাইতেছিল।

পাশে শুইয়া অমল উসখুস করিতেছিল—মনে তার অজস্র প্রশ্ন জমা হইয়া আছে। বৌদির কাছে গল্প শুনিবার আকাঙ্ক্ষাটাও মাঝে মাঝে দুর্নিবার হইয়া উঠিতেছিল। ক্রমাগত তার হাত-পা নাড়ানোতে মায়ের ঈষৎ তন্দ্রা ভাঙিয়া যাইতেছিল, অবশেষে বিরক্ত হইয়া তিনি কহিলেন—'অমল, তুই ঘুমুবি, না, না ?'

অমল নিরপরাধের মতো সরলকণ্ঠে উত্তর দিল—'কেন, মা, আমি তো চুপ করে শুয়ে আছি।'

'ওকে যদি চুপ করে শুয়ে থাকা বলে, তবে গোলমাল করা কাকে বলে? ঘুমো দেখিনি তুই একটু, আমি একটু চোখ বুজি।'

খানিকক্ষণ চুপ করিবার চেষ্টা করিয়া অমল কহিল, 'মা।'

'কেন?'

'আচ্ছা, মা, আমি কোথা থেকে এলাম?'

'কেন, ঐ কমলালেবুর গাছটা থেকে।'

'কোন্ কমলালেবুর গাছ থেকে!'

প্রথম উত্তর দিবার সময় মা কিছু ভাবিয়া বলেন নাই। কিন্তু অমলের জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি একবার জাগিলে তাঁহার আর ঘুমের সম্ভাবনা নাই জানিয়া তিনি কিছু গুছাইয়া কহিলেন,—

'ঐ যে বাড়ির পিছনে কূয়াটার পাশে কমলা গাছ, ওর দুটো বড়ো ডাল দেখেছিস্, ওরি মাঝে একদিন সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি তুই শুয়ে কাঁদছিস্। পেড়ে নিয়ে এলাম—এবার, আর একটা কথাও না। তোর যন্ত্রণায় যদি আমি কোনোদিন একটু ঘুমুতে পারি।'

জননী চোখ বুজিয়াই কথা বলিতেছিলেন, পাছে ঘুমের রেশটা ভাঙে। এবার একটু চোখ মেলিতেই দেখিলেন, অমল দরজার কাছে। রুক্ষস্বরে কহিলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস্?'

'বড়োমার কাছে,' বলিয়া অমল দরজা খুলিল।

ব্যস্ত হইয়া মা কহিলেন, 'লক্ষ্মীটি, তবে সে ঘরেই থাকিস, রোদে ঘুরিস না যেন।'—'আচ্ছা মা,' বলিয়া অমল বাহির হইয়া গেল। একটু শান্তি পাইয়া মা অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

২

বস্তুতঃ এই কমলালেবুর গাছের গল্প শুনিয়া অবধি অমলের মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু মায়ের স্বভাব সে জানিত, আপাততঃ তাঁর নিকট হইতে আর খবরের আশা নাই, নিজের ঘুম নষ্ট করিয়া তিনি তাহাকে গল্প বলিবেন না জানিয়া অমল তার জ্যাঠাইমার কাছে যাইবার সংকল্প হঠাৎ করিয়াছিল। জ্যাঠাইমাকে বড়োমা বলিত। তিনি দিনে ঘুমান না, সে জানিত।

বাহিরে বৈশাখের রৌদ্র। মায়ের কাছে কথা দেওয়া সত্ত্বেও আস্তে আস্তে অমল কমলালেবু গাছটার কাছে গেল। কতদিন এ গাছের পাশ দিয়া গিয়াছে, ইহার মূলে বসিয়া সাথীদের সাথে খেলিয়াছে, কিন্তু গাছটিকে এত রহস্যের আধার বলিয়া ভাবে নাই। আজ সেখানে আসিয়া ডাল-ছুটি সে ভালোভাবে দেখিল। এইখানে সে ছিল—কিন্তু তার কৌতূহলের উদ্রেক মাত্র হইয়াছে— কে আনিয়াছিল—সে তখন কতটুকু ছিল ইত্যাদি।

খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া সে বড়োমার ঘরে গেল। তিনি তখন চশমা আঁটিয়া রামায়ণ পড়িতেছিলেন, আর সীতার বনবাস-দুঃখে তাঁর চোখ ভিজিয়া উঠিতেছিল। অমল ঢুকিতেই কহিলেন, 'কী অমল ?'

যে প্রশ্ন মুখে করিয়া আসিয়াছিল, বৃহদাকার পুঁথি দেখিয়া অমল তাহা ভুলিয়া গেল। বলিল—'বড়োমা, ওটা কী পড়ছ, বড়োমা ?'

'রামায়ণ।'

'ছবি আছে!'

'না, বাবা।' সত্যিই বটতলার পুঁথি, কোনো ছবি ছিল না।

খানিকক্ষণ তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অমল কহিল—'আচ্ছা, বড়োমা, তুমি সেখানে ছিলে ?'

বিস্মিত হইয়া তিনি কহিলেন—'কোথায় ?'

অমল কহিল, 'কেন, যেদিন আমাকে কমলাগাছ থেকে পেড়ে নিয়েছিল মা ?'

বড়োমা অতি সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি কহিলেন, 'সে আবার কবে!' অমল আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। জন্মিয়া অবধি বড়োমাকে দেখিতেছে—এত বড়ো একটা ঘটনাতে তিনি থাকিবেন না, ভাবিতেই পারিল না, বলিল—

'আচ্ছা, আমি কোথা থেকে এলাম ?'

এ-সম্বন্ধে বড়োমার একটি গল্প বাঁধা ছিল। তাঁর নিজের ছেলেদের শিশু অবস্থায় অনেকবার বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—'কেন, নদীর স্রোতে।'

'কোন্ নদী ?'

'এখানে আর নদী ক'টা রে! সে অনেক দিনের কথা, চৈত্রসংক্রান্তিতে

নদীতে নাইতে গেছলাম। স্নান করছি, এমন সময় দেখি একটা পদ্মফুল ভেসে যাচ্ছে, তার মধ্যে ছোটো একটা ছেলে কাঁদছে। সেটাকে ধরে তা থেকে ছেলেটিকে তুলে নিলাম, সেই যে তুই আমার',—বলিয়া অমলকে চুম্বন করিলেন। অমল খুশি হইল না। বস্তুতঃ তাব মনে একটা অশান্তির সৃষ্টি হইল। এ দুয়েব কোন্ গল্পটি সত্য তাই জিজ্ঞাসা করিল—'তবে যে মা বলল, কুয়ার পাড়ের কমলাগাছের ডালের মধ্যে আমি ছিলাম, সেখান থেকে পেড়ে নিয়েছিল।'

এতক্ষণে বড়োমা বুঝিলেন যে, একথাটি তার কাছে হইয়া গেছে। তিনি কহিলেন, 'না, অমল, তোর মার ভুল হয়েছে, কমলাগাছে পাওয়া গেছল কমলাকে, তোর দিদি, তাই তো তার নাম কমলা, তোর মা ভুল করেছে—'

'আচ্ছা বড়োমা, তুমি পড়ো, আমি বৌদির কাছে যাই,'—বলিয়া অমল ভিতরের দালান দিয়া বাহির হইয়া গেল।

ব্যস্ত হইয়া বড়োমা উচ্চস্বরে কহিলেন—'ওরে, বাইবে রোদে যাস্‌নি যেন,' সে কথা কানে না পৌছতেই প্রবল বাত্যার মতো বৌদির শয়নকক্ষে অমল ঢুকিল।

৩

গৃহকর্মান্তে নিরালা দুপুরটিতে বৌদি প্রবাসী স্বামীকে চিঠি লিখিতেছিলেন। ঘরের পাশে লিচুগাছে ক্লান্ত কপোতের স্বর, দূর আম্রবন হইতে ঘুঘুর করুণ ডাক বোধ হয় তাঁর বিবহী হৃদয়কে উতলা করিয়া তুলিতেছিল—অমল ঢুকিতেই যেন তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হইয়া গেল। তবু তার সুন্দর মুখখানার দিকে চাহিয়া রাগ করিতেও পারিলেন না। তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন—এই শিশু দেবরটি তাঁর হৃদয়ের একটি অপূর্ণ কথা ভরিয়া রাখিয়াছিল। সেটা খানিকটা ছোটো ভাইয়ের, খানিকটা সন্তানের। তা ছাড়া তার মুখ-চোখ, বলিবার ভঙ্গি, হাসিবার ধরণ, সবই তাঁর স্বামীকে মনে করাইয়া দিত। কতদিন অবসন্ন হৃদয়ে এই শিশুটিকে বুকে লইয়া প্রাণ জুড়াইতে চেষ্টা করিতেন। অমলও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালোবাসিত, মাকে সে কিছু ভয় করিয়াই চলিত। বড়োমা চিরদিনই কিছু আনমনা। তার কত আবদার, গোপন কথা, সব ছিল বৌদির কাছে, কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসিত সে—

বৌদির মুখে উপকথা শুনিতে। তাই ঘরের কাজ শেষ করিয়াও তার এই দেওরের কাজ ফুরাইত না।

'কী লিখছ, বৌদি',—বলিয়া অমল ঝুঁকিয়া চিঠি দেখিতে লাগিল। সবে দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়াছে। বৌদিকে কিছু বিদ্যা জানানো চাই, তাই তারস্বরে চিঠির যেখানটায় চোখ পড়িল সেইখানটা বানান করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—'আমি ব্য বয়ে য-ফলা থা আকার ব্যথা পাইলে—বৌদি, ব্যথা কিসের ?' বৌদি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—'যা তোমার যেন না পেতে হয়, লক্ষ্মী ভাইটি, অত চেঁচিয়ে পোড়ো না।'— 'চিঠি তুমি পরে লিখো, বৌদি। আমায় একটা কথা বলো,'—বলিয়া অমল অতি কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। 'আচ্ছা, সত্যি ক'রে বলো দেখি আমি কোথা থেকে এলাম, নদীর জলে, না কমলার গাছ থেকে ?' এই 'সত্যি ক'রে' শুনিয়া চতুর বৌদি বুঝিলেন যে, কোথাও কিছু গোলমাল হইয়াছে। তাই একটু একটু করিয়া সকল কথা অমলের কাছ থেকে শুনিয়া হাসি চাপিয়া বলিলেন, 'অমল,—মা বড়োমা দুজনের কথাই সত্যি। বড়োমা নদী থেকে তুলে আমার কাছে দেন, আমি মজা করবার জন্য কমলাগাছে তুলে রাখি।'

'তুমি অত উঁচুতে উঠলে কী করে ?'

কথাটা তাঁর মনেই হয় নাই। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি সহজে খেলিত, বলিলেন— 'কমলাগাছ কি তখন অত বড়ো ছিল ?—সে আজ সাত বৎসরের কথা। তখন ওখানটা আমি হাতে পেতাম।'

সমস্ত ব্যাপারটা অমলের কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল। সহসা গাল ফুলাইয়া কহিল—'একটি গল্প বলো না, বৌদি।' বৌদি এই ভয়টিই করিতে-ছিলেন। অমলের ফরমাস একবার আরম্ভ করিলে শীঘ্র শেষ হইবে না। কঙ্কাবতী হইতে আরম্ভ করিয়া, মধুমালা সাত ভাই চম্পা, একে একে সকল গল্পই বলিতে হইবে, অথচ চিঠিটা আজ না দিলেই নয়। তাই মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন—'লক্ষ্মী ধন আমার, একটু চুপ ক'রে শোও, আমি চিঠিটা শেষ করি তারপরে বলব—'

'চিঠি তুমি পরে লিখো, আগে গল্প বলো, একটা শুধু।'

আর বাদ-প্রতিবাদ বৃথা জানিয়া, বৌদি কহিলেন,—'আচ্ছা বলছি, কিন্তু একটা কথা, একটির বেশি নয়, আর তুমি চুপ ক'রে আমার পাশে চোখ বুজে

শোবে ; আর বলতে পারবে না, "তারপরে"।' মহোৎসাহে অমল বলিল—'আচ্ছা।'

চেয়ার ছাড়িয়া বৌদি বিছানায় আসিলে, অমল পাশে শুইল। বৌদির আশা ছিল যে, চুপ করাইয়া রাখিতে পারিলে গল্প বলিতে বলিতে অমল ঘুমাইয়া পড়িবে, তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া চিঠিটা শেষ করিতে পারিবেন। অমলের ছোটো হাতটি নিজের হাতে লইয়া কহিলেন, 'বলো. কোন্‌টি বলব।'

বৌদিকে খুশি করিবার জন্য অমল কহিল—'তোমার যেটা ইচ্ছে সেটা।'

৪

বৌদি গল্প আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ বলিয়া থামিয়া পরখ করিতেছিলেন অমল ঘুমাইয়াছে কিনা। একটু থামাতেই অমল বলিল, 'তারপর।' বৌদি কহিলেন—'আমি আর বলব না। কী কথা ছিল, অমল? তুমি চোখ মেলবে না, বলবে না "তারপরে"—'

অমল অনুযোগের স্বরে বলিল—'তুমি থামলে কেন, রাজকন্যা কী করলে তখন?'

'আচ্ছা'—বলিয়া বৌদি গল্প আবার আরম্ভ করিলেন। মিনিট দশেক বলিয়া একটু থামিলেন—অমল এবার চোখ না মেলিয়াই কহিল—'হুঁ।'

এবার বৌদি রাগের স্বরে কহিলেন—'আচ্ছা, এবার কেন হুঁ বললে? আমি পাশ ফিরছিলাম বই তো নয়।'

অমল হাসিয়া বৌদির গলা জড়াইয়া কহিল—'বলা বারণ ছিল 'তারপরে,' আমি তো খালি 'হুঁ' বলেছি।'

'দুষ্ট ছেলে কথা কইতে পাবে না,'—বলিয়া তার গাল-দুটি টিপিয়া বৌদি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, শ্বশুরের উঠিবার সময় প্রায় হইল। এক্ষুনি মিছরির জল দিতে যাইতে হইবে, চিঠি লেখা বুঝি হয় না।—অথচ আর একজন হয়তো এই চিঠির পথ চাহিয়া আছে। হঠাৎ কী মনে করিয়া তিনি বলিলেন—'অমল, এ-সব তো পুরানো গল্প, একটা নূতন শুনবে?' পরম-পুলকভরে অমল কহিল, 'হাঁ, বৌদি।'

'তবে শোনো—এক দেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি থাকতেন বিদেশে, রাণী থাকতেন বাড়িতে, রাণীর সাথে ছিল রাজার ছোটো ভাইটি—সে তার

রাণী-বৌদিকে খুব ভালোবাসত। রাণীও তাকে বড়ো ভালোবাসতেন।'

অমলের মনে কী সন্দেহ আসিল, সে কহিল, 'সে কি আমি, বৌদি?'

'না, তুমি হতে যাবে কেন? আমরা কি রাজা, আর সে ছোটোকুমারের নাম ছিল সরলকুমার, তোমার নাম তো অমল।'

'ছোটোকুমার কে?'

'ঐ সে রাজার ভাই।'

এইরূপে ছোটোখাটো প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বৌদি গল্প বলিয়া গেলেন।

'রাজা থাকতেন অনেক দূরে। রাণীর জন্য, ছোটোকুমারের জন্য তাঁর মন কেমন করত। আর রাণীও রাজা একলা দূরে থাকতেন বলে অনেক ভাবতেন। প্রতিমাসে একবার করে রাণী রাজাকে চিঠি দিতেন—অনেক দূর কিনা, চিঠি পৌছতে দেরি হত।

সরলকুমার সারাদিন রাণীর কাছেই থাকত। আবদার করত, ভালোবাসত, চুমো খেত আর গল্প শুনত। রাণীর রাজবাড়ির অনেক কাজ—সেরে এসে বসলেই ছোটোকুমার তাঁর কোলটি জুড়ে বসত।

একদিন সে গল্প শুনবার লোভে রাণীকে চিঠি লিখতে দিল না। সে মাসে রাণীর চিঠি গেল না। রাজাও চিঠি না পেয়ে ভাবলেন যে, রাণী বাপের বাড়িতে গেছেন তাই লিখলেন না। এরি মধ্যে রাজা যে দেশে ছিলেন সে দেশ ছেড়ে আর এক দেশে গেলেন।

রাণী ঠিকানা জানতে পারলেন না, চিঠি লিখতে পারলেন না। খবর না পেয়ে দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলেন। এ-সময়ে শুধু সরলকুমারকে বুকে নিয়ে তিনি প্রাণ জুড়োতে চাইতেন।

সরলকুমার কিছু বুঝত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাণীর শরীর খারাপ হতে লাগল। তারপর একদিন কবিরাজ বলল, শক্ত অসুখ।

কত চিকিৎসা হল। কিন্তু রাণীর মন ভালো ছিল না, শরীরও সারল না। তারপরে একদিন সকলকে রেখে, তার স্নেহের সরলকে পরের হাতে দিয়ে তিনি মরে গেলেন। এমনি দুষ্ট সরল, যে তার আদরের রাণী-বৌদির জন্য একটুও কাঁদল না।'

হায় রে শিশুর কোমল মন, অমলের চোখের পাতা তখন সবে ভিজিয়া

উঠিয়াছে। সে গম্ভীর হইয়া কহিল, 'বৌদি, তুমি চিঠি লেখো, আমি ঘুমোই।'

'ঘুমোও ধন,' বলিয়া নিজের প্রতারণায় ঈষৎ ব্যথা পাইয়া তিনি অমলকে একটু আদর করিয়া চিঠি লিখিতে গেলেন। সমস্তক্ষণ অমল চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া রহিল।

চিঠিরও শেষ আছে। লেখা শেষ করিয়াই বৌদির মনটি স্নেহে যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই শিশুটি শুধু তার জন্য তার দুরন্তপনা ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া আছে। ঘুমাইয়াছে কি না তাঁর নিজেরই সন্দেহ ছিল। তাই অনুচ্চস্বরে কহিলেন—

'ঘুমিয়েছ, অমল?'

'হাঁ, ঘুমিয়েছি'—বলিতেই বৌদি হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'ঘুমন্ত মানুষ কি কথা কয়?'

'কী করব, ঘুম পাচ্ছে না যে।'

'তবে চুপ করেছিলে যে?'

একেই বলে যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। অমল আবার গম্ভীর হইয়া কহিল, 'এদিকে এসো, বৌদি।' বৌদি তার পাশে গিয়া তার বুকের উপর ঝুঁকিয়া কহিলেন, 'কী ভাই?' এবার অতি আস্তে তার বড়ো বড়ো চোখদুটি মেলিয়া অমল জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি মরবে না বৌদি, আর চিঠি লিখবার সময়ে গল্প শুনব না, তুমি আমায় সন্ধ্যার সময়ে বোলো'—বলিতে বলিতেই তার চোখের কোণে জল দেখা দিল।

'ওরে আমার মাণিক,' বলিয়া বৌদি তাহাকে বুকে জড়াইয়া কহিলেন, 'আমি মরব কেন, বালাই, আমি সরলকুমারকে একটা ছোটোরাণী এনে দেব, একদিন সেও বিদেশে যাবে, ছোটোরাণী চিঠি দেবে, যাদু আমার, আমার জন্য চুপ করে ছিলে এতক্ষণ?'

অমলের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

সপ্তপর্ণ

শেষের হিসাব

পরিমল গোস্বামী

নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসে পূর্বতন বাসিন্দার একখানা হিসাবের খাতা হঠাৎ হাতে এল। দেয়ালের গায়ের আলমারির মধ্যে খাতাখানা পড়েছিল। চুনকাম করার সময়েও কেউ এটা লক্ষ্য করেনি, আশ্চর্য! আলমারিটা তারা কেউ খোলেনি বোধহয়। কিন্তু আগের সেই ভাড়াটিয়াই বা কেমন লোক, হিসাবের খাতাখানাই নিতে ভুলে গেছে?

খাতাখানা সরিয়ে রেখে দিলাম, খোঁজ পড়বে একদিন হয়তো, তখন দেওয়া যাবে।

এদিকে আমার সংসারের যা দুর্গতি, তাতে এই সামান্য পরোপকারের প্রবৃত্তিও এখন আমার কাছে অস্বাভাবিক বোধহয়। জীবনরক্ষার মূল জিনিসেরই অভাব, অথচ বাঁধা আয়ে সংসার চালাতে হবে। এ অবস্থায় কার কি রইল, কার কি গেল, ভাববার প্রবৃত্তিও হয় না। চোখের সামনে সব ভেঙে পড়েছে। ঘুণ ধরে গেছে বাংলাদেশের জীবনে।

মাসে যা উপার্জন করি তাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিছুই কেনা হয় না। জানুয়ারি মাসের বেতন দিয়ে শুধু বিছানার চাদর কিনেছি। পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচ, একসঙ্গে অনেক জিনিস কিনতে হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দিয়ে কিনলাম পাঁচজোড়া জুতো। এমনি ভাবে এক এক মাসে এক একজাতীয় জিনিস!

গ্রীক পৌরাণিক গল্পে আছে, পারসিউস, গর্গন-হত্যার অভিযানে যাবার পথে এক সময় তিনটি বৃদ্ধা ভগিনীর দেখা পায়। তাদের তিনজনের চোখ ছিল মাত্র একটি, যখন যার দেখার দরকার হ'ত সে তখন ঐ চোখটি আর একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করত। তার কথাই আজ মনে পড়ছে। বর্তমানে আমাদের দেশের এক এক পরিবারের পাকস্থলী থেকে শুরু ক'রে ছাতাটি পর্যন্ত যদি ঐ রকম একটিতে কাজ চলত!

একদিন একা বিছানায় প'ড়ে এই সব নানা অসম্ভব কল্পনায় মেতেছি, এমন সময় খেয়াল হ'ল আমার এই ফ্ল্যাটের পূর্বপুরুষটি কি ভাবে সংসার

চালাতেন দেখা যাক। তাঁর এই ফেলে-যাওয়া হিসাবের খাতাখানা খুলে শুয়ে শুয়েই পড়তে আরম্ভ করলাম। পাঁচ বছরের হিসাব। পড়তে পড়তে উঠে বসলাম। এক নিশ্বাসে সবটা পড়ে ফেলতে হ'ল। শেষ করে স্তম্ভিত হ'য়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে যখন উত্তেজনা কমে এল, বুঝলাম এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কিছু বুঝেও নিষ্কৃতি পেলাম না।

আমার নিজের হিসাবের খাতাখানাও খুলে দেখি, এই হিসাবের সঙ্গে আশ্চর্য মিল! এঁর শেষ হিসাব লেখা হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমার শেষ হিসাব এখনও লেখা হয়নি—ঐখানেই যা তফাৎ।

প্রতি মাসে আশী টাকার সযত্ন হিসাব। ভদ্রলোক মাসে আশী টাকা বেতন পেতেন, বেশ বোঝা যায় তিনি কখনও ধার করেননি। তাঁর এই হিসাব থেকে আমি পাঁচ বছরে ছটি মাস বেছে নিয়েছি। এরই মধ্যে পাওয়া যাবে তাঁর ইতিহাস।

কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তি এই হিসাবের সঙ্গে আমার নিজের হিসাব এক সুরে বেঁধে দিয়েছে, ভাবতে গেলে আমি অস্থির হয়ে উঠি। তাই নিজের মনকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে আমার আবিষ্কার-করা হিসাবের খাতা থেকে আমার বাছাই-করা ছ'টি হিসাব সবার সামনে এনে হাজির করলাম, হয়তো আরও পাঁচজনের হিসাবের সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে। এটা কল্পনা করেও অনেক আরাম বোধ করছি। আমার একান্ত অনুরোধ নীচের পাঁচ বছরের ছ'টি হিসাব আপনারা ভাল করে পড়ুন।

(১) ১৯৩৯ জুলাই

বাড়িভাড়া	...	১৫৲
চাল দু'মণ	...	১০৲
কাপড় ৪ জোড়া	...	১০৲
বাজার খরচ	...	৩০৲
কয়লা ৩ মণ	.	১॥০
থিয়েটার ও সিনেমা	...	৭৲
অন্যান্য	...	৬॥০
		৮০৲

(২) ১৯৪০ জুলাই

বাড়িভাড়া	...	১৫৲
চাল দু'মণ	...	১২৲
কাপড় ৪ জোড়া	...	১৮৲
কয়লা ৩ মণ	...	২।০
বাজার	...	৩০৲
অন্যান্য	...	২৸০
		৮০৲

(৩) ১৯৪১ জুলাই

বাড়িভাড়া	...	১৫৲
চাল একমণ	..	১০৲
বাজার	...	৩৫৲
কাপড় ২ জোড়া	.	১৪৲
কয়লা ২ মণ	...	২৲
অন্যান্য	...	৪৲
		৮০৲

(৪) ১৯৪২ জুলাই

বাড়িভাড়া (গত জানুয়ারি থেকে সাময়িক ভাবে কম)		১২৲
চাল আধমণ	...	১২৲
বাজার	...	৩৬৲
কয়লা ২ মণ	...	৩৲
লটারির টিকিট	..	৬৲
কাপড় ১ জোড়া	...	১০৲
অন্যান্য	...	১৲
		৮০৲

(৫) ১৯৪৩ জুলাই

বাড়িভাড়া (পুনরায় বৃদ্ধি)	...	১৫৲
চাল দশ সের	...	৭॥০
বাজার	...	৩০৲
কাপড় ১ জোড়া	...	১০৲
লটারির টিকিট	...	৫৲
সর্বসিদ্ধি কবচ	...	৫৲
ভাগ্যলক্ষ্মী মাদুলি	...	৫৲
কয়লা আধমণ	...	১॥০
অন্যান্য	...	১৲
		৮০৲

(৬) ১৯৪৩ অগষ্ট

বাড়িভাড়া	...	১৫৲
পরিবার দেশে পাঠানোর খরচ	...	১২৲
স্ত্রীর হাতে দেওয়া গেল	...	৫১৸০
দড়ি ও কলসি	...	১।০
		৮০৲

ব্ল্যাকমার্কেট

লেখকের বিচার

মণীন্দ্রলাল বসু

অবনীর 'ললিত-লাবণ্য কথা', সিতাংশুর 'বালীগঞ্জে ভূতুড়ে বাড়ি' ও সতীশের 'অনন্ত তৃষ্ণা' গল্পগুলির পর আমার গল্প তোমাদের তেমন ভাল লাগবে না। আমি যা বলব তা গল্প নয়, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এ ঘটনা ঘটেছিল, অর্থাৎ ঘটা উচিত ছিল।

গত মাসে সতীশ চৌধুরীর বাড়িতে ডিনার-খাওয়া তোমাদের নিশ্চয় মনে

আছে। চৌধুরীর কোনও ডিনার আমি ভুলতে পারি না, ও লোকটা খাওয়ার আর্ট ওস্তাদের মত আয়ত্ত করেছে। যেমন বর্ণ ও রেখা-ছন্দের সামঞ্জস্যে চিত্রের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়; যেমন বেহালার সঙ্গে পিয়ানোর বা শরদের সঙ্গে বাঁয়া তবলার যথাযথ সঙ্গতে সুরের সমন্বয়ে জল্‌সা জ'মে ওঠে, তেমনিই আহার্যের সঙ্গে পানীয়ের যথোচিত সম্মিলনেই আহারের আনন্দ সৃষ্টি হয়; ভোজ্য প্রচুর ও বিচিত্র হলেই হয় না; আহার্য নির্ধারণে চাই সংযম এবং ডিনারের প্রতি কোর্সের খাদ্যের সঙ্গে পানীয় নির্বাচনে চাই পান-বিলাসীর সূক্ষ্ম আভিজাতিক রুচি; চৌধুরীর প্রতি ডিনারে আহার্য ও পানীয়ের শুধু বৈচিত্র্য নয়, আনন্দময় ঐক্য পাওয়া যায় ব'লেই তার ডিনারগুলি এমন উপভোগ্য।

ডিনার খেয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, রাত বারটা বেজে গেছে, কে আমায় মোটরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল, অবনী তুমিই বোধ হয়। হাসছ কেন,— বুঝেছি, তুমি বলতে চাও, মোটরে বাড়ি পৌঁছে না দিয়ে গেলে, একা বাড়ি ফেরবার মত অবস্থা আমার ছিল না তা হয়ত সত্যি!

আমার ড্রয়িং-রুম তোমরা দেখেছ, বাড়ির একতলার প্রায় সমস্ত অংশ জুড়ে, তার পাশে বারান্দা তারপর দোতালাতে ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে দেখি ড্রয়িং-রুমে আলো জ্বলছে; এত রাত্রে ড্রয়িং-রুমে কে আলো জ্বালাল!

খোলা দরজার পর্দা সরিয়ে দেখি, ঘর লোক-ভরা, সব অজানা অদ্ভুত-মূর্তি! এত রাতে এত লোক আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে আর গেট খোলবার সময় দরোয়ান একটা কথাও বললে না? ঘরের আলো বড় অপূর্ব লাগল, এ-আলো কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর বৈদ্যুতিক আলো নয়, এ সূর্যের বা চন্দ্রের আলোও নয়, এ কোনও অতীন্দ্রিয় লোকের আলো।

ঘরে প্রবেশ করতেই একটা সোরগোল প'ড়ে গেল।

—এই যে এতক্ষণে এসেছেন।

—খাওয়া বেশ ভালই হয়েছে দেখছি।

—পান ততোধিক, আমরা এদিকে এক ঘণ্টা ব'সে।

বিস্মিতভাবে বললুম, ক্ষমা করবেন, আমি কাউকে ঠিক চিনতে পারছি না, কোনও জরুরী কেস্ নাকি, পুলিস কেস্?

সোফাতে একটি মোটা লোক বসেছিল, সার্কাসের ক্লাউনের মত হা-হা ক'রে সে অদ্ভুত হেসে উঠল,—ওহে আমাদের চিনতে পারছে না!

সামনের সেটিতে এক মধ্যবয়স্কা নারী ব'সে শুষ্ক মুখ, শীর্ণ দেহ, চোখ দুটি অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে। কোণে গদি আঁটা চেয়ারে এক তরুণ যুবক, কালো কোঁকড়ান চুল, কবির মত স্বপ্নভরা চোখ। রজনীগন্ধা-ভরা ফুলদানির পাশে দোলানো-চেয়ারে এক তরুণী, বর্ষাস্নাত শ্বেতকরবীর মত করুণ সুন্দর। অপর দিকে এক কিশোরী মভ-রঙের শাড়ী প'রে, শ্রাবণ-জ্যোৎস্নায় অপরাজিতা লতার মত মধুর উদাস। আরও অনেক বিচিত্রবেশী বিভিন্ন বয়সের নরনারী। মনে হ'ল, তাদের যেন কোন স্বপ্নে দেখছি, চেনা হয়েছিল, কিন্তু জানা হয়নি, সব ভুলে গেছি। মোটা লোকটি পরিহাসের সুরে হেসে উঠল,—ভয় নেই, চেয়ারটায় ব'স, ভারতীতে 'ক্লাউন' ব'লে একটি গল্প লিখেছিলে মনে পড়ে?

—হাঁ, সে ত অনেক বছর আগে হবে।

—আমি সেই ক্লাউন, আমার কথাই তুমি লিখে নাম করেছিলে। আমার আসার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এঁরা বিশেষ ক'রে ইনি, কিছুতেই ছাড়লেন না।

রঙ্গভরা চোখ নাচিয়ে সে শীর্ণা নারীটির দিকে চাইল।

ক্লাউন বলতে লাগল,—'মা' গল্পটা মনে পড়ে? ইনি সেই মা। তোমার গল্পে এঁর সাত বছরের ছেলে টাইফয়েডে মারা যায়, চার বছর ধ'রে ইনি মৃত ছেলের জন্যে শোক করছেন, প্রতীক্ষা করছেন, এখন এসেছেন তোমার কাছে, তাঁর প্রতি কেন এ অবিচার, কেন তাঁর ছেলে মারা যাবে, তুমি ত তার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে পারতে। আর এঁরা সব তোমার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা—ওই হচ্ছে বিশু পাগল, কোণে গুম হয়ে বসে আছে, ওই তোমার তরুণ কবি রেবন্ত, ওই মাধবী কেশে শ্বেত করবীর মালা জড়িয়েছে, ওই চিরবিরহিণী অপরাজিতা—এঁরা এসেছেন তোমার বিচার করতে, তুমি তোমার খুশীমত তাঁদের জীবন গড়েছ, ভেঙেছ, কেন তাঁরা এত দুঃখ পাবেন চিরদিন। তুমি কি ওঁদের সুখী করতে পারতে না? হা হা, এবার বড় মুস্কিলে পড়েছ লেখক।

ব্যঙ্গের সুরে সে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল, যেন জীবনটা একটা অট্টহাস্য।

ধীরে বললুম, আমি লেখক মাত্র, মানব-সংসারে যদি দুঃখ মৃত্যু বিচ্ছেদ না থাকত, আমিও সে কথা লিখতুম না, আমার কি অপরাধ?

শীর্ণা নারী ব্যথিত স্বরে ব'লে উঠল, কার কি অপরাধ আমি জানি না, বুঝি না, আমি চাই আমার ছেলেকে, আমার মানিককে ফিরিয়ে দাও।

—আমি চাই আমার স্বামীকে। কেন তিনি আমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবেন এক ঘৃণিতা নারীর সঙ্গে।

—আমি চাই আমার প্রেমিক, আমার অজিতকে সে ত সত্যি আমায় ভালবাসত, আমায় বিবাহ করবে বলেছিল, তুমি কি আমার সুখ-মিলন কথা লিখে তোমার উপন্যাস শেষ করতে পারতে না? কেন তুমি আনলে ইন্দ্রাণীকে, অজিত তার রূপ দেখে ভুলে গেল, আমাকে ত্যাগ ক'রে চলে গেল—আমাদের প্রেম-মিলনপথে তুমি কেন আনলে ইন্দ্রাণীকে?

—আর আমি? হৈমন্তীকে আমার মত কে ভালবাসত, কে ভালবাসে? নিজ হাতে তাকে আমি খুন করলুম, হৈমন্তী শরৎ-শেফালির মত পবিত্র নিষ্পাপ, তাকে আমি সন্দেহ করলুম, কেন তুমি শরতকে আনলে আমাদের জীবনে? সে শুধু আমার মনে সন্দেহ জাগাত, নিজ স্ত্রীকে ভাবলুম অবিশ্বাসিনী, তুমি লেখক শরতের চরিত্র এঁকে পেলে বাহবা, আমি হলুম স্ত্রী-হত্যাকারী!

আমি বললুম, দেখ তোমরা যদি একে একে তোমাদের কথা বল, তাহলে তোমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করতে পারি।

শীর্ণা নারী ব'লে উঠলেন, আগে আমাব উত্তর দাও, কেন আমার ছেলে মরবে, টাইফয়েড রোগ থেকে ত কত ছেলে সেরে ওঠে, তুমি কি গল্পে লিখতে পারতে না, আমার ছেলে সেরে উঠল?

বললুম, মা, তুমি কি ভাবো, তোমার ছেলের মৃত্যুতে আমার অন্তরের ব্যথা, তোমার ব্যথার চেয়ে কিছু কম? তুমি জানো, আমিও তোমারই মত তোমার রুগ্ন শিশুর শিয়রে রাতের পর রাত ভয়ব্যাকুল চক্ষে জেগেছি; তুমি জানো, আমিও তোমারই মত তার রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা করেছি। মনে পড়ে, সে-রাতে তোমার ছেলের মৃত্যু হয়—সন্ধ্যায় ডাক্তার ব'লে গেল, খোকা অনেকটা ভাল আছে. সেই আশ্বাসবাণী শুনে তুমি ভাবলে রাতে একটু ঘুমোবে, শ্রান্তিতে তুমি তার শয্যাপার্শ্বে ঘুমিয়ে পড়লে, আমি কিন্তু

বিনিদ্র নয়নে জেগে রইলুম। শ্রাবণের মধ্যরাতে আকাশের সব তারা নিবিয়ে বৃষ্টি এল, দ্বারে দেখলুম, কার করাল কৃষ্ণ ছায়া, সে যম। দ্বার রোধ ক'রে দাঁড়ালুম, বললুম, নিদ্রিত মায়ের কোল থেকে রুগ্ন পুত্রকে তুমি নিতে পারবে না, আমি মাকে জাগিয়ে দেব। যম বললে,—তুমি বাধা দিও না, সৃষ্টির সত্যকে তুমি লঙ্ঘন করতে চাও! আমি যম, আমি অমোঘ শাশ্বত নিয়ম, আমি আজ্ঞাবহনকারী ভৃত্য মাত্র, আমার কাছে প্রার্থনা করা বৃথা; যিনি জন্মমৃত্যুর অধিপতি তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, কিন্তু সে প্রার্থনাও বৃথা হবে, সৃষ্টিকর্তা নিজ নিয়ম-জালে আপনি বাঁধা পড়েছেন। পারলুম না যমকে বাধা দিতে, নিশীথ রাত্রে তোমার ঘর থেকে সে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেল, তুমি নিদ্রিতা ছিলে, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ শ্রাবণ নিশীথাকাশের মত আমার চোখে অশ্রুর বন্যা উথলে উঠেছিল। তা যদি না হত তা হ'লে পারতুম কি তোমায় সৃষ্টি করতে, তোমার কথা লিখতে কি পারতুম? তোমার মনের বেদনা আমার রেখাঙ্কিত ললাটে আমার শীর্ণ কপোলে; তোমার আশাহীন কালো চোখের দিকে চেয়ে বিশ্বস্রষ্টাকে আমিও রাতের পর রাত প্রশ্ন করেছি; উত্তর পেলুম না, কিন্তু শোকাতুরা মাতার দিব্য মূর্তি দেখলুম; তুমি ছিলে চঞ্চলা বালিকা, নিজ স্বার্থকামিনী, সুখান্বেষিণী, তুমি বদলে গেলে, নিজ সুখ-সম্পদের দিকে চাইলে না, তুমি হলে সেবিকা, পৃথিবীর সব মা-হারা সন্তানদের তুমি বুকে টেনে নিলে; তোমার দুঃখ-বেদনা যদি না জানতুম, তোমার কথা কি লিখতে পারতুম এমন করে?

পুত্র-মৃত্যুপীড়িতা মাতা কোনও উত্তর দিল না, দীপ্ত নয়নযুগল অশ্রুতে অন্ধ হয়ে গেছে।

বিরহিণী অপরাজিতা বললে, অজিতকে ত মৃত্যুতে নিয়ে যায় নি, নিয়ে গেল এক ডাইনী, সে মায়াবিনীকে তুমিই ত আমাদের জীবনে আনলে, তোমার গল্প হয়ত বেশ জমল, কিন্তু আমার জীবন হ'ল ব্যর্থ শূন্য। তুমি তোমার উপন্যাসের একটা উপসংহার লেখ—অজিত বুঝতে পেরেছে ইন্দ্রাণী মেকী, তার ক্ষণিক রূপের মোহ ভেঙে গেছে, অজিত বুঝবে আমার প্রেম কত সত্য, আমি তার জন্য প্রতীক্ষা করছি, সে আমার কাছে ফিরে আসুক, তোমার উপন্যাসের কি সুন্দর শেষ হবে বল দেখি।

বললুম, আমার সমস্যা দেখছ না, অজিতকে তোমরা দু-জনেই ভালবাস, আমি কার সঙ্গে তার মিলন ঘটাই? অজিত যাকে ভালবাসবে, তার সঙ্গে মিলন হওয়া ভাল নয় কি? তোমার সঙ্গে যদি অজিতের বিবাহ দিতুম, আজ ইন্দ্রাণী এসে আমায় প্রশ্ন করত, আমাদেব মিলন কেন হবে না, আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি? হয়ত তোমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হযে যেত।

—মিথ্যে কথা, ইন্দ্রাণী কি অজিতকে আমার মত ভালবাসে। ও অজিতের টাকায ভুলেছে।

—মানলুম, কিন্তু জীবনেব বিপুল পথে মানব-দেহমনেব লোভ মোহ ক্ষুধা বাসনা কামনাকে তুমি কোনও নিযমে নিয়ন্ত্রিত করতে পার? আমি দিতে পারি অজিতকে তোমার হাতে, কিন্তু তুমি রাখতে পারবে কি? দীর্ঘ বিচিত্র জীবনপথে কত নবীনা ইন্দ্রাণী অজিতের হৃদয়-দ্বারে আঘাত করবে, অজিতের হৃদয উদাস হবে, তার পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে রাখতে পার, কিন্তু তার প্রেম পাবে কি? চাও তুমি তোমার ব্যর্থ প্রেমের কারাগারে তার অশান্ত বুভুক্ষু দেহ-মনকে বন্দী ক'রে রাখতে?

—কেন সে আমায ভালবাসবে না? তুমি ত উপন্যাসে লিখতে পার, সে আমায় মনপ্রাণ দিযে ভালবাসল, তুমি ত তাকে তেমনই ক'রে সৃষ্টি করতে পার।

—অজিতকে আমি তোমার প্রেমিকারূপেই সৃষ্টি করতে চেযেছিলুম, আমি লিখতে চেযেছিলুম, সত্যিকার প্রেমিক আজীবন অনুরক্ত স্বামীর কথা, আঁকতে চেয়েছিলুম আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন। কিন্তু মানুষের মন ত আমার হাতের পুতুল নয়, সে সজীব, সক্রিয় অগ্নিগর্ভ, পর্বতগুহাবতীর্ণা নদীধারার মত সে যে কোন্ পথে যাবে, পুরানো পাড ভাঙবে, নূতন তীর গড়বে, তার পথের নির্দেশ কে করতে পারে। সজীব মানুষ যখন আমার উপন্যাসে আসে, তাকে ত শৃঙ্খলিত সামাজিক অনুশাসনপীড়িত ক'রে আপন ইচ্ছা আদর্শ মত চালাতে পারি না, সব বাধা শৃঙ্খল ভেঙে সে তার নিজ যাত্রাপথ ক'রে চলে, আমি তার পথ চলার কাহিনী লিখি।

দোলানো-চেয়ার থেকে দীর্ঘ কৃষ্ণ অক্ষিপক্ষ্ম কাঁপিযে মাধবী আমার দিকে চাইল। বললুম, মূর্তিমতী বেদনার মত তুমি মূক ব'সে আছ, মাধবী, তুমি ত

কিছু বলছ না? আমার আত্মার সুগভীর বেদনা দিয়ে তোমায় সৃষ্টি করেছি, তুমি আমার প্রেমের কাহিনী জানো। শোন, তোমরা আমার গল্প শোনো:

আমি যখন কিশোর ছিলুম, এক কিশোরীকে ভালবেসেছিলুম, সে ছিল আমার জীবন-রূপকথার রাজকন্যা, তাকে ঘিরে রচতুম যৌবনস্বপ্ন, জীবন-মায়াজাল। কিন্তু সে সুন্দরীর মন ছিল অন্যমনা, সে ভালবাসত আর-এক যুবককে, আনমনা হয়ে সে বসে থাকত আমার পাশে। জেদ হ'ল, জয় করব ওই কিশোরী-চিত্তকে। আমার প্রেমের সাধনায় সে মুগ্ধ হ'ল, তাকে জয় করলুম; যৌবনে তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেলুম। তারপর বাহির হলুম পৃথিবীর বিপণিতে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুটে আনতে হবে প্রিয়ার পদপ্রান্তে; সেখানে স্বর্ণের জন্য হানাহানি, কাড়াকাড়ি, স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত, অর্থ-আহরণের প্রবল সংগ্রামে মেতে গেলুম। প্রথম যৌবনের প্রেম বিহ্বল দিন-গুলি স্বপ্ন হয়ে গেল; প্রিয়া যখন গান গায়, আমার এস্রাজ বাজাবার সময় হয় না; প্রিয়া যখন ছবি আঁকে, আমার রং গুলে দেবার অবসর কোথায়?

বাণিজ্য ক'রে আনলুম স্বর্ণ, ব্যাঙ্কে তহবিল উঠল উপছে। প্রিয়াকে সাজালুম,—কর্ণে মুক্তার দুল, কণ্ঠে হীরার মালা, অঙ্গুলিতে নীলার অঙ্গুরীয়, কটিতে স্বর্ণময় কাঞ্চী, পদে মণির নূপুর।

গঙ্গাতীরে তৈরী করলুম বিচিত্র প্রাসাদ প্রিয়ার জন্য। জার্মান দেশ হতে এল স্থপতি, ইতালী হতে এল বিচিত্র বর্ণের মর্মরপ্রস্তর, চৈনিক কারিগর তৈরী করল গবাক্ষ, পারসিক রীতিতে নির্মিত হ'ল স্নানাগার।

প্রাসাদের চারিদিকে রমণীয় উদ্যান রচনা করলুম—পূর্বদ্বারে অশোক-বীথিকা, পশ্চিমে তালতমালশ্রেণী, উত্তরে পদ্মদিঘী, দক্ষিণে নীপবন, করবীকুঞ্জ।

কিন্তু প্রিয়ার মন রইল অন্যমনা, আনমনা হ'য়ে সে সুদূরে চেয়ে থাকে, প্রেমতৃষিতা।

সে দিন সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশের বর্ণোৎসবে পৃথিবী রঙিন, হেনাহাস্নাহানা-কুঞ্জের গন্ধোচ্ছ্বাসে বাতাস মাতাল, নদীর জল কূলে কূলে ভরা। বিপণী থেকে গৃহে ফিরলুম; চন্দনকাষ্ঠের দ্বার খুলে পারস্যকার্পেটমণ্ডিত অধিরোহণী অতিক্রম করে প্রিয়ার কক্ষের দিকে গেলুম। সে সন্ধ্যায় প্রিয়া পরেছিল আধনী রঙের শাড়ী, কণ্ঠে ছিল রজনীগন্ধার মালা; আমাকে দেখে প্রিয়া স্মিতমুখে,

চকিতপদে এগিয়ে এল, শ্বেতপ্রস্তরের গৃহতলদর্পণের মতো দীপ্তিময়, পদযুগল ফুটে উঠল রক্তকমলের মতো, কিন্তু প্রিয়ার মন ছিল আনমনা, কাচের মতো মসৃণ মেঝেতে পা গেল পিছলে, সে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল, শুভ্র মর্মরে রক্তপদ্মের পাপড়ি ছড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল। সে মূর্ছা ভাঙল না, অন্যমনা হয়ে আমার গৃহে চলতে চলতে প্রিয়ার চরণ স্খলিত হ'ল, মৃত্যু এল।

পশ্চিমাকাশের বর্ণোৎসব শেষ হয়ে অন্ধকার এল, আমার অগণিত অশ্রু-বিন্দু অনন্ত আকাশ ভরে জ্বলে উঠল। সে রাতে বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করে-ছিলুম, তাকে যদি পেলুম, কেন তার ভালবাসা পেলুম না, তাকে এমন করে কেন তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলে? বোবা আকাশ কোনো উত্তর দিল না।

উন্মাদ হয়ে প্রাসাদ ভেঙে দিলুম, প্রিয়ামৃত্যুবেদনা অহর্নিশি অন্তরে বহন ক'রে মহা উন্মাদনায় দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরেছি। জীবনের সেই অপরিসীম বেদনাসমুদ্র মন্থন ক'রে তুমি এলে মাধবী, তুমি এলে তরুণ কবি রেবন্ত; তোমরা আনলে নবদৃষ্টি, নববাণী মানবজীবনে, সংসারের সুখ দুঃখ পৃথিবীর সৌন্দর্য নূতন চোখে গভীরভাবে দেখলুম। আগে যাদের হৃদয়ের ব্যথা বুঝিনি, যাদের তুচ্ছ অবহেলা করেছি, তাদের বীরত্ব, তাদের মহত্ত্ব দেখলুম, আত্মার নবজন্ম হল। তুমি খুনী, তুমি ঘৃণিতা, তুমি পাগল, তুমি ক্লাউন, তোমাদের সঙ্গে অন্তরের পরিচয় হ'ল, তোমাদের সমব্যথী হলুম। তোমাদের দুঃখের কথা লিখেছি, তোমাদের আত্মার সংগ্রামবেদনাব কাহিনী। প্রিয়া-বিরহকাতর আমার অন্তর দিয়ে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি, আমি কথাশিল্পী তোমাদের দুঃখে সমবেদনায় কাঁদতে পারি, আমি দার্শনিক নই, মানবজীবনের দুঃখের অর্থ কেমন করে বলব? আমি শুধু বুঝেছি, অপরূপ এই পৃথিবী, মহান এই মানবজীবন।

আমি চুপ করলুম। ঘরভরা স্তব্ধতা কাঁপতে লাগল তেল-ফুরিয়ে-যাওয়া প্রদীপের শিখার মত। সহসা বিশেপাগল হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল—আমি পারি, আমি পারি বলতে, এস আমার সঙ্গে।

বিশেপাগল পুব দিকের সবুজ পর্দা সরিয়ে আমার লাইব্রেরীতে যাবার দরজা খুলে দিল। সবাই চমকে দাঁড়ালুম। লাইব্রেরীতে নটরাজ শিবের একটি মূর্তি আছে দেখেছ, মূর্তিটির দিকে বিশু ছুটে গেল, হাত জোড় করে নতজানু হয়ে মূর্তির সামনে বসল।

চোখে চমক লাগল। মনে হ'ল, এ আমার লাইব্রেরী নয়, ভারতীয় কোনো গুহামন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখে আমি দাঁড়িয়ে, গর্ভগৃহের অন্ধকারে অগ্নিকান্তি নটরাজ বিগ্রহ। গৃহের দ্বার শঙ্খপদ্মখোদিত কারুকার্যময় প্রস্তরনির্মিত ; দ্বারের দক্ষিণে গঙ্গা ও বামে যমুনার লাবণ্যময়ী মূর্তি উৎকীর্ণ, অমৃতনিস্যন্দিনী রূপ কঠিন প্রস্তর ভেদ ক'রে পদ্মের মত ফুটে উঠতে চায়—জ্যোৎস্নাশুভ্র গঙ্গা তরুচ্ছায়ায় মকরের উপর বঙ্কিমভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, এক হস্তে পূর্ণ জলকুম্ভ, অপর হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম ; নীলোৎপলবর্ণা যমুনা কূর্মের উপর দাঁড়িয়ে, তাঁর এক হস্তে চামর অপর হস্তে নীলোৎপল।

গর্ভগৃহে দশদিকে ষোড়শ হস্ত প্রসারিত ক'রে অপরূপ নটরাজ মূর্তি—দক্ষিণ হস্তগুলিতে ডমরু বজ্র শূল পাশ টঙ্ক দণ্ড সর্প ও অভয়-মুদ্রা ; বাম হস্ত-গুলিতে অগ্নি খেটক ঘণ্টা কপাল খড়্গ পতাকা শুচিমুদ্রা ও গজহস্তভঙ্গি ; পিঙ্গল জটাভারে অর্ক ধুতুরাপুষ্প, চন্দ্র, গঙ্গামূর্তি ; কণ্ঠে মুক্তার হার, সর্পহার, বকুলের মালা ; বাম স্কন্ধে ব্যাঘ্রচর্ম ; কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে পদে মণিমাণিক্য-বিজড়িত বলয় ; অগ্নিশিখাবেষ্টিত পদ্মের উপর দক্ষিণপদ ; নৃত্যচঞ্চল বামপদ শূন্যে স্থাপিত।

বিশে পাগল অট্টহাস্য করলে—হাঃ হাঃ! পদ্মপীঠ ঘিবে অগ্নিশিখা নেচে উঠল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল। নটরাজ নৃত্য শুরু করলেন। নত্যের তালে তালে হস্তের নানা অস্ত্র দিকে দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। পরম বিস্ময়ে দেখলুম, নানা অস্ত্রের বদলে আমার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা তাঁর অগণিত হস্তে পুত্তলিকার মত শোভিত। নটরাজ তাঁর ডমরু ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমার দিকে, যেন তিনি বললেন, আমার ডমরু তুমি বাজাও, আমি তোমার সৃষ্ট নরনারীদের নিয়ে নৃত্যে মাতি। দেখলুম পুত্রশোকাতুরা মাতা, চিরবিরহিণী প্রেমিকা, জীবনেব হলাহলপায়ী পাগল, সবাই মেতেছে তাঁর হস্তে জন্মমৃত্যু সুখদুঃখের নৃত্যের উন্মাদনায়।

আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত বিসর্পিল গতিতে বিদ্যুৎ চমকে গেল। অশনিগর্জনে চমকে জেগে দেখি, সিঁড়িব পাশে বারান্দায় বেতের লম্বা চেয়ারে শুয়ে আছি, আমার চোখেমুখে বৃষ্টির জল অঝোরে ঝরে পড়ছে, বাতাসে অন্ধকার আকাশ হা হা করে উঠল।

লেখক-পরিচিতি

অনুরূপা দেবী ॥ ১৮৮১-১৯৫৮ ॥ পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, তাঁর কাছেই অনুরূপা দেবী জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, 'ভারতী' পত্রিকায অনুরূপার 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর আগে কুন্তলীন প্রতি-যোগিতায় গল্প লিখে পুরস্কৃত হন। এঁর স্বামীর নাম শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থাবলী পোষ্যপুত্র মন্ত্রশক্তি, মহানিশা। মা ইত্যাদি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১৮৭১-১৯৫১ ॥ অবনীন্দ্রনাথ বিদ্যালযে বেশি দূব পড়াশুনা করেন নি। ছবি-আঁকাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল। পবে সাহিত্য-চচা আবম্ভ করেন। চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি বিশ্ববিখ্যাত, কথাশিল্পী হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব সামান্য নয। তাঁব ভাষায চিত্রকরেব কারুকাজ লক্ষ্য কবার মত। অবনীন্দ্রনাথেব সাহিত্যপ্রতিভার মূল্যাযন এখনো সঠিক ভাবে হয নি। তিনি শিল্পী, এবং তিনি ভাষার জাদুকর।

গ্রন্থাবলী শকুন্তলা ক্ষীবেব পুতুল বাজকাহিনী, ভারতশিল্প, ভূতপতবীব দেশ, নালক, বাংলাব ব্রত খাতাঞ্চিব খাতা, প্রিযদর্শিকা, বুড়ো-আংলা, ঘরোযা জোড়াসাঁকোর ধারে, মাসি, এক তিন তিনে এক মারুতিব পুঁথি বং বেবং চাইবুড়োব পুঁথি ইত্যাদি।

অমৃতলাল বসু ॥ ১৮৫৩-১৯২৯ ॥ শৈশবাবধি অমৃতলাল বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি প্যারডি-রচনায় আত্মনিযোগ করেছিলেন তিনি একাধাবে নট ও নাট্যকার ছিলেন। বাংলাব রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। বসরচনার গুণে তিনি দেশবাসীর কাছে 'বসবাজ' নামে পবিচিত ছিলেন।

গ্রন্থাবলী হীবকচূর্ণ নাটক চোবেব উপব বাটপাড়ি তিলতর্পণ নাটক, ব্রজলীলা, ডিসমিশ, চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে বিবাহবিভ্রাট কৌতুক যৌতুক ইত্যাদি।

ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ॥ ১৮৪৯-১৯১১ ॥ ইন্দ্রনাথ আইনজীবী ছিলেন, কলকাতার হাইকোর্টে ওকালতী করতেন। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাল্যকাল থেকে। গদ্যে ও পদ্যে তিনি সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠকীর্তি তাঁব সম্পাদিত 'পঞ্চানন্দ'।

গ্রন্থাবলী উৎকৃষ্ট কাব্যম্ কল্পতরু, ভারত-উদ্ধাব হাতে হাতে ফল পাঁচু ঠাকুর, তিনখণ্ড খাজানাব আইন ক্ষুদিবাম জাতিভেদ ইত্যাদি।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ১৮৮১-১৯৬০ ॥ বিহারের ভাগলপুরে জন্ম।

তিনি 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদকরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। সাহিত্যই তাঁর জীবনের একমাত্র উপাস্য ছিল ; সংগীতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি 'গল্পভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন পারিবারিক সম্পর্কে তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাতুল ছিলেন।

গ্রন্থাবলী : রাজপথ, দিকশূল, অমূলতরু, বিদুষী ভার্যা, শশিনাথ, অমলা, নবগ্রহ ইত্যাদি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ॥ ১৮৪০-১৮৭০ ॥ কালীপ্রসন্ন তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে নিজেকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন যে, উনিশ শতকের বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে তিনি একজন বলে গণ্য হয়েছেন। দেশের ও দশের হিতকারী অনেক উদ্যোগের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বঙ্গভাষার অনুশীলনের জন্যে মাত্র তেরো বৎসর বয়সে তিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' মাইকেল মধুসূদনকে মানপত্র দিয়ে প্রথম সম্মানিত করেন। মহাভারতের অনুবাদ তাঁর অন্যতম মহৎ কীর্তি।

গ্রন্থাবলী : বাবু নাটক, বিক্রমোর্বশী নাটক, সাবিত্রী সত্যবান নাটক, মালতীমাধব নাটক, হুতোম প্যাঁচার নকশা ইত্যাদি।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৮৬৩-১৯৪৯ ॥ চব্বিশ পরগনার দক্ষিণেশ্বরে নিবাস। প্রথমজীবনে 'সংসারদর্পণ' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। সেই সময় থেকেই সাহিত্যচর্চার প্রতি প্রবল আগ্রহ জন্মে। অনেক স্যাটায়ার ও কবিতা রচনা করেছেন। ফ্রেনলজি ও সামুদ্রিক নিয়েও অনেক সময় অতিবাহিত করেন। কেদারনাথ তাঁর দীর্ঘজীবনের সাহিত্যসাধনার ফলে বঙ্গসাহিত্যকে উনিশখানি মুদ্রিত পুস্তক উপহার দিয়েছেন।

গ্রন্থাবলী : রত্নাকর, গুপ্তরত্নোদ্ধার, কাশীর কিঞ্চিৎ, কাশী-সঙ্গীতাঞ্জলি, চীনযাত্রী, শেষ খেয়া, আমরা কি ও কে, কবলুতি, আই হ্যাজ, স্মৃতিকথা ইত্যাদি।

কিরণশঙ্কর রায় ॥ ১৮৯১-১৯৪৯ ॥ ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত তেওতার বিখ্যাত জমিদার-বংশে জন্ম। কলকাতার হিন্দু স্কুলের ছাত্র, তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করেন মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। ইতিহাসে ট্রাইপস-সহ অক্সফোর্ড থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হন। ১৯১৭ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। ইনি 'সবুজ পত্রে'র লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। প্রবাসী,

আত্মশক্তি পত্রিকাতেও এঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। একটি মাত্র গ্রন্থের রচয়িতা।

গ্রন্থ : সপ্তপর্ণ।

গোকুলচন্দ্র নাগ ॥ ১৮৯৪-১৯২৫ ॥ গোকুলচন্দ্র আসলে একজন চিত্রশিল্পী। গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে তিনি অতুল বসু, যামিনী রায় প্রভৃতির সহাধ্যায়ী ছিলেন। তৈলচিত্র অঙ্কন করে তিনি অর্থোপার্জন আরম্ভ করেন, কিন্তু ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল অধিক। আর্কিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের চাকুরি করেন, তখন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের বহুদেশ ও অবজ্ঞাত স্থান পরিভ্রমণ করেন। এ'তে তাঁব স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তিনি শিল্পী, সেইসঙ্গে 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প রচনাও করেন, তখনই তাঁর সাহিত্যিক সত্তার পরিচয়ে সকলে মুগ্ধ হন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালিদাস নাগের সঙ্গে জাঁ ক্রিস্তভ অনুবাদ কবেন। ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধাব কবতে না পেবে অকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

গ্রন্থ : পথিক।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৮৭৭-১৯৩৮ ॥ মালদহ জেলার চাঁচল গ্রামে জন্ম। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করে যশস্বী হন। সাহিত্যসাধনার সঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদনাতেও বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ইনি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার সহঃসম্পাদক ছিলেন।

গ্রন্থাবলী : হাইফেন, যমুনাপুলিনে ভিখাবিণী, সর্বনাশেব নেশা, পরগাছা, পঞ্চদশী, চোরকাঁটা, নষ্টচন্দ্র ইত্যাদি।

জগদীশ গুপ্ত ॥ ১৮৮৬-১৯৫৭ ॥ একাত্তর বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সারাজীবন তিনি সাহিত্যের নিভৃতেই সাধনা করেছেন। আত্মপ্রচারে তিনি উদাসীন ছিলেন। কিন্তু প্রথম দিকে তিনি যেমন সুযশ ও কীর্তি অর্জন করেন, জীবিতকালেই তিনি তাঁর সেই কীর্তি ম্লান হয়ে যেতে দেখেছেন। কিন্তু তাতে বোধহয় কিছু যায়-আসে না। বিস্মৃতির অতল থেকেও নূতনভাবে অভ্যুত্থান অনেকের ঘটতে দেখা গিয়েছে।

গ্রন্থাবলী : লঘুগুরু, রোমন্থন, রতিবিরতি, দুতিনী, অসাধু সিদ্ধার্থ ইত্যাদি।

জলধর সেন ॥ ১৮৬০-১৯৩৯ ॥ শৈশবকাল থেকে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ। প্রথমজীবনে গোয়ালন্দে শিক্ষকতা করার সময়ে তিনি কাঙ্গাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতেন। ১৮৮৭

সালে জলধর সেন পারিবারিক শোকে অধীর হয়ে দেশত্যাগ করেন এবং হিমালয়-ভ্রমণ করেন। কিন্তু মুসাফিরকে অবশেষে আবার সংসারে প্রবেশ করতে হল। তিনি মহিষাদলে মাস্টারি গ্রহণ করলেন। তিনি অনেক পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনাকার্যে যুক্ত ছিলেন, তার মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য 'ভারতবর্ষ'।

গ্রন্থাবলী : প্রবাস-চিত্র, চাহার দরবেশ, হিমালয়, নৈবেদ্য, হিমাচল-বক্ষে, কাঙ্গাল হরিনাথ, দানপত্র, তিনপুরুষ ইত্যাদি।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ১৮৪৩-১৮৯১ ॥ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটি মাত্র গ্রন্থ রচনা করেই খ্যাত হন, সে গ্রন্থটি স্বর্ণলতা। তিনি মেডিকাল কলেজ থেকে পাস করে সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেন। যখন ডাক্তারী পড়ছেন, সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। তখনই বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে গ্রন্থরচনার ইচ্ছা তাঁর হয়, তারই পরিণাম 'স্বর্ণলতা'। এই গ্রন্থের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তারকনাথ আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু তাঁর খ্যাতি নির্ভর করে তাঁর প্রথম গ্রন্থটির উপরেই।

গ্রন্থাবলী : স্বর্ণলতা, ললিত সৌদামিনী, হরিষে বিষাদ, তিনটি গল্প, অদৃষ্ট ইত্যাদি।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ ১৮৪৭-১৯১৯ ॥ ত্রৈলোক্যনাথের জীবন বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আকর। তিনি বহুবিধ কাজ করেছেন, স্কুলমাস্টারি, দারোগাগিরি এবং অবশেষে মিউজিয়মের অ্যাসিস্টাণ্ট কিউরেটর। আজগুবি ও ব্যঙ্গরচনায় ত্রৈলোক্যনাথের জুড়ি নেই। তাঁরই রচনা অনুসরণ করে উত্তরকালে অনেকে যশস্বী হয়েছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নূতন রসের জোগান দিয়েছেন, এরূপ নির্দোষ রসিকতার তিনিই প্রবর্তক।

গ্রন্থাবলী : কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোকলা দিগম্বর, মুক্তামালা, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা, ময়না কোথায়, মজার গল্প, পাপের পরিণাম, ডমরু-চরিত ইত্যাদি।

দীনেশরঞ্জন দাশ ॥ ১৮৮৮-১৯৪১ ॥ ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার কুমোরপুর গ্রামে জন্ম। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এনট্রান্স পড়া ছেড়ে দেন। কলকাতায় এসে আর্টস্কুলে ভর্তি হন। অনেক রকম কাজ তিনি করেছেন। প্রথমে একটি দোকানে সেল্‌স্‌ম্যান, পরে ব্যবসায়। গোকুল নাগের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ১৯২১ সালে, এবং শিল্প ও সাহিত্যে মনোযোগ ঘটে। ফোর আর্টস্‌ ক্লাব স্থাপনা, এবং 'কল্লোল' পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরে চলচ্চিত্র শিল্পে আত্ম-নিয়োগ করেন।

গ্রন্থাবলী : ঝড়ের দোলা, মাটির নেশা, রাতের বাসা, দীপক, উতঙ্ক ইত্যাদি।

দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ ১৮৬৯-১৯৪৩ ॥ নন্দনকানন সিরিজ ও রহস্যলহরী সিরিজ লেখায় দীনেন্দ্রকুমারের সাহিত্যিক সুনাম অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হলেও বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্র থেকে তিনি স্থানচ্যুত হন নি। তাঁর 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীবৈচিত্র্য' ও 'পল্লীচরিত্র' গ্রন্থাবলীতে তিনি তাঁর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় সর্বপ্রথম তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাবলী : বাসন্তী, হামিদা, পট, অজয়সিংহের কুঠী, পল্লীচিত্র, পল্লীবৈচিত্র্য, চীনের ড্রাগন, পল্লীচরিত্র ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ ১৮৬৩-১৯১৩ ॥ কৃষ্ণনগরে জন্ম। ইনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এম. এ. পাস ক'রে বিলাত গমন করেন। বিলাতে গিয়ে ইংরেজিতে কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। দেশে ফিরে সরকারী চাকুরিতে যোগ দেন। দেশবাসীর কাছে তিনি নাট্যকার হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু অনেক কবিতা ও গান রচনা করেও যশস্বী হয়েছেন।

গ্রন্থাবলী : আর্যগাথা, The Lyrics of Ind, আষাঢ়ে, হাসির গান, মন্দ্র, দুর্গাদাস, আলেখ্য, মেবার পতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, ত্রিবেণী, আনন্দ-বিদায় ইত্যাদি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ ১৮৯৫- ॥ বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথার সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের নাম জড়িত। জীবনের দীর্ঘকাল এঁর প্রবাসজীবন কাটে—লখনউয়ে অধ্যাপনাতে নিযুক্ত ছিলেন। প্রবাসজীবন অতিবাহিত করলেও বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর যোগ নিয়মিত। সংগীত সাহিত্য শিল্প—সর্ববিষয়েই এঁর রুচি সমান উচ্চাঙ্গের। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংগীত বিষয়ে পত্রালাপ করেছেন, প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ রেখেছেন।

গ্রন্থাবলী : কথা ও সুর (রবীন্দ্রনাথ-সহ), অন্তঃশীলা, বক্তব্য, মনে এল ইত্যাদি।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ ১৮৬১-১৯৪০ ॥ রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্। করাচিতে অবস্থান করেন, তখন 'প্রবাসের চিঠি' ও 'করাচির চিঠি' নামে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' (১২৯২ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। করাচিতে 'ফিনিক্স' পত্রিকা ও লাহোরে 'ট্রিবিউন' পত্র সম্পাদনা করেন। পরে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অবসর গ্রহণের পর 'প্রদীপ' সম্পাদনা করেন।

গ্রন্থাবলী : স্বপনসঙ্গীত, পর্বতবাসিনী, অমরসিংহ, সংগ্রহ, লীলা, জয়ন্তী, আরাতামা ইত্যাদি।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ॥ ১৮৮২- ॥ ইনি বহু উপন্যাস রচনা করেছেন। কলকাতা হাইকোর্টে বহুদিন আইন ব্যবসায়ে রত। এই কাজে তিনি

সুনাম অর্জন করেন। বিভিন্ন কলেজে ইনি আইনের অধ্যাপনাও করেন। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যসাধনায় ছেদ পড়ে না। এমন এক সময় ছিল যখন সর্বসাধারণ নরেশচন্দ্রের উপন্যাস সাগ্রহে পাঠ করতেন।

গ্রন্থাবলী : শুভা, সর্বহারা, অগ্নিসংস্কার, শান্তি, সতী, মেঘনাদ, প্রহেলিকা, তরুণী ভার্যা, অভয়ের বিয়ে, বংশধর, টিকি বনাম টাক, দ্বিতীয় পক্ষ ইত্যাদি।

নিরুপমা দেবী ॥ ১৮৮৩-১৯৫১ ॥ বাংলা সাহিত্যে যে-কয়জন প্রতিভা-শালিনী লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছে নিরুপমা দেবী তাঁদের অন্যতমা। বহরমপুরের সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী পরিবারে তাঁর জন্ম, কিন্তু অতি অল্প বয়সে, ১৮৯৭ সালে, তাঁকে বৈধব্যবরণ করতে হয়। তিনি জীবনের সহচর করে নিলেন সাহিত্যকে। অনুরূপা দেবীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, তাঁরা উভয়ে উভয়ের 'গঙ্গাজল' ছিলেন। কঠোর ব্রতপালন, জপতপ ও তীর্থপর্যটনে জীবনের দীর্ঘকাল তিনি অতিবাহিত করেছেন।

গ্রন্থাবলী : অন্নপূর্ণার মন্দির, দিদি, অষ্টক, আলেয়া, শ্যামলী, বন্ধু, দেবত্র আমার ডায়েরী, যুগান্তরের কথা, অনুকর্ষ ইত্যাদি।

পরশুরাম ॥ ১৮৮০-১৯৬০ ॥ প্রকৃত নাম রাজশেখর বসু। প্রথম জীবনে সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' রচনার দ্বারা হঠাৎ খ্যাতি অর্জন করেন। সে খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ব্যঙ্গ-রচনায় যেমন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাতেও তেমনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গ্রন্থাবলী : গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, চলন্তিকা, লঘুগুরু, মেঘদূত, ভারতের খনিজ, কুটীরশিল্প, চলচ্চিন্তা, চমৎকুমারী ইত্যাদি।

পরিমল গোস্বামী ॥ ১৮৯৭- ॥ পাবনা ও পরে ফরিদপুর জেলার অধিবাসী। পিতা বিহারীলাল গোস্বামী ছিলেন বঙ্গভাষাবিৎ, কবি, প্রবন্ধকার। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে সম্ভবত পিতার প্রভাবে। ১৯২০ সালে বি. এ পাশ করে কিছুকাল বিশ্বভারতীতে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৩ সালে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে যোগ্যতার সঙ্গে এম. এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। 'বসুমতী', 'কল্লোল', 'উপাসনা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রথম লেখা শুরু করেন। কিছুকাল, ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬, 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৮ সালে 'সচিত্র ভারত' ও ১৯৩৯ সালে প্রমথ চৌধুরীর সহযোগীরূপে 'অলকা' মাসিক পত্র সম্পাদন করেন। ১৯৪৫ সাল থেকে 'যুগান্তর' পত্রিকার সাহিত্য-বিভাগের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

গ্রন্থাবলী : মারকে লেঙ্গে, ঘুঘু, পথে পথে, ম্যাজিক লণ্ঠন, সপ্তপঞ্চ, স্মৃতিচিত্রণ ইত্যাদি।

প্যারীচাঁদ মিত্র ॥ ১৮১৪-১৮৮৩ ॥ সাহিত্যজগতে ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর নামে খ্যাত। এই নামে তিনি রচনা করেন 'আলালের ঘরের দুলাল'—এই বই-ই প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাস। তাঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাংলা ভাষাকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাংলা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।"

গ্রন্থাবলী : আলালের ঘরের দুলাল, রামারঞ্জিকা, ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত ইত্যাদি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ১৮৭৩-১৯৩২ ॥ বর্ধমানের ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে প্রভাতকুমারের জন্ম। আদি নিবাস হুগলী জেলার গুরুপ। বি. এ. পাস করার পর কিছুকাল ভারত-সরকারের আপিসে কেরানীগিরি করেন। তারপর অকস্মাৎ বিলাতযাত্রার সুযোগ লাভ করে সেখানে গিয়ে তিনি ব্যারিস্টারি পাস করেন। দেশে ফিরে কিছুকাল রংপুরে তারপর গয়ায় প্র্যাকটিস করেন। জীবনের শেষভাগে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল-কলেজে অধ্যাপনা করেন। ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্যসেবা তিনি আরম্ভ করেন। প্রথমে কবিতা লিখতেন, তারপরে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে গল্প-রচনা আরম্ভ করেন।

গ্রন্থাবলী : নবকথা, অভিশাপ, ষোড়শী, রমাসুন্দরী, দেশী ও বিলাতী, নবীন সন্ন্যাসী, গল্পাঞ্জলি, রত্নদ্বীপ ইত্যাদি।

প্রমথ চৌধুরী ॥ ১৮৬৮-১৯৪৬ ॥ প্রমথ চৌধুরীর রচনায় সর্বত্র মজলিশি মেজাজের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। তিনি ব্যারিস্টারি পাস করে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন, কিন্তু আইন-ব্যবসায়ে বেশিদিন লিপ্ত ছিলেন না। তিনি নানাজাতীয় মানুষের সংস্পর্শে আসেন, তাঁর রচিত গল্পে এইসব অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। চলতি ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হওয়া যে সম্ভব তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'সবুজ পত্র' প্রকাশ করেন। কবিতারচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গ্রন্থাবলী : তেল নুন লকড়ি, সনেট-পঞ্চাশৎ, চার-ইয়ারি কথা, বীরবলের হালখাতা, নানাকথা, পদ-চারণ, নীললোহিতের আদিপ্রেম ইত্যাদি।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ॥ ১৮৯০- ॥ ইনি যেমন সুরসিক তেমনি বন্ধুবৎসল। 'ভারতী'র সঙ্গে ইনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁর রচিত 'আনারকলি' গ্রন্থটি এঁর খ্যাতির অন্যতম কারণ। 'যাদুকর' নামক একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। 'মহাস্থবির জাতক' এঁর পরিণত

বয়সের রচনা—এই গ্রন্থ সাহিত্যরসিকসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে।

গ্রন্থাবলী : আনারকলি, চাষার মেয়ে, দুই রাত্রি, ঝড়ের পাখি, মহাস্থবির জাতক ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৮৩৮-১৮৯৪ ॥ সাহিত্যের বহু বিষয়ে তিনি পথিকৃত। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর'-এ তাঁর অনেক গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গসাহিত্যে নবযুগের সৃষ্টি করে, বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে জ্ঞানচর্চার পথ রচনা করে এই পত্রিকাটি।

গ্রন্থাবলী : দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, কমলাকান্তের দপ্তর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ ১৮৯৬- ॥ ইনি প্রবাসী বাঙালী। দ্বারভাঙায় অবস্থান করেন। রসরচনায় দক্ষতা অসামান্য। যেসব চরিত্র ইনি অঙ্কন করেছেন তা যেমন সহজ তেমনি স্বাভাবিক এবং তেমনি নিখুঁত। বহুদিন থেকে ইনি রচনাকার্যে লিপ্ত আছেন, কিন্তু গ্রন্থপ্রকাশ আরম্ভ হয়েছে অনেক দেরিতে। তৎসত্ত্বেও গ্রন্থের সংখ্যা এখন আর সামান্য নয়।

গ্রন্থাবলী : রাণুর প্রথম ভাগ, রাণুর দ্বিতীয় ভাগ, বরযাত্রী, বসন্তে, বর্ষায়, নীলাঙ্গুরীয় রিকশার গান ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৮৯৪-১৯৫০ ॥ 'পথের পাঁচালী' খ্যাত বিভূতিভূষণ বি. এ. পাস করার পর কিছুকাল চব্বিশ পরগনা জেলার হরিনাভিতে স্কুলমাস্টারি করার পর ভাগলপুরের সন্নিকটে জমিদারের স্টেটের ম্যানেজারির কাজ করেন। সেখান থেকে ফিরে পুনরায় স্কুল-মাস্টারি করেন কলকাতায়। তাঁর রচনায় গ্রামজীবনের চিত্র স্পষ্টভাবে চিত্রিত।

গ্রন্থাবলী : দৃষ্টিপ্রদীপ, যাত্রাবদল, নবাগত, তৃণাঙ্কুর, আরণ্যক, মৌরীফুল, আদর্শ হিন্দু হোটেল, অপরাজিত, বিধুমাস্টার, ইছামতী, দেবযান, উর্মিমুখর, মেঘমল্লার, অনুবর্তন ইত্যাদি।

বিজয়রত্ন মজুমদার ॥ ১৮৯৩-১৯৬০ ॥ বহুকাল যাবৎ বিবিধ পত্রিকা সম্পাদকতা করেন। সাপ্তাহিক 'বাঙলা' পত্রিকা ১৯২৩ সাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি সম্পাদনা করেন। কিছুকাল সাপ্তাহিক 'শিশির' পত্রিকা এবং 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। অতি রসিক

ও বন্ধুবৎসল ছিলেন, দেশভ্রমণে ও মৎস্যশিকারে উৎসাহ ছিল প্রবল।

গ্রন্থাবলী : সাথী, গৃহদেবী, লেডী ডাক্তার, স্ত্রীর চিঠি, সতীত্বের মূল্য, প্লাবন, আবহাওয়া, ক্ষুধা, রাজস্থানের গল্প ইত্যাদি।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৭৮৭-১৮৪৮ ॥ বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে ভবানীচরণের দান সামান্য নয়। সেকালের সমাজে তিনি অশেষ কীর্তি অর্জন করেন। তাঁর জীবনও ছিল কর্মময়। সামাজিক ব্যাপারে তাঁর অভিমতের মূল্য ছিল অনেক। সাহিত্যে তিনি সর্বপ্রথম ব্যঙ্গরচনার সূচনা করেন। সেকালের বাবু ও বিবি বাঙালীদের নিজ নিজ চেহারা দেখাবার জন্যে তিনি লেখনী ধারণ করেন। ১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হয়, এখানেই তাঁর সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি; অতঃপর তিনি 'সমাচার-চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন।

গ্রন্থাবলী : কলিকাতা কমলালয়, হিতোপদেশ, নববাবুবিলাস, দূতীবিলাস, নববিবিবিলাস ইত্যাদি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ॥ ১৮২৭-১৮৯৪ ॥ আজীবন শিক্ষার উন্নতি ও শিক্ষা-বিস্তারে উদ্যোগী ভূদেব এদেশে সংস্কৃতচর্চার পথ সুগম করেন। তিনি জাতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিনি সহপাঠী, দুইজনের মেজাজের মিল ছিল না, কিন্তু মনের মিল ছিল। ভূদেবের রচনায় পুরাতনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পরিস্ফুট। বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস তিনিই প্রথম রচনা করেন। তিনি দীর্ঘকাল 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদনা করেন।

গ্রন্থাবলী : ঐতিহাসিক উপন্যাস, পুষ্পাঞ্জলি, পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার-প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ইত্যাদি।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ১৮৮৮-১৯২৯ ॥ পারিবারিক পরিচয়ে ইনি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। বিভিন্ন ধরনের রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। বড়দের জন্যে যেমন, ছোটদের জন্যেও তেমনি তিনি অনেক রচনা করেছেন। তাঁর লিখিত নাটক এককালে সাধারণ রঙ্গালয়ে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। 'ভারতী' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

গ্রন্থাবলী : জাপানী ফানুশ, কায়াহীনের কাহিনী ইত্যাদি।

মণীন্দ্রলাল বসু ॥ ১৮৯৷- ॥ ইনি ব্যারিস্টার। খুব বেশি লেখেন নি, কিন্তু স্বল্পরচনার দ্বারাই পাঠকচিত্ত জয় করেছেন। 'রমলা' গ্রন্থটি রচনা

করেই ইনি খ্যাত হন। 'প্রবাসী' পত্রিকার গল্পপ্রতিযোগিতায় মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, গল্পের নাম 'অরুণা'। ইউরোপের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধও রচনা করেছেন।

গ্রন্থাবলী : রমলা, মায়াপুরী, সোনার হরিণ, রক্তকমল, কল্পলতা, জীবনায়ন, সহযাত্রী, স্বপ্ন ইত্যাদি।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৮৫৮-১৯০৯ ॥ ছাত্রাবস্থা থেকেই মাতৃভাষা চর্চায় অনুরাগ দেখা যায়। উনিশ বছর বয়সে সাময়িক পত্র পরিচালনা আরম্ভ করেন, যথা—'সুধাকর' (১৮৭৭), 'কল্পনা' (১৮৮৯), 'অবকাশ' (১৮৮২)। অনেক গ্রন্থ রচনা করে যশস্বী হয়েছিলেন, কিন্তু এখন প্রায় বিস্মৃত।

গ্রন্থাবলী : প্রেমপ্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা, প্রণয় পরিণাম, দুই বন্ধু, স্ত্রী ও স্বামী, পাহাড়ীবাবা, শোভাসিংহ ইত্যাদি।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ॥ ১৮৫৪-১৯০৫ ॥ যোগেন্দ্রচন্দ্রের বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কীর্তি 'বঙ্গবাসী'-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ; কেননা এই প্রতিষ্ঠান বঙ্গদেশের, বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গসমাজের অনেক কল্যাণ সাধন করেছে। তাঁর রচনায় তিনি সমাজের বিবিধ গ্লানি নিবারণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে 'মডেল ভগিনী' গ্রন্থ বিশেষভাবে পরিচিত।

গ্রন্থাবলী : বাঙ্গালী-চরিত, মডেল ভগিনী, চিনিবাস চরিতামৃত, কালাচাঁদ পঞ্চানন্দ, কৌতুক-কণা, নেড়া হরিদাস ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১৮৬১-১৯৪১ ॥ জোড়াসাঁকো-ঠাকুরপরিবারের পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ ও সারদা দেবীর চতুর্দশ সন্তান। সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ। শৈশবকাল থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। কবিতা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ সংগীত—সকল স্তরেই সমান দক্ষতার এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ষোলো বৎসর বয়ঃক্রমকালে সদ্যপ্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকায় রচনা আরম্ভ করেন। তাঁর দীর্ঘদিনের তপস্যার ও সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন; শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কীর্তি। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা সামান্য নয়। সে এক দীর্ঘ তালিকা।

রাখালচন্দ্র সেন ॥ ১৮৯৭-১৯৩৪ ॥ খুলনা জেলার এক নগণ্য গ্রামে সাধারণ ঘরে এঁর জন্ম। তীক্ষ্ণ মেধাবী বালক নিজের অধ্যবসায়ে ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করেন। ১৯১৯ সালে এম. এ. পরীক্ষায় ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন, এবং সিবিল সার্বিস পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক

সরকারের কাছে খুব উৎসাহ পান, রাজনারায়ণ বসু তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হন। রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের পুত্র শরৎচন্দ্র সরকারের সঙ্গে বিবাহ হয়, স্বামীও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। সরলাবালার দেশাত্মবোধ অত্যন্ত প্রবল। বাংলা দেশের বহু লব্ধকীর্তি বিপ্লবী নেতা এককালে তাঁর কাছে সস্নেহ আশ্রয় পেয়েছেন। ১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার নির্বাচিত করেন; বাংলা দেশের মহিলাদের মধ্যে তিনিই এই সম্মান প্রথম লাভ করেন।

গ্রন্থাবলী প্রবাহ নিবেদিতা চিত্রপট, কুমুদনাথ, অর্ঘ্য, মনুষ্যত্বের সাধনা, হারানো অতীত ইত্যাদি।

সীতা দেবী ॥ ১৮৯৫- ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। শান্তা দেবীর মত ইঁহার জীবনও সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে পরিপুষ্ট। অনেক উপন্যাস রচনা করে একসময়ে বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কবি সুধীরকুমার চৌধুরী ইঁহার স্বামী।

গ্রন্থাবলী : চিরন্তনী সোনার খাঁচা, পরভৃতিকা, হিন্দুস্থানী উপকথা (শান্তা দেবীর সঙ্গে), বিদ্যুৎলতা (শান্তা দেবীর সঙ্গে) ইত্যাদি।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১৮৬৯-১৯২৯ ॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থা থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়--অগ্রহায়ণ ১২৯৮। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দানের পরিমাণ খুব বেশি নয়, কিন্তু সকল রচনাই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

গ্রন্থাবলী : দোলা, মঞ্জুষা মায়ার বন্ধন, দাসী চিত্ররেখা, বৈতানিক, করঙ্ক ইত্যাদি।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥ ১৮৭০-১৯২১ ॥ ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র। ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে সংস্কৃত পাঠ করে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। অল্পবয়সে স্বল্পপুঁজিতে 'সাহিত্য' পত্রিকা সম্পাদন আরম্ভ করেন। অনেক লেখক সৃষ্টি তাঁর অন্যতম সাহিত্যিক দান। 'সাহিত্য' ছাড়া 'বসুমতী', 'সন্ধ্যা', 'নায়ক', 'বাঙ্গালী' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদন করেছেন।

গ্রন্থাবলী কল্কিপুরাণ, সাজি, রণভেরী, ইউরোপের মহাসমর, ছিন্নমস্তা, বঙ্কিমপ্রসঙ্গ প্রভৃতি।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ ১৮৮৪- ॥ ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য-সাধনায় লিপ্ত। এঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক, প্রায় শতাধিক—বড়দের জন্যেও যেমন, ছোটদের জন্যেও তেমনি। 'ভারতী'

সাহিত্যচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তীকালে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকও হন।

গ্রন্থাবলী : কাজরী, বাবলা, আঁধি, রাঙামাটির পথ, লাখ টাকা, আরব্য উপন্যাসের গল্প ইত্যাদি।

স্বর্ণকুমারী দেবী ॥ ১৮৫৫-১৯৩২ ॥ ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ইংরেজি সভ্যতা ও সাহিত্যের সংযোগে বঙ্গদেশের সাহিত্যে যে নবচেতনা জাগ্রত হয়, নারী-সমাজের পক্ষ থেকে স্বর্ণকুমারীই সেই চেতনার কলগীতি প্রথম ধ্বনিত করেন। গান গল্প উপন্যাস নাটক কৌতুকনাট্য প্রহসন কবিতা প্রবন্ধ—সাহিত্যের সব বিভাগেই তাঁর দানের পরিমাণ বিপুল।

গ্রন্থাবলী : দীপনির্বাণ, বসন্ত-উৎসব, ছিন্নমুকুল, মিরাররাজ, হুগলীর ইমামবাড়ী, বিবাহ-উৎসব, নবকাহিনী, স্নেহলতা ইত্যাদি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥ ১৮৫৩-১৯৩১ ॥ হরপ্রসাদের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যাচর্চা। পুরাতত্ত্ব-আলোচনায় তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিসীম। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' আবিষ্কার করে তিনি বঙ্গভাষীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় হরপ্রসাদ মৌলিক রচনা আরম্ভ করেন, এবং তদ্দ্বারা স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দেন।

গ্রন্থাবলী : ভারত মহিলা, বাল্মীকির জয়, সচিত্র রামায়ণ, মেঘদূত-ব্যাখ্যা, কাঞ্চনমালা, বেনের মেয়ে, প্রাচীন বাংলার গৌরব, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি।

হরিশচন্দ্র মিত্র ॥ ১৮৩৮-১৮৭২ ॥ ঢাকায় জন্ম। অর্থকৃচ্ছ্রতার দরুন অধিক দূর লেখাপড়া করতে পারেন নি। ঢাকায় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং উভয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় হরিশচন্দ্র কবিতাদি লেখেন। হরিশচন্দ্রের উদ্যোগে ঢাকা থেকে প্রথম মাসিক পত্র 'কবিতাকুসুমাবলী' প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাবলী : হাস্যরসতরঙ্গিণী, কৌতুকশতক, বিধবাবঙ্গাঙ্গনা, কবিতাকৌমুদী, জানকী নাটক ইত্যাদি।